নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী

দ্বাদশ খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ★ কলিকাতা-৭৩

সূচীপত্র

অমাবস্যার গান

পুরী থেকে বৈষ্ণবের দল চলেছে বৃন্দাবনের পথে। মহাপ্রভুর নির্বাণ তীর্থ থেকে রাধাকৃষ্ণের লীলাভূমি ব্রজধামে। সাক্ষীগোপালকে প্রণাম করে, বর্গীর অধিকারের সীমা পার হয়ে, কুলীন গ্রামের পরম ভক্ত মালাধর বসুর অঙ্গনে সংকীর্তন করে, খানাকুল-কৃষ্ণনগরে।

সারাদিনে অনেকখানি পথ পার হয়েছেন বৈষ্ণবেরা। সন্ধ্যার মুখে যখন খানাকুলে পেঁীছুলেন, তখন পা আর কারো চলতে চায় না।

'জয় গৌরাঙ্গ! আজ এখানেই বিশ্রাম নিতে হবে।'

দলের নেতা বৃদ্ধ বৈষ্ণব যে জায়গাটিতে এসে দাঁড়ালেন, সেটি মনোরম। সামনে দীঘির জলে সূর্যাস্তের রঙ। বসন্তের হাওয়ায় চারপাশের গাছপালায় মাতন জেগেছে। কোকিল ডাকছে, বাতাসে নিম-মঞ্জরীর গন্ধ।

দলের নেতা মোহান্ত আবার বললেন, 'নিমফুলের গন্ধ আসছে। এই নিম্ব বৃক্ষের মূলেই তো আবির্ভাব হয়েছিল মহাপ্রভুর।'—উদ্দেশ্যে হাত জোড় করে প্রণাম করলেন, তারপর বললেন, 'রাতটা এই দীঘির পাড়েই চমৎকার কেটে যাবে। আজ শুক্লপক্ষ, চাঁদ উঠবে একটু পরেই। আকাশে মেঘ-বৃষ্টিরও কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। এসো, বসে পড়ো সবাই।'

সবাই বসে পড়ল ঠিকই আর নিমফুলের গন্ধে মেশানো বসন্তের হাওয়াও নেহাৎ মন্দ লাগছিল না। কিন্তু জনকয়েক একটু পরেই উসখুস করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত একজন আর থাকতে না পেরে বললে, 'প্রভু!'

মোহান্ত গুনগুন করছিলেন, 'জয় নিত্যানন্দ, জয় শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র'—তাঁর ঘোর লেগেছিল। বাধা পেয়ে ফিরে তাকালেন। বললেন, 'আবার কী হল?'

'পথ চলে সবাই ক্লান্ত, খিদে-তেষ্টাও পেয়েছে—'

মোহান্ত বাবাজী বললেন, 'সঙ্গে চিঁড়ে-মুড়কী আছে, সামনে টলটলে স্নিগ্ধ জল রয়েছে—শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় কিছুরই অপ্রতুল নেই। বেশ তো, সেবাটা সেরেই নেওয়া যাক না।'

বৈষ্ণবটি বয়সে ছেলেমানুষ, খিদেটাও একটু বেশি। করজোড়ে বললে, 'প্রভু, চিঁড়ে-মুড়ি যা আছে তা সামান্যই। তাতে কারো ভালো করে পেট ভরবে না।'

অক্রোধী মোহান্তও একটু বিরক্ত হলেন। একটা খঞ্জনী তুলে নিয়ে বারকয়েক ঝংকার দিয়ে বললেন, 'পেটপুজো তো আর আসল কথা নয়—আমরা শ্রীবৃন্দাবনে তীর্থ করতে চলেছি। এটুকু আত্মনিগ্রহও যদি করতে পারবে না, তা হলে এ পথে এলে কেন?'

ছেলেমানুষ বৈষ্ণবটি মাথা নিচু করে বসে রইল।

মোহান্ত আবার বললেন, 'প্রভুপাদ শ্রীসনাতন গোস্বামী যখন রাজপদ ছেড়ে

দীনাতিদীন হয়ে নীলাচলে গিয়েছিলেন, মনে আছে তাঁর সেই কৃচ্ছ্রসাধন ? আধখানা হরিতকী সঞ্চয় রেখেছিলেন বলে সঙ্গের ভৃত্যটিকে পর্যন্ত তাড়িয়ে দিলেন।'

একটু দূরে ঘাসের ওপর পুঁটলি মাথায় দিয়ে দাড়িগোঁফওলা একজন বৈষ্ণব চিৎ হয়ে শুয়েছিলেন, আকাশের তারা গুনছিলেন খুব সম্ভব। তাঁর পাশেই মাঝবয়েসী রোগা চেহারার একটি লোক বসে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিল মোহান্তকে। বেশ বোঝা যাচ্ছিল, মোহান্তের বাণী তার আদৌ পছন্দ হচ্ছে না। লোকটি লম্বমান শ্মশ্রুল গোসাঁইটির ব্যক্তিগত ভৃত্য, গৌরবে খাস শিষ্য।

সে গোসাঁইকে আস্তে একটা খোঁচা দিয়ে বললে, 'কর্তা, শুনছেন ?'

গোসাঁই ভ্রূকুটি করে বললেন, 'আবার কর্তা ? তোকে লক্ষবার বলিনি, আমি বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ? হয় প্রভু বলবি, নইলে গোসাঁইজী বলবি।'

'এজ্ঞে, মনে থাকে না। আপনি না হয় হঠাৎ গোসাঁই হতে পারেন, কিন্তু আমার এতদিনের অভ্যাসটা চট করে যায় কেমন করে ? তা ছাড়া চৌদ্দপুরুষ যার শাক্ত—তার এখন মালসাভোগ আর নামকেত্তন—'

'চোপ্‌'—বলে দাড়িওয়ালা গোসাঁই পাশ ফিরলেন।

'ইদিকে কণ্ঠী ধরেছ, ওদিকে শাক্তের বদমেজাজটি তো যায়নি।'

'আমাকে এখন জ্বালাসনি রঘু, শরীর ভালো নেই।'

'শরীর ভালো না থাকার এখুনি হয়েছে কী! ওদিকে মোহান্ত বাবাজীর ফতোয়া শুনছেন না ? রাত্তিরের জন্যে হর্তুকীর ব্যবস্থা হচ্ছে যে!'

গোসাঁই হাসলেন এবার। বললেন, 'ক্ষতি কী! হর্তুকীর মতো উৎকৃষ্ট জিনিস কি কিছু আছে ? কবিরাজী শাস্ত্রে কী বলে তা জানিস ? কদাচিৎ কুপিতা মাতা—ন কুপিতা হরিতকী—'

রঘু অর্থাৎ রঘুনাথ এবার চটে উঠল। বললে, 'থামুন কর্তা, থামুন।'

'আবার কর্তা ?'

'হ্যাঁ, একশোবার কর্তা। জানি আপনি মস্ত পণ্ডিত, ফার্সী-সংস্কৃত সব পড়ে ফেলেছেন, তাই বলে নাপিতের বাচ্চা রঘুকে এত সহজে ফাঁকি দিতে পারবেন না। খালি পেটে হর্তুকী ? ভেবেছেন কী ?'

দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে গোসাঁই বললেন, 'তোকে তো হাজারবার বলেছি রঘু, তুই আমার সঙ্গে থেকে কষ্ট পাসনি, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যা। বৈরাগ-যোগ ভারী শক্ত জিনিস রে—সবাই কি আর পারে ?'

'আপনি পেরেছেন বুঝি ?'

'চোপরাও। তোর তো বড্ড মুখ বেড়েছে!'

'আহা, কী আমার বোষ্টুম রে! যেন মা-কালীর মতো খাঁড়া উঁচিয়েই রয়েছেন!'

গোসাঁই এবার উঠে বসলেন। পরম রূপবান দীর্ঘদেহ পুরুষ—বয়েস যৌবনের শেষ সীমায়, চল্লিশ ধরো-ধরো। একটু দূরেই জনকয়েক বৈষ্ণব পাটকাঠির একটা মশাল জ্বালাচ্ছিলেন চকমকি ঠুকে, তার আলোয় জ্বলে উঠল তাঁর প্রতিভায় উজ্জ্বল চওড়া কপাল, বুদ্ধি আর কৌতুকে ভরা দুটি ঝকঝকে চোখ।

'তরোরিব সহিষ্ণুণা' আর 'অক্রোধেন ক্রোধং জয়েৎ'—এইসব বৈষ্ণবের আচরণীয়

মহামন্ত্র ভুলে গিয়ে গোসাই একটা চড়ই বোধহয় তুলতে যাচ্ছিলেন রঘুর উদ্দেশে। কিন্তু ওই পর্যন্ত এগিয়েই ব্যাপারটা থেমে গেল, কারণ ঠিক সেই সময়েই মোহান্ত ডাকলেন : 'বাবাজী কৃষ্ণপ্রেম !'

রঘুর একটা ফাঁড়া কেটে গেল। গোসাই—অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেম করজোড়ে বললেন, 'আজ্ঞা করুন প্রভু।'

'সবাই ভারী শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে আছে, তোমার মধুমাখা কণ্ঠে একখানা গান শোনাও।'

রঘু ফিস্‌ফিস্ করে বললে, 'হ্যাঁ, ভালো করে গান শোনান—জোড়া হর্তুকী প্রসাদ পাবেন।'

কৃষ্ণপ্রেম রঘুর দিকে একটা বজ্রদৃষ্টি ফেলে, কোমল গলায় বললেন, 'কী গাইব প্রভু ? মহাজন-পদাবলী ?'

'না—না, তোমার নিজের তৈরি গান। আশ্চর্য কবিত্ব হে তোমার, যেন সরস্বতীর বরপুত্র হয়েই জন্মেছ।'

'আজ্ঞে আমি কিছুই নই। সবই মহাপ্রভুর করুণা।'

'এই তো বৈষ্ণবের বিনয়।'—মোহান্ত প্রসন্ন হলেন : 'নাও, ধরো।'

কিছুক্ষণ চোখ বুজে থেকে দরাজ গলায় কৃষ্ণপ্রেম গান ধরলেন :

"জয় কৃষ্ণকেশব রাম রাঘব
কংসদানব ঘাতন।
জয় পদ্মলোচন নন্দনন্দন
কুঞ্জকানন রঞ্জন।
জয় কেশিমর্দন কৈটভার্দন
গোপিকাগণ মোহন।—"

'আহা, মধু—মধু।'—মোহান্তের উচ্ছ্বাস শোনা গেল।

মধুই বটে। যেমন দরাজ গলা, তেমনি আবেগ। বৈষ্ণবেরা স্থির হয়ে বসলেন সবাই। চাঁদ উঠল নিমগাছের মাথার ওপর, দীঘির জলে জ্যোৎস্না দুলতে লাগল, পাপিয়ার ডাক উঠল। কৃষ্ণপ্রেম গেয়ে চললেন :

"জয় গোপবল্লভ ভক্তসল্লভ
দেবদুর্লভ বন্দন।
জয় বেণুবাদক কুঞ্জনাটক
পদ্মনন্দক মণ্ডন—"

গানের টানে পথের লোকও জড়ো হতে লাগল দু-চারজন। তারপর ছোটখাটো একটি ভিড় এসে জমা হল বৈষ্ণবদের চারদিকে।

গান থামল। মোহান্তের চোখ দিয়ে নামল প্রেমাশ্রু। একটু আগেই যে ছেলেমানুষ বৈষ্ণবটি রাতের চিঁড়ে-মুড়ি নিয়ে ভাবনায় পড়েছিল সে পর্যন্ত মগ্ন হয়ে বসে রইল।

ঘোরটা একটু কাটলে, গলায় চাদর জড়ানো, রসকলি কাটা একজন গোলগাল মাঝবয়েসী মানুষ এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন মোহান্তের পায়ে। জিজ্ঞেস করলেন,

'প্রভুরা কোত্থেকে আসছেন ?'

'নীলাচল।'

'কত দূর যাওয়া হবে ?'

'শ্রীধাম বৃন্দাবন।'

'শ্রীবৃন্দাবন—আহা। কত পুণ্য থাকলে মানুষের ব্রজধাম দর্শন হয়—রাধা-গোবিন্দের পদরেণু দেহে মেখে জীবন ধন্য হয়ে যায়। আমরাই সংসারের বিষয়কীট—জাল কেটে আর বেরুতে পারি না।'

মোহান্ত জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কে ?'

'আমি এখানকার বৈষ্ণব চূড়ামণি জমিদারবাবুদের নায়েব, অধমের নাম হরিদাস। কিন্তু নামেই হরিদাস, মহাভক্ত প্রভুপাদ যবন হরিদাসের নখকণারও যোগ্য নই। কিন্তু ঠাকুর, আমি একটি নিবেদন নিয়ে এসেছি আপনাদের কাছে। দয়া করে বিমুখ করবেন না।'

মোহান্ত বললেন, 'আহা, অত কুণ্ঠা কেন, বলুন না।'

'আজ বাবুদের শ্রীশ্রীগোপীনাথজীর মন্দিরে বিশেষ সংকীর্তনের ব্যবস্থা হয়েছে। কাটোয়া নবদ্বীপের বিখ্যাত সব কীর্তনীয়া এসেছেন—মাথুর পালাকীর্তন হবে। দয়া করে আপনারা যদি সেখানে পায়ের ধুলো দেন, তবে আমরা বড়োই সুখী হবো। বৈষ্ণব-সেবারও সাধ্যমতো আয়োজন হয়েছে—প্রশস্ত নাটমন্দির আর অতিথিশালা আছে, আপনাদের রাত্রিবাসেও কোনো অসুবিধে হবে না।'

বৈষ্ণবদের মধ্যে একটা চাপা আনন্দের ঢেউ উঠল। দীঘির ধারে যতই চাঁদের আলো আর নিমমঞ্জরীর গন্ধ থাক, ক্ষিদেয় তেষ্টায় সবাই আকুল হয়ে উঠেছিলেন। কাল সকালে উঠেই আবার সামনের দীর্ঘ পথে পা বাড়াতে হবে। রাতে একটুখানি পেট ভরে খাওয়া আর খানিক নিশ্চিন্ত বিশ্রাম মনে মনে কামনা করছিলেন সবাই। এমন কি প্রবীণ মোহান্তও যে প্রসন্ন হলেন না তা নয়। ছেলেমানুষ বৈষ্ণবটি আর থাকতে পারল না, বলেই ফেলল, 'এ তো অতি সৎ প্রস্তাব।'

অক্রোধী মোহান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা তীক্ষ্ন দৃষ্টি হানলেন তার দিকে। তারপর শান্ত স্বরে বললেন, 'যাব বই কি, নিশ্চয় যাব। যেখানে সংকীর্তন, বৈষ্ণব তো রবাহূত হয়েই সেখানে যায়। চলুন।'

হরিদাস হাতজোড় করে বললে, 'তা হলে আসুন আমার সঙ্গে—দয়া করে গা তুলুন আপনারা।'

বেশি বলবার দরকার ছিল না। নতুন উৎসাহে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন বৈষ্ণবেরা। আর রঘু কৃষ্ণপ্রেমের কানে কানে বললে, 'আপনার গানের গুণ আছে কর্তা। হতুর্কীর হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলেন।'

কৃষ্ণপ্রেম চাপা গলায় বললেন, 'এবার তোকে আমি নির্ঘাৎ তাড়িয়ে দেব।'

'আহা, চটেন কেন ? বৈষ্ণবের রাগ করতে নেই।'

রাগের মাথায় কৃষ্ণপ্রেমের গলা দিয়ে বেরিয়ে গেল : 'জালিম! বরাখুরদার! বেফোয়াশ বাত্‌ ছোড় দো, নেহি তো—'

'ছি-ছি কর্তা! কৃষ্ণপ্রেম বাবাজী হয়ে আরবী-ফারসী কপচাচ্ছেন! লোকে বলবে কী!'

'তুই চুলোয় যা !'—কৃষ্ণপ্রেম একটু পিছিয়ে পড়েছিলেন, হন হন করে রঘুকে ফেলেই সামনের দিকে এগিয়ে চলে গেলেন।

আর সেই সময় একটা কথা মনে পড়ে গেল রঘুনাথের। বিদ্যুতের মতো চমকে গেল মাথার ভেতর। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের লোকজন যারা আসছিল, সে ফিরে তাকালো তাদের দিকে।

'এ তো খানাকুল-কৃষ্ণনগর, তাই নয় ?'

দুতিনজন হেসে উঠল। বললে, 'খানাকুল-কৃষ্ণনগর বইকি। গাঁয়ের নামটাও এতক্ষনে জানা হয়নি গোসাঁই ?'

রঘুনাথ রাগ করে বললে, 'আমাকে গোঁসাই-টোসাঁই বলবেন না—ও সব আমার কর্তাটিকে বলুন। আচ্ছা, এই গাঁয়েই তো মুকুন্দ ভটচাযের বাড়ি ?'

'হাঁ, এই গাঁয়েই। দীঘির পুব দিকেই তো বাড়িটা—সামনে মস্ত একটা জামগাছ রয়েছে। কিন্তু তারা তো বৈষ্ণব নয়। বাবাজীর সেখানে কী দরকার ?'

'বৈষ্ণব না হলেই কি চেনা মানুষের খবর নিতে নেই ? আপনারা তো বেশ লোক মশাই। আচ্ছা, আপনারা এগোন—আমি একটু ঘুরে আসছি।'

লোকগুলোকে একটা কথাও আর বলবার সুযোগ না দিয়ে রঘুনাথ জোর পায়ে ভট্চায-বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল। কর্তার এই পাগলামি আর সহ্য হয় না—তার অরুচি ধরে গেছে। একটা হেস্তনেস্ত যেভাবে হোক করা দরকার। আজ ভগবানই বোধহয় সে সুযোগ মিলিয়ে দিয়েছেন।

কর্তা যদি সত্যি সত্যিই মনেপ্রাণে গোসাঁই হয়ে যেতেন রঘুনাথের আপত্তি ছিল না ; তা হলে সে-ও না হয় সাধ্যমতো বাবাজী হতে চেষ্টা করত, তিলক-সেবা করত, সংকীর্তন গাইত, আখড়ায় আখড়ায় প্রসাদ পেতো। এ তো সে নয়। এমন একটা মানুষ কেবল খেয়ালের ঝোঁকে হিল্লী-দিল্লী ঘুরে বেড়াবে, রাজার ছেলে হয়ে মাটিতে শুয়ে থাকবে আর হর্তুকী খেয়ে রাত কাটাবে—রঘুনাথ কিছুতেই এতখানি বরদাস্ত করতে রাজী নয়।

আঠারো বছর বৈষ্ণবদের সঙ্গে থেকেও এ দুঃখ রঘুনাথের যায়নি ; মরলেও যাবে না।

কতদিন বলেছে, 'কর্তা, বর্ধমান এতদিন আপনাকে ভুলে গেছে, এবার ভালো ছেলে হয়ে ঘরে ফিরে চলুন।'

'আমার ঘর নেই।'

'ঘর নেই ?'—রঘুনাথ ব্যাজার হয়ে বলেছে, 'কেন বার বার ও অলক্ষুণে কথা মুখে আনেন বলুন তো ? বাপ-মা-ভাই—'

'কেউ না—কিছুই না। সন্ন্যাসীর পূর্বাশ্রম থাকতে নেই।'

'বাজে বকবেন না। ওসব আশ্রম-ফাশ্রম আমার মাথায় ঢোকে না। আর যদি মনে মনে এসব মতলবই ছিল, তা হলে দুম করে একটা বিয়েই বা করে বসলেন কেন ? আহা—মা-লক্ষ্মীর ভগবতীর মতো রূপ—'

'চোপ্ !'

'আমাকে থামিয়ে দিলে কী হবে ? ভগবান দেখছেন না ? সাধু সেজে এসব

অধর্ম করলে ভালো হবে আপনার? কী কুক্ষণেই যে আপনি বাবাজীদের পাল্লায় পড়লেন—'

'চলে যা আমার সামনে থেকে। তোর আমি মুখ-দর্শন করব না আর।'

'না-ই করলেন। সেই যেসব বোষ্টুম মাথায় ঘোমটা দিয়ে থাকে, আমিও নয় তাদের মতো—'

'চলে যা বলছি রোঘো।' কৃষ্ণপ্রেম ধৈর্য হারিয়েছেন: 'এবার তোর মাথা আমি ভেঙে ফেলব।'

'খুব বোষ্টুম হয়েছ যা হোক।'

এক-আধবার নয়, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর। শেষ পর্যন্ত বৈষ্ণবদের সঙ্গ অনেকটা অভ্যাস হয়ে গেছে, তবু রঘুনাথের মনের জ্বালা মেটেনি। এ জ্বালা কি মেটবার!

আজ খানাকুল-কৃষ্ণনগরে ভগবানই সুযোগ বুঝে এনে ফেলেছেন। যা করবার এখুনি করে ফেলতে হবে। রঘুনাথ গিয়ে ভট্‌চায-বাড়ির দরজায় ঘা দিল।

কৃষ্ণপ্রেম কিন্তু এসব কিছুই টের পেলেন না। হরিদাসের সঙ্গে সবাই মিলে যখন গোপীনাথজীর মন্দিরে গিয়ে পৌঁছুলেন, তখন আশপাশে তাকিয়ে দেখলেন একবার। রঘুনাথকে চোখে পড়ল না। ভাবলেন, আছে কাছাকাছি কোথাও—কোন্ চুলোয় আর যাবে, না মরা পর্যন্ত তো আর সঙ্গ ছাড়বে না!

মন্দিরের সামনে তখন সংকীর্তনের আসর বসে গেছে, মাথুর শুরু হয়ে গেছে, ভক্ত গায়ক গান ধরেছেন:

'অক্রুর সারথি নিরদয় অতি
রথ যায় দূরে চলে—
আর গোপিকার প্রাণ ভেঙে খান খান,
ব্রজ ভাসে যে নয়নজলে—'

ঝাড়লণ্ঠনের আলোয় ঝলমল করছে প্রাঙ্গণ, আসর জমজমাট, চারদিকে 'আহা—আহা' আর দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ, ধূপ-চন্দন-ফুলের সঙ্গে বৈষ্ণব-সেবার জন্যে লুচি ভাজার গন্ধ—কৃষ্ণপ্রেম তন্ময় হয়ে বসে রইলেন। বোধহয় ঘণ্টাখানেক কেটেছে, হঠাৎ পেছন থেকে রঘুনাথ ফিস্‌ফিস্ করে ডাকল: 'প্রভু!'

ঘাড় ফিরিয়ে কৃষ্ণপ্রেম বললেন, 'কী হয়েছে?'

'একবারটি আসরের বাইরে আসুন। জরুরী কথা আছে।'

'বিরক্ত করিসনি। এখন আমি যেতে পারব না।'

'দয়া করে একবার উঠুন না কর্তা?'

'কী আরম্ভ করলি রোঘো! আসরে ভক্তরা বিরক্ত হবেন।'

'বয়ে গেল!'—রঘুনাথ চাপা গলাতেই বেশ ঝাঁঝালোভাবে বললে, 'ইদিকে আমার জীবন-মরণ সমিস্যে, আপনার ভক্তদের আমি থোড়াই কেয়ার করি। আপনি উঠে আসবেন কিনা বলুন, নইলে আমি ডাক-চিৎকার ছাড়ব তা বলে দিচ্ছি!'

'উঃ, কী কুক্ষণেই যে তুই আমার পেছু নিয়েছিলি. আমাকে পাগল করে তবে

ছাড়বি !'—কৃষ্ণপ্রেম গজগজ করতে করতে আসর ছেড়ে উঠে এলেন। দরজার কাছে এসে বললেন, 'বল্ এবার তোর জীবন-মরণ সমিস্যেটা কী !'

'এখানে হবে না, বাইরে চলুন। নিরিবিলি দরকার।'

'নিরিবিলি কেন ?'—কৃষ্ণপ্রেম ভ্রূকুটি করলেন : 'কোথাও চুরি-ডাকাতি করে এলি নাকি ?'

'দুর্গা—দুর্গা' বলেই জিভ কাটল রঘুনাথ : 'রাধে মাধব, রাধে মাধব ! এ্যাদ্দিন আপনার চেলাগিরি করে শেষে চুরি-ডাকাতি করতে যাব ! কী যে বলেন !'

'তবে মতলবটা কী ?' কৃষ্ণপ্রেম একবার সন্দিগ্ধভাবে রঘুনাথের দিকে তাকালেন : 'পরামানিকের ছেলে, হাড়ে হাড়ে তোর চালাকি ! কী এঁটেছিস বল্ তো রোঘো ?'

'বলছি তো, বাইরেই আসুন না একবার। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনিই তো খালি কথা বাড়াচ্ছেন !'

'আচ্ছা, চল্—' গোসাঁই হাল ছেড়ে দিলেন : 'কিন্তু মনে থাকে যেন, কোনো চালাকি করলে একেবারে মাথা ভেঙে দেব !'

'বৈষ্ণব মতে ভাঙবেন তো কর্তা ?'

'চোপ্ !'

দুজনে বেরিয়ে এলেন বাইরে। মন্দির ছাড়িয়ে, জমিদারবাড়ি ছাড়িয়ে। রঘুনাথ আর থামে না, শেষ পর্যন্ত একটা অন্ধকার আমবাগানের দিকে এগিয়ে চলল সে।

কৃষ্ণপ্রেম দারুণ সন্দেহে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

'এই রোঘো, ও জঙ্গলের দিকে কোথায় চললি ? সত্যি বল্ তো তোর মতলবটা কী ?'

রঘুনাথ জবাব দিলে না। তার আগেই আমবাগানের ভেতর থেকে তিন-চারজন লোক বেরিয়ে এল হঠাৎ। কৃষ্ণপ্রেম কিছু বলবার আগেই তারা তাঁকে চেপে ধরল, তারপর সোজা তুলে ফেলল চ্যাংদোলা করে।

'আহা—আহা—করেন কী ! করেন কী !' কৃষ্ণপ্রেম চেঁচিয়ে উঠতে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে একজন হাত চাপা দিলে তাঁর মুখের ওপর। বললে, 'বেশি চেঁচামেচি কোরো না রায়, তা হলে একটানে তোমার দাড়ি-ফাড়ি সব উপড়ে নেব। মনে থাকে যেন।'

রায় ! কৃষ্ণপ্রেম কথা বলতে পারলেন না—কেবল চোখ দুটো কপালে তুলে চেয়ে রইলেন।

সেই লোকটিই বললে, 'এবার ঠিক পাকড়াও করা গেছে। চলো হে, আর সময় নষ্ট করা নয়। বাবাজীরা টের পেয়ে গেলে বাগড়া দেবে, ভারী গোলমাল হবে তখন। এখন আসামীকে জায়গামতন পৌঁছে দিয়ে তবে আমাদের ছুটি। তারা তারা।'

চ্যাংদোলা করে কৃষ্ণপ্রেমকে নিয়ে তারা আমবাগানে ঢুকল। পেছনে পেছনে ছায়ার মতো চলল রঘুনাথ, চাপা হাসিতে সমস্ত মুখ তার ভরে উঠেছে। হর্তুকীর প্রতিশোধ একেই বলে !

॥ দুই ॥

মুকুন্দ ভট্চাযের গিন্নী সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে চারদিক, বসন্তের হাওয়া বইছে, দূরে গোপীনাথজীর মন্দির থেকে খোল-আর কীর্তনের সুর ভেসে আসছে। জ্যোৎস্নায় ধোয়া পথটা একেবারে নির্জন। অনেক-ক্ষণ ধরে একভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, কিন্তু এখনো ওদের কাউকে দেখতে পাচ্ছেন না। তবে কি ধরে আনতে পারল না? হাতের কাছে এসে আবার পালিয়ে গেল? অভাগা ছোট বোনটার কথা ভেবে ভট্চাযগিন্নীর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

সেই সময় হুড়মুড় করে একটা আওয়াজ উঠল খিড়কির দিকে। যেন দুমদাম করে ঢুকে পড়ল অনেক লোক। ভট্চাযগিন্নী ব্যতিব্যস্ত হয়ে ছুটে গেলেন ভেতর দিকে।

চাঁদের আলোয় আলোয় স্নান করছে উঠোন। আর সেই উঠোনে সেই তিন-চারটি লোকের হাতে তখনো চ্যাংদোলা হয়ে ঝুলছেন কৃষ্ণপ্রেম। ভট্চাযগিন্নী চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওমা—ই কি!'

দলের নেতা মুকুন্দ ভট্চায ছড়া কেটে বললেন, 'গুরু মশাই, গুরু মশাই, তোমার পোড়ো হাজির! সদু, এইবার কান ধরে বেশ কষে পাক দাও আর তোমার পাঠশালায় পাঠ দাও!'

এতক্ষণে শূন্য থেকে ধপাস করে মাটিতে নামলেন কৃষ্ণপ্রেম। তারপর হাঁ করে চেয়ে রইলেন। সদু অর্থাৎ সৌদামিনী অবাক হয়ে গালে হাত দিয়ে বললেন, 'ওমা, এই নাকি ভারত!'

'ভারত মহাভারত যাই হোক, সন্দেহ হচ্ছে ইনি তিনিই। তা মুখে তো হাতখানেক দাড়ি-গোঁফ গজিয়েছে, সেগুলো মুড়িয়ে না ফেললে ব্যাপারটা এখনো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ওহে রঘু!'

রঘুনাথ এগিয়ে গেল। কৃষ্ণপ্রেম একবার বজ্রদৃষ্টি ফেললেন তার দিকে, কথা বলতে পারলেন না।

মুকুন্দ বললেন, 'জাত-ব্যবসা কিছু মনে আছে, না সব বৈষ্ণব-সঙ্গে ভুলে মেরে দিয়েছ রঘুনাথ?'

রঘুনাথ বিনয়ে হাত কচলাতে লাগল: 'এজ্ঞে, ও কি আর ভোলবার জিনিস? অস্তর পেলেই দেখিয়ে দিতে পারি।'

মুকুন্দর ছোট ভাই হেরম্ব উৎসাহিত হয়ে বললে, 'পরামানিক-বাড়ি থেকে খুর চেয়ে আনব দাদা?'

রঘুনাথ বললে, 'এজ্ঞে রাত্তিরে বরং থাক। চারটিখানি দাড়ি তো নয়, এক গাড়ি। রাত্তিরে ওসব ঝোপ-জঙ্গল সাফ করতে গেলে কেটেকুটে যেতে পারে। আমি বলি, শুভ কাজটা সকালেই হবে।'

কৃষ্ণপ্রেম এবার উঠে দাঁড়ালেন: 'এসবের অর্থ কী? কেন নিরীহ বৈষ্ণবকে উৎপীড়ন করছেন? কে আপনারা?'

ভ্রূকুটি করে মকুন্দ বললেন, 'ন্যাকা আর কী! ভাজা মাছটাও তো উলটে খেতে

জানো না! আমার নাম মুকুন্দ ভট্চায। আর সামনে এই যে ইনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন, এঁর নাম সৌদামিনী—সারদা গাঁয়ের আচার্যিদের লীলাবতী বলে যে মেয়েটাকে বিয়ে করে তুমি উধাও হয়েছিলে, ইনি তারই দিদি। বিয়ের সময় এর হাতের দুটো-চারটে কানুটি খেয়েছিলে, এখনো হয়তো সেকথা তোমার মনে থাকতে পারে!'

কৃষ্ণপ্রেম অর্থাৎ ভারত এবার গুম হয়ে বসে রইলেন। এতক্ষণে মনে পড়ল, ঠিক বটে—তাঁর বড়ো শালীর তো খানাকুল-কৃষ্ণনগরেই বিয়ে হয়েছিল! কিন্তু নিজের বিয়েটা হঠাৎ করে ফেলে বাড়িতে সেই গণ্ডগোল। তারপর বিষয়সম্পত্তির ঝামেলা। বর্ধমানের জেলখানা থেকে সেই কোনোমতে পালিয়ে যাওয়া—তারপর এত বছর দেশ-বিদেশ ঘুরে শেষে এই বৈষ্ণবের জীবন—এত কি আর খেয়াল থাকে! যদি থাকত, খানাকুল-কৃষ্ণনগরের ত্রিসীমানায় পা দিতেন তিনি? কিন্তু হতভাগা রঘু ঠিক মনে রেখেছে, আর এসব তারই শয়তানী!

রঘুর দিকে চেয়ে দেখলেন একবার। চাঁদের আলোয় বত্রিশটা দাঁত তার আনন্দে জ্বলজ্বল করছে। ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত জ্বলে উঠল তাঁর। চিৎকার করে বললেন, 'দূর হ রোঘো, দূর হয়ে যা আমার সামনে থেকে।'

মুকুন্দ বললেন, 'এ আমার বাড়ি, তুমি এখান থেকে ওকে দূর করবার কে হে? এখন ভালোয় ভালোয় ঘরে উঠবে, না চ্যাংদোলা করে আবার তুলতে হবে আমাদের?'

জোয়ান ভাই হেরম্ব তখনই তৈরী, বাড়ির চাকর মধু আর জ্ঞাতিভাই শ্রীপদও এগিয়ে এল। কিন্তু সৌদামিনীই বাধা দিলেন এবার। বললেন, 'কী ষণ্ডামি হচ্ছে তখন থেকে? তোমাদের বাড়ির ধারাই এই, কাউকে ধরে আনতে বললে তোমরা বেঁধে আনো। ছি—ছি, এমন করে কেউ কুটুম আনে?'

'নইলে আসতেন নাকি বাবাজী? টের পেলেই লম্বা দিতেন।'

'হয়েছে, থামো।'—সৌদামিনী এগিয়ে এলেন ভারতের দিকে। সস্নেহে হাত ধরলেন তাঁর।

'কিছু মনে কোরো না ভাই, এরা এইরকমই চোয়াড়ে। বললুম, মিষ্টি কথায় ভারতকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে একটিবার নিয়ে এসো আমার কাছে, তা নয়—একেবারে ডাকাতি করে আনল! তুমি কিছু মনে কোরো না—ঘরে এসো।'

রঘুনাথ ফোড়ন কেটে বললে, 'আজ্ঞে হাঁ, এবার ভালো ছেলের মতো ঘরে উঠুন, জামাই-আদরে খাওয়াদাওয়া করুন। আর আমার জন্যেও দয়া করে একটু প্রসাদ রাখবেন কিন্তু।'

ভারত সংক্ষেপে বললেন, 'চোপ্!'

সৌদামিনী আবার বললেন, 'এসো ভাই—মাপ করো আমাদের।'

ভারত এবার নিঃশব্দে সৌদামিনীকে অনুসরণ করলেন। এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন, 'ভবিতব্যং ভবত্যেব'—তার হাত থেকে কারো নিস্তার নেই। নইলে রঘুনাথই বা তাঁর সঙ্গ ছাড়বে না কেন, আর কেনই বা চলতে চলতে এভাবে খানাকুলে এসে পৌঁছুবেন? সবই শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা, যা হওয়ার তাই হোক।

সে রাতে উৎসব শুরু হয়ে গেল ভট্চায-বাড়িতে। অন্ধকারেই পুকুরে জাল ফেলে মাছ তুলল হেরম্ব, গোয়ালপাড়ায় গিয়ে মুকুন্দ ভালো ক্ষীর যোগাড় করে আনলেন।

কিন্তু অনেকদিনের অনভ্যাসে ভারত মাছ মুখেই তুলতে পারল না, মনের অনিশ্চয়তায় ক্ষীরও বিস্বাদ লাগল—সবটাই প্রসাদ হয়ে রইল রঘুনাথের জন্যে।

খাওয়াদাওয়ার পরে যে ঘরটিতে এনে সৌদামিনী তাঁকে শুইয়ে দিয়ে গেলেন, তার দক্ষিণে পশ্চিমে দুটি জানলা। দক্ষিণের জানলা দিয়ে বসন্তের হাওয়া আর নিমফুলের মিঠে গন্ধ আসছে, বালিশ থেকে মাথা উঁচু করে তাকালে পশ্চিমে সেই দীঘিটার উজ্জ্বল জলটা চোখে পড়ে। ভারত ঘরটির দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলেন। কুলুঙ্গিতে পেতলের বড়ো একটা প্রদীপ জ্বলছে, দেওয়ালে কালীঘাট আর কামাখ্যার দুখানা পট। ভট্চাযেরা শাক্ত। দীর্ঘ পথের ক্লান্তির পরে সেবাযত্ন দিয়ে পাতা এই নরম বিছানাটিতে গা এলিয়ে সব তাঁর কেমন অবাস্তব মনে হল। দূর থেকে এখনো সংকীর্তনের সুর আসছে, মোহান্ত গোসাঁই এখন তাঁর খোঁজ করছেন কিনা কে জানে! কীর্তনের সুরটা যেন ক্রমশ তাঁকে পেছনে ফেলে কোথায় সরে যাচ্ছে—যেন নীলাচলের সমুদ্রতীর থেকে অনেক দূরে কোথায় এগিয়ে চলেছেন তিনি, ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে আসছে সাগরের ডাক। ভারতের চোখ বুজে এল।

আর ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন, সেই না-ঘুম না-জাগার ভেতরে, নিজের অতীতটা ছায়া-ছায়া আর ছাড়া-ছাড়া ছবির মতো চেতনার ওপর ভেসে বেড়াতে লাগল। ভুরশুটের পেঁড়ো গ্রামে তাঁদের সেই ঐশ্বর্য, সেই প্রতাপ—তাঁর বাপ নরেন্দ্রনারায়ণ রায়কে লোকে 'রাজা' বলত। তারপরে কী তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে বর্ধমানের মহারানী বিষ্ণুকুমারীর সঙ্গে বিরোধ, দশ হাজার সৈন্য বর্ধমান থেকে এসে গড় আক্রমণ করল—সর্বস্ব গেল, কোনোমতে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালেন সবাই। তারপর দুর্দিন। বাড়ির ছোট ছেলে ভারত মানুষ হওয়ার জন্যে মামাবাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিলেন, সংস্কৃত শিখতে লাগলেন, সেখান থেকে সারদা গ্রামের আচার্যদের বাড়িতে, লীলাবতীর সঙ্গে বিয়ে—

লীলাবতী। আট-ন' বছরের সেই ফুটফুটে ছোট্ট মেয়েটি। কতদিন হলো? প্রায় সতেরো-আঠারো বছর। এর মধ্যে স্ত্রীর সঙ্গে আর তাঁর দেখা হয়নি। এতদিনে সে কি তাঁকে মনে রেখেছে? দেখলেও কি আর চিনতে পারবে?

অথচ সম্পূর্ণ দোষও তাঁর ছিল না। বাড়ির কাউকে না জানিয়ে কুল ভেঙে বিয়ে করেছেন, সংস্কৃত পড়েছেন—দেশে ফেরবার সঙ্গে সঙ্গে যেন ঝড় উঠল। বাবা মুখ ফিরিয়ে রইলেন, মা অভিমানে ঘরে দরজা বন্ধ করলেন, তিন দাদা সমস্বরে বলতে লাগলেন, 'ছি ছি ভারত, তোর এই কাজ? ভেবেছিলুম তোর বুদ্ধি আছে, লেখাপড়া শিখে ভাঙা সংসারটাকে তুই দাঁড় করাবি—আর তুই পড়ে এলি সংস্কৃত? কী হবে সংস্কৃত দিয়ে, একালে কে তার কদর করে? ফার্সী পড়লে অন্তত মুর্শিদাবাদ নবাব-দরবারে গিয়ে দাঁড়াতে পারতিস, একটা গতি হতো আমাদের। তারপর কোন্ এক আচার্যি-বাড়ির মেয়েকে বিয়ে করলি—বংশের মান-সম্মান—'

বিরক্ত হয়ে বাড়ি ছাড়লেন ভারতচন্দ্র। এবার দেবানন্দপুর। রামচন্দ্র মুন্শীর আশ্রয়ে ফার্সী পড়া। বাড়ি ফিরে এলেন, সবাই খুশি হলেন। বাবা তখন বর্ধমানের সঙ্গে রফা করে রাজসরকার থেকে কিছু জমিজমা ইজারা নিয়েছেন। বললেন, 'তুমি তো ফার্সী পড়ে এবার সত্যিকারের বিদ্বান হয়েছ—এখন বর্ধমানে গিয়ে আমাদের মোক্তার হয়ে থাকো। খাজনাপত্রের কোনো গোলমাল না হয়, রাজা কীর্তিচন্দ্র আমাদের ওপর

রাগ না করেন, মহারানী বিষ্ণুকুমারী যাতে খুশি থাকেন, সে-সব দিকে নজর রেখো। তুমি বুদ্ধিমান বিচক্ষণ—বেশি কথা তোমাকে আর কী বলব!'

বর্ধমানে গেলেন ভারতচন্দ্র। কিন্তু নরেন্দ্রনারায়ণের শত্রুর অভাব ছিল না, দরবারের চক্রান্তে বর্ধমানরাজ ইজারা জমিটুকু কেড়ে খাস করে নিলেন, বাকী খাজনার দায়ে ভারতকে কয়েদখানায় যেতে হল। সে কী লজ্জা, আর কী অপমান! ভাগ্যিস কোতোয়াল ধর্মভীরু লোক, নির্দোষ ব্রাহ্মণ-সন্তানকে নির্যাতন করতে তার খারাপ লাগছিল, তার দয়ায় গোপনে মুক্তি পেলেন ভারত। তারপর আর বর্ধমান নয়—বাংলা দেশ নয়—উড়িষ্যা পেরিয়ে একেবারে বর্গী অধিকারে, কটকে। সোজা গিয়ে হাজির হলেন সুবেদার শিবভট্টের কাছে। সুবেদার বর্গী হলেও দয়ালু লোক, ভারতচন্দ্রের দুঃখের কথা শুনে তাঁর মন গলে গেল।

শিবভট্ট সমস্ত কর্মচারী, মঠধারী আর পাণ্ডাদের কাছে এক হুকুমনামা পাঠালেন। ভারতচন্দ্র এবং তাঁর ভৃত্য যতদিন খুশি—যে মঠে ইচ্ছে, নীলাচলে থাকতে পারবেন। তাঁর আদর-যত্নে কোনো ত্রুটি হবে না, প্রত্যেক দিন তাঁকে একটি করে 'বলরামের আটকে ভোগ'ও দেওয়া হবে। বিনা করে, অবাধে তীর্থবাসের অধিকার দেওয়া হল তাঁকে।

পুরীধামে স্থায়ী হলেন ভারতচন্দ্র—স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। তারপর মঠে থাকতে থাকতে ক্রমশ ধর্মের দিকে মন গেল। 'গম্ভীরা'য় অহোরাত্র ভক্তের কীর্তন; 'সিদ্ধ বকুলে' বৈষ্ণবের উচ্ছ্বসিত চোখের জল; দিকে দিকে মহাপ্রভুর স্মৃতি; রায় রামানন্দ, ভক্ত হরিদাস, সার্বভৌম, সনাতনের কাহিনী…যেন আর-এক জীবনের সন্ধান পেলেন তিনি। ভারত বৈষ্ণব হলেন। ভেবেছিলেন, জীবনটা এইভাবেই শেষ পর্যন্ত কেটে যাবে, কিন্তু কেন যে এই দলটার সঙ্গে তাঁর বৃন্দাবন যাওয়ার দুর্মতি হল, কেন যে তিনি উড়িষ্যার নিরাপদ গণ্ডী থেকে বেরিয়ে এলেন! আর তারই ফলে—

ওই রঘুটাই যত গণ্ডগোলের গোড়া। ওই হল নাটের গুরু নিত্যানন্দ!

কিন্তু হতভাগার ওপর রাগই বা করবেন কী করে? গ্রামের লোক, তিন পুরুষ ধরে তাঁদের পরিবারের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। যখন পড়তে যান, সঙ্গে ছিল, বিয়ের সময় ওই হতভাগাই তো গৌরবচন শুনিয়েছিল। রামচন্দ্র মুনশীর বাড়িতে ফার্সী পড়বার সময়েও ও তাঁর সঙ্গ ছাড়েনি। তারপরে বর্ধমান—সেখানেও রঘুনাথ। বর্ধমানের হাজত থেকে পালানোর পথেও সে-ই সঙ্গী। জাজপুরে যখন দুরন্ত অসুখে মরণাপন্ন হয়ে পড়েন, তখন এই রঘুনাথই তাঁকে সেবাযত্ন করে বাঁচিয়ে তুলেছিল। বৈষ্ণব হলেন, রঘুনাথও তাঁর পিছু ছাড়ে না। শেষ পর্যন্ত—

এ লোকটাকে না হলে তাঁর একদণ্ডও চলে না, অথচ হতভাগা কী ধূর্ত!

কিন্তু লীলাবতী—

খুট করে বাইরে একটা আওয়াজ হল, ভারতচন্দ্র চোখ খুললেন। তার অর্থ, দরজার যে শিকলটা বাইরে থেকে আটকে রাখা হয়েছিল, সেটা খুলে ফেলল কেউ। দরজার দিকে তাকালেন ভারতচন্দ্র। সৌদামিনী দাঁড়িয়ে। আকাশ-ধোয়া জ্যোৎস্নার ঝলক পড়েছে তাঁর গায়ে—কেমন অবিশ্বাস্য মনে হল তাঁকে। যেন প্রথমটায় তিনি ভালো করে চিনতেই পারলেন না।

দরজার গোড়া থেকে সৌদামিনী ডাকলেন, 'ঘুমুচ্ছ ভাই?'

'না দিদি, জেগেই আছি। কিন্তু রাত বোধহয় দুপহর পেরিয়ে গেল, একটু আগেই শেয়ালের ডাক শুনছিলুম। আপনারা এখনো শোননি ?'

'আমাদের কি এত তাড়াতাড়ি শুলে চলে ? বাসন-কোসন ধুয়ে সব তুলতে হল ঘরে। এদিকে আজকাল চোরের উৎপাত বেড়েছে, তার সঙ্গে আবার কীর্তনের আসর বসেছে. একটু সাবধান থাকতে হয়।'

ভারতচন্দ্র উঠে বসলেন। হাসলেন।

'কীর্তনের সঙ্গে চোরের সম্পর্ক কী, দিদি ? তুমি কি ভাবো বৈষ্ণবদের ঝোলায় সিঁদকাঠি থাকে ?'

সৌদামিনী জিভ কাটলেন। বললেন, 'ছি ! ছি ! আমরা বৈষ্ণব নই, তাই বলে অমন কথা বলতে পারি কখনো ? মহাপাপ হবে যে ! তা নয়। কিন্তু এসব গান-টান হলে সবাই মিলে শুনতে যায়, রাত্তিরে বাড়িতে কেউ থাকে না, সেই ফাঁকে চোর এসে ঢোকে।'

'তাই বলো।'

সৌদামিনী ঘরে এলেন। প্রদীপের আলোয় আবার ভালো করে চেয়ে দেখলেন ভারতের দিকে। বললেন, 'কী কাণ্ডটাই করেছ বলো তো ! এমন টকটকে গায়ের রঙ রোদে পুড়ে গেছে, একমাথা ঝাঁকড়া চুল. সারামুখে দাড়ি ! রঘু এসে খবর না দিলে কেউ তো তোমায় চিনতেই পারত না।'

ভারতচন্দ্র নিঃশব্দে হাসলেন, জবাব দিলেন না।

'এবার কী করতে চাও ?'

ভারত চুপ করে রইলেন।

'আবার পালাবার ফন্দী ?'—সৌদামিনী হাসলেন : 'সে পথ বন্ধ চিরকালের মতো। হেরম্ব সারদা রওনা হয়ে গেছে। কাল দুপুরের ভেতরেই লীলাকে নিয়ে এসে পড়বে।'

ভারত চমকে উঠলেন।

'এই রাতে ! বলো কি দিদি ?'

'কোনো ভাবনা নেই ভাই, হেরম্বের হাতে লাঠি থাকলে চোর-ঠ্যাঙাড়ে ওর ত্রিসীমানায় আসতে পারবে না। এ পরগণায় সবাই ওকে জানে।'

'সেকথা আমি ভাবছি না দিদি। কিন্তু কাজটা ভালো হয়নি।'

'কেন ভালো হয়নি ?'

একটু চুপ করে থেকে ভারত বললেন, 'আমি এখনো মনস্থির করতে পারিনি। তা ছাড়া—তা ছাড়া লীলার কাছে আমি মুখ দেখাতে পারব না।'

'সে পারো কিনা আমরা বুঝব। সকালে দাড়িগোঁফ কামিয়ে দিলেই চাঁদমুখখানা আবার ফুলে উঠবে।'

'দিদি, ঠাট্টা নয়। আজ এত বছর ধরে জীবনটা একভাবে কেটে চলেছে। ঘর-সংসার করিনি, করবার কথাও ভাবিনি। এই বুড়ো বয়েসে এখন আর—'

সৌদামিনী বাধা দিলেন। বললেন, 'তুমি কুলীনের ছেলে, ফুলেল মুখুটি, এসব কথা তোমার মুখে মানায় না। তোমাদের তো আশী বছর অবধি বিয়ে করার রেওয়াজ আছে। বাজে বকতে হবে না, এবার লক্ষ্মীছেলের মতো সংসার পাতো, ঘরকন্না করো।'

'কী করে সংসার পাতবো ? আমার চাল-চুলো কিছু নেই। পেঁড়োতে আমি আর ফিরব না। বাড়ির জন্যেই আমার এই দুর্গতি। দাদারা যদি তখন আমার একটু সাহায্য করত, তা হলে অমন করে আমাকে বর্ধমানে কয়েদ যেতে হতো না। সব দোষ আমার ঘাড়ে পড়ল। না দিদি, সংসার আমাকে দিয়ে হবে না। এতদিন বিবাগী হয়ে কাটিয়েছি, বাকী জীবনটাও কাটিয়ে দেব।'

'তুমি না পুরুষমানুষ ?'—সৌদামিনী ভ্রূকুটি করলেন : 'এত লেখাপড়া কি মিথ্যেই শিখেছিলে তা হলে ? কোথাও একটা কাজকর্ম তুমি জুটিয়ে নিতে পারবে না ?'

'কোথায় যাব ? বর্ধমানের পাইক-পেয়াদা আমাকে একবার পেলে আর ছাড়বে না, টানতে টানতে আবার নিয়ে গিয়ে কয়েদে পুরে দেবে। আমার ওপরে রাগ ওদের এখনো যায়নি।'

'বর্ধমানের রাজত্বের বাইরে কি আর দেশ নেই ?'

ভারতচন্দ্র আবার চুপ করে রইলেন। কথাটার জবাব ঠিকমতো খুঁজে পাওয়া গেল না।

'ঠিক বুঝতে পারছি না, দিদি। নতুন করে জীবন শুরু করবার সাহস আর আমার নেই। তার চাইতে আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও—যেদিকে আমার চোখ যায়, চলে যাই।'

'আর লীলার কী হবে ?'

'কিছুই হবে না। এতদিন যেভাবে কেটেছে, সেইভাবেই কেটে যাবে।'

'তুমি মেয়েমানুষেরও অধম—' সৌদামিনীর চোখ দিয়ে আগুন ঝরতে লাগল : 'বেশ, তাই যাও। তোমাকে আনাই আমাদের ভুল হয়েছে। ভুরশুট রাজবংশের ছেলে যে এমন অপদার্থ হয়, স্বপ্নেও আমার তা জানা ছিল না। এসো আমার সঙ্গে, নিজের হাতে আমি সদর দরজা খুলে দিচ্ছি, কেউ তোমাকে বাধা দেবে না।'

মাথা নিচু করে বসে রইলেন ভারতচন্দ্র। লজ্জায় অপমানে চোখ তুলে চাইতে পারলেন না।

'কই, উঠে এসো !'

ভারতচন্দ্র বললেন, 'না, থাক। আজকের রাতটা আমি ভেবে দেখি।'

সৌদামিনী নরম হলেন। বললেন, 'ভাবনার তো কিছু নেই ভাই। সত্যিই যদি তুমি সন্ন্যাসী হয়ে যেতে, আমরা কেউ তোমায় পেছু ডাকতুম না। কিন্তু তুমি তো সাধু হওনি—রাগে দুঃখে বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ। শুধু নিজের জীবনটাই নষ্ট করছ তাই নয়—লীলার যে এতগুলো বছর কিভাবে কাটছে, সে-ও তুমি বুঝতে পারছ না। কাল লীলা আসুক, একবার ভালো করে চেয়ে দেখো তার মুখের দিকে, তারপর তোমার ধর্ম যা বলে তাই কোরো।'

ভারতচন্দ্র আবার মাথা নামালেন। গোপীনাথের মন্দিরে কীর্তন আর শোনা যায় না। এতক্ষণে বৈষ্ণবেরা সেবায় বসেছেন। আর মোহান্ত বাবাজী হয়তো ডেকে ডেকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন : 'কৃষ্ণপ্রেম ? বাবাজী কৃষ্ণপ্রেম ? সে কোন্ দিকে গেল হে ? তাকে তো দেখতে পাচ্ছি না !'

হায়, মোহান্ত যদি ঘুণাক্ষরেও জানতেন !

সৌদামিনী বললেন, 'কিন্তু আর নয় ভাই, রাত অনেক হয়েছে, তুমি ঘুমোও। কর্তা দরজায় শিকল দিয়ে গিয়েছিলেন, আমি খুলেই রাখলুম। পালাতে ইচ্ছে হয়,

পালিয়ো—কিন্তু লীলার কথাটা একবার ভেবে দেখো।'

সৌদামিনী বেরিয়ে গেলেন। পেছনে নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা।

ভারতচন্দ্র কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন, তারপর ধীরে ধীরে নেমে এলেন খাট থেকে। হ্যাঁ, এখুনি তিনি পালাতে পারেন এখান থেকে, গোপীনাথজীর নাটমন্দিরে গিয়ে মিশে যেতে পারেন বৈষ্ণবদের দলে। তখন আর মুকুন্দ ভট্টাচাযের সাধ্য নেই যে, সেখান থেকে তাঁকে ধরে আনবেন। কিন্তু—

কিন্তু নিজের মনের দিকে চেয়ে দেখলেন একবার। বর্ধমানরাজের উপদ্রবে দেশত্যাগী হয়েছিলেন, নিজের আত্মীয়স্বজনের ওপর একটা অসহ্য ঘৃণা জন্মেছিল, কিছুদিনের জন্যে শান্তি পেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সত্যি সত্যিই কি মনের ভেতর কোথাও বৈরাগ্যের ছায়ামাত্রও অনুভব করেছেন কখনো? অভ্যাসের ভেতর বছরের পর বছর কেটেছে, মন্দিরে গেছেন, কীর্তনে যোগ দিয়েছেন, মহাজন আর ভক্তদের সঙ্গ করেছেন; কিন্তু কখনো কি সেই অকৈতব কৃষ্ণপ্রেমের স্বাদ পেয়েছেন—যার জন্যে রূপ-সনাতন গৌড় দরবারের সব প্রতাপ-প্রতিপত্তির প্রলোভন ছেড়ে অঙ্গে ব্রজরেণু মাখলেন, রাজার ঐশ্বর্য ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে এলেন ভক্ত রঘুনাথ, বাইশ বাজারে 'কোড়া'র ঘায়ে রক্তাক্ত হলেন যবন হরিদাস, তবু কৃষ্ণনাম ত্যাগ করলেন না!

কিছুই হয়নি, শুধু পালিয়ে বেড়িয়েছেন। বরং চৈতন্যভাগবতে শাক্তনিন্দা পড়ে মনে ক্ষুব্ধ প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। 'শুষ্ক কাষ্ঠের সম আপন দেহ করিতে হয়'—মহাপ্রভু বলেছিলেন। কিন্তু একটি বৃত্তিও তো বশ মানেনি। পরকীয়া তত্ত্বের গূঢ় রহস্যে প্রবেশ করতে গিয়ে লৌকিক বিচার মাথা তোলে—নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর গৃহজীবন তাঁর ভালো লাগে না—'তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়—' এ কথা মেনে নিতে তাঁর মন সাড়া দেয় না। প্রভুপাদ শ্রীনিবাস আচার্য প্রাতঃস্মরণীয়, তাঁর কীর্তির তুলনা নেই, কিন্তু গৃহ-জীবন না হলে কী তাঁর চলত না? তাঁরও গুরু তো দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন, 'স্খলৎপাদ স্খলৎপাদ কহে বারম্বার!'

না—বৈষ্ণব তিনি হতে পারেননি। শুধু দিন কাটিয়ে চলেছেন। জীবন বদলেছেন, কিন্তু মন বদলাতে পারেননি; যেন একটার পর একটা পান্থশালায় দিনের পর দিন কাটিয়েছেন, অভ্যাসে মহাজন-সঙ্গ করেছেন, কীর্তন গেয়েছেন, গান বেঁধেছেন, চোখের জলও ফেলেছেন; কিন্তু অন্তরে কোথাও একটি রেখা পড়েনি, পাষাণ গলেনি, মনের শুকনো ডালে একটি 'প্রেমাঙ্কুর'ও দেখা দেয়নি। মোহান্ত তাঁকে ভালোবাসেন, বিশ্বাস করেন। অথচ সে ভালোবাসা, সেই বিশ্বাসের এতটুকু মর্যাদা রাখতে পারেননি তিনি।

সৌদামিনীই ঠিক বলেছেন। বৈষ্ণব তো হতে পারেন-ই নি, এদিকে পুরুষ নামেরও অযোগ্য। প্রাণের ভয়ে পলাতক। আঠারো-উনিশ বছর ধরে নিজের স্ত্রীর খবরটুকু পর্যন্ত নেননি—নরাধম আর কাকে বলে!

কপালের ঘাম মুছে আবার অসহায়ভাবে বসে পড়লেন খাটের ওপর। না—আবার পালাবার জো নেই। নিজের মনের কাছে ধরা পড়ে গেছেন, সরল নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবদের কোন্ অধিকারে তিনি প্রবঞ্চনা করবেন? কেমন করে আর সঙ্গ দেবেন তাঁদের? সৌদামিনী দরজা খুলে দিয়েছেন, কিন্তু আজ রাত্রে এই খোলা দরজাই তাঁর

সবচাইতে বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পরের দিন সকালটা বাবাজী কৃষ্ণপ্রেমের খুব সুখে কাটল না।

প্রথমেই এল পরামানিক। দাড়ি-জটা কামিয়ে নির্মূল করল। মুকুন্দ বলেছিলেন, কাজটা রঘুনাথই করুক, কিন্তু চড়-চাপড় খাওয়ার ভয়ে রঘুনাথ মনিবের কাছে এগোতে চাইল না। গেরুয়ার বদলে এল ধুতি-চাদর। ভারতচন্দ্র প্রতিবাদ করলেন না, ভাগ্যকে তিনি মেনে নিয়েছেন। তারও পরে চাকরটা গিয়ে খবর আনল, বৈষ্ণবের দল সকালেই গ্রাম ছেড়ে আবার বৃন্দাবনের পথে রওনা হয়ে গেছেন। যাওয়ার আগে মোহান্ত বাবাজী অনেকবার কৃষ্ণপ্রেমের খোঁজ করেছিলেন, শেষে ভেবেছেন, কৃষ্ণপ্রেম এগিয়ে গেছেন—পথেই দেখা হবে তাঁর সঙ্গে।

মুকুন্দ বললেন, 'তোমার কোনো ভাবনা নেই ভারতচন্দ্র, এখন দেখলেও আর মোহান্ত তোমাকে চিনতে পারবেন না।'

ভারতচন্দ্র হাসলেন, জবাব দিলেন না।

সৌদামিনী এসে বললেন, 'খুব কষ্ট হচ্ছে, না?'

'না দিদি।'

সৌদামিনী আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইলেন।

'মিথ্যেই ভেক বয়ে বেড়াচ্ছিলুম, পাপের বোঝা বাড়ছিল। তোমরা তা থেকে আমায় মুক্তি দিলে।'

সৌদামিনী একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'ও-সব তত্ত্বকথা বুঝিনে ভাই। শুধু তুমি সুখী হও, লীলাকে সুখী করো, এর বেশি আর কিছুই চাইনে।'

ভারতচন্দ্র তেমনি আকাশ-পাতাল চিন্তার মধ্যেই তলিয়ে রইলেন সারাদিন। চল্লিশ বছরের সীমায় পেঁছে আবার নতুনভাবে শুরু করতে হবে জীবনকে। সুখী হতে হবে, লীলাকে সুখী করতে হবে। কিন্তু কেমন করে? পেঁড়োতে তিনি আর যাবেন না, কিছুতেই না। গঙ্গার পশ্চিম কূলে থেকে থেকে বর্গীর হানা—আরো উত্তরে বর্ধমান রাজসরকারের ভয়। এক মুর্শিদাবাদে যাওয়া চলে, কিন্তু—

কিন্তু নবাব সরকারে গিয়ে উজীর-নাজীরের তোষামোদ করতে আর প্রবৃত্তি হয় না। কিছু জমি-জমা পত্তনি হয়তো নেওয়া চলে, কিন্তু আবার তো সেই বিষয়-সম্পত্তির ঝঞ্ঝাট। তা ছাড়া মুর্শিদাবাদেও এখন নানারকম গণ্ডগোল চলছে, পুরীতে বসেই সে-সব খবর তিনি শুনেছিলেন। চাকরি-বাকরি হয়তো এদিক-ওদিক একটা জুটতে পারে, কিন্তু চাকরি করতে আর তাঁর উৎসাহ হয় না।

বরাবর কবিতা লেখার ঝোঁক—সময় সুযোগ পেলেই কিছু কিছু চর্চা করতেন। মনে আছে, দেবানন্দপুরে রামচন্দ্র মুন্শীর কাছে থেকে যখন তিনি ফার্সী পড়ছেন, তখন বাড়িতে একদিন সত্যপীরের সেবা। দুপুরের পর রামচন্দ্র যখন পুঁথি আনতে পাঠাচ্ছেন, কী খেয়াল হল ভারতচন্দ্রের। বলে বসলেন, 'পুঁথি আনবার দরকার নেই—আমার কাছেই আছে একখানা।'

রামচন্দ্র খুশি হয়ে বললেন, 'বেশ, তা হলে পুঁথি তুমিই পড়বে। তোমার সংস্কৃত জানা আছে, উচ্চারণ ভালো, চমৎকার গলা। এ ভার তোমারই রইল।'

সত্যপীরের পুঁথি ভারতচন্দ্রের কাছে ছিল না। একবার সরস্বতী আর একবার বিস্‌মিল্লাকে স্মরণ করে কলম ধরলেন তিনি। তারপরেই শুরু হল চন্দ্রকলার কাহিনী :

"শুন সবে একচিত সত্যপীর গুণগীত
দুই লোকে পাবে প্রীত সিদ্ধ মনস্কামনা।
গণেশাদি দেবগণ বন্দ সত্যনারায়ণ
সিদ্ধ দেহ অনুক্ষণ যার যেই ভাবনা ॥
কলির প্রথমে হরি ফকির শরীর ধরি
অবনীতে অবতরি হরিবারে যন্ত্রণা—"

সভার সকলে পুঁথি শুনে খুশি হলেন, তারপর ভণিতা শুনে চমকে উঠলেন :

"দেবের আনন্দধাম, দেবানন্দপুর নাম,
তাহে অধিকারী রাম রামচন্দ্র মুন্‌শী—"

স্বয়ং মুন্‌শী মশাই এসে জড়িয়ে ধরেছিলেন ভারতচন্দ্রকে।

'তুমি এই পুঁথি নিজে লিখেছ? এত ভালো কবিতা লেখ তুমি? তুমি যে দেখছি স্বয়ং কবি কালিদাস হে। হাতে তোমার একেবারে তৈরী সেহাই কলম! লেখো লেখো, কবিতা লেখো—দেশ-জোড়া নাম হবে তোমার।'

'আজ্ঞে ভরসা হয় না।'

'কেন? কবিতা লিখবে, তাতে ভয়টা কিসের? দেখো, এতেই তোমার উন্নতি হবে।'

'উন্নতি?'—ভারতচন্দ্র হেসেছিলেন : 'আজকাল কবিতার দাম আর কে দেয় বলুন।'

'দেবে দেবে। সমঝদার হলেই দেবে। ফার্সী কবিতায় পড়োনি?—

"কদরে গোল বুলবুল বেদানম্‌ ইয়া চস্বেরী,
কদরে জওহর সা বেদানা ইয়া বেদানদ্‌ জওহরী"—

মনে আছে?'

'আজ্ঞে মনে আছে বইকি। বুলবুল জানে ফুলের কদর, জহুরী চেনে জহরকে। কিন্তু কবিতা—'

'চিনবে হে, চিনবে। এলেমদার আর আক্কেলমন্দ্‌ হলেই চিনবে।'

দেবানন্দপুরের লোকে চিনেছিল।

ওই গ্রামেরই হীরারাম রায়ের অনুরোধে আর একখানি পুঁথিও লিখেছিলেন সত্যপীরের। কিন্তু সেইখানেই শেষ। বাড়ি ফিরে কিছুদিন পরেই বর্ধমান যাত্রা, সেখানে নানা দুর্বিপাক—জীবনের সব আশা ভরসা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

নীলাচলে বৈষ্ণবদের সঙ্গে যখন কাটিয়েছেন, তখন মহাজন পদাবলী শুনতে শুনতে মধ্যে মধ্যে গান বাঁধতেন। তার দু'একটি কণ্ঠে আছে, বাকীগুলো কখন ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন, কোনো কিছুতেই তাঁর তখন আসক্তি ছিল না। আজ মনে হল, জীবন যদি নতুন করে শুরু করতেই হয়—আবার কবিতা লিখবেন, গান বাঁধবেন, সরস্বতীর আরাধনা করবেন। কিন্তু—

কিন্তু গান বেঁধে, পুঁথি লিখে তো আর পেট চলবে না। রামচন্দ্র মুন্‌শীর আশ্বাসেও জোর পাচ্ছেন না খুঁজে। মহারাজ বিক্রমাদিত্য আর নেই যে, নবরত্নসভা বসিয়ে

কালিদাসের মতো তাঁকে রাজকবি করবেন ; মহারাজ ভোজের রাজদরবারে নতুন কবিতা শোনাতে পারলেই কবির মাথায় স্বর্ণমুদ্রার পুষ্পবৃষ্টি হতো—সে কথা বল্লালের 'ভোজ-প্রবন্ধে' আছে। দিল্লীর বাদশাহুদের যখন আকাশছোঁয়া প্রতাপ, তখনো কবির ভাগ্য নেহাৎ মন্দ ছিল না। বাঙালী একজন কবি লিখেছিলেন, 'একাম্বর নামে রাজা অর্জুন অবতার'—কিন্তু বাদশা আকবরকে অর্জুন না বলে মহারাজ বিক্রমাদিত্য বলা উচিত। তাঁরও 'নবরত্ন' সভা ছিল, আর সেই সভায় ছিলেন জনাব আবদুল রহিম খান-খানান—যিনি কবি গঙ্গকে চার পংক্তি কবিতা রচনার জন্যে চার লক্ষ টাকা পুরস্কার দিয়েছিলেন।

বিক্রমাদিত্য, ভোজরাজ, আকবর, খান-খানান, মহারাজ লক্ষ্মণ সেন—কেউ নেই। কবি ভারতচন্দ্রকে স্বর্ণমুদ্রা কেন, একমুঠো অন্নও কেউ আর দেবে না। ভারতচন্দ্র দেখলেন, কুলুঙ্গিতে একখানা পুঁথি রয়েছে—লাল খেরোর ওপর বড়ো হরফে কালি দিয়ে লেখা : 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী'। চণ্ডীমঙ্গলের গান ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছেন, জেনেছেন, হতভাগ্য ঘরছাড়া মুকুন্দরামও শেষ পর্যন্ত আবড়া গ্রামে জমিদার বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয় পেয়েছিলেন, তারপর 'চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে'—কবি চণ্ডীমঙ্গল লিখলেন। ভারতচন্দ্রের হাসি পেলো। সারা দেশ জুড়ে বিশৃঙ্খলা। রাজা-জমিদারেরা মান-প্রাণ নিয়ে কোনোমতে বেঁচে থাকতে চায়, চারদিকে চোর-ডাকাতের উপদ্রব, পথে-ঘাটে ঠগী আর ঠ্যাঙাড়ে নির্বিচারে মানুষ মারছে, পথিক যদি থানার কোতোয়ালীতে আশ্রয় নেয়, তা হলে মাঝরাতে দারোগাই তার গলা কেটে সর্বস্ব লুট করে। তান্ত্রিকেরা ছেলে চুরি করে বলি দেয়, বৌ-ঝি কেড়ে নিয়ে গিয়ে ভৈরবী বানায়। এখন আর রাজা-জমিদার কবিকে শিরোপা দিয়ে সভায় নিয়ে বসান না—দিনে দুপুরেই যখন ডাকাতে এসে চড়াও করে, তখন চণ্ডী আর কাউকেই রক্ষা করেন না। এতদিন বৈষ্ণবদের সঙ্গে ছিলেন, সত্যিকারের ভক্ত-সজ্জন অনেক দেখেছেন, কিন্তু পরকীয়া সাধনার নামে আখড়ায় আখড়ায় মধ্যে মধ্যে যা চোখে পড়ে, তা দেখলে ক্ষমা আর করুণার অবতার শ্রীগৌরাঙ্গও সইতে পারতেন না—তাঁকেও শ্রীকৃষ্ণমূর্তিতে সুদর্শন ধারণ করতে হতো।

কী কবিতা লিখবেন ভারতচন্দ্র ? কার জন্যে লিখবেন ?

মুকুন্দ ভট্টাচার্য ঘরে ঢুকলেন। বললেন, 'কী ভায়া, এখনো কি শ্রীবৃন্দাবনের জন্যে মন উড়ু-উড়ু করছে ?'

ভারতচন্দ্র হাসলেন, জবাব দিলেন না।

একটা চৌপাই টেনে বসে পড়লেন মুকুন্দ। জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ঠিক করলে ?'

'ভাবছি।'

মুকুন্দ একটু কাশলেন। বললেন, 'আমি বলি কি, তুমি বরং কলকাতায় চলে যাও।'

'কলকাতা ? কী করব সেখানে ?'

'ইংরেজের কুঠি হয়েছে—কেল্লা হয়েছে। নতুন শহর পত্তন হয়েছে সেখানে। শুনেছি যাদের ঘরে হাঁড়ি চড়ত না, তারা কোম্পানির দালালী করে রাতারাতি বাড়ি-গাড়ি-বাগান করে ফেলছে। তুমিও দেখো না চেষ্টা করে।'

'দালালী ?'

'একবার রাজা আমীরচাঁদজীর ওখানে যাও না। অসংখ্য লোককে তিনি প্রতিপালন করছেন—'

'ভেবে দেখি।'

'নইলে ফরাসডাঙাতেও যেতে পারো। সেখানে দেওয়ান রয়েছেন ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, লক্ষ্মী তাঁর ঘরে বাঁধা; সব রাজা-মহারাজা তাঁর দুয়োরে গিয়ে হাত পাতে। কাউকে বিমুখ করেন না।'

ভারতচন্দ্র চুপ করে রইলেন। হাত পাতবার কথাটা তাঁর ভালো লাগল না।

দূর থেকে হুম-হাম করে পালকীর আওয়াজ আসছিল। ভট্চাষ-বাড়ির সামনে এসে পালকীটা থামল। তারপরেই হেরম্বর দরাজ গলার হাঁক উঠল: 'দাদা, আমরা এসে গেছি।'

॥ তিন ॥

একটা মাস যেন স্বপ্নের মতো কেটে গেল।

নৌকোর ছইয়ের ভেতর চুপ করে বসে ছিলেন ভারতচন্দ্র। ভরা গঙ্গার কোল ঘেঁষে নৌকো চলেছে—বাঁধানো ঘাট দেখা দিচ্ছে—স্নান করছে মেয়ে-পুরুষ; কোথাও গঙ্গাযাত্রী ঘাটের ওপর শেষ নিঃশ্বাস টানছে—আঁজলা আঁজলা করে জল দেওয়া হচ্ছে তার মুখে, এমনিতে যদি সহজে না মরে, দম আটকেই ফুরিয়ে যাবে। আট-দশটি মেয়ে পাথরের মতো বসে আছে—পরনে টকটকে লালপাড় শাড়ি, কপালে সিঁদুরের মাখা-মাখি। কোনো কুলীন স্বর্গে চললেন, এরা তাঁরই সহধর্মিণী। হয়তো সহমরণে যাবে কেউ কেউ।

দৃশ্যটা সহ্য করা যায় না—ভারতচন্দ্র চোখ ফিরিয়ে নিলেন। গঙ্গার ওপারে যতদূর চোখ যায় সবুজের পর সবুজ। পাহাড়ের মতো উঁচু একটা শিবমন্দির দেখা যায়, তার চূড়োর ওপর রুপোর ত্রিশূল রোদে জ্বলছে। একটা প্রকাণ্ড জাহাজ পালের পর পাল তুলে এগিয়ে চলে গেল উজানে। মাঝিরা বললে, 'ওলন্দাজের জাহাজ, হুগলীর বন্দরে চলল।'

ওলন্দাজ, দিনেমার, ইংরেজ, ফরাসী। বন্দর করছে, কুঠি গড়ছে, ব্যবসা করছে। অচেনা মানুষ, অদ্ভুত ভাষা, অদ্ভুত চাল-চলন। ওই কালো প্রকাণ্ড জাহাজটার দিকে অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে রইলেন ভারতচন্দ্র। কোথা থেকে একটা অশুভ সম্ভাবনার ছায়া ফেলতে লাগল মনের ভেতর। কী যেন একটা ঘটতে যাচ্ছে। উড়িষ্যা থেকে বর্গীর হাঙ্গামা এখন কমে এসেছে, বর্গী সেনাপতি ভাস্কর রাও পণ্ডিতকে কৌশলে হত্যা করে দেশে এখন অনেকটা শান্তি এনেছেন নবাব আলীবর্দী; কিন্তু নবাবের বয়েস বাড়ছে, ক্রমে অথর্ব হয়ে পড়ছেন আর হাতে ক্ষমতা পাচ্ছেন তাঁর দৌহিত্র মীর্জা মামুদ। মীর্জা মামুদের বয়েস অল্প, মাথা গরম, মতিগতি ভালো নয়—শোনা যায় বিদেশীদের, বিশেষ করে ইংরাজদের, সে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। কিন্তু এইরকম কালো কালো জাহাজে আকাশছোঁয়া পাল তুলে যারা দুরন্ত সাগর পাড়ি দিয়ে এসেছে, আকাশের চাঁদের মতো যাদের রঙ, আগুনের মতো যাদের চুলের বর্ণ, চোখের তারা যাদের বাঘের মতো কপিশ, হাঁটবার সময় যাদের পায়ের দাপে মাটি কাঁপে আর তলোয়ার ঝনঝনিয়ে ওঠে, কথায়

কথায় যাদের কামান গর্জায়—তাদের সঙ্গে বিরোধ করে কি শেষ পর্যন্ত ভালো হবে মীর্জা মামুদের ?

কী একটা ঘটবে। কী একটা ঘটতে যাচ্ছে।

আবার গঙ্গার ঘাটে চোখ পড়ল। কোমরে পিতলের জলভরা কলসীটি নিয়ে, লাল শাড়িপরা একটি বধূ মাথার ঘোমটাটি একটু সরিয়ে কৌতূহলে তাঁরই নৌকোটির দিকে চেয়ে আছে। ভারতচন্দ্র চমকে উঠলেন। লীলা ? না—মনের ভুল, লীলা অনেক দূরে, সারদা গ্রামে তার বাপেরবাড়িতে। কথা দিয়ে এসেছেন, কোনো একটা রোজগারের উপায় করতে পারলেই তাকে নিয়ে আসবেন নিজের কাছে।

লীলা। সেই রাত। আঠারো বছর পরে স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ।

বাইরে দীঘির জলে জ্যোৎস্না। হাওয়ায় নিমফুলের গন্ধ। কুলুঙ্গিতে প্রদীপের শিখা। পাপিয়ার ডাকে রাত যেন বেদনায় মন্থর।

লাল শাড়ি। অলংকারের শিঞ্জন। কপালে সিঁদুরের টিপ। দু' চোখে ভয়, আনন্দ আর ছলোছলো জল।

পায়ে লুটিয়ে প্রণাম করেছিলেন লীলা—পরম স্নেহে দু' হাতে তাঁকে তুলে ধরেছিলেন ভারতচন্দ্র।

'লীলা।'

ছলোছলো জল ধারা হয়ে নেমে এসেছিল।

'আমাকে ক্ষমা করো।'

'তোমার কোনো দোষ নেই। আমার ভাগ্য।'

'ভাগ্য নয়, লীলা।'—স্ত্রীর হাত ধরে এনে খাটে বসালেন, নিজেও বসলেন তাঁর পাশে। মুছিয়ে দিলেন চোখের জল। বললেন, 'যে অপদার্থ স্বামী স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ করতে না পেরে কাপুরুষের মতো পালিয়ে যায়, আমি তাদেরই একজন। কিন্তু এবার আমি প্রায়শ্চিত্ত করব, ঘর বাঁধব তোমাকে নিয়ে।'

লীলা জবাব দেননি।

'কথা বলছ না যে ?'

লীলা ঝাপসা চোখের দৃষ্টি তুলে ধরলেন স্বামীর দিকে। বললেন, 'তুমি তো ইচ্ছে করে আমার কাছে ফিরে আসোনি। এরা যদি জোর করে তোমাকে ধরে না রাখত, তুমি নিজে কখনো আমার কাছে আসতে না।'

এইবার চুপ করে থাকার পালা ভারতচন্দ্রের। কোনো কৈফিয়ৎ নেই তাঁর।

'তুমি তো আমাকে একেবারেই ভুলে গিয়েছিলে।'

'ভুলিনি লীলা। বারে বারে তোমার কথা ভেবেছি।'

'তাই আঠারো বছর ধরে আমার কোনো খবর পর্যন্ত নাওনি ?'

'আমি যে দূর বিদেশে চলে গিয়েছিলুম। ভেবেছিলুম, গৃহসুখ আমার অদৃষ্টে নেই।'—ভারতচন্দ্র একটু চুপ করে রইলেন, বাইরে পাপিয়া ডাকছিল, দু'জনেই কান পেতে শুনলেন কিছুক্ষণ। তারপর আবার গম্ভীর গলায় ভারতচন্দ্র বললেন, 'সন্ন্যাসী হতে চেয়েছি, মনে বৈরাগ্য আনতে চেয়েছি, ভাবতে চেয়েছি সংসারের বিষফলের

প্রীতি মোহ আমার দূর হোক, আমি কৃষ্ণপ্রেমের অমৃতরসেই ডুবে থাকব। কিন্তু কিছুই হয়নি লীলা। শুধু ভণ্ড সন্ন্যাসী সেজে, ভক্তির ভান করে ভক্তদের প্রতারণা করেছি।'

অশ্রুর কুয়াশা একটু একটু করে সরে গিয়ে লীলার কালো-নিবিড় চোখের তারা দুটো ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগল। নিঃশব্দে স্বামীর দিকে চেয়ে রইলেন তিনি।

'এখন বুঝতে পারছি, তুমিই ছিলে আমার মনের ভেতর। বাধা সেইখানেই ছিল।'

'তা হলে আমিই তোমার ধর্মের পথে কাঁটা দিয়েছি?'

'না, লীলা। তুমিই আমার ধর্মরক্ষা করেছ।'

'তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না।'

'না বোঝবার তো কিছু নেই। তোমার ওপর অন্যায় করেছিলুম—স্বামীর কর্তব্য করিনি। তাই মহাপ্রভুও আমাকে ঠাঁই দিতে পারলেন না, পায়ে ঠেলে দিলেন।'

'তিনিও তো এমনি করেই বিষ্ণুপ্রিয়াকে কাঁদিয়ে চলে গিয়েছিলেন।'—জল ভরে এসেছিল লীলার চোখে: 'লোকের ঘর ভাঙাই তো তাঁর কাজ।'

ভারতচন্দ্র কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকেছিলেন স্ত্রীর মুখের দিকে। এ আর সেই ছোট্ট ফুটফুটে মেয়েটি নয়, দীর্ঘ আঠারো বছরের সংযমে শাসনে শান্ত মুখে একটা স্থির গাম্ভীর্য এসেছে, পড়েছে কঠিনতার ছাপ। এই আঠারো বছর ধরে আচার্য বাড়ির মেয়েটি সন্ন্যাসিনীর মতো গড়ে নিয়েছে নিজেকে, শাস্ত্র পড়েছে, একটা অনাসক্ত ভবিষ্যতের ভেতরে ভাসিয়ে দিয়েছে ভাগ্যকে। একবারের জন্য মনে হল, লীলার জীবনে তিনি ফিরে না এলেই ভালো করতেন; আজ তাঁর জন্যে লীলাকে আবার নতুন করে আরম্ভ করতে হবে; যে স্বামীকে এতদিন ধ্যানের মধ্যে পুজো করে এসেছেন, রক্তমাংসের একটা মানুষকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে সেখানে।

'আমি ফিরে এসে বোধহয় তোমার দুঃখই বাড়ালুম, লীলা।'

'পুরুষমানুষ বলেই এ-কথা বলতে পারলে। কিন্তু আমার একটা কথার জবাব দাওনি।'

'কোন্ কথার?'

'তোমার গৌরাঙ্গ তোমাকে পায়ে ঠেললেন কেন? তিনি তো মা বিষ্ণুপ্রিয়ার দিকে ফিরেও তাকাননি?'

'ও লক্ষ্মী-নারায়ণের কথা, লীলা। মানুষের মন নিয়ে ওঁদের বিচার করতে নেই। বারে বারে বিরহের মধ্য দিয়ে ওঁদের মিলন হয়—নইলে যে ওঁরা কেউ কাউকে পূর্ণ করে পান না।'

লীলা আবার চোখ তুললেন। ঘরের দরজাটা বোধহয় ভেজানো ছিল, একটা দক্ষিণ হাওয়ার দমকায় কী করে খুলে গেল, দপ করে প্রদীপটা নিবে গেল হঠাৎ, আর কালকের মতো আজও খোলা দরজার পথ বেয়ে ঘরে জ্যোৎস্না এসে পড়ল। সেই জ্যোৎস্নায় লীলাকে অন্যরকম মনে হল, মুখের কঠিন শান্ত রেখাগুলো যেন তরল আর স্নিগ্ধ হয়ে গেল, হাওয়ায় নিমমঞ্জরীর গন্ধ আসতে লাগল, পাপিয়ার ডাক উঠল, মনের ভেতর গুঞ্জন তুলল মহাজন পদাবলীর সুর:

'বঁধু, কি আর বলিব আমি,
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হইয়ো তুমি—'

দু' হাতে লীলাকে আরো কাছে জড়িয়ে এনে বললেন, 'আমরা তো দেবতা নই, লীলা। তাই নরলোকেই বিরহের পরে আমাদের নতুন করে মিলন হল।'

ভারতচন্দ্রের চমক ভাঙল।

'কর্তা, আমরা পেঁৗছে গেছি ফরাসডাঙায়। ওই তো কেল্লার ঘাট।'

মাঝির ডাকে ভারতচন্দ্র চেয়ে দেখলেন। আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে কেল্লার বুরুজ। গঙ্গার ধারে শাহী সড়কের পাশে রং-বেরঙের প্রাসাদের সার। মাঝগঙ্গায় দু'তিনটি অতিকায় জাহাজ। অসংখ্য নৌকোর ভিড়—সারি সারি কাপড়ের গাঁট নিয়ে নৌকোগুলো জাহাজে তুলছে। শয়ে শয়ে লোক—দোকানপসার, মাঝখান দিয়ে মাটি কাঁপিয়ে চলেছে বিদেশীর দল—আকাশের চাঁদের মতো যাদের গায়ের রঙ, মাথার চুল যাদের আগুনবর্ণ, কোমরে যাদের তলোয়ার ঝনঝন করে বাজে।

স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রাইলেন ভারতচন্দ্র। এই পনেরো-ষোলো বছরের ভবঘুরে জীবনে অনেক দেশ, অনেক শহর দেখেছেন, কিন্তু এ যেন সম্পূর্ণ নতুন। এমন আশ্চর্য সুন্দর শহর, এত জমজমাট, এত মানুষ একসঙ্গে—এ আর তিনি কখনো দেখেননি। নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করল না।

মাঝি আবার আঙুল বাড়িয়ে বললে, 'ওই যে বাজারের ভেতর রাজপ্রাসাদের মতন মস্ত বাড়ি দেখতে পাচ্ছেন—ওই হল ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর কাছারী। ফরাসীরা আর কী কর্তা, ফরাসডাঙার আসল মালিকই তো চৌধুরী মশাই—তিনিই হচ্ছেন এখানকার রাজা।'

অর্ধচন্দ্রাকার গঙ্গার ধারে শহর। তাই থেকে নাম চন্দ্রনগর। বিদেশীদের উচ্চারণে সাঁদের নাগর. লোকের মুখে মুখে চন্দননগর। আসলে সবাই ফরাসডাঙা বলেই জানে।

চন্দননগরের শাসনকর্তা জোসেফ ফ্রাঁসোয়া দ্যুপ্লে। দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।

দ্যুপ্লে বুঝেছিলেন, এ দেশের রীতিনীতি তাঁদের জানা নেই, বিশেষ করে খাজনা-পত্র সংক্রান্ত আইন-কানুন তাঁরা কিছুই জানেন না। শহর গড়ে তোলা, অরলেয়াঁর কেল্লা রক্ষা করা আর কোম্পানির স্বার্থ—অ্যাঁদ অরিয়্যাঁতাল্-এর ব্যবসা যাতে ঠিক থাকে, প্রধানত সেইদিকেই তাঁদের লক্ষ্য রাখতে হবে। অতএব চন্দননগরের সবরকম স্থানীয় খাজনাপত্র আদায় করবার ভার পেলেন ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী—চুক্তি হল, মাসে হাজার টাকা করে অ্যাঁদ্ অরিয়্যাঁতালকে তিনি দেবেন।

ইন্দ্রনারায়ণের ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেল।

তীক্ষ্নবুদ্ধি বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ দেখতে দেখতে ফরাসডাঙার হর্তা-কর্তা-বিধাতা হয়ে বসলেন। বাজারে যা কিছু বিক্রী কিংবা আমদানি হয় তার ওপর তিনি খাজনা পান, ধান-চালের ওপর 'কোহালী' পান, কেউ কোনো স্থাবর সম্পত্তি কিনলে তাঁকে সেলামী দিতে হয়; কোনো বিয়ে-সাদী হলে বরপক্ষ থেকে দেড় টাকা আর কন্যাপক্ষ থেকে তিন টাকা প্রণামী তাঁর পাওনা; বন্দর বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নৌকো তৈরীর কারখানা

বসেছে, সেখান থেকে নৌকো কিনলে তাঁকে খাজনা দিতে হয়, তা ছাড়া প্রত্যেকটি জেলে-ডিঙি এবং প্রতিটি হালের বলদের জন্যেও তিনি কর সংগ্রহ করেন। প্রতিটি ফরাসী কিংবা ইয়োরোপীয়ের জন্যে শতকরা চার টাকা আর দেশী লোকের জন্যে দশ টাকা রাজস্ব। চলতি নৌকোর ওপর সুদ, কোনো বিদেশী ফরাসডাঙায় বসবাস করতে এলে তার জন্যে ইচ্ছেমতো খাজনা। চারদিকে তাঁর তহশীলদার ঘুরে বেড়ায়, লোক-লস্কর পাইক-বরকন্দাজে বিরাট কাছারীবাড়ি গমগম করে।

মাসে এক হাজার টাকা কোম্পানীর ঘরে পৌঁছে দিলেই নিশ্চিন্ত। সে টাকা তাঁর গায়েও লাগে না। লক্ষ্মী ঝাঁপি উজাড় করে ঢেলে দেন তাঁর ঘরে, ইন্দ্রনারায়ণের ঐশ্বর্য জনপ্রবাদে পরিণত, মুর্শিদাবাদের জগৎ শেঠ পর্যন্ত এই নতুন ভাগ্যবানের কাছে ম্লান হয়ে গেছেন।

দান-ধ্যান-অতিথিসেবাতেও তাঁর তুলনা নেই। কোনো প্রার্থী বিমুখ হয়ে ফেরে না। গঙ্গার ধারে গড়ে দিয়েছেন নন্দদুলালের অপরূপ মন্দির, পুজো-অর্চনায়, কীর্তনে মন্দির মুখর হয়ে থাকে। তাঁরই উদ্যোগে চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজোর প্রচলন হয়েছে, সে পুজোর সমারোহ দেখবার জন্য দেশবিদেশ থেকে লোক ছুটে আসে।

শুধু সাধারণ মানুষই তাঁর দ্বারস্থ হয় তা নয়; বিপাকে পড়লে রাজামহারাজার দলও এসে দাঁড়ান ইন্দ্রনারায়ণের কাছে—লক্ষ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়ে তিনি তাঁদের দায়মুক্ত করেন। ফরাসীদের তাঁর ওপর অগাধ আর অটল বিশ্বাস, ইন্দ্রনারায়ণের কোনো কথায় স্বয়ং দুপ্লে পর্যন্ত প্রতিবাদ করেন না।

গঙ্গার ধারে অপরূপ সুন্দর, ঐশ্বর্যে ঝলমল এই শহরের পথ ধরে ভারতচন্দ্র ভয়-ব্যাকুল পায়ে এগিয়ে চলেছেন। কোথাও সাজানো সব দোকান, ফরাসীরা সেখান থেকে কিনছে হাতির দাঁতের জিনিস, বেতের লাঠি, সোনারুপোর কারুকাজ; ঘরে ঘরে তাঁত চলছে—রূপ পাচ্ছে সূক্ষ্ম মসলিন, মাকুর টানে টানে রঙ-বেরঙের সূক্ষ্ম সুতো যেন ইন্দ্রধনুর জাল বুনছে; কোথাও স্তূপাকার পাটের উগ্র গন্ধ—তৈরি হচ্ছে জাহাজ বাঁধবার বড়ো বড়ো কাছি; আর কোথাও ছুতোরের যন্ত্রে উঠছে ঠুকঠুক আওয়াজ, পালিশ করা মেহগিনীর ওপর আশ্চর্য সব নকশা তুলছে শিল্পী।

শহর নয়—যেন ইন্দ্রলোক। আর সেই ইন্দ্রলোকের ইন্দ্র ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী স্বয়ং। সার্থক নাম।

ইন্দ্রনারায়ণের গদীতে ঢুকে দুরুদুরু বুকে দাঁড়িয়ে রইলেন ভারতচন্দ্র। প্রকাণ্ড ফরাসপাতা ঘর—মাথার ওপরে হাজার ডালের ঝাড়লণ্ঠনে এই দিনের বেলাতেই আলো জ্বলছে। দেওয়ালে ফরাসী সাহেবদের বড়ো বড়ো ছবি ঝুলছে কয়েকখানা। সেরেস্তায় হাত-বাক্স কোলে নিয়ে কর্মচারীরা হিসেব লিখছেন, মাঝখানে বিরাট তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে গড়গড়া টানছেন বৃদ্ধ ইন্দ্রনারায়ণ। কয়েকজন চাষাভুষো মানুষ হাত জোড় করে দরবার জানাচ্ছে তাঁকে।

একজন বলছে, 'সত্যি বলছি হুজুর, হালের বলদ আমার তিনটে। তশীলদারেরা জোর করে বলছে, ছ'টা। ছিল বটে চারটে, কিন্তু একটা মড়কে মরে যাওয়ায়—'

সেই সময় ভারতচন্দ্র এসে সামনে দাঁড়ালেন।

চোখ তুলে ইন্দ্রনারায়ণ বললেন, 'আপনি?'

প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিলেন ভারতচন্দ্র। বললেন, 'আমি আপনার শরণাগত।'
আশীর্বাদ করে ইন্দ্রনারায়ণ বললেন, 'কোত্থেকে আসছেন?'
'আমার বাড়ি ভুরশুট পরগণায়। পেঁড়ো বসন্তপুর।'
'জাতি?'
'ব্রাহ্মণ। ফুলেল মুখুটি। উপাধি রায়।'
'কন্যাদায়? অর্থসাহায্য দরকার?'
'আজ্ঞে না।'—ভারতচন্দ্র হাসলেন, 'পুত্র-কন্যা আমার নেই। আমি আপনার কাছে এসেছি কিছু কাজকর্মের সন্ধানে। দয়া করে একটা ব্যবস্থা করে দিন।'
'কোথায় আছেন এখানে?'
'আমি এইমাত্র এসে পৌঁছেছি। আপনারই আশ্রয় চাই।'
ইন্দ্রনারায়ণ একবার ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। বললেন 'আমার অতিথিশালায় আপনি স্বচ্ছন্দেই থাকতে পারেন। কিন্তু খাওয়ার ব্যবস্থা অন্যত্র করতে হবে। সে আমিই করে দেব।'
'কেন, আপনিও তো ব্রাহ্মণ। আপনার এখানে—'
ইন্দ্রনারায়ণ বিষণ্ণভাবে হাসলেন।
'আমার অন্ন গ্রহণ করলে ব্রাহ্মণ-সমাজে আপনি পতিত হবেন।'
'বলেন কি দেওয়ানজী!'—ভারতচন্দ্র আশ্চর্য হলেন: 'আপনাকে তুচ্ছ করে এমন শক্তি কার আছে?'
ইন্দ্রনারায়ণ তেমনি ম্লান গলায় বললেন, 'কেন, সমাজের! সে অনেক কথা, পরে শুনবেন। এখন এই পাইকের সঙ্গে যান, অতিথিশালায় আশ্রয় নিন—আপনার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা আমি করছি। আর সন্ধ্যেবেলায় অন্যান্য কথা হবে আপনার সঙ্গে।'

সারি সারি ঘর অতিথিশালায়। দেশ-বিদেশের প্রার্থীর ভিড়। যে ঘরে ভারতচন্দ্র জায়গা পেলেন, সেখানে আরো দুজন আগে থেকেই জায়গা করে নিয়েছেন। চিঁড়ে, কলা, দই দিয়ে তাঁরা কাঁচা ফলারের আয়োজন করছিলেন।
দুজনেরই বয়েস হয়েছে, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, গিঁট-বাঁধা টিকি, গলায় মোটা পৈতে। ভারতচন্দ্র নমস্কার করলেন তাঁদের।
একজন জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি?'
'ব্রাহ্মণ।'
পুঁটলিটি নামিয়ে এক কোণে বসে পড়লেন। ব্রাহ্মণদের একজন আঙুল বাড়িয়ে একটা মাদুর দেখিয়ে দিলেন। বললেন, 'ওটা নিতে পারেন।'
'এখন দরকার নেই, বেশ বসেছি।'
'আপনার অভিরুচি!'—ভ্রূকুটি করে ব্রাহ্মণ বললেন, 'আসা হচ্ছে কোত্থেকে?'
'পেঁড়ো বসন্তপুর।'
'সে কোথায়?'
'ভুরশুট পরগণায়।'
'অনেক দূর?'

'আজ্ঞে হাঁ, অনেক দূর।'

'ওঃ!'—ব্রাহ্মণেরা ফলারে মন দিলেন। তারপর আবার প্রশ্ন হল: 'উপলক্ষ কী? কন্যাদায়? টোলের জন্যে সাহায্য? বৃত্তি?'

'আজ্ঞে না—উমেদারি।'—ভারতচন্দ্র হেসে ফেললেন।

'ওঃ—উমেদারি! তা হলে তো মশায়কে কিছুদিন থাকতে হবে এখানে!'

ভারতচন্দ্র হাসলেন। বললেন, 'সেই রকমই তো ইচ্ছে আছে।'

'তা আহারাদি হবে কোথায়?'

তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রনারায়ণের কথা মনে পড়ল ভারতচন্দ্রের। ঠিক এই রকমই কিসের একটা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সে-কথা না তুলে ভালোমানুষের মতো বললেন, 'কেন, চৌধুরী মশাইয়ের এখানেই হবে। এত মানুষকে যিনি আশ্রয় দেন, সাহায্য করেন, প্রতিপালন করেন, অতিথিকে দু'মুঠো অন্ন তিনি দিতে পারবেন না?'

ব্রাহ্মণদের একজনের গলায় ফলার আটকে গেল, বিষম খেলেন তিনি। আর একজন চিঁড়ে-কলার গ্রাস মুখে তুলতে যাচ্ছিলেন, হাতসুদ্ধ সেটা নেমে এল কলাপাতার ওপরে।

যিনি বিষম খেলেন, একটা গোঁ গোঁ আওয়াজ বেরুল তাঁর মুখ দিয়ে। দ্বিতীয়জন রুক্ষস্বরে বললেন, 'মশাই কি সত্যি সত্যিই ব্রাহ্মণ?'

'আজ্ঞে, মুখোপাধ্যায়। কুলীন সন্তান।'

'জাত খোয়াবার ইচ্ছে হয়েছে?'

'কেন বলুন তো? আপনাদের কথা তো বুঝতে পারছি না।'

ব্রাহ্মণেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। বললেন, 'দুপুরবেলা এই যে চিঁড়ে-কলা গিলে মরছি, তাতেও কিছু মনে হচ্ছে না আপনার?'

'আজ্ঞে, খাওয়াটা তো মানুষের ইচ্ছাধীন। তা থেকে কী মনে হবে বলুন?'

'কিছু আপনি শোনেননি তা হলে?'

'আজ্ঞে না।'

'তবে দাঁড়ান, খাওয়াটা সেরে নিই, তারপরে বলছি। কিন্তু সাবধান এর মধ্যে যদি চৌধুরী মশায়ের বাড়ি থেকে খেতে ডাকে, আপনি যাবেন না।'

ব্রাহ্মণেরা আবার আহারে মন দিলেন। ভারতচন্দ্র বসে রইলেন চুপ করে। চারদিকে মানুষের কলরব। কোথা থেকে আকাশ ঝাঁপিয়ে গুমগুম করে আওয়াজ উঠল, মনে হল তোপ পড়ল কেল্লায়।

খাওয়া শেষ করে, বাইরে কলাপাতা ফেলে দিয়ে ব্রাহ্মণেরা ফিরে এলেন। একজন শোলা আর চকমকি বের করে তামাক ধরালেন, দ্বিতীয়জন গম্ভীর হয়ে ভারতচন্দ্রের মুখের দিকে তাকালেন। বললেন, 'এ ভারী আশ্চর্য ব্যাপার যে আপনি কিছু জানেন না! চৌধুরী মশাই পতিত।'

'কেন?'

'কেন আর? সেই বিদ্যেধরীর জন্যে।'

'বিদ্যেধরী?'—ভারতচন্দ্র আশ্চর্য হলেন: 'সে আবার কে?'

'আরে সে একটা ছোট জাতের মেয়ে—চৌধুরী মশাইয়ের সেবাদাসী। বিষ্ণু—বিষ্ণু! তা একটা কেন, দশটা সেবাদাসী রাখুন না—পয়সা আছে, যত খুশি পুষুন।

কত লোকেই তো পুষছে। কিন্তু চৌধুরী মশায়ের কোনো চক্ষুলজ্জা নেই—একেবারে সকলের সামনে—রামচন্দ্র!'

'চৌধুরী মশায়ের তো সাহস আছে বলতে হবে?'

'কী বললেন?'—ব্রাহ্মণ চোখ পাকালেন।

'আজ্ঞে না, কিছু বলিনি—' ভারতচন্দ্র সন্ত্রস্ত হয়ে কথাটা সামলে নিলেন: 'বিদ্যাধরী কোথায় থাকে? ওঁর অন্দরমহলে নাকি?'

'আগে কোথায় থাকত জানি না, এখন তো নন্দদুলালের মন্দিরেই আছে। ঝাঁট-পাট দেয়, ঠাকুর সাজায়, চামর দোলায়, শুনেছি কেত্তন-টেত্তনও গাইতে পারে। বোষ্টুমদেরও বলিহারী মশাই—ওদের তো আর জাত-গোত্তর বিচার নেই'—ব্রাহ্মণ বিকট মুখভঙ্গি করলেন: "আচণ্ডালে ধরি দেই কোল!" ছত্রিশ জাতের ন্যাড়া-নেড়ীর মোচ্ছব হয় নন্দদুলালের মন্দিরে, সবাই নাকি বিদ্যাধরীকে মা বলে ডাকে। রামো—রামো!'

বৈষ্ণব-নিন্দা গায়ে লাগল, একবারের জন্যে মুখে এল: 'গোপনে পাপ করলে অপরাধ হয় না, আর সাহস করে মেয়েটিকে সামনে এনেছেন—তাকে সম্মান দিয়েছেন বলেই যত দোষ হল চৌধুরী মশাইয়ের? এই ভণ্ডামির নাম ধর্ম?' কিন্তু ভারতচন্দ্র কোনো প্রতিবাদ করলেন না।

শুধু একবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তা চৌধুরী মশাই তো পতিত। ওঁর অন্ন খেলে জাত যায়, টাকা নিলে বুঝি জাতের ক্ষতি হয় না কিছু?'

'রজতখণ্ড চিরশুদ্ধ। তাতে অশুচিতা স্পর্শ করে না।'

'বিদ্যাধরীর হাত থেকে রজতখণ্ড নিতেও আপত্তি হবে না বোধহয়?'

ব্রাহ্মণ চটে উঠলেন: 'আমরা অশূদ্রযাজী। শূদ্রাণীর দান কেন নিতে যাব?'

ভারতচন্দ্র আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, সেই সময় দরজার সামনে আবার পাইক এসে দাঁড়ালো। বললে,'পেঁড়ো বসন্তপুর থেকে কে এসেছেন? কর্তা ডেকেছেন তাঁকে।'

ভারতচন্দ্র উঠে দাঁড়ালেন। পা বাড়ালেন ঘরের বাইরে।

পেছন থেকে ব্রাহ্মণদের জোরালো ফিসফিসানি শোনা গেল: 'খুব সাবধান মশাই, কক্ষনো অন্ন গ্রহণ করবেন না।'

ভারতচন্দ্র মুখ ফিরিয়ে হাসলেন। বললেন, 'ভাববেন না, আমার জাত সহজে যাবে না। তার বনেদ অনেক শক্ত।'

ব্রাহ্মণেরা আবার সন্দিগ্ধ চোখে ওঁর মুখের দিকে চাইলেন। ভারতচন্দ্রকে তাঁরা যেন সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারলেন না।

এবার আর কাছারীতে নয়—ইন্দ্রনারায়ণের খাসকামরায়।

এ ঘরটি খুব বড়ো নয়, কিন্তু ভেতরে পা দিয়েই চোখ ঝলসে যায়। হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যায়, মেঝেতে এমনি পুরু মীর্জাপুরী গালিচা; রঙিন কাঁচের নানারকম ঝাড়বাতি দুলছে ছাদ থেকে; দেওয়ালে বিদেশী ফিরিঙ্গিদের বড়ো বড়ো ছবি—অচেনা হরফে কী সব লেখা রয়েছে তাদের নীচে; আর ঘরময় মেহগিনী কাঠের ওপর নানারকম সূক্ষ্ম কাজ করা গদী আঁটা সব বসবার জায়গা; ভারতচন্দ্র নিজে রাজবংশের ছেলে—ঐশ্বর্যের অভাব একসময় তাঁদেরও ছিল না; বর্ধমানের রাজপ্রাসাদ দেখেছেন, কটকে বর্গী সুবাদারের মহল দেখেছেন, কিন্তু এমন ধরনের আসবাব কোথাও তাঁর চোখে পড়েনি।

ঘরে ইন্দ্রনারায়ণ একা নন, তাঁর মুখোমুখি বসে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক কথা কইছিলেন ; মাথায় পাগড়ী, জরির কাজ করা পোশাক আর গলায় মুক্তোর মালা দেখে ভারতচন্দ্র বুঝলেন, ইনিও কোনো সম্ভ্রান্ত নামজাদা লোক।

ইন্দ্রনারায়ণ বললেন, 'আসুন রায় মশাই, আসুন।'

হাত জোড় করে ভারতচন্দ্র বললেন, 'আমাকে ভারত বলেই ডাকবেন। আমি আপনার আশ্রিত—বয়েসে পুত্রতুল্য।'

'আচ্ছা, তাই হবে—,' ইন্দ্রনারায়ণ হাসলেন। বললেন, 'এই যে এঁকে দেখছ, ইনি হলেন বাবু রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়—ওলন্দাজদের দেওয়ান। আমার বিশেষ বন্ধুব্যক্তি ইনি।'

ভারতচন্দ্র রামেশ্বরের পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলেন। ইন্দ্রনারায়ণ বললেন, 'ইনি কাছেই গোঁদলপাড়ায় থাকেন। এঁর বাড়িতে তোমার খাওয়ার কথা বলেছি, ইনি আনন্দে রাজী হয়েছেন। তুমি আমার এখানে থেকে স্বচ্ছন্দে দুবেলা এঁর ওখানে খেয়ে আসতে পারো। আসতে যেতে একটু কষ্ট হবে হয়তো, তবে—'

ভারতচন্দ্র বললেন, 'আমার একটা নিবেদন আছে চৌধুরী মশাই।'

ইন্দ্রনারায়ণ বললেন, 'বলো।'

'আমি আপনার এখানেই প্রসাদ পেতে চাই।'

রামেশ্বর চমকে উঠলেন, তার চাইতে বেশি চমকালেন ইন্দ্রনারায়ণ স্বয়ং।

'কী বলছ হে ? তুমি কি আমার সম্বন্ধে কিছুই জানো না ?'

'আমি জানতে চাই না'—ভারতচন্দ্র দৃঢ়স্বরে বললেন,'আঠারো বছর ধরে আমি দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছি, বারো বছর আমার কেটেছে পুরুষোত্তম ধামে। সেখানে জাত-বিচার নেই, শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ কোনো ভেদ রাখেন না। লোকের কথা আমি গ্রাহ্য করি না।'

রামেশ্বরের মুখে মেঘের ছায়া পড়ল।

'বাপু হে, শ্রীক্ষেত্রে সব চলে। সেখানে চণ্ডাল এসে ব্রাহ্মণের মুখে অন্ন তুলে দেয়, লোকে বলে, "খাইয়া প্রসাদী ভাত, মাথায় মুছিবে হাত"—তীর্থমাহাত্ম্যে সব খণ্ডন হয়ে যায়। কিন্তু দেশ-গাঁয়ে তো আর ও-সব চলে না, সেখানে দেশাচার-লোকাচারকে মানতেই হয়।'

ইন্দ্রনারায়ণ বললেন, 'ঠিক কথা। তুমি কোনো দ্বিধা কোরো না ভারত, রামেশ্বর-বাবুর সঙ্গেই চলে যাও। ইনি আমার ভাইয়ের মতো—এঁর অন্ন গ্রহণ করলে অতিথি-সেবার তৃপ্তি আমিই পাব।'

ভারতচন্দ্র আর একবার ইন্দ্রনারায়ণের পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নিলেন।

॥ চার ॥

"ওহে বিনোদ রায় ধীরে ধীরে যাও হে।
অধরে মধুর হাসি বাঁশীটি বাজাও হে।
নবজলধরতনু শিখিপুচ্ছ শক্রধনু
পীত ধড়া বিজলীতে ময়ূরে নাচাও হে—"

চোখ বুজে গান শুনছিলেন ইন্দ্রনারায়ণ। হাত থেকে আস্তে গড়গড়ার নল খসে পড়ল তাঁর।

"নয়ন চকোর মোর দেখিয়া হয়েছে ভোর
মুখ সুধাকর হাসি সুধায় বাঁচাও হে—"

গান শেষ হল। ইন্দ্রনারায়ণ ধীরে ধীরে সোজা হয়ে উঠে বসলেন।

'এ গান তোমার নিজের লেখা?'

ভারতচন্দ্র সলজ্জভাবে মাথা নাড়লেন।

'তোমার মধ্যে যে মহাকবির প্রতিভা দেখতে পাচ্ছি। তুমি এইভাবে ভবঘুরে হয়ে তা নষ্ট করছ?'

'আজ্ঞে কী করব বলুন? আজকাল আর কে কবির পোষকতা করে!'

'ঠিক কথা, কেউ করে না।'—ইন্দ্রনারায়ণ একটু চুপ করে রইলেন: 'রাজা-রাজড়াদেরও সে মন আর নেই। দেশের অবস্থাও বদলে গেছে। এদিকে মুর্শিদাবাদে মীর্জা মামুদ, ওদিকে দিল্লীর গোলমাল, মোগল-বাদশাহের মসনদ টলমল করছে—চারদিকে বর্গী-ঠ্যাঙাড়ে-ঠগী আর ডাকাতের উৎপাত। এখন আর কবির কথা কেউ ভাবে না, কিন্তু—' ইন্দ্রনারায়ণ আবার কী ভাবলেন, বললেন, 'না—সে হয় না।'

'কী হয় না চৌধুরী মশাই?'

'ভেবেছিলুম, ফরাসী সায়েবদের বলে তোমার একটা চাকরি করে দেব এখানে। কিন্তু তাতে কোনো লাভ নেই, তোমার কদর কেউ বুঝবে না, মাঝখান থেকে তোমার এমন কবিত্বশক্তিই নষ্ট হয়ে যাবে। আমার ছেলে কাশিমবাজার কুঠির দেওয়ান হয়েছে, সেখানেও তোমাকে পাঠানো যেত। কিন্তু তার দরকার নেই।'

ভারতচন্দ্র ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

'কবিত্ব আছে বলে সেই অপরাধে আমায় কি না খেয়ে মরতে হবে চৌধুরী মশাই?'

'না খেয়ে মরবে কেন? তোমার যোগ্য স্থান আমি তোমায় খুঁজে দেব।'

ভারতচন্দ্র চুপ করে রইলেন।

চাকর এসে গড়গড়ার তামাক বদলে দিয়ে গেল। ইন্দ্রনারায়ণ নলটা আবার মুখে তুলে নিলেন।

'আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না—না?'

'আজ্ঞে আপনি প্রতিপালক, আপনাকে অবিশ্বাস করব কেন? তবে অনেকদিন হয়ে গেল কিনা—'

ইন্দ্রনারায়ণ হাসলেন।

'খুব অসুবিধে হচ্ছে?'

'আজ্ঞে, বহুকাল বাড়িঘর ছেড়ে বিদেশে আছি কিনা। নইলে আপনি ইন্দ্রতুল্য, আপনার পায়ের কাছে পড়ে থাকা তো সৌভাগ্যের কথা।'

নিঃশব্দে কিছুক্ষণ তামাক টানলেন ইন্দ্রনারায়ণ। বললেন, 'আমার একজন খাতক আছেন। তিনি খুব রসিক আর গুণগ্রাহী, সঙ্গীতে কাব্যে তাঁর গভীর অনুরাগ। শুনেছি অনেক গুণী আছেন তাঁর সভায়। কিছুদিনের মধ্যেই আমার কাছে তিনি আসবেন খবর পেয়েছি। ভেবেছি, তাঁরই হাতে তোমায় তুলে দেব।'

'কে তিনি ?'

'নবদ্বীপের অধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়।'

'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ?'

'চমকালে কেন ? তাঁর নাম কি তুমি শোনোনি ?'

'আজ্ঞে, শুনেছি বইকি।'—ভারতচন্দ্রের মুখ বিষণ্ণ হয়ে উঠল : 'কিন্তু রাজা-মহারাজার কাছে যেতে আমার আর সাহস হয় না। আপনি ফরাসীদের ঘরেই যা হোক একটা কাজ জুটিয়ে দিন আমার।'

ইন্দ্রনারায়ণ আবার গড়গড়া টানতে লাগলেন, কপালে কয়েকটা চিন্তার রেখা ফুটল। বললেন, 'আজ প্রায় কুড়ি বছর ফরাসীদের সঙ্গে আছি আমি। সতেরো বছর ধরে ইজারাদারি করেছি। এর ভেতর ফরাসীদের ব্যবসা-বাণিজ্যের অনেক ওঠা-পড়া দেখেছি, দেখেছি দ্যুপ্লে সায়েব আসবার পরে ধীরে ধীরে কেমন করে শহর বাড়ল, বন্দরের উন্নতি হল, অরলেয়্যাঁর কেল্লা গড়ে উঠল। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ঈশান কোণে ঝড় দেখা দেবে। ওদের দেশে ইংরেজ-ফরাসীতে গোলমাল চলছে—এখানে কখন যুদ্ধ বাধে ঠিক নেই। দিল্লীর বাদশা আহ্‌মদ শাহ্‌ তো অপদার্থ—শিখে আর বর্গীতে মিলে তুলকালাম কাণ্ড চলছে—কী যে হবে কিছুই বলা যায় না। সেইজন্যেই বলছি, এখন এখানে থেকে কাজ নেই। যদি মেঘ কেটে যায়, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ওখানে থাকতে তোমার ভালো না লাগে, চলে এসো আমার কাছে। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করব তখন।'

'তবু রাজা-মহারাজার কাছে—'

'এত ভয় কেন হে ?'—ইন্দ্রনারায়ণ হাসলেন : 'বর্ধমানের অভিজ্ঞতা বুঝি কিছুতেই ভুলতে পারছ না ?'

'আজ্ঞে, কয়েদখানায় তো প্রাণই যেতে বসেছিল। তারপরে আঠারো বছর বিবাগী হয়ে কাটাতে হল, এত সহজেই কি ভোলবার ?'

'তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সে-রকম লোক নন।'

'আপনি যা আদেশ দেবেন আমি তাই করব। কিন্তু কথাটা কী জানেন ? ওঁদের কাউকেই আমার বিশ্বাস হয় না। "বড়র পীরিতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ"।'

ইন্দ্রনারায়ণ চকিত হয়ে বললেন, 'বাঃ—বাঃ! মুখে মুখে বানালে নাকি হে ?'

'আজ্ঞে, ছেলেবেলা থেকে ওই আমার রোগ।'

'রোগ নয় হে, যোগ। তুমি যোগী, সারস্বত-যোগী। সিদ্ধিলাভ তোমার হবেই—আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি।'

খোলা দরজায় ভারী চেহারার ছায়া পড়ল। মোটা গলায় অচেনা ভাষায় ডাক উঠল : 'আল্লো মসিয়ো শুদুরী !'[১]

ইন্দ্রনারায়ণ আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন : 'আঁত্রে, আঁত্রে মসিয়ো দুবোয়া, সিল্‌ ভু প্লে !'[২]

১ হ্যালো শ্রীযুক্ত চৌধুরী !

২ আসুন, আসুন, মিঃ দুবোয়া—অনুগ্রহ করুন।

ফরাসী সাহেব ঘরে ঢুকল। একবার পিঙ্গল জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে দেখল ভারতচন্দ্রের দিকে। ইন্দ্রনারায়ণকে জিজ্ঞেস করল, 'ট্র্যাজকুপে ?'[৩]

'পা দ্য তু। আসিয়ে ভু।[৪] আচ্ছা ভারত, তুমি এসো এখন। দুবোয়া সাহেবের সঙ্গে আমার কথা আছে।'

ভারতচন্দ্র বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে, তারপর রাস্তায়। বাজারে গঞ্জে কতরকম মানুষের ভিড়। বন্দরে জাহাজ থেমে রয়েছে, মালবোঝাই নৌকো চলেছে তার দিকে।

কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী যাচ্ছে জাহাজে ?'

'মসলিন। বাপতা। মলমল। চাল। তুলো, মোম, শোরা—'

'কী নামে জাহাজ থেকে ?'

'শৌখিন বিলিতী থান। মদ। প্রবাল। লোহা-লক্কড়ের জিনিস—'

ভারতচন্দ্রের হাসি পেল। বিলিতী বানিয়ারা কত চালাক। নিয়ে যাচ্ছে চাল, তুলো, মসলিন—তার বদলে আনছে সুরা। ওদের দোষ নেই। দিল্লীর বাদশারা যেদিন থেকে বিলিতী মদের স্বাদ পেয়েছে, সেদিন থেকেই দেশের জিনিসে আর তাদের নেশা লাগে না। জাহাঁগীর বাদশা তো বিলিতী মদ খেয়েই মরল। এখন রাজা-জমিদারেরাও ধরেছে। ওদের আর কী দোষ!

চারদিকে মানুষের কলরব। সব জমজমাট। কত ভাষায় কথা কইছে লোকে—বাংলা, ফার্সী, হিন্দী, ফরাসী; দোকানে বেচাকেনা চলছে। সবাই এখানে পয়সার জন্যে এসেছে—যেন ময়রার দোকানে উড়ে পড়েছে মাছির ঝাঁক।

শাহী সড়ক দিয়ে চলতে চলতে ভারতচন্দ্র থেমে দাঁড়ালেন। মানুষের সব কোলাহল, সব কেনা-বেচার হট্টগোল ছাপিয়ে শঙ্খঘণ্টার আওয়াজ উঠল। গঙ্গার জলে অন্ধকার নেমেছে, তার ওপর আরো ভারী হয়ে জমছে জাহাজ আর নৌকোর ছায়া, কয়েকটা আলো কাঁপছে স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে। নন্দদুলালের মন্দিরে সন্ধ্যার আরতি শুরু হয়েছে।

মনে পড়ল বিদ্যাধরীর কথা।

এর ভেতরে কয়েকদিন তিনি মন্দিরে গেছেন, দূরে থেকে মেয়েটিকে দেখেছেন কয়েকবার। বয়েস চল্লিশ ছাড়িয়ে আরো কিছুদূর এগিয়ে গেছে; শ্যামবর্ণ দীর্ঘ চেহারা। রূপসী নয়, কোথায় তবু একটা শান্ত শ্রী জড়িয়ে আছে শরীরে। দু হাতে দুটি কঙ্কণ ছাড়া আর কোনো আভরণ নেই, পরনে গরদের শাড়ি। দেখেছেন মন্দিরের সেবা করতে, আরতি সাজাতে, চামর দোলাতে। বাইরের লোকে যে যাই বলুক, বৈষ্ণবেরা তাকে শ্রদ্ধাভক্তি করে, তার হাত থেকে নন্দদুলালের প্রসাদ নেয়। বৈষ্ণবের শুচিবায়ু নেই, তাদের কাছে কৃষ্ণের জীব সব সমান।

এই মেয়েটির জন্যেই ইন্দ্রনারায়ণের লোকনিন্দা, সমাজে ধিক্কার, কোনো ব্রাহ্মণ অন্নগ্রহণ করেন না তাঁর বাড়িতে। অথচ তাঁর অতিথিশালায় দেশ-দেশান্তর থেকে এসে ভিড় করে, সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে, তাঁর হাত থেকে সাহায্য নেয়, আশীর্বাদ করে, গদ্‌গদ হয়ে বলে, 'আপনি স্বয়ং দাতাকর্ণ। আপনার দর্শনলাভেও জীবন ধন্য হয়।'

৩ খুব ব্যস্ত ?
৪ আদৌ নয়। আপনি বসুন।

হাত পেতে টাকা নিতে কারো লজ্জা নেই। রজত-কাঞ্চন? সে তো নিত্য-শুদ্ধ। তাতে কোনো পাপ স্পর্শ করে না।

ভণ্ডামি—মিথ্যার বেসাতি চারদিকে। ধর্ম একটা অভ্যাস মাত্র; শাস্ত্র শুধু কার্যসিদ্ধির জন্যে। সমস্ত জাতটার মেরুদণ্ডেই ঘুণ ধরে গেছে। ভারতচন্দ্র এই আঠারো বছর ধরে অনেক দেশ, অনেক মানুষকে দেখলেন। কোথায় বিশ্বাস—কোথায় ধর্ম? বর্গীর ভয়, চোর-ডাকাতের ভয়, দল-ছাড়া ফৌজের লুটতরাজের ভয়। আলীবর্দী ভাস্কর রাও পণ্ডিতকে মারলেন, রঘুজী নিজে এসে চারিদিকে শ্মশান করে দিয়ে গেলেন; দূরে দক্ষিণের মানুষ মগ-ফিরিঙ্গির অত্যাচারে প্রায় পাগল। দিল্লীর মসনদ থর-থর করে কাঁপছে। তবু আলীবর্দী যা পারেন করছেন, মীর্জা মামুদ সম্বন্ধে যে যাই বলুক, সেও তলোয়ার হাতে বীরের মতো নেমে পড়েছে। বর্গীর হাঙ্গামা একটু কমেছে, তবু সুবে বাংলায় শান্তি নেই, ভরসা নেই, এক মুহূর্তের জন্যে কারো সোয়াস্তি নেই। চণ্ডীর গানে কেউ আর আশ্বাস পায় না—মহাকালী এখন ডাকাতের দেবতা, কেশীকংসনিসূদন তাঁর সুদর্শন চক্র রেখে বোধহয় ঘুমিয়েই পড়েছেন। এরই ফাঁকে ফাঁকে কাপালিকের হানা, নরবলি, পুকুরঘাট থেকে গৃহস্থের বৌ-ঝিকে ছিনিয়ে নেওয়া। আগে রাজা-জমিদারেরা প্রজাদের রক্ষা করতেন, এখন বর্গী আর ডাকাতের ভয়ে তাঁরা তটস্থ; ভয় ভোলবার জন্যে স্ফূর্তির স্রোতে তাঁরা গা ভাসিয়েছেন; চন্দননগর, কলকাতা, কাশিমবাজারের কুঠি থেকে আমদানি হচ্ছে বিলিতী মদ; দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, বারাণসী থেকে রুপো আর হাতির দাঁতের কাজ করা পালকীতে করে আসছে যবনী বাইজীর দল: 'যাবৎ জীবেৎ, সুখং জীবেৎ!'

আর এরই মাঝখানে ফিরিঙ্গি বানিয়ার দাপট। ধূর্ত ইংরাজ, বীর ফরাসী, ব্যবসায়ী ওলন্দাজ-দিনেমার, লুটেরা হার্মাদ। কী একটা ঘটবে—কী যেন ঘটতে যাচ্ছে।

বাইজী পুষলে রাজারাজড়ার জাত যায় না—মান বাড়ে; এক কুলীন চার-পাঁচশো বিয়ে করে উধাও হয়, সারাজীবনেও হয়তো তার পাত্তা মেলে না। মাঝে মাঝে এমন দু'একটি কুলীন-সন্তানের জন্ম হয়, যাদের পিতৃপরিচয় খুঁজতে গেলে দক্ষযজ্ঞ বাধতে পারে।

আর যত দোষ ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর। কারণ সাহস করে মেয়েটিকে সকলের সামনে স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি।

ভারতচন্দ্র তো দেখেছেন মেয়েটিকে। সেই শ্যামবর্ণ, দীর্ঘ শরীরে পরিণত বয়সের কী স্নিগ্ধতাই ছড়িয়ে রয়েছে। যেন মনে হয় ভাদ্রের ভরা গঙ্গা, গভীর, শান্ত, নিজের ভেতরে নিমগ্ন। কয়েকটি পাকা চুল চকচক করছে সিঁথিতে। রূপ নয়, রূপের চাইতেও অনেক বেশি আছে তার, সে তার অন্তরের লাবণ্য। মুখে-চোখে জ্বলজ্বল করছে ভক্তি, বিশ্বাস। এই মেয়েটিকে গ্রহণ না করে ইন্দ্রনারায়ণ যদি পাঁচটি যবনী আর আরমানী বাইজী রাখতেন, তা হলে কেউ এতটুকুও নিন্দা করত না; সবাই একবাক্যে বলত: 'বেশ করেছেন, এ না হলে আর কিসের বড়লোক!'

ভণ্ডামি! চারদিকে দুর্দিনের ভেতরে এ ছাড়া কী আর আশা করা যায়!

আর এই রাজাদের একজনের সভায় গিয়ে তাঁকে বসতে হবে! উমেদারি করতে হবে, চাটুবাক্য শোনাতে হবে! নিজে রাজার ছেলে হয়েও বসতে হবে পারিষদের ভূমিকায়!

দিনের পর দিন আত্মগ্লানিতে জ্বলে মরতে হবে, অথচ প্রতিকারের কোনো উপায় থাকবে না!

তার চাইতে ইন্দ্রনারায়ণের উপাসনা বরং ভালো। সবদিক থেকে শ্রদ্ধা করবার মতো মানুষ তিনি। বীরপুরুষ ফরাসীদের তিনি হাতের মুঠোর মধ্যে রেখে দিয়েছেন। সারা ফরাসডাঙার সব খাজনার তিনি মালিক, অথচ কারো ওপর কোনো অন্যায় নেই, কোথাও কোনো জবরদস্তি চলে না; প্রত্যেকের নালিশ শোনেন, নিজে তার প্রতিকার করেন। চুলোয় যাক নবদ্বীপ, ফরাসী আর ইংরেজের গণ্ডগোলে যা হওয়ার তাই হোক, এখানেই তিনি থাকবেন। কী হবে কবিত্ব দিয়ে? আজকাল আর কবিকে কেউ চায় না; লোকের জন্যে বাইজী আছে, খেউড় গান আছে; তিনি ইন্দ্রনারায়ণের দোর-গোড়াতেই পড়ে থাকবেন: 'যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা—', মহতের কাছে ব্যর্থ উপাসনাও সম্মানজনক, অধমের কাছে প্রার্থনা পূর্ণ হলেও তা লজ্জাকর।

ভারতচন্দ্রের চিন্তায় ছেদ পড়ল।

নন্দদুলালের মন্দিরে ঢুকে কখন থেকে এক জায়গায় চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি। আরতি শেষ হয়ে গেছে, সামনে একটি ছোট নাটকের অভিনয় শুরু হয়েছে। রাধা তাঁর সখীদের নিয়ে দই-দুধ বেচতে মথুরায় যাবেন, শ্রীকৃষ্ণ পথ আড়াল করে দাঁড়িয়েছেন। তাঁকে শুল্ক না দিলে গোপীরা মথুরার হাটে যেতে পারবে না। রাধা প্রশ্ন করছেন: 'কোন্ অধিকারে শুল্ক চাও তুমি? তোমাকে কি মহারাজ কংস নিয়োগ করেছেন?'

উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'আমি কংসকে গ্রাহ্যও করি না। আমার রাজা আমিই।'

শ্রীরাধা বলছেন, 'আমরা কংসের কাছে নালিশ করব। প্রহরীরা এসে এখনই তোমাকে বন্দী করে নিয়ে যাবে, রেখে দেবে পাষাণ কারাগারে, নানা নির্যাতন করবে, বুকের ওপর চাপিয়ে দেবে পাঁচমণ পাথর। যদি প্রাণে বাঁচতে চাও, এখনি ভালো-মানুষের মতো আমাদের পথ ছেড়ে দাও।'

শ্রীকৃষ্ণ হাসছেন। বলছেন, 'কংস? কে তাকে গ্রাহ্য করে? আমি পুতনা বধ করেছি, সংহার করেছি বক রাক্ষসকে, নিপাত করেছি কেশী দৈত্যকে, কালীদহের দুরন্ত কালী নাগকে দমন করে পদচিহ্ন এঁকে দিয়েছি তার ফণায়, এক ফুৎকারে বিনাশ করেছি তৃণাবর্তকে, ইন্দ্রের রোষ থেকে গোকুল বাঁচানোর জন্যে ছত্রাকারে ধারণ করেছি গিরি-গোবর্ধন। আর পাপ রাজা কংস? সে তো একটি মুষ্ট্যাঘাতের অপেক্ষা মাত্র!'

রাধা বলছেন, 'হে বাক্যবাগীশ—'

ভারতচন্দ্রের কৌতুক বোধ হচ্ছিল। গানগুলো সুন্দর জমেছে; যে কিশোর ছেলেটি রাধা সেজেছে, সে রূপবান—তীক্ষ্ণ আর উজ্জ্বল তার গলার স্বর। শুধু শ্রীকৃষ্ণকেই যেন ঠিক মানায়নি। গানের গলা তার ভালো, কিন্তু একটু বয়েস হয়েছে, তা ছাড়া কিছু বেশিমাত্রায় আহারাদির ফলেই বোধহয় চেহারাটা একটু গোলগাল। এই কৃষ্ণ কেশী-কালীয় দমন করেছে, পরে কংস-শিশুপালের হন্তারক হবে, কুরুক্ষেত্রে পার্থ-সারথি হবে—রাধার আর দোষ কী, দর্শক ভারতচন্দ্রেরই সে-কথা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হচ্ছে না।

'প্রসাদ নেবে বাবা ?'

ভারতচন্দ্র চমকে উঠলেন। রুপোর থালা হাতে বিদ্যাধরী তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে। খোলা চুলের রাশ কোমর ছাপিয়ে নেমে পড়েছে, সর্বাঙ্গ থেকে চন্দনের মিষ্টি গন্ধ। দূর থেকে যাঁকে শান্ত-স্নিগ্ধ বলে মনে হয়েছিল, কাছে তাঁকে আরো পবিত্র, আরো দীপ্তাঙ্গী বলে মনে হল।

'দিন মা, দিন।'

অঞ্জলিপুটে হাত বাড়ালেন। বিদ্যাধরী দুটি সন্দেশ তুলে দিলেন তাঁর হাতে।

ভারতচন্দ্র এক মুহূর্ত চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে। তারপর দু'হাতের সন্দেশ এক হাতে নিয়ে হঠাৎ নত হয়ে পড়লেন, প্রণাম করতে গেলেন বিদ্যাধরীকে।

সাপের ছোবল লাগতে যাচ্ছে, এমনি ভাবে চমকে সরে গেলেন বিদ্যাধরী। হাতের থালাটা কেঁপে উঠল : 'ছি ছি বাবা, করছ কী তুমি ?'

'আমি আপনার পায়ের ধুলো নেব, মা।'

'কী সর্বনাশ! আমি যে নিচু জাত বাবা। তার ওপর পাপীয়সী। এমন কথা শুনলেও যে আমি নরকে যাব।'

'না মা, আপনি বৈষ্ণবী। আপনাকে প্রণাম করলে পুণ্য হয়।'

'ছি বাবা, ছিঃ। আমি কেউ নই—নন্দদুলালের দাসী। তাঁর চরণ ধরে পড়ে আছি, এককণা কৃপা যদি কখনো পাই, এইটুকুই মাত্র ভরসা। এমনভাবে আমায় অপরাধী কোরো না।'

একটা কান্নার রেশ কেঁপে উঠল গলায়। বিদ্যাধরী সরে গেল সামনে থেকে।

ভারতচন্দ্র তেমনি ভাবেই দাঁড়িয়ে রইলেন। এই মেয়েটির জন্যে ইন্দ্রনারায়ণ সমাজে পতিত! অথচ পুরুষোত্তমের মন্দিরের পুরোহিত কিংবা শহরের অন্যান্য গণ্যমান্যদের পতিত করবার সাহস কেউ রাখে না। মন্দিরের দেবদাসীদের নিয়ে সেখানে যে কী চলে, অন্তত ভারতচন্দ্রের তা অজানা নেই।

সামনে তখন শ্রীরাধা বলছেন : 'বেশ, শুল্কই না হয় দেব। কিন্তু কী দাম তুমি চাও ? কত কড়ি পেলে তুমি আমাদের পথ ছেড়ে দেবে ?'

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'কড়ি ? অত তুচ্ছ জিনিসেই কি ভোলাতে পারো আমাকে ? আমার দাবি অনেক বেশি। তোমার যা শ্রেষ্ঠ দান, তাই দাও আমাকে। দাও তোমার লাজ-লজ্জা, বসন-ভূষণ, দাও তোমার জীবন-যৌবন—'

ধীরে ধীরে মন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন ভারতচন্দ্র। দাবির পরিমাণ সামান্য নয়—যথাসর্বস্ব, জীবন-যৌবন! এমনি করেই সর্বস্ব সঁপে দিতে হয় ভক্তকে, এমন করে দিতে না জানলে মুক্তি আসে না। বিদ্যাধরী তাই দিয়েছেন। কিন্তু ক'জন দিতে পারে!

অন্যমনস্ক ভাবে আবার চললেন ভারতচন্দ্র। নদীর ধার ছেড়ে, বাজার পার হয়ে, অরলেয়াঁর কেল্লার পাশ ধরে এগিয়ে চললেন পূব-দক্ষিণে। ডানদিকে গীর্জা। পাদ্রীদের থাকবার জন্যে প্রাসাদ, তার পাশে ফরাসীদের আরোগ্যশালার মস্ত বাড়িটা। ভারতচন্দ্র ধীরে ধীরে এসে প্রকাণ্ড দীঘিটার বাঁধানো ঘাটলায় বসে পড়লেন। লোকে বলে, লালদীঘি। মস্ত দীঘি, পরিষ্কার নীল জল, আকাশে ছাড়া-ছাড়া মেঘের ভেতর দিয়ে ভাঙা চাঁদের আলো লাখ লাখ জোনাকির মতো সেই জলে ঝিকমিক করছে। সেই দিকে

তাকিয়ে তাকিয়ে মনে পড়ল খানাকুল-কৃষ্ণনগরের সেই দীঘির ধার, রঘুনাথের সেই বিশ্বাসঘাতকতা, মুকুন্দ ভট্চাযের সেই লোপাট্ করে নিয়ে যাওয়া—লীলা—

লীলা। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

যতদিন ভুলে ছিলেন, দিন একরকম করে কাটছিল। ভেবেছিলেন, ঘরসংসার তাঁর জন্যে নয়, তাঁকে ভগবান পৃথিবীর পথে পথে সন্ন্যাসী করেই ডাক পাঠিয়েছেন; কিন্তু সব এলোমেলো হয়ে গেল। সেই ঘরই আবার তাঁকে টানল, আঠারো বছর পরে স্ত্রীর সঙ্গে নতুন করে শুভদৃষ্টি হল, বুকের ভেতরে যেখানটা শূন্য হয়ে ছিল, সেখানে একটা রক্ত-মাংসের আকুলতা মাথা খুঁড়তে লাগল। লীলাকে কথা দিয়ে এসেছেন, সংসার বাঁধবেন।

কিন্তু কোথায় বাঁধবেন সংসার? কোন্ অনিশ্চয়তার ওপর? মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কেমন লোক? সত্যি সত্যিই কি কবিকে শ্রদ্ধা করবেন তিনি, সম্মান দেবেন তাঁকে? না নিজের চাটুকারদের দলেই আসন দিয়ে বসিয়ে রাখবেন?

ইন্দ্রনারায়ণ তাঁকে ভরসা দিয়েছেন। কিন্তু—

দুর্গের উঁচু বুরুজগুলো ভাঙা জ্যোৎস্নায় কেমন অশুভ ভাবে দাঁড়িয়ে। চোখে পড়লেই অকারণে চমক লাগে। বিদেশী বানিয়া। কলকাতা, চুঁচুড়ো, চন্দননগর, কাশিমবাজার—ক্রমাগত মনে হয়, কী একটা ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু কী ঘটবে?

মন্ত্র-উচ্চারণের মতো খানিকটা গম্ভীর স্বর কানে এল। লালদীঘির পেছনে খানিকটা দূরেই ক্রীশ্চানদের সমাধির জায়গা। কারা যেন একটা শবাধার বয়ে নিয়ে চলেছে সেদিকে, কয়েকটা বড়ো বড়ো আলো রয়েছে তাদের সঙ্গে।

মৃত্যু! সব দুর্ভাবনার জট একসঙ্গে খুলে দেয়। ভারতচন্দ্র অন্যমনস্ক হলেন মুহূর্তের জন্যে। মনে পড়ল কার কবিতা:

“থা খোওয়াব মেঁ খিয়াল্ কো
তুঝ্ সে মু' আমল্,
জব আঁখ খুল্ গয়ী
ন জিয়ান থা ন সুদ্ থা—”

জীবন তো স্বপ্নের মরীচিকা। সুখই বা কী, দুঃখই বা কোথায়? মৃত্যুকে সামনে দেখলে এইসব মনে পড়ে বার বার। কিন্তু সত্যিই কি একথা ভাবতে পারেন ভারতচন্দ্র? এমন করে দেখতে পারেন সুখ-দুঃখকে, জীবনকে?

‘বঁসোয়ার মসিয়ো!’

ভারতচন্দ্র চমকে উঠলেন। কখন একজন ফিরিঙ্গি এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে। ভাষা শুনেই বুঝতে পারলেন, ফরাসী। ইন্দ্রনারায়ণের বাড়িতে এই কথাটা তিনি অনেকবার শুনেছেন। সন্ধ্যাবেলা পরস্পরকে ওরা এই বলেই সম্ভাষণ করে।

ভারতচন্দ্র চেয়ে রইলেন লোকটির দিকে, কোনো জবাব দিলেন না। অস্বাভাবিক লম্বা রোগা চেহারা, মুখে ছুঁচালো দাড়ি, খালি মাথায় খানিকটা রুক্ষ ঝাঁকড়া চুল। তার ছায়াটা আরো দীর্ঘ হয়ে পড়েছে দীঘির জলে, চাঁদের আলো তার কপিশ চোখ দুটোয় জ্বলে উঠছে।

চকিতের জন্যে মনে হল লোকটা যেন অশরীরী। এই সন্ধ্যায়, এই নির্জনতায় যেন ওদিকের কবরখানা থেকে সে উঠে এসেছে। লোকটি আবার বললে, ‘পারদনে মোয়া।

পার্লে ভু ফ্রাঁসে ?'

ভারতচন্দ্র মাথা নাড়লেন। তিনি বুঝতে পারছেন না।

লোকটি ধীরে ধীরে বললে, 'আমি ব্যাঁগালীজ ভালো বলতে পারি না। আপনাকে এখানে বসে থাকতে দেখে; আলাপ করার ইচ্ছে হল। আমার নাম জাঁ। আপনার কাছে একটু বসব ?'

'নিশ্চয়।'—আশ্চর্য হয়ে ভারতচন্দ্র বললেন, 'বসুন।'

'ম্যার্সি।' জাঁ তাঁর পাশে বসে পড়ল। ভারতচন্দ্র দেখলেন, লোকটির বয়েস হয়েছে, পাক ধরেছে মাথার চুলে, জ্যোৎস্নায় তার গালে-কপালে কয়েকটা কালো কালো রেখাও চোখ এড়াল না।

একটু চুপ করে থেকে জাঁ বললে, 'আপনি কে ?'

'ব্রাহ্মণ।'

'ব্রামান ? জ্য কঁপ্রা—বুঝতে পেরেছি।—আপনি পুজো করেন ?'

ভারতচন্দ্র একটু হাসলেন। নিজের পরিচয় লোকটির কাছে কী দেবেন, কিছুক্ষণ ভেবে পেলেন না। তারপর বললেন, 'না, পুজো করি না। আমি কবি। কবিতা লিখি।'

জাঁর চোখ যেন নতুন করে জ্বলে উঠল।

'পোয়্যাত্ ? কবি ? বঁ দিও! মহাশয়, আমারও তাই মনে হয়েছিল। পোয়্যাত্ না হলে কে আর এমন করে এখানে বসে থাকে ?'

ভারতচন্দ্র বললেন, 'আপনিও কবি ?'

'ন-ন! জ্য সুই আঁ সলদা—আমি একজন সলদা—সৈনিক, যুদ্ধ করি। এখানে আছি কুড়ি বছর।'

'ও।'

লোকটি আবার অন্যমনস্ক হয়ে সামনের জ্যোৎস্না-জ্বলা জলের দিকে চেয়ে রইল। ভারতচন্দ্র ভাবছিলেন উঠবেন কিনা, এমন সময় জাঁ তাঁর মুখের দিকে তার দৃষ্টি ফেলল।

'জানেন, স্যাং নুই—আজকের রাত্রিতে, পনেরো বছর আগে মনামি আঁতোয়ান—আমার বন্ধু আঁতোয়ানকে আমি এখানে সমাধি দিয়ে গেছি। সেই থেকে আমি এই রাতে প্রতি বছর এখানে আসি, সুর তা ফস্—তার সমাধিতে ফুল দিই।'

'ও।'

'আপনি কবি, পোয়্যাত্। আপনি বুঝবেন। কেন সে মরেছিল, জানেন ? পার্‌সক্যু য়ুন ব্যাঁগালী ফাম্—একটি বাঙালী মেয়ের জন্য।'

'বাঙালী মেয়ের জন্যে ?'

'উই-উই। স্য কি সে পাসে—কী হয়েছিল সব আপনাকে বলি। স্যাতেত্যুন পয়েজী—সেও একটা কবিতা। আপনি কবি, আপনাকে বলিতে ইচ্ছা করি।'

'বলুন।'

বাংলার সঙ্গে ছাড়া-ছাড়া ফরাসী মিশিয়ে জাঁ শুরু করল এক আশ্চর্য কাহিনী। চন্দননগরে যে সব ফরাসী সৈনিক আসত, তারা দেশীয় লোকের সঙ্গে মেলামেশা করত, ঘনিষ্ঠ হতো, শেষে এমনও হতো যে এদেশী মেয়েদের বিয়ে করে পালিয়ে যেত দূরে,

তাদের নিয়ে সংসার বাঁধত।

এমনি করে কেল্লার সৈনিকের সংখ্যা কমে যাচ্ছে দেখে অ্যাদ্‌ অরিয়্যাঁতালের টনক নড়ল। তৈরি হল এক নিদারুণ 'লোয়া'—কঠোর আইন। সে আইনের সারকথা, কোনো সৈনিক যদি এদেশের মেয়েকে বিয়ে করে, তবে তার প্রাণদণ্ড হবে, সে অপরাধের কোনো ক্ষমা নেই।

'আর আমার বন্ধু—মার্সেল, মনে মনে সে-ও ছিল পোয়্যাত্‌। সলদা—সৈনিক হওয়ার জন্যে তার জন্ম হয়নি। তবু আশ্চর্য দেশ এই অ্যাদের মোহই তাকে সাঁদের নাগরে টেনে এনেছিল। কী সুন্দর ছিল তার চেহারা। সোনালি চুল—নীল চোখ, কী চমৎকার গান গাইতে পারত। একজন ব্যাঁগালী মেয়েকে দেখে সে মুগ্ধ হয়ে গেল। মেয়েটির নাম ছিল কমলা।'

কৌতূহল গভীর হতে লাগল ভারতচন্দ্রের।

'তারপর ?'

জাঁ বলে চলল কমলার রূপের কথা। ঘন কালো তার চুলের রাশ—সে যেন অন্ধকারের বনভূমি ; তার চোখের দিকে তাকালে মনে হতো যেন 'ক্রেপ্‌সক্যুল'—গোধূলিতে পাশাপাশি দুটি সন্ধ্যাতারা ফুটেছে। 'সি ব্যাল্‌ !' দেশ, জাতি, সমাজ—সব ভুলে গিয়ে সে-ও মার্সেলকে ভালোবাসল। দুজনে গভীর রাতে পালাতে চাইল সাঁদের নাগর ছেড়ে। কিন্তু পালাতে পারল না, গেটের সামনেই তারা ধরা পড়ল। পরদিন হল বিচার। মার্সেলের জন্যে হুকুম হল 'অ্যাঁ কু দ্য ফো'—তাকে গুলি করে মারা হবে। জাঁর চোখ জলে ভরে উঠল : 'মার্সেল কবি ছিল। পোয়্যাত্‌। কিন্তু প্রাণ দিলে সে সলদার মতো। মৃত্যুর আগে তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, তুমি কি অনুতপ্ত ? মার্সেল বললে, না। আমার হৃদয় জানে, বঁদিও জানেন—আমি কোনো অন্যায় করিনি। আর বুকে বন্দুকের গুলি বেঁধবার আগে পর্যন্ত সে গান গেয়েছিল। জানো, কী ছিল তার গানের কথা ? সে বলেছিল, আকাশে চন্দ্র-সূর্য থাকবে, ফুল ফুটবে, পাখি গান গাইবে—ততদিন বেঁচে থাকবে মানুষের হৃদয়, বেঁচে থাকবে তার প্রেম। আমার মৃত্যু হবে, কিন্তু আমার প্রিয়াকে—আমার প্রেমকে কেউ কোনোদিন কেড়ে নিতে পারবে না।'—ফরাসী ভাষায় গুনগুন করে জাঁ কী বলে চলল, তার ভাষা ভারতচন্দ্র বুঝতে পারলেন না ; কিন্তু এই জ্যোৎস্নায়, সামনের ওই সমাধিগুলোর পটভূমিতে, নির্জনতায়, আর এই অদ্ভুত মানুষটির পাশে বসে পনেরো বছর আগেকার এক অপূর্ব কাহিনী শুনে সব কিছুর অর্থই তাঁর কাছে যেন স্পষ্ট হয়ে গেল।

জাঁর ডাকে তাঁর চমক ভাঙল। সে বলছিল, 'তুমি কবি। এ নিয়ে একটা কবিতা লেখো।'

একটু চুপ করে থেকে ভারতচন্দ্র বললেন, 'লিখতে আমি পারি। কিন্তু সে কবিতা কেউ পড়বে না।'

জাঁ আহত হয়ে বললে, 'পুরকোয়া ? কেন পড়বে না ?'

ফিরিঙ্গী আর হিন্দু মেয়ের প্রেমের কাহিনী যে কেউ সহ্য করবে না, একথা জাঁ-কে বলতে ভারতচন্দ্রের বাধল। মার্সেলের মৃত্যুর ছবিটা যেন তাঁরও চোখের সামনে ভাসছে। মনে পড়ছে, যতদিন আকাশে চন্দ্র-সূর্য থাকবে, ততদিন বেঁচে থাকবে

মানুষের প্রেম। একটা নিঃশ্বাস ফেলে ভারতচন্দ্র বললেন, 'আমাদের দেশে মানুষের প্রেমের কথা নিয়ে কাব্য লেখার নিয়ম নেই। সব কিছু লিখতে হয় দেবতাকে নিয়ে।'

'কোয়া?'—জাঁ আরো ক্ষুণ্ণ হল: 'আমি তো তোমাদের রাধা-কিষণের গান শুনেছি। সে তো আমুর—প্রেমের গান!'

'কিন্তু রাধাকৃষ্ণ দেবতা। তাঁদের প্রেম আমাদের ধর্মেরই কথা।'

'ও!' জাঁ হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো: 'তোমাদের কোনো হৃদয় নেই। তুমিও পোয়্যাত্ নও। ন-ন!'

ভারতচন্দ্র কিছু বলতে চাইলেন, বলতে পারলেন না। একটু পরে চোখ তুলে চেয়ে দেখলেন, জাঁ নেই। যেমন হঠাৎ এসেছিল, তেমনি হঠাৎ কোথায় চলে গেছে লোকটা।

আশ্চর্য, পায়ের শব্দ পর্যন্ত শোনা গেল না। কিংবা নিজে অন্যমনস্ক ছিলেন বলেই—

আচ্ছা, লোকটা কি সত্যিই শরীরী? সেই ওই কবরখানা থেকে উঠে আসেনি তো? কিংবা ও নিজেই মার্সেল, লালদীঘির এই নির্জনতায় ভারতচন্দ্রের কাছে এসে নিজের কাহিনীই জানিয়ে গেল, জানিয়ে গেল পনেরো বছর আগেকার এক গভীর করুণ ইতিহাস?

ছি-ছি, কী অসম্ভব অসংলগ্ন চিন্তা এ-সব!

আচ্ছা কমলার কী হল, সে-কথা তো জাঁকে জিজ্ঞেস করা হল না?

কী হল কমলার? কে বলতে পারে সে-কথা? হয়তো এই লালদীঘির জলেই নিজের সব হিসেব মিটিয়ে দিয়েছিল সে। আর কী-ই বা করতে পারত এ-ছাড়া? সমাজ তো তাকে আর ফিরিয়ে নিত না?

আজ যদি মৃত্যুর ওপার থেকে কমলা সে কাহিনী বলতে আসে—

কেমন অস্বস্তি বোধ হল, আস্তে আস্তে উঠে পড়লেন ভারতচন্দ্র। মনে পড়ল, এখনো তাঁর সান্ধ্য-আহ্নিক কিছুই হয়নি, এই রাতে আবার তাঁকে খেতে যেতে হবে গোঁদলপাড়ায় রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে।

জীবনটা আলো-অন্ধকারের এক অদ্ভুত কৌতুক! জাঁ, মার্সেল, কমলা—সবাই সেই কৌতুকের অংশীদার। তার মাঝখানে তাঁর নিজের জায়গাটা কোথায়, তা-ই শুধু বুঝতে পারছেন না।

পাঁচ

গঙ্গার ঘাটে স্নান করে উঠলেন ভারতচন্দ্র। তখন অল্প অল্প করে ফুটছে ভোরের আলো। শিবমন্দিরের পাশে পুরোনো বটগাছের তলায় তখনো একটুকরো রাত জমে আছে, তার ডালে ডালে, কোটরে কোটরে শুরু হয়েছে পাখির কাকলী। তার তলা থেকে গম্ভীর ভরা গলায় ভৈরোঁতে শুরু হয়েছে ভজন: 'জয় হর শঙ্কর, জয় ভুবনেশ্বর, জয় মহাকাল-ত্রিপুরারি—'

সামনে গঙ্গায় নোঙর ফেলে ফিরিঙ্গী জাহাজগুলো স্তব্ধ; নৌকোর চলাচল এখনো আরম্ভ হয়নি। শুধু পাখির ডাক, পাতার শব্দ, আর ভজনের সঙ্গে সুর মিলিয়ে গঙ্গার

করতালি। ভারতচন্দ্র চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। আকাশে সিঁদুর ছড়িয়ে গঙ্গাকে রাঙিয়ে সূর্য উঠতে লাগল, ভারতচন্দ্রের মনে পড়ল, কতদিন নীলাচলে সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখেছেন তিনি।

'জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্'—

দু হাত তুলে সূর্য-প্রণাম করলেন ভারতচন্দ্র। তারপরেই শুনলেন, 'বাবা!'

শান্ত মধুর গলার স্বর। চেয়ে দেখলেন, সিঁড়ির দু ধাপ ওপরে বিদ্যাধরী দাঁড়িয়ে। পরনে গরদ, কপালে চন্দন। প্রথম সূর্যের আলোয় একখানা পটের মতো দেখালো।

ভারতচন্দ্র বললেন, 'আমাকে কিছু বলছেন মা?'

'একটা প্রার্থনা ছিল, বাবা।'

কয়েকদিন আগে নন্দদুলালের মন্দিরের স্মৃতিটা মনে এল। সেখানেও মেয়েটিকে যেমন দেখেছিলেন, এখানেও ঠিক তেমনি দেখলেন। সেই শুচিতা, সেই পবিত্রতা। আশ্চর্য, এরই জন্যে চৌধুরী মশাইয়ের এত লোকনিন্দা!

'কী বলবেন, বলুন মা। আমি কি কিছু করতে পারি আপনার জন্যে?'

'পারো, বাবা। একটু অনুগ্রহ চাইছি তোমার কাছে।'

'অনুগ্রহ! আমি?'—বিস্মিত চোখে ভারতচন্দ্র চেয়ে রইলেন।

'বলতে সংকোচ হয় বাবা—' বিদ্যাধরী একবার থামল: 'আজকের সকালে ব্রাহ্মণকে কিছু ফলদান করে ধন্য হই আমি। কিন্তু সব ব্রাহ্মণ সে দান নেন না—আমি শূদ্রা আর পতিতা বলে—' বিদ্যাধরীর মুখে বেদনা আর লজ্জার ছায়া পড়ল: 'সেদিন মন্দিরে তোমার কথা শুনে বড়ো ভালো লেগেছিল। আজ তুমি গঙ্গায় স্নান করে উঠে আসছ ব্রহ্মণ্যদেবের মতো, বড়ো ভালো লাগল দেখে। লোভ আর সামলাতে পারলুম না। তোমার যদি আপত্তি না থাকে—'

ভারতচন্দ্র হাসলেন।

'মা, বহুকাল আমি বৈষ্ণব-সঙ্গ করেছি। আমার মন তৈরী হয়নি, বৈষ্ণব আমি হতেও পারিনি। কিন্তু কে শূদ্রা, কে পতিতা সে-বিচার শ্রীক্ষেত্রে গিয়েই আমি ভুলে গেছি। আমাকে কিছু দান করে যদি আপনার তৃপ্তি হয়, দিন।'

ছল ছল করে উঠল বিদ্যাধরীর চোখ, কিছুক্ষণ যেন কথা খুঁজে পেল না। তারপর আস্তে আস্তে বললে, 'তা হলে একটু কষ্ট করে এসো বাবা আমার সঙ্গে। মন্দিরের পাশেই আমি থাকি।'

ভারতচন্দ্র অনুসরণ করলেন বিদ্যাধরীকে। নন্দদুলালের মন্দিরের ধারেই বিদ্যাধরীর ঘর। টিনের চাল, কাঠের খুঁটি। দরজার শেকল খুলে বিদ্যাধরী বললে, 'এসো, বাবা।'

বারান্দায় খড়ম রেখে ভারতচন্দ্র ভেতরে ঢুকলেন। ছোট ঘরটির একদিকে মেজেতে একটি ছোট বিছানা গুটানো, বাকী আধখানা জুড়ে পুজোর সাজসরঞ্জাম, নিতাই-গৌরাঙ্গের পট, পিতলের বালগোপাল বসে আছেন রুপোর সিংহাসনে। ফুল রয়েছে সাজানো, ধূপের গন্ধে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে ঘরটি। তারই পাশে একখানা বড়ো কাঁসার থালায় একটি নারকেল, একছড়া কলা, অন্যান্য দু-চারটি ফল, কিছু সন্দেশ, কয়েকটি টাকা।

একখানা আসন পেতে দিয়ে সসম্মানে বিদ্যাধরী বললেন, 'বোসো বাবা।'

ভারতচন্দ্র বসলেন। কাঁসার থালাখানি সামনে রেখে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল বিদ্যাধরী।

তটস্থ হয়ে ভারতচন্দ্র বললেন, 'কী করছেন মা, কী করছেন আপনি?'

'তুমি যে ব্রাহ্মণ, বাবা। তোমাকে প্রণাম করতে পেরে আজকের দিনটা আমার সার্থক হল।'

ব্রাহ্মণ! কথাটার গুণে আছে বটে। একটা বিস্বাদ হাসি ফুটে উঠল ভারতচন্দ্রের মুখে। চন্দননগরে এসে ইন্দ্রনারায়ণের অতিথিশালায় ওঠবার দিনের সেই দুই ব্রাহ্মণকে তাঁর মনে পড়ে গেল।

বিদ্যাধরী বললে, 'তুমি থালাটা একবার স্পর্শ করো, বাবা। তা হলেই বুঝব তুমি নিলে।'

দু হাত দিয়ে ভারতচন্দ্র থালাটি ধরলেন। বিদ্যাধরী বললে, 'তোমাকে আর কষ্ট করে বয়ে নিতে হবে না, আমি লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেব। কোথায় থাকো তুমি?'

'চৌধুরী মশাই আমায় আশ্রয় দিয়েছেন। তাঁরই অতিথিশালায় থাকি।'

'খাওয়া-দাওয়া কোথায় হয়?'

ভারতচন্দ্র মাথা নামালেন। এই প্রসঙ্গটা না উঠলেই ভালো হতো। তাঁরই সামনে সন্ন্যাসীর মতো যে মেয়েটি বসে আছে, তারই জন্যে যে ইন্দ্রনারায়ণ ব্রাহ্মণকে অন্ন দিতে পারেন না, এ-কথা তাঁর আর অজানা নেই।

'গোঁদলপাড়ায় রামেশ্বর মুখুজ্জে মশাইয়ের বাড়িতে।'

বিদ্যাধরীর মুখের ওপর দিয়ে ছায়া ভেসে গেল।

'আমি পাপীয়সী। আমার জন্যেই দেবতার মতো মানুষটির এত অপযশ।'

'একথা বলবেন না, মা। নিষ্পাপ শরীর আপনার। যারা আপনার নিন্দে করে, তারা মিথ্যেবাদী।'

বিদ্যাধরী আশ্চর্য হয়ে ভারতচন্দ্রের দিকে চেয়ে দেখল, বেদনায় ছলছল করে উঠল তার চোখ। ঠিক এমন করে সান্ত্বনা এর আগে কেউ কখনো তাকে দেয়নি। আস্তে আস্তে বললে, 'বাবা, তুমি বিদেশী। আমার সম্বন্ধে কিছু জানো না বলেই এ-কথা বলছ।'

'আমি কিছু জানতে চাইনে, মা।'—ভারতচন্দ্রের গলায় আবেগ ফুটে উঠল: 'আপনাকে আমি দেখেছি।'

'কী দেখেছ বাবা বাইরে থেকে, কতটুকুই বা জানো!'—কয়েক মুহূর্ত বিদ্যাধরী চুপ করে রইল: 'মনে হয় তুমি সদ্‌বংশের সন্তান, তোমার চোখমুখ দেখে বুঝতে পারি, ঠিক সাধারণ মানুষ নও তুমি। আমাকে তুমি ভুল বুঝবে, এই ব্রতের পুণ্য দিনটিতে আমার সম্পর্কে মিথ্যে ধারণা নিয়ে যাবে, সে হয় না। নিজের কথা অল্পের মধ্যে তোমায় খুলে বলি। তোমার সময় নষ্ট করছি না তো বাবা?'

'আমার সময়ের কোনো অভাব নেই, মা।'

বিদ্যাধরী আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। ধূপের ধোঁয়া ঘুরে ঘুরে একটা দূরের আড়াল তৈরি করতে লাগল তার মুখের ওপর। গঙ্গার দিক থেকে অনেকগুলো দাঁড়ের আওয়াজ আসতে লাগল, কোনো একটা বড়ো নৌকো উজানে চলেছে।

'সে প্রায় কুড়ি বছর আগেকার কথা, বাবা। শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপেরবাড়ি আসছিলুম গোরুরগাড়িতে। সঙ্গে স্বামী।'—বিদ্যাধরীর মুখ এতদিন পরেও লজ্জায় বেদনায় কালো হয়ে উঠল : 'পথে ডাকাতে ধরল মাঠের ভেতর। স্বামী পালালেন, সঙ্গের লোকজন পালালো। গয়নাগাটির সঙ্গে সব হারিয়ে মাঠের ভেতর পড়ে রইলুম অজ্ঞান হয়ে।

ভোররাতে পালকী করে চলেছিলেন চৌধুরী মশাই। আমাকে কুড়িয়ে নিলেন। আমার বাপেরবাড়িতে গেলেন। বাপ বেঁচে নেই, মা কেঁদে মাটি ভাসালেন, কিন্তু ভাইয়েরা দরজা আটকে রইল—ঘরে ঢুকতে দিলে না। শ্বশুরবাড়ি নিয়ে গেলেন, স্বামী কোন্ দিকে মুখ লুকোলো—শ্বশুর বললেন, ও বউ আর আমি ঘরে তুলতে পারব না। সমাজ আছে তো!

চৌধুরী মশাই বললেন, বেশ, দরকার হলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে নাও। আমি খরচ দেব।

শ্বশুর বললে, আপনি ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে থাকেন। দেশের ধর্ম-কর্ম ভুলে গেছেন। এ পাপের কোনো প্রায়শ্চিত্ত নেই—পোকায় ছোঁয়া ফুল আর পুজোয় লাগে না। তা ছাড়া বউ বাঁজা। ছ'সাত বছর বিয়ে হয়েছে, এখনো ছেলেপুলে হল না। আমার বংশ থাকে কী করে? এ না হলেও ও বউকে আমি ত্যাগ করতুম।

সাফ জবাব।

চৌধুরী মশাইয়ের পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে আমি বললুম, আপনি দয়ালু, আমার জন্যে আর মিথ্যে অপমান সইবেন না। আমার জন্যে দড়িকলসী আছে, গঙ্গার জল আছে, আপনি কিছু ভাববেন না।

তিনি বললেন, দড়ি-কলসীর কথা পরে হবে, এসো আমার সঙ্গে।

আনলেন, পায়ে ঠাঁই দিলেন। তখনো এত বড়ো হননি, সমাজে খুব হৈ-হৈ হল, তবে ফিরিঙ্গিরা সহায় ছিল বলে বিশেষ কিছু কেউ করতে পারল না। আর আমি?'

বিদ্যাধরীর মুখ ধূপের রেখায় রেখায় যেন আরো অস্পষ্ট হয়ে গেল : 'আমারই মন নীচ, আমি থাকতে পারলুম না। পুজো করতে করতে ভালোবাসলুম। প্রথমটা চমকে উঠলেন, আমাকে ফেরাতে চাইলেন, কিন্তু আমি—'

বিদ্যাধরী থামল : 'আমারই পাপ বাবা, আমারই পাপ। ওঁর কোনো দোষ ছিল না। ওঁর গায়ে ধুলো লাগল, কিন্তু আমি পেলুম মুক্তি। ওঁকে ভালোবেসে ভালোবাসলুম নন্দদুলালকে। আজ রাতদিন ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে বলি, আমার গতি হোক অনন্ত নরকে, কিন্তু ওঁর পুণ্যে যেন এতটুকুও কালির ছোঁয়া না লাগে।'

চোখে জল এসেছিল, শাড়ীর আঁচলে মুছে ফেলে বিদ্যাধরী বললে, 'এ-সব কথা কাউকে বলতে পারিনি, তোমাকে যে কেন বললুম তা-ও জানি না। মনে হল, তুমি ঠিক সাধারণ মানুষ নও। যখন গঙ্গাস্নান করে উঠে এলে, তখন তোমার সারা শরীর দিয়ে আলো ঠিকরে পড়ছিল। তোমার নামটি কী, বাবা?'

'ভারতচন্দ্র রায়।'

'তুমি খুব বড়ো হবে, বাবা। ভগবান তোমার মুখে-চোখে সে-কথা লিখে দিয়েছেন।'

বিদ্যাধরীর কাহিনীটা মনের ভেতরে ঘুরছিল। অন্যমনস্ক ভাবে বিষন্ন হাসি

হাসলেন ভারতচন্দ্র। জীবনের এই চল্লিশটা বছর ধরে বড়ো হওয়ার সব লক্ষণই তো দেখতে পেলেন। কিন্তু এই রূঢ় কথাটা বিদ্যাধরীকে বলতে তাঁর বাধল।

'অনেকক্ষণ তোমায় আটকে রাখলুম বাবা, অপরাধ নিয়ো না। আচ্ছা, এসো তুমি। আমি এই থালাটা লোক দিয়ে অতিথিশালায় পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'মা, আপনাকে আমার একটা প্রণাম করতে ইচ্ছে করছে।'

'ছি বাবা, ছি। এমন কথা শুনলেও আমার মহাপাতক।'

অতিথিশালার ঘরে ভারতচন্দ্র একা। কাল পর্যন্তও একজন সঙ্গী ছিলেন, তিনি মাতৃশ্রাদ্ধ বাবদ কিছু আদায় করে নিয়ে গেছেন ইন্দ্রনারায়ণের কাছ থেকে। যাওয়ার আগে ভারতচন্দ্রকে বলে গেছেন, 'মা মারা গেছেন মশাই বারো বছর আগে। বুঝলেন না—যেন তেন প্রকারেণ বর্বরস্য ধনক্ষয়ঃ!'

ভারতচন্দ্র জবাব দেননি।

এঁরা সমাজকে রক্ষা করছেন, এঁদেরই জন্যে তৈরী হচ্ছে স্বর্গের ধাপ। আর ইন্দ্রনারায়ণ পতিত! বিদ্যাধরীর পাঠিয়ে দেওয়া ফল-মিষ্টির দিকে চেয়ে রইলেন ভারতচন্দ্র। ঘরে আর কোনো ব্রাহ্মণ থাকলে এই থালাটা দেখে কী বলতেন, কে জানে?

নিজের ঝুলি থেকে একটি বই বের করলেন ভারতচন্দ্র। কতগুলো শায়ের-এর সমষ্টি। পাতা ওলটাতেই চোখে পড়ল:

"খবরে-তহয়ুরে-ইশ্‌ক শুণ্ না জনুন্ রহা না পরি রহী,
না তু তু রহা না তু মেঁ রহা যো রহী সো বে-খবরী রহী—"

প্রেমের শক্তি দেবভাব, দানবভাব, সব নিশ্চিহ্ন করে দিল। তোমার নিজস্ব—তোমার ব্যক্তিগত সত্তা—সব লুপ্ত হয়ে গিয়ে রইল শুধু একটি স্বার্থহীন একাত্মতার অনুভব।

ভারতচন্দ্র বই থেকে চোখ তুললেন। এ কা-র উপলব্ধি? বিদ্যাধরীর? প্রেমের আশ্চর্য শক্তি তাকেও কি এমনভাবে মুক্তি এনে দিয়েছে?

দরজার গোড়ায় ডাক পড়ল: 'রায় মশাই!'

চৌধুরী মশাইয়ের পাইক।

'রায় মশাই, হুজুর আপনাকে খাসকামরায় ডেকেছেন।'

তটস্থ হয়ে ভারতচন্দ্র পুঁথি গুছিয়ে রাখলেন।

'আসছি, আমি এখনি আসছি।'

ভারতচন্দ্র ব্যস্ত হয়ে দেখা করতে গেলেন। সাধারণত এই সময় ইন্দ্রনারায়ণ কখনো ডাকেন না, আজ নিশ্চয়ই কোনো জরুরী কাজের তাগিদ আছে।

খাসকামরার সামনে আশা-সোঁটাধারী অচেনা প্রহরী। নিশ্চয় মান্যগণ্য কেউ এসেছেন। ভারতচন্দ্র দ্বিধা করতে লাগলেন। বরকন্দাজ বললে, 'যান, ভেতরে যান। হুজুর আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছেন।'

ভারতচন্দ্র দরজা ঠেলে সভয়ে ঢুকলেন ঘরের মধ্যে।

আজ ইন্দ্রনারায়ণের মুখোমুখি আর একজন রূপবান পুরুষ। বয়সে ভারত-

চন্দ্রের কাছাকাছিই হবেন, কিছু কনিষ্ঠ হতেও বাধা নেই। কিন্তু ঐশ্বর্য আর আভিজাত্যের চিহ্ন তাঁর সর্বাঙ্গে। মাথার পাগড়ীতে হীরা, হাতের আঙুলের আংটিতে হীরা, গলায় তিন প্যাঁচ সোনার হারে হীরা-মুক্তোর কাজ। মসলিনের দামী পোশাক, পায়ের মখমলের নাগরায় ঝকঝকে রুপোর জরি। ইন্দ্রনারায়ণকে বলছেন, 'আপাতত এই তিন লাখ টাকার ব্যবস্থা আমায় করে দিতেই হবে, নইলে মুর্শিদাবাদের রাজস্ব নিয়ে আমি খুব অসুবিধেয় পড়ব।'

ঠিক সেই সময় ভারতচন্দ্র পা দিলেন। আগন্তুক তাঁর দিকে সন্দিগ্ধ চোখে চেয়েই থেমে গেলেন। আর ইন্দ্রনারায়ণ বললেন, 'এসো ভারত, এসো। ইনি হচ্ছেন নবদ্বীপের অধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়। মহারাজ, এঁর কথাই আপনাকে বলছিলুম।'

কৃষ্ণচন্দ্র বললেন, 'ইনিই? বেশ বেশ!'

ভারতচন্দ্র এগিয়ে গিয়ে মহারাজার পায়ের ধুলো নিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র বললেন, 'বসুন—বসুন।'

ভারতচন্দ্র বসলেন। তা হলে ইনিই তাঁর ভবিষ্যৎ প্রভু। প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হল, লোকটি নেহাৎ খারাপ নন, চোখে-মুখে একটা প্রসন্নতার আভাস আছে, খুব সম্ভব রসিক আর ফুর্তিবাজ। কিন্তু কোথাও ব্যক্তিত্বের কোনো স্পষ্ট পরিচয় নেই, দুর্বলচিত্ত, মোটের ওপর একটা সহজ আরামের স্রোতে ভেসে যেতে ভালোবাসেন। এ ধরনের লোকের কাব্যরসিক হতে বাধা নেই, কিন্তু—

কিন্তু ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর আশ্রয় যদি বাঁধানো বটের ছায়া হয়, এর আশ্রয় প্রমোদ-বজরা।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন ভারতচন্দ্রের দিকে। বললেন, 'আপনার সব কথা আমি চৌধুরী মশাইয়ের কাছ থেকে শুনেছি।'

'আমার সৌভাগ্য।'

'তা ছাড়া পেঁড়োর নরেন্দ্রনারায়ণের কথাও আমি জানি। মহারাণী বিষ্ণুকুমারী তাঁর ওপরে যে অত্যাচার করেছিলেন, সে কথাও আমার শোনা আছে। বর্ধমানের ব্যাপারই ওই—তারা আর কাউকে মানুষ বলেই গণ্য করে না!'

ভারতচন্দ্র চুপ করে রইলেন।

ইন্দ্রনারায়ণ বললেন, 'ইনি যোগ্য বংশের যোগ্য সন্তান। সংস্কৃত জানেন, ফার্সী জানেন, অতি উচ্চশ্রেণীর কবিত্ব-শক্তির অধিকারী। আপনি গুণিজনের প্রতিপালক, তাই আপনার সভাই এঁর যোগ্যস্থান বলে মনে করি। তাই এঁর জন্যে বিশেষভাবে আপনার কাছে সুপারিশ করেছি। এঁর স্বরচিত গান কিংবা কবিতা শুনলে আপনি মুগ্ধ হবেন।'

কৃষ্ণচন্দ্র বললেন, 'সেইজন্যেই আমি আপনার প্রতি একটু আকর্ষণ বোধ করছি। আমার সভায় একটি ভাঁড় আছে, তার নাম গোপাল। সে অনর্গল ইয়ার্কি করতে পারে, রাতদিন বকবক করতে জানে। তাকে ছেড়ে যেমন আমার চলে না, তেমনি বেশিক্ষণ তার রসিকতা শুনলে মাথা ধরে যায়। এমন কি আমার মহিষীরা পর্যন্ত তার বদ-রসিকতা থেকে নিস্তার পান না। এবার বড়োরাণী রাগ করে বলেছেন, "এসব ইতর-সঙ্গ করে তুমিও ইতর হয়ে যাচ্ছ।" আমি তাঁকে কথা দিয়েছি, "আমার সভায় এবার

খুব গুণী একজন লোককে যোগাড় করে আনব।" একজন সুকবি যদি পাওয়া যায়, সে তো মহাভাগ্যের কথা!'

ইন্দ্রনারায়ণ আবার বললেন, 'ভারত সত্যিই সুকবি। এমন প্রতিভা আমি আর দেখিনি।'

'তাই নাকি?'—কৃষ্ণচন্দ্র গোঁফে একবার তা দিলেন। কৌতুকে চোখ দুটি মিটমিট করে উঠল তাঁর।

'আপনি সমস্যা-পূরণ করতে পারেন রায় মশাই?'

'সমস্যা-পূরণ?'

কৃষ্ণচন্দ্র হাসলেন: 'আকবর বাদশাহ যেমন করতেন। আধ পঙক্তি কবিতা বললেন, আর কোনো সভাসদ তা থেকে অর্থবোধক একটি সম্পূর্ণ কবিতা রচনা করে দিলেন!'

'বুঝেছি।'

'কবি যখন, আপনিও নিশ্চয় তা পারেন?'

তার অর্থ, কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে পরীক্ষা করতে চাইছেন। একবারের জন্যে ভারতচন্দ্রের চোখ জ্বলে উঠল। আবার মনে হল, 'যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা!' কিন্তু ইন্দ্রনারায়ণের সম্মান নির্ভর করছে তাঁর ওপর, তিনিই তাঁর জন্যে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন মহারাজাকে, তাঁর অমর্যাদা কিছুতে করা চলে না।

ভারতচন্দ্র মৃদুস্বরে বললেন, 'চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

'খুব ভালো কথা।'—কৃষ্ণচন্দ্র একটু ভাবলেন, গোঁফে তা দিলেন একবার, একটুখানি কৌতুকের হাসি দেখা দিল ঠোঁটের কোণায়, বললেন, 'এইটে পূরণ করুন—"পায় পায় পায় না"।'

কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে ভেবে নিলেন ভারতচন্দ্র। তারপর ধীরে ধীরে বলতে আরম্ভ করলেন:

'চিনিতে নারিনু আমি আইল জগৎস্বামী
মাগিল ত্রিপদ ভূমি আর কিছু চায় না,
খর্ব দেখি উপহাস শেষে একি সর্বনাশ
স্বর্গমর্ত্য দিব আশ তাহে মন ধায় না॥
গেল সকল সম্পদ এক্ষণে পরম পদ
বাকী আছে একপদ ঋণ শোধ যায় না।
হ্যাদে শুনে হ্রদিপ্রিয়ে বৃন্দাদেবী দেখসিয়ে
অখিল ব্রহ্মাণ্ড দিয়ে পায় পায় পায় না।'

কবিতা শেষ করে ভারতচন্দ্র বললেন, 'এ হল বলিরাজার উক্তি। ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা করে বামন-অবতার যখন তাঁকে ছলনা করেছিলেন, তখন।'

কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র তখন অবাক মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে আছেন। ভারতচন্দ্রের শেষ কথাগুলো তিনি শুনতেও পেয়েছেন কিনা সন্দেহ। সত্যি সত্যিই যে ভারতচন্দ্র এত দ্রুত এমন সুন্দরভাবে সমস্যা পূরণ করে দেবেন, এ তাঁর কল্পনাতেও ছিল না।

শুধু অল্প অল্প হাসছিলেন ইন্দ্রনারায়ণ। বললেন, 'দেখুন মহারাজ, আমি ঠিক

বলেছিলুম কিনা !'

কৃষ্ণচন্দ্র আসন ছেড়ে উঠলেন, দু পা এগিয়ে ভারতচন্দ্রের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। নিজের হাত থেকে খুললেন একটা হীরার আংটি, ভারতচন্দ্রের ডান হাতখানা টেনে নিয়ে আংটিটি পরিয়ে দিলেন তাঁর আঙুলে।

বললেন, 'সত্যিই আপনি মহাকবি। আপনাকে পেলে নবদ্বীপের রাজসভা ধন্য হবে।'

ভারতচন্দ্র আবার মহারাজের পায়ের ধুলো নিলেন। বললেন, 'আপনার অনুগ্রহ।'

'অনুগ্রহ নয়, আমার সৌভাগ্য। কিন্তু ক'দিন আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে এখানে। আমি আপাতত কলকাতায় চলেছি, কালীঘাটে মা-কে দর্শন করব, পুজো দেব। তাছাড়া মানিকচাঁদজী, আমীরচাঁদজীর সঙ্গেও কিছু বৈষয়িক কাজকারবার আছে। তা নইলে আমি নিজেই আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতুম। আপনি এক কাজ করুন, তিন সপ্তাহ পরে কৃষ্ণনগরে গিয়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন, আমি আপনাকে সভাকবি করে রাখব।'

ইন্দ্রনারায়ণ সস্নেহে বললেন, 'ভারত, খুশি হয়েছ তো ?'

ভারতচন্দ্র বললেন, 'এ কৃতজ্ঞতার ঋণ আমি সারাজীবনেও শোধ করতে পারব না।'

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করলেন না। ইন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে আরো কিছু শিষ্টাচারের পালা শেষ করে, ভারতচন্দ্রকে আবার কৃষ্ণনগরে যাওয়ার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিলেন। আজই তাঁকে কলকাতা যেতে হবে।

কৃষ্ণচন্দ্র চলে গেলে ইন্দ্রনারায়ণ বললেন, 'কেমন দেখলে ?'

করজোড়ে ভারতচন্দ্র বললেন, 'ভয়ে বলব, না নির্ভয়ে বলব ?'

চৌধুরী হাসলেন : 'নির্ভয়েই বলো।'

'বয়েস বেশি নয়, একটু তরলচিত্ত—'

চৌধুরী বললেন, 'ভুল বুঝেছ, বয়েসে তোমার চেয়ে বড়োই হবেন। তরলচিত্ত বলছ ? আদৌ নয়, অত্যন্ত বিচক্ষণ লোক। তুমি অনেকদিন বিদেশে ছিলে তাই হয়তো কিছুই জানো না। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রই আজ দেশের কুলপতি—বলতে গেলে গঙ্গার পূর্বপারের সমাজ তাঁর নির্দেশেই চলে। অনেক সৎকীর্তি করেছেন—দানেধ্যানে বহু খ্যাতি। মুর্শিদাবাদে নবাব আলীবর্দীও খুব খাতির করেন। তোমার ভয় নেই —যোগ্য স্থানেই তুমি আশ্রয় পাবে।'

মাথা নামিয়ে ভারতচন্দ্র ভাবতে লাগলেন।

'তা ছাড়া কী করবে এখানে থেকে ? তোমাকে তো বলেছি, আবহাওয়া বড়ো ভালো ঠেকছে না আমার। দুবোয়া কিছু দুঃসংবাদ দিয়ে গেল। ফরাসীরা বীরের জাত, কিন্তু ইংরেজ অনেক চালাক, অনেক ধুরন্ধর। কী যে ঘটবে সব অনিশ্চিত। তুমি চলেই যাও এখান থেকে। ভগবান তোমার ভালো করুন, সরস্বতী আশীর্বাদ করুন তোমাকে।'

॥ ছয় ॥

ধার্মিক, বুদ্ধিমান কৃষ্ণচন্দ্রকে আলীবর্দী আদর করে নাম দিয়েছেন 'ধর্মচন্দ্র'। চুরাশী পরগণা জুড়ে তাঁর রাজত্ব। রাজ্যের উত্তরসীমা মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণসীমা গঙ্গাসাগর, পশ্চিমসীমা ভাগীরথী, পূব সীমান্ত 'বড় গঙ্গা'। 'চারি সমাজের' অধিনায়ক কৃষ্ণচন্দ্র। ঐশ্বর্যে, প্রতাপে বাংলা দেশে মাত্র দুজন তাঁর সমকক্ষ, একজন মুর্শিদাবাদের ধনপতি মহারাজ জগৎ শেঠ, আর একজন নাটোরের রাণী ভবানী।

বর্গীর হাঙ্গামা, প্রজাদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ, মহাবৎজঙ্গের হাতে লাঞ্ছনা—এসব সত্ত্বেও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মোটের ওপর নিশ্চিন্তই ছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি কিছু অনিশ্চয়তার কারণ ঘটেছে। মুর্শিদাবাদের আকাশে মেঘ ঘনিয়ে আসছে। তার কারণ, নবাবের দৌহিত্র এবং পোষ্যপুত্র মীর্জা মামুদ। এ-কথা আজ আর গোপন নেই, জরাজীর্ণ বৃদ্ধ নবাব তাঁকেই বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সিংহাসনে বসিয়ে যেতে চান।

নবাব আলীবর্দী অবশ্য চক্রান্ত আর হত্যার মধ্য দিয়েই সিংহাসনে বসেছিলেন। কিন্তু বীরত্বে, বিচক্ষণতায়, হিন্দু-মুসলমানের প্রতি সমান অপক্ষপাতে দেশের প্রত্যেক মানুষ শ্রদ্ধা করে তাঁকে: কৌশলে তিনি বর্গীর হাঙ্গামা ঠেকিয়েছেন, মগ-হার্মাদের উপদ্রব অনেকখানি বন্ধ করে দিয়েছেন। কিন্তু সবচাইতে বড়ো কথা, জমিদারদের সঙ্গে সব সময় তিনি সম্ভাব রেখে চলেন, তাঁদের পরামর্শ ছাড়া কোনো কাজ করেন না। তিনি নবাব, কিন্তু ক্ষমতা প্রতিপত্তির চূড়োয় বসে আছেন ধনকুবের জগৎ শেঠ। তাঁরই প্রাসাদে নবাবী টাঁকশাল, তাঁরই কাছারীতে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সব রাজস্ব জমা পড়ে। জগৎ শেঠই দেশের রাজা-জমিদারদের প্রতিনিধি—হাওয়া কখন কোন্ দিকে বইছে, সে খবর তিনিই ভালো করে জানেন।

এখন এই মীর্জা মামুদই জগৎ শেঠের কণ্টকশয্যা হয়ে উঠেছে।

উদ্ধত, বেপরোয়া, উচ্ছৃঙ্খল; কতগুলো কুসঙ্গী জুটেছে, তারাই আরো বেশি করে তার মাথা খাচ্ছে। তার লঘু-গুরু জ্ঞান নেই, এমন কি যে নবাবের সে চোখের মণি, তাঁরও বিরুদ্ধে একবার সে মাথা তুলেছিল। সুন্দরী মেয়েদের সম্পর্কে দুর্বলতার তার সীমা নেই; জগৎ শেঠের পুত্রবধূকে হরণ করে নিয়ে যে কীর্তি সে করেছে, মানী মানুষটার মাথা যেভাবে নুইয়ে দিয়েছে, তাতে শেঠজী ইহজীবনে তাকে ক্ষমা করতে পারবেন না। এমন কি তার উৎপাতে স্বয়ং রাণী ভবানী পর্যন্ত বড়নগর ছেড়ে পালিয়ে এসেছেন।

বড়নগর গঙ্গার ধারে। গঙ্গাতীরে বাস করবার জন্যে নাটোরের মহারাণী একটি চমৎকার প্রাসাদ আর মন্দির তৈরী করিয়েছেন সেখানে। নিজের বিধবা মেয়ে তারাকে নিয়ে মধ্যে মধ্যে সেখানে এসে থাকেন। তারার অপূর্ব রূপ একদিন চোখে পড়ল মীর্জা মামুদের, তাকে পাওয়ার জন্যে সে পাগল হয়ে উঠল। রাণী অনেক কৌশলে মেয়েকে নিয়ে বড়নগর থেকে পালিয়ে গেলেন, কিন্তু এই ঘটনার পর থেকে লোকের হৃৎকম্প আরো বেশি করে দেখা দিয়েছে। জগৎ শেঠও যদি মান বাঁচাতে না পারেন, স্বয়ং রাণী ভবানীরই যদি এই অবস্থা হয়, তা হলে মীর্জা মামুদ বাংলার নবাব হলে

কারো ঘরে বৌ-ঝি আর থাকবে না।

ভয়ের কারণ আরো আছে।

চতুর জগৎ শেঠ জানেন, ইংরেজ বণিকেরা ঠিক সাধারণ ব্যবসায়ী মাত্র নয়। ওদের বুদ্ধি আছে, শক্তি আছে, সাহস আছে। কিন্তু মীর্জা মামুদ দু'চোখে ইংরেজদের দেখতে পারে না, তার ধারণা ইংরেজদের জন্যে চটিজুতোর কয়েকটা ঘা-ই যথেষ্ট। জগৎ শেঠ মনে করেন, এ আগুন নিয়ে খেলা—এর জের অনেকদূর পর্যন্ত গড়াবে।

শুধু একটিমাত্র উপায় আছে। নবাবের শরীর দিনের পর দিন যেভাবে ভেঙে পড়ছে, তাতে তাঁর সময় যে আর বেশি নেই, সে কথা নিশ্চিত। তারপরে মীর্জা মামুদই নবাব হয়ে বসবে। তখন যে দুর্দিন ঘনিয়ে আসবে, তার ছবিটা এখন থেকেই কল্পনা করা চলে।

এই সম্পর্কেই পরামর্শ করবার জন্যে মুর্শিদাবাদে একবার ডেকে পাঠিয়েছেন জগৎ শেঠ। জরুরী চিঠি নিয়ে লোক এসেছে—পড়তে পড়তে বার বার ভুরু কুঁচকে উঠছিল কৃষ্ণচন্দ্রের। চিঠির শেষে আর একটা দুঃসংবাদ আছে। হোসেনকুলী খাঁকে মুর্শিদাবাদের পথের ওপর দিনের আলোয় টুকরো টুকরো করে কেটেছে মীর্জা মামুদ। এমন কি হোসেনকুলীর অন্ধ ভাইটা পর্যন্ত নিস্তার পায়নি, তাকেও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে। নওয়াজেস্ মহম্মদ নীরব, আলীবর্দী একটি আঙুল পর্যন্তও তোলেননি।

হোসেনকুলীর মৃত্যুতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই, নিজের মরণ অনেক দিন থেকেই সে ডাকছিল। কিন্তু মীর্জা মামুদ যদি এইভাবে সংক্ষেপে বিচার শেষ করতে শুরু করে দেয় নিজের হাতে, তাহলে এর শেষ কোথায়? এরপরে কার পালা আসবে? রাজবল্লভের? যে পাপে হোসেনকুলী প্রাণ হারিয়েছে—নিন্দুকে বলে তাতে রাজা রাজবল্লভেরও অংশ নিতান্ত কম নয়!

মহারাজের খাস কামরায় শুধু দেওয়ান গোপাল চক্রবর্তী ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। কৃষ্ণচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, 'কী করা যায় চক্রবর্তী?'

গোপাল কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন, 'আমার পরামর্শ যদি শোনেন, তাহলে এসব গণ্ডগোল থেকে যতটা পারা যায় দূরে থাকাই ভালো।'

'কিন্তু দূরে তো থাকা যাবে না চক্রবর্তী। এর সঙ্গে আমাদের সকলের স্বার্থই জড়িয়ে রয়েছে। বুড়ো নবাবের মনটা সরল, দুটো মিষ্টি কথাতেই গলে যায়। নইলে তুমি তো জানো, নবাব সরকারে যে খাজনা আমরা দিই, আরো অনেক বেশি টাকা আমাদের ঘাড়ে ধরে আদায় করতে পারত। তোষামোদেই কার্যসিদ্ধি। কিন্তু মীর্জা মামুদ অন্য ধরনের লোক—বুকে পা দিয়ে পাওনা টাকা কেড়ে নিয়ে যাবে, মিঠে কথায় ভোলবার পাত্র সে নয়।'

'তবু তো সে-ই নবাব হবে দুদিন পরে। আজ যদি তার শত্রুতা করেন, ক্ষমতা হাতে পেলে সে আর ছেড়ে কথা কইবে? তখন শুধু টাকাই নয়, গলাটাও কেটে নেবে তার সঙ্গে।'

'নবাব যাতে না হয় তাই দেখতে হবে আমাদের!'

'কে হবে তার বদলে?'

'আমরা সবাই নওয়াজেস মহম্মদের কথা ভাবছি।'

'নওয়াজেস মহম্মদ ?'

কৃষ্ণচন্দ্র ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন : 'হ্যাঁ, সেই যোগ্য লোক। ধীর, স্থির, মীর্জা মামুদের মতো হঠকারী নয়, বয়েস হয়েছে, বুদ্ধি-বিবেচনা আছে। দানধ্যান করে, মতিঝিলে তার এতিমখানার দরজা সকলের জন্যে খোলা, সবাই তাকে পছন্দ করে। আর সবচেয়ে বড়ো কথা, সে আমাদেরই হাতে রয়েছে।'

'কিন্তু মহারাজ'—গোপাল চক্রবর্তী কুণ্ঠিতভাবে বললেন, 'নিজের বেগমকে পর্যন্ত যে শাসন করতে পারে না, সে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার ভার বইতে পারবে ?'

কৃষ্ণচন্দ্র বিরক্ত হলেন। বললেন, 'সেইটেই তো আমাদের সুবিধে। আমরা ইচ্ছে-মতো তাকে চালাতে পারব। আচ্ছা চক্রবর্তী, তুমি এখন যাও। পরে ভেবেচিন্তে শেঠজীর চিঠির জবাব দেওয়া যাবে।'

গোপাল চক্রবর্তী বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, কয়েক পা গিয়ে থেমে দাঁড়ালেন।

'মহারাজ ব্যস্ত ছিলেন বলে এতক্ষণ বলিনি। ফরাসডাঙা থেকে একজন ব্রাহ্মণ দেখা করতে এসেছেন আপনার সঙ্গে। বলছেন, চৌধুরী মশাই তাঁকে পাঠিয়েছেন।'

'কী নাম ?'

'ভারতচন্দ্র রায়। মহারাজ নিজেই তাঁকে নাকি চরণ-দর্শনের আদেশ দিয়েছেন।'

কৃষ্ণচন্দ্র সোজা হয়ে বসলেন : 'আরে সেই কবি ? কোথায় সে ?'

'দরবারের বাইরে অপেক্ষা করছেন।'

'ডেকে পাঠাও—এখুনি ডেকে পাঠাও। লোকটার জিভে সরস্বতী বাস করেন হে, মুখে মুখে কী আশ্চর্য কবিতা যে রচনা করতে পারে, সে আমি তোমায় কী বলব ! যাও, সঙ্গে করে নিয়ে এসো এখানে—'

গোপাল চক্রবর্তী চলে গেলেন।

দরবারের বাইরে একটি কাঞ্চনগাছের ছায়ায় ভারতচন্দ্র চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হাওয়ায় একটি দুটি করে ফুল ঝরে পড়ছে গায়ে। সামনে দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে আসা-যাওয়া করছে ভোজপুরী আর বুন্দেলখণ্ডী সোয়ারের দল। তলোয়ার ঝনঝনিয়ে যাওয়া-আসা করছে কয়েকজন মোগল। দুজন ব্রাহ্মণ শাস্ত্র নিয়ে তর্ক করতে করতে চলে গেলেন। দেউড়িতে উঠছে নহবতের সুর। অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন ভারতচন্দ্র, এখনো রাজদর্শন হয়নি।

একটা তীক্ষ্ণ অপমানের কাঁটা বুকের মধ্যে বিঁধতে লাগল। কৃষ্ণচন্দ্রের বিশাল পুরী, অনেক ঐশ্বর্য—তবু ইন্দ্রনারায়ণের তুলনায় কিছুই নয়। অথচ চৌধুরী মশাইয়ের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে কাউকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এমন তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষা করতে হয় না—তাঁর দরজা অবারিত। আর এ রাজা-মহারাজার কাণ্ড—এখানে অনুগ্রহ চাইতে হলে কুকুরেরও অধম হয়ে আসতে হয়।

মনে পড়তে লাগল, নিতান্ত হা-ঘরের সন্তান তিনিও নন—তাঁর বাপ নরেন্দ্রনারায়ণকেও লোকে রাজা বলত। কিন্তু গ্রহের ফের, সব অন্যরকম হয়ে গেল, তাঁকেও আজ আর এক রাজার দরবারে এসে দাঁড়াতে হচ্ছে উমেদারের ভূমিকায়। তিলে তিলে এখানে আত্ম-সম্মানকে বিসর্জন দিয়ে যাব, দিনের পর দিন অমানুষ হয়ে যেতে হবে। আরো দশজন ইতরের সঙ্গে গলা মিলিয়ে তাঁকেও মাছির মতো ভন্‌ভন্ করে বলতে হবে : 'হাঁ মহারাজ,

ঠিকই বলেছেন। সূর্য পশ্চিমে ওঠে, পূবে অস্ত যায়!'

ইন্দ্রনারায়ণের কাছেও তিনি উমেদার ছিলেন; কিন্তু সেখানে মনের এই দীনতা কোথাও ছিল না।

মহারাজ কি সত্যিই দেখা করবেন তাঁর সঙ্গে, না ধুলোপায়ে বিদায় নিতে হবে এখান থেকেই? ফরাসডাঙার যে-সব সাধুবাদ শুনিয়ে কবিকে তিনি সভায় ডেকেছিলেন, সে-সব কি সত্যিই মনে আছে তাঁর? নাকি গঙ্গার জলে বজরা ভাসানোর সঙ্গে সঙ্গেই সব কথা নিঃশেষে ভুলে গেছেন?

ভারতচন্দ্র দাঁতে দাঁত চাপলেন। হাতে সেই হীরের আংটিটা এখনো রয়েছে, যেন আগুনের মতো জ্বলতে লাগল সেটা। রঘুনাথ হতচ্ছাড়াই তাঁর সর্বনাশ করল। বেশ ছিলেন বৈষ্ণবের দলে—সে-ই কুবুদ্ধি করে—! কিন্তু আর ফেরা যায় না। লীলাকে নতুন করে দেখেছেন, কথা দিয়েছেন তাঁকে নিয়ে নতুন করে সংসার পাতবেন। কিন্তু—

'রায় মশাই!'

ভারতচন্দ্র চমকে ফিরে চাইলেন। এক সম্ভ্রান্ত চেহারার ভদ্রলোক সামনে দাঁড়িয়ে। কোনো পদস্থ রাজকর্মচারী বলে মনে হল।

ভদ্রলোক বললেন, 'আমি মহারাজের সুহৃবতী দেওয়ান। মহারাজ খাসকামরায় এত্তেলা দিয়েছেন আপনাকে। আসুন আমার সঙ্গে।'

দরবার বসেছে পরদিন।

পাত্র-মিত্র নিয়ে সভা আলো করে বসেছেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র। পণ্ডিত গদাধর তর্কালঙ্কার একটি নতুন শ্লোকে রাজাকে বন্দনা করতে শুরু করেছেন, এমন সময় বাইরে একটা হৈ-হৈ আওয়াজ উঠল।

সকলেই সেদিকে তাকালেন। দারোয়ানেরা মুচকে হেসে দরজা ছেড়ে দিলে। মাথায় একটি বিরাট ঝাঁকা নিয়ে কুঁজো হয়ে দরবারে ঢুকল একটি ঝাঁকামুটে, সারা গা দিয়ে তার দর-দর করে ঘাম পড়ছে।

ঝাঁকার মধ্যে নিশ্চিন্তে বসে আছে ঘোর কালো রঙের গোলাকার একটি মনুষ্য। মুখভরা পরিতৃপ্তির হাসি।

সঙ্গে সঙ্গে সভায় কলধ্বনি উঠল: 'গোপাল ভাঁড়—গোপাল ভাঁড়।'

তিন-চারজন চেঁচিয়ে বললে, 'এই মুটে, ফেলে দে, ঝাঁকাসুদ্ধ ফেলে দে ওটাকে।'

ঝাঁকা নামল. গোপাল ভাঁড় উঠে এল তা থেকে।

কৃষ্ণচন্দ্র হাসলেন।

'এটা কী হল গোপাল!'

'আজ্ঞে একটু নতুন রকমের হল'—বলে মহারাজকে প্রণাম করে অম্লান মুখে সভায় আসন নিলে গোপাল।

'তা হোক। এবার ও বেচারার ভাড়াটা মিটিয়ে দাও।'

'ভাড়া আবার কিসের মহারাজ? ওর মাথায় চেপে আমি এলুম, সেই ফাঁকে ব্যাটার রাজদর্শন হয়ে গেল, এই তো ওর সাতপুরুষের ভাগ্যি। ভাড়া চাইবে কোন্ আক্কেলে?'

লোকটা তখনো হাঁপাচ্ছিল। কৃষ্ণচন্দ্র বক্‌শীকে বললেন, 'লোকটাকে একটা টাকা দিয়ে দাও।'

মুটে চলে গেল। কৃষ্ণচন্দ্র বললেন, 'গোপাল, এ টাকা তোমার মাসোহারা থেকে কাটা যাবে।'

'তা যাক মহারাজ। কাল ওকে আবার আমিই ঝাঁকায় করে নিয়ে আসব। এক টাকা বকশিশ মিলবে, উশুল হয়ে যাবে সব।'

'আচ্ছা হয়েছে, থামো এখন।'

গদাধর তর্কালংকার আবার দাঁড়িয়ে উঠে মহারাজার বন্দনা শেষ করলেন। সভায় কয়েকজন বললেন, 'সাধু সাধু, অতি সুললিত রচনা।' গোপালের মন্তব্য শোনা গেল : 'অং-বং-কং!' গদাধর কেবল একবার ভ্রূকুটি করে তাকালেন তার দিকে—কোনো জবাব দিলেন না।

ভারতচন্দ্র চুপ করে বসে ছিলেন এতক্ষণ। মহারাজ কালই আপ্যায়ন করে তাঁকে পারিষদরূপে নিয়োগ করেছেন, বেতন আপাতত চল্লিশ টাকা, প্রাসাদের কাছেই একটি বাসা এবং সিধেরও বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। এখন লীলাকে নিয়ে আসা যায়, সংসার-যাত্রাও হয়তো একভাবে নির্বাহ করা চলে। কিন্তু এই মানুষগুলোর সঙ্গে থাকতে হবে তাঁকে? হাসতে হবে এই গোপাল ভাঁড়ের রসিকতায়? এরই মধ্যে কাটাতে হবে দিনের পর দিন? ভারতচন্দ্রের মুখে মেঘ ঘনিয়ে এল।

'ভারত!'

ভারতচন্দ্র চকিত হয়ে উঠলেন। মহারাজ তাঁকেই ডাকছেন। উঠে দাঁড়ালেন আসন ছেড়ে।

'ভারত, তোমাকে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই'—একে একে পাত্র-মিত্র, আত্মীয়-কুটুম্বের নাম করে যেতে লাগলেন মহারাজা, তারপর বললেন, 'ইনি ভুরশুট রাজবংশের ছেলে ভারতচন্দ্র রায়। হিন্দী, ফার্সী, সংস্কৃত, নানা ভাষায় পণ্ডিত। কিন্তু তার চাইতেও বড়ো পরিচয় এঁর আছে। ইনি অতি সুকবি। মুখে মুখে চমৎকার কবিতা রচনা করতে পারেন। আমি এঁকে সভাসদ নিযুক্ত করেছি।'

সভার সকলে বললেন, 'সাধু—সাধু।'

শুধু গোপাল প্রশ্ন করল, 'কী বললেন মহারাজ? সুকপি?'

'আঃ, গোপাল!'

গোপাল বললে, 'মহারাজ, আমার জিভে একটু দোষ আছে, ব আর প-এর উচ্চারণ সব সময় ঠিক থাকে না। ইনি নতুন লোক, দু'দিন পরেই সব বুঝতে পারবেন। তা ইনি যদি সত্যিই কপি, আমাদের দু-একটা কবিতা শোনাতে আজ্ঞা হোক।'

কৃষ্ণচন্দ্র হাসলেন।

'বেশ তো। কিছু তৈরী আছে ভারত? শোনাও এঁদের।'

মনের ভেতর স্তূপাকার বিতৃষ্ণাকে বিনীত হাসিতে পরিণত করলেন ভারতচন্দ্র, বৈষ্ণবদের সঙ্গে কাল কাটিয়ে অন্তত এটুকু লাভ তাঁর হয়েছে। মাথা নামিয়ে বললেন, 'কী কবিতা শোনাব মহারাজ? সংস্কৃত?'

গোপালই মাঝখান থেকে ফোড়ন কাটল : 'না মশাই, ও অং-বং-কং নয়। তর্কাল-

ঙ্কার মশাই, সিদ্ধান্ত মশাই দিনরাত ওসব শুনিয়ে শুনিয়ে মাথা খারাপ করে দিয়েছেন।'—গোপালের চোখ পিট পিট করে উঠল : 'আপনি তো অনেক ভাষা জানেন —না? হিন্দী—সমস্কেত—ফার্সী? ঠিক আছে। সব ভাষায় মিলিয়েই আমাদের একটা কবিতা শোনান।'

মহারাজার পিসেমশাই শ্যামসুন্দর চাটুজ্জে আফিঙের নেশায় এই সকালবেলাতেই অল্প অল্প ঝিমুচ্ছিলেন। এবার তিনি আরক্তিম চোখ দুটি মেলে একটা ধমক দিলেন গোপালকে।

'আঃ, বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে, গোপাল! ইনি আজ প্রথম সভায় এসেছেন, কী ভাবছেন বলো দেখি!'

ভারতচন্দ্রের মুখের রেখাগুলো ক্রমশ শক্ত হয়ে উঠছিল। বললেন, 'আজ্ঞে না, আমি কিছুই ভাবিনি। আচ্ছা, চেষ্টা করা যাক। দেখি, উনি যেমনটা বলছেন, সেরকম পারা যায় কিনা।'

কৃষ্ণচন্দ্র বললেন, 'ওর পাগলামিতে কান দিয়ো না, ভারত। তুমি একটা বাংলা কবিতাই বলো।'

'মহারাজ, বাংলা কবিতা তো আছেই।'—ভারতচন্দ্র জোর করে হাসলেন : 'তা ইনি যখন নতুন রকম কিছু শুনতে চাইছেন, তখন এঁকেই বা একেবারে নিরাশ করি কেন! আমাকে একটু সময় দিন, চেষ্টা করে দেখি।'

কয়েক লহমা চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইলেন ভারতচন্দ্র। তারপর আরম্ভ করলেন :

'শ্যাম হিত প্রাণেশ্বর
বায়দকে গোয়দ রুবর
কাতর দেখে আদর কর
কাহে মর রো রোয়কে।
বক্তুং বেদং চন্দ্রমা
ছুঁ লালা চে রেমা
ক্রোধিত পর দেও ক্ষমা
মেট্রিমে কাহে শোয়কে।
যদি কিঞ্চিৎ ত্বং বদসি
দর জানে মন আয়ৎ খোসি
আমার হৃদয়ে বসি
প্রেম কর খোস হোয়কে—'

আর বলতে হল না। একলাফে উঠে দাঁড়ালো গোপাল ভাঁড়।

'সাবাস—সাবাস—সাবাস। আর বলতে হবে না হে, এতেই আমাদের মাথায় কুমোরের চাকের চক্কর লাগিয়ে দিয়েছ! কী নিদারুণ কবিতাই শোনালে, যেন মনে হল, মগজের ভেতরে ভগবন্ত সিং গোটাকয়েক তোপ দাগল! পায়ের ধুলো দাও খুড়ো—পায়ের ধুলো দাও!'

একজন বললে, 'খুড়ো! খুড়ো আবার কোন্ সুবাদে হে গোপাল?'

'ভক্তির সুবাদে। কপি তো নয়—ইনি একেবারে মহাকপি জাম্বুবান। আমার

জাম্ববান খুড়ো।'

ভারতচন্দ্রের ঠোঁটের কোণে তীক্ষ্ন হাসির ঝলক ফুটে উঠল। বললেন, 'ভারী খুশি হলুম ভাইপো—জাম্ববান খুড়োকে ঠিক চিনে নিয়েছ বলে। তা তোমার বাবা—দাদা হনুমান ভালো আছেন তো?'

রসিক গোপাল ভাঁড় একটা খাবি খেলো, সঙ্গে সঙ্গে যেন চুপসে গেল খানিকটা। আর হাসির রোল উঠল সভায়। সবচাইতে বেশি করে হাসলেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং।

রাজদরবারকে প্রথম চিনলেন ভারতচন্দ্র; দরবার চিনল ভারতচন্দ্রকে।

॥ সাত ॥

'জো রহীম উত্তম প্রকৃতি,
    কা করি সকত কুসংগ,
চন্দন বিষ ব্যাপত নহীঁ
    লপটে রহত ভুজংগ—'

বাদশা আকবরের সভাসদ রহীম খানখানান আশ্বাস দিয়েছিলেন নিজেকে। আমার সত্যে আমি স্থির হয়ে থাকব—কে আমার চিত্ত-বিকার ঘটাতে পারে? রাজার সভা যেমনই হোক—আমি আত্মস্থ থাকব, আমি কবিতা লিখব, আমি সত্যিকারের রাজকবি হয়ে উঠব। "জো রহীম মন হাথ হ্যায়, তো তন কহুঁ কিন জাহি—"

কিন্তু আত্মবিশ্বাস কিছুতেই থাকতে চায় না। একটা বিস্বাদ শূন্যতা ক্রমাগত মাথার ভেতরে ঘুরপাক খেতে থাকে।

দিনের পর দিন মহারাজার কৃপাদৃষ্টি বেশি করে পড়ছে ভারতচন্দ্রের ওপর। সকালে সন্ধ্যায় দুবেলা হুজুরে হাজির হতে হয়। সকালের দরবারে অনেক লোকের ভিড়ের মধ্যে বসে থাকতে হয় পারিষদের ভূমিকায়; সন্ধ্যায় ডাক পড়ে মহারাজের খাসকামরায় —সেখানে বলরাম, হরষিত, শংকর ইত্যাদি জনকয়েক অন্তরঙ্গ ছাড়া আর বিশেষ কেউ থাকে না। তখন নতুন নতুন কবিতা শোনাতে হয় মহারাজকে। গুরুগম্ভীর জিনিস মহারাজ পছন্দ করেন না। বলেন, এমনিতেই তো দুর্ভাবনার অন্ত নেই হে, তার ওপর আবার ও-সব ভারী ভারী ব্যাপার কেন? একটু হালকা ধরনের কিছু শোনাও—যাতে মন প্রসন্ন হয়।'

সুতরাং রাজার মন প্রসন্ন করতে হয়। তাতে কবিতা না হোক, ইয়ার্কির আবহাওয়াটা চমৎকার জমে ওঠে। ভারতচন্দ্র মধ্যে মধ্যে ভাবতে চেষ্টা করেন, আসলে তাঁর সঙ্গে গোপাল ভাঁড়ের তফাৎ কোথায়? দুজনে একই পথের যাত্রী—একই উপজীবিকা। দিনের পর দিন বুদ্ধি-বিদ্যা-মনুষ্যত্বের গণিকা-বৃত্তি। শেষ পর্যন্ত এই পরিণামই তিনি বেছে নিলেন!

ইন্দ্রনারায়ণকে মনে পড়ে। উমেদারি সেখানেও ছিল। কিন্তু কত তফাৎ।

মহারাজ সম্প্রতি ক'দিনের জন্যে মুর্শিদাবাদে গেছেন। আপাতত ছুটি। নিজের বাসাটিতে বসে ভারতচন্দ্র ভাবছিলেন, কী করা যায়। সামনের উঠোনে মাধবীলতার কুঞ্জে দুটি টুনটুনি বাসা বাঁধবার চেষ্টা করছিল—ছোট ছোট গাছপালাতেই ওদের ঘর

বাঁধার ঝোঁক। ভারতচন্দ্র লীলার কথা চিন্তা করছিলেন।

তাকে আনা যায় এখানে ?

মাইনে যাই হোক, কষ্টেসৃষ্টে দিনযাপন হয়তো করা চলে। কিন্তু এই কৃষ্ণনগরে ? যেখানে দিনের পর দিন ইয়ার্কি জমিয়ে রাজাকে খুশি রাখতে হয়, বলরাম-শঙ্কর-গোপাল ভাঁড়ের সঙ্গ দিতে হয়—সেখানে ?

মন সাড়া দেয় না। কী বলবে তাঁকে লীলা ? বলবে, 'তুমি বিদ্বান, তুমি কবি, শেষ পর্যন্ত এই রাস্তাই বেছে নিলে ? তাহলে এত শাস্ত্র পড়বার কী দরকার ছিল ? গোপাল ভাঁড়কে তো কিছুই পড়তে হয়নি, শুধু ইয়ার্কি দিয়েই সে রাজার চোখের মণি হয়ে উঠেছে !'

না, পারবেন না। লীলার কাছে এত ছোট হয়ে যাওয়া কল্পনাই করা চলে না।

টুনটুনি দুটো মাধবীলতার ঝোপে বাসা বাঁধছে—বেশ আছে ওরা। কবে ঘর বাঁধা হবে ভারতচন্দ্রের ? ভবিষ্যতের দিকে একবার ছড়িয়ে দিলেন চোখের দৃষ্টি, কিছু দেখা যায় না—শুধু একরাশ শূন্যতা যেন হা-হা করছে সেখানে।

মনে পড়ল, আজ মাসোহারা নেবার দিন। একটা নিঃশ্বাস ফেলে উঠে পড়লেন। চাদরটা জড়িয়ে নিয়ে চললেন দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্তিরের সদর কাছারীতে। এসব বিলি-ব্যবস্থা রঘুনন্দনই করেন।

পাইক-পেয়াদা লোক-লস্করে কাছারী জমজমাট। রাজজ্যোতিষী অনুকূল বাচস্পতি বেরিয়ে যাচ্ছিলেন কাছারী থেকে—একই উদ্দেশ্যে এসেছিলেন নিশ্চয়। ভারতচন্দ্রকে দেখে তাঁর কপালে ভ্রূকুটি ঘনিয়ে এল।

'প্রণাম বাচস্পতি মশাই।'

'জয় হোক।'—বিস্বাদ গলায় বাচস্পতি বললেন, 'ভালো তো ?'

'আপনাদের আশীর্বাদে একরকম চলছে।'

'তা বেশ, বেশ।'—বাচস্পতি যাওয়ার জন্যে পাশ কাটালেন।

'দেওয়ানজী আছেন কাছারীতে ?'

'আছেন—যাও।'—হাতের লাঠিটা ঠুকঠুক করে বয়েসের তুলনায় অনেক বেশি দ্রুত-গতিতে বাচস্পতি এগিয়ে গেলেন। কয়েক মুহূর্তের জন্যে উন্মনা হয়ে থেমে দাঁড়ালেন ভারতচন্দ্র। এই আর এক অস্বস্তি। ভারতচন্দ্র দিনের পর দিন অতিমাত্রায় রাজার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠছেন এই ব্যাপারটাই এঁদের পক্ষে প্রায় অসহ্য। সভায় জ্ঞানী-গুণী-পণ্ডিত যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের একটা চাপা অপ্রীতি মনের কাছে কখনো গোপন থাকে না। তিনি যেন হঠাৎ বাইরে থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন, যেন অন্যায়ভাবে এঁদের অধিকারে হাত বাড়িয়েছেন।

কথায় কথায় একদিন দুঃখ করেছিলেন রাজবৈদ্য গোবিন্দরাম রায়। তাঁর বাড়ি বাঙাল দেশে—যেখানে বিষ্ণুচক্রে সতীর নাসিকা ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, সেই সুগন্ধা তীর্থে। এ নিয়ে কবিরাজ মশায়ের মনে কিছু গর্বও আছে। কিন্তু বাঙাল বলে প্রতি মুহূর্তে তাঁকে নানান ঠাট্টা-তামাসা সইতে হয়।

'অ কবিরাজ মশয় ! অইদ্য কী বোজন আইলো ? হুক্কুতা খাইছেন ?'

বলরাম একদিন দরবারে বলেছিল, 'কবিরাজ মশায়ের ওষুধ মরা মানুষকে বাঁচায়,

তাঁর আশীর্বাদে জ্যান্ত মানুষ মারা যায়।'

কবিরাজের মুখ লাল হয়ে উঠেছিল : 'ক্যান্ ?'

'কেউ প্রণাম করলে বলবেন—শতায়ুভবঃ। কিন্তু বাঙালের মুখ দিয়ে তো আর শতায়ুঃ বেরুবে না, বেরুবে হতায়ুঃ ? ব্যাস—গেল ! এক আশীর্বাদেই ইহলোকের রাস্তা পরিষ্কার !'

কবিরাজ ক্ষোভ করে বলেছিলেন, 'মশয়, অ্যারগো ব্যাবাক্ ভালো, ক্যাবল বাইরের মানুষ দ্যাখলেই হ্যারে কাউয়ার মত ঠোকরাইতে থাকে। ক্যান্—বাঙাল বলিয়া কি আমরা মনুষ্য না ? নাকি বইন্যার জলেই আমরা ভাইস্যা আইছি ?'

ভারতচন্দ্র বাঙাল নন, কিন্তু বিদেশী। তার ওপর মহারাজের বিশেষ অনুগ্রহভাজন। বিরক্তির কাঁটাগুলো বেশিক্ষণ লুকিয়ে থাকে না, যখন তখন আত্মপ্রকাশ করে। একটা নিঃশ্বাস ফেললেন ভারতচন্দ্র, তারপর কাছারীতে পা দিলেন।

রঘুনন্দন ডাকলেন, 'আসুন রায় মশায়, আসুন।'

ভারতচন্দ্র তাঁর পাশে ফরাসে গিয়ে বসলেন।

'আপনার মাসোহারা তো ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, সেইজন্যেই আসা।'

বাক্স খুলে রঘুনন্দন টাকা গুনতে লাগলেন। টাকা গোনা হলে আবার গুনলেন, নিশ্চিত হওয়ার জন্যে তৃতীয়বার গুনে দেখলেন। শেষে খাতা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'সই করুন—'

'শ্রীভারতচন্দ্র রায় দেবশর্মণঃ—'

টাকা নিয়ে উঠতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় বাইরে কোলাহল শোনা গেল। রঘুনন্দন মিত্তির চোখ তুলে তাকালেন উঠোনের দিকে, ভারতচন্দ্রের দৃষ্টিও পড়ল সঙ্গে সঙ্গে।

সিপাহীদের জমাদার মামুদ জাফর চিৎকার করে বলছে : 'চুপ রহো—চুপ রহো—সব বৈঠ্ যাও হিঁয়াপর। ফয়শালা পিছে হোগা।'

প্রায় ত্রিশ-চল্লিশজন চাষী প্রজা। পনেরো-ষোলো বছরের কিশোর থেকে সত্তর বছরের বুড়ো পর্যন্ত আছে তাদের ভেতর। উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা, বিবর্ণ মুখ, চোখভরা আতঙ্ক। অনেক দূর থেকে এসেছে মনে হয়, দু-একদিনের মধ্যে বিশেষ কিছু খেতে পেয়েছে বলেও বোধ হয় না। গা-ভর্তি ধুলো, দু-একজনের পা-টাও কেটে-ছড়ে গেছে, ধুলোর সঙ্গে জমে আছে কালো কালো রক্তের বিন্দু। লোকগুলো হাঁপাচ্ছে।

শুধু ওইটুকুই নয়। দড়ি দিয়ে তাদের হাত শক্ত করে বাঁধা। একদল পাইক লাঠি হাতে ঘিরে আছে তাদের।

কে যেন ভাঙা গলায় বলতে চাইল : 'একটু জল—'

মামুদ জাফর উঠোন কাঁপিয়ে ধমক দিলে : 'ঠহ্‌রো উল্লুকা বাচ্চা !'

কিছুক্ষণ নির্বাক দৃষ্টিতে ভারতচন্দ্র চেয়ে রইলেন লোকগুলোর দিকে।

'এরা কারা দেওয়ানজী ?'

রঘুনন্দন বললেন, 'ধাড়ী বজ্জাত সব।'

'বজ্জাত কেন ?'

'অবাধ্য প্রজা।'

'অবাধ্য ? কই—দেখে তো সেরকম মনে হয় না !'

'তা মনে হবে কেন ?'—রঘুনন্দন মুখভঙ্গি করলেন : 'বাইরে থেকে যত সাদাসিধে সরল দেখছেন, ভেতরে ভেতরে আদৌ তা নয়। গেঁয়ো চাষী কিনা, চেহারায় তাই নিপাট ভালোমানুষ, আসলে ব্যাটারা শয়তানের একশেষ।'

'কী করেছে বলুন তো ?'—লোকগুলোর ক্ষুধিত ক্লান্ত মুখের দিকে চেয়ে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হল না।

'কী আবার করবে ?'—ভ্রূকুটি করে রঘুনন্দন বললেন, 'গ্রামসুদ্ধ লোক এককাট্টা হয়েছে। বলে, সরকারী খাজনা দেবে না।'

'খাজনা দেবে না কেন ?'

রঘুনন্দন মিত্তির কঠিন হাসি হাসলেন : 'এত পুঁথি-পত্তর পড়েছেন মশায়, দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না, একথা কখনো শোনেননি ? এরা বলছে, বর্গীর হাঙ্গামায় সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে, খাজনা দিতে পারবে না।'

'বর্গীর হাঙ্গামা তো এখন দেশে নেই।'

'তা নেই। কিন্তু এরা বলছে, মারাত্মক অতিবৃষ্টি হয়েছে এ-বছর। যা ফসল ক্ষেতে ছিল, হেজে নষ্ট হয়ে গেছে। গতবারও চাষ হয়ই নি বলতে গেলে।'

ভারতচন্দ্র বললেন, 'কথাগুলো তো মিথ্যে নয় ?'

'আপনি বিশ্বাস করেন নাকে ?' কবিমানুষ মশায় আপনারা'—রঘুনন্দনের স্বর বিষাক্ত হয়ে উঠল : 'একটুতেই মন গলে যায় আপনাদের। আপনাদের মতো সাদাসিধে হলে কি আর জমিদারী করা চলত, সব লাটে উঠে যেত কোনদিন। আচ্ছা, আপনিই বলুন তো—চেহারা দেখে মনে হয় ব্যাটারা কচুঘেঁচু খেয়েই বেঁচে রয়েছে ?'

রাজভোগ খেয়ে মোটা হচ্ছে, লোকগুলোকে দেখে এমনও মনে হওয়ার কারণ নেই। কিন্তু এ নিয়ে কথা বাড়িয়ে লাভ হবে না। ভারতচন্দ্র লোকগুলোর অসহায় শূন্য চোখের দিকে আর চাইতে পারলেন না, দৃষ্টি নামিয়ে নিলেন।

'শয়তান—আদত শয়তান সব !' রঘুনন্দন গজরাতে লাগলেন।

মৃদু গলায় ভারতচন্দ্র বললেন, 'কিন্তু ধরে এনে কী লাভ হবে ?'

'আখ-মাড়াইয়ের জাঁতায় ফেলব। রস আপনি বেরুবে।'

'আর আখ যদি ছিবড়ে হয় ?'

'ছিবড়ে থেকেও রস আমরা বের করতে জানি—' আবার নিষ্ঠুর হাসি হাসলেন রঘুনন্দন।

ভারতচন্দ্র চুপ করে রইলেন। এরপরে আর কোনো কথাই বলবার নেই।

'হাজতে বন্ধ করে রাখব। বুকে বাঁশ-ডলা দেওয়া হবে। পিটিয়ে জোড়া হাড় ভেঙে দেব। খাজনা বেরিয়ে আসবে সুড়সুড় করে।'—রঘুনন্দন একবার আড়চোখে তাকালেন ভারতচন্দ্রের দিকে : 'আপনার এসব শুনতে নিশ্চয় খুব খারাপ লাগছে ?'

ভারতচন্দ্র বললেন, 'আমার ভালো লাগা খারাপ লাগায় কী আসে যায় ? যে কাজের যে নিয়ম !'

'যা বলেছেন।'—রঘুনন্দন মাথা নাড়লেন : 'যে কাজের যা নিয়ম। আরে মশাই, আমরা কি একেবারে অমানুষ, না দয়াধর্ম করতে জানি না ? কিন্তু কী করা যাবে ?

আমরা এদের ছাড়তে পারি, কিন্তু মুর্শিদাবাদের সরকার তো আমাদের ছেড়ে কথা কইবে না। জানেন বোধ হয়, একবার বারো লক্ষ টাকা খাজনার দায়ে বুড়ো নবাব কী হেনস্থা করেছিল মহারাজের? তাই কড়া হুকুম আমাদের ওপর, প্রজারা মরুক বাঁচুক, রসাতলে যাক—টাকা আমাদের আদায় করতেই হবে।'

'ওঃ।'

'তারপর দেখুন, সামনে দুর্গোৎসব আসছে, তার এক এলাহী খরচ। মহারাজার বাড়ির দুর্গাপুজো আপনি কখনো দেখেননি, এমন প্রতিমা মশাই কোথাও হয় না, এত ঘটা ভূভারতে কোথাও দেখতে পাবেন না আপনি। তবু তো ইচ্ছেমতো সব করা যায় না, ধুমধামের মাত্রা বেশি হলে নবাব মনে করে, লোকটা অনেক পয়সা করেছে, সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়ে দেয় খাজনা, নয়তো কয়েক লক্ষ টাকার নজরানা চেয়ে বসে। তা-ও কম-সম করেই কি সোজা খরচা! পুজোর আর সব বাদ দিলেও তিনদিনে একশো মোষ পড়ে, পাঁটার রক্তে বান ডেকে যায়। সে-সব খরচ কোত্থেকে আসে বলুন?'

: দেখুন—'

রঘুনন্দনের কথা থেমে গেল মাঝপথেই। সেই লোকটাই বোধহয় জলের জন্যে একবার গোঙিয়ে উঠেছিল, 'শালা শুয়োরকে বাচ্চা'—বলে সজোরে একটা লাথি তার পেটে বসিয়ে দিলে জাফর।

ভারতচন্দ্র আর সহ্য করতে পারলেন না। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'মিত্তির মশাই, আমি এখন যাই।'

'আসুন—আসুন। প্রণাম।'

এই রাজা—এই রাজত্ব! আখ-মাড়াইয়ের জাঁতায় ফেলে রস বের করতে হয়, নইলে রাজস্ব আদায় হয় না, রাজার ঠাট থাকে না, চূড়োয় চূড়োয় নিশান কাঙরা ঘড়ি শোভা পায় না, তোরণে নহবৎ বাজে না। অথচ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র দয়াধর্ম করেন, সমাজ প্রতিপালন করেন, দেশজোড়া পণ্ডিতদের মাসোহারা দেন,—ধার্মিক বলে তাঁর খ্যাতি আছে, নবদ্বীপের বিখ্যাত আগমবাগীশ বংশের কাছে দীক্ষা নিয়ে পরম কালীভক্ত মহারাজা তন্ত্র-সাধনাও করে থাকেন।

অথচ—

অথচ এই চল্লিশ টাকার মাসোহারা, রাজদরবারে খাতির, থালায় সাজানো সিধে—সব কিছু এক মুহূর্তে নিজের কাছে বিস্বাদ মনে হল। এদের সব কিছুর উৎস নিজের চোখেই তিনি এই মুহূর্তে দেখে এসেছেন। তাঁর বাপ নরেন্দ্রনারায়ণও কী এইভাবে প্রজা-পীড়ন করতেন? ঠিক মনে পড়ে না, তখন তিনি নিতান্ত বালক ছিলেন। তারপর লেখাপড়া শেষ করে বাড়ি ফিরে উকিল হয়ে তাঁকে বর্ধমানে যেতে হল। সেখান থেকে—

সব ঐশ্বর্য কি এমন করে—এই পথ দিয়েই আসে? এমনভাবেই কি ভগবান ভাগ্যবানদের অনুগ্রহ করেন? তাহলে মগ-হার্মাদ-বর্গীর ওপর অভিমান করা কেন? বর্গীরাও তো ধার্মিক, তারাও তো 'হর হর মহাদেও' ধ্বনি তুলে গ্রামের পর গ্রাম লুঠতে আসে। মেয়েদের ঘর থেকে টেনে নিয়ে যাওয়ার সময় তারাও ভক্তিভরে মন্দিরে

প্রণাম করে যায় ?

বর্গীর ওপর রাগ কেন ? বড়লোকের গায়ে আঁচড় লাগে বলে ?

দূর হোক, এসব ভাবনা তাঁর নয়। তিনি রাজ-বয়স্য, রাজাকে খুশি রাখাই তাঁর কাজ।

বাসায় পা দিতেই একগাল হেসে তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল রঘুনাথ পরামানিক।

'কর্তা, ভালো আছেন ?'

ভারতচন্দ্র ভ্রূকুটি করলেন।

'হতভাগা, তুই এখানে !'

'আজ্ঞে, চলে এলুম।'

'চলে এলি ? তুই না বলেছিলি, বুড়ো হয়ে যাচ্ছিস—এবার জাত-ব্যবসা করবি, জমি-জিরেত দেখবি, দুনিয়া চষে চষে তোর অভক্তি হয়ে গেছে ? তাহলে আবার এসে জুটলি কেন এখানে ?'

রঘুনাথ বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না : 'আজ্ঞে শ্রীচরণ দর্শন না করে আর থাকতে পারলুম না।'

'ওঃ, ভক্তি কত ! তা চরণদর্শন তো হল, এবার বাড়ি যা।'

'এজ্ঞে, বাড়ি যাব কী !'—রঘুনাথের মুখ আবার হাসিতে ভরে উঠল : 'আর এখান থেকে নড়ছিনি। বাসাটি ছোট্ট, কিন্তু দিব্যি। আর শহর বটে কেষ্টনগর ! যেন পটে আঁকা ছবিটি, দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। তা এইবার বাকী কাজটুকুও করুন ছোট কর্তা, ঝটপট মা-ঠাকরুণকেও এখানে নিয়ে আসুন, আমি লক্ষ্মীনারায়ণের যুগল রূপ দেখে কেতাখ হই।'

একবারের জন্যে উন্মনা হলেন ভারতচন্দ্র। লীলা !

'সেই লক্ষ্মীই বুঝি তোকে দূত করে পাঠিয়েছে এখানে ?'

'আজ্ঞে না। তিনি রইলেন সেই কোথায় সারদাতে, আমি আসছি পেঁড়ো থেকে।'

'তবে সেই পেঁড়োতেই রওনা হও আবার।'

'আমি নড়লে তো !'

রাগ করতে গিয়েও ভারতচন্দ্র হেসে ফেললেন।

'আমি তো কাজের লোক একজন রেখেছি। দুজনকে আমি পুষতে পারব না।'

'আমাকে পোষবার জন্যে আপনাকে খরচ করতে হবে না। পাত-কুড়োনো খেলেই আমার পেট ভরবে।'

'তুই কি না মরা পর্যন্ত আমার সঙ্গ ছাড়বিনে রঘু ?'

'আজ্ঞে না। বয়েসে তো বড়ো, আপনার আগেই যাব বলে আশা আছে। আর ওপারে গিয়েই আপনার গাড়ু-গামছা সব গুছিয়ে রাখব—নইলে সঙ্গে সঙ্গেই লোক আপনি পাবেন কোথায় ?'

ভারতচন্দ্র আবার হেসে ফেললেন। তারপর চাদরের খুঁট থেকে বের করলেন টাকাগুলো।

'নে, তবে এগুলো তুই-ই রাখ্। মাস চালাতে হবে। টাকা পয়সার হিসেব আমি রাখতে পারি না, ভালোও লাগে না। তোরই জিম্মায় রইল। কিন্তু দেখিস, বেশি

চুরি-চামারি করিসনি।'

'আজ্ঞে সেজন্যেই তো বলি, মা-ঠাকরুণকে—'

'বেশি বকিস্‌নি। তাহলে কালই সিপাই সর্দার জাফরকে দিয়ে তোকে খড়ে পার করিয়ে দেব। জ্বালাতে যখন এসেইছিস, তখন সব দেখেশুনে নে—আমি ঘুরে আসছি একটু।'

আবার পথ। নবদ্বীপ ছেড়ে কৃষ্ণনগরে নিজের নামে শহর পত্তন করেছেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র—মনের মতো করে সাজিয়েছেন। অবশ্য ফরাসডাঙার সঙ্গে কোনো তুলনা হয় না, সে জাঁকজমক, সেই গমগমে বাজার, সেই দেশ-বিদেশের মানুষ, হাজার হাজার দালান-কোঠা, সেই আকাশছোঁয়া অরুলেয়্যার কেল্লা, গঙ্গার ঘাটে জাহাজ আর নৌকোর সার, তার চেহারাই আলাদা। তবু কৃষ্ণনগরের শোভাও দেখবার মতো। ফরাসডাঙা যেন বাজার, কৃষ্ণনগর যেন বাগানবাড়ি। মনোরম রাজপ্রাসাদ, পাত্র-মিত্র, রাজার আত্মীয়স্বজনের সাজানো-গোছানো বাড়ি, পুকুর, মন্দির; দোকান-বাজার, রং-বেরঙের মিঠাই, কত রকমের মাটির পুতুল; তাঁতী-কাঁসারী-স্বর্ণকার-শাঁখারী; এমন কি একদল গণিকা পর্যন্ত এসে জাঁকিয়ে বসেছে।

একটা পুতুলের দোকানের সামনে দাঁড়ালেন কিছুক্ষণ। রাধাকৃষ্ণের একটি যুগলমূর্তি বড়ো ভালো লাগল, শাক্তবংশের ছেলে হয়ে তান্ত্রিক মহারাজের আশ্রয়ে থেকেও বৈষ্ণব ভাবটা মন থেকে একেবারে যায়নি। কিন্তু সঙ্গে পয়সা ছিল না, যুগল-মূর্তিটি কেনা গেল না। একবার তুলে দেখেই নামিয়ে রেখে যাওয়ার জন্যে পা বাড়ালেন।

দোকানী বললে, 'কী হল ঠাকুরমশাই, নিলেন না?'

'আজ থাক।'

'বউনির সময়, নিয়ে যান। যা ইচ্ছে তাই দিন।'

'একটাও পয়সা নেই আমার কাছে, কিছু মনে কোরো না'—ভারতচন্দ্র লজ্জিতভাবে এগিয়ে চললেন।

কয়েক পা যেতেই পেছন থেকে ডাক এল: 'ঠাকুরমশাই!'

চমকে ফিরে চাইলেন ভারতচন্দ্র। অল্পবয়েসী একটি রূপবতী মেয়ে। ঠোঁটে টুকটুকে পানের রং, কপালে টিকুলি, পরনে রঙিন পাছা-পাড় শাড়ি, দু হাতে সোনার দুটি ভারী কঙ্কণ। দেখবামাত্র বুঝতে বাকী রইল না, মেয়েটি রূপোপজীবিনী।

কী বিপদ! এ আবার তাঁকে ডাকে কেন?

'একটু দাঁড়িয়ে যাবেন ঠাকুরমশাই।'—মেয়েটি চলার গতি বাড়িয়ে তাঁর সামনে চলে এল।

'কী চাই তোমার?'

আঁচলের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ছোট সেই যুগলমূর্তিটি।

'এইটি নিয়ে যান আপনি।'

আশ্চর্য হয়ে ভারতচন্দ্র চেয়ে রইলেন মেয়েটির দিকে। মেয়েটি ঠোঁট টিপে হাসল, চঞ্চল চোখ দুটো আলো-পড়া জলের মতো চিকচিক করে উঠল।

'কেন নেব তোমার জিনিস?'

'ঠাকুর, আমি পাপীয়সী হতে পারি, কিন্তু এ তো দেবতার মূর্তি। নিতে দোষ নেই।'

ভারত বুঝতে পারলেন, কাছাকাছিই কোথাও দাঁড়িয়েছিল মেয়েটি, তাঁকে লক্ষ্য করছিল। হোক দেবতার মূর্তি, কিন্তু গণিকার দান—ভারতচন্দ্র দু পা পিছিয়ে গেলেন।

'ও তুমিই রাখো।'

'ঠাকুর, আপনি শাস্ত্র জানেন, আপনি কবি। আপনার দেবতারও যে আচার-বিচার আছে সে তো বুঝতে পারিনি!'

ভারতচন্দ্র থমকে দাঁড়ালেন।

'তুমি কি আমাকে চেনো?'

মেয়েটি আবার মুখ টিপে হাসল, কথাটার জবাব দিলে না। তারপর বললে, 'এটা আপনি নেবেন না?'

এক মুহূর্তের দ্বিধা করে ভারতচন্দ্র বললেন. 'দাও।'

মূর্তিটি হাতে তুলে দিয়ে মেয়েটি গলবস্ত্রে প্রণাম করল ভারতচন্দ্রকে।

'চিরজীবিনী হও।'

'ও আশীর্বাদ করবেন না—আমাদের আয়ু বাড়লে সংসারের পাপ বাড়ে। দাসীর নাম চন্দ্রাবলী। সাহস করে তো আর কুঞ্জে যেতে বলতে পারি না, যদি কৃপা হয়, নামটি স্মরণে রাখবেন।'

ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে গেল। ভারতচন্দ্র দাঁড়িয়ে রইলেন। একবারের জন্যে তাঁর মনে পড়ে গেল বিদ্যাধরীকে। কোথায় যেন মিল আছে দুজনের ভেতরে—কিছুটা বোঝা যায়, সবটা যায় না।

।। আট ।।

কৃষ্ণনগরে দুর্গোৎসব এসে পড়ল।

ঢাকী-শানাইদার-কাঁশিওলা আসতে শুরু করল দেশ-বিদেশ থেকে, চণ্ডীমণ্ডপে তৈরী হতে লাগল রাজবাড়ির বিখ্যাত প্রতিমা—নতুন নতুন দোকানপসার বেড়ে গেল দেখতে দেখতে।

রঘুনন্দন মিত্তিরের নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই, জাফরেরও না। আখ-মাড়াইয়ের জাঁতা থেকে রস বেরিয়ে আসছে নিয়মিত—অনেক টাকা দরকার। রাজা কংসনারায়ণের দুর্গোৎসব ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পুজোর কাছে সে ইতিহাস ম্লান করে দেওয়া চাই।

পাত্র-মিত্রদের কারো নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই, রাজা স্বয়ং ব্যতিব্যস্ত। তারই ফাঁকে ফাঁকে অন্তরঙ্গদের নিয়ে আসর করে বসেন। মুর্শিদাবাদ থেকে ফেরবার পরে তাঁর মনে সব সময় একটা চাপা অশান্তি থমথম করছে। ভাঙা শরীর নিয়ে আলীবর্দী এখনো চালিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু তাঁর যে আর বেশি দিন বাকী নেই, এ-কথা বুঝতে কারো অসুবিধে হয় না। চোখের মণি মীর্জা মামুদকে তিনি নবাবী দিয়ে যাবেন, তাতেও

সন্দেহ নেই। শুধু ভরসা নওয়াজেস মহম্মদ। সে নবাব হলে সব দিক বজায় থাকে, কিন্তু—

কিন্তু রাজবল্লভ! ঢাকার মহারাজ রাজবল্লভ!

নওয়াজেসের বেগম ঘসেটি সম্পর্কে হোসেনকুলীর যে অপযশ ছিল, সে অপবাদ রাজবল্লভেরও কিছু কম নয়, বরং লোকে অন্য কথাই বলে। কিন্তু ঘসেটির সঙ্গে রাজবল্লভের সম্বন্ধ যা-ই হোক, আসলে তাঁর আঙুলের ইশারায় ঘসেটি ওঠা-বসা করেন। শোনা যাচ্ছে, মীর্জা মামুদকে সরাতে পারলে ঘসেটির পোষ্য শিশুটিকে নামকে-ওয়াস্তে নবাব সাজিয়ে আসলে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব হয়ে বসবেন রাজবল্লভ স্বয়ং। আর নওয়াজেসের জন্যে গুপ্তঘাতকের ছুরির ফলাই যথেষ্ট।

এই সম্ভাবনাটাই বেশি করে পীড়ন করছে মনকে। নওয়াজেস্ অত্যন্ত ভদ্রলোক, বুদ্ধি-বিবেচনা আছে, মাথা ঠাণ্ডা; মীর্জা মামুদ দুরন্ত আর উদ্ধত হতে পারে, চরিত্রদোষও তার আছে, কিন্তু সে বীর, তার সঙ্গে চালাকি না করলে সে অকারণে কাউকে ঘাঁটাবে না। আর রাজবল্লভ? যেমন খল, তেমনি অত্যাচারী। একবার ক্ষমতা হাতে পেলে সে আর তার ছেলে কৃষ্ণবল্লভ যে কী কাণ্ড করতে থাকবে, তা অনুমানও করা যায় না।

শুধু কলকাতার কুঠির ইংরেজেরা হয়তো এ সময়ে কিছু সাহায্য করতে পারে। তাদের অনেকের সঙ্গেই কৃষ্ণচন্দ্রের বন্ধুত্ব আছে। লোকগুলো কূটকৌশলী, লোভী, স্বার্থপর; উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে না পারে এমন কাজ নেই; তার ওপর যোদ্ধার জাত, প্রত্যেকেই তলোয়ার-বন্দুক নিয়ে লড়াইয়ে নেমে পড়তে পারে, দরকার হলে প্রাণ দিতে পারে। কিন্তু তারা তো ব্যবসা করতে এসেছে, টাকা কামানোই তাদের লক্ষ্য। এ সমস্ত ব্যাপারে মাথা গলাতে তারা রাজী হবে? মীর্জা মামুদকে তারা আদৌ পছন্দ করে না, কিন্তু তাই বলে এইসব চক্রান্তের তারা শরিক হবে? একবার অন্যান্য মহাজনদের জাহাজ লুটের দায়ে নবাব আলীবর্দীর কাছে ফিরিঙ্গীদের বারো লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হয়েছিল, তার পেছনেও মীর্জা মামুদের হাত ছিল। সে-কথা তারা নিশ্চয় ভুলে যায়নি, কিন্তু তাই বলে—

একবার কলকাতায় গিয়ে ড্রেক সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে পারলে মন্দ হয় না। কিন্তু নবাবের কানে গেলে অবস্থা কী দাঁড়াবে তা বলা মুশকিল। দেখা যাক।

মনের অস্বস্তি ভোলবার জন্যেই বারে বারে কবির ডাক পড়ে।

'ওহে, রসের কবিতা শোনাও দুটো-একটা। মন-মেজাজ ভালো করে দাও।'

ভারতচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে শোনাতে থাকেন শ্রীকৃষ্ণের উক্তি ঃ

'বয়েস আমার অল্প নাহি জানি রসকল্প
তুমি দেখাইয়া তল্প জাগাইলা যামী।
ননী-ছানা খাওয়াইয়া রসরঙ্গ শিখাইয়া
অঙ্গভঙ্গ দেখাইয়া তুমি কৈলা কামী—'

কোনোদিন হিন্দী কবিতার ফরমাস হয়। তথাস্তু।

'ধুম্ বড়া ধুম্ কিয়া থানে শোনে নাহি দিয়া
চঁহুয়ার ঘেরু লিয়া ফৌজ্ কিসি কাওয়া,

বালাখানা কোট্ কিম্বা কানাৎ সে ঘের্ লিয়া
ত'হ্নয়ান্ দাগা দিয়া আগ্ কিসি তাওয়া—'

চমৎকার জীবন! নিজেকে বিদূষকের মতো মনে হয় ভারতচন্দ্রের।

রাজদরবারে কবির আসন পাওয়ার স্বপ্ন ছিল, সে স্বপ্ন তার সফল হয়েছে। কিন্তু বিক্রমাদিত্যের সভা নয় যে, রঘুবংশ-মেঘদূত রচনা করবার ফরমাস আসবে। রাজা ভোজের দরবার নয় যে, শ্রুতিধর মহাপণ্ডিতেরা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-বিবেচনা নিয়ে অলঙ্কার-শাস্ত্রের লক্ষণ মিলিয়ে মিলিয়ে কবিতার গুণাগুণ বিচার করবেন; বাদশা আকবরের নবরত্ন নয় যে, খানখানানের মতো রসিকপুরুষ চার পঙক্তি শুনে চার লক্ষ টাকা পুরস্কার দেবেন! সে যুগ গেছে। এখন যেমন রাজা, তেমনি রাজকবি।

আগে যাঁরা প্রজাপালন করতেন, এখন তাঁরা আখ-মাড়াইয়ের জাঁতাকেই রাজ্য চালাবার একমাত্র উপায় বলে জেনেছেন; বাইরে থেকে শত্রু কিংবা দস্যুতে আক্রমণ করলে যাঁরা তলোয়ার হাতে আগে বেরিয়ে পড়তেন, এখন তাঁরা ছুটন্ত ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনলে বর্গী ভেবে সকলের আগে পালাবার রাস্তা খোঁজেন। বিলাস-ভোগ আগেও ছিল, কিন্তু এখন সেইটেই শেষ কথা।

আর প্রজা?

ধর্ম-কর্ম সব অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। কিছুদিন আগে নবদ্বীপ থেকে একটা খেউড়ের দল এসেছিল। রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনী নিয়ে যে গান তারা শুনিয়ে গেল, তাতে কানে আঙুল দিতে হয়। ব্রাহ্মণেরা সংস্কৃত পড়তে ভুলে যাচ্ছেন—কী হবে মিথ্যে ওসব চর্চা করে? তার চেয়ে গুরুগিরি ভালো—তাতে বিদ্যার দরকার হয় না, পায়ের ধুলো দিতে জানলেই চলে; তাতেও যদি সুবিধে না হয়, রাজা-জমিদারের ভাট-বিদূষক হয়ে বসলেই চলে; পেটেটা মোটা থাকা দরকার, আর দরকার গলা খুলে রাজার গুণগ্রাম বর্ণনা করে যাওয়া, তারস্বরে আশীর্বাদ করে যাওয়া।

ব্রাহ্মণ, জমিদার, সমাজপতি যেদিকে চলে—সমাজের গতিও সেই দিকে। ঘরে ঘরে পাপ ঢুকেছে, আখড়ায় আখড়ায় ব্যাভিচার, তন্ত্রের নামে পঞ্চ 'ম'-কারের লৌকিক উপাসনা। চারদিকে অন্ধকার। যেমন রাজসভা, তেমনি রাজকবি। আলোহীন, ভবিষ্যৎহীন এই অমাবস্যার ভেতরে অমাবস্যার গান।

'কী কবি, মুখ এত গম্ভীর কেন?'—মহারাজ প্রশ্ন করেন।

উত্তরটা গোপাল ভাঁড়ই যুগিয়ে দেয়: 'আজ্ঞে, খুড়ী তো এখানে নেই, তাই খুড়োর মন-মেজাজ ভারী খারাপ।'

'কষ্ট পাচ্ছ কেন হে, আনিয়ে নাও না এখানে।'

'আনবারই বা কী দরকার? মহারাজের কৃষ্ণনগর তো কল্পতরু—খুড়ো ইচ্ছে করলে একটা কেন, সঙ্গে সঙ্গে দশটা খুড়ী এসে হাজির হবে।'

ভারতচন্দ্র হাসেন, জবাব দেন না। রাজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে আসেন বাসার দিকে। কৃষ্ণনগরের পথে পথে মহাপুজোর ভিড়। রাজবাড়ির সামনে কয়েকশো পাঁঠা-মোষ বাঁধা—পুজোর বলি; ওদিকে রঘুনন্দন মিত্তিরের কাছারীবাড়ি জমজমাট। দুটোর অর্থই এক—কোনো তফাৎ নেই।

বাসায় ফিরতে দেখেন, দাওয়ায় একটি কলাপাতার ওপর কয়েকটি আধ-ফোটা শ্বেতপদ্ম। পদ্মগুলো আকারে অনেক বড়ো—সচরাচর দেখা যায় না।

ভারী ভালো লাগল। এই পদ্ম দিয়ে আজ পুজো করবেন।

'কে দিলে রে ফুলগুলো ?'

'আজ্ঞে একটি মেয়েছেলে। অল্প বয়েস, দিব্যি চেহারা। স্নান করে, গরদের শাড়ি পরে এসেছিল। জিজ্ঞেস করলুম, কে আপনি ? বললে, নামের দরকার নেই, ঠাকুরমশাইকে ফুলগুলো দিয়ো।'

চন্দ্রাবলী।

মেয়েটির পরিচয় আজ আর ভারতচন্দ্রের অজানা নেই। রাজার সভার অনেক নর্তকীদের মধ্যে সে-ও একজন। সেইজন্যেই ভারতচন্দ্রকে সে চেনে।

চন্দ্রাবলীর দেওয়া ফুল দিয়ে তিনি পুজো করবেন ?

আবার মনে পড়ল বিদ্যাধরীকে। যার জন্যে দেশের ব্রাহ্মণেরা কেউ ইন্দ্রনারায়ণের অন্ন গ্রহণ করেন না, তাকে তিনি সেদিন প্রণাম করেছিলেন। আর এই ফুল তো সে-ই দিয়েছে, যে তাঁর হাতে দেবতার বিগ্রহ তুলে দিয়েছিল।

এই পদ্ম দিয়েই তিনি পুজো করবেন ; এর চাইতে পবিত্র আর কিছু নেই।

রঘুনাথ বললে, 'রাজবাড়ির প্রতিমা যা একখানা তৈরী হচ্ছে, আপনি দেখেছেন কর্তা ? বাপ্‌স্‌, কী কাণ্ড ! আপনার শ্রীচরণের ছায়ায় ছায়ায় অনেক দেশ তো ঘুরে এলুম, কিন্তু এমন একখানা এলাহী কারবার—'

ভারতচন্দ্র অন্যমনস্ক ছিলেন। সংক্ষেপে বললেন, 'জাঁতা।'

রঘুনাথ চমকে উঠল : 'কী বললেন আজ্ঞে ?'

লজ্জা পেয়ে ভারতচন্দ্র বললেন, 'না না, কিছু নয়। আমি এখন স্নান করব, তুই জল এনে দে।'

বিকেলের দিকে রাজবাড়ির মন্দিরে প্রণাম করে বেরিয়ে আসছিলেন ভারতচন্দ্র। চোখে পড়ল, একটু দূরে বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার আসছেন।

ভারতচন্দ্র রাজার কবি-বয়স্য, রাজার অবসর-বিনোদনের সঙ্গী ; কিন্তু আসল সভাকবি হলেন বাণেশ্বর। পরম পণ্ডিত, অত্যন্ত সুকবি। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কখনো কখনো তাঁর সাহায্য নিয়ে সংস্কৃত কবিতা রচনা করেন। বাণেশ্বর ভারতচন্দ্রকে শঙ্কর কিংবা গোপাল ভাঁড়ের সমপর্যায়ী বলেই মনে করেন—উপেক্ষার দৃষ্টিতেই দেখে থাকেন।

ভারতচন্দ্র রাজপণ্ডিতকে প্রণাম করলেন। আশীর্বাদ করে বাণেশ্বর সংক্ষেপে বললেন, 'কুশল ?'

'আপনাদের আশীর্বাদে।'

'তোমরা রাজার প্রসাদ পেয়েছ, ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ তোমাদের পক্ষে অনাবশ্যক।'—বাণেশ্বরের গলায় অপ্রীতি আর গোপন রইল না : 'তা রাজাকে কবিতা শুনিয়ে অর্থাগম ভালোই হচ্ছে নিশ্চয় ?'

ভারতচন্দ্রের মুখের ওপর দিয়ে রক্ত ছুটে গেল এক ঝলক। বিদ্যালঙ্কার বলছেন, চাটুবৃত্তি দিয়ে অর্থাহরণই ভারতচন্দ্রের একমাত্র কাজ। অপমানটুকু মুখ বুজে সহ্য করা গেল না।

'অপরাধ ক্ষমা করবেন বিদ্যালঙ্কার মশাই। মহারাজের সভাকবিও রাজপ্রসাদের আকাঙ্ক্ষাতেই কাব্য রচনা করেন। তাঁরও অর্থাগম মন্দ হয় না।'

কঠিন গলায় বাণেশ্বর বললেন, 'বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার দেবভাষায় কাব্য রচনা করে থাকে, রাজার সারস্বত সাধনায় সাহায্য করে। সে ইতর এবং যাবনিক ভাষায় চুট্‌কি রচনা করে না।'

'চুট্‌কি সংস্কৃতেও রচনা করা যায়, অনেক পণ্ডিত তা করেও থাকেন।' ভারতচন্দ্র সবিনয়ে বললেন, 'আর যদি ভাষার কথা বলেন, তা হলে বাংলাতেও কাব্য রচনা করা যায়—যাবনিক ভাষার পদ্মেও সরস্বতী অধিষ্ঠান করেন।'

'না, করেন না।'—সক্রোধে বাণেশ্বর বললেন, 'তুমি না ব্রাহ্মণ-সন্তান? জানো না, দেবভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় কাব্য রচনা নিষিদ্ধ?'

'না, জানি না। কোন্ শাস্ত্রে আছে জানালে বাধিত হই। শাস্ত্র কিছু কিছু আমিও পড়েছি।'

রক্ত-চক্ষে কিছুক্ষণ তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন বাণেশ্বর। তারপর বললেন, 'তোমার সঙ্গে অকারণে বাক্যব্যয় করবার সময় আমার নেই। মহাপণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন কৃষ্ণনগরে পদধূলি দিয়েছেন, আমি তাঁরই সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চললুম।'

বাণেশ্বর দ্রুত চলে গেলেন। মৃদু নিঃশ্বাস ফেলে এগিয়ে চললেন ভারতচন্দ্র।

আসন্ন পুজোকে উপলক্ষ করে শহর জমজমাট। এখানে সং, ওখানে নাচ, সেখানে হুল্লোড়। একজন অন্ধ একতারা বাজিয়ে বর্গীর হাঙ্গামার গান গাইছিল :

'আহা ঘরেতে আগুন দিল, লুটি নিল সব,
আর কোনো শব্দ নাই, 'তঙ্কা-তঙ্কা' রব!
আর শিশুরে আছাড়ি ফেলে মা-র কোল হইতে—'

ভারতচন্দ্র দাঁড়িয়ে পড়লেন। লোকটার কপালে মস্ত একটা কাটা দাগ। তলোয়ারের কোপ পড়েছিল মনে হয়। চোখ দুটোতেও অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন, সে জন্মান্ধ নয়।

গান থামলে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার দেশ কোথায় গো?'

'দেশ অনেক দূরে, মশায়। চন্দ্রকোণা।'

'চন্দ্রকোণা? কী করতে সেখানে?'

'চন্দ্রকোণার মানুষ শুনছ, আবার জিজ্ঞেস করতে হয় নাকি? তাঁত ছিল, তাঁত। তাতেই মরাই ভরা ধান থাকত, গোয়াল ভরা গোরু থাকত। কিন্তু অদেষ্ট।'—কপালে করাঘাত করল লোকটা।

'বর্গী?'

'বর্গী ছাড়া কী আর?'—লোকটা একটু থামল : 'চোখের সামনে মা-বাপ-ভাইকে বল্লমে ফুঁড়ল, বৌটাকে'—মনে হল যেন তার গলার স্বরকে কেউ বুকের ভেতরে টেনে নিতে চাইছে : 'তবু ভাগ্যি ভালো মশাই, তার আগেই আমার কপালে বসিয়েছিল খাঁড়ার ঘা, চোখের ভেতরে লোহার শলা পুরে দিয়েছিল।'—কাঁধের ছেঁড়া গামছাটা দিয়ে সে চোখ মুছে ফেলল একবার : 'যাকগে সে-সব কথা—কিছু দেবেন?'

ভারতচন্দ্র লোকটিকে একটা পয়সা ফেলে দিলেন।

বাবরী চুল, গলায় সোনার হার, কানে বীরবৌলি আর হাতে বুলবুলি নিয়ে অল্প-

বয়েসী একটা ছোকরা তার সঙ্গীর কাছে বক্তৃতা দিচ্ছে। অশ্বের গান থেকেই আলোচনাটা শুরু হয়েছে খুব সম্ভব।

'বর্গীর সামনে দাঁড়ানো কি বাঙালীর কাজ বাবা? সাক্ষাৎ যমদূতের মতো চেহারা সব, দেখলেই দাঁতকপাটি লাগে। দূরে বর্গীর ঘোড়ার শব্দ শুনলেই কি জমিদার কি কৃষাণ, যে যা পারে গুছিয়ে নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে আরম্ভ করে। অনেক সময় বৌ-ছেলেমেয়ে পর্যন্ত পেছনে পড়ে থাকে।'

সঙ্গীটি বললে, 'হুঁ। আত্মানং সতত রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি। কিন্তু আমি ভাবছি, বর্গীরা যদি শেষে এই কৃষ্ণনগরেও এসে পেঁছোয়, তখন কী হবে?'

'আরে, এখানে কি আর চালাকি চলে? মহারাজের সৈন্য-সামন্ত আছে না? ভোজপুরী, বুন্দেলখণ্ডী, পাঠান, মোগল, জাঁদরেল বীর সব। বর্গীকে তারা কচুকাটা করে ফেলবে। ভেতো বাঙালী তো আর নয় যে আচমকা ছাগলের পায়ের আওয়াজ শুনেও পিলে কেঁপে ওঠে, ভাবে ঘোড়সোয়ার এল বুঝি!'

'কে জানে, কিছু বিশ্বাস নেই!'—সঙ্গীটি নিঃশ্বাস ফেলল: 'নবাব আলীবর্দী পর্যন্ত বর্গীকে এঁটে উঠতে পারেন না, আর এ তো—! কিন্তু তোমার কথাটা আমার গায়ে লাগছে। ভেতো বাঙালীকে তুমি একেবারে উড়িয়ে দিলে? জানো তো, আমি গোয়ালার ছেলে। আমার ঠাকুর্দা ছিল নামজাদা লেঠেল, একা একশো জনের মহড়া নিতে পারত, বর্ধমান থেকে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত সবাই চিনত তাকে। আজ কি ভোজপুরী-মোগল-রাজপুত নইলে বাঙালী জান-মান বাঁচাতে পারে না?'

'পারেই না তো। বাঙালীর সে-সব দিন আর নেই হে। এখন শুধু কাঁদতে জানে আর মরতে জানে। তুমি বলছিলে, তোমার ঠাকুর্দা হ্যানো ছিল ত্যানো ছিল। আর তুমিই তো এখন নেংটি ইঁদুর দেখলে মূর্ছো যাও!'—হাতের বুলবুলির উদ্দেশে একটা শিস দিয়ে শৌখিন ছোকরাটি বললে, 'ওসব কথা ছেড়ে দাও, ভাই। বর্গী এলে সবাই পালায়, আমরাও পালাব—সেজন্য আর ভাবনা কি!'

'না, ভাবনার কী আছে? যঃ পলায়তে স জীবতি!'

'খুব যে সংস্কৃত কপচাচ্ছ তখন থেকে! পেলে কোথায়?'

সঙ্গীটি হাসল: 'আমার বাড়ির পাশেই যে চতুষ্পাঠী রয়েছে। পোড়োদের কয়েক জনের সঙ্গে আমার ভারী ভাব, মধ্যে মধ্যে তাদের ভাঙের সরবতের জন্য আমাকেই ঘন দুধ যোগান দিতে হয় কিনা। তাদের মুখেই এ-সব শুনি। তা ছাড়া কত যে রসালো শোলোক আছে সংস্কৃতে, সে আর তোমায় কী বলব!'

'রসালো শ্লোক পরে হবে। ওদিকে নাচ হচ্ছে, চলো যাই।'

পথের ধারের একটা কাঞ্চনগাছের গায়ে ঠেসান দিয়ে ভারতচন্দ্র দাঁড়িয়ে পড়লেন। কথাগুলো চমৎকার লাগছিল শুনতে। বর্গী এলেই পালাব—পালানো ছাড়া কী-ই বা করবার আছে? 'দারৈরপি ধনৈরপি'—নিজের প্রাণটাকে সকলের আগে বাঁচানো দরকার। আর তা ছাড়া মোগল-বুন্দেলী-ভোজপুরী তো আছেই। বাঙালীর ঘর, বাঙালীর মান পারলে তারাই বাঁচাবে, সে-সম্পর্কে বাঙালীর কোনো কর্তব্য নেই।

কবিকঙ্কণ তবু তো চণ্ডীকে ডেকেছিলেন। এ-কালের মানুষ দেবতাকেও বিশ্বাস করে না, ধর্মকেও না। নিতান্ত অভ্যাসে যেটুকু মানতে হয় তাই মানে। এদের

বাঁচাবে কে ?

মনে মনে অনুতপ্ত বোধ করতে লাগলেন ভারতচন্দ্র। নীলাচল ছেড়ে চলে না এলেই ভালো করতেন। তা হলে এই বাংলা দেশকে দেখতে হতো না, এই বাঙালীকেও না। সেই কতকাল আগে যখন দেশ ছেড়েছিলেন, তখনো দেশে দেখেছিলেন হাঙ্গামা, দেখেছিলেন আকাল, দেখেছিলেন এক সের মিঠাইয়ের দাম এক কাহন, আধ পণে আধ সের চিনি কিনতে হয়, কাপড় অগ্নিমূল্য, চারদিকে হাহারব। এই কুড়ি বছরে অবস্থা এতটুকু বদলায়নি, আরো নেমে গেছে। তবু সেদিন বাঙালীর কিছু শক্তি-সামর্থ্য, কিছু সাহস ছিল ; আজ তা-ও শেষ হয়ে এসেছে। এরই মধ্যে ঝলমল করছে কৃষ্ণনগর, চলছে নাচ-গান, ঘুরছে রঘুনন্দনের জাঁতা—যেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র শ্মশানে বাসর সাজিয়েছেন !

অন্যমনস্ক ভাবে ভারতচন্দ্র পা বাড়ালেন। হঠাৎ একসময় চমক ভাঙল তাঁর। যেন তাঁকে উপলক্ষ করেই অনেকখানি কৌতুকের হাসি চারদিকে বিকীর্ণ হয়ে পড়েছে।

চেয়ে দেখলেন, সামনেই তরুণী নর্তকী। তাকে ঘিরে রসিক দর্শকের দল, ভারতচন্দ্রও কখন গিয়ে তাদের মধ্যে দাঁড়িয়েছেন টের পাননি। আর তাঁর দীর্ঘ উজ্জ্বল কান্তি দেখে নর্তকী কী বুঝেছে সে-ই জানে, সুর্মাটানা চোখে মর্মঘাতী কটাক্ষ হেনে এগোচ্ছে তাঁর সঙ্গে। 'সঙ্গতী'র ছড় কাঁপছে সারেঙ্গীর ওপর, উর্দুতে গান গেয়ে নর্তকী বলছে, 'এতক্ষণ ধরে কেঁদে কেঁদে ফিরছিলুম, কোথায় ছিলে জীবন-বল্লভ ? এসো এসো—আলিঙ্গন দাও আমাকে—'

দু-হাত বাড়িয়ে এমন করে অগ্রসর হল, যেন সত্যিই আলিঙ্গন করতে চায়। সসংকোচে, সভয়ে পিছিয়ে গেলেন ভারতচন্দ্র, আর উচ্ছ্বসিত হাসির হর্‌রা উঠল জনতার মধ্যে।

গান থামিয়ে কলকণ্ঠে নর্তকী বললে, 'ছি ছি ব্রাহ্মণঠাকুর, এ কি ব্যবহার তোমার ? এমন রূপ, এমন রসিকের মতো চেহারা—সুন্দরীর আলিঙ্গনের ভয়ে তুমি পালিয়ে গেলে ?'

নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে কৌতুকের হাসি হাসলেন ভারতচন্দ্র।

'তুমি ভুল বুঝেছ সুন্দরী। আলিঙ্গনের ভয়ে নয়, মৃত্যুভয়ে।'

'মৃত্যুভয় ! আমি বাঘ না ভালুক ?'

'সুন্দরী, বাঘ-ভালুক তো অতি তুচ্ছ। জানো তো, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ একখানা গোবর্ধন ধারণ করতে হিমসিম খেয়ে গিয়েছিলেন। দুখানি গিরি-গোবর্ধন তুমি বয়ে বেড়াচ্ছ, তাদের চাপ কি আমি সইতে পারব ? চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে যাব যে !'

নর্তকীর গাল সঙ্গে সঙ্গে রাঙা টুকটুকে হয়ে উঠল, লজ্জার ছায়া নামল উজ্জ্বল, প্রগল্‌ভ চোখের তারায়, কী জবাব দেবে খুঁজে পেল না।

'বেড়ে বলেছেন—চমৎকার বলেছেন'—কৃষ্ণনগরের রসিক জনতা রসিকতাটা পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করে সাধুবাদ দিলে ভারতচন্দ্রকে, ফেটে পড়ল অট্টহাসিতে।

আর সেই অবসরে দ্রুত পা ফেলে ভারতচন্দ্র অদৃশ্য হয়ে গেলেন সেখান থেকে। তখন সন্ধ্যা নামছিল শহরে—ঘনিয়ে আসা অন্ধকারের ভেতরেই মিলিয়ে গেলেন তিনি।

মহানবমীর রাত্রিতে বিশাল নাটমন্দিরে বিখ্যাত গায়ক নীলমণি কণ্ঠাভরণ 'চণ্ডীমঙ্গলে'র পালা গাইছিলেন।

মন্দিরা বাজছে, করতাল বাজছে, মৃদঙ্গ বাজছে। ঝাড়লণ্ঠনের আলোয় চারদিক ঝকমক করছে দিনের আলোর মতো; সামনে ডাকের সাজ আর শলমা-চুমকিতে অপূর্ব সুন্দর বিরাট প্রতিমা যেন দেবলোকের দ্যুতিতে ঝলমল। চামর-ছত্র নিয়ে সুধাকণ্ঠে কণ্ঠাভরণ গাইছেন মশানে শ্রীমন্তের চৌতিশা স্তুতি—এই অন্তিমকালে সর্বসংকটবারিণী দেবী চণ্ডিকার কাছে বরাভয় প্রার্থনা করছেন তিনি।

ওপরে চিকের আড়ালে রাজপরিবারের মহিলারা, আসরের সামনে জরির কাজ করা মখমলের তাকিয়ায় হেলান দিয়ে মহারাজা, পাশে পাত্র-মিত্র-পারিষদের দল, কয়েকজন ইংরেজ বণিক, মহারাজার নিমন্ত্রণে তাঁরা দুর্গোৎসব দেখতে এসেছেন; কিন্তু ফিরিঙ্গিরা গান শুনছেন না, ফিস ফিস করে নিজেদের মধ্যে কী যেন আলাপ করছেন চাপা গলায়। একদিকে একটি ছোট দল করে বসে রয়েছেন দিক্‌পাল সব নৈয়ায়িক আর শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা—হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি, রামগোপাল সার্বভৌম, বীরেশ্বর ন্যায়পঞ্চানন আর রাজকবি বাণেশ্বর বিদ্যালংকার। আজকের দিনে রাজা আর তাঁদের গুরুগম্ভীর সঙ্গ কামনা করছেন না, কারণ রাজার মেজাজ আজকে তরল। নাটমন্দির লোকের ভিড়ে কানায় কানায় উপচে পড়ছে, বাইরেও হাজার হাজার প্রজা দাঁড়িয়ে নীলমণির দরাজকণ্ঠের গান শুনছে। রাজা এবং সাঙ্গোপাঙ্গদের অনেকেরই চোখে একটু ঘোর লাগানো, মহানবমীর রাত্রে শাক্তমতে সবাই কিছু কিছু 'কারণ' করছেন। ভারতচন্দ্র একটু সংকুচিত হয়ে বসে আছেন, কারণবারির ব্যাপারটা তাঁর বিশেষ ধাতে-টাতে সয় না।

প্রাণ খুলে গাইছিলেন নীলমণি, অনেকেই চোখের জল মুছছিলেন। ভারতচন্দ্রেরও একটুখানি আচ্ছন্নতা এসেছিল। মহারাজ একবার নড়ে বসলেন, তারপর ভ্রূকুটি করলেন।

'ওহে ভারত!'

তটস্থ হয়ে ভারতচন্দ্র বললেন, 'আজ্ঞা করুন।'

'কেমন যেন জমছে না হে!'

'আজ্ঞে, ভালোই তো গাইছেন।'

'নীলমণি ভালোই গায়, ও সুর করে চরক-সংহিতা পড়লেও লোকের চোখে জল আসবে। কিন্তু বড্ড নিরামিষ হে! কবিকংকণের ওই এক দোষ—ভারী শুকনো!'

ভারতচন্দ্র চুপ করে রইলেন।

মহারাজ বলে চললেন, 'দুঃখ কর অবধান, আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান! এই সবই কবিকংকণের হাতে খোলে ভালো। আসলে মুকুন্দরাম চাষাভুষো ছোটলোকের কবি, গরিবের দুঃখের কথা শুনিয়ে কান ঝালাপালা করে দেয়। আদিরস যেটুকু আছে নেহাৎ জোলো, নিতান্তই নিয়মরক্ষা করতে হয়, তাই লেখা। তারপর বছর বছর শুনতে শুনতে এখন কেমন একঘেয়েও লাগে।'

ভারতচন্দ্র শুনতে লাগলেন।

একটা হাই তুলে মহারাজ বললেন, 'তুমি তো খুচরো কবিতা লিখেই চালাচ্ছ। কখনো একটুখানি বসন্ত-বর্ণনা শোনালে, কখনো বা হিন্দী-ফার্সী-বাংলা-সংস্কৃত মিশিয়ে

খানিকটা ইয়ার্কি করলে!'—মহারাজ আরক্তিম চোখ দুটো আধ-বুজে একটু হাসলেন, 'তা এসব তোমার হাতে জমে বেশ! ভুয়ো ভুয়ো রোরুদাসি ইয়াকৎ নমুদা খাঁ কোসি —হা—হা—হা!'

মহারাজ শব্দ করে হেসে উঠলেন। কণ্ঠাভরণের গান একবার হোঁচট খেল, ঘরসুদ্ধ লোক দৃষ্টি ফেলল এদিকে, ফিরিঙ্গি বণিকেরা নিজেদের ভেতরে কী যেন কানাকানি করলেন, আর ভারতচন্দ্র অত্যন্ত অপ্রতিভ হয়ে গেলেন। মহারাজও যেন লজ্জা পেয়ে চুপ করে রইলেন।

কিছুক্ষণ গান চলল। তারপরেই আবার চাপাগলায় ডাক এল: 'ভারত!'

'আজ্ঞা করুন।'

'নাঃ, এ নিতান্তই পানসে। এই চৌতিশায় মন ভরে? আর ভাবো দিকি, বিহ্লনের "চৌরপঞ্চাশিকা"র সেই স্তুতি? শ্মশানে মরতে বসেছে, তবু কী বুকের পাটা!'

অদ্যাপি তাং শশিমুখীং নবযৌবনাঢ্যাং।
পীনস্তনীং পুনরহং যদি গৌরকান্তীম্।
পশ্যামি মন্মথশরাসন পীড়িতাঙ্গীং
গাত্রাণি সংপ্রতি করোমি সুশীতলানি।—

'এ না হলে আর শ্মশান-স্তব!'

আবার একটা তিক্ত বিস্বাদে ভারতচন্দ্রের সমস্ত মন বিরস হয়ে উঠল। তবু হাসতে চেষ্টা করতে হল, তবু সায় দিতে হয় রাজার কথায়। রাজবয়স্য আর কী করতে পারে এ ছাড়া?

'আজ্ঞে হাঁ, মহারাজ ঠিকই বলেছেন।'

'তাহলে তুমিই ভার নাও এবার। এ-সব পুরোনো চণ্ডীকাব্য আর নয়—মা-কে নিয়ে নতুন মঙ্গলকাব্য লিখে ফেলো একখানা।'

'মঙ্গলকাব্য!'

'হাঁ, সম্পূর্ণ কাব্য। এ-সব টুকরো কবিতা লিখে কেবল নিজের প্রতিভারই অপচয় করছ তুমি!'

'আমি পারব মহারাজ?"

'কেন পারবে না? তুমি রসিক, তুমি পণ্ডিত, অলঙ্কার-শাস্ত্র তোমার মুঠোয়, তার ওপর স্বভাবকবি। মুকুন্দরাম কোথায় দাঁড়াবে তোমার কাছে?'

'ও কথা বলবেন না মহারাজ, কবিকঙ্কণ আমাদের নমস্য। তবে আপনি যখন আদেশ করছেন, আমি চেষ্টা করব।'

'চেষ্টা তোমায় করতে হবে না, সরস্বতী নিজে এসে তোমার কলমে ভর করবেন। কিন্তু মনে রেখো, সরস হওয়া চাই। আর দেখছো তো, আমার কৃষ্ণনগরের লোক এমনিতেই একটু বেশি রসিক, তাদেরও খুশি করা চাই।'

'মহারাজের আদেশ শিরোধার্য।'

॥ নয় ॥

'বাগর্থাবিব সংপৃক্তৌ বাগর্থ-প্রতিপত্তয়ে,
জগতঃপিতরৌ বন্দে পার্বতী-পরমেশ্বরৌ—'

কালিদাসকে স্মরণ করেই লেখনী ধরা যাক। সেই সঙ্গে মনে পড়ল মুসলীম কবির কথাও :

'ইলাহী দে মুঝে রংগীন বয়ানী,
আতা কর মুজকো ইয়াকুতে মানী—'
হে ঈশ্বর, দাও আমাকে বর্ণোজ্জ্বল ভাষা,
সেই সঙ্গে দাও তার জ্যোতির্ময় অর্থ।

কবির অন্তরের চিরন্তন প্রার্থনা।

কিছুক্ষণ মগ্ন হয়ে ভারতচন্দ্র চেয়ে রইলেন মাধবীলতার কুঞ্জটির দিকে। টুনটুনিদের বাসায় দুটি বাচ্চা হয়েছে, একটু একটু করে মা-বাবার সঙ্গে উড়তে শিখছে তারা। লীলাকে মনে পড়ে গেল, ঘর-সংসার করবেন বলে তাঁকে আশ্বাস দিয়ে এসেছেন—কিন্তু এখনো কোনো ব্যবস্থাই করা গেল না। মহারাজের কাছে কিছু জমিজমা চাইলে কেমন হয়? কিন্তু প্রবৃত্তি হয় না। চাটুকারিতার লজ্জাই যথেষ্ট, ভিক্ষার ঝুলি পেতে দরকার নেই আর।

কাগজের ওপর বড়ো বড়ো করে লিখলেন, 'চণ্ডীমঙ্গল'।

না, চণ্ডীমঙ্গল নয়। রঘুনন্দন মিত্তিরের কাছারীবাড়ি মনে পড়ে গেল। ক্ষুধিত তৃষ্ণার্ত একদল মানুষ, একটুখানি জল খেতে চাইলে রাজার পেয়াদা তাদের লাথি মারে। দেবী কি কেবল রাজারাজড়ারই দেবতা, গরিবের কেউ নন? নামটা কেটে দিলেন, তারপর লিখলেন, 'অন্নদামঙ্গল'।

অন্নদা। যিনি মা। যিনি সকলকে অন্ন দেন।

কিন্তু তাঁর কথাই কি লিখতে পারবেন? সে অপরাধেই তো মুকুন্দরাম বাতিল হয়ে গেলেন। গরিবের ক্ষুধার কথা তো রাজা শুনতে চান না। তাঁর বিরক্তি ধরে যায়।

রসিকতাই করতে হবে তাঁকে। রাজা রসিক, কৃষ্ণনগরের লোকে রসিকতাই পছন্দ করে।

'ঠাকুরমশাই!'

চমকে চোখ তুললেন ভারতচন্দ্র।

'কে? চন্দ্রাবলী?'

'তোমাকে প্রণাম করতে এলুম।'—দাওয়ার ওপর ভারতচন্দ্রের পায়ের কাছে এক মুঠো শেফালী ফুল ছড়িয়ে দিয়ে প্রণাম করল চন্দ্রাবলী। স্নিগ্ধ একটা পবিত্র গন্ধে ভরে উঠল চারদিক।

'ফুলগুলো আমার পায়ে দিয়ে নষ্ট করলে কেন? ঠাকুরপুজোয় দিতুম!'

'আমার ফুল কি তোমার ঠাকুরপুজোয় লাগে?'

'লাগে বই কি। সেদিনও তুমি শ্বেতপদ্ম দিয়ে গিয়েছিলে, আমি রাধাকৃষ্ণের পায়ে সাজিয়ে দিলুম। ঠিক মনে হল, দেবতা খুশি হয়ে উঠলেন। তোমার নামটাই যে শ্রীবৃন্দাবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে'—ভারতচন্দ্র হাসলেন।

'আমিই যে ফুল দিয়ে গিয়েছিলুম, তুমি জানলে কী করে?'

'বিগ্রহ তুমি দিয়েছ, ফুল তুমি ছাড়া আর কে দেবে?'—ভারতচন্দ্রের চোখের দৃষ্টি নিবিড় হয়ে এল। আজও স্নান করে এসেছে চন্দ্রাবলী, ভিজে চুল মেলে দিয়েছে পিঠের ওপর, হালকা চন্দনের গন্ধ আসছে হাওয়ায়। বিদ্যাধরীর সঙ্গে মিল আছে মেয়েটির, ঠিক চিনতে পারা যায়।

চন্দ্রাবলী নিঃশ্বাস ফেলল। বললে, 'তুমি বোধহয় কবিতা লিখছিলে ঠাকুর, আমি এসে বিরক্ত করলুম। যাই।'

'না, বোসো একটু। বোসো ওই সিঁড়িতে। তুমি থাকলে আমার ভালো লাগে।'

চন্দ্রাবলী যেন শেষ কথাটায় শিউরে উঠল একবার যেন মুখের ওপর দিয়ে রক্তের ছোট একটা ঢেউ খেলে গেল, যেন বুকে তুফান ছুটল একটুখানি। চকিত-উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি ছুটে গেল ভারতচন্দ্রের দিকে। না—সে মুখ শিশুর মতো সরল আর নিষ্পাপ।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে কুণ্ঠিতভাবে সিঁড়ির ওপর বসে পড়ল চন্দ্রাবলী। টুনটুনির বাচ্চা দুটো একটু বড়ো হয়ে উঠেছে, উড়ে উড়ে ফিরছে মাধবীলতা কুঞ্জের চারপাশে। চন্দ্রাবলী কিছুক্ষণ চেয়ে রইল সেদিকেই। হাওয়ায় ভাসছে ফুল আর চন্দনের গন্ধ। নিজের ওপরে তার ধিক্কার এল। কী দুর্বল মানুষের মন! এমন পরিবেশের ভেতরেও তার রক্ত-মাংসের চঞ্চলতা বাধা মানে না—যা অসম্ভব, তারই জন্যে অনর্থক ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

'চন্দ্রাবলী!'

চমকে নড়ে উঠল চন্দ্রাবলী। শেষ রাতের চাঁদের আলো যেমন করে দীঘির কালো জলের ওপর কাঁপতে থাকে, ডাকটা তেমনি ভাবে তার বুকের ভিতরে থরো-থরো করে দুলতে লাগল খানিকক্ষণ। একটু সামলে নিয়ে জবাব দিলে সে, 'বলো, ঠাকুর।'

'তোমার বাড়ি এখানেই?'

'না—নবদ্বীপে।'

'এখানে কেন এলে এভাবে?'

চন্দ্রাবলী সহজ হল এতক্ষণে, হাসল: 'এই যে আমাদের পেশা, ঠাকুরমশাই। মা-রও এই কাজ ছিল। ছেলেবেলায় কীর্তন গাইতুম মনোহরশাহী, গরাণহাটি, রেনেটি। এখন বিশ্রাম খাঁ সাহেবের কাছে টপ্পা-গজল শিখি, নাচ শিখতে হয় শের মামুদের কাছে।'

'কীর্তন শোনবার লোক নেই কৃষ্ণনগরে?'

চন্দ্রাবলী বিষণ্ণভাবে বললে, 'মহারাজ যে পরম শাক্ত। এমনিতে অবশ্য তাঁর রাজ্যে কোনো অত্যাচার নেই, কিন্তু মনে মনে তিনি আদৌ পছন্দ করতে পারেন না বৈষ্ণবদের। নবদ্বীপে, যেখানে স্বয়ং মহাপ্রভুর জন্মস্থান, তাঁর লীলা, সেখানেও এখন শাক্তদেরই প্রতিপত্তি। এমন কি দোল-পূর্ণিমায় মহাপ্রভুর আবির্ভাবের দিনে পর্যন্ত বৈষ্ণবদের

নগর-সংকীর্তন বের করবার জো নেই, শাক্তেরা নরমুণ্ডের মালা গলায় দুলিয়ে খড়্গ হাতে তাড়া করে আসে।'—চন্দ্রাবলী একটু চুপ করে রইল: 'কিন্তু সেদিন দেখলুম, তুমি যুগল-মূর্তিটির দিকে যেমন একভাবে চেয়ে আছো, চিনতে পারলুম ভক্তের চোখ। নইলে কি সাহস করে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভার কবির হাতে আমি রাধাকৃষ্ণকে তুলে দিতে পারতুম?'

'আমি শাক্ত না বৈষ্ণব নিজেই জানি না।'—ভারত দীর্ঘশ্বাস ফেললেন: 'শাক্তের বংশে জন্মেছি, জীবনের অর্ধেক কেটে গেল বৈষ্ণবের সঙ্গে। আমার চোখে শ্যাম-শ্যামা এক হয়ে মিশে যায়, আমি কোনো তফাৎ দেখি না।'

'তোমরা অনেক উঁচুতে উঠেছ ঠাকুর, তোমাদের কথা আলাদা। আমরা সামান্য প্রাণী, আমাদের এ-সব অভেদ জ্ঞান জন্মায় না।'

'আমিও অন্ধকারেই বাস করছি চন্দ্রাবলী, কোনো সত্যের খবরই এ পর্যন্ত পাইনি।' —ভারত একবার থামলেন, তারপর বললেন, 'এই শাক্ত রাজার সভায় তোমাকে নাচতে হয়, গান গাইতে হয়, ভালো লাগে তোমার?'

'তখন মনে মনে ভাবি—সর্বং কৃষ্ণময়ং জগৎ। আর মহারাজার নামই তো তাঁরই নাম। তখন শ্যাম আর শ্যামার ভেতরে অভেদ হয়ে যায়। ফার্সী গজল মিলে যায় ভাবসম্মিলনে। তখন মানুষের জন্যে যে গান গাই, তা দেবতার পায়ে গিয়ে পেঁছোয়। নাচতে নাচতে মনে হয়, আমি তো দেবদাসী, আমার সামনে সব চোখগুলো পুরুষোত্তমের চোখে হারিয়ে যায়, রবাব তবলার বাজনায় আমি শ্রীমন্দিরের মৃদঙ্গ শুনি।'

নিস্তব্ধ চোখে ভারতচন্দ্র চন্দ্রাবলীর দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'চন্দ্রাবলী, এর পর থেকে তোমার প্রণাম তো আর আমি নিতে পারব না।'

'ছি ছি, এমন করে আমাকে আর লজ্জা দিয়ো না ঠাকুর। এমনিতেই তো পাপে ডুবে আছি, তোমাকে দেখলে তবু কিছুক্ষণের জন্যে সব পবিত্র হয়ে যায়। মাঝে মাঝে এসে চরণ-দর্শন করে যাব, তাতে আর তুমি বাধা দিয়ো না।'

'কিন্তু চন্দ্রাবলী, আমি তো সাধারণ মানুষ। বাসনা-কামনার অন্ত নেই, পুণ্য বলতে জীবনে কিছুই করিনি। আমাকে কেন প্রণাম করে যাও তুমি? কী লাভ হয় তোমার?'

চন্দ্রাবলী হাসল।

'আমার লাভ-ক্ষতির কথা জেনে তোমার কী হবে? আমি তোমাকে কী চোখে দেখি, কেন প্রণাম করি, সে সবও তুমি না-ই বা শুনলে। শুধু পায়ে ঠেলো না, এইটুকুই মিনতি রইল।'

সিঁড়ির ওপরে আর একবার প্রণাম রেখে চন্দ্রাবলী চলে গেল।

ভারতচন্দ্র মগ্নমৌনী হয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। পায়ের কাছে একমুঠো সাদা শেফালী ফুলের অঞ্জলি। বাতাসে এখনো যেন চন্দনের সুগন্ধ মূর্ছিত হয়ে আছে। চন্দ্রাবলী তাঁর কাছ থেকে কী পায় কে জানে, কিন্তু আজকের সকালটিকে তাঁর পূর্ণ করে দিয়ে গেল।

আজই কাব্য আরম্ভ করবার সব চেয়ে শুভদিন। এমন লগ্ন আর আসবে না।

কয়েক লহমা নিজের ভেতরে মগ্ন হয়ে থেকে লিখতে আরম্ভ করলেন:

"গণেশায় নম নমঃ আদিব্রহ্ম নিরুপম
পরমপুরুষ পরাৎপর।
খর্বস্থূল কলেবর গজমুখ লম্বোদর
মহাযোগী পরমসুন্দর ॥
বিঘ্ননাশ কর বিঘ্নরাজ।
পূজা হোম যোগযাগে তোমার অর্চনা আগে
তব নামে সিদ্ধ সব কাজ—"

বন্দনার পরে ভারতচন্দ্রের কলম থামল। এইবারে কাহিনী শুরু করতে হবে।

কিন্তু কার কাহিনী? রাত্রে ঘুম আসে না—বিনিদ্র প্রহরগুলো নানা ভাবনার মধ্যে দিয়ে পার হয়। কালকেতুর গল্প মহারাজ শুনতে চান না, গরিবের দুঃখের কথা তাঁর আর ভালো লাগে না। ধনপতি শ্রীমন্ত সওদাগরের গল্প? মজা সরস্বতীর ধারে ধীরে ধীরে মরে আসছে ত্রিবেণী-সপ্তগ্রামের বন্দর, বাঙালী সওদাগর আর সাহস করে বহর নিয়ে পাটনে বেরোয় না। হার্মাদে মগে লুট করে নেয় জাহাজ, ফিরিঙ্গিরাও সুযোগ পেলে ছাড়ে না।

আর বর্গী? সে আর কিছু দেশে রাখেনি। চাষী মাঠ ফেলে পালিয়েছে, তাঁতী তাঁত ছেড়ে উধাও হয়েছে, ব্রাহ্মণের পুঁথির পাতা হাওয়ায় উড়ছে। ক্ষেতে আগাছার জঙ্গল, তাতে ইঁদুরের বাসা—ধান নেই—চাল নেই, ব্যবসা নেই, অর্ধেক সুবে বাংলার এই চেহারা।

ফরাসডাঙা, চুঁচুড়া, কলকাতায় নতুন কুঠি, নতুন ঐশ্বর্য। বর্ধমান-কৃষ্ণনগরে রাজারা মোচ্ছব করেন, সেপাইসান্ত্রী লোকলস্কর নিয়ে তাঁদের দিন একরকম সুখেই কাটে। কিন্তু ভারতচন্দ্র আর এক দেশকে দেখছেন; ধর্মে বিশ্বাস নেই, চোর-ডাকাতের হাতে ভরসা নেই, সন্ন্যাসী-কাপালিকের উপদ্রবে একদিনের জন্যে স্বস্তি নেই। খেউড় গান আর উচ্ছৃংখলতা, পরকীয়া সাধনার নামে বেপরোয়া ব্যভিচার, তন্ত্রের নামে নরবলি-নারীহরণ। আর সব কিছু ছাপিয়ে আকাল—শুধু আকাল। চালের দাম আকাশছোঁয়া; দেশে কাপড়-চোপড় যা তৈরী হয়, ফিরিঙ্গী বানিয়ারা বেশি দাম দিয়ে তা কিনে নেয়—গরীব মানুষ প্রায় বিবস্ত্র হয়ে দিন কাটায়। তারই ভেতরে রঘুনন্দন মিত্রের আখ-পেষাইয়ের জাঁতা ঘুরে চলেছে, দেবতার নৈবেদ্যে এক মণ ওজনের সন্দেশটিতে এক ছটাকও কম পড়ে না।

ভাবতে ভাবতে চোখ বুজে এল। ছেলেবেলার একটা অস্পষ্ট স্মৃতি। পেঁড়োর গড়ের সর্বস্ব লুঠ করে নিয়ে গেছেন কুপিতা মহারানী বিষ্ণুকুমারী। একমুঠো চালের পর্যন্ত সংস্থান নেই।

বাবা-দাদারা পলাতক। রাজরানী মা ধুলোয় বসে। চোখ দিয়ে তাঁর জল পড়ছে।

'কী খেতে দেব তোদের? কী করে তোদের আমি বাঁচাব?'

লোকে মাকে বলত অন্নপূর্ণা। অতিথির সেবার জন্যে সব সময় খোলা থাকত বাড়ির দরজা। সেই অন্নপূর্ণা আজ ভিখারিণী।

মনে হল যেন মা সামনে এসে দাঁড়ালেন।

'কী খেতে দেব তোদের? কেমন করে তোদের আমি বাঁচাব?'

চকিতে চোখ মেললেন ভারতচন্দ্র। এই কি স্বপ্নাদেশ? স্বয়ং অন্নপূর্ণাই কি

মায়ের রূপ ধরে এসে তাঁকে পথ দেখিয়ে দিয়ে গেলেন ?

বাইরে পাখির কলকাকলি। প্রথম ভোরের আলো এসেছে ঘরে। ভারতচন্দ্র উঠে বসলেন। সেই অস্পষ্ট আলোতেই টেনে নিলেন কাগজ-কলম, যেখানে শেষ করেছিলেন, তার শেষে জুড়ে দিলেন :

"স্বপনে রজনী শেষে বসিয়া শিয়র-দেশে
কহিলা মঙ্গল রচিবারে।
সেই আজ্ঞা শিরে বহি নূতন মঙ্গল কহি
পূর্ণ কর চাহিয়া আমারে—"

দুর্গোৎসবের পালা শেষ হয়েছে, কিন্তু উৎসবের জের মেটেনি। সামনে কালীপুজো। মহারাজের ইষ্টদেবীর পুজো। সেদিন আর এক বিপুল সমারোহ। আগমবাগীশের বংশধর আসবেন নবদ্বীপ থেকে, তিনিই বসবেন পুরোহিতের আসনে, রাজা হবেন তাঁর তন্ত্রধার। সমস্ত কৃষ্ণনগর তৈরী হচ্ছে তার জন্যে। এখন থেকেই বাজি পুড়তে আরম্ভ হয়েছে। পুজোর দিনে আকাশ জুড়ে শুরু হবে আগুনের খেলা। রাজবাড়ির জন্যে লক্ষ টাকা বাজির ফরমাস গেছে, তৈরী করবে কলকাতার এক ফিরিঙ্গি কারিগর। শহর লোকে লোকারণ্য। দেশবিদেশ থেকে অসংখ্য মানুষ এসেছে, এসেছে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের দল, এসেছে জুয়াড়ী, এসেছে ভিখারী, এসেছে বারাঙ্গনা। ষোলো পাক সরভাজার গন্ধে বাজারের বাতাস উতরোল, পুতুলের দোকানে রঙের হাট বসেছে।

মহারাজের দান-ধ্যানের তুলনা নেই, এই সময় তাঁর উদারতার অন্ত থাকে না। কোনো প্রার্থী বিমুখ হয় না, পণ্ডিতদের অকাতরে ব্রহ্মত্র বিতরণ করেন। রাজার জয়ধ্বনিতে কৃষ্ণনগর কাঁপতে থাকে। এবারেও সব এক রকম। কিন্তু মনে শান্তি নেই।

শান্তি নেই রাজবল্লভের জন্যে।

একটা নিঃশব্দ অন্ধকারের স্রোত বইছে মুর্শিদাবাদে। নবাব ক্রমশ অথর্ব আর অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। কিন্তু তিনি যে কী চান, সে-কথা কারো আর অবিদিত নেই। মীর্জা মামুদই বাংলার নবাব হবে।

সেটা ভয়ের কথা। তার চাইতেও ভাবনার কথা রাজবল্লভ।

মীর্জা মামুদ নবাব হলে তাঁরই সর্বনাশ হবে সকলের আগে। যে পাপে হোসেন-কুলি খাঁর মতো বিচক্ষণ বুদ্ধিমান লোককেও কুকুরের মতো রাস্তায় প্রাণ হারাতে হয়েছে, সে পাপে রাজবল্লভেরও নিষ্কৃতি নেই। দাঁতে দাঁত চেপে সুযোগের অপেক্ষা করছে মীর্জা মামুদ। রাজবল্লভ জানেন, হোসেনকুলি তলোয়ারের মুখে প্রাণ হারিয়েছেন ; তাঁর মাংস ডালকুত্তায় ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে। সুতরাং মীর্জা মামুদকে শেষ করতেই হবে রাজবল্লভকে। কাঁটা তোলবার জন্যে হয় নওয়াজেস মহম্মদ, না হয় পূর্ণিয়ার শওকৎ জঙ্গ। নওয়াজেসের শক্তি-সামর্থ্য যাই থাক, ঘসেটি বেগমের বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহস তার নেই। আর শওকৎ জঙ্গ ? চরিত্রহীন, অকর্মণ্য, বিলাসী। যে-ই নবাব হোক, রাজবল্লভ হাতের পাঁচ আঙুলে তাদের পুতুলের মতো নাচাতে পারবেন।

তারপর—

তারপর নিষ্ঠুর স্বার্থপর রাজবল্লভের অত্যাচারে দেশের একটি জমিদারেরও আর

চোখে ঘুম থাকবে না।

মুসলমান নবাব প্রজাদের ওপর উৎপাত করে না তা নয় ; কিন্তু হিন্দু জমিদারদের সব অন্ধি-সন্ধি তারা জানে না, জানতেও চায় না ; নিয়মিত রাজস্ব দিলে, বিদ্রোহ-চক্রান্ত না করলে, যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় কিছু সেনা-সামন্ত পাঠালেই তারা খুশি থাকে, খেতাব-খেলাৎ দেয়। কিন্তু হিন্দুর হাত থেকে অত সহজে নিস্তার নেই। সে সব জানে, সব বোঝে ; দেবত্র-ব্রহ্মত্রকেও সে ছেড়ে কথা কইবে না। হিন্দু যদি হিন্দুকে দেখত, তা হলে পরম শৈব বর্গীর উৎপাতে এমন করে দেশ মহাশ্মশান হয়ে যেত না। তার ওপর স্বয়ং রাজবল্লভ যদি একবার ক্ষমতা হাতে পায়—

কৃষ্ণচন্দ্র ভাবছিলেন আর অস্থিরভাবে পায়চারি করছিলেন। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে কন্দর্প সিদ্ধান্তকে ডেকে পাঠালেন। তাঁর নানা মেজাজে নানা সঙ্গী। তর্কসিদ্ধান্ত কিংবা বাচস্পতির সঙ্গে যখন ন্যায়শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করেন, তখন তাঁর এক রূপ ; যখন বাণেশ্বরের সঙ্গে সংস্কৃত কাব্য রচনা করেন, তখন তাঁর আর এক চেহারা ; বিশুদ্ধ ইয়ার্কির দরকার হলে গোপাল ভাঁড়, ভারতচন্দ্রেরা আছেন। কন্দর্প সিদ্ধান্তও এই রকম একটি বিশেষ মুহূর্তের প্রয়োজনে।

'স্মরণ করেছেন মহারাজ ?'

'ওহে সিদ্ধান্ত, আর তো ভালো লাগছে না। মেজাজ ভারী খারাপ।'

'মহারাজ, গোপাল ভাড়কে খবর দেব কি ?'

'না, ওটা এখন থাক। ওকে আপাতত সহ্য করা যাবে না, অত মোটা রসিকতা শোনবার মতো মনের অবস্থা আমার নয়। তোমার সঙ্গে কিছু রসালো পুঁথিটুঁথি আছে নাকি হে ? পড়ে শোনাও।'

সিদ্ধান্ত হাসলেন ঃ 'আজ্ঞে আমি বিহ্লণ সঙ্গে করেই এনেছি।'

'বটে—বটে ! পড়ো তা হলে। ভালো কথা, ভারতচন্দ্রের খবর কী ?'

'আজ্ঞে মহারাজের আদেশে সে মঙ্গলকাব্য রচনা করছে।'

'তা করুক। কিন্তু লোকটা ভারী নিষ্ঠাবান আর ধার্মিক হে। কবিত্ব-শক্তি আছে বটে, কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, ঠিক আর একখানা কবিকঙ্কণ চণ্ডী দাঁড় করাবে। সে যাক, তুমি পড়ো।'

'রাজকন্যার রূপ বর্ণনা দিয়েই শুরু করি মহারাজ ?'

'তাই করো।'

পুঁথি খুলে কন্দর্প পড়তে আরম্ভ করলেন ঃ

"কিমিন্দুঃ কিম্পদ্মংকিসু মুকুরবিম্ব কিম্মু মুখং
কিমব্জে কিম্মীনৌ কিমু মদনবাণৌ কিমুং দৃশৌ।
খগৌ বা গুচ্ছৌ বা কনককলসৌ বা কিমু কুচৌ
তড়িদ্বা তারা বা কনকলতিকা বা কিমবালা।"

রাজা বললেন, 'বেশ, বেশ। তা সংশয়ের নিরসন হল কী করে ?'

কন্দর্প মৃদু হেসে পড়ে চললেন ঃ

"নেদং মুখন্দুগবিমুক্ত শশাংকবিম্বং
নেমৌ স্তনাবমৃতপূরিতহেমকুম্ভৌ।

নৈবালকবলিরিয়ম্মদনাশ্রশালা
নৈবেদমক্ষিবুগলং নিগলং হি যুণাং—"

রাজা বললেন, 'তবু তো সন্দেহ রয়েই গেল। এখনও সম্পূর্ণ মানবী কিনা বোঝা যাচ্ছে না।'

'কামীর সংশয় কি অত সহজে নিবৃত্ত হয়, মহারাজ? তারপর শুনুন—"ধ্বান্তানামু পটলং সুধাংশুসকলঙ্কোদণ্ডমিন্দীবরে, পত্রঙ্কোকনদস্য কম্বুলতিকে—"

সেই সময় ভারতচন্দ্রের বাসায় চন্দ্রাবলী ডাকল: 'ঠাকুর!'

ভারতচন্দ্র লিখছিলেন। খাগের কলমটি দোয়াতে ডুবিয়ে রেখে বললেন, 'এসো।'

'আরে, তোমার লেখা নষ্ট করে দিলুম তো?'

'তুমি এলে আমার লেখা নষ্ট হয় না, প্রাণ পায়।'

'ছি ছি, কী যে বলো! মিথ্যে শুধু পাপ বাড়াচ্ছ আমার।'—আঁচল থেকে আজ কয়েকটি পদ্মের কুঁড়ি বের করল চন্দ্রাবলী।

'আজ তোমার জন্যে এই ক'টি মাত্রই পেলুম। পুজোর হিড়িকে পদ্মবন খালি হয়ে গেছে, যে দু-চারটি আছে, হিমের ছোঁয়ায় তারাও ঝরতে শুরু করে দিয়েছে।'

'তা যাক।'—ভারতচন্দ্র স্নিগ্ধ হাসি হাসলেন: 'তোমার মনের পদ্মে যে অর্ঘ্য সাজিয়ে দিচ্ছ, তাই নিয়েই দেবতা খুশি হবেন। কিন্তু ও ফুল ক'টি আর আমার পায়ে দিয়ো না, রাখো এখানে।'

'আমি তোমাকে দিলুম। তাতেই আমার তৃপ্তি। তুমি যা খুশি করো। কিন্তু আমি যাই—তোমার লেখা নষ্ট করবো না।'

ভারতচন্দ্র বললেন, 'না না, বোসো একটু। তুমি এলে আমার ভালো লাগে।'

একবারের জন্যে আলো হয়ে উঠেই চন্দ্রাবলীর মুখে আবার ছায়া ঘনালো: 'আমি এলে তোমার ভালো লাগে? কিন্তু আমি তো পাপিষ্ঠা!'

'দেবদাসীর পাপ-পুণ্যের বিচার তার দেবতা করবেন, আমি কে?'—ভারতচন্দ্র গভীর দৃষ্টিতে চন্দ্রাবলীর মুখের দিকে চাইলেন: 'তোমার ভাবনা যিনি ভাববার তিনিই ভাবছেন। কিন্তু সত্যিই বলছি, তোমাকে দেখলে আমার মন প্রেরণা পায়।'

চন্দ্রাবলী মুখে আঁচল দিয়ে হেসে উঠল।

'ঠাকুর, জিতেন্দ্রিয় বলে তোমার খ্যাতি আছে। এ-কথা শুনলে লোকে কী বলবে?'

'যা খুশি বলুক। আমার সত্য আমার কাছে।'

'ব্রাহ্মণী এখানে নেই বলেই বুঝি এত সাহস?'

ব্রাহ্মণী! লীলার কথায় কয়েক মুহূর্তের জন্যে উদাস হলেন ভারতচন্দ্র। তারপর হাসলেন।

'না, ব্রাহ্মণীও আমায় ঠিক বুঝবে। জানো, তোমার নাম যদি চন্দ্রাবলী না হতো, আমি ওটাকে পাল্‌টে দিতুম। তোমাকে ডাকতুম মালিনী বলে।'

'মালিনী? বেশ তো, তোমার যে নামে খুশি ডেকো।'—চন্দ্রাবলীর চোখ জ্বল-জ্বল করে উঠল: 'কিন্তু মালিনী কেন?'

'বোসো তবে ওখানে, বলি।'

সেই দূরত্ব বাঁচিয়ে, সসম্ভ্রমে সিঁড়ির ওপর বসে পড়ল চন্দ্রাবলী। ভারতচন্দ্র বললেন, 'মহাকবি কালিদাসের নাম শুনেছ তুমি ?'

'শুনেছি।'

'সেই মহাকবিকে মালিনী রোজ ফুল এনে দিত।'

'আমার মতো ?'

'হাঁ, ঠিক তোমার মতো। আর কবি তাকে নিজের লেখা কবিতা শোনাতেন। আমিও তোমাকে শোনাব আজ থেকে।'

চন্দ্রাবলী হাসল : 'কিন্তু আমি বুঝতে পারব কেন ?'

'তুমি সবই বুঝতে পারবে। আর আমার কবিতা তো পণ্ডিতমশায়দের জন্যে লেখা নয়, সকলের জন্যেই।'

'তা হলে মালিনী বলেই ডেকো আমাকে।'

'না, তা হয় না। তুমি কৃষ্ণপ্রিয়া, তোমাকে কি আমার কুঞ্জের মালিনী করতে পারি ?'—ভারতচন্দ্র হাসলেন : 'শিবের ঘরকন্নার কথা লিখছিলুম। পড়ব একটুখানি ?'

'আমার ভাগ্য।'

খাতা খুলে ভারতচন্দ্র পড়তে লাগলেন :

"শঙ্কর কহেন শুন শুনহ শঙ্করি।
ক্ষুধায় কাঁপিয়ে অঙ্গ বলহ কি করি॥
নিত্য নিত্য ভিক্ষা মাগি আনিয়া যোগাই।
সাধ করে একদিন পেট ভরে খাই॥
সকলের ঘরে ঘরে নিত্য ফিরি মেগে।
সরম ভরম গেল উদরের লেগে॥
ভিক্ষা মাগি ভিক্ষা মাগি কাটালাম কাল।
তবু ঘুচাইতে নারিলাম বাঘছাল—"

ভারতচন্দ্র থামলেন : 'খুব নীরস, না ?'

'রসের আমি কী জানি, ঠাকুর ? কিন্তু এ কোন্ শিবের কথা তুমি বলছ ? যিনি ত্রিভুবনের ঈশ্বর, এই কি তাঁর সংসারের দশা ? কুবের স্বয়ং যাঁর ভাণ্ডারী, তাঁকেও কি এমন করে পেটের দায়ে দোরে দোরে ভিক্ষে করতে হয় ?'

'তাই তো হয়, চন্দ্রাবলী। এই তো আমাদের বাংলা দেশের শিবের দশা। নিজের চোখেই তাঁর সে দুর্গতি আমি দেখেছি।'

'এই কবিতা মহারাজের ভালো লাগবে ?'

'জানি না। বোধহয় লাগবে না। কিন্তু যত চেষ্টাই করছি, সব ঐশ্বর্য-মূর্তির আড়াল থেকে আমার এই ভোলানাথই বেরিয়ে আসতে চান বার বার। কী করব চন্দ্রাবলী !'

'তোমায় কিছুই করতে হবে না ঠাকুর। যিনি তোমাকে দিয়ে লেখাচ্ছেন, তাঁর কথা তিনি নিজেই বলবেন। তুমি তো নিমিত্ত মাত্র। আচ্ছা আসি আজ, অনেক বেলা হল। প্রণাম।'

চন্দ্রাবলী চলে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিঃশ্বাস ফেলে আবার কলম হাতে তুলে নিলেন ভারতচন্দ্র। মহারাজকে খুশি করবার ওপর সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। কিছু জমি-জমা, একটি বাসস্থান, লীলাকে নিয়ে আবার নতুন করে সংসার পাতা। এক বছর হতে চলল, এখনো কিছুই করতে পারেননি। কাব্য লিখে মহারাজকে তুষ্ট করতে পারলে সব ঠিক হয়ে যেত।

কিন্তু তাঁর ইচ্ছেতেই কি সব? 'যিনি তোমাকে দিয়ে লেখাচ্ছেন, তাঁর কথা তিনি নিজেই বলবেন। তুমি তো নিমিত্ত মাত্র।' ঠিক। স্বেচ্ছায় তাঁর কিছুই করবার নেই। একবার গানে লিখেছিলেন, 'নিত্য তুমি খেল যাহা, নিত্য ভাল নহে তাহা, আমি যা খেলিতে বলি, সে খেলা খেলাও হে।'

এ তো অহংকারের কথা। মানুষের ইচ্ছা দিয়ে কি তাঁকে চালানো যায়? অন্তরের আড়ালে বসে সবই তো তিনিই নিয়ন্ত্রণ করছেন : 'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন—'

অহংকার চূর্ণ হোক। দেবতাই তাঁর লেখনীতে আবির্ভূত হোন।

ভারতচন্দ্র লিখে চললেন :

"কেবা এমন ঘরে থাকিবে।
জয়া এ দুঃখ সহিতে কেবা পারিবে।
আপনি মাখেন ছাই আমারে কহেন তাই
কেবা সে বালাই ছাই মাখিবে।
দামাল ছাবাল দুটি অন্ন চাহে ভুমে লুটি
কথায় ভুলায়ে কে বা রাখিবে—"

॥ দশ ॥

কালীপুজোর উৎসব শেষ, প্রায় দেড় মাসের মত্ততার পর শহর এখন শ্রান্ত-ক্লান্ত। বিদেশের মানুষ ঘরে রওনা হয়েছে, পণ্ডিতেরা যথাসাধ্য বিদায় কুড়িয়ে রাজার জয়ধ্বনি তুলে বিদায় নিয়েছেন। পথের ভিড় হালকা, নাচগানের স্রোতে ভাঁটা পড়েছে। রঘুনন্দনের কাছারীতে ভিড় নেই, সন্ন্যাসী-অবধূত-ভিখারীর দল আর তেমন করে চোখে পড়ে না; দোকান-বাজার যেন ঝিমন্ত, যে-সব নতুন দোকান বসেছিল, তারা ছাউনি তুলে চলে গেছে। শুধু পথে পথে এখনো রাজসূয় যজ্ঞের স্মৃতিচিহ্ন হয়ে শুকনো কলার পাতা হাওয়ায় হাওয়ায় উড়ে বেড়াচ্ছে। স্বয়ং মহারাজও ক'দিন আর দর্শন দেননি—না খোলা দরবারে, না খাস বৈঠকে। তিনি বিশ্রাম করছেন।

"কৃষ্ণচন্দ্র নরপতি করিলেন অনুমতি
সেই মত রচিয়া বিধানে।
ভারত যাচয়ে বর অন্নপূর্ণা দয়া কর,
পরীক্ষিততনু ভগবানে—"

কাব্য শেষ হয়েছে ভারতচন্দ্রের। দেওয়ান গোপাল চক্রবর্তীর মুখে হুজুরে খবর পাঠিয়েছেন ভারতচন্দ্র। কিন্তু এখনো ডাক আসেনি। কিন্তু চন্দ্রাবলী এসেছে মাঝে

মাঝে। কিছু কিছু শুনিয়েছেন তাকে।

'ঠাকুর, চমৎকার হয়েছে তোমার লেখা। মহারাজ খুশি হবেন।'

'অদৃষ্টই বলতে পারে সে-কথা। আমি চেষ্টা করেছি।'

'চেষ্টা কেন? সিদ্ধিলাভ হয়েছে তোমার। লোকে মহাকবি বলে চিরদিন মনে রাখবে তোমার নাম।'

'কবিতায় সিদ্ধিলাভ? মহাকবি কালিদাস পর্যন্ত আশা রাখতে পারেননি। তিনিও দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, "মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম, প্রাংশু-লভ্যে ফলে—"

চন্দ্রাবলী বাধা দিয়েছিল: 'কালিদাস যা খুশি বলুন, তাঁর কথায় আমার কাজ নেই। আমি বলছি, এই কাব্য তোমার অমর হয়ে থাকবে। লোকে কোনোদিন তোমার কথা ভুলবে না।'

তারপর রোজকার মতো সেদিনও কিছু ফুল রেখে চলে গিয়েছিল। জলের পদ্ম ফুরিয়ে গেছে, ক'টি স্থলপদ্ম। এই ফুলগুলো সে কোথা থেকে আনে জিজ্ঞেস করতে কৌতূহল হয়। কিন্তু মুখ ফুটে কথাটা জিজ্ঞেস করতে পারেন না, কোথায় যেন সংকোচে বাধে।

আর উৎসাহ রঘুনাথের।

'কর্তা, এবার আমাদের সুদিন আসছে তা হলে!'

'তাই নাকি?'

মহারাজা নিশ্চয় আপনাকে অনেক খেতাব-খেলাৎ দেবেন, চাই কি বড়োসড়ো একটা জমিদারীও দিয়ে বসতে পারেন। তখন আপনি আবার রাজা হবেন, আর আমি—'

'তোকে মন্ত্রী করে দেব।'—ভারতচন্দ্র হাসলেন।

'আজ্ঞে মন্ত্রী হওয়া ভারী ল্যাঠা, কখনো রাজা মাথায় তুলে রাখছেন, কখনো পছন্দ না হলে গর্দান নিয়ে নিচ্ছেন। ও-সব ঝঞ্ঝাটের ভেতরে আমি নেই। আমি হব আপনার খাস চোপদার। রেশমী পাগড়ী মাথায় দিয়ে, হাতে একটা রুপো-বাঁধানো লাঠি নিয়ে দুনিয়াসুদ্ধ সবাইকে কড়্‌কে বেড়াব।'

'বুড়ো বয়েসে শেষকালে গাঁজা ধরলি রঘু?'

'গাঁজার কী পেলেন এতে? আহা, কী কবিতাই লিখেছেন—মহারাজা তো মহারাজা, শুনলে পাষাণ পর্যন্ত গলে যাবে।'

'তুই কী করে জানলি?'

রঘুনাথের অভিমান হল।

'আজ্ঞে, কী ভেবেছেন আপনি? ওই চন্দ্রাবলীকে আপনি পড়ে পড়ে শোনান আর দূরে বসে আমি কান পেতে শুনি। কী লেখাই লিখেছেন কর্তা! শিব যখন গৌরীকে বিয়ে করতে গেলেন, তখন বুড়ো বর দেখে—'

'তুই থাম্!'

'থামব কি কর্তা? এ যে একেবারে আমাদের গাঁয়ের ত্রিলোচন চাটুজ্জের বিয়ের ছবিটা এঁকে দিয়েছেন। আমি সে বিয়েতে বরের সঙ্গে গিয়েছিলুম। সত্তর বছরের বুড়ো, বিয়ে করতে গেছে কুলীনের ঘরের দশ বছরের মেয়েকে। বুড়োর মাথা থরথর

করে কাঁপে, শরীর যেন অষ্টাবক্র মুনি। বর দেখেই মেয়ের মা-র সে কি আছাড়ি-পিছাড়ি কান্না। বলে, "মেয়ে আমার সারাজীবন আইবুড়ো থাক সে-ও ভালো, কিন্তু ওই ঘাটের মড়ার হাতে দিলে তিনদিনে হাতের শাঁখা ভেঙে সিঁথের সিঁদুর মুছে ফিরে আসবে।" মেয়েকে কিছুতে আনতে দেবে না স্ত্রী-আচারে, জড়িয়ে ধরে বসে রইল। শেষে জোর করে মা-টাকে নিয়ে গিয়ে একটা ঘরে শেকল-বন্ধ করে রাখলে। সেখান থেকে তার সমানে মাথা কোটা আর চিৎকার—'

'থাম রঘু, চুপ কর। আমার ভালো লাগছে না।'

'সত্যি কর্তা, এ-সব কাণ্ড-কীর্তি দেখলে আপনাদের জাতটার ওপরেই ঘেন্না ধরে যায়। সমাজের চুড়োর ওপর বসে রয়েছেন কিন্তু একেবারে কশাইয়ের মতো আচার-আচরণ। আপনার পাল্লায় পড়ে অনেকদিন তো বোষ্টুমদের সঙ্গে কাটালুম। দেখলুম, ভণ্ডামি আছে বিস্তর, খামোকা হাউমাউ করে কাঁদে, এক-একটা ষাঁড়ের মতো কেঁদো গোসাঁই পঁচিশটে করে সেবাদাসী নিয়েও বেড়ায়; খিচুড়ি-মালপো গিলতে পারে রাক্ষসের মতো, অথচ অন্যের খিদে পেলে শুকনো হর্তুকীর গল্প শোনায়!'

ত্রিলোচন চাটুজ্জের বিয়ের কাহিনীতে চোখে জল এসে গিয়েছিল, কিন্তু শেষ কথাটা শুনে অনিচ্ছা সত্ত্বেও হেসে ফেললেন ভারতচন্দ্র।

'সেই হর্তুকীর দুঃখ দেখছি তোর এখনো যায়নি!'

'আজ্ঞে সে কি সহজে যাবার? ইচ্ছে হয়েছিল, বাবাজীর দাড়ির গোছাটা ধরে জোরে একটা টান দিই! তবু বলব কর্তা, বামুনদের চাইতে বোষ্টুমরা ঢের ভালো। তারা দিনরাত লোকের হাঁড়িকুঁড়ি নিয়ে মাথা ঘামায় না, তাদের মন নরম, পারৎপক্ষে কারুর অনিষ্ট করে না, মনে দয়া-ধর্মও আছে। আর বামুন? বাপ্‌রে, তাদের ক্ষুরে পেন্নাম!'

চোখ কৌতুকে চকচক করতে লাগল, কিন্তু মুখে গাম্ভীর্য টেনে আনলেন ভারতচন্দ্র।

'ব্রাহ্মণের নিন্দে করছিস হতভাগা? নরকে যাবি!'

'যাই যাব। চিত্তির গুপ্তকে বলব, ঠাকুর, যে নরকে বামুন নেই, দয়া করে সেইখানেই ঠাঁই দিও আমাকে।'

ভারতচন্দ্র বললেন, 'তা হলে তোর আর নরকবাস অদৃষ্টে নেই। বামুন নেই, এমন নরক হতেই পারে না। বরং যেখানে যাবি দেখতে পাবি তাদের ভিড়টাই বেশি। সে যাক।'—মৃদু হেসে বললেন, 'তা ছাড়া সে-রকম নরক যদি থাকেই, আমাকে পাচ্ছিস কোথায়? আমিও তো বামুনদের—'

রঘুনাথ বাধা দিলে: 'বালাই ষাট্! আপনার পুণ্যের শরীর, নরকে যাবেন কোন্ দুঃখে?'

'যমরাজ তোর সাক্ষী শুনবেন?'

রঘুনাথ বিব্রত হয়ে বললে, 'যেতে দিন কর্তা, ও-সব ভাবনা পরে ভাবা যাবে। কিন্তু এখন তো সুদিন আসছে বলে মনে হয়। যদি অনুমতি করেন, তা হলে কালই মা-ঠাকরুণকে আনবার জন্যে আমি সারদায়—'

'দাঁড়া, দাঁড়া, আগে থেকেই অমন করতে নেই। রাজারাজড়ার মেজাজ, কাব্য শুনিয়ে যদি উলটো ফল হয়! তখন যদি মহারাজ আমার গর্দান নিতে চান? তোর

মা-ঠাকরুণকে ডেকে এনে সেইটেই দেখাতে চাস নাকি ?'

'আপনার সঙ্গে কথা কয়ে খালি সময় নষ্ট—', বিরক্ত হয়ে চলে গেল রঘুনাথ।

কিন্তু মনের অস্বস্তি কাটছে না ভারতচন্দ্রের। তিনদিন ধরে মহারাজের দর্শন নেই। একে তো এই সব উৎসবের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত, তার ওপরে নানা কারণে তাঁর মন-মেজাজ অত্যন্ত খারাপ। কালীপুজোর পরের দিন নাকি কাশিমবাজার থেকে একজন কুঠিয়াল ইংরেজ এসে মহারাজের সঙ্গে গোপনে কী সব আলোচনা করে গেছে। সেই থেকে মহারাজ তিরিক্ষে হয়ে রয়েছেন।

খবরটা দিয়েছেন গোপাল চক্রবর্তী স্বয়ং। বলেছেন, 'ইংরেজরা নাকি যুবরাজ মীর্জা মামুদকে মোটেই চটাতে চায় না, আর রাজা রাজবল্লভ তাদের আপনার জন। তারা দু'দিক রাখতেই চেষ্টা করবে। আর এই দুজনেই মহারাজের চক্ষুঃশূল। তাই—'

সুতরাং কৃষ্ণচন্দ্র অনেক জটিল ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত। অন্তরঙ্গ পার্ষদ হিসেবে মহারাজের কিছু কিছু মনের কথা ভারতচন্দ্রও জানেন, অনেক আলোচনাও দরবারের আশপাশ থেকে শুনেছেন। মুর্শিদাবাদকে ঘিরে ঘিরে যে মেঘ ঘনাচ্ছিল, তার ছায়া আরো কালো হয়ে নেমেছে, হয়তো এইবারে ঝড় উঠবে। এর মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের সময় কই অন্নদামঙ্গল শোনবার ?

এইভাবেই কাটবে। এই চল্লিশ টাকা মাসোহারা, এই শঙ্কর-বলরাম-গোপালভাঁড়ের সঙ্গে রাজার মেজাজ বুঝে মনযোগানো, হিন্দী-বাংলা-ফার্সী-সংস্কৃত মেশানো কবিতা, ধেড়ে-ভেড়েকে নিয়ে মোটা রসিকতা। লীলাকে নিয়ে ঘর আর কোনোদিনই বাঁধা হবে না!

শুধু এইটুকু সান্ত্বনা, তাঁর ভিখারিণী অন্নপূর্ণা মা-র আদেশ তিনি পালন করতে পেরেছেন। মনের সব মমতা ঢেলে ভিখারী শিবের দুঃখ-সুখের ছবি এঁকেছেন। আর অন্তত একজন তাঁর কবিতা শুনে আনন্দ পেয়েছে। সে এমন কেউ নয়—চন্দ্রাবলী। তাঁর মালিনী।

কিন্তু মহাকবি কালিদাস কাকে কাব্য শুনিয়ে সবচেয়ে বেশি সুখী হতেন? মালিনীকে, না মহারাজ বিক্রমাদিত্যকে ?

এ-কথার উত্তর কেউ দিয়ে যায়নি। কোনো পণ্ডিত তা জানেন না।

এমনি অনিশ্চয়তার ভেতরে আরো দিনকয়েক কেটে গেল। তারপর একদিন ডাক এল মহারাজার কাছ থেকে।

'কাল থেকে রাজসভায় কাব্যপাঠ শুরু হবে।'

'ব্রহ্মস্বরূপা পরমা জ্যোতীরূপা সনাতনী—'

মনে মনে স্মরণ করে ভারতচন্দ্র চেয়ে দেখলেন সভার দিকে। মাথায় ধবল ছত্র, দু'পাশে চামর দুলছে, বহুমূল্য সিংহাসনে মখমলের কোমল পাদপীঠে পা রেখে বসেছেন স্বয়ং নবদ্বীপের অধীশ্বর মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়। সিংহাসনের কিছু নীচে দু'পাশে রাজার দুই পক্ষের ছয় পুত্রের পাঁচজন সাবালকই আসীন। তা ছাড়া চার জামাতা, দুই ভগ্নীপতি, ভাগিনেয়, ভাগিনীজামাই, পিসে শ্যামসুন্দর। শ্যামসুন্দরের তিন জামাই, জ্ঞাতির দল; এ ছাড়া পণ্ডিত-পারিষদ, দেওয়ান, রাজবৈদ্য, রাজজ্যোতিষী,

নর্তক, বাদক, মোগল-ভোজপুরী-বুন্দেলখণ্ডী সেনানায়কেরাও সভা আলো করে রয়েছেন। আর সকলের মাঝখানে বিকশিতদন্ত গোপাল ভাঁড়, তার পাশে হরষিতকে কানে কানে ক্রমাগত কী যেন বলে চলেছে।

গোপাল ভাঁড়ের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিলেন ভারতচন্দ্র ; লোকটাকে যে ঠিক ঘৃণা করেন তা নয়, ওকে যেন নিজের দর্পণের মতো মনে হয়। যেন ওরই ভেতরে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখতে পান—এক বিলাসী রাজার সভায় কর্মহীন এক বিদূষকের ভূমিকা!

'ব্রহ্মস্বরূপা পরমা জ্যোতীরূপা সনাতনী—'

আবার দেবী ব্রাহ্মণী ইরাকে স্মরণ করলেন ভারতচন্দ্র। মনে পড়ল, একদিন ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর ফরাসডাঙার বাড়িতে সমস্যা পূরণ করে তাঁকে রাজার কাছে পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। আজও তাঁর আর এক পরীক্ষার দিন। আজ দরবারসুদ্ধ লোক তাঁর বিচার করবে, পরীক্ষা হয়ে যাবে সত্যি সত্যিই তাঁর কবিতার কোনো দাম আছে কিনা। এ দেবানন্দপুরে রামচন্দ্র মুন্সীর বাড়িতে সত্যনারায়ণের পুঁথি পড়া নয়, কৃষ্ণচন্দ্রের দরবার সমঝদারের জায়গা, রসিকের আসর।

মহারাজকে একটু শুকনো, একটু বিষণ্ন মনে হচ্ছিল। তবু মৃদু হেসে বললেন, 'আরম্ভ করো হে ভারত!'

'হাঁ খুড়ো, শুরু করে দাও। পাতা পেড়ে বসে আছি অনেকক্ষণ, গরম লুচি-টুচি দু'একখানা ছাড়ো।'—গোপাল ভাঁড়ের মন্তব্য শোনা গেল। পুঁথিটিকে একবার মাথায় ঠেকিয়ে নিরুত্তরে পাতা খুললেন ভারতচন্দ্র।

মহারাজ বললেন, 'একটু দাঁড়াও। আচ্ছা ভারত, পুঁথি পড়তে তোমার ক'দিন লাগবে?'

'অনুগ্রহ করে রোজ যদি দু দণ্ড ধরে শোনেন, তা হলে দশ দিন।'

'বেশ, তাই হবে।'—তারপর সভার দিকে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে মহারাজ বললেন, 'কিন্তু একটা আদেশ আছে আমার। পুঁথি যতক্ষণ শেষ না হয়, ততক্ষণ কেউ কোনো মন্তব্য করবেন না, কোনো কথা বলবেন না।'

'আজ্ঞে ফিসফিস করেও না?'—গোপাল ভাঁড় জানতে চাইল।

কঠোর গলায় মহারাজ বললেন, 'না। তা হলে তখনই সভা থেকে বের করে দেব।'

তারপর দেশের সেই গুণিজন-প্রতিপালক দানধ্যান অমিতকীর্তি চার সমাজের অধিনায়ক মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় ভারতচন্দ্র পড়ে চললেন তাঁর কাব্য। বন্দনা শেষ হল, সভা-বর্ণনা সাঙ্গ হল, তারপর আরম্ভ হল পার্বতী-পরমেশ্বরের কাহিনী। দক্ষযজ্ঞের সূচনা, দশমহাবিদ্যার রূপ, দক্ষের শিবনিন্দা, সতীর দেহত্যাগ, যজ্ঞবিনাশ, পীঠের বিবরণ ; দেবীর নবজন্ম, শিব-বিবাহের আয়োজন, মদনভস্ম, রতিবিলাপ, শিব-বিবাহ, হরগৌরীর সংসার ; দরিদ্র সংসারে দাম্পত্য-কলহ, ভিখারী শিব, অন্নপূর্ণার রূপ ; ব্যাস ও ব্যাসকাশীর কথা, শেষে দেশে মানসিংহের আবির্ভাব, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের সৌভাগ্যোদয়ের বৃত্তান্ত—কাহিনীর সমাপ্তি।

এই দশ দিন ধরে নানা অভিব্যক্তি ফুটে উঠল শ্রোতাদের মুখে। ছন্দ-অলংকারের ছটায় কখনো তাঁরা মুগ্ধ হয়ে বসে রইলেন, কখনো বা বাক্-চাতুর্যে চকিত হলেন,কখনো বা উচ্ছ্বসিত কৌতুকের হাসিতে সভা মুখরিত হল। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা প্রথমে উপেক্ষার ভাব করে বসেছিলেন, ক্রমে ক্রমে তাঁরাও যেন আকৃষ্ট হয়ে উঠতে লাগলেন। দশ দিন পরে কাব্যপাঠ সমাপ্ত হল। গ্রন্থ বন্ধ করে ভারতচন্দ্র উচ্চারণ করলেন,

"যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।

পূর্ণং ভবতু তৎ সর্বং ত্বৎ প্রসাদাৎ সুরেশ্বরী—"

সকলের আগে উঠে দাঁড়ালেন প্রাচীন গদাধর তর্কালংকার। পৈতাটি তুলে ধরে বললেন, 'অপূর্ব হয়েছে তোমার কাব্য। আশীর্বাদ করছি নরলোকে খ্যাতি তোমার অক্ষয় হোক।'

রাজকবি বাণেশ্বর বিদ্যালংকার বললেন, 'ভাষার কবিতায় আমি বিশ্বাস করি না। সংস্কৃতই একমাত্র উচ্চাঙ্গের কাব্যরস বহন করতে পারে। তবু ভারতচন্দ্রের কাব্য শুনে আমি প্রীত হয়েছি। এতে তরলতা আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু বিস্ময়কর কবিত্বের স্ফুরণও হয়েছে। আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি।'

বাণেশ্বর এই প্রথম স্বীকৃতি দিলেন ভারতকে। অন্য পণ্ডিতেরা বললেন, 'সাধু, সাধু!' কালিদাস সিদ্ধান্ত অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি মুগ্ধস্বরে বললেন, 'রসে অলংকারে অনুপম। সমস্ত শাস্ত্র-পুরাণ মন্থন করা বিদ্যা। ভাষায় এমন কাব্য আর লেখা হয়নি। মহারাজের শতরত্ন সভায় কবি ভারতচন্দ্র শ্রেষ্ঠ রত্ন।'

গোপাল ভাঁড় বললে, 'বুড়ো ব্যাসটাকে খুব জব্দ করে দিয়েছ খুড়ো। "গর্দভ হইবে বুড়ী এখানে যে মরে।" হা-হা-হা। কিন্তু খামোকা তুমি আবার হরিহর অভেদ-টভেদ করতে গেলে কেন? ও জায়গাটা কেটে দাও। ও-সব ন্যাড়ানেড়ীগুলোর কথা শুনলেও গা জ্বালা করে। বরং শিবকে আর একবার ক্ষেপিয়ে দিয়ে বোম্টুম-টোম্টুমগুলোকে নিকেশ করে ফেলো।'

আফিঙের নেশায় টকটকে রাঙা চোখ মেলে রাজার পিসেমশাই শ্যামসুন্দর চাটুজ্জে বললে, 'তুমি থামো গোপাল। কীলোৎপাটীব বানরের মতো তুমি আর অব্যাপারে নাক গলিয়ো না।'

বিষ্ণুভক্ত মুক্তিরাম মুখুজ্জে বললেন, 'অপূর্ব—অপূর্ব! ভারত, তোমার মনে কোনো সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি নেই, তুমি শ্যাম ও শ্যামার অভেদত্ব উপলব্ধি করেছ, এ দেখে বড়ো আনন্দ হল।'

শুধু মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র গম্ভীর বিষণ্ন হয়ে বসে রইলেন। সভাসদদের আলোচনা, মন্তব্য, কিছুই তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন না। কপালে কয়েকটা কুঞ্চিত রেখা, চোখ অর্ধনিমীলিত।

একটু পরে ডাকলেন, 'ভারত!'

'আদেশ করুন, মহারাজ।'

'তোমার রচনা অতি উত্তম। কিন্তু—কিন্তু এ আমি চাইনি।'

এক মুহূর্তে সভা স্তব্ধ হয়ে গেল। পরম কাব্যরসিক, মহাপণ্ডিত রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছ থেকে এ প্রত্যাশা কেউ করেনি। এমন কি গোপাল ভাঁড় পর্যন্ত আশ্চর্য হয়ে চেয়ে

রইল, বিবর্ণ হয়ে গেল ভারতচন্দ্রের মুখ।

রাতের পর রাত, দিনের পর দিন। আহার-নিদ্রা ছিল না, বিশ্রাম ছিল না। সমস্ত মনপ্রাণ, জীবনের সব সাধনা ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যের প্রতিটি ছত্রে ঢেলে দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত এই তাঁর পারিশ্রমিক!

রাজা বললেন, 'তোমার কাব্য অসম্পূর্ণ। এ রাজসভার যোগ্য নয়।'

'মহারাজ—!'

'আজ সন্ধ্যাবেলায় তুমি আমার সঙ্গে দেখা করবে—', রাজা সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন : 'তখন আমার যা বক্তব্য সে আমি তোমাকে বলব। সভাভঙ্গ হল আজকে।'

অন্তঃপুরের দিকে চলে গেলেন মহারাজা। দরবারের আর এক দরজা দিয়ে মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেলেন ভারতচন্দ্র, তখন আর মাটি নেই তাঁর পায়ের তলায়।

সারাদিন আর ঘরে ফিরলেন না। উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ালেন শহরের পথে পথে—বার বার নিজেকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হল : কী হল—কী হল? শেষ পর্যন্ত এরই জন্যে একটা বছর তিনি কৃষ্ণনগরে চাটুকারী করে কাটালেন? 'তদর্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—' কিন্তু রাজসেবার চাইতে ভিক্ষাও ভালো। সেখানে আত্ম-মর্যাদার কোনো বালাই থাকে না বলে আত্মসম্মান হারাবার কোনো ভয়ও থাকে না। এ-ই রাজা? এ-ই রসিকশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণচন্দ্র? এঁরই স্তুতিগানে তিনি পাতার পর পাতা ভরিয়েছেন?

ভারতচন্দ্র খড়ে নদীর ধারে এসে দাঁড়ালেন। ওপারে সবুজ মাঠ, কৃষকের খড়ের চালা, আম-জাম-বাঁশবনের ছায়া ঘন হয়ে আছে। ওখানকার মানুষগুলো কাব্য বোঝে না, ব্যাকরণ বোঝে না, অলংকার বোঝে না। একমুঠো হাসিকান্না নিয়ে এতটুকু জীবন—কোনোমতে বেঁচে থাকবার চেষ্টা। রাজা-মগ-বর্গী-ফিরিঙ্গি—ওদের কাছে সব সমান। ওরা সকলের শিকার। ডাকাত লুট করে নিয়ে যায়, বর্গীতে গ্রামের পর গ্রামে আগুন জ্বালিয়ে দেয়, রাজার কাছারীতে ধরে এনে ওদের জাঁতা-পেষাই দিয়ে রস নিংড়ে বের করে নেওয়া হয়। ভারতচন্দ্রের আজ মনে হল, ওদের চোখের জলের অভিশাপেই রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্ব গেছে, সেই অভিশাপই তাঁকে ঠেলে দিয়েছে বর্ধমানের রাজকারাগারে, দেশ-দেশান্তরে তাঁকে ছুটিয়ে বেড়িয়েছে। তবু তাঁর মোহ কাটেনি, তবু রাজসভাতেই আবার তিনি ভাগ্যের সন্ধান করেছিলেন।

ভালোই হয়েছে। ভিখারী শিব আর ভিখারিণী অন্নপূর্ণা তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছেন, ও তাঁর জায়গা নয়!

একটা গাছের ছায়ায় বসে অনেকক্ষণ নদীর দিকে চেয়ে রইলেন ভারতচন্দ্র। বর্ষার ভরাস্রোতের জল কার্তিকে এখন শীর্ণ হয়ে গেছে, তবু খড়ে ছুটেছে খরধারায়। ওই স্রোতের দিকে তাকিয়ে সেই আঠারো বছরের দিনগুলোর স্বপ্ন দেখতে লাগলেন তিনি। বেশ ছিল সেই জীবন। এমন করে আবার সেই রাজসভার পাপচক্রে এসে পড়বেন—কে ভাবতে পেরেছিল সে-কথা?

চলে যাবেন এখান থেকে? কোনো শান্ত পাড়াগাঁয়ের ছায়ায় গিয়ে খুলবেন টোলচতুষ্পাঠী? কিন্তু আজকাল কেউ আর সংস্কৃত পড়ে না, এখন কালিদাস-মাঘ-ভবভূতি-ভারবিতে লোকের অনুরাগ নেই। যাজন-যজন করবেন? তাতে আপত্তি

নেই। ব্রাহ্মণ-সন্তানের ওতে লজ্জা পাওয়ার কথা নয়।

বিকেলের আলো শেষ হয়ে নদীর জলে সন্ধ্যা নামল: কালো হয়ে উঠল খড়ের স্রোত, তারার ছায়া জলের টানে ছুরির ফলার মতো দীর্ঘায়িত হল। শঙ্খঘণ্টার আওয়াজ উঠল। তখন ওপারের মাঠ-ঘাট অন্ধকার আরো অনিশ্চিত হয়ে এল—পেছনে শহরের আলোগুলোই তখন তাঁকে ডাকতে লাগল। মনে পড়ে গেল, রাজা তাঁকে সন্ধ্যার সময় দেখা করতে বলেছিলেন।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে ভারতচন্দ্র ফিরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়ালেন।

সন্ধ্যাপুজো শেষ করে রাজা খাসকামরায় অপেক্ষা করছিলেন তাঁরই জন্যে। যেতেই ডাক পড়ল।

ফিরিঙ্গি-কেতার আরামকেদারায় শুয়ে রাজা গড়গড়া টানছিলেন। ঘরে তিনি একা। বললেন, 'বোসো।'

রাজাকে প্রণাম করে নিঃশব্দে আসন নিলেন ভারতচন্দ্র।

কৃষ্ণচন্দ্র মুখ থেকে গড়গড়ার নল নামিয়ে রাখলেন। হাসলেন সস্নেহে।

'খুব অভিমান হয়েছে, না ভারত?'

'না মহারাজ, অভিমান আবার কিসের? আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারিনি—এ আমারই দুর্ভাগ্য।'

'কাব্য তোমার উৎকৃষ্ট হয়েছে ভারত, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ-ও তো মুকুন্দরামের মতোই হল। সেই দেবতার বন্দনা, সেই দেবতার কাহিনী, সেই নাম-মহিমা, তীর্থ-মাহাত্ম্য, তার ফাঁকে ফাঁকে মানুষের সাদামাটা সুখ-দুঃখের কথা। তোমার কাব্যে রস কোথায় ভারত?'

'রস নেই মহারাজ?'—ভারতচন্দ্র চমকে উঠলেন।

'না, রস নেই। রসের শ্রেষ্ঠ আদিরস, তাই যদি না থাকে, তা হলে চণ্ডীর গীত লেখা হতে পারে, কিন্তু কাব্য হয় না। স্বয়ং কালিদাসের কুমার-সম্ভব দ্যাখো। দেবতাকে আশ্রয় করেও—'

ভারতচন্দ্র মাথা নামালেন: 'কিন্তু মহারাজ, কুমার-সম্ভবের ও অংশটা কি খুব শোভন হয়েছে?'

'কাব্য কাব্যই, তা কামন্দকীয় নীতিসার নয়। রস যেখানে আসল কথা, শোভন-অশোভনের প্রশ্ন সেখানে অবান্তর। তুমি বিহ্লন পড়েছ, ভারত?'

'পড়েছি মহারাজ।'

'অমরু শতক?'

'পড়েছি।'

'রাজশেখর?'

'দেখেছি মহারাজা।'

'তুমি তো ভালো ফার্সী জানো। কিস্সা পড়েছ কিছু কিছু?'

'পড়বার সৌভাগ্য হয়েছে।'

'তবে তো তুমি সবই জানো।'—মহারাজ একটু থামলেন: 'দিনকাল দেখতে পাচ্ছ না? লোকের রুচি বদলে যাচ্ছে, মন বদলে যাচ্ছে। দেবতার কথা শুনতে কারো আর

ভালো লাগে না। রামায়ণ গান, কথকতায় লোকের আর মন নেই, এখন খেউড় গান শ্নেতে তারা ভিড় করে। একালে অন্নদার কথা কে শ্নবে ভারত ?'

'কিন্তু মহারাজ, ইতরের রুচি পরিচর্যা করাই কি কবির কাজ ?'

'কবিরও তো শ্রোতা চাই, ভারত!'—কৃষ্ণচন্দ্র হাসলেন: 'রাজসভায় যারা বাহবা দিয়েছে, তাদেরও মন পড়ে আছে নদে, শান্তিপুরের খেউড়ের দিকে। তা ছাড়া আসল কথা, আমি তোমাকে কবি হিসেবেই দেখতে চাই, পাঁচালী-লিখিয়ে বলে নয়। আর—'

মহারাজ একটু থামলেন। ভারতচন্দ্র বললেন, 'আর ?'

'নানা ঝঞ্ঝাটে আমারও মন-টন একেবারেই ভালো নেই। চারদিক থেকে কেমন মেঘ ঘনিয়ে আসছে। কী যে হবে কিছুই বুঝতে পারছি না। এগুলো ভুলতে চাই, ভারত। মজিয়ে দাও, নেশা ধরিয়ে দাও।'

একটু চুপ করে থেকে ভারতচন্দ্র বললেন, 'কিন্তু আমার তো কালিদাসের মতো সাহস নেই মহারাজ। তিনি কুমার-সম্ভবে যা করেছেন তা আমার সামর্থ্যে কুলোবে না।'

'তার দরকার নেই। নতুন অংশ জুড়ে দাও তোমার কাব্যে।'

'নতুন অংশ ?'

'হাঁ—আদি রস। সব রসের সেরা, কাব্যের প্রাণ। আর তুমি তো জানো, আমি বীরাচারী—শাক্ত। তন্ত্রের সাধনায় যার দীক্ষা হয়েছে, ভৈরব-ভৈরবীর নিগূঢ় রহস্য যার জানা, তার এ-সব নিরিমিষে মন উঠবে কেন ? অতএব—' অল্প একটু হেসে মহারাজ আবৃত্তি করলেন 'চৌর পঞ্চাশৎ':

"অদ্যাপি তাং মকরকেতুশরাতুরাঙ্গী—
মুক্তাঙ্গপীবরপয়োধরভার ঘিন্নাম্।
সংপীড্য বাহুযুগলেন পিবামি বক্তুং
প্রোম্মত্তবম্মমধুকরঃ কমলং যথেষ্টং—"

মহারাজ একটু থামলেন। বললেন, 'হালিশহরের রামপ্রসাদ সেনের নাম শ্নেছ ?'

'শ্নেছি। পরম ভক্ত সাধক তিনি। মহারাজ তাঁকে বিশেষ অনুগ্রহ করেন তা-ও শ্নেছি।'

'হুঁ, লোকটা অদ্ভুত। ভক্তি আর প্রতিভার আশ্চর্য সমন্বয় হয়েছে তার মধ্যে। কিন্তু রামপ্রসাদ আধা-পাগল, শ্যামা-সঙ্গীত গেয়েই তার দিন কাটে। সে একখানা "বিদ্যাসুন্দর" লিখেছিল বটে, কিন্তু জমেনি। ও-সব লোককে দিয়ে হয় না।—' মহারাজ এবার ভারতচন্দ্রের দিকে তাকালেন: 'তুমি পারো নতুন একখানা বিদ্যাসুন্দর লিখতে ?'

'আমি ?'

'তুমিই যোগ্য লোক হে। তা ছাড়া মহাকালীর মঙ্গলকাব্যে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীই তো খাপ খাবে সবচাইতে বেশি। যাও, লিখে ফেলো।'

নতশিরে ভারতচন্দ্র বসে রইলেন কিছুক্ষণ। দেউড়ী থেকে নহবতের আওয়াজ আসতে লাগল, আসতে লাগল ঘড়ি বাজবার শব্দ। একটা নিঃশ্বাস ফেললেন, তারপর উঠে দাঁড়ালেন ধীরে ধীরে। বললেন, 'আদেশ শিরোধার্য, মহারাজ। আমি চেষ্টা করব।'

॥ এগারো ॥

ঘরের ভেতরে, বারান্দায় অস্থিরের মতো পায়চারি করছিলেন ভারতচন্দ্র। আদি-রস। আদিরসের বন্যা বইয়ে দিতে হবে, রাজার মন ভালো করে দিতে হবে, দেশের লোকের ইতর-রুচির উপাসনা করতে হবে! যে শ্রদ্ধা-ভক্তি নিয়ে অন্নপূর্ণার মহিমা বন্দনা রচনা করতে চেয়েছিলেন, সেই মনকে আজ চালনা করতে হবে গণিকাবৃত্তির দিকে।

রাজা তন্ত্রের উপাসক। তিনি হয়তো আদিরসকে সাধন-রহস্যে পৌঁছে দেবেন, বলবেন, 'এ তো বীর-সাধকের সিদ্ধিলাভের পথ।' কিন্তু সাধারণ মানুষ? তাদের ক'জন কাব্যের আড়ালে তত্ত্বের সন্ধান করে? তন্ত্রের আসল রহস্য বুঝতে সাধকেরও বিভ্রম ঘটে, আর কাব্যের আধারে তা—

শুধু বিকার ফেনিয়ে উঠবে, শুধু উদ্‌ভ্রান্তি দেখা দেবে। আর লোকে বলবে, ভারতচন্দ্র রায় বাংলা ভাষায় ভারী রংদার কেচ্ছা লিখেছে একখানা, তা ফার্সী কেচ্ছাকেও লজ্জা দেয়।

অসম্ভব! পারবেন না ভারতচন্দ্র।

তার চাইতে চলেই যাবেন এখান থেকে। লীলাকে নিয়ে কোনো দূর গ্রামে বাসা বাঁধবেন, যজন-যাজন করেই একভাবে দিন কেটে যাবে। রাজার ছেলে হয়েও দারিদ্র্যকে তিনি জেনেছেন, পথে পথে ঘুরেছেন, গাছের তলায় হাটে মাঠে কত রাত কত দিন তাঁর কেটেছে। বলতে গেলে ঐশ্বর্যের কথা আজ ভুলেই গেছেন তিনি। লীলাও গরীবের মেয়ে, নিরন্ন ব্রাহ্মণের সংসারে তার কোন কষ্ট হবে না।

'ঠাকুরমশাই!'

চেয়ে দেখলেন, চন্দ্রাবলী। এমন অসময়ে সে কখনো আসে না।

'তুমি এখন কোথা থেকে এলে?'

'গান শিখতে গিয়েছিলুম ওস্তাদজীর কাছে। কিন্তু কী হল ঠাকুর? কাব্য পছন্দ হল না মহারাজের?'

ভারতচন্দ্র আশ্চর্য হলেন।

'তুমি কেমন করে জানলে?'

'আমরা সব জানতে পারি।'—চন্দ্রাবলী একটু হাসল: 'রাজসভার একজন যে অনুগ্রহ করে আমার কুঞ্জে আসেন যান।'

মুহূর্তে ভারতচন্দ্রের মন ঘৃণায় সংকুচিত হয়ে গেল। যেমন রাজসভা তেমনি তার নর্তকী। এখানে সব সমান। এই মেয়েটিকেই একসময় তাঁর নিজের প্রেরণা বলে বোধ হয়েছিল। ছি—ছি!

চন্দ্রাবলী বললে, 'খুব ঘেন্না হল, না ঠাকুর?'

ভারতচন্দ্র দাঁতে দাঁত চাপলেন: 'না, ঘৃণা করব কেন? যার যা উপজীবিকা!'

'উপজীবিকা নয়, পাপ। আমরা তো নরকের কীট, পাপেই ডুবে আছি। তবুও

সান্ত্বনা আছে। সর্বং কৃষ্ণময়ং জগৎ। যিনি আমার কাছে আসেন, তিনিই আমার কৃষ্ণ। তাঁর ভেতর দিয়ে আমার ঠাকুরের আরাধনা করি।'

'তাই করো। কিন্তু আমি চলে যাচ্ছি এখান থেকে।'

'চলে যাবে? কেন?'

'আমার কাব্যে রাজার মনস্তুষ্টি হয়নি। তিনি আদিরস চান। কবিতায় আমাকে খেউড় গাইতে হবে। সে আমি পারব না।'

চন্দ্রাবলী একটু চুপ করে রইল। তারপর বললে, 'একটা কথা শুনবে আমার?'

ভারতচন্দ্রের সমস্ত মুখ তিক্ত বিস্বাদ হাসিতে ভরে উঠল: 'তোমাদের কথাই তো শুনতে হবে, তোমরাই তো আজ রস-রুচি-কাব্যের ভাগ্যবিধাতা। কালিদাসের পরিণাম ঘটেছিল লক্ষহীরার কুঞ্জে—আমাকেও একদিন তোমার কুঞ্জেই যেতে হবে সব দেনা মিটিয়ে দেবার জন্যে। নইলে আমি রাজকবি হতে পারব না!'

চন্দ্রাবলী জিভ কাটল: 'এমন কথা বলতে নেই, ঠাকুর। এত পুণ্য আমি করিনি যে আমার ঘরে তোমার পায়ের ধুলো পড়বে। এ তোমার অভিমান। কিন্তু আদিরসে তোমার এত বিরাগ কেন?'

'আমি দেবতার পুজোর মন্ত্রই পড়তে চাই চন্দ্রাবলী, শৃঙ্গার শতক আওড়াতে চাই না।'

'কিন্তু নবরসেই তো দেবতার অর্ঘ্য সাজানো যায়।'

বিকৃত মুখে ভারতচন্দ্র বললেন, 'কামকলা দিয়েও?'

'কেন নয়? আদিরসের উপকরণেই তো রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা। সে লীলার কাহিনী শুনে তো কেউ লালসায় আতুর হয় না, ভক্তির অশ্রু নামে তার চোখ দিয়ে। ঠাকুর, লেখাপড়া আমি জানি না—কিন্তু নবদ্বীপের মেয়ে, অনেক মহাজনকে দেখেছি, অনেকের কথা শুনেছি। স্বয়ং মহাপ্রভুও তো গীত-গোবিন্দ পড়ে ভাবে বিভোর হয়ে যেতেন। সে কি আদিরসের জন্যে?'

ভারতচন্দ্র চমকে উঠলেন।

'চন্দ্রাবলী, তাই বলে অন্নদা কাব্যে—'

'ঠাকুর, তোমার কাছে হরি-হর এক। শ্যাম-শ্যামা অভেদ। যদি শ্যামার গান শুনিয়ে থাকো, তাহলে শ্যামের গানও শোনাও তার সঙ্গে!'

'কিন্তু মহারাজ শাক্ত। তিনি তা শুনবেন না।'

'শোনাতে জানলেই শুনবেন।'—চন্দ্রাবলী হাসল: 'তুমি তো পরম পণ্ডিত, তোমাকে আমি আর নতুন কথা কথা কী বলব? তুমি নরলীলাকে আশ্রয় করেই রাধাকৃষ্ণের কথা শোনাও।'

'লোকে তো বুঝবে না। তারা লৌকিক অর্থই করবে।'

'সে তো মহাজন পদাবলীরও করে। যে বোঝবার ঠিক বুঝবে।'

ভারতচন্দ্র হতাশভাবে মাথা নাড়লেন একবার।

'কেউ বুঝবে না চন্দ্রাবলী, বোঝবার লোক কোথাও নেই। সব বিকৃত হয়ে গেছে, সব পচে গেছে। মহারাজের মতোই সারা দেশ এখন শবসাধনায় বসেছে। পচা মড়ার গন্ধ, কারণ আর ভৈরবী, আর কিছুই তারা বুঝবে না।'

'সময় হলে ঠিকই বুঝবে। তুমি লেখো ঠাকুর, আদিরসকে আশ্রয় করে নরলীলার কথাই শোনাও। বাইরে থাকুক বিলাস, ভেতরে থাকুক বৈরাগ্য। তোমার সাধনায় ফাঁকি ঘটবে না।'

ভারতচন্দ্র চন্দ্রাবলীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন এক দৃষ্টিতে। চন্দ্রাবলী লজ্জা পেল।

'কী দেখছ ঠাকুর?'

'তোমাকে।'

'কী আছে আমার মধ্যে দেখবার?'

'ভাবছি, এই কৃষ্ণনগরে তোমাকে কেউ চিনতে পারল না। একটা ছদ্মবেশের আড়ালেই তুমি লুকিয়ে রইলে।'

চন্দ্রাবলী চুপ করে রইল, কথাটার জবাব দিল না। তারপর বললে, 'আমি এখন যাই। তুমি লেখো।'

'লিখব?'

'হাঁ, লেখো। মনে থাকুক রাধাগোবিন্দ, বাইরে থাক লোকলীলা। প্রণাম।'

আবার দু সপ্তাহ পরে হুজুরে সেলাম দিলেন ভারতচন্দ্র।

'মহারাজ, আমার কাব্য প্রস্তুত।'

'আদিরস?'

'হাঁ মহারাজ, বিশুদ্ধ প্রেমকথা।'

'সংস্কৃত নাটকের সেই "হা প্রিয়ে—চন্দ্রাননে! এই মলয় বাতাসে বিরহ জ্বরে আমি জর্জরিত"—এই সব পোশাকী প্রেমের কথা নয় তো?'

'না মহারাজ, এ রসে কোনো আবরণ নেই।'

'সাধু—সাধু!'

একবারের জন্যে অপরিসীম একটা গ্লানির উচ্ছ্বাস মনের ভেতরে ফেনিয়ে উঠল। কিন্তু ভারতচন্দ্র আত্মসংযম করলেন।

মহারাজ বললেন, 'শুভস্য শীঘ্রং। তা হলে কালই হোক।'

কিন্তু মহারাজ, একটি নিবেদন আছে। কালকের আসরে কুমারেরা, মহারাজের পূজনীয় আত্মীয়েরা, তর্কসিদ্ধান্ত, বাচস্পতি, ন্যায়ালঙ্কার, বিদ্যাবাগীশ, ন্যায়পঞ্চানন, বিদ্যালংকার আর প্রবীণেরা কেউই থাকতে পারবেন না।'

কৃষ্ণচন্দ্র হেসে উঠলেন: 'বুঝেছি, আর বলতে হবে না।'

অন্তরঙ্গ আসর বসল পরদিন সন্ধ্যায়। একবার চোখ বুজে কৃষ্ণনাম স্মরণ করলেন ভারতচন্দ্র। শুধু হল 'অন্নদামঙ্গলে' নতুন সংযোজন 'বিদ্যা-সুন্দরের' কাহিনী:

"শুন রাজা সাবধানে পূর্বে ছিল এইখানে
বীরসিংহ নামে নরপতি।
বিদ্যা নামে তার কন্যা আছিল পরমধন্যা
রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী।
প্রতিজ্ঞা করিল সেই বিচারে জিনিবে যেই

পতি হবে সেই সে তাহার।
রাজপুত্রগণ তায়   আসিয়া হারিয়া যায়
ভাবে রাজা কি হবে ইহার—"

তারপর বর্ধমান প্রবেশ, নারীগণের খেদ এবং সুন্দরের মালিনীদর্শন হতেই আসর জমাট হয়ে উঠল। তিনদিন ধরে শ্রোতাদের কারো আর নিঃশ্বাস পড়ল না। শুধু থাকতে না পেরে মাঝখানে একবার গোপাল ভাঁড় চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'কাত করে বই ধোরো না খুড়ো, কাত করে বই ধোরো না। রস গড়িয়ে পড়ে যাবে!'

পাঠ শেষ করে ভারতচন্দ্র যখন বসলেন, তখন স্বয়ং আসন ছেড়ে উঠে এলেন মহারাজ। দু'হাত দিয়ে তুলে ধরলেন ভারতচন্দ্রকে।

'অপূর্ব—অদ্ভুত! কৌতুকে, রসিকতায়, কবিত্বে কামশাস্ত্রকে মহাকাব্য করে তুলেছ তুমি। বিহ্লন, অমরু, রাজশেখর—সবাই ম্লান হয়ে গেছে তোমার কাছে। আজ আমি তোমায় উপাধি দিচ্ছি "রায়গুণাকর"।'

ভারতচন্দ্র জবাব দিলেন না। নীরবে ঘর্মাক্ত কপাল মুছে ফেললেন। সভাসদেরা বললেন, 'মহারাজের জয় হোক।'

রাজা মৃদু হেসে বললেন, 'তবু নিন্দুকের স্বভাবই এই যে, সে খুঁৎ না ধরে থাকতে পারে না। এই অনন্য কাব্য সম্পর্কেও কবির কাছে আমার ছোট একটি অনুরোধ আছে।'

সভাস্থ সকলে আশ্চর্য হলেন, উৎকণ্ঠায় ভরে উঠল ভারতচন্দ্রের মন। শুকনো গলায় বললেন, 'হুকুম করুন মহারাজ!'

গোপাল ভাঁড় বললে, 'মালিনী মাসীকে দিয়ে যদি আর একটু রগড় বাড়ানো যেত—' ধমক দিয়ে রাজা বললেন, 'চুপ—একটা বাজে কথাও তুমি বোলো না। রায়গুণাকর, মশানে সুন্দরের কালীস্তুতির আগে যে অংশটা তুমি লিখেছ, ওই অংশটুকু তোমাকে বাদ দিতে হবে। ওই যে লিখেছ—"চন্দ্র-সূর্য যতদিন রবে"—ততদিন প্রেম অমর, প্রিয়ার জন্যে বারে বারে আমি প্রাণ দেব—এগুলো বড্ড বেশি গম্ভীর হয়ে গেছে। একেবারেই যেন খাপ খায়নি।'

ভারতচন্দ্র চমকে উঠলেন। প্রেমের জন্যে এই মৃত্যু—এই বেদনা, এই কথা—কার কাছে শুনেছিলেন তিনি? সেই চন্দননগর, লালদীঘির ধার—জাঁ নামে সেই অদ্ভুত মানুষটা—

মশানে সুন্দরের কথা ভাবতে গিয়ে তাঁর কি সেই ফিরিঙ্গি মার্সেলের কথাই মনে পড়ে গিয়েছিল?

রাজা বললেন, 'কবি, এই অনুরোধ আমার রাখতে হবে।'

ভারতচন্দ্র বিষণ্ণ হাসি হেসে বললেন, 'তাই হবে মহারাজ, ও জায়গাটা আমি বাদই দেব।'

'তা হলেই কাব্য সর্বাঙ্গসুন্দর হবে।'—একটু থেমে, কী ভেবে রাজা আবার বললেন, 'আমি জানি, তুমি গৃহহীন, নিঃস্ব। তোমার স্ত্রী পিত্রালয়ে পড়ে আছেন, তাঁকে নিজের কাছে নিয়ে আসবার সামর্থ্য তোমার নেই। আমি তোমাকে কিছু ভূ-সম্পত্তি এবং একটি ভদ্রাসন দিয়ে পুরস্কৃত করতে চাই। বলো, কোথায় বাস করতে তোমার বাসনা?'

পারিষদেরা আবার বললে, 'মহারাজ দাতাকর্ণ। তাঁর জয় হোক।'

ভারতচন্দ্র মাথা তুললেন। এতদিনে রাজসেবা সার্থক। কিন্তু কোন্ মূল্যে—কিসের পণ্যে? বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর অন্তরালে কে খুঁজবে রাধাশ্যামের রসতত্ত্ব? কে বুঝবে ও লৌকিক কাহিনী নয়? বিদ্যার সঙ্গে সুন্দরের মিলনে চিরকাল রসলোক গড়ে ওঠে—তার গোপন রহস্য যে এর মধ্যে লুকিয়ে রইল, একজন ছাড়া কে জানবে সে-কথা?

মহারাজ আবার বললেন, 'বলো ভারত, কোথায় বাস করতে চাও তুমি?'

মনে পড়ল ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীকে। সেই এক আশ্চর্য মানুষ। মনে পড়ল বিদ্যাধরীকে, যাকে দেখে তিনি চন্দ্রাবলীকে দেখতে পেয়েছিলেন, আর চন্দ্রাবলীকে না দেখলে হয়তো বিদ্যাসুন্দর লেখাই হতো না। সবই চৌধুরী মশাইয়ের জন্য। তাঁর ঋণ জীবনে কোনোদিন ভোলবার নয়।

'মহারাজ, আমার সব সৌভাগ্যের মূলে চৌধুরী মশাই। তিনিই আপনার মতো কল্পতরুর ছায়ায় আমার আশ্রয় জুটিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর কাছাকাছি, গঙ্গাতীরে কোথাও যদি আমি বাস করতে পারি—'

এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন মহারাজ। ডাকলেন গোপাল চক্রবর্তীকে।

'চক্রবর্তী, ফরাসডাঙার কাছে গঙ্গার ধারে কোন্ গ্রাম ভারতকে দেওয়া যেতে পারে?'

চক্রবর্তী বললেন, 'মহারাজ, মূলাযোড়।'

'খুব ভালো। কালই সব লেখাপড়া করে দেবে। বাড়ি তৈরী করার জন্যেও লোক পাঠিয়ে দাও। আর বাড়ি যতদিন তৈরী না হয়'—মহারাজ ভারতচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন ঃ 'ততদিন তোমার কাছে আমার আর একটি ফরমাস আছে ভারত।'

'বলুন, মহারাজ?'

'নায়ক-নায়িকার লক্ষণ নির্দেশ করে আর একটি কাব্য তুমি লিখে দেবে আমার জন্যে।'

'তাই হবে, মহারাজ।'

আজও অনেক রাত পর্যন্ত পথে পথে ঘুরলেন ভারতচন্দ্র, তারপর এসে দাঁড়ালেন খড়ে নদীর ধারে। ওপারে নিবিড়-পুঞ্জিত অন্ধকার—গ্রামের একটি আলোও চোখে পড়ে না। কী তিথি আজ? মনে পড়ল, অমাবস্যা।

নদীর জলের ওপর একটা মৃদু কুয়াশার আবরণ ছড়িয়ে পড়েছে। শীতের হাওয়া। সেদিনও যে কাশফুলগুলো দেখে গিয়েছিলেন, মনে হল আজ তারা ঝরতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে শহরের আলো, ওপারে হেমন্তের শীতল অমাবস্যা।

সেই অমাবস্যায় গ্রাম ডুবে আছে, দেশ ডুবে আছে। আরো কোন্ অন্ধকার তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে কেউ জানে না। সেই আগামী শীতের রাতের জন্যে ভারতচন্দ্র লিখে গেলেন তাঁর বিদ্যা-সুন্দর। কবিকঙ্কণের গান হারিয়ে যাবে, অন্নপূর্ণার কথা কেউ শুনতে চাইবে না—কিন্তু বিদ্যাসুন্দরের গানে সে রাত বিষে আবিল হয়ে উঠবে। সেই বিষপাত্র ভারতচন্দ্রই আজ দেশের মুখে তুলে দিয়ে গেলেন।

কে বুঝবে সেই কাহিনীর আসল রহস্য? ভারতচন্দ্রের মনের কথা কে জানবে—শুধু একজন ছাড়া?

আজ তিনি বিজয়ী। কিন্তু কোন্ মূল্যে? প্রতিভার কোন্ পণ্যে?

খড়ে নদীর তামস-তরঙ্গ চোখের সামনে দিয়ে একটা মৃত্যুস্রোতের মতোই বয়ে যেতে লাগল।

বাড়ি ফিরে দেখলেন, রঘুনাথ আনন্দে অধীর।

'এমন দিনে এতক্ষণ কোথায় ছিলেন কর্তা? আমি যে কালীবাড়িতে পাঁচসিকের পুজো দিয়ে এলুম!'

'এত আনন্দ কেন?'

'বাঃ, আনন্দ করব না? খেতাব পেলেন, জমি-জায়গীর পেলেন, রাজকবি হলেন —আর কী চাই?'

'এর মধ্যেই কানে গেছে তাহলে?'

'আজ্ঞে শুধু আমার কানে কেন, গোটা কেষ্টনগরেই ছড়িয়ে গেছে। সেই যে মেয়েটি—যে আপনাকে পুজোর ফুল দিয়ে যায়, সেই তো খবরটা দিয়ে গেল আমাকে!'

'চন্দ্রাবলী?'—ভারতচন্দ্র চকিত হয়ে উঠলেন।

'আজ্ঞে হাঁ, সেই চন্দ্রাবলী না বিন্দে দূতী, সেই-ই। সে আরো বলে গেল, আপনার সঙ্গে বোধহয় আর দেখা হবে না।'

'দেখা হবে না?'—যন্ত্রণায় ভারতচন্দ্রের হৃৎপিণ্ডে যেন মোচড় লাগল: 'কেন, কী হয়েছে?'

'মহারাজ তাকে কলকাতার কোন্ মহাজনের বাড়িতে নাচতে পাঠাচ্ছেন। এরপর সেখানেই থাকতে হবে তাকে। আজ রাতেই যেতে হবে রওনা হয়ে। আপনার সঙ্গে তো আর দেখা হবে না, তাই যাওয়ার আগে হাজার হাজার প্রণাম জানিয়ে গেছে আপনার পায়ে।'

ভারতচন্দ্র দাওয়ার ওপর বসে পড়লেন। চন্দ্রাবলী তাঁর কেউ নয়। সে গণিকা, রাজার নর্তকী। তবু—তবু সে না থাকলে ভারতচন্দ্র লিখতে পারতেন কি বিদ্যা-সুন্দর? শ্যামার কাহিনীতে মেলাতে পারতেন শ্যামসুন্দরকে?

হৃৎপিণ্ড থেকে যন্ত্রণাটা যেন মস্তিষ্কের মধ্যে উঠে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। কৃষ্ণনগরে আর থাকা যায় না—আর একদিনও নয়।

'কর্তা এবার অনুমতি করুন!'

কোনো জবাব এল না।

'কই, কথা বলছেন না কেন? অনুমতি করুন!'

'কিসের অনুমতি?'—যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন ভারতচন্দ্র।

'বা-রে, আনতে হবে না মা-ঠাকরুণকে? যেতে হবে না সারদায়?'

'ওঃ!'

'তা হলে কালই রওনা হয়ে পড়ি?'

ভারতচন্দ্র আবার নিজের মধ্যে তলিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'আচ্ছা।'

পাঁচ বৎসর পরে কীর্তিমান কবি ভারতচন্দ্র কৃষ্ণনগর দরবার থেকে মুলাযোড়ে ফিরে এলেন। মুলাযোড়েই তাঁর স্থায়ী বাস, তবু মাঝে মাঝে রাজার চরণে গিয়ে প্রণাম নিবেদন করে আসতে হয়। এবার একটু অন্য ঝঞ্ঝাটও ছিল; পত্তনিদার রামদেব নাগ

অকারণে অত্যাচার করছিল তাঁর ওপর। রাজাকে 'নাগাষ্টক' নামে একটি ব্যঙ্গ কবিতা শুনিয়ে তার প্রতিকারের ব্যবস্থাও করে এসেছেন।

কিন্তু এবার রাজদর্শনের দিনগুলো খুব আনন্দে কাটেনি। কৃষ্ণনগর থমথম করছে, মহারাজার মুখে আষাঢ়ের ঘন মেঘ। আলীবর্দী মৃত। নওয়াজেস মহম্মদ আগেই দেহরক্ষা করেছেন, শওকৎ জঙ্গ যুদ্ধে নিহত, মীর্জা মামুদ নবাব সিরাজউদ্দৌলা হয়ে মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে বসেছেন, তারপরেই কলকাতার ফিরিঙ্গিদের আক্রমণ করে তাদের দুর্গ কেড়ে নিয়েছেন। ফিরিঙ্গিরা প্রাণ নিয়ে পালিয়েছিল, কিন্তু আবার ফিরে এসেছে। এবার নবাবের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ অনিবার্য। 'সাজ সাজ' রব উঠেছে।

জগৎশেঠের চোখে ঘুম নেই। শওকৎ জঙ্গকে সমর্থন করেছিলেন বলে সিরাজ তাঁকে বন্দী করে কারাগারে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু সেনাপতি মীরজাফর তাঁকে বন্দী রাখলে অস্ত্র ধরবেন না প্রতিজ্ঞা করায় বাধ্য হয়ে পূর্ণিয়ার যুদ্ধের সময় নবাব তাঁকে মুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু একবার যখন সিরাজের মনে আগুন জ্বলেছে, তখন তাঁর হাত থেকে জগৎশেঠের আর পরিত্রাণ নেই। এবং জগৎশেঠই যদি যান, তা হলে নবাবের বিরোধী একজন রাজা-জমিদারেরও আর নিষ্কৃতি নেই, স্রোতের মুখে কুটোর মতোই ভেসে যেতে হবে তাঁদের।

সুতরাং সিরাজকে সরাতে হবে। আজ দেখা যাচ্ছে, একমাত্র ফিরিঙ্গি ছাড়া এ কাজ আর কেউ করতে পারবে না। তারা নিজেরা দেশের রাজত্ব চালাক কিংবা মীরজাফরকে নবাব করুক, কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, কিন্তু সিরাজউদ্দৌলাকে যেতেই হবে।

জগৎশেঠের বাড়িতে আলোচনা করে তা-ই ঠিক হয়েছে। সবাই একমত।

শুধু একজন সে বৈঠকে আসেননি, তিনি রানী ভবানী। এই সিরাজউদ্দৌলার জন্যেই তাঁর বিধবা কন্যার সম্মান বিপন্ন হয়ে উঠেছিল। অনেক কৌশলে সেবার নিজের এবং কন্যার মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন তিনি। সিরাজকে তাঁর মার্জনা করবার কথা নয়। অথচ এই রানীই বলে পাঠিয়েছেন, 'দেশের রাজা যেমনই হোক, তবু সে দেশেরই রাজা। আজ তাকে উৎখাত করবার জন্যে ফিরিঙ্গিদের ডেকে আনলে তার পরিণাম শুভ হবে না। খাল কেটে কুমীর ঘরে তুললে অনেক বেশি সর্বনাশ হবে।'

স্ত্রী-বুদ্ধি চিরদিনই অন্যরকম, রাজনীতি বোঝে না। কিন্তু মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র জ্বলছেন অন্য কারণে। তিনিও এই ষড়যন্ত্রের শরিক বলে রানী ভবানী তাঁকে 'ভীরু কাপুরুষ' বলে ধিক্কার দিয়েছেন, 'স্ত্রী জাতিরও অধম' বলে তাঁর জন্যে শাড়ি-শাঁখা-সিঁদুর উপহার পাঠিয়ে দিয়েছেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এখন ক্ষিপ্তের মতো রাতদিন দেওয়ানদের সঙ্গে সলা-পরামর্শ করছেন, ঘন ঘন মুর্শিদাবাদ থেকে খবর আসছে।

ওদিকে আর এক কাণ্ড বাধিয়েছিল রাজবল্লভ। তার বারো বছরের বিধবা মেয়ের দুঃখ সইতে না পেরে সে ঠিক করেছিল বিধবা-বিবাহ চালু করবে। একদল পণ্ডিত মতও দিয়েছিল তার পক্ষে। শুনেই তেলে-বেগুনে জ্বলে গেছেন কৃষ্ণচন্দ্র। 'চার সমাজে'র মাথা তিনি—দেশের সব শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত তাঁর মাসোহারা পান—কৃষ্ণচন্দ্রের সভা থেকে বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ উঠেছে, ভেস্তে গেছে রাজবল্লভের কুমতলব।

এইসব নানা ঝঞ্ঝাটে মহারাজের এখন আর মন-মেজাজের ঠিক নেই। দরবার থেকে সব খবরই পেয়েছেন ভারতচন্দ্র।

কৃষ্ণনগরের এই আবহাওয়ায় শুধু বেঁচে আছে 'বিদ্যা-সুন্দর'। কণ্ঠাভরণ নীলমণি সমাদ্দার আসর জমিয়ে পালা গাইছেন—রসের বন্যায় রসিক শ্রোতারা মশগুল। হত্যা, যুদ্ধ, রক্ত, চক্রান্ত, বিদেশী বণিক—দেশ জুড়ে অরাজকতা বাড়ছে, চোর-ডাকাতের উৎপাত আরো বেশি করে শুরু হয়েছে, আবার দেখা দিয়েছে বর্গীর হাঙ্গামা—বারদরিয়ায় জাহাজের পর জাহাজ লুট করছে ফিরিঙ্গি-মগ-হার্মাদের দল। দেশ অন্ধকার, বিদ্যা বিকৃত, সুন্দরের মৃত্যু হয়েছে, বিদ্যা-সুন্দরের পালা ছাড়া আজ আর কী আছে?

ক্লান্ত, বিমর্ষ মন নিয়ে ভারতচন্দ্র চুপ করে শুয়েছিলেন। ফাল্গুনের সন্ধ্যা। হাওয়ায় আমের মুকুলের গন্ধ। বাইরে থেকে গঙ্গার কলধ্বনি আসছে। হঠাৎ মনে পড়ল, খানাকুল-কৃষ্ণনগরে এমনি এক সন্ধ্যাতেই দীঘির পাড়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তারপর হতভাগা রঘুনাথ—

নবজাতক দ্বিতীয় পুত্রটিকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে লীলা এসে স্বামীর পাশে বসলেন। প্রদীপের আলোয় কিছুক্ষণ উৎকণ্ঠিত ভাবে চেয়ে রইলেন স্বামীর দিকে।

'কই, তোমার শরীর তো ভালো যাচ্ছে না। কৃষ্ণনগর থেকে ফিরে এসে তুমি যেন আরো শুকিয়ে গেছ।'

'আমি রাজবৈদ্য গোবিন্দরাম রায়কে দেখিয়েছিলুম।'

'কী বললেন তিনি?'

'বললেন, বহুমূত্র।'

লীলা চমকে উঠলেন: 'বলো কি গো, সে যে ভারী খারাপ অসুখ!'

ভারতচন্দ্র হাসলেন: 'ভয় নেই, সহজে মরব না। কবিরাজ ওষুধপত্র দিয়েছেন; বলেছেন, সাবধানে থাকতে হবে। যথাসম্ভব বিশ্রাম দরকার, মস্তিষ্কের ছুটি চাই—কাব্য রচনা কিছুদিন বন্ধ রাখলেই ভালো হয়।'

লীলা বললেন, 'আমি তোমার সব পুঁথি-পত্তর দোয়াত-কলম সিন্দুকে তুলে রাখব।'

আবার বিমর্ষভাবে হাসলেন ভারতচন্দ্র: 'সেই ভালো লীলা, সেই ভালো। কী হবে লিখে? কার জন্যে লিখব? আমি তো জানি, আমি কী লিখতে পারতুম—কী লিখে গেলুম! আমার খ্যাতি কিসে টিঁকে থাকবে জানো? ওই বিদ্যা-সুন্দরে। কেউ ওর আসল অর্থ বুঝবে না, কেউ বুঝবে না আমার যন্ত্রণা, শুধু তারিয়ে তারিয়ে পড়বে ওর রসিকতা, মজে থাকবে ওর ভোগবিলাসে, বলবে—সাবাস কবি, সাবাস কবিত্ব! লীলা, কিসের বিনিময়ে আমার এই যশ, এই সৌভাগ্য, এই অর্থ? আমি কী দিতে চেয়েছিলুম, আর কী দিলুম?'

এ নতুন কথা নয়। আজ পাঁচ বছর ধরে স্বামীর এই অন্তর-যন্ত্রণার ছবি দেখছেন লীলা, বার বার শুনেছেন কাতরোক্তি, দেখেছেন দীর্ঘশ্বাস। স্বামীর বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'সারাক্ষণ তোমার এই এক চিন্তা। এইসব ভেবে ভেবেই শরীরটাকে তুমি আরো খারাপ করে ফেলছ।'

ভারতচন্দ্রের আবার রহীমকে মনে পড়ল। আস্তে আস্তে বললেন:

'রহিমন কঠিন চিতান তে,
চিন্তা কো চিত চেত,
চিতা দহতি নিৰ্জীব কো
চিন্তা জীবসমেত—'

লীলা চমকে উঠলেন।

'কী বলছ তুমি ?'

'কিছু না।'

'তুমি আর এ-সব কথা ভাবতে পারবে না।'

'না লীলা, আর ভাবব না। ভাববার আর কিছু নেই।'

এই সময় দোরগোড়ায় দেখা দিল রঘুনাথ।

'কর্তা, আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে এক বোষ্টুমি।'

লীলা বলে, 'এত রাতে ? বলে দে, কাল সকালে যেন আসে, কর্তার শরীর ভালো নেই।'

'আজ্ঞে বলছে, শুধু একটিবার প্রণাম করে যাবে। তা ছাড়া আজ ভোররাতেই চলে যাবে—হয়তো আর কখনো দেখা হবে না। আর কর্তাও তাকে চেনেন। মেয়েটা হল কেষ্টনগরের সেই কী বলে বিন্দে দূতী না—'

'চন্দ্রাবলী ?'—ভারতচন্দ্র চঞ্চল হয়ে বিছানার ওপর উঠে বসলেন : 'সে কোত্থেকে এল ? ডেকে আন্, ডেকে আন্ তাকে।'

'এখানে—এই ঘরে ?'—রঘুনাথ একটু আশ্চর্য হল।

'হাঁ, এই ঘরে !'

লীলা চুপ করে রইলেন, ভালো-মন্দ কোনো মন্তব্য করলেন না। চন্দ্রাবলীর কথা স্বামী তাঁকে অনেকবার বলেছেন। এই মেয়েটিই ছিল নাকি তাঁর কাব্যের প্রেরণা। প্রেরণার অর্থ কী, লীলা বোঝেননি, বোঝবার চেষ্টাও করেননি। কখনো কখনো সন্দেহ আর ঈর্ষার দু-একটা ছোটখাটো কাঁটা বুকের ভেতরে মাথা তুলেছে, কিন্তু স্বামীকে তিনি জানেন—স্বামীকে তিনি বিশ্বাস করেন। পরম ধর্মপ্রাণ চরিত্রবান ভারতচন্দ্র যে কোনো অন্যায় কখনো করতে পারেন না, এইটুকু বিশ্বাসই যথেষ্ট তাঁর পক্ষে।

রঘুনাথ আবার এসে দোরগোড়ায় দাঁড়ালো। তার পেছনে ছায়ার আড়াল থেকে আবার ভেসে এল—সেই বহুদিন, বহুবার শোনা কণ্ঠস্বরটি : 'ঠাকুরমশাই !'

'এসো চন্দ্রাবলী, এসো ভেতরে।'

প্রদীপের আলোয় চন্দ্রাবলী ঘরে পা দিল।

লীলা তাকালেন কৌতূহলে, দেখলেন অল্পবয়সী সুন্দরী একটি বৈষ্ণবী। পরনে গেরুয়া, চুড়ো করে বাঁধা চুল, কপালে তিলক-সেবা, আর হাতে একটি গোপীযন্ত্র। আর ভারতচন্দ্র আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, যে মেয়েটি এলোচুলে গরদ পরে প্রায়ই তাঁকে পুজোর ফুল এনে দিত, তাকে আরো স্নিগ্ধ, আরো উজ্জ্বল বলে মনে হচ্ছে—হঠাৎ যেন চেনাই যায় না।

চন্দ্রাবলী বললে, 'ঠাকুর, প্রণাম। মা-জননী, প্রণাম।'

মাটিতে লুটিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল।

ভারতচন্দ্র কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন ঃ 'এ বেশ কেন তোমার ?'

'এই তো সত্যিকারের বেশ, ঠাকুর। ছিলুম কলকাতায় শেঠ আমীরচাঁদের আশ্রয়ে। তাঁর বাড়িতে যখন নবাবের ফৌজ ঢুকল, রক্তের বন্যা বয়ে গেল—সম্ভ্রম বাঁচানোর জন্যে পরিবারের মেয়েদের তলোয়ারের মুখে শেষ করা হল শেঠজীর হুকুমে—সেদিনই চোখের সামনে থেকে শেষ পর্দাটুকুও সরে গেল। দেখলুম, এই তো ভোগ, এই তো ঐশ্বর্য, এই তো জীবন। তবে আর এ-সব কেন ? বেরিয়ে পড়েছি পথে। পেয়েছি বৈষ্ণবের সঙ্গ—যাচ্ছি শ্রীবৃন্দাবনে।'

ভারতচন্দ্র চুপ করে রইলেন। একদিন এমনি করে তিনিও বৃন্দাবনে চলেছিলেন। কিন্তু পথ তাঁর হারিয়ে গেল—জীবনে আর খুঁজে পেলেন না।

চন্দ্রাবলী বললে, 'যেতে যেতে মূলাযোড় পড়ল। ভাবলুম, আর এক ঠাকুরের ভেতরে আমার শ্রীকৃষ্ণকে দেখেছিলুম। তাঁকে প্রণাম না করে গেলে বৃন্দাবন যাত্রা আমার সার্থক হবে না। রঘুনাথের কাছে শুনেছি, তোমার শরীর ভালো নয়। তবু বিরক্ত করলুম একটিবারের জন্যে, একটিবার দেখে গেলুম, মন আমার পূর্ণ হল। অপরাধ নিয়ো না।'

আর একবার প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালো।

'চলি, ঠাকুর। গৌর তোমাদের কল্যাণ করুন। আসি মা-ঠাকরুণ।'

রাত্রে ভালো ঘুম আসছে না। গায়ের মধ্যে একরাশ অস্বস্তিকর জ্বালা। ভারতচন্দ্র এ-পাশ ও-পাশ করছিলেন। খালি মনে পড়ছে, চন্দ্রাবলীও চলেছে বৃন্দাবনে। কেবল তাঁরই পথ হারিয়ে গেল। জীবনে কী চেয়েছিলেন, কী পেলেন তিনি !

স্বামীর ছটফটানিতে লীলার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠে বসলেন।

'কী, শরীর খারাপ লাগছে ?'

'না, এমন কিছু নয়। বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল দাও।'

ঘরের কোণের সোরাই থেকে একটা রুপোর ছুমুকিতে করে জল এনে দিলেন লীলা। একটুখানি জল খেয়েছেন ভারতচন্দ্র, এমন সময় হঠাৎ চমকে উঠলেন তিনি, খানিকটা জল উপচে পড়ল বিছানায়।

বাইরে মেঘের ডাকের মতো ঘন ঘন গুরু-গুরু রব। কিন্তু মেঘের ডাক নয়। বারুদের আওয়াজ। দূর থেকে আসছে, তবু মাটি পর্যন্ত কেঁপে উঠছে থর থর করে।

'ও কিসের আওয়াজ লীলা, কিসের আওয়াজ ?'

লীলা বললেন, 'এ তো বিয়ের মাস। কোথাও বড়োলোকের বাড়িতে ঘটা করে বিয়ে হচ্ছে, বাজী পোড়াচ্ছে তারা। ও কিছু নয়, তুমি ঘুমোও।'

কিন্তু বাজী পুড়ছিল না। সিরাজউদ্দৌলার বন্ধু, ইংরেজের শত্রু—ফরাসীদের চন্দননগর ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল ক্লাইভের কামানে। চূর্ণ হচ্ছিল ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর কাছারীবাড়ী, ভেঙে পড়ছিল নন্দদুলাল মন্দিরের চূড়া। পলাশী যুদ্ধের বোধনমন্ত্র ছড়িয়ে পড়ছিল আমের মুকুলের গন্ধে, মাতাল বসন্তের হাওয়ায় হাওয়ায়।

নতুন তোরণ

আগে এই বাড়িটার সামনে, পথের ওধারে পুকুরটা পেরিয়ে একটি গোয়ালা পরিবারের বসত ছিল। কটা নারকেল গাছ ছিল তাদের, টিনের চালার খান দুই ছোট ছোট ঘর ছিল। কিন্তু নারকেল গাছ অথবা টিনের ঘর এই দোতলার বারান্দা থেকে তারাকান্ত চৌধুরীর দৃষ্টিকে আড়াল করতে পারত না। এখান থেকে সকাল-সন্ধ্যায় তিনি গঙ্গার জলে সূর্য ওঠা আর ডুবে যাওয়ার রঙের খেলা দেখতে পেতেন, গঙ্গার ঘাটের ধারে সেই পাশাপাশি আটটি শিবমন্দিরের চূড়ো তাঁর চোখে পড়ত, সাদা জলের ওপর জেলে-ডিঙির পাল আর স্টিমারের চোঙা—কিছুই তাঁকে এড়িয়ে যেতে পারত না।

এখন আর তারাকান্ত ও-সব কিছুই দেখতে পান না। কলকাতার সর্বনাশা জমির খিদে এখন শহরতলীর চারদিকে জিভ মেলে দিয়েছে ; চিরকালের জলার ওপর এখন জ্যামিতিক মাপে তৈরী একালের বাড়িগুলো কাচ আর কংক্রীট নিয়ে বিদ্যুতের আলোয় ঝলমল করছে। ভাগাড়-শ্মশান-কবরখানা—কারুরই রেহাই মেলেনি. সি-আই-টি ফ্ল্যাট, পার্ক, নতুন রাস্তা আর মোটরগাড়িতে তাদের জন্মান্তর ঘটেছে।

অতএব গোয়ালারাও তাদের বিঘেখানেকের এই জমিটুকু নতুন কালের মানুষদের কাছে বেচে দিয়ে কোথায় দূর পাড়াগাঁয়ে উধাও হয়েছে। তাদের ভিটেতে মাথা তুলেছে দোতলা-তেতলা খানপাঁচেক বাড়ি—একটি মাত্র নারকেল গাছ এখন অবশিষ্ট আর ওই ছোট পুকুরটা। ভাদ্র মাসের ভরা জলে তার ওপর আজও সবুজ পানার আস্তরণ—ঠিক বিশ বছর আগে এই বাড়ি কেনবার সময়ে তারাকান্ত যেমনটি দেখেছিলেন।

কিন্তু গঙ্গা আর চোখে পড়ে না। শিবমন্দিরগুলো অদৃশ্য। এই বারান্দায় বসে বসে সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের রঙটুকু দেখবার সুখটুকু চিরকালের মতো চলে গেছে তারাকান্তর। আর তিনি ছাড়া, তার জন্যে এ বাড়িতে মন খারাপ করবার মতো লোকও আর কেউ নেই।

ছোট ছেলে সুমন্ত এনজিনীয়ার—সে আলাদা ধাঁচের ; পাঁচ বছর জার্মানীতে কাটিয়ে আসবার পরে গঙ্গার জন্যে সে বিন্দুমাত্রও মাথাধরা বোধ করে না। তাছাড়া তার পোস্টিং হয়েছে হায়দ্রাবাদে, সস্ত্রীক সেখানেই থাকতে হয় তাকে। দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন, শিলং আর বালিগঞ্জে বাস করে তারা, গঙ্গার জন্যে চিন্তিত হয় না। স্ত্রী চিরকাল সংসার আর ঝি-চাকর নিয়ে চ্যাঁচামেচি করে কাটিয়েছেন, এই বুড়ো বয়েসেও তাই করেন, ওর আর ব্যতিক্রম ঘটল না। কেবল অর্চনা—

পানা-পুকুরটার জলে সকালের রোদ পড়েছিল। নিজের ডেক-চেয়ারটায় বসে বসে সেই রোদের ফালিটুকুর দিকে চোখ পড়তেই তারাকান্তের ভ্রূ কুঁচকে উঠল। মনে পড়ল, ছ'টা বাজে—তবু অর্চনা এসে এখনো তাঁকে প্রণাম করে গেল না।

শুধু সামনের ওই বাড়িগুলোই নয়—আরো কিছু ঘটছে, ঘটতে যাচ্ছে। বিশ বছর আগে ভেবেছিলেন, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত দূরের ওই গঙ্গা নারকেল গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে তাঁর চোখের সামনে এমনি সুন্দর, এমনি প্রসন্ন হয়ে থাকবে ; বারো বছর আগে মনে হয়েছিল, হেমন্তকে হারানোর দুঃসহ দুঃখটা একটা শোক-স্নিগ্ধ স্মৃতির

মধ্য দিয়ে তাঁর কাছে চিরকাল পবিত্র হয়ে থাকবে। কিন্তু ওই নতুন বাড়িগুলোর মতোই আর একটা আড়াল আজ তাঁর আর হেমন্তের স্মৃতির মধ্যে এসে দাঁড়াচ্ছে—এখনও ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু তার একটা অস্পষ্ট আশংকাকে কিছুতেই মন থেকে সরিয়ে দিতে পারছেন না তিনি।

ছ'টা বাজে—আজ এখনো অর্চনা তাঁকে প্রণাম করতে এল না। অথচ বারো বছরের অভ্যাসে বরাবর রাত চারটেয় অর্চনার ঘুম ভাঙে, পাঁচটার ভেতরে তার পুজো-পাট সারা হয়ে যায়, সাড়ে পাঁচটার মধ্যেই এই বারান্দায় এসে সে তাঁকে প্রণাম করে।

অসুখ-বিসুখ? না। বারো বছরের নিয়মিত কৃচ্ছ্রসাধনায় অর্চনার স্বাস্থ্য একেবারে নিখুঁত। শীতের ভোরে কনকনে ঠাণ্ডা জলে সে স্নান করে, মাঘ মাসের বৃষ্টিঝরা কঠিন-শীতল রাত্রেও একখানা খদ্দরের চাদর ছাড়া আর কিছুই তার দরকার করে না। এই বারো বছরের ভেতরে একদিনের জন্যেও তার একটু জ্বর বা সামান্য সর্দির কথা মনে করতে পারেন না তারাকান্ত।

অর্চনাকে নতুন করে কলেজে পড়তে পাঠিয়েই কি ভুল করলেন তিনি? সেইখান থেকেই কি বয়ে আনছে এই শিথিলতার হাওয়া? কিন্তু—

লম্বা বারান্দাটার আর এক প্রান্তে পায়ের শব্দ উঠল। আওয়াজটা হাল্কা, এতই হাল্কা যে আজ বারো বছর ধরে অভ্যাস না থাকলে তারাকান্ত শব্দটা শুনতেও পেতেন না। ডেক-চেয়ার থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন, অর্চনা আসছে।

লম্বা ধাঁচের মেয়েটি। গায়ের রঙ ফর্সা নয়, নতুন পাতার মতো উজ্জ্বল শ্যামল। আল্গাভাবে চেয়ে দেখলে যে-কোনো একটি সাধারণ বাঙালী মেয়ের সঙ্গে তার তফাৎ বোঝা যাবে না। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলে চোখে পড়বে ত্রিশ-একত্রিশ বছরের এই মেয়েটির মুখখানা শুধু সুশ্রী নয়, তার চাপা পাতলা ঠোঁটে একটা নিজস্ব চরিত্রের ছাপ আছে। সে আরো দশজনের একজন নয়, একটু আলাদা।

এতদিন তারাকান্ত ভেবেছেন, অর্চনার মুখে ওই নিজত্বটুকু আরোপ করেছেন তিনিই; তাঁরই শিক্ষায় উপদেশে সে এমন একটা স্বতন্ত্র উজ্জ্বলতায় পেঁৗছেছে—যেখানে জীবনের ছোটখাটো দাবি-দাওয়াগুলো সব তুচ্ছ আর মিথ্যে হয়ে গেছে। এই শিখার মতো মেয়েটি তাঁরই হাতে জ্বালানো প্রদীপ—বাইরের সমস্ত দরজাগুলোকে বন্ধ করে দিয়ে পবিত্রতম শোকের সামনে নিষ্পাপ হয়ে জ্বলছে। কিন্তু কিছুদিন ধরেই তারাকান্ত অস্বস্তির মতো অনুভব করছেন, সেই মন্দিরে একটা দরজা-জানলা যা হোক কিছু খুলে গেছে কোথাও—শিখাটাতে এসে লেগেছে হাওয়ার ছোঁয়া।

ছ'টা শুধু আজই বাজল না, মাঝে মাঝে প্রায়ই বেজে যাচ্ছে আজকাল।

চশমার ভেতর দিয়ে তারাকান্ত চোখ দুটো একটু ছোট করে আনলেন।

অর্চনা এসে প্রণাম করল তাঁকে। অভ্যস্ত আশীর্বাদ করলেন তারাকান্ত। বাঁধা নিয়মেই অর্চনা জিজ্ঞেস করল, 'আপনার চা আনব বাবা?'

'আনো।'

অর্চনা চলে যাচ্ছিল, তারাকান্ত ডাকলেন, 'শোনো!'

অর্চনা দাঁড়িয়ে পড়ল।

'তোমার শরীর খারাপ নাকি মা?'

অর্চনার চোখ নেমে এল নীচের দিকে। লজ্জার ছায়া পড়ল গালে।

'না বাবা, আমি ভালো আছি।'

একটু চুপ করে রইলেন তারাকান্ত। চশমার ভেতর দিয়ে আবার তাঁর চোখের দৃষ্টি সংকীর্ণ হয়ে এল: 'তোমার আজকে উঠতে বোধ হয় একটু দেরি হয়ে গেছে?'

'হাঁ, বাবা।'—অর্চনার চোখ নীচু হল আর একটু।

'এরকম তো তোমার হয় না।'

'প্রথম রাতে ভালো ঘুম হয়নি, বাবা।'—অপরাধীর মতো অর্চনা জবাব দিলে: 'কাল বড্ড গুমোট গরম পড়েছিল, সেইজন্যে অনেকক্ষণ—'

একটু চমকালেন তারাকান্ত। বারো বছর ধরে এরকম অনেক ভাদ্র এসেছে, কালকের চাইতেও অনেক দুঃসহ রাত পার হয়েছে, কিন্তু কোনোদিন সেজন্যে ঘুমের ব্যাঘাত হয়নি অর্চনার। তার শরীরটা এ-সবের অনেক উর্ধ্বে উঠে গেছে বলেই ভেবেছিলেন তারাকান্ত। যেমন করে পঞ্চাগ্নি সাধনা করতেন উমা অথবা তপস্যা করতেন অলকনন্দার তুষার-শীতলতায়, অর্চনা তারই কাছাকাছি এগিয়েছে বলে বিশ্বাস হয়েছিল তাঁর।

একটু চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বললেন, 'তোমার অসুবিধে হচ্ছে, একথা আগে, বলোনি কেন মা? ঠিক আছে, আজকেই আমি তোমার ঘরে ফ্যান লাগিয়ে দেব।'

কোমল, শান্ত, প্রায় স্নেহঝরা স্বরেই বললেন তারাকান্ত, কিন্তু কথাটা যেন চাবুকের মতো পড়ল অর্চনার গায়ে। বারকয়েক ঘন ঘন বদলে গেল তার মুখের রঙ।

'না বাবা, পাখা আমার দরকার নেই। ও আমার সহ্য হয় না'—আলোচনাটা থামিয়ে দেবার জন্যেই সে সরে গেল তারাকান্তের সামনে থেকে: 'আমি যাই, আপনার চা-টা নিয়ে আসি।'

॥ দুই ॥

চা খেয়ে তারাকান্ত নীচে চলে গেলেন, এখন ঘণ্টা দুই-তিন অফিসে বসবেন তিনি। আজকাল আর প্র্যাকটিস করেন না—বছর পাঁচেক হল ছেড়ে দিয়েছেন। তবে এখনো দু-চারজন মক্কেল আসে, জুনিয়ারেরা আলাপ-আলোচনা করে, তাদের লীগ্যাল্ অ্যাডভাইস দেন। কিন্তু কোর্টে আর তিনি যান না।

বাড়ির গিন্নী সুলতার একটু হাঁপানির টান আছে—দু দিন থেকে সেটা বেড়েছে। সকালের কাজগুলো অর্চনাই সেরে এল। ভাঁড়ার বের করে দিলে, সুলতাকে চা জল-খাবার খাইয়ে এল, তারপর দোতলার সেই বারান্দার একটা কোণায় এসে দাঁড়াল। সাধারণত এই সময়ে সে পড়তে বসে, কিন্তু আজকে তার মনের সুর কেটে গিয়েছিল। তারাকান্ত তার ওপরে রাগ করেছেন—নইলে ঘরে ফ্যান লাগিয়ে দেবার কথা তিনি বলতেন না।

এ বাড়িতে, একমাত্র তারাকান্তর অফিস ছাড়া আর কোনো ঘরে ফ্যান ব্যবহার করা হয় না; রেডিয়ো একটা আছে, কোনোদিন খোলা হয় না; গ্রামোফোন আর রেকর্ডের বাক্সগুলো একটা বন্ধ ঘরে কতগুলো পুরোনো ফার্নিচারের মধ্যে নির্বাসিত হয়ে আছে।

বারো বছর ধরে কোনোদিন মাছ-মাংস-ডিম এ বাড়ির দরজা পার হয়নি। আর তেতলায় হেমন্তের শোবার ঘরটিতে ঠাকুরঘরের শুচিতা—সেখান থেকে প্রতিদিনের টাটকা ফুল আর ধূপের গন্ধ এই বাড়িটাকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

শোক। পবিত্র উজ্জ্বল একটি শোক। অর্চনা সেই শোকের পূজারিণী। তার কৃচ্ছ্রসাধনার মধ্য দিয়ে এই পরিবার হেমন্তের স্মৃতিকে জাগিয়ে রেখেছে।

অর্চনা রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইল। গঙ্গার কথা তার মনে পড়ল না, তার বদলে চোখ চলে গেল সামনের একটা নতুন বাড়ির দিকে। এক গা ঝকঝকে নতুন গয়না আর কপালে টকটকে সিঁদুর নিয়ে একটি অল্পবয়েসী মেয়ে তার দিকে তাকিয়ে গেল একবার। এই তো ক'দিন আগে বিয়ে হয়েছে মেয়েটির, আজ বোধ হয় বাপেরবাড়িতে এসেছে সে।

অর্চনা জানে, তারও জন্যে গয়না এসেছিল নতুন নতুন, এসেছিল মুক্তোর দুল, হীরের আংটি, বাক্স ভরে শাড়ি এসেছিল। কিন্তু কিছুই দরকার হয়নি। অ্যাক্সিডেণ্টটা হল বিয়ের ঠিক আট দিন আগে, যে মাহেন্দ্র যোগে আশীর্বাদ হওয়ার কথা ছিল, সেই শুভলগ্নেই হেমন্তের চিতায় আগুন জ্বলল।

সব যেন একটা বানানো আর অসম্ভব গল্পের মতো মনে হয়।

অর্চনা কে এ বাড়ির? কেউ নয়। অথচ কে নয়?

সেই নোয়াখালির দাঙ্গা। পার্টিশন। বয়েস কত তখন? দশ-এগারো।

কেউ বাঁচেনি। মা-বাবা-ভাই-বোন, কেউ না। বাড়িঘর ছাই হয়ে গিয়েছিল—গোয়ালের গোরুগুলো পর্যন্ত পরিত্রাণ পায়নি। মানুষ যখন একবার নিজেকে ছাড়িয়ে যায়, তখন পৃথিবীর কোনো জানোয়ারই তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না।

কী করে সুপুরি ঘরের মধ্যে পালিয়ে গিয়ে একা বেঁচে গিয়েছিল, সে-কথা নিজেও বুঝতে পারে না অর্চনা।

তারপর সব একটা ধুলোর ঘূর্ণি। সেই বাড়ির বুড়ো কৃষাণ মন্তাজ আলী। কিভাবে নৌকো করে—নিজের প্রাণ হাতে নিয়ে তাকে পৌঁছে দিয়েছিল শহরে। মন্তাজ যখন তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, শহরে কাউকে সে চেনে কিনা, তখন একটিমাত্র নামই মনে এসেছিল তার—তারাকান্ত চৌধুরী। সে জানত, তারাকান্ত তার বাবার উকিল—তাদের বাড়িতে তিনি বারকয়েক যাওয়া-আসা করেছেন।

তারাকান্ত তখন দেশ ছাড়বার ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছেন। দু'দিন পরেই বেরোবেন সপরিবারে। অচর্নাকে তাঁরা টেনে নিলেন নিজেদের ভেতর।

সেই থেকে এই সংসারের একজন হয়ে গেল সে।

তারাকান্ত পক্ষপাত করলেন না। নিজেদের মেয়েদের সঙ্গে তাকেও ভর্তি করে দিলেন স্কুলে। কোনোদিন বুঝতে দিলেন না সে এ বাড়ির কেউ নয়—নিতান্তই বাইরে থেকে এসে পড়েছে। বলতেন, 'আমার তিন মেয়ে, কিন্তু ছোটটিই সব চেয়ে লক্ষ্মী।'

বড়ো দুজন রাগ করত না, তারা হাসত।

নিজের মেয়ে দুটির বিয়ে হয়ে গেল। তারাকান্ত ভাবছিলেন, এইবার অর্চনার জন্যও একটি পাত্র খুঁজতে হবে। ব্যাপারটা ঘটল ঠিক সেই সময়।

কিংবা ঠিক সেই সময়ে নয়। অনেকদিন থেকেই কোথাও তার একটা নিঃশব্দ

প্রস্তুতি চলছিল। তারাকান্ত জানতেন না, সুলতা জানতেন না, অর্চনার পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না। শুধু জানত একজন। সে এই বাড়ির বড়ো ছেলে—হেমন্ত।

ভালো ছাত্র সে। ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল এম-এস্‌সিতে। স্কলারশিপ নিয়ে রিসার্চ করছিল।

নিরীহ, শান্ত মানুষ হেমন্ত। গোটা দিন কাটত তার সায়েন্স কলেজের ল্যাবরেটরিতে, সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে বইয়ের মধ্যে মুখ গুঁজে রাত একটা পর্যন্ত পড়াশোনা করত। তখন স্কুল ফাইন্যালের জন্যে তৈরী হচ্ছিল অর্চনা। সে-ও রাত জাগত—রাত এগারোটা নাগাদ হেমন্তের ঘরে এক পেয়ালা কফি পেঁছে দেবার দায়িত্বও ছিল তারই ওপরে।

অর্চনা লক্ষ্য করেনি, কফির পেয়ালা টেনে নিতে গিয়ে কতদিন অন্যমনস্ক হয়েছে হেমন্ত। কতদিন সামনের মোটা মোটা বই, অংক কষা বড়ো বড়ো খাতা, মাথার ভেতরে রিসার্চের জটিল চিন্তাগুলো—সব ভুলে গিয়ে—চশমার ভেতর দিয়ে আশ্চর্য উজ্জ্বল চোখে তার দিকে তাকিয়েছে হেমন্ত। বাইরে গঙ্গার হাওয়ায় নারকেল গাছের পাতার শব্দ উঠেছে, বৈশাখী বৃষ্টির গুঞ্জনের ভেতরে মাটি থেকে উঠে এসেছে নেশাভরা গন্ধ, ঝিঁঝির ডাকের সঙ্গে পানাপুকুর থেকে ব্যাঙেরা গলা মিলিয়েছে, সারা বাড়িটার ঘুমন্ত নির্জনতার মধ্যে—শুধু এই দুজনকে ঘিরে পৃথিবীটা কেন্দ্রিত হয়ে গেছে।

কিছু একটা বলতে গিয়েই থেমে গেছে হেমন্ত। তারপর চোখ নামিয়ে কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়েছে। শুধু হয়তো একবার জিজ্ঞেস করেছে, 'পড়াশুনো কেমন চলছে?'

অর্চনা সংক্ষেপে বলেছে, 'ভালো।'

'ক'টা লেটার পাওয়ার আশা আছে?'

'একটাও না। আমি তোমাদের মতো ব্রিলিয়াণ্ট্ নাকি? কোনোমতে সেকেণ্ড ডিভিশনে তরে যেতে পারলেই যথেষ্ট।'

'খুব খারাপ। অ্যাম্বিশন থাকা উচিত।'

'অসম্ভবের আশা করে লাভ কী?'

'হুঁ, অসম্ভবের আশা!'—আবার তাকিয়েছে হেমন্ত, আর একবার কী ভেবে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার চোখ। তারপর আস্তে আস্তে বলেছে, 'ওয়ান শুড্ ট্রাই!'

'দেখি।'—ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে অর্চনা।

অনেক দিন পরে একটা জিনিস নতুন ভাবে খেয়াল হয়েছে অর্চনার। ছেলেবেলা থেকে হেমন্ত তাকে 'তুই' বলে ডাকত, কিন্তু সেই ডাকটা ক্রমশ ভাববাচ্যে পেঁছে গিয়েছিল। 'কী করা হচ্ছে এখন', 'প্রিপ্যারেশন ঠিক হচ্ছে তো', 'এক গ্লাস জল পাওয়া যাবে কিনা—' এইভাবেই সে অর্চনাকে সম্ভাষণ করত।

কিন্তু কিছুই ভাবেনি অর্চনা, ভাবতে চেষ্টা করেনি। হেমন্তর উজ্জ্বল চোখ; কখনো বৃষ্টি, কখনো বা হাওয়ার সঙ্গে ভরা দু'জনের জন্যে গড়ে ওঠা নির্জন রাত; টুকরো টুকরো পোশাকী কথার ফাঁকে হেমন্তর গলায় ঘনিয়ে আসা গভীরতা—কিছুই সেদিন অর্চনার চেতনায় চিন্তায় কোনো অর্থ বয়ে আনেনি। দশ-এগারো বছরের সেই ভয়ংকর স্মৃতি তো এত সহজেই মুছে যাবার নয়। এই বাড়ির সব মমতা, সব

ভালোবাসার মধ্যেও সে জানে, এই পরিবারের ভেতরে কোথাও তার শেকড় নেই। যেটুকু সে পেয়েছে, সেই তার আশার অনেক বেশি—তার স্বপ্নের আকাশটাকেও ছাড়িয়ে গেছে। এর পরে আরো কোনো দিন আছে—স্কুল-ফাইন্যালে লেটার পেয়ে পাস করবার মতো অসম্ভবের পরেও আরো বিস্ময় কোথাও ঘটতে পারে, কোনোদিন কি তা কল্পনাও করতে পারে অর্চনা ?

অথচ, তাই-ই ঘটল।

সে রাত্রে বাইরে হাওয়া ছিল না, শব্দ না, এমন কি ঝিঁঝির ডাক পর্যন্ত ছিল না। কেবল হেমন্তর মাথার ওপর পাখাটা শোঁ শোঁ করছিল আর সেই হাওয়ায় খস খস করে আওয়াজ তুলছিল বইয়ের খোলা পাতা—যেন ফিসফিস করে চাপা গলায় কথা কইছিল কেউ।

সেই রাতে, কফির পেয়ালা টেনে নিতে গিয়ে, হেমন্তের হাত কাঁপল একবার, খানিকটা কফি ছলকে পড়ে গেল টেবিলের ওপর। হেমন্ত তাকালো না। অর্চনা টেবিলের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, হেমন্ত সেই দিকে ঘুরে দুটো মুঠোয় একসঙ্গে ডান হাতখানা চেপে ধরল অর্চনার।

হেমন্তর ছোঁয়া অর্চনার জীবনে নতুন নয়। কয়েক বছর আগেও পড়াতে কি অঙ্ক কষাতে গিয়ে অর্চনাকে দু-একটা আলগা চড়-চাপড় দিয়েছে হেমন্ত, লুকিয়ে-খাওয়া টক কুল কেড়ে নিয়েছে হাত থেকে। কিন্তু তারপর বড়ো হয়েছে অর্চনা, ষোলো ছাড়িয়ে সতেরোয় পা দিয়েছে, হেমন্ত গম্ভীর আর রাশভারী হয়েছে, ছেলেমেয়েদের মাস্টারি করবার দায় ছেড়ে দিয়ে সরে এসেছে নিজের লেখাপড়ার একান্ত জগতে। হেমন্ত এখন দূরের মানুষ, আর এক গ্রহের অধিবাসী।

বদলেছে অর্চনাও। হয়তো সম্পূর্ণ জানেনি, কিন্তু জীবন সম্পর্কে তারও এসেছে হরিণীর উৎকর্ণতা। সে-ও গল্প উপন্যাস পড়তে শিখেছে।

হেমন্ত তার হাত চেপে ধরতে অর্চনা শিউরে উঠল। সেই চমকটুকু বিদ্যুতের মতো বয়ে গেল হেমন্তর শরীরে। তবু নিজেকে সামলে নিয়ে অপ্রতিভের মতো হাসল অর্চনা।

'কী হল হেমন্তদা ? হাত ছাড়ো !'

বৈজ্ঞানিক হেমন্ত জবাব দিল না, কিছুক্ষণ স্থিরভাবে কেবল চেয়ে রইল তার মুখের দিকে। আরো অস্বস্তি বোধ করে কাঁপা গলায় অর্চনা বললে, 'কী পাগলামি হচ্ছে ? হাত ছেড়ে দাও—আমি যাই।'

হেমন্ত কথা বললে। নেশাধরা জড়ানো তার আওয়াজ। তার বিজ্ঞানী মনে কোনো ভূমিকা এল না, কোনো সাজানো কথা দেখা দিল না। হেমন্ত সংক্ষেপে বললে, 'তোমাকে ভালোবাসি অর্চনা।'

কথাটা আজ নয়—আগেও বলেছে হেমন্ত। সময়মতো চা এনে দিলে, ঠিক খিদের সময় জলখাবার যোগাড় করে দিলে, বাবাকে লুকিয়ে কখনো কখনো দু-একটা সিগারেট এনে দিলে। খুশি হয়ে সে অর্চনাকে বলেছে, 'ভারী লক্ষ্মী মেয়ে তুই—এই জন্যেই তোকে এত ভালোবাসি। মীরা-নীরা কোনো কাজের নয়, ও দুটো একেবারে হোপ্‌লেস।' 'ভালোবাসি'—এই কথাটা আজও নতুন শুনল না অর্চনা, কিন্তু এই মুহূর্তে ভয়ে

যেন পাথর হয়ে গেল।

'আমাকে তুমি ভালোবাসো না অর্চনা?'

নেশার ঝোঁকেই বোধ হয় মুঠো আলগা হয়ে গিয়েছিল, অর্চনা চকিতে ছাড়িয়ে নিলে নিজেকে।

'ছি ছি,—কী বলছ!'—ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল ঘর থেকে—একবার পেছনে তাকিয়ে দেখবার সাহসও তার ছিল না।

পড়াশুনো মাথায় উঠল, আলো নিবিয়ে বিছানায় আছড়ে পড়ল সে। দশ-এগারো বছরের সেই স্মৃতিটা—সাত বছর আগেকার সেই ক্ষতটা—সমস্ত রাত তার রক্ত ঝরালো। মা-র জন্যে কাঁদল, বাবার জন্যে কাঁদল, ভাইবোনদের জন্যে কাঁদল। এ অপমান কেন তাকে করল হেমন্ত? এ কখনো হতে পারে, কোনোমতেই কি হওয়া সম্ভব? অর্চনা কি জানে না, এর মধ্যেই কত বড়ো বড়ো লোকের বাড়ি থেকে সম্বন্ধ এসেছে হেমন্তের জন্যে, কিন্তু 'রিসার্চ শেষ না হলে কিছু হবে না'—এই বলে সব ঠেকিয়ে রেখেছে হেমন্ত!

তাদের কাছে অর্চনা? এই বাড়ির দয়ায় যার আশ্রয়—এঁরা সেদিন এমন করে কাছে টেনে না নিলে যে আজ কোন্ সর্বনাশের অতলে তলিয়ে যেত? ছি ছি, এ-কথা যদি তারাকান্তর কানে যায়, তাহলে—

রাতে ঘুম হল না, দিনটা কাটল দুঃস্বপ্নের ঘোরে। আবার পরের রাত, আবার হেমন্তর ঘরে কফি পেঁছে দেওয়া, আবার সারাটা বাড়ি ভরে ঘুমের নির্জনতা। অনেকবার ভাবল অর্চনা—যাব না, যাব না, কিছুতেই যাব না। কিন্তু তবু যেতে হল। বুকের মধ্যে তখন তুফান চলছিল, চলতে চলতে পা টলছিল তার।

একবার দোরগোড়ায় দাঁড়ালো, একবার দাঁতে দাঁতে চাপল। তারপর চোখ বুজে অন্ধকারে ঝাঁপ দেবার মতো এগিয়ে গেল হেমন্তর টেবিলের সামনে। অস্পষ্ট গলায় বললে, 'কফি।'

হেমন্ত আজ আর পাগলামি করল না, বই থেকে মাথাও তুলল না। শুধু শান্তস্বরে বললে, 'রেখে যাও।'

মুক্তি।

অর্চনা ফিরে এল। হয়তো লজ্জিত হয়েছে হেমন্ত, হয়তো সাময়িক নেশাটা তার কেটে গেছে। তবু নিজের ঘরে ফিরে এসে আজও স্বস্তি পেল না অর্চনা। আজ দেখা দিল আর এক যন্ত্রণা। সে যন্ত্রণার মানে বোঝা যায় না, কিন্তু এই মুক্তিও তাকে নিস্তার দিল না, হৃৎপিণ্ডের ভেতরে তার কাঁটা বিঁধতে লাগল। নেশা কেটে গেছে হেমন্তর? এত সহজেই কেটে গেল?

'মা!'

অর্চনা চমকে উঠল। ফিরে এল স্মৃতির ওপার থেকে। তারাকান্ত উঠে আসছেন দোতলায়। এত তাড়াতাড়ি আজকে? অন্য দিন তো দশটার আগে আসেন না!

অর্চনা বললে, 'আজ এখনি যে উঠে এলেন বাবা? শরীর খারাপ হয়নি তো?'

তারাকান্ত অর্চনার মুখের দিকে চাইলেন। কী দেখলেন, তিনিই জানেন। বললেন, 'আজ আর ও-সব ভালো লাগছে না মা। সংক্ষেপেই সেরে দিলুম।

এসো, তোমার সঙ্গে একটু গল্প করি।'

বসে পড়লেন ডেক-চেয়ারটায়। অর্চনা ধীরে ধীরে এগিয়ে এল তাঁর দিকে।

॥ তিন ॥

তারাকান্ত বললেন, 'দাঁড়িয়ে কেন, বোসো!'

একটা বেতের মোড়া টেনে এনে তাঁর পায়ের কাছে বসে পড়ল অর্চনা। তারাকান্ত কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চেয়ে রইলেন সামনের দিকে। সেই নতুন বাড়িগুলোর অসহ্য আড়াল। গঙ্গা আর দেখা যায় না, শিবমন্দিরগুলো অদৃশ্য। এক-একটা স্টিমারের কালো ধোঁয়ার রেখা মধ্যে মধ্যে চোখে পড়ে কেবল।

তারাকান্তর নিঃশ্বাস পড়ল। তারপর :

'কলেজ কেমন লাগছে মা?'

'বেশ ভালোই বাবা।'

'মেল-টীচারই বেশি?'

এই প্রশ্নটা মাঝে মাঝেই করেন। আর শোনবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা বিরূপতায় অর্চনার মন আচ্ছন্ন হয়ে যায়। ধীর, শান্ত, পরিণত বয়েসের অভিজ্ঞ মানুষ আর একটু উদার হলেও সংসারে বিশেষ কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না।

অর্চনা মৃদুস্বরে বললে, 'লেডী টীচারও আছেন।'

আবার একটু চুপ করে রইলেন তারাকান্ত। তারপর বললেন, 'তোমাকে বেথুনে দিতে পারলেই ভালো হত—সেখানে টীচিং অনেক বেটার।'

টীচিংয়ের চাইতেও নিরাপত্তাটা বেশি—তারাকান্তর এই মনস্তত্ত্বটা অর্চনার জানা। ভেতরে ভেতরে আরো বিস্বাদ বোধ করতে লাগল সে। এই বারো বছর ধরে তাকে সন্ন্যাসিনীর মতো তপশ্চর্যা করিয়েও তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারেননি। বৈষয়িক এবং বিচক্ষণ অ্যাডভোকেট বোধ হয় ভাবেন, মেয়েদের চিতার ছাই না ওড়া পর্যন্ত তাদের বিশ্বাস করে চলে না!

তারাকান্ত আবার বললেন, 'সবচেয়ে ভালো কে পড়ান?'

'সবাই, বাবা'—জোর করে হাসতে চেষ্টা করল অর্চনা : 'সকলের পড়ানোই আমার ভালো লাগে।'

সতর্ক হয়েই জবাব দিল অর্চনা। বিশেষ কারো নাম করা বিপজ্জনক। যদি পুরুষ অধ্যাপক হন, তারাকান্ত হয়তো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাইবেন, তাঁর বয়েস কত, তাঁর চেহারা কি রকম, অর্চনাকে ডেকে আলাপ করেন কিনা, অর্চনার সম্পর্কে তাঁর কোনো বিশেষ ইন্টারেস্ট্ আছে কিনা।

তারাকান্ত ক্রমশই যেন সতর্ক আর চিন্তিত হয়ে উঠলেন। অর্চনার নতুন করে কলেজে ভর্তি হওয়াটা এখনো তিনি মনের দিক থেকে সম্পূর্ণ মেনে নিতে পারছেন না।

ভয়। কিন্তু কিসের ভয়? বারো বছর ধরে অর্চনার চারদিকে যে শান্ত সংযত শোকের দেওয়ালটা তুলে দিয়েছেন—সেই দেওয়ালটায় ফাটল ধরবে বলে? দিনের পর

দিন তার মনটাকে মন্দিরের মতো পবিত্র করে গড়ে দিয়েছেন, সেখানে আসবে অশুচি হাওয়া আর অপবিত্র আলো—এই তাঁর আশংকা ? আরো সংকুচিত বোধ করল অর্চনা। তারাকান্ত সম্পর্কে তার কুড়ি বছরের শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতাকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরতে চাইল সে, ভাবতে চাইল এই ভালো, অভিভাবক হিসেবে এই রকম সতর্কতাই তারাকান্তর দরকার। দিনকাল বিষিয়ে উঠছে ক্রমশ, নিজের মনকেই কি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারে অর্চনা ?

তারাকান্ত আবার স্বগতোক্তির মতো বললেন, 'কিন্তু বেথুনে তোমাকে ভর্তি করলেই ভালো হত, মা।'

'হ্যাঁ, বাবা।'

'মুশকিল হল, বড্ড দূর এখান থেকে।'

'বাসে যাওয়া যেত, বাবা।'

'কিন্তু ওদের কলেজের বাস তো এত দূরে আসে না।'

'স্টেট বাসে যাওয়া যেত, বাবা।'

'সে ভালো নয় মা, তার চাইতে এই ভালো।'

'হ্যাঁ, বাবা।'

মরে গেলেও বাসে তাকে কখনো একা ছেড়ে দেবেন না তারাকান্ত, এ-কথা অর্চনা জানে। সেখানে অচেনা মানুষ, অনেক ভিড়, বিপজ্জনক সম্ভাবনা। কোর্টে যাওয়া ছেড়ে দেওয়ার পরে তারাকান্ত নিজের পুরোনো গাড়িখানা বিক্রী করে দিয়েছেন, কোনো কাজে লাগে না ; সুলতা বাড়ি ছেড়ে আজকাল আর বেরুতে চান না—এক মাঝে মাঝে গঙ্গার ঘাটে স্নানে যাওয়া ছাড়া ; তারাকান্ত কোনো কোনো দিন পায়ে হেঁটে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত বেড়াতে যান, ব্যাস, ওই পর্যন্তই। সিনেমা-থিয়েটারের প্রশ্ন এ বাড়িতে অবান্তর, দেখা করতে আসেন আত্মীয়-স্বজনেরাই, এঁরা কখনো যান না। কাজেই গাড়িটা অনাবশ্যক মনে হয়েছিল তারাকান্তর। কিন্তু হঠাৎ এতদিন পরে, এইভাবে জেদ করে অর্চনা কলেজে ভর্তি হবে—এ কথা জানলে গাড়িটা তিনি বিক্রী করতেন না।

আবার একটু চুপ করে থেকে তারাকান্ত বললেন, 'কলেজে আমি পড়েছি, মা। আমার ছেলেমেয়েদেরও তো পড়ালুম। কিন্তু এতদিন পরে কী মনে হয়, জানো ?'

অর্চনা প্রশ্ন করল না। চোখ তুলে তাকালো তাঁর দিকে।

'মনে হয়—', তারাকান্ত সামনের বাড়িগুলোর ওপর দিয়ে অদৃশ্য গঙ্গার দিকে চোখ মেলে দিলেন :

'যা কিছু পড়েছি, জীবনে তা কোনো কাজে আসেনি। জীবিকার কথা যদি বলো —হাঁ, মানতে রাজী আছি, বাঁচবার জন্যে ক'টা ডিগ্রি-ডিপ্লোমার দরকার আমার ছিল। কিন্তু মানুষের আসল বাঁচা তো সেখানে নয়। গিভ্ আস দিস্ ডে আওয়ার ডেলি ব্রেড্—এই প্রার্থনা কেবল সেই স্তরের, যেখানে আমরা জন্তুর সীমা ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতে পারিনি। কিন্তু ওই পরিচয়টাই তো আমাদের শেষ কথা নয়। আমাদের সত্যিকারের প্রাণের উৎসটা অন্য জায়গায়—নট্ বাই ব্রেড্ অ্যালোন।'

ছ' মাস আগেও তারাকান্তর এই কথাগুলো আর এক অর্থ বয়ে আনত, একটা গভীর বিশ্বাসে, পূর্ণতর আর একটা জীবনের সংকেতে তার মনের সামনে আলোর মতো

কতগুলো একসঙ্গে জ্বলে উঠত। আজ অর্চনার মনে হল, যে-কথা জোর করে স্পষ্ট ভাষায় তারাকান্ত বলতে পারছেন না, এই রকম সব বহুব্যবহৃত পুরোনো চিন্তার মালা গেঁথে, কৌশলে সেই কথাটাই পেঁাছে দিতে চাইছেন তার কাছে। এ-সব থেকে একটি, একটি মাত্র সরল অর্থই দাঁড় করানো চলে। কলেজে পড়ে তুমি কী করবে? মিটবে তোমার আত্মার ক্ষুধা? 'যেনাহং নামৃতাস্যাম্, কিমহং তেন—'

তারাকান্ত বললেন, 'জীবিকা যেখানে প্রশ্ন নয়, সেখানে এই শিক্ষা মনকে কোনো আলো দেয় না, শুধু ধাঁধিয়ে দেয়। অহমিকা আনে, মোহ নিয়ে আসে। ভেতরটায় যে অন্ধকার সেই অন্ধকার। অশিক্ষিত মানুষ নিজের পশুটাকে লুকিয়ে রাখে, শিক্ষিত মানুষ সেটাকে অসংকোচে আর উদ্ধতভাবে বাইরে নিয়ে আসতে পারে—এইটুকুই যা তফাৎ।'

'আপনি কি লেখাপড়া শেখা সমর্থন করেন না বাবা?'

'কেন করব না, মা? কিন্তু প্রপার এডুকেশান আর কলেজী লেখাপড়া—এ দুইয়ের ভেতরে আকাশ-পাতাল তফাৎ! তোমাকে তো আমি আগেই বলেছি, সত্যিকারের শিক্ষার জন্যে আমাদের ভারতবর্ষ যে পথ দিয়ে গিয়েছিল, যত তর্ক করো, যতই অবিশ্বাস করো, একদিন সেখানেই আমাদের ফিরে আসতে হবে। বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে—'

তারাকান্ত বলে যেতে লাগলেন, মেজের একটা ছোট ফাটলের দিকে চোখ রেখে সেগুলো আচ্ছন্নের মতো শুনে যেতে লাগল অর্চনা। কথাগুলো নতুন নয়, অনেকবার তিনি বলেছেন, অনেকবার শুনতে হয়েছে অর্চনাকে। গীতার শ্লোক, মহাভারতের বাণী, মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ, কোন্ কোন্ ইয়োরোপের মনীষী ভারতের এইসব শাশ্বত সত্যকে বন্দনা করেছিলেন,—তাঁদের বিস্তৃত বিবরণ। এতদিন এগুলো শুনতে শুনতে রোমাঞ্চিত হত অর্চনা, কখনো কখনো চোখে তার জলও এসে যেত। কিন্তু আজ সব ছাপিয়ে মনে হতে লাগল, তারাকান্তর এই দীর্ঘ আলোচনার একটি মাত্র লক্ষ্যই রয়েছে, একটিই সুক্ষ্ম ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে এদের ভেতরে। আজ এই মুহূর্তে অর্চনা যদি বলে বসে, 'আমি আর কলেজে যাব না বাবা, আর আমার দরকার নেই—' তাহলেই তারাকান্তর সুখের আর সীমা থাকবে না।

ভয়! বারো বছরের দুর্গে হঠাৎ ভাঙন ধরবে তারই ভয়? যে মন্দিরের দরজা স্মৃতির ধূপ আর শোকের প্রদীপ নিয়ে এতদিন বন্ধ হয়ে আছে, সেখানে হঠাৎ ঢুকবে ঝোড়ো হাওয়া—সব ওলট-পালট করে দেবে? কিন্তু এত অবিশ্বাস কেন? বারো বছর ধরে যে গাঁথুনি নিজের হাতে তৈরী করেছেন, তার ওপরেও এতটুকু ভরসা নেই কেন? নিজেই কি তা হলে জানেন যে তাঁর লোহার বাসর নিশ্ছিদ্র নয়?

তারাকান্ত হঠাৎ কথার সুর পাল্টালেন।

'সুজিত ঘোষ একটা ইন্টারেস্টিং কেস নিয়ে এসেছিল, জানো মা?'

'কী কেস বাবা?'—অর্চনার কোনো কৌতুহল ছিল না, তবুও জিজ্ঞেস করতে হল।

'বিধবা মা-র একমাত্র ছেলে। বাপ বিস্তর টাকা রেখে গিয়েছিলেন—মা ছেলের শিক্ষায় কোনো ত্রুটি রাখেননি। বিলেত থেকে লেখাপড়া শিখিয়ে এনেছেন, ছেলে এখন একটা বড়ো ফার্মের অ্যাসিসট্যান্ট্ ম্যানেজার। বিয়ে করেছে একটি উচ্চশিক্ষিতা আধুনিকা মেয়েকে। এখন পজিশনটা কী দাঁড়িয়েছে, জানো?'

অর্চনা শুনে যেতে লাগল।

'মা নিজের সবই ছেলের নামে দিয়ে দিয়েছেন, থাকবার মধ্যে শুধু বাড়িটা। শিক্ষিতা স্ত্রীর অ্যাডভাইসে, হাইলি-এডুকেটেড ছেলের সেটাও অসহ্য ঠেকছে। মা মারা গেলে দু'দিন পরে বাড়িটা সে-ই পেতো, কিন্তু সেটুকু তরও আর সইছে না। ছেলে মা-কে জোর করে আউস্ট্ করতে চাইছে, কেস করেছে মা-র নামে।'

অর্চনা চুপ ক'রে রইল। তারাকান্ত তিক্তভাবে হাসলেন।

'দিস ইজ্ এডুকেশন! এই হচ্ছে এ-কালের শিক্ষার ফল! কিন্তু এ তো একটা আইসোলেটেড্ কেস নয়? সারাজীবন আইন-আদালত করে—'

সব রাস্তাই শেষ পর্যন্ত রোমে যায়—অর্চনা ভাবল। তর্ক করা যেত, বলা যেত—প্রাচীন ভারতবর্ষেও অনেক ছেলে মা-বাপকে খেতে দিত না বাবা, সংস্কৃত-সাহিত্যে আছে; সিংহাসনের জন্যে অজাতশত্রু যা করেছিলেন, এ-কালের অপরাধ কি তারও চাইতে বেশি? কিন্তু বলা নিরর্থক—তারাকান্ত বিচার করতে চান না, বাণী দিতে চান।

অর্চনার মুখের দিকে তাকিয়ে এতক্ষণে একটু সন্দিগ্ধ হলেন তারাকান্ত। মনে হল, তাঁর সব কথাগুলোই এই মেয়েটির কানে যায়নি, অনেকখানিই বোধ হয় বাজে খরচ হয়ে গেছে।

তারাকান্ত থেমে গেলেন। একটু পরে শুকনো গলায় বললেন, 'তুমি আজকাল গীতা-টীতা পড়ো মা?'

'পড়ি বাবা।'—অর্চনা ক্লান্তভাবে বললে, 'নিয়মিতই তো পড়ি।'

'আমি ভাবছিলুম'—তারাকান্ত থেমে থেমে, অর্চনার মুখের দিকে চোখ রেখে বলে চললেন, 'হয়তো কলেজের পড়ার চাপ তোমার বেড়ে গেছে, তাই—'

অর্চনার মনে বিদ্রোহ মাথা তুলতে চাইল। তারাকান্ত বেশ সূক্ষ্মভাবে তাকে একটা খোঁচা দিতে চাইছেন।

অর্চনা সোজা দৃষ্টি তুলে বললে, 'গীতা পড়বার সময়ের অভাব আমার হয় না বাবা।'

'না হলেই ভালো মা।'

অর্চনা উঠে দাঁড়ালো।

'আপনার জন্যে আর এক পেয়ালা চা এনে দেব, বাবা?'

হঠাৎ তীব্র স্বরে অর্চনাকে একটা ধমক দেবার প্রেরণা অনুভব করলেন তারাকান্ত। বলতে ইচ্ছে করল, কী হয়েছে তোমার, কিসের এই অধৈর্য যে পাঁচ মিনিট স্থির হয়ে বসেও দুটো ভালো কথা তুমি শুনতে পারো না? এরও পরে তুমি বলতে চাও—কলেজে ভর্তি হয়ে তুমি এতটুকুও বদলাওনি, যা ছিলে তাই আছো? সেই শুচি-পবিত্র তপস্বিনী, সেই অম্লান উজ্জ্বল মন?

কিন্তু তারাকান্ত এত কথা কিছুই বললেন না। শুধু মুখটা ফিরিয়ে নিলেন অর্চনার দিক থেকে: 'থাক মা, এখন চায়ের দরকার নেই। তুমি বরং তোমার কাজে যাও, আমি একা একা একটু বসি।'

॥ চার ॥

ক্লাসে নোটিশ এল, পি-কে-সি আজ ক্লাস নেবেন না।

এর পরের পিরিয়ড অফ, তারপরে পি-কে-সির ক্লাস। অতএব একটা খুশির কলরব উঠল মেয়েদের ভেতরে। তার মানেই ছুটি। বাড়তি কারণ ছিল আরো একটি। অন্যান্য প্রোফেসারদের মতো পি-কে-সি কেবল চোখ বুজে বক্তৃতাই দেন না, থেকে থেকে পড়া জিজ্ঞেস করবার একটা বিশ্রী অভ্যাস তাঁর আছে। পরস্পর কানাকানি করে হয়তো একটা মুখরোচক আলোচনা চলছিল, হঠাৎ বেয়াড়াভাবে আঙুল বাড়িয়ে দিয়ে, প্রায় বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতো সব চেয়ে অন্যমনস্ক মেয়েটির দিকেই প্রশ্নের তীরটি ছুঁড়ে দেন তিনি : 'ইউ দেয়ার, ক্যান্ ইউ টেল্ মী—'

বই খাতা গুছিয়ে উঠে পড়েছিল অর্চনা, ভাবছিল বাড়ি ফিরে যাবে। দীপা এসে তাকে ধরে ফেলল।

'কোথায় পালাচ্ছ অর্চনাদি?'

'কোথায় আবার? বাড়ি যাব!'

'কী হবে এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে? চলো আমাদের বাসায়।'

দীপাদের বাসা কলেজের কাছেই। মিনিট দুয়েকের পথ।

'না রে, বাবা রাগ করবেন।'

'জানতে পারলে তো? তোমার তো চারটের ফেরবার কথা। কাজেই এই দেড় ঘণ্টা তোমার বাবার কাছ থেকে চুরি করতে পারো স্বচ্ছন্দে।'

'বলিস কি? মিথ্যে কথা বলব?'

দীপা গম্ভীর হয়ে বললে, 'অর্চনাদি, মিথ্যে বলা বড়ো দোষ—ওটা স্কুলে পড়া পর্যন্ত মানতে হয়। কলেজে ওঠবার পরে আর দরকার হয় না। তা ছাড়া তুমি তো সময়মতো পড়লে না, নইলে তোমার ছাত্রীও আজ এম-এ এম-এস্‌সি পাস করে যেত। তুমি এখনো মিথ্যে বলতে ভয় পাও? শেম্ শেম্!'

অর্চনা হেসে ফেলল।

'এই আঠারো বছরেই তুই যে-রকম পেকে উঠেছিস, তাতে—'

দীপা বাধা দিলে : 'এখনো পাকিনি, কেবল ডাঁশা হয়ে উঠেছি। যখন পাকব, তখন দেখো—গন্ধে একেবারে চারদিক আলো হয়ে যাবে।'

'এখন থেকেই দেখতে পাচ্ছি।'—অর্চনা যাওয়ার জন্যে পা বাড়ালো : 'আচ্ছা, তুই তাহলে ভালো করে পাকতে থাক্—আমি চলি।'

দীপা খপ করে অর্চনার ব্যাগ চেপে ধরল। বললে, 'চলি মানে? চালাকি হচ্ছে, না? তোমাকে আমাদের বাসায় নিয়ে যাবই। তা ছাড়া দাদা বলেই রেখেছে, সুযোগ পেলেই তোমাকে যেন ধরে নিয়ে যাই।'

দাদা!

একবারের জন্যে অর্চনার মনে ছোট্ট একটু ঢেউ উঠল। দীপার বাসায় যাওয়া তার

আজ এই প্রথম নয়। কলেজে ভর্তি হওয়ার পর এই মেয়েটির সঙ্গেই তার প্রথম আলাপ। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ভাব জমিয়ে নিয়েছিল। বলেছিল, 'অর্চনাদি, পরের ক্লাসটায় আমার প্রক্সিটা একটু দিয়ে দেবেন—আমি পালাব।'

'আমি তো প্রক্সি দিতে পারি না।'

'প্রক্সি দিতে পারেন না ?'—দীপার চোখ কপালে উঠেছিল : 'অথচ আজ প্রায় এক মাস ক্লাস করছেন! আমি তো এক ঘণ্টার মধ্যেই রপ্ত করে নিয়েছিলুম। আচ্ছা—আজ থেকে বসবেন আমার পাশে, আমি আপনাকে ভালো করে তালিম দিয়ে দেব।'

এই খবরটা তারাকান্তর কানে গিয়ে পেঁছুলে কী হত বলা মুশকিল। হয়তো সেদিনই কলেজ থেকে অর্চনার নামটা কাটিয়ে দিতেন, বলতেন—'আর ও-সব কুসংসর্গের দরকার নেই মা, ওতে তোমার চিত্তের স্থৈর্য নষ্ট হয়ে যাবে।' কিন্তু বারো বছর পঞ্চতপা পার্বতীর মতো কাটিয়ে, গীতা আর যোগবাশিষ্ঠ তন্ন তন্ন করে পড়েও দীপাকে অর্চনার খারাপ লাগেনি। ভাব হয়ে গিয়েছিল।

বয়েসে বারো-তেরো বছরের ছোট মেয়েটা। তবু বন্ধুত্বে বাধা হল না। কলেজের কাছেই বাসা—অফ-পিরিয়ডে টেনে নিয়ে যেত মাঝে মাঝে।

ছোট্ট সংসার। খুব ভালোমানুষ একটি রোগা চেহারার মা—চোখ দুটো মমতায় ছলছল করে।

একমাত্র ভাই, বয়েসে অনেক বড়ো—পঁয়ত্রিশের নীচে নয়। তার নাম বাসুদেব মুখার্জি। জার্নালিস্ট্—আর্ট-ক্রিটিক। এখনো বিয়ে করেনি। মা হয়রান হয়ে গেছেন। বাসুদেব জানিয়েছে, চল্লিশের আগে কারো বিয়ে করা উচিত নয়, কারণ তার আগে কেউ সাবালক হয় না।

মা বলেছিলেন, তোর বাবা বুঝি নাবালক অবস্থায় বিয়ে করেছিলেন ?

বাসুদেব বলেছিল, তখনকার কথা ছাড়ো। তেরো বছরে বিয়ে না হলে তো মেয়েরা মা-বাপের গলায় কাঁটা হয়ে উঠত। এখন তেরো বছরের খুকুরা স্কিপিং করে।

অতএব ওইখানেই থামল প্রসঙ্গ। বাসুদেব বিয়ে করেনি।

প্রথম দু-একবার এই বাসুদেবের সঙ্গে অর্চনার দেখা হয়নি। দুপুরে সে অফিসে থাকত। কিন্তু গত সপ্তাহে—নিশ্চিন্ত হয়েই দীপার সঙ্গে গল্প করছিল সে। হঠাৎ দরজার সামনে দেখা দিল লোকটি।

অর্চনা চমকে উঠল। দু হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করল বাসুদেবই। বললে, 'আমি দীপার দাদা—বাসুদেব মুখোপাধ্যায়। লজ্জা পাবেন না—শান্ত হয়ে বসুন। দীপার মুখে আপনার স্তবগান শুনে শুনে ভারী কৌতূহল ছিল। নাইট-ডিউটিকে ধন্যবাদ—আপনাকে দেখতে পাওয়া গেল!'

অর্চনা কোনো কথা খুঁজে পায়নি। কিছুক্ষণ শক্ত হয়ে বসেছিল চেয়ারে। আজ ঠিক বারো বছর পরে এইভাবে একজন অপরিচিত মানুষ এসে দাঁড়ালো তার সামনে।

কিন্তু এসে দাঁড়ানো নয়—এ যেন আবির্ভাব। দীর্ঘ চেহারার মানুষ। মাথার সামনে চুলগুলো একটু পাতলা হয়ে এসেছে—সাধারণের চাইতে চওড়া কপাল তাতে আরো ছড়িয়ে পড়েছে অনেকখানি। চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা। রগের পাশে দু-একটা চুলে সাদা রেখা পড়েছে, বুদ্ধিজীবিতার লক্ষণ। গায়ে হাতকাটা গেঞ্জি—

স্বাস্থ্যবান একটি উজ্জ্বল পুরুষ।

একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিয়েছিল অর্চনা। বাসুদেব হেসে বলেছিল, 'আমাকে দেখে যদি ও-ভাবে ভয়ে কাঠ হয়ে যান, তাহলে অনধিকার-চর্চার জন্যে ক্ষমা চেয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি। আর যদি অনুমতি করেন, তাহলে ঘরে পা দিতে পারি।'

দীপা বলেছিল, 'দাদা, এরকম বিনয়ে তো তোমার অভ্যেস নেই। হঠাৎ আজ এই ভদ্রতার বাড়াবাড়ি কেন?'

'উনি নতুন লোক। বেশি অ্যাগ্রেসিভ হতে গেলে নার্ভাস হয়ে যাবেন।'

'অর্চনাদি নার্ভাস হয়ে গেছে সে তো দেখতেই পাচ্ছ। কাজেই আর কথা বাড়িয়ো না। এতক্ষণ তো নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছিলে, তাই ঘুমোও গে না!'

'লাই! ঘুমুলে কখনো আমার নাক ডাকে না।'

'তোমাকে ডাকে না। কিন্তু সে ডাক আমরা সবাই শুনতে পাই।'

হা-হা করে হেসে উঠেছিল বাসুদেব। অচর্নাও হেসে ফেলেছিল।

বাসুদেব বলেছিল, 'দেখলি তো দীপু, ওঁর নার্ভাসনেস কেটে গেল। এবার আমি ঘরে আসতে পারি।'

'নার্ভাসনেস না কাটলেও তুমি আসতে!'

আবার সেই চারদিক ফাটানো হাসির আওয়াজ। বাসুদেব চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরে এল নয়—যেন আবির্ভাব ঘটল তার।

দীপার কথায় চকিতে এই স্মৃতিটা ভেসে উঠল অর্চনার মনে। দেখা দিল সেই দীর্ঘদেহ মধ্য-যৌবনের মানুষটি—কানে এল হাসির শব্দ, তার ভরাট গলার স্বর। একবারের জন্যে চেতনা তার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, তার পরেই নিজের কাছে কুঁকড়ে গেল অচর্না।

এমন হওয়া উচিত নয়, কিছুতেই হওয়া উচিত নয়।

দীপা বললে, 'ভাবছ কী, চলো!'

'না।'

'না কেন?'

'শরীর ভালো লাগছে না।'

'মিথ্যে কথা। কখনো খারাপ হয়নি শরীর।'

'না রে, সত্যিই আমায় বাড়ি যেতে হবে।'

'এই শরীর খারাপ ছিল, আর তার পরেই কাজের কথা মনে পড়ে গেল?'—দীপা ছাড়বার পাত্রী নয়ঃ 'কলেজে ক্লাস থাকলে কাজ কী করে হত শুনি? চলো—দাদা ডেকেছে।'

'এখনো নাইট-ডিউটি চলছে?'

'এখনো।'

'কিন্তু আমাকে ডাকছেন কেন?'

'তোমার সঙ্গে গল্প করে ভালো লেগেছে তার।'

বুকের ভেতরটায় আবার চমকে উঠল অর্চনার। তার সঙ্গে গল্প করে বাসুদেবের

ভালো লেগেছে—এই ব্যাপারটা দীপা কিংবা বাসুদেবের কাছে খুব সহজ। কিন্তু তারাকান্ত ?

'মা, মানুষের সবচাইতে শত্রু হল মন। সাপের চাইতেও তা বিপজ্জনক। কখন যে তা প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে দেবে—বাঁধ ভেঙে দেবে, কেউ তা বলতে পারে না। তাকে সব সময়ে বশে রাখতে হয়। সেই অবাধ্য জানোয়ারটাকে সব সময়ে শাসনে রাখবার একটিই উপায় আছে, সে হল বিবেকের চাবুক। তাই মহাভারতে নারদ বলছেন—'

দীপা বললে, 'কী আশ্চর্য', কলেজের করিডোরেই চারটে বাজাবে নাকি! সত্যি, তোমাকে যে আজ আসতে বলছি, তার আলাদা কারণ আছে একটা।'

অর্চনা চকিত একটু।

'কী কারণ ?'

'দাদা একটা জিনিস দেখাবে তোমাকে। খুব ইন্টারেস্টিং।'

'কী ইন্টারেস্টিং জিনিস ?'

'না গেলে বলব না।'

আবার মিনিটখানেক নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অর্চনা। নিজের ভেতরে সেই বিবেকের চাবুকটাকে খুঁজতে লাগল, অথচ হাতের কাছে পাওয়া গেল না সেটাকে। এবং আরো অস্বস্তিকর ভাবে মনে হল, দীপার সঙ্গে না যাবার মতো যথেষ্ট যুক্তিও দাঁড় করানো যাচ্ছে না। প্রায় নিরুপায় আত্মসমর্পণের মতোই একটা নিঃশ্বাস অর্চনা ফেলে বললে, 'তোর সঙ্গে পারবার জো নেই!'

'সেটা আগেই বোঝা উচিত ছিল তোমার।'

'কিন্তু ঠিক আধ ঘণ্টার মধ্যেই ছেড়ে দিতে হবে আমাকে।'

'তাই দেব। অনার ব্রাইট।'

॥ পাঁচ ॥

ঠং করে একটা ঘণ্টা পড়ল কোথাও—সাড়ে দশটা। তারাকান্ত শুতে গেছেন সাড়ে নটায়, ডাক্তারের শাসনে এখন তাঁর আর্লি টু বেড। সুলতাও শুতে গেছেন কিছুক্ষণ। চাকর-বাকরদের খেতে দিয়ে, নিজের সামান্য খাওয়ার পাটটুকু চুকিয়ে এইবার নিজের ঘরে এসে নিশ্চিন্ত হল অর্চনা।

শহরতলীর এইসব শান্ত অঞ্চলে এর মধ্যেই ঘুম নেমে এসেছে। কৃপণ হাওয়ায় এখন রাতের গন্ধ; মাটি-জল-গাছপালার, বাড়ির দেওয়াল থেকে নোনা লাগার আর পুরোনো চুনের; এখন থেকে থেকে বাদুড়ের ডানার শব্দ, কুকুরের ডাক, দূরের বড়ো রাস্তা থেকে মোটর, লরী আর গ্যারাজমুখো শেষ বাসগুলোর আওয়াজ। এই সময় নিজেকে নিয়ে বসা যায়, একান্ত করেই মনের মুখোমুখি হওয়া চলে।

একটু আগে যে বইটা পড়ছিল, অর্চনা এসে বসল তার খোলা পাতার সামনে। কিন্তু কলেজের পড়ায় আর তার মন বসল না। একটা প্যারাগ্রাফ পড়তে না পড়তে অক্ষরগুলো একরাশ পোকার মতো চোখের বাইরে ছিটকে ছিটকে চলে যেতে লাগল। অর্চনা চশমাটা খুলল, শাড়ীর আঁচলে মুছে নিলে কাচ দুটো, তারপর আবার সেটা

পরে নিয়ে সোজা তাকালো সামনের দেওয়ালের দিকে। সেখানে কিছুই ছিল না, তবু অর্চনার মনে হল, আজ রাতে সেখানে একখানা ছবি থাকা উচিত ছিল। হেমন্তর ছবি।

সে ছবি তারাকান্তর ঘরে আছে; তেতলার যে ছোট ঘরটিতে হেমন্ত শুত, পড়াশোনা করত—আজ বারো বছর ধরে যে ঘর শোকে স্মৃতিতে ধূপে প্রদীপে মন্দির হয়ে আছে—সেখানেও রয়েছে একখানা। কিন্তু অর্চনার ঘরে হেমন্তর কোনো ছবি নেই। তারাকান্ত কোনো প্রয়োজন বোধ করেননি। যেখানে হেমন্ত সমস্ত প্রাণ-মন অধিকার করে চিরকালের সম্রাটের মহিমায় স্থির হয়ে রইল, সেখানে বাইরের কোনো প্রতীকের যে দরকার থাকতে পারে—এ কথা ভাবতেও পারেননি তারাকান্ত। সাধ্য আর সাধিকায় যখন সাযুজ্য ঘটে গেছে, তখন কী হবে ছবিতে, কী দরকার রয়েছে মূর্তির?

আজ তারাকান্ত কী ভাবছেন কে জানে, কিন্তু এই মুহূর্তে, এই নিঃসঙ্গতায়, এই রাত্রির গন্ধের ভেতরে অর্চনা অনুভব করল নীলচে হয়ে আসা সামনের এই ফাঁকা দেওয়ালটা ক্রমশ একটা শূন্যতায় ভরে উঠছে; ছাড়িয়ে যাচ্ছে এই ঘর, এই বাড়ি, দূরের বাসের রাস্তা, গঙ্গা—সব। তারপর চলে যাচ্ছে আরো দক্ষিণে—যেখানে বাড়িঘর গাছপালা নদী কিছুই নেই—কেবল কালো আকাশের তলায় একটা কালো সমুদ্র হা-হা করছে।

অর্থহীন এই কল্পনাটা অর্চনাকে শিউরে তুলল। সমুদ্র যেখানে তলিয়ে নিতে থাকে—আকাশে হাত বাড়িয়ে যেখানে কোনো আশ্রয় মেলে না—যেন পৃথিবীহীন সেই ভয়ংকর শূন্যতার মধ্যে কে যেন জোর করে তাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। এই সময়, ওই ফাঁকা দেওয়ালে হেমন্তর ছবিটা জেগে থাকতে পারত একটা দীপস্তম্ভের মতো, সমুজ্জ্বল কোনো উত্তরণ-ভূমির মতো, যেখানে আশ্রয়, যেখানে ঝড়-তুফান-দুর্বিপাকের হাত থেকে মানুষের নিরাপত্তা।

কিন্তু এমন করে কে তাকে ওই অন্ধকার অতলতায় ঠেলে নিয়ে চলেছে? বাসুদেব মুখোপাধ্যায়?

না—না—না। অর্চনা জোর করে বলতে চাইল, প্রায় চীৎকার করে উঠতে চাইল। ঠিক তিন দিনের আলাপ। আর একদিন একটা ফোলিও ব্যাগ হাতে নিয়ে বোধ হয় বাস ধরবার জন্যেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছিল, অর্চনাকে কলেজের রাস্তায় আসতে দেখে সেই তাড়াহুড়োর মধ্যেও একটু হেসে বলেছিল, 'ভালো আছেন?' ব্যাস—এই পর্যন্তই।

এই পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছরের দীর্ঘদেহ মানুষটি—সুপুরুষ না হয়েও যে সাধারণের চাইতে খানিকটা আলাদা, বুদ্ধিতে যার মন ঝকঝক করে অথচ খামখেয়ালী ধরনের জন্যে যাকে কখনো কখনো ভারী অদ্ভুত মনে হয়—সে তার এই বারো বছরের দুর্গটাকে এমন করে টলিয়ে দিলে? তা-ও তিন দিনের আলাপে? হতে পারে, এমন হওয়া সম্ভব?

না-না-না—আবার বলতে চাইল অর্চনা, কিন্তু জোর পাওয়া যাচ্ছে না।

'অবাধ্য জানোয়ারটাকে শাসনে রাখবার একটিই উপায় আছে। সে হল বিবেকের চাবুক।'—তারাকান্তর গলা। কিন্তু বিবেক যদি মনটার সঙ্গেও চক্রান্ত করে? যদি সে-ও মনের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলতে থাকে—'হেমন্তর জন্যে শোক তুমি করতে

পারো, নিশ্চয়ই করতে পারো ; কিন্তু কোনো শোকই অনন্ত নয়—জীবন কোথাও দাঁড়ি টানে না, সে এক সম্ভাবনা থেকে আর সম্ভাবনায় এগিয়ে নিয়ে যায় ; অর্চনা, তোমারই হিসেবে ভুল হয়ে গেছে—তুমি নিজেও জানতে না ভেতরে ভেতরে কখন তুমি ক্লান্ত হয়ে গেছ, তোমার শোক, তোমার স্মৃতি শুধু অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, তা তোমার সত্তা হয়ে ওঠেনি ; সত্য পর্যন্ত বারে বারে নিজেকে সংশোধন করে—তুমি অভ্যাসকে বদলাতে পারো অর্চনা—বেরিয়ে আসতে পারো আজো—'

আর একবার কেঁপে উঠল অর্চনা। এসব কথা সে ভাবছে কেন ? কে তাকে ভাবাচ্ছে ?

বাসুদেব ?

বাসুদেবের ভেতরে একটা জোরালো প্রাণ আছে, কিন্তু এমন কোনো আতিশয্য তো নেই। সে তো অর্চনাকে একবারও তার মন্দিরের বাইরে বেরিয়ে আসতে বলেনি। সে নিঃসংকোচ, কিন্তু আগ্রহী নয় ; সে সহজ, কিন্তু নিজের সীমা মেনে চলে শান্ত সংযমে। তার কথাবার্তা আলাপ-আলোচনা সরল স্বাভাবিক, কৌতুকে ঝলমলে।

'আপনার সঙ্গে আলাপ করবার এত কৌতূহল হল কেন জানেন ?'

'না।'

'দীপুর স্তুতি। আপনার ভেতরে সে একটি অদ্ভুত মানুষকে দেখেছে। আমি জার্নালিস্ট্। কাজেই মনে হল, তা হলে এই মানুষকে আমার একবার দেখা উচিত।'

দীপা চায়ের ব্যবস্থা করতে উঠে গিয়েছিল। ভারী অস্বস্তি বোধ করছিল অর্চনা।

'কিন্তু দেখলেন তো, আমি নিতান্তই সাধারণ।'

'এখনো ঠিক করে বলতে পারছি না—', হাসির রেখা দেখা দিয়েছিল বাসুদেবের মুখেঃ 'আমার বোন ছেলেমানুষ হলেও কাউকে ভালো লাগার ব্যাপারে খুব সিলেক্টিভ।'

'কিন্তু ভালো লাগা কি সবটাই বাছাইয়ের ওপর নির্ভর করে ?'

'সবটা করে না—ঠিকই বলেছেন। অনেকটাই মন-মেজাজের মিল থেকে আসে। তবু বাছাইও একটা থাকে। দীপুকে আমি জানি, খুব পার্টিকুল্যার।'

'তা হলে দীপার ভুল ভাঙতে দেরি হবে না। আপনার কৌতূহলের জেরও আশা করি, মিটেছে।'

বাসুদেব দুটো উজ্জ্বল চোখ তার দিকে তুলে বলেছিল, 'আচ্ছা, দেখা যাক। আমার মতামত তোলা রইল আপাতত।'

দীপা চা এনেছিল। তারপর এটা-ওটা গল্পের পালা। শেষে সব আলোচনা গিয়ে শেষ হয়েছিল ছবির ভেতরে। বাসুদেবের নিজের জগৎ।

'একালের কবিতা বলুন, নাটক বলুন, উপন্যাস বলুন—সব কিছুর শেষ কথা হল ছবি। কবিতা যে কথা নানা ফর্মে, নানা ইমেজে, শব্দের নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়েও ভালো করে বলতে পারছে না, নাটকে যে-কথা বলতে গিয়েও সবটা বলা যায় না—অডিটোরিয়ামের দিকে তাকিয়ে অনেকখানি কম্প্রোমাইজ করে নিতে হয়, উপন্যাসে অনেক চিন্তা-চরিত্রের ভেতর যা ভিড়ে হারিয়ে যেতে থাকে—ছবি তাকে একেবারে স্পষ্ট

করে, প্রত্যক্ষ করে তোলে। উপমা দিয়ে বলা যাক, কবিতা-নাটক-উপন্যাসকে যদি শিল্পের ডাল-পাতা-কুঁড়ি বলে কল্পনা করেন, ছবি হচ্ছে তার ফুল। আর্টের শেষ কথা—তার পারফেক্‌শ্যন। খুব সোজা করে বলি, একটি অতল রহস্যময়ী মেয়ের কথা সাহিত্যে নানাভাবে আমরা বলতে পারি, কিন্তু ধরুন মোনালিসা—র‍্যাদার "জোকোন্দা স্মাইল"—'

দীপা প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিল।

'আঃ থামো দাদা, মাথা ধরিয়ে দিলে! তোমার ও-সব কচকচানি কিচ্ছু বুঝতে পারা যায় না।'

'তুই বুঝতে পারিস নে, তোর ব্রেন বলে কিছু নেই। কিন্তু অর্চনা দেবী সব বুঝতে পারছেন।'

'মোটেই বুঝতে পারছে না। বাড়িতে ডেকে এনে এ কি উৎপাত ওর ওপরে?'

'সত্যি খুব উৎপাত করছি আপনাকে!'—বাসুদেব কাতরভাবে তাকিয়েছিল অর্চনার দিকে।

মাথা নামিয়ে অর্চনা বলেছিল, 'না, আপনি বলুন, বেশ লাগছে।'

'ভদ্রতা দাদা, স্রেফ ভদ্রতা। ওটাকে অ্যাপ্রেসিয়েশান বলে মনে কোরো না। আর্ট নিয়ে বকুনি বন্ধ করে তোমার বরং শিকারের সেই বিখ্যাত গল্পটা বলো। সেটা অনেক ইন্টারেস্টিং।'

বাসুদেব বলেছিল, 'এই—খবর্দার! এবারে একটা চড় বসিয়ে দেব তোকে।'

শিকারের বিখ্যাত গল্প বাসুদেবের অত্যন্ত দুর্বলতার জায়গা। দীপা খিলখিল করে হেসে উঠেছিল।

সেই প্রথম দিন। বাসুদেব আসবার সময় বলেছিল, 'বেশ লাগল আপনাকে—আবার আসবেন।'

বাইরে রাতটা আরো ঘন, আরো নির্জন হয়ে উঠল। পানাপুকুরটার জলে একটা মাছ ছলাৎ করে উঠল, নৈঃশব্দ্যের ভেতর দিয়ে শব্দটা অর্চনার ঘর পর্যন্ত ভেসে এল। রাত্রে মাছেরা কি ঘুমোয়? হয়তো ঘুমোয়—হয়তো তারই মতো কেউ জেগে আছে, তারই মতো কেউ আজ আর ঘুমোতে পারছে না। মাছেদের কি মন থাকে?

দীপার তাকে নিয়ে বাসুদেবের কাছে গল্প করা, ওটা নেহাতই ছেলেমানুষি। তার মধ্যে একটা অসাধারণ কিছুকে আবিষ্কার করবার হাস্যকর চিন্তা বাসুদেবের মনে কোনোদিনই আসবে না। ও শুধু কথার কথা—বলবার জন্যেই বলা। সে যে-কোনো বাঙালী মেয়ের একজন। লেখাপড়ায় ব্রিলিয়াণ্ট্ নয়—এমন কিছু রূপ তার নেই, সে ছবি আঁকতে পারে না, কবিতা লিখতে পারে না। তবু কেন তাকে ভালো লাগে বাসুদেবের? লাগে কি? এ-ও ভদ্রতা—বলার জন্যেই বলতে হয়।

কথাটা খুব সহজ, তবু কোথায় যেন বিঁধতে থাকে অর্চনার। শুধুই ভদ্রতা? আরো দশজন বাঙালী মেয়ের সঙ্গে তার কোনো তফাত নেই—সত্যিই কি কোনো তফাত নেই? তা হলে হেমন্তর মতো অমন অসাধারণ ভালো ছেলে সেদিন কী দেখেছিল তার ভেতরে? হেমন্তর জন্যে যেদিন রূপসী বিদুষী পাত্রীর দল টাকার তোড়া নিয়ে

অরাকান্তর দরজায় এসে ভিড় করছিল, সেদিন—

সামনের শূন্য দেওয়ালটায় কোনো ছবি ছিল না। কিন্তু এইবারে সেখানে আলোর রেখায় একখানা মুখ ফুটে উঠতে লাগল। হেমন্তর মুখ।

আর একটা রাত। এইরকম রাত।

সেদিনের পাগলামির পর সেই যে অদ্ভুত সংযত হয়ে গিয়েছিল হেমন্ত, তারপর থেকে আর একটি বেশি কথাও সে বলত না অর্চনার সঙ্গে। খাতায় কিছু লিখতে লিখতে কিংবা একটা মোটা বই পড়তে পড়তে হাত বাড়িয়ে নিত কফির পেয়ালাটা। চোখ না তুলেই বলত : 'ঠিক আছে।' কখনো বা আরো সংক্ষেপে : 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

তেতলায় এই একটি মাত্র ঘর, হেমন্তর পড়বার আর শোবার ঘর। যাতে নির্ঝঞ্ঝাটে সরস্বতীর সাধনা করতে পারে, সেই জন্যে এই ঘরটি বিশেষভাবে তাকে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া বাকীটা টানা ছাদ। সেই ছাদের রেলিঙের ধারে ধারে ফুলের গাছ, পামের টব। হেমন্তকে কফি দিয়ে অর্চনা কখনো দু'চার মিনিটের জন্যে রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত ছাদের ওপর। সামনের বাড়িগুলো তখনো তৈরী হয়নি, পথের ওধারের পুকুর, নারকেল গাছ, গোয়ালাদের টিনের বাড়িটা—তাদের ভেতর গঙ্গার হাওয়া আসত —একটু চেয়ে থাকতে থাকতে অন্ধকারে চোখ সয়ে এলে গঙ্গার সাদা আভাসটুকুও দেখা যেত—দেখা যেত লঞ্চের লাল নীল আলো; কখনো বা একটা স্টিমার আচমকা তার সার্চলাইটের আলো ফেলত এদিকে, গাছপালার ভেতর দিয়ে এত দূরেও সে আলো অর্চনার মুখের ওপর দিয়ে বিদ্যুতের মতো ঝলকে যেত।

পাঁচ-দশ মিনিট এমনি করে দাঁড়িয়ে থেকে, পরীক্ষার পড়ায় ক্লান্ত মাথাটাকে ঠান্ডা হাওয়ায় একটু জুড়িয়ে নিয়ে, আবার নিজের ঘরে ফিরে যেত অর্চনা। আজও এইভাবেই দাঁড়িয়ে ছিল সে, হঠাৎ তার মনে হল, পেছনে—তার কাঁধের ওপর কার নিঃশ্বাস পড়ছে।

চমকে মুখ ফেরালো। হেমন্ত। চাঁদ ছিল না, কিন্তু পরিষ্কার আকাশে প্রত্যেকটা তারা পরিচ্ছন্ন উজ্জ্বলতায় ঝকঝক করছিল। তাদের আলোয় পঞ্চমীর জ্যোৎস্নার মতো তরল আভা ছড়িয়ে পড়েছে ছাদের ওপর। প্রত্যেকটা রেখায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে হেমন্তকে। তার চশমাটা জ্বলছে—কিংবা তার চোখ—অর্চনা ভালো করে বুঝতে পারল না, কিন্তু বুকের ভেতরটা তার কেঁপে উঠল।

হেমন্ত একেবারে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তার নিঃশ্বাসের ছোঁয়া পড়ছে অর্চনার গায়ে।

'হেমন্তদা!'

বিচিত্র চাপা গলায় হেমন্ত বললে, 'হাঁ—আমি।'

স্বরটা আবার কাঁপিয়ে দিলে অর্চনাকে। তবু সে সহজ হওয়ার চেষ্টা করল।

'পড়া ছেড়ে উঠে এলে যে?'

'কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

'কাল হবে হেমন্তদা। অনেক রাত হয়েছে এখন। আমি নীচে যাচ্ছি।'

'না—', তেমনি তীব্র চাপা গলায় হেমন্ত বললে, 'না। কথাটা এখনই আমার শেষ করতে হবে। আজ সাতদিন ধরে আমার মাথার ভেতরে আগুন জ্বলছে। কোনো দিকে মন দিতে পারছি না, একটা লাইনও পড়তে পারছি না। কথাটা আজই মিটিয়ে

নেওয়া দরকার।'

ঝড়ের আভাস পাচ্ছিল অর্চনা। স্বাভাবিক সংস্কারে সব মেয়েই টের পায়। উত্তর দিতে পারল না, নিজের হৃৎপিণ্ডের মাতলামি শুনতে লাগল কেবল।

হেমন্ত বললে, 'বাবা তোমার বিয়ে প্রায় ঠিক করে এনেছেন। শুনেছি তোমার পরীক্ষার পরই হবে। আর দেরি করলে আমিও আর সময় পাব না।'—একবারের জন্যে থামল হেমন্ত, 'তুমি আমাকে ভালোবাসো কিনা জানি না, হয়তো বাসো না। কিন্তু তোমাকে আমি ছাড়তে পারব না। আজ রাতে আমাদের সম্পর্ক চিরকালের মতো স্থির হয়ে যাক।'

হাত দুটো বেশি বাড়াবার দরকার ছিল না হেমন্তর। অর্চনা কিছু বোঝবার আগেই তাকে নাগপাশের মতো বেঁধে ফেলল হেমন্ত, একেবারে টেনে আনল বুকের ভেতরে। শুধু টেনে আনল না, যেন পিষে ফেলতে চাইল।

'হেমন্তদা—হেমন্তদা—', রুদ্ধশ্বাসে কিছু বলতে চাইল অর্চনা। কিন্তু বলা গেল না। হেমন্তর জ্বলন্ত ঠোঁট তার মুখ বন্ধ করে দিয়েছিল।

তবুও হেমন্ত ছেড়ে দেয়নি।

বলেছিল, 'আজ আমি স্বার্থপর, শিশুর চাইতে স্বার্থপর। তোমাকে আমি সম্পূর্ণ করে নেব। আমাকে ছাড়া কাউকে তুমি ভাবতে পারবে না, কোনো মানুষের ছায়াও তোমার মনে আমি পড়তে দেব না, আমি ছাড়া পৃথিবীর সব পুরুষের স্পর্শ তোমার কাছে আমি অশুচি করে দেব। আজ আমাদের বিয়ের রাত—আজ আমাদের বাসর রাত। এসো—এসো—'

'মা বাবা—'

'আমার স্ত্রী নির্বাচন করব আমি। আর কেউ নয়।'

'আজ আমাকে ছেড়ে দাও তুমি, আজ এই পাগলামি—'

'সময় একবারই আসে অর্চনা। তাকে হারালে দুবার আর খুঁজে পাওয়া যায় না। সে ভুল আমি করব না। এসো—এসো আমার সঙ্গে—'

বাধা দেবার শক্তি ছিল না অর্চনার। বুকের ভেতর মিশিয়ে তাকে প্রায় তুলে নিয়ে গিয়েছিল হেমন্ত।

ছেড়ে দিয়েছিল প্রায় দু ঘণ্টা পরে। তখন হেমন্ত ছাড়া তার জীবনে আর কোনো পুরুষ ছিল না, তখন হেমন্ত ছাড়া পৃথিবীর সব পুরুষের স্পর্শ অশুচি হয়ে গিয়েছিল তার কাছে।

হেমন্ত বলেছিল, 'কেঁদো না, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কালই আমি বলব বাবাকে।'

'কিন্তু ওঁরা—'

'ওঁরা যদি সরে যান, তুমি আর আমি তো রইলুম।' ড্রয়ার খুলে একটা ছোট সিঁদুরের কৌটো বের করেছিল হেমন্ত: 'এসো, পরিয়ে দিই একটু।'

'না—না, ও থাক।'—তখনো চোখে জল ছিল অর্চনার: 'ও একবার পরলে আর মোছা যায় না। সিঁথের সিঁদুর নিয়ে কাল সকালে আমি মুখ দেখাব কী করে? সময় হলে পরিয়ে দিয়ো। আজ বরং—', কাঁপা হাতে কৌটোটা নিয়ে মাথায় ঠেকিয়েছিল:

'এই পর্যন্তই থাকুক।'

সে সিঁদুর আর পরাতে পারেনি হেমন্ত। কৌটোটা আজও তোলা আছে অর্চনার ট্রাঙ্কের ভেতর।

বাইরে আবার কর্কশ শব্দে প্যাঁচা ডাকল—চমকে উঠল অর্চনা। সামনের ফাঁকা দেওয়াল থেকে হেমন্তর ফুটে ওঠা ছবিটা যেন মুছে আসছে একটু একটু করে। শূন্যতার পর শূন্যতার আবরণ খুলে যাচ্ছে—একটা অতল সমুদ্র আর হা-হা-করা আকাশের ভেতরে কে তাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। বাসুদেব? কিন্তু বাসুদেব কেন? তার জীবনে তো অন্য কোনো পুরুষের ছায়া পড়বারও কথা নয়!

হেমন্ত—হেমন্ত ছাড়া আর কিছুই নেই। তার বারো বছরের এই বন্ধ শোকের মন্দিরে স্মৃতির ধূপ জ্বলছে। কোনো বাইরের হাওয়া আসতে পারবে না সেখানে।

হেমন্ত। আর কেউ নয়।

জোর করে উঠে পড়ল অর্চনা, আলো নিবিয়ে দিলে, তারপর অন্ধের মতো অন্ধকার বিছানাটায় এসে এলিয়ে পড়ল।

॥ ছয় ॥

তারাকান্ত চোখ তুলে চাইলেন। দু'দিন থেকে তাঁরও যেন কী হয়েছে। আর গঙ্গার কথা ভাবেন না—সামনের নতুন বাড়িগুলোর দিকে বিরক্তভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আর একটা বিস্বাদ চেতনা তাঁকে বিব্রত করে। তাঁর অর্চনার কথাই মনে হয়।

এতদিন কোনো সমস্যা ছিল না, প্রশ্ন ছিল না, ভাবনা ছিল না। এই বাড়ির সব কিছু একটা বিষণ্ণ পবিত্রতার মধ্যে নির্বাসিত হয়ে গিয়েছিল। চারদিকে একটা শান্ত অন্ধকারের মতো ছিল -কোনো মন্দিরের সব আলো ক'টি নিভিয়ে দিলেও যে একটা জ্যোতির্ময় উপলব্ধি চারদিকে বিকীর্ণ হয়ে থাকে—সেই গভীর একটা মগ্নতা ছিল এখানে। কিন্তু আজ তারাকান্ত অনুভব করছিলেন—কোথায় যেন ঠিক সুর লাগছে না—যেন একটা অবাঞ্ছিত আলোর ঝলক এসে মন্দিরের সেই ধ্যানতন্ময়তাকে ব্যাঘাত করছে।

অর্চনা?

কলেজে পড়তে দিয়ে কি তাকে ভালো করেননি?

প্রথমে আপত্তি তুলেছিলেন, বলেছিলেন, 'কী হবে মা আর পড়ে? তোমায় তো চাকরি করতে হবে না। সুমন্তর মুখাপেক্ষী হওয়ারও দরকার নেই। তোমার জন্যে যে টাকা আমি রেখে দিয়েছি, তাতে হাতও দিতে হবে না—তার সুদেই তোমার খরচ চলে যাবে। আর এ বাড়িতে তোমার অংশও তো লিখে দিয়েছি।'

হ্যাঁ—যথেষ্ট করেছেন তারাকান্ত। এর বেশি দরকার কী আছে অর্চনার জীবনে? একবেলা একমুঠো খাওয়ার খরচ। সামান্য কাপড়-জামা। আলমারি ভরে তো কিনেই দিয়েছেন ধর্মগ্রন্থ—যত খুশি পড়তে পারবে। এর বেশি আর কী চাই?

তবু মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে ছিল অর্চনা।

'অন্তত বি-এটা পর্যন্ত পাস করতে চাই, বাবা।'

'কী হবে মা?'

'আপনি তো অনেক ইংরেজি বইও কিনে দিয়েছেন। পড়ে কিছু বুঝতে পারি না।'

তা বটে। এইবার একটু দুর্বল হয়েছিলেন তারাকান্ত। শ্রীঅরবিন্দের রচনা। বিবেকানন্দের ইংরেজি বই। ইংরেজি একটু জানা দরকার।

'আমি তো তোমায় বাড়িতেও ইংরেজি পড়াতে পারি, মা।'

'আপনাকে আর বিরক্ত করতে ইচ্ছে করে না, বাবা।'

'বিরক্ত কি মা, তোমাকে পড়াতে আমার তো ভালোই লাগবে। বেশ তো—বসা যাবে কাল থেকেই।'

অর্চনা জবাব দেয়নি। তেমনি দাঁড়িয়ে ছিল মাথা নামিয়ে।

কিন্তু ওকালতি করলেন সুলতাই। অর্চনার চোখে জল দেখেছিলেন খুব সম্ভব। মেয়েদের ওই এক দোষ। ইমোশ্যনের সামনে আর ভালোমন্দ বিচার করতে পারে না।

'দাও না ভর্তি করে—এত বলছে যখন!'

'কী হবে? চাকরি তো করতে যাবে না আর!'

'নাই বা গেল। শখও তো হতে পারে।'

শখ! কথাটা যেন নতুন শুনলেন তারাকান্ত। এই সর্বত্যাগিনী মেয়েটি—গীতার 'নিষ্কাম কর্মযোগে' যার আপাদমস্তক অভিষিক্ত হয়ে গেছে বলে বিশ্বাস করেছিলেন তিনি—তারও শখ! এ তো ভালো কথা নয়। এর থেকেই চিত্ত-বৈকল্য আসে।

'শখের কী আছে?' তারাকান্ত একটু রূঢ়ই হয়ে উঠেছিলেন যেন: 'এ বাড়িতে শখ বলে কিছু নেই। তুমি ভুলে গেছ সুলতা—আজ অর্চনার জন্যেই বাড়িতে মাছ-মাংস বন্ধ হয়েছে, পাখা চলে না, রেডিয়ো চলে না, সিনেমায় যাওয়া হয় না। আমরা ওর জন্যে সব ছেড়েছি।'

'তা ছেড়েছ। তার জন্যে সুমন্তও বাড়ি ছেড়েছে।'

'তার মানে?'

'মানেটা আমি তোমায় বুঝিয়ে বলব নাকি?'—ধার ফুটেছিল সুলতার স্বরে: 'তোমার ছোট ছেলের মুর্গী ছাড়া খাওয়া হয় না। পাখা তো পাখা—এয়ার-কন্ডিশান ঘর না হলে ছোট বৌমার ঘুম হয় না। সেদিন নীরা এসে দু'দিনও থাকল না—স্পষ্ট বললে, মা, গরমে ছেলেমেয়ে দুটো ঘুমুতে পারেনি, গা-ভর্তি ঘামাচি উঠে গেছে ওদের। আমরা বুড়ো-বুড়ী কষ্ট সইছি, সইব। সকলের ওপরে সেটা চাপাতে চাও কেন!'

বারো বছর পরে বাড়িতে প্রথম বিদ্রোহের সুর শুনেছিলেন তারাকান্ত। গুম হয়ে বসে থেকেছিলেন কিছুক্ষণ। মনে পড়ে গিয়েছিল, অর্চনাকে নিয়ে যেদিন বাড়িতে শোকের মন্দির তিনি গড়েছিলেন, সেদিনও ব্যাপারটা সুলতার সম্পূর্ণ পছন্দ হয়নি।

'আমাদের ভাঙা কপাল, তাই হেমন্ত চলে গেল। কিন্তু পরের মেয়েকে সন্নিসিনী সাজাচ্ছ কেন?'

'পরের নয়, ও আমাদেরই মেয়ে।'

'বেশ, তাই হল। কিন্তু বিয়েটা যখন হয়ই নি—'

'সম্প্রদানই হয়নি, কিন্তু মনে মনে ওদের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। তুমি তো জানো—হেমন্ত মুখ ফুটে বলেছিল সে-কথা।'

'অমন মনে মনে বিয়ে অনেক হয়।'—ছেলের শোক ভুলে গিয়েও সুলতা বাস্তববাদী হয়ে উঠেছিলেন: 'আশীর্বাদের পরেও তো বিয়ে ভাঙে। কত ছেলেমেয়ে তো এ ওকে পছন্দ করে—শেষে আলাদা আলাদা জায়গায় বিয়ে হয়ে যায়।'

'কিন্তু অর্চনা অন্যপূর্বা।'

'অন্যপূর্বারও বিয়ে হয়।'

'সে বিবাহিতা।'

'ছাই! ও-সব পাগলামি ছেড়ে একটা ভালো জায়গায় মেয়েটার বিয়ের ব্যবস্থা করে দাও।'

'আমি পারব না।'

'বেশ, আমিই বলব এখন।'

কিন্তু তারাকান্ত সব চেয়ে বেশি জোর পেয়েছিলেন অর্চনার কাছ থেকেই। কথাটা শোনবার সঙ্গে সঙ্গে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল সে। লুটিয়ে পড়েছিল সুলতার পায়ের তলায়, কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছিল।

'ও কথা বলবেন না, মা। বিয়ে আমার দু'বার হতে পারে না।'

সুলতা চুপ করে গিয়েছিলেন।

তারপরে শুরু হয়েছিল শোকের সাধনা। উজ্জ্বল, অম্লান। একগুচ্ছ রজনীগন্ধার মতো, একমুঠো ধূপের গন্ধের মতো, আলো-নেবা মন্দিরের জ্যোতির্বলয়িত অন্ধকারের মতো পবিত্র। এর ভেতরে শখের প্রশ্ন কোনোদিন ওঠেনি।

সুমন্তর কাছ থেকে কোনো আশা তিনি রাখেন না—ইয়োরোপে গিয়ে সে আলাদা ধাঁচের হয়ে গেছে। স্ত্রীটি সঙ্গে গিয়েছিল, সে ফিরেছে মেমসায়েবের ওপর আর এক কাঠি হয়ে; এ বাড়িতে এলে তার মুখের হাসি নিবে যায়—যেন কেউ জেলখানায় এনে পুরে দিয়েছে তাকে। মীরা-নীরা তো পরই হয়ে গেছে, তাদের জন্যে তাঁর কিছু বলবারও নেই, ভাববারও নেই। কিন্তু অর্চনা?

সুলতা আবার বললেন, 'দাও ওকে কলেজে ভর্তি করে।'

'তারপর?'

'তারপর আবার কী?'

'যদি—'

'যদিটা এল কোত্থেকে?'—সুলতার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল।

'মানে—মানুষের মন—বাইরের সংসর্গে—'

'বত্রিশ বছর বয়েসে বাইরের সংসর্গে টলে যাবে?' সুলতা হেসে উঠেছিলেন: 'তাহলে সে মন টলেই আছে। এতদিন তুমি মিথ্যেই তাকে খাঁচায় আটকে রেখেছ।'

দুর্ধর্ষ অ্যাডভোকেট তারাকান্ত চৌধুরী চুপ করে গিয়েছিলেন। জীবনে অনেক উকিল-ব্যারিস্টার, অনেক বদমেজাজী আর খুঁৎখুঁতে জজ, অনেক পোড়-খাওয়া পেশাদার সাক্ষীকে তিনি নাজেহাল করে দিয়েছেন, কিন্তু স্ত্রীর কাছে কোনোদিন তর্কে জিতেছেন বলে মনে করতে পারেন না। আজও হার স্বীকার করতে হল। কিন্তু আদৌ প্রসন্ন

হয়ে নয়।

'আচ্ছা, দেখা যাক। কিন্তু পরে আমায় দোষ দিয়ো না।'

'কিসের দোষ?'

'অর্চনা যদি—'

'বিগড়ে যায়? বললুম তো, তা হলে বিগড়েই ছিল। তুমি মিথ্যেই ঠেকিয়ে রেখেছিলে এতকাল!'

তারাকান্ত প্রথমে বেথুনে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু গাড়িটা বেচে দিয়েছেন। আর ওদের বাসও এতদূরে আসে না। পাবলিক বাসে যাতায়াত করতে দেবেন? অসম্ভব—সে ভাবাই যায় না। একে তো যাচ্ছেতাই ভিড়, তার ওপর গা-ঘেঁষাঘেঁষি রাজ্যের বাজে লোক, আর যা জঘন্য দিনকাল! না—তা হতেই পারে না।

অগত্যা এই কলেজটাই বাছতে হল। মেয়েদেরই কলেজ—নতুন হয়েছে, কিন্তু মেল-স্টাফ্ বড্ড বেশি। কিন্তু উপায় ছিল না।

অর্চনাই কি বদলাচ্ছে? সেইটাই কি টের পাচ্ছেন তিনি? যেমন কোর্টে দাঁড়িয়ে মিথ্যে সাক্ষীর মুখের দিকে তাকালেই তিনি বুঝতে পারতেন?

অথবা তাঁরই সংশয়? নিজেই গড়ে তুলছেন ছায়াটা?

বিরসভাবে অলক্ষ্য গঙ্গার দিকে তাকাতে তাকাতে তারাকান্ত নিজের ভেতরে একটা জোর আনবার চেষ্টা করতে লাগলেন। না—এরকম ভাবনার কোনো মানে হয় না। অর্চনা আজ এই বারো বছর ধরে তিলে তিলে হেমন্তময় হয়ে গেছে, তার বাইরে তার কোনো ভাবনা নেই, কোনো অস্তিত্ব নেই। এই মেয়েটির দিকে চেয়ে তিনি হেমন্তকে দেখতে পান—অর্চনা আজ তাঁর কাছে হেমন্তর প্রতীক হয়ে গেছে। মৃত্যুর মধ্যে হারিয়ে যাওয়া তাঁর সন্তান নবজীবিত হয়ে উঠেছে এই শোকশান্ত মেয়েটির ভেতরে—আর সেই উজ্জীবনে তিনিও অর্চনার সঙ্গে সমান অংশ নিয়েছেন, গীতা পড়িয়েছেন, উপনিষদ আলোচনা করেছেন, যোগবাশিষ্ঠ বুঝিয়ে দিয়েছেন, শঙ্করাচার্যের কথা বলেছেন। আজ অর্চনা ভেতরে বাইরে একটা লোহায় গড়া দুর্গের মতো সুকঠোর হয়ে গেছে, কোনো প্রলোভন, কোনো শক্তিই তাকে টলাতে পারবে না।

কিন্তু—

ভুরু দুটো কুঁচকে উঠল তারাকান্তর। মনের ভেতরে স্বস্তি পাচ্ছেন না কেন? নিজের তৈরী ছায়াটাই কি ভয় দেখাচ্ছে তাঁকে?

যা হয় হোক—তারাকান্ত আর একটা ব্যবস্থা করবেন এবার। লোহার দুর্গের ওপর আরো একপ্রস্থ ইস্পাতের গাঁথুনি। কাল থেকে তাঁর খেয়াল হয়েছে কথাটা। অর্চনার একটা দীক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার।

ড্রয়ার টানতেই চমকালো অর্চনা। সেই খামটা। হাত বাড়িয়ে সেটা ছুঁতে গিয়েই সে চমকে হাত সরিয়ে নিলে। বাসুদেবের কীর্তি।

কী অদ্ভুত লোক—আর কী বিশ্রী তার কাণ্ড!

লোকটা কেবল আর্ট-ক্রিটিক নয়, ফোটোগ্রাফারও। ছবি তোলবার নেশা আছে তার। দীপা যেদিন তাকে টানতে টানতে দাদার ঘরে নিয়ে গিয়েছিল, সেদিন অর্চনা

দেখেছিল, দেওয়ালে শুধু একরাশ ছবিই নেই, গোটাতিনেক ক্যামেরাও টাঙানো রয়েছে। আর একটা সেলফে বই-পত্রিকার সঙ্গে মিশে রয়েছে অন্তত খান-পনেরো অ্যাল্‌বাম।

সেই অ্যালবাম খুলে অনেকগুলো ছবি দেখিয়েছিল বাসুদেব। কন্যাকুমারী থেকে হিমালয়ান স্নো; লিডো-মার্গারিটা থেকে ত্র্যম্বকের ত্রিমুণ্ড মহাকাল। সারা ভারতবর্ষ। দেখতে দেখতে যেন স্বপ্নে ডুবে গিয়েছিল অর্চনা। নোয়াখালির স্মৃতি, তারপর কলকাতা। এর মধ্যে তার আর কিছুই নেই। দু-একবার তারাকান্ত গাড়ি করে তারকেশ্বর নিয়ে গিয়েছিলেন, ওই পর্যন্তই।

হঠাৎ চটকা ভেঙে গিয়েছিল বাসুদেবের স্বরে।

'আপনার একটা ছবি তুলব।'

শিউরে উঠে অর্চনা বলেছিল, 'না—না।'

'না—কেন? ছবি তুলতে আপনার আপত্তি আছে নাকি?'

'আমার ভালো লাগে না।'

বাসুদেব হেসে উঠেছিল: 'এই ব্যাপার! কিন্তু আপনার যদি ভালো না লাগে, তাহলে একটা রফা করতে দিন। যাদের তুলতে ভালো লাগে, তাদের তুলতে দিন অন্ততঃ।'

'না, আমি পারব না।'

'পারবে না কি অর্চনাদি?'—দীপা হেসে উঠেছিল: 'ছবি তোলা এমন কি অসম্ভব ব্যাপার? আমি তো এক্ষুনি তৈরী। কই দাদা, আনো তোমার ক্যামেরা।'

'তোর ছবি তুলে আমি ফিল্‌ম্‌ নষ্ট করতে চাই না।'

সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা। একটু আগেই অ্যালবামের ভেতরে দীপার অন্ততঃ খান আণ্টেক ছবি চোখে পড়েছে অর্চনার। অন্য অ্যালবামগুলোতেও আরো কিছু থাকা সম্ভব। দীপার ছবি তোলার ব্যাপারে বাসুদেবের কোনো কৃপণতা আছে বলে মনে হয় না।

দীপা কলধ্বনি করেছিল: 'দেখলে অর্চনাদি, দাদার কী পার্শিয়ালিটি!'

'আদৌ পার্শিয়ালিটি নয়।'—সিগারেট ধরাতে ধরাতে গম্ভীর হয়ে বাসুদেব বলেছিল, 'তোর যা চেহারা—ছবি তুললে পেত্নীর মতো দেখায়!'

এটাও মিথ্যে কথা। দিব্যি মিষ্টি চেহারা দীপার।

মুখ ভার করে দীপা বললে, 'সকলের তো আর অর্চনাদির মতো সুন্দর চেহারা হয় না!'

অর্চনা বিব্রত হয়ে উঠল: 'আমাকে আবার জড়াচ্ছিস কেন এর ভেতরে?'

গম্ভীরভাবে বাসুদেব বলেছিল, 'কিন্তু মিথ্যে বলেনি। কোনো মেয়ে অবিশ্যি অন্য মেয়েকে সুন্দরী দেখে না, আর দেখলেও স্বীকার করে না. কিন্তু আমার বোনের গাট্‌স্‌ আছে। সত্যি কথা বলবার সৎসাহস রাখে।'

'মোটেই সত্যি কথা নয়। আমি কালো—আমি—'

'নিজের রূপ নিজে বর্ণনা না-ই বা করলেন! আত্মকথন বস্তুটা হয় অত্যুক্তি, নইলে নিন্দোক্তি। কিন্তু দুটোই খারাপ। আর আপনার যখন পরেরটার দিকেই বেশি ঝোঁক দেখা যাচ্ছে, তখন আমি তার প্রবল প্রতিবাদ করব। আমি বরং আত্মম্ভরিতা

সইতে পারি—তাতে মর্যাদা বোধ প্রকাশ পায়, কিন্তু আত্মনিন্দা আমার ভয়ঙ্কর খারাপ লাগে। দয়া করে এ কাজটি করবেন না।'

'কিন্তু আমি—'

'আমি ফোটোগ্রাফার—জানেন তো? আর ছবিও যে বেশ ভালোই তুলি—দীপুই তার সাক্ষী দেবে। রূপ নিয়ে সামনে আলোচনা তুলে লজ্জিত করতে চাই না, কিন্তু সত্যের খাতিরে আমি বলতে বাধ্য—চমৎকার ক্যামেরা-ফেস আপনার, লাভলি প্রোফাইল—খুব ভালো ছবি আসবে।'

এ নিছক ফোটোগ্রাফারের কথা—এর মধ্যে কোনো অন্যায় নেই, সংকোচেরও প্রশ্ন নেই কোথাও। যেমন স্পষ্ট, তেমনি স্বাভাবিক। কিন্তু বারো বছরের অনভ্যাসে বুকের ভেতরে রক্ত চমকে উঠেছিল অর্চনার—মুখ রাঙা হয়ে গিয়েছিল।

'আমাকে মাপ করবেন।'

একটু নিবে গিয়েছিল বাসুদেব। একটা ছায়া পড়েছিল মুখে।

'ছবি একটা তুলতে দেবেন না আপনার?'

'না।'

দীপাও ক্ষুণ্ণ হয়েছিল একটু: 'সত্যি অর্চনাদি, এতে যে কী আপত্তি—।'

'তুই বুঝতে পারবি না।'

সত্যিই বোঝানো সম্ভব নয়। অর্চনার সামনে তারাকান্ত এসে দাঁড়াচ্ছেন ভ্রূকুটি-ভরা চোখে। বলছেন—'কী হচ্ছে মা—কী হচ্ছে এ-সব? এইজন্যেই কি তোমায় আমি কলেজে পড়তে পাঠিয়েছিলুম?' কিন্তু সেকথা বলা যাবে না। তার বদলে, সমস্ত ঘরের উচ্ছল আবহাওয়াটাকে নিষ্প্রাণ করে দিয়ে অর্চনা বলেছিল, 'আমি বরং আজ চলি।'

ফিরে এসেছিল। কিন্তু রক্তে ঢেউ থামেনি। শুধু ঝিঁঝির ডাকের মতো চেতনার ওপর ঝিম ঝিম করছিল দুটো কথা: 'চমৎকার ফোটো ফেস আপনার, লাভলি প্রোফাইল—'

কিছুই নয়, ফোটোগ্রাফারের কথা। পুরুষের চোখ দিয়ে দেখা নয়—এ ক্যামেরা-ম্যানের শীতল নিরপেক্ষ বিচার। অন্য যে-কোনো মেয়েই এ-কথা শুনলে খুশি হত। কিন্তু অর্চনার সমস্ত অস্তিত্বেই যেন দোলা লেগে উঠেছে। তার জীবনে পুরুষ আর শিল্পী একাকার—একই পরিচয় সকলের—তারা পুরুষ। তপ্ত অঙ্গার আর ঘৃতকুম্ভের সেই কুৎসিত অবিশ্বাস।

তারাকান্তর দূর-সম্পর্কের এক বোন মাঝে মাঝে কলকাতায় আসেন বাঁকুড়া থেকে। বয়েস এখন পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। খুব নিষ্ঠাবতী তিনি। দু'বেলা পুজো-আচ্চায় তাঁর কম করেও ঘণ্টাচারেক সময় কাটে। কালো রোগা চেহারা, অসম্ভব শুচিবায়ু—রাতদিন জল ঘেঁটে ঘেঁটে হাতে-পায়ে তাঁর হাজা হয়ে গেছে। দেখতে তিনি চমৎকার, অথবা কোনোদিনই চলনসই গোছেরও ছিলেন—একথা কেউ বলবে না; অথচ গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে কিংবা দক্ষিণেশ্বরে আরতি দেখতে গেলে ক্রমাগতই বলতে থাকবেন: 'ওই লোকটা অমন ড্যাব-ড্যাব করে তাকাচ্ছে কেন অসভ্যের মতো?' 'কেমন ভদ্দরলোক গো—গায়ের ওপর ধাক্কা দিয়ে গেল'—অথচ ভদ্রলোক হয়তো তিন

হাত দূর দিয়ে চলে গেছেন।

এ তাঁর আশ্চর্য বাতিক, সবটাই মনগড়া। অর্চনার বিশ্রী লাগত। এখন যেন একটা উত্তর পাওয়া যাচ্ছে কোথাও। যারা নিজেদের বেশি বাঁচিয়ে রাখতে চায়, ভয় তাদেরই সবচাইতে বেশি; ধর্মের মধ্যে যারা ডুবে থাকে—তারাই অধর্মের আতঙ্কে আধমরা; যেখানে যত বাঁধন, সেখানেই আলগা হয়ে যাওয়ার দুশ্চিন্তা সব সময়ে তাদের পীড়ন করতে থাকে।

সেই ব্যাধি অর্চনাকেও ছুঁয়েছে। বাসুদেবের কথাগুলো কিছুতেই সে ভুলতে পারছে না। হয়তো তারাকান্তই ঠিক বুঝেছিলেন। তার বাইরে আসবার দরকার ছিল না, উচিত ছিল না; দিনের পর দিন আড়ালে লুকিয়ে থেকে তার অবস্থা এখন সেই সব ছত্রাকের মতো—যারা অন্ধকারে জন্মায়, বাড়ে—অথচ রোদের আঁচে, বাতাসের ছোঁয়ায় শিউয়ে শিউরে মরে যায়।

একবার ঠোঁট কামড়ে ধরল অর্চনা। ওই খামটা!

বাসুদেব কিন্তু কথা রাখেনি। একেবারে বিশ্বাসঘাতকের মতো ছবি তুলে নিয়েছে তার।

অর্চনা জানতও না, কাণ্ডটা সে কখন করেছে! দীপা যখন ডাকল, 'দাদা একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখাবে, চলো'—তখন সে ভেবেছিল, কোনো নতুন ছবি-টবি তুলেছে হয়তো। কৌতূহল ছিল না—দীপার টানেই যেতে হয়েছিল।

কিন্তু চমকে দিয়েছিল বাসুদেব।

'এইটে আপনার জন্যে।'

খাম খুলে চমকে গিয়েছিল অর্চনা। পাশ থেকে তোলা তারই ছবি। খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে সে হাসছে।

'এ কি!'

'কেন—চিনতে পারছেন না?'

'এ ছবি কী করে—কখন—'

'ম্যাজিকে। সিটিং তো দেবেন না—অগত্যা যাদুবিদ্যারই আশ্রয় নিতে হল!'

স্তব্ধ হয়ে ছবিটার দিকে তাকিয়ে ছিল অর্চনা। হেসে উঠেছিল বাসুদেব।

"ভয় নেই—আর নার্ভাস করে দেব না। সেদিন দীপুর সঙ্গে হাসছিলেন আর গল্প করছিলেন, সেই ফাঁকে ওদিকের জানলা দিয়ে অন্যায়টি করে ফেলেছি। নর্থ লাইট ছিল আপনার মুখের ওপর—ছবিটা উতরে গেছে। অবশ্য দীপুও এসে গেছে কম্পোজিশ্যনে—আমি নেগেটিভ থেকে ওকে এলিমিনেট করে এটাকে এনলার্জ করিয়েছি।'

'বা রে, আমাকে এলিমিনেট্!'—দীপা আর্তনাদ করে উঠেছিল: 'কক্ষনো চলবে না, তা বলে দিচ্ছি!'

'কিন্তু তোর যা পেত্নীর মতো চেহারা—'

রসিকতা শেষ করতে পারেনি বাসুদেব। তার আগে একসঙ্গে দুই ভাই-বোন ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। অর্চনার হাত থেকে ফোটোটা খসে পড়েছে টেবিলের ওপর, চোখের পাশ দিয়ে জল নেমেছে।

'আপনি কাঁদছেন ?'

শাড়ীর আঁচল চোখে তুলে অর্চনা বললে, 'না-না, ও কিছু না।'

চেয়ারের ওপর শক্ত হয়ে গিয়েছিল দীপা। শীর্ণ কাঁপা গলায় বলেছিল 'ছি ছি দাদা, কী কাণ্ড করলে তুমি—এ কী করলে!'

বাসুদেবের ঠোঁট কাঁপল কয়েকবার, উজ্জ্বল কপাল আর ধারালো চোখ তার ছায়া-ছায়া হয়ে গিয়েছিল। দু-হাত জোড় করে বলেছিল, 'আমি বুঝতে পারিনি—একেবারেই বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলুম, অনেকেই মুখে আপত্তি করেন কিন্তু—মনে করেছিলুম আপনি খুশি হবেন—আয়্যাম সরি—রিয়্যালি এক্সট্রিমুলি সরি! আমাকে মাপ করবেন—এ ছবিটা আমি ছিঁড়ে ফেলছি, আর নেগেটিভটাকে আপনার সামনেই—'

হাত বাড়িয়ে দিল বাসুদেব। তখনো চোখ দিয়ে জল পড়ছিল অর্চনার, তখনো একটা আবেগ ঠেলে ঠেলে উঠছিল তার বুকের ভেতর থেকে। তবু অর্চনা তারই ভেতরে ধরাগলায় বলেছিল, 'থাক্—এ ছবিটা আমারই থাক্।'

॥ সাত ॥

কেন নিয়ে এল ছবিটা?

মনের কাছে উত্তর মেলে না।

ছবি তার একেবারে যে তোলা হয়নি তা নয়। এ বাড়ির একখানা গ্রুপ ফোটোর ভেতরে ফ্রক পরে আর রিবন বেঁধে মীর-নীরার সঙ্গে সে বসে আছে তারাকান্ত আর সুলতার পায়ের কাছে। মা-বাবার চেয়ারের পেছন ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে কলেজের ছাত্র হেমন্ত আর কিশোর সুমন্ত। কুড়ি বছর আগেকার তোলা ছবি। সেটা এখন রয়েছে তারাকান্তর শোবার ঘরে, তার কাচের একটা জায়গা ফেটে গেছে, ধুলো পড়েছে তার ওপরে, ভেতরটা লালচে হয়ে এসেছে। সে ছবির দিকে এখন কেউ ভালো করে তাকায়ও না।

এখন বাড়িতে একটিই ছবি আছে। হেমন্তর ছবি।

তার একখানা আছে তেতলার সেই পুজোর ঘরটিতে যেখানে হেমন্ত থাকত, যেখানে তার বই-খাতা-কলম আজো গোছানো আছে—সেখানে তার স্মৃতিকে সারাক্ষণ সজীব রাখবার আয়োজনে এতটুকুও ত্রুটি ঘটেনি; সেখানে দেওয়ালে তার ছবিটাকে প্রতিদিন টাটকা ফুলের মালা পরিয়ে দেওয়া হয়, চন্দন শুকিয়ে গেলে নতুন করে ফোঁটা দেওয়া হয় আবার। সে ছবির আর একখানা কপি রয়েছে তারাকান্তর ঘরে, কতদিন অর্চনা দেখেছে, ছবিটার দিকে অনিমেষ চোখে তাকিয়ে স্থির হয়ে বসে আছেন তিনি।

হেমন্তর ছবি। শান্ত গম্ভীর চেহারা—একটু লাজুক। আত্মমগ্ন চোখের চাউনি—মৃত্যুর ভেতর দিয়ে যেন আরো সুন্দর হয়ে গেছে এখন। তার পাশাপাশি নিজের ছবিটার কথা মনে পড়তেই ঘৃণায় লজ্জায় শিউরে উঠল অর্চনা। কী হাসির কথা উঠেছিল মনে নেই—কিন্তু এত অসংকোচে এমনভাবে হেসে উঠেছিল সে! এ বাড়িতে এমন করে এই বারো বছরের মধ্যে কেউ তাকে হাসতে দেখেনি—কেউ না।

তা হলে এই তার মনের চেহারা? হেমন্তর জন্যে কোনো শোক নেই তার—কোনো যন্ত্রণা নেই? এ হাসি তো তপস্বিনীর নয়—তারা তো এমন নির্লজ্জের মতো দাঁত বের করে হাসতে পারে না! সে কি এই বারো বছর ধরে শুধু অভ্যাসেই হেমন্তর কথা ভেবেছে—তার চিন্তায়, তার গভীরে, তার উপলব্ধির আড়ালে—অনেকদিন আগেই ছিন্নমূল হয়ে স্রোতের মতো ভেসে গেছে হেমন্ত?

এই ছবিটা ছিঁড়ে ফেলা উচিত। কোন্ দুর্বলতায়—কিসের প্রলোভনে এটাকে বয়ে আনল সে? তার পর থেকে আর সে দীপাদের বাড়ি যায় না, দীপাও কেমন সংকুচিত হয়ে আছে। কিন্তু তার দীপাকে বলা দরকার—বাসুদেব ওই ছবির নেগেটিভ-টাকে পুড়িয়েই ফেলুক—ওর চিহ্নও যেন আর না থাকে।

না—এই বাড়িতে এ ছবি মানায় না। এ তার শোককে অপমান করছে—হেমন্তর অমর্যাদা করছে।

তবু হাত গুটিয়ে তেমনি বসে রইল অর্চনা। আর মনের সামনে ফুটে উঠল হেমন্ত।

হেমন্ত কথা রেখেছিল। চিরদিনই সে শান্ত স্থিরচিত্ত মানুষ। তার কোনো কাজে দ্রুততা নেই, কিন্তু নিশ্চয়তা আছে। নিতান্তই ঝোঁকের মাথায় সে সেদিন অর্চনাকে কাছে টেনে নেয়নি, তিলে তিলে নিজেকে তৈরী করেছে, দিনের পর দিন অপেক্ষা করেছে—হয়তো নিজের মনটাকে বশ মানাতেও চেয়েছে। তারপর একসময়—তার অঙ্কের ফল মেলাবার মতোই বুঝেছে—এ তার নিশ্চিত পরিণাম, এখান থেকে সে জোর করে ফিরতে পারবে না, ফেরবার কোনো পথ নেই তার। তখন সে তৈরী হয়েছে; আর শুধু যে তৈরী হয়েছে তা নয়—তার স্বামীত্বের পুরো দাবিটা পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছে—যাতে অন্য পুরুষের স্পর্শও আর কল্পনা না করতে পারে অর্চনা।

সেই সিঁদুরের কৌটোটা আজও তোলা আছে অর্চনার বাক্সের ভেতর। ফুলশয্যার রাতে হেমন্ত তা থেকে তাকে সিঁদুর পরিয়ে দেবে কথা ছিল। কিন্তু সে সুযোগ আর আসেনি।

অথচ সব নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল।

হেমন্তর কথায় প্রথমটা যেন বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলেন তারাকান্ত। একবার হেমন্ত আর একবার অর্চনার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলেন তিনি।

'কী বলছিস তুই হেমু?'

'সত্যি বলছি বাবা।'

'অর্চনাকে বিয়ে করবি?'

'ওকে আমি কথা দিয়েছি বাবা। আমি ওকে ছাড়া আর কাউকেই বিয়ে করব না।'

তখন চুরুট খেতেন তারাকান্ত, হাতের চুরুট তাঁর নিভে গিয়েছিল। মাথার ওপর পাখার হাওয়ায় তা থেকে মোটা একটা ছাইয়ের টুকরো খসে পড়েছিল তাঁর কোলের ওপর—তিনি টের পাননি। শুধু এমনভাবে তাকিয়ে ছিলেন কিছুক্ষণ যে মনে হচ্ছিল এর আগে হেমন্তকে তিনি কখনো দেখেননি, অর্চনা তাঁর কাছে সম্পূর্ণ অচেনা।

অর্চনা আসতে চায়নি, হেমন্তই তাকে জোর ক'রে টেনে এনেছিল বাবার কাছে। অর্চনার মনে হচ্ছিল, এখান থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাতে পারলে সে বেঁচে যায়।

কিন্তু তখন পালাবার উপায় ছিল না, পা দুটো যেন জমে গিয়েছিল মাটির ভেতরে, কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে নিজের বুকের ভেতর ঝড়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল সে।

আরো কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারাকান্ত বলেছিলেন, 'তাহলে অর্চনাকেই তুমি বিয়ে করতে চাও?'

'সেই কথাই তো আপনাকে বলছি বাবা!'

একবারের জন্যে ভ্রূকুটি করেছিলেন তারাকান্ত।

'দু-চার দিন আগে সেটা আমাকে জানালে পারতে। তাহলে তোমার আর অর্চনার বিয়ের ব্যাপার নিয়ে অন্য ভদ্রলোকদের বিরক্ত করতুম না!'

'আপনি তো আমায় কোনো কথা জিজ্ঞেস করেননি বাবা?'

'হুঁ।'

ঘরটা থমথমে হয়ে থেকেছিল কিছুক্ষণ। তারপর অপরাধীর মতো হেমন্ত প্রশ্ন করেছিল: 'আপনি কি রাগ করলেন আমাদের ওপর?'

'রাগ করব কেন? তোমরা এখন বড়ো হয়ে গেছ।'

রাগ নিশ্চয়ই করেছিলেন। একটা আশ্রিতা মেয়েকে যতই আপন করে নিন, যতই নিজের মেয়ে বলে স্নেহবৃষ্টি করুন—এমন একজন সব-খোয়ানো সর্বনাশিনীকে পুত্রবধূ করবার কল্পনা নিশ্চয়ই তাঁর কখনো ছিল না। তবু তারাকান্ত জোর করলেন না—একটা পরাভবের মতোই জিনিসটাকে মেনে নিলেন।

সুলতা আপত্তি করেছিলেন স্পষ্ট ভাষাতেই।

'ছি ছি, হেমু!'

'ছি-ছির তো কিছু হয়নি মা?'

'অর্চনাকে শেষে তুই—'

হেমন্ত পড়ার বই থেকে একবারের জন্যে মাথা তুলেছিল।

'আপত্তির তো কিছু নেই মা। তোমরাই তো কতবার বলেছ—এমন লক্ষ্মীর মতো মেয়ে, যে ঘরে যাবে সে ঘর আলো করে দেবে। তাই যদি, তবে এখন লক্ষ্মীকে যেচে বিদায় করতে চাইছ কেন ঘর থেকে?'

চিরদিনের শান্ত হেমন্তর এই প্রগল্‌ভতা দেখে থ হয়ে গিয়েছিলেন সুলতা। কিন্তু এমন অকাট্য যুক্তির কোনো জবাব খুঁজে পাননি তিনি। তারপর শুধু একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'লোকে কী বলবে!'

'খারাপ বলবে না মা।'

'বাড়ির মেয়ে—'

'সেটা তো দোষের নয়, মা।'

'কিন্তু ওকে বৌ করব! ও যে তোদের বোনের মতো—'

'আসলে যে রক্তের কোনো সম্বন্ধ নেই, সে তো তোমরা ভালো করেই জানো।'

হেমন্তকে টলানো গেল না। তার বৈজ্ঞানিক মন নিয়ে সে ধীরে ধীরে এগোয়, বিচার করে, চিন্তা করে, নিজের সঙ্গে তর্ক করে, কখনো সহজে নিঃসন্দেহ হয় না। যখন হয়, তখন সংকল্প থেকে এক তিলও সে সরে না—তখন অঙ্কের ফলের মতো তার সিদ্ধান্ত নিশ্চয়তায় পৌঁছে গেছে।

মীরা একবার ভ্রূকুটি করেছিল, কিন্তু নীরা এসে জড়িয়ে ধরেছিল দু'হাতে।

'বাঁচালি ভাই। কোথায় চলে যেতিস, কে একটা উট্‌কো লোক এসে ছোঁ মেরে নিয়ে যেত—কবে যে দেখতে পেতুম তার ঠিকঠিকানা নেই। এই দ্যাখ্‌ না—থাকি তো হিল্লি-দিল্লীতে নয়, তবুও নিউ আলিপুর থেকে ছ'মাসে একবার যদি আসতে দেয়!'

আর সুমন্তর মতামত কিছু জানা যায়নি। সে তখন কলকাতার মাঠে ফুটবল লীগ নিয়ে অনেক বেশি ব্যতিব্যস্ত ছিল।

তবু সব ধীরে ধীরে সহজ হয়ে গিয়েছিল। উৎসবের দিন ঘনিয়ে আসছিল একটু একটু করে। তারাকান্তই উদ্যোগী হয়ে কোথা থেকে ধরে এনেছিলেন অর্চনার কোন্‌ জ্ঞাতি এক মেসোমশাইকে—যাঁর কথা কোনোদিন সে শোনেওনি। তিনিই তারাকান্তর কেনা হীরের আংটি দিয়ে হেমন্তকে আশীর্বাদ করে গিয়েছিলেন।

গয়না তৈরী হয়ে গিয়েছিল, শাড়ী আসতে শুরু করেছিল, দিন ঠিক হয়ে গিয়েছিল, বিয়ের চিঠি ছাপা হয়ে এসেছিল, হেমন্তর থীসিস্‌ও জমা পড়ে গিয়েছিল। লজ্জায় মুখ লুকিয়ে লুকিয়ে ঘুরছিল অর্চনা, নীরা তাকে সমানে বিরক্ত করছিল আর হেমন্ত বাইরে বাইরে পালিয়ে থাকছিল—অঘটন ঘটল তখন।

সাত দিন। বিয়ের ঠিক সাত দিন আগে।

হেমন্তর কে এক বন্ধু নতুন গাড়ি কিনেছিল একখানা। ওকে বলেছিল, 'চল্‌—বেড়িয়ে আসি বর্ধমান থেকে।'

বাড়ির কেউ আপত্তি করেনি, করবার কথাও নয়। ভোরবেলায় এই বাড়ি থেকেই হৈ-হৈ করে জনচারেক বন্ধুর দলটা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল বালী ব্রীজের দিকে।

বিকেলের মধ্যে ফেরবার কথা ছিল, ফেরেনি। খবর এল সন্ধ্যার সময়।

অ্যাক্‌সিডেণ্ট হয়েছে পাণ্ডুয়ার কাছে—লরীর মুখোমুখি। সামনের সীটে গাড়ি চালাচ্ছিল গাড়ির মালিক বন্ধুটি, তার পাশে ছিল হেমন্ত। সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেছে তারা। পেছনের দুজন প্রাণে বেঁচেছে, কিন্তু হুগলীর হাসপাতালে তাদের অবস্থাও অনিশ্চিত।

তারপর আর মনে করতে পারে না অর্চনা। অন্ধকারের একটা ঘূর্ণি এসে বিশ্ব-সংসার মুছে দিয়েছিল—ক'দিন জ্ঞান ছিল না সে আজও জানে না।

হেমন্তর দেহ নাকি আনা হয়েছিল বাড়িতে। অর্চনা দেখেনি। সেই অচেতনার মধ্যেও আবার একটা কান্নার রোল সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো যেন একবার তার ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তখন সব সমান।

হেমন্তর আঙুলের সেই হীরের আংটিটা কোথায়? তারাকান্তর কাছে? কিংবা অর্চনার সেই হঠাৎ পাওয়া আশ্চর্য সৌভাগ্যের সঙ্গে মোটর অ্যাক্‌সিডেণ্টে সেটা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে?

'মা!'

বারান্দার সেই ডেক-চেয়ার থেকে ডাক শোনা গেল তারাকান্তর। ড্রয়ারটা বন্ধ করে, তাতে চাবি দিয়ে তটস্থ হয়ে উঠে দাঁড়ালো অর্চনা।

'আসছি, বাবা।'

তারাকান্ত তেমনি গঙ্গার দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। কপালে কতগুলো রেখা

ফুটে উঠেছে তাঁর।

অর্চনার মনে হল, আজ তাঁকে অনেক বেশি বিষণ্ণ ঠেকছে।

'বোসো মা।'

একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসল অর্চনা। তারাকান্ত চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। সামনে নারকেল গাছের মাথায় আটকে যাওয়া লাল রঙের একটা কাটা ঘুড়ি বাতাসে ছটফট করতে লাগল।

'আচ্ছা মা—', খাঁকারি দিয়ে গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিলেন তারাকান্ত: 'একটা কাজ করলে হয় না ?'

'বলুন।'

'আমাদের বংশগত গুরুদেব আছেন, জানো নিশ্চয় ?'

'জানি, বাবা। একবার এসেছিলেন বোধ হয় বছর আটেক আগে।'

'হাঁ তিনিই। এখন কাশীতে রয়েছেন—বয়েস হয়ে গেছে, আর তেমন বেরোতে-টেরোতে পারেন না। আমি প্রতি বছর তাঁর প্রণামী মানি-অর্ডার করেই পাঠিয়ে দিই। তবে আমি অনুরোধ করলে নিশ্চয় একবার এখানে আসবেন।'

'তা আসবেন।'—অর্চনা সায় দিলে। কিন্তু গুরুদেব আনবার ব্যাপারটা তার সঙ্গেই বিশেষ করে আলোচনা করবার কী দরকার ছিল, সেইটেই বুঝতে পারল না অর্চনা।

'ওঁদের সাধকের বংশ, মা। জানো তো, ওঁদের আদি বাড়ি সেই বিখ্যাত গোসাঁই-গঞ্জে ? ওঁর ঠাকুরদা ছিলেন সেখানকার শিরোমণি। দরজা বন্ধ করে ভোগ দিতেন—সোনার বালগোপাল সিংহাসন থেকে নেমে এসে ওঁর হাত থেকে ক্ষীর-মিষ্টি খেয়ে যেতেন। আমাদের গুরুদেবও সেই শক্তি পেয়েছেন।'

অর্চনা চুপ করে রইল। বৈষ্ণব গুরুর শিষ্য হয়েও তারাকান্ত কোনোদিন বৈষ্ণবের সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহ দেখাননি—বারো বছর আগেও এ বাড়িতে মাছ-মাংসের কোনো অভাব ছিল না, বরং মাংসের সম্পর্কে তারাকান্তর উৎসাহ একটু বেশিই ছিল। হেমন্ত চলে যাওয়ার পরে এ বাড়িতে গীতা-উপনিষদ এসেছে, কিন্তু ভাগবত আসেনি, চৈতন্য-চরিতামৃতও না। তা ছাড়া কুলগুরু থাকা সত্ত্বেও এ বাড়িতে কেউ তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়েছেন—বাইশ বছরের স্মৃতিতে এমন ঘটনাও ধরা পড়ছে না অর্চনার।

তবু ছ'মাস আগে হলেও খবরটাতে নিশ্চয় উৎসাহিত হত অর্চনা। আট বছর আগে গুরুদেব একবার এসেছিলেন, পাকা দাড়ি, গেরুয়া পরা, হাতে মালা—সেই ভালোমানুষ চেহারার ভদ্রলোককে বেশ মনে আছে অর্চনার। দিনতিনেক ছিলেন, কথা বলতেন কম, ধর্মগ্রন্থ পড়তেন আর তারাকান্তকে পড়ে শোনাতেন, আর ভোরের আলো ফোটবার আগেই গুনগুন করে গান গেয়ে বাগানে ঘুরে বেড়াতেন। লোকটিকে অর্চনার মন্দ লাগেনি—বেশ সাত্ত্বিক ভাব—শ্রদ্ধাই হয়েছিল একটু।

তাকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, 'গৌর গৌর। গৌর বলো মা, তিনিই শান্তি দেবেন।'

কিন্তু গৌর! এখানে তো গৌরের কোনো জায়গা নেই। আর এক নরদেবতা স্থির-প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে এখানে। হেমন্ত। হেমন্ত ছাড়া আর কেউ নয়—এ বাড়ি-

তারই স্মৃতিসৌধ, তারই শোকের দেবালয়।

গুরুদেব বোধ হয় এসেছিলেন তাঁর সবচেয়ে ছোট মেয়েটির বিয়ের ব্যাপার নিয়ে। কিছু অর্থসাহায্য তাঁর দরকার ছিল। কুলগুরুকে খুশি করে দিয়েছিলেন তারাকান্ত। তার বেশি যে গুরুদেব সম্বন্ধে আর কিছু করণীয় আছে—সে-কথা সেদিন তাঁর মনেও হয়নি।

কিন্তু আট বছর পরে আবার তাঁর কথা কেন উঠল আজকে? কোথায় একটা ছায়া অনুভব করল অর্চনা—তার ভালো লাগল না।

তারাকান্ত অর্চনার দিকে তাকালেন। একটু বিশেষভাবেই তাকালেন।

'তাঁকে আসতে লিখে দিই মা?'

'বেশ তো।'

'কথা হল—', আর একবার গলাখাঁকারি দিলেন তারাকান্তঃ 'আমাদের আসল শত্রুই হচ্ছে মন। নিজে তাকে যতই বশে রাখতে চেষ্টা করি, কোনখান দিয়ে সে আয়ত্তের বাইরে চলে যায়—আমরা তা টেরও পাই না। তাই তাকে বাঁধবার জন্যে একটা শক্ত খুঁটি দরকার হয় আমাদের।'

এতদিন বিবেক দিয়ে বাঁধবার কথা বলতেন, আজ আর একটা খুঁটির কথা মনে এসেছে। অর্চনা মেজের ফাটলে সরীসৃপ-রেখাগুলোর দিকে চেয়ে রইল।

তারাকান্ত বললেন, 'দীক্ষা তো আমাদের কারুরই হয়নি। এবার সবাই গুরুদেবের কাছে মন্ত্র নিয়ে নেব। কী বলো মা, দরকার নেই?'

'হাঁ বাবা, দরকার আছে বই কি।'

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা বেয়াড়া প্রশ্ন মাথা তুলল অর্চনার মনে। নতুন করে দীক্ষা—গৌরের মন্ত্র। তার মানে শুধু হেমন্তকে জপ করা নয়—তার অর্ধেক জায়গা এখন হয় কৃষ্ণ নয় গৌর এসে দখল করে বসবেন। তাতে দ্বিচারিণী হবে না তো অর্চনা? বিচক্ষণ অ্যাডভোকেট তারাকান্ত চৌধুরী কি এই সহজ প্রশ্নটাও চিন্তা করে দেখেননি?

অর্চনার মনের এই ব্যঙ্গভরা চিন্তাটা কি অনুমান করলেন তারাকান্ত? একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'জানো মা—আমরা তখনই আমাদের প্রিয়জনকে সত্যি করে অন্তরের ভেতরে পেয়ে যাই—যখন তাকে মিলিয়ে দিতে পারি আমাদের দেবতার সঙ্গে। তখন দুই-ই এক হয়ে যায়। তখন দেবতাই আমাদের সত্যকে পাহারা দেন—বাইরের আর কেউ তাকে কেড়ে নিতে পারে না।'

'ঠিক কথা বাবা।'

অর্চনা সায় দিলে, সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতরে বিদ্যুতের মতো চমকে উঠল আর একজন। বাসুদেব। বাসুদেব মুখোপাধ্যায়। দীর্ঘদেহ সেই মানুষটি—বয়েস চল্লিশ ধরো-ধরো। ঠিক রূপবান বলা যায় না, কিন্তু পৌরুষের যেন প্রতিমূর্তি। রগের কাছে চুলে পাক ধরেছে, মাথার ওপরের চুল একটু পাতলাও হয়ে এসেছে—কিন্তু সব মিলে যেন একটা পূর্ণতা হয়েছে তার ভেতরে। যৌবনের শক্তি এসে সংহত হয়েছে তার মধ্যে—প্রাণশক্তি ভরে উঠেছে, কিন্তু প্রগল্‌ভতা নেই—অসংযম নেই। খুব সহজে যেচে আলাপ করেছে অর্চনার সঙ্গে, হেসেছে—হাসিয়েছে, ছবি দেখিয়েছে, বিনা অনুমতিতে ছবি তুলেছে। তবু রাগ করতে পারেনি অর্চনা। বাসুদেবের সমস্ত

ব্যবহারে এমন একটা শোভন পরিচ্ছন্নতা আছে যে দীপার মতোই দীপার দাদাকে মেনে নিতে তার বাধেনি।

তবু সেইখানেই থেমেছে কি? তাহলে কেন বাসুদেবের কথা মনে হলেই তার রক্তের মধ্যে একটা অসংযত উৎক্ষেপ অনুভব করা যায়? কেন সে ছবিটা ছিঁড়ে ফেলতে পারল না—কেন সেদিন নয়, তার পরেও নয়—দীপাকে সে বলতে পারল না ওই নেগেটিভটা নষ্ট করে ফেলতে? কেন দীপাদের বাড়িতে যাওয়ার জন্যে একটা আকুল তৃষ্ণা সে অনুভব করে, কেন ক্লাসে দীপা এসে তার পাশে বসলেই হেমন্তর স্মৃতি তার মন থেকে মিলিয়ে যায়—কেন একটা অবাধ্য জিজ্ঞাসা এসে থর-থর করতে থাকে গলার কাছে: 'তোর দাদার কি এখনো নাইট-ডিউটি—আজো কি বাড়িতে আছেন তিনি?'

একবারের জন্যে ঠোঁট কামড়ে ধরল অর্চনা। তারপর বললে, 'হাঁ বাবা, আসতেই লিখে দিন তাঁকে। দীক্ষা আমার নিজেরও দরকার।'

তারাকান্তর কপালে যেন আলো পড়ল একটা। সন্দেহ আর দুর্ভাবনার ছায়াটা যেন একটু সরে গেল সেখান থেকে।

তারাকান্ত বললেন, 'তা হলে আসছে মাসেই তিনি আসুন।'—একবার থামলেন গলাটা যেন ধরে এল, বললেন, 'আসছে মাসের সতেরোই। তোমার মনে আছে নিশ্চয়—', স্বর একটু ঝাপসা হল: 'ওই তারিখেই দীক্ষা নিলে ভালো হয়—কারণ ওই দিনেই হেমন্ত আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিল।'

সতেরোই তারিখ—হেমন্তর মৃত্যুর দিন। যেন বুকে একটা বন্দুকের গুলি এসে লাগল অর্চনার। অমন করে দিনটাকে তারাকান্ত মনে না করিয়ে দিলেও পারতেন।

'আচ্ছা বাবা—'

মোড়া ছেড়ে উঠে পড়ল অর্চনা—যেন পালিয়ে গেল একটা নিষ্ঠুর কুটিল ব্যাধের সামনে থেকে—যে তার হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য করে বন্দুক উঁচিয়ে বসে আছে।

॥ আট ॥

বিশ্রী লাগছিল অর্চনার—অত্যন্ত বিশ্রী লাগছিল। সতেরোই হেমন্তর মৃত্যুদিন—এই কথাটাকে এমন করে শুনিয়ে না দিলে কী ক্ষতি হত তারাকান্তর? এর মধ্যে কি একটা হিংস্র আনন্দ আছে তাঁর? ওই তারিখটা তাঁর নতুন করে মনে না করিয়ে দিলেও চলে, তিন দিন আগে থেকেই বাড়িটা যেন নিঃশব্দে—নিজেরই প্রেরণায় সেই পরমতম শোক-মুহূর্তের জন্যে অপেক্ষা করে। অর্চনাও তৈরী হতে থাকে—তার চেতনায় ছায়া নামে—সেই ঘনিয়ে আসা সন্ধ্যাটায় হেমন্তর বিষণ্ণ আবির্ভাব বাড়িটাকে অভিভূত করে—যেন বিশেষ করে সে অর্চনারই সামনে এসে দাঁড়ায়। অর্চনা তার ধ্যানের মধ্যে শুনতে পায় হেমন্তর স্বর: 'আমি নেই, কিন্তু আমি আছি, আমি চিরদিন তোমার কাছে থাকব।'

তারাকান্তর কথাটা না বললেও চলত।

নিজের ঘরে ফিরে এসে হঠাৎ একটা বিশ্রী অন্যায় সন্দেহ আজ বারো বছর পরে তার মনের ওপর চাপ দিতে লাগল। সত্যিই কি আজো ছেলের জন্যে তারাকান্ত শোকার্ত?

অথবা অভ্যাসে অভ্যাসে, সময়ের ঘষা লেগে, সেই শোকটা ভোঁতা হয়ে আসছে বলেই কি অর্চনার মধ্য দিয়ে তিনি সেটাকে শাণিত করে নিতে চান? অর্চনা কি তাঁর সেই উপকরণ? নিজের ভেতরে স্মৃতিটাকে জাগিয়ে আর রাখতে পারছেন না বলেই কি অর্চনা তাঁর কাছে হেমন্তর প্রতীক হয়ে উঠেছে? অর্থাৎ একটা হিংস্র স্বার্থপরতায় তিনি অর্চনাকেই হেমন্তর শবদেহ বলে কল্পনা করে নিয়েছেন—যে-শব রাতদিন চলে ফিরে বেড়াবে—অন্ততঃ তাঁর আয়ুর সীমা পর্যন্ত হেমন্তর মৃত্যুটাকে তাঁর সামনে বয়ে বেড়াবে? এ এক অদ্ভুত সহমরণ—মরে না বাঁচা পর্যন্ত এই জীবিত-মৃত্যুর হাত থেকে তার নিস্তার নেই। তাই হেমন্তর মৃত্যুদিনটা অমন নির্মমভাবে স্মরণ করিয়ে দিতে চান তিনি।

কথাগুলো কয়েক মুহূর্ত তীব্র বিতৃষ্ণায় তাকে আচ্ছন্ন করে রাখল, তারপরেই আত্মগ্লানিতে ভরে উঠল অর্চনা। ছি ছি, কী ভাবছে এসব! এতদিন পরে এমন অবিশ্বাস, এমন বিদ্বেষ তার মনে কেন এল? নিজের দিকে তাকিয়ে সে-ও কি বলতে পারে, হেমন্ত সম্পর্কে আজও তার নিষ্ঠা অবিচল, আজো সে আগেকার দিনগুলোর মতো, তার বিশুদ্ধ আর পবিত্র শোককে একরাশ তাজা ফুলের মতো ধরে রাখতে পেরেছে? এইরকম একটা বিশেষ দিন—বিশেষ তিথিই কি এখন তার দরকার হয় না মাদকের মতো, যা তাকে সজাগ করে, যা হেমন্তকে নতুন করে তার কাছে ফিরিয়ে দেয়?

এ কি তারাকান্তর একটা সূক্ষ্ম নির্যাতনের কৌশল, অথবা তার নিজেরই প্রয়োজন?

তা হলে আসুন গুরুদেব—দীক্ষা দিন তিনি। যদি মনের বাঁধন আলগা হয়ে গিয়ে থাকে—তা হলে গুরুমন্ত্র লোহার বাঁধনে বেঁধে দিক তাকে।

বাসুদেব মুখোপাধ্যায় কেউ নয়। এক মাস আগেও অপরিচিত ছিল, আজও সে অর্চনার কাছে অচেনা।

ওদের বাড়িতে যাওয়ার কথা দীপা আর তাকে বলেনি, একবারও ছবিটার কথা জিজ্ঞাসা করেনি তাকে। ভালোই হল—সব মিটে গেছে। তবু একটা মৃদু অস্বস্তি ভুলতে পারল না অর্চনা। হয়তো একটা কথা বাসুদেবকে তার বলা উচিত ছিল। বলবার দরকার ছিল—বাসুদেব তাকে যেন ভুল না বোঝে—ছবিটা তোলার জন্যে সে রাগ করেনি। আসল কথা—তার ছবি তোলবার উপায় নেই, তার দিক থেকে এসব বিলাসিতা অত্যন্ত অন্যায়—আর তা ছাড়া—তা ছাড়া তারাকান্ত—

হয়তো তার জীবনের সব কথাগুলো বাসুদেবের জানা দরকার। জানা দরকার—সে নিবেদিতা, পৃথিবীর কাছে আজ আর তার কিছু নেবারও নেই—পাওয়ারও নেই। বারো বছর আগেই সব শেষ হয়ে গেছে।

বলা যাবে? কিন্তু কী করে বলা যাবে? তা ছাড়া বলবারই বা কী দরকার? বাসুদেব তো তার কেউ নয়—সে তো তার সম্পূর্ণ অপরিচিত।

কিন্তু এই ফোটোটা?

যেখানে আছে—সেইখানেই থাক। হয়তো একদিন তার নিজেরও এই ছবিটাকে দরকার হবে, ভাবতে ইচ্ছে করবে—সে-ও কোনোদিন সাধারণ মানুষের মতো ছিল, হাসতে পারত, খুশি হতে পারত। বয়স্ক মানুষও নিজের ছেলেবেলার ছবি দেখে

মন্মথ কৌতুকে তাকিয়ে থাকে—তারও নিজের ভেতরে আর এক অর্চনাকে নতুন করে দেখতে তার খারাপ লাগবে না।

ছবি থাক, কিন্তু বাসুদেব রইল না।

কয়েকটা দিন আশ্চর্য জোরের সঙ্গে কাটাল অর্চনা। আবার সহজ হল, আবার বিনম্রভাবে তারাকান্তর পায়ের কাছে বসল, অবসর সময়ে গীতার শঙ্করভাষ্য নিয়ে গিয়ে প্রার্থনা জানালো: 'এই জায়গাটা একটু বুঝিয়ে দেবেন বাবা, আমি ভালো বুঝতে পারছি না!' আর তেতলার ঘরে আবার তার মন পূর্ণ হল, পবিত্র হল, আবার সে নিজের তপস্যার ভেতরে যেন অদ্‌গত হওয়ার অবকাশ পেলো।

এমন কি শান্তি আর বৈরাগ্যের এমন একটা স্তরে সে উঠতে আরম্ভ করল যে সেদিন তারাকান্ত জাগবার অনেক আগে, গঙ্গার দিকে হীরের মতো শুকতারাটা ডুবে যাওয়ার আগে সে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। তখনো পাখিরা ভালো করে জাগে নি, কেবল চাপা কুলু-কুলু শুরু হয়েছে তাদের; বাইরে হালকা অন্ধকার—ব্রাহ্ম-মুহূর্ত। এক সময়ে কিছু গান শিখেছিল অর্চনা—সে-সব ভুলে গেছে অনেকদিন, আজ তার মনের ভেতর ঝঙ্কার বাজতে লাগল: 'জাগো ব্রহ্মের নামে—'

কী শান্তি—কী আশ্চর্য শান্তি! শুকতারাটা যেন হেমন্তর স্নিগ্ধ চোখের মতো তার দিকে তাকিয়ে আছে মনে হল।

নিজের মধ্যে মগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, সে চমক ভাঙল তারাকান্তর স্বরে।

'এখানে দাঁড়িয়ে মা?'

'আজ অনেকক্ষণ উঠেছি, বাবা। কী হবে বেশিক্ষণ ঘুমিয়ে?'

অস্পষ্ট আলোয় ভারী স্নিগ্ধ দেখাল মেয়েটিকে। নীচু হয়ে প্রণাম করল, ভিজে চুলগুলো ঝরে পড়ল তারাকান্তর পায়ে। গভীর মমতায় আশীর্বাদ করলেন তারাকান্ত।

তারপর প্রতিদিনের মতো গঙ্গার দিকে তাকিয়ে যেন ধ্যানে তন্ময় হয়ে রইলেন। অর্চনা নিঃশব্দে বসে রইল তাঁর পায়ের কাছে। পাখির ডাক উঠতে লাগল, আলো ফুটল, শুকতারা নিঃশব্দে নিবে গেল, পুব আকাশের একটুখানি রঙ পড়ল পশ্চিমের মেঘে, তারাকান্ত চোখ মেলে চাইলেন।

'এখনো বসে আছো মা?'

'বসে থাকতে ভালো লাগছে বাবা।'

'কলেজের পড়াশুনো কেমন চলছে মা?'

ঠিক এই কথাটার জন্যেই অপেক্ষা করছিল অর্চনা। চোখ তুলে চাইল তারাকান্তের দিকে।

'সেই কথাই আপনাকে বলব বাবা।'—একটু ইতস্তত করে অর্চনা বললে: 'আমি আর কলেজে পড়ব না বাবা—আমার নামটা উইদড্র করিয়ে দিন।'

তারাকান্ত আশ্চর্য হয়ে গেলেন। ঠিক বিশ্বাস করতে পারলেন না।

'কী বলছ মা!'

'আপনার কথাই ঠিক বাবা। ও-সবের কোনো দরকার নেই আমার।'

'সত্যি বলছ তুমি?'

'হাঁ বাবা, সত্যিই বলছি।'

তারাকান্ত সম্পূর্ণ খুশি হবেন কিনা বুঝতে পারলেন না। এই কথাগুলো কয়েক মাস আগে অর্চনার মনে হলেও কোনো ক্ষতি ছিল না। তিনিও তো তাকে এই জিনিসটাই বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তখন অর্চনার তা পছন্দ হয়নি, বরং নিজের পক্ষে ওকালতি করবার জন্যে সে সুলতাকে পর্যন্ত ডেকে এনেছিল। এই সুবুদ্ধিটা তখন জাগলে এতগুলো টাকা নষ্ট হত না।

একটু চুপ করে থেকে তারাকান্ত বললেন, 'ভর্তি যখন হয়েছ, তখন মাঝপথে ছেড়ে দিয়ে কী লাভ? অন্তত বি-এটা পাস করে নাও!'

'আমার ভালো লাগছে না বাবা।'

তারাকান্ত একটু বিরক্তি বোধ করলেন। কিন্তু এই ভালো-লাগা সকালটিকে তাঁর এমনভাবে নষ্ট করতে ইচ্ছে করল না। বললেন, 'ঠিক আছে মা। এই সেশনটা যাক —যদি সেকেন্ড ইয়ারে উঠে আর ভালো না লাগে, তখন পড়া ছেড়ে দিয়ো।'

'আচ্ছা বাবা।'

মনে মনে ক্ষুণ্ন হল অর্চনা। কাল রাত থেকে এই চরম ত্যাগটির জন্যে অনেক যত্নে—অনেক চেষ্টায় তৈরি হয়েছিল সে। আর সে কলেজে যাবে না, আর দেখা হবে না দীপার সঙ্গে, বাসুদেবের একটা অর্থহীন আকর্ষণ আর তাকে অকারণে টানতে থাকবে না। কিন্তু তারাকান্ত আবার তার মুক্তির পথ বন্ধ করে দিলেন।

একটা নিঃশ্বাস পড়ল অর্চনার।

কী বুঝলেন তারাকান্ত, তিনিই জানেন। আবার স্নিগ্ধভাবে বললেন, 'ঠিক আছে মা, তোমার যদি পড়বার ইচ্ছে না হয়, আমি জোর করে তোমায় কলেজে পাঠাব না। কিন্তু আরো দু-চারটে দিন ভেবে দেখো মা—ঝোঁকের মাথায় কিছু করে বসতে নেই।'

'আচ্ছা বাবা।'

কিন্তু তবুও বাসুদেব এল। এল এমন ভাবে যে অর্চনা তার জন্যে একবিন্দুও তৈরি ছিল না।

শরীর ভালো থাকলে মাঝে মাঝে গঙ্গাস্নানে যান সুলতা, অর্চনা সঙ্গে যায়। আজও গিয়েছিল। স্নান শেষ করে—মেয়েদের জন্যে ঘেরা-জায়গাটিতে কাপড় বদলে, একটু সরে এসে ঘাটের মাথায় অপেক্ষা করছিল সে। হাতে ভিজে শাড়ি-গামছা। সুলতা তখনো ওঠেননি, বুক পর্যন্ত জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি গঙ্গাস্তব করছিলেন। অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল অর্চনা। কিছু যে একটা ভাবছিল তা নয়—দূরে গঙ্গার ওপারে একসার শিবমন্দির তার চোখে পড়ছিল।

'এই যে—আপনি!'

পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিউরে গেল অর্চনার। খদ্দরের মোটা পাঞ্জাবি আর পাজামা পরনে বাসুদেব তার সামনে দাঁড়িয়ে। বুক শুকিয়ে গেল তার।

একমুখ হেসে বাসুদেব বললে, 'ব্যাপার কী? আমাদের যে একেবারেই পরিত্যাগ করলেন দেখছি!'

একটা শব্দ ফুটল না অর্চনার মুখে।

বাসুদেব বললে, 'হতে পারে, বিনা পারমিশ্যনে একটা ছবি তুলে ফেলে ভারী অন্যায়

করে বসেছি। কিন্তু সে অপরাধ কি এতই মারাত্মক? ফাঁসির আসামীও তো আপীলে খালাস পায়—আমিও না হয় আপীল করছি আপনার কাছে।'

'না—সেজন্যে নয়।'

'তবে কী জন্যে?'

'নানা কাজ থাকে—'

'বিশ্বাস করতে পারলুম না। দুপুরবেলা বাড়িতে মেয়েদের এমন কাজের তাড়া থাকে না যে আড়াইটে সাড়ে তিনটেয় ছুটি হলেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে হয়।'

'দেখুন—আপনি ঠিক বুঝতে পারবেন না—'

'বোঝাতে আপনিও পারবেন না। দেখুন অর্চনা দেবী—কোনটা সত্যি আর কোনটা এড়িয়ে যাওয়া—সেটুকু অনুমান করবার মতো বুদ্ধি এবং বয়েস আমার নিশ্চয়ই হয়েছে। আপনার কাছে আজ একটা স্বীকারোক্তি করব—শুনবেন? এই সকালে—গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে—' বাসুদেব হাসল: 'গঙ্গাকে মানি আর নাই মানি, মিথ্যে কথাটা বলতে পারব না—'

একটা অনিশ্চিত আশঙ্কা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল অর্চনা। মনে হচ্ছিল, এখানে এভাবে বাসুদেবের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা তার কিছুতেই উচিত নয়। যদিও সুলতা এখনো গঙ্গায় রয়েছেন এবং পাশের বটগাছটার জন্যে তাঁকে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু যে-কোনো সময়েই উঠে আসতে পারেন তিনি।

বাসুদেবকে চলে যেতে বলা যায় এখান থেকে?

না—যায় না।

বাসুদেব বললে, 'জানেন—আপনি আসবেন এই আশায় যেচে নাইট-ডিউটি নিয়েছি আমি। কিন্তু রাতের ঘুমটা গেল—আপনিও আসছেন না, আমার অবস্থাটা কী দাঁড়ায় —বলুন তো?'

'আমি না এলে কী ক্ষতি হয় আপনার?'—মনের ভেতরে কদিন যে আশ্চর্য প্রশান্তিটা ছিল সেটা চকিতে টুকরো টুকরো হয়ে গেল অর্চনার। কথাটা ইচ্ছের বিরুদ্ধেই মুখফসকে বেরিয়ে গেল তার।

বাসুদেবের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল. গভীর হয়ে উঠল তার চোখের দৃষ্টি: 'কী ক্ষতি যে হয় সেটা বোঝানো শক্ত। কিছুদিন ধরে আমিও সে কথাটা বোঝবার চেষ্টা করেছি। তারপর—' একবারের জন্যে সে থামল: 'তারপর আবিষ্কার করলুম আপনাকে আমার ভীষণ ভালো লেগেছে। জীবনে মেয়েদের নিয়ে আমি কখনো ভাবিনি—ভাববার মতো উৎসাহ হয়নি। কিন্তু আজ এই আটত্রিশ বছর বয়েসে এসে হঠাৎ দেখলুম—এমন মেয়েও কেউ কেউ আছে, যাদের ভালো করে চেনবার আগেই চেনা হয়ে যায়, নিজের সঙ্গে বার বার যুদ্ধ করেও যাদের ভোলা যায় না।'

কথাগুলো সবটা শোনবার আগেই অর্চনা শক্ত হয়ে গিয়েছিল। বুকের মধ্যে ঝড় উঠছিল তার—মাথাটা যেন চাকার মতো ঘুরপাক খেতে শুরু করেছিল।

বাসুদেব বোধ হয় নিজের আবেগেই এগিয়ে চলেছিল, অর্চনাকে সে লক্ষ্যও করেনি। সমানে বলে যেতে লাগল: 'সেই ভালো লাগা যে আপনারও ভালো লাগবে এমন দাবি আমি করি না। কিন্তু তবুও একটা আশা—ও কি, আপনি অসুস্থ বোধ করছেন

নাকি ?'

রক্তহীন মুখে অর্চনা বললে, 'না—ও কিছু না। কিন্তু—কিন্তু মা আসছেন !'

অর্চনার ওপর দুটি দীপ্ত অথচ মমতাভরা বিস্মিত চোখ রেখে বাসুদেব বললে, 'কিন্তু তাতে আপনি এত ভয় পাচ্ছেন কেন ? যেকথা আপনাকে বলতে পারি, সেকথা আপনার মাকে বলতেও আমার দ্বিধা নেই। যদি থাকত, আপনাকেও আমি বলতুম না।'

'দোহাই আপনার—আপনি—'

কিন্তু কথা শেষ করবার আগেই আতঙ্কে থমকে গেল অর্চনা। সুলতার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আসছিলেন বাসুদেবের মা। তিনি কখন ঘাটে এসেছেন অর্চনা জানে না—হয়তো কিছুদূরে তার দিকে পিঠ ফিরিয়ে স্নান করছিলেন বলে সে দেখতেও পায়নি। তাহলে যার সঙ্গেই বাসুদেব—

বাসুদেব হাসতে চেষ্টা করল : 'আমার মা'র সঙ্গে যিনি আসছেন—'

'হাঁ, আমার মা।'—ধরা গলায় অর্চনা বললো, 'আপনি—আপনি সরে যান—'

সুলতা ডাকলেন : 'অর্চি !'

ছেলেবেলা থেকে ওই নামে ডেকেছিলেন, আজও ডাকেন। মাথা নামিয়ে অর্চনা এগিয়ে গেল তাঁর দিকে। তার পায়ের তলায় পৃথিবী দুলছিল।

যেন দুঃস্বপ্নের মতো অর্চনা শুনতে পেলো—বাসুদেবের মা হেসে উঠেছেন।

'দিদি, এই আপনার মেয়ে ? এ তো আমাদের চেনা !'

'চিনলেন কী করে ?'—সুলতা থেমে দাঁড়ালেন।

'বা রে, আমার মেয়ে দীপার সঙ্গে কলেজে পড়ে যে। কতদিন আমাদের বাড়িতে গেছে। আমার ছেলেমেয়ের সঙ্গে কত ভাব। ওই তো আমার ছেলে—বাসুদেব। বাসু—'

বাসুদেব খুব সহজভাবে এগিয়ে গেল সুলতার সামনে। প্রণাম করে বললে, 'আপনারা স্নান করছিলেন, আমি আর অর্চনা দেবী ততক্ষণ গল্প করছিলুম। অর্চনা দেবীর ভারী ভয়—পাছে আপনি রাগ করেন !'

একটা আকাশ-ফাটা চীৎকার তুলে অর্চনার বলতে ইচ্ছে করল : 'না—না, গল্প করিনি, আমি এই ভদ্রলোককে চিনি না—ওদের বাড়িতে আমি কোনোদিন যাইনি। কিন্তু একটা কথাও বলা গেল না। সত্যকে নিঃশব্দে মেনে নিয়ে—একটা অনন্ত পাতালের দিকে পা বাড়িয়ে, কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অর্চনা।

বাসুদেব আবার নিয়তির মতো পরিষ্কার উজ্জ্বল গলায় বললে, 'মাসীমা, দয়া করে আপনার মেয়েকে মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে যাওয়ার অনুমতি দেবেন। উনি ভয়ে তটস্থ থাকেন—ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয়—এতদিন সূর্যের আলো পর্যন্ত বুঝি দেখেননি। আপনি একটু অভয় দিলেই উনি দীপার সঙ্গে মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে যেতে পারেন।'

হাল্‌কাভাবে একটা ধমক দিলেন বাসুদেবের মা।

'কী পাগলামি আরম্ভ করলি বাসু ! বুড়ো হতে চললি, এখনো তোর ছেলেমানুষি গেল না ?'

'তোমার কাছে—মাসীমার কাছে আমি তো চিরদিনই ছেলেমানুষ, মা। এই

আটত্রিশ বছর বয়সেও।'

নিঃশব্দে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন সুলতা। একবার তাকালেন অর্চনার পাণ্ডুর মুখের দিকে। তারপর শান্ত গলায় বাসুদেবকে বললেন, 'সে তা বটেই বাবা, তুমিও আমার ছেলের বয়েসী।'

'দেখলে তো মা ?'

বাসুদেবের মা বললেন, 'ওর কথা ধরবেন না, দিদি। কিন্তু ভারী ভালো আপনার এই মেয়েটি। যেমন শান্ত, তেমনি লক্ষ্মীশ্রী। কিন্তু একটা বড়ো অন্যায় দিদি—এমন মেয়ের এখনো বিয়ে দেননি কেন ? সাজগোজ নেই—সাদামাটা থাকে—মাছ-মাংস ছোঁয় না, চায়ের সঙ্গে একটুকরো খাবার পর্যন্ত দাঁতে কাটতে চায় না। এমন সন্ন্যাসিনী বানিয়েছেন কেন ওকে ?'

আবছা গলায় অর্চনা বললে, 'মা, বাড়ি চলো।'

সুলতা আবার তার দিকে তাকালেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'অল্প বয়েস থেকেই ওর ওই রকম—সে কথা আর বলে লাভ কী, দিদি ? কিন্তু বেলা হয়ে গেল, আমরা যাই এবার!'

'আমরাও চলি। কিন্তু আলাপ তো হয়ে গেল, পাড়ায় যখন রয়েছেন—সময় পেলে আসবেন না আমাদের বাড়িতে। ভারী একা একা থাকি—গল্প করবার লোক পাই না। আমরা আছি একশো সাত নম্বরে।'

'আসব—নিশ্চয় আসব।'

ওঁরাই আগে চলে গেলেন। বাসুদেব রিক্সা ডেকেছিল একটা।

কিছুক্ষণ নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন সুলতা। অর্চনা ঠোঁটে দাঁত চেপে ভাবতে লাগল—সামনের ওই গঙ্গায় গিয়ে সোজা ঝাঁপিয়ে পড়লে কেমন হয় ?

তারপর সুলতা বললেন, 'চল অর্চি।'

অর্চনা চলতে পারছিল না। পথটা ঢেউয়ের মতো দুলছিল তার সামনে। তবু চলতে হল। আর কিছু করবার ছিল না।

একটু পরে সুলতা বললেন, 'বেশ ছেলে ওই বাসুদেব। আমার হেমন্ত থাকলে ওই বয়েস হত আজকে। ও কি—দাঁড়ালি যে!'

প্রাণপণে কান্না চাপতে চাপতে অর্চনা বললে: 'ও কিছু না মা, পায়ে একটা কাঁকর ফুটেছিল।'

আবার চুপ করে চলতে লাগলেন দুজনে। কিন্তু একটা নীরব শাসন—একটা নিঃশব্দ ধিক্কার—আর অসহ্য আত্মগ্লানিতে জ্বলে যেতে লাগল অর্চনা। তারও পরে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে, চারদিকের লোকজন সব ভুলে গিয়ে হু-হু করে কেঁদে ফেলল সে।

'আমার কোনো দোষ নেই মা—ওই দীপা—দীপাই আমাকে জোর করে ওদের বাড়িতে টেনে নিয়ে যায়!'

সুলতা বললেন, 'ভালো জ্বালা—কী আরম্ভ করলি মাঝরাস্তায় ? গেছিস গেছিস, তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে নাকি ? তুই তো আর পর্দানশীন বিবি নোস ? এত কান্নার ধুম কেন তাতে ? আর ওরা তো মানুষ ভালোই মনে হল, ছেলেটিও

দিব্যি, আমার তো বেশ লাগল।'

কান্না ভুলে গিয়ে অর্চনা চেয়ে দেখল সুলতার দিকে। ঠাট্টা করছেন না। যেমন শান্ত, তেমনি নিশ্চিন্ত।

'কিন্তু মা, আমার সত্যিই অন্যায় হয়ে গেছে। বাবা বলে দিয়েছিলেন—'

'তোর বাবার মাথাখারাপ হয়েছে।'

'কিন্তু মা—বাবা শুনলে—'

'কী হবে শুনলে? ফাঁসি দেবে নাকি ধরে?'—সুলতা বিরক্তস্বরে বললেন, 'মীরা-নীরার বন্ধুরা আসত না আমাদের বাড়িতে? ওরা যেত না তাদের বাড়ি? ওঁর আবার সবকিছু মাত্রা ছাড়ানো!'

'না মা, আমারই—আমারই দোষ হয়েছে। আমি তো যেতে চাইনি, দীপাই জোর করে—'

সুলতা একবার সম্পূর্ণ করে অর্চনার মুখ দেখলেন। বড়ো বেশি কৈফিয়ৎ দিতে চাইছে অর্চনা—এত ভয় পাওয়ার কোনো দরকার ছিল না। কলেজের কোন্ ছাত্রী দুদিন তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল, তার জন্যে পৃথিবী রসাতলে পাঠাবেন—এতখানি বাড়াবাড়ি তারাকান্তও করবেন না।

এই ভয় তা হলে কাকে অর্চনার? নিজেকেই? মেয়েটার এত বেশি ভয় এতদিনে তো তাঁর কখনো আর চোখে পড়ে নি!

একটা আভাস পেলেন কিছুর—কোথায় যন্ত্রণা চমক দিল একটুখানি, বাসুদেবের উজ্জ্বল দীর্ঘ শরীরটা মনে পড়ল। হেমন্ত নেই—চিরকাল সে থাকবে না—কে থাকে? নিজের বাবাকে কত ভালোবাসতেন সুলতা—কিন্তু এখন কি মাসে একবারও বাবার কথা মনে পড়ে তাঁর?

সুলতা হঠাৎ বললেন, 'অর্চি?'

'কী মা?'

'বোর্ডিংয়ে যাবি?' মানে সেখানে থেকে পড়বি কলেজে?'

অর্চনা ভয়ানক ভাবে চমকে উঠল।

'কী বলছ মা?'

'সেখানে লেখাপড়া ভালো হবে তোর। আমি ভেবে দেখছি অর্চি—এ বাড়িতে এখন আর তোকে না রাখাই উচিত।'

'মা—মা—' অর্চনা আবার কেঁদে উঠল: এসব বললে আমি আত্মহত্যা করব।'

'আচ্ছা আচ্ছা, যেতে হবে না তোকে। আমি এমনি বলছিলুম।'—সুলতা মুখ ফেরালেন।

'না—এসব তুমি কক্ষনো বলবে না।' আর—আর তোমার পায়ে পড়ি মা—আমি আর কখনো ওদের বাড়িতে যাব না, কিন্তু তুমি বাবাকে এ নিয়ে কোনো কথা বোলো না।'

সুলতা ঝঙ্কার দিয়ে বললেন, 'বলব না, বলব না। কিন্তু এবার কান্না থামা লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে—বাড়ি চল্!'

॥ নয় ॥

বাড়ি ফিরে নিজের ঘরে শক্ত হয়ে বসে রইল অর্চনা। কিছু সে আর ভাবতে পারছে না। এইবারে ঝড় আসবে। কী বলবেন তারাকান্ত—সে জানে না। কিন্তু যাই বলুন—তার কোনো কৈফিয়ৎ নেই। কলেজের একটি বাচ্চা মেয়ে তাকে জোর করে নিজেদের বাড়িতে ধরে নিয়ে যায়, তার দাদা উপযাচক হয়ে তার সঙ্গে আলাপ করে, অথচ সে একবারও মুখ ফুটে বলতে পারে না আমার পৃথিবী আলাদা, আমি তোমাদের কেউ নই—এমন ছেলেমানুষ তো সে নয়!

তাহলে এই তার শোকের চেহারা—এই তার এতদিনের তপস্যার পরিণাম? গীতা-যোগবাশিষ্ঠ, আচার্য শঙ্কর আর তারাকান্তর এত উপদেশের ফলশ্রুতি এই?

দরজার পাশে ছায়া পড়ল। বুক কেঁপে উঠল অর্চনার। সুলতা। কী বুঝেছেন তিনি? কেন বললেন বোর্ডিংয়ে যাবার কথা?

সুলতা ঘরে ঢুকলেন। বসলেন অর্চনার বিছানার ওপর। ডাকলেন, 'অচি?'

ঝাপসা চোখ তুলে অর্চনা তাঁর দিকে তাকালো। ভালো করে যেন দেখতেও পাচ্ছিল না।

সুলতা আস্তে আস্তে বললেন, 'ভয়ের কী আছে তোর? অন্যায় তো কিছু করিসনি?'

আবার জল দেখা দিল অর্চনার চোখে।

'তুমি আমাকে বোর্ডিংয়ে যাবার কথা কেন বললে, মা?'

'তা হলে অন্য দশটা মেয়ের সঙ্গে মিশে খানিকটা সহজ হতে পারবি। আমি বুঝতে পারছি, এখানে থেকে তোর লেখাপড়া হবে না। এত পুজোপাট আর পড়াশোনা দুটো একসঙ্গে হয় না।'

'বাবা আমাকে যেতে দেবেন বোর্ডিংয়ে?'—মনের এই বিস্বাদ আতঙ্কের ভেতরেও অর্চনার মনে একটা বিরস কৌতুক জেগে উঠল। যিনি বাসে পাঠাতে সাহস করেন না—তিনি তাকে অনুমতি দেবেন বোর্ডিংয়ে যাওয়ার!

'দেবেন কিনা, সে আমি বুঝব।'

'তোমার ওসব কিছু করতে হবে না মা, আমি পায়ে পড়ছি তোমার। আমি কোথাও যেতে চাই না। ছাড়তে হয়, পড়াই ছাড়ব।'

'তা ভালো। সুখী হবি তাতে?'

'আমি খুব সুখে আছি মা।'

একটু চুপ করে রইলেন সুলতা। অর্চনা বললে, 'ওসব কথা থাক মা। কিন্তু বাবা আজকের কথাগুলো শুনলে যে কী বলবেন—'

ছায়া পড়ল সুলতার কপালে। বললেন, 'ওঁর সব কথা শুনতে হলে আর সংসারে সমাজে বাস করা যায় না—বনে গিয়ে থাকতে হয়। কলেজের বন্ধুবান্ধবদের বাড়ি এক-আধটু যাবি—মহাভারত একেবারে অশুদ্ধ হয়ে যায় নাকি তাতে? তা ছাড়া ওঁদের যেটুকু দেখলুম, তোকে তো বলেছি, আমার বেশ ভালোই লাগল।'

'আমি আর কখনো যাব না মা।'

'যাস না যাস, সে তোর ইচ্ছে। কিন্তু আমি বলছি, কোনো অন্যায় করিসনি তুই। সে যাই হোক, এসব নিয়ে আবার যেন তোর বাবার কাছে মাপ চাইতে যাস্‌নি। উলটো বুঝে বসে থাকবেন।'

'কিন্তু মা—', শাড়ির আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে অর্চনা বললে, 'ওঁকে না বললে আমার তো প্রায়শ্চিত্ত—'

'আ গেল যা!'—সুলতা একটা মুখভঙ্গি করলেন: 'যেন ব্রহ্মহত্যে গো-হত্যে করেছেন—এখন সেজন্য নাকে কেঁদে কেঁদে ওঁকে প্রাচিত্তির করতে হবে! নেই কাজ তো খই ভাজ! দিনরাত কানের কাছে শাস্তর কপচে মেয়েটাকে কেঠো-বৈরিগী তৈরী করেছেন উনি। তোকে ও-সব পাকামো করতে হবে না। ওঠ দিকি এখন!'

'কী করব মা?'

'কী করবি আবার! গরম জামাকাপড়গুলো সব বের করবি আমার সঙ্গে—ধুতে দিতে হবে না ওগুলো? আয়—ওঠ্‌। সেই থেকে মেয়ে কাঠ হয়ে বসে রয়েছে—যেন ফাঁসির হুকুম হয়েছে তার! আয়—আয় শিগগীর—'

অগত্যা উঠে পড়তে হল অর্চনাকে। ওদিকের বারান্দায় সেই বড়ো চেয়ারটায় বসে তারাকান্ত কী যেন পড়ছিলেন, তাঁর দিকে সে চাইতে পারল না—সুলতার পেছনে ছায়ার মতো লুকিয়ে লুকিয়ে সে এগিয়ে গেল।

তারাকান্ত পড়ছিলেন একজন খৃস্টীয় সন্তের জীবনী। পড়া বই—তবু মধ্যে-মধ্যেই তিনি এটি নিয়ে বসেন। এই বই পড়ে তিনি সেই বিপুল বিষাদ আর নিবিড় প্রেরণা লাভ করেন, যা থেকে মহৎ মনুষ্যত্বের এক বিশাল ধূসর দিগন্ত তাঁর দৃষ্টির সামনে ভেসে ওঠে।

তেরো বৎসর মাত্র মেয়েটির বয়স। যেমন তার রূপ, তেমনি ঐশ্বর্য।

সেই সৌন্দর্য আর সম্পদের আকর্ষণে দলে দলে রোমক তরুণ উপস্থিত হল তার সামনে।

'কন্যা, আমাকে বিবাহ করো।'

'আমি বিবাহিতা।'

'কার সঙ্গে?'

'যিনি মানবপুত্র, তাঁর সঙ্গে। সমস্ত মানুষের জন্যে যিনি ক্রুশ-কাষ্ঠে রক্ত দিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে।'

'তুমি খৃীস্টান?'—শিউরে উঠল রোমের তরুণেরা।

'হাঁ, আমি খৃীস্টান।'

খৃীস্টান! রোমান সাম্রাজ্যে এ যে কল্পনাতীত অপরাধে। এই ধর্মদ্বেষীরাই তো স্বর্গের ক্রোধবজ্রকে আহ্বান করে আনছে সমস্ত জাতির ওপর। কী ভয়ঙ্কর! হতাশ, ক্রুদ্ধ আর আতঙ্কিত পাণিপ্রার্থীর দল ছুটল বিচারপতির দরবারে।

বিচারক ডাকলেন মেয়েটিকে। তার সুন্দর নিষ্পাপ চেহারা দেখে অনুকম্পা জাগল তাঁর। সস্নেহে বোঝাতে চাইলেন, উপদেশ দিলেন, শোনালেন অনেক প্রলোভন-বাক্য, দেখালেন সারি সারি পীড়ন-যন্ত্র, যেগুলি খ্রীশ্চানদের জন্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

তারপর আদেশ করলেন সামনে সারিবদ্ধ দেবদেবীর মূর্তিকে প্রণাম করতে।

মেয়েটি প্রণাম করল না। নীরবে বুকের ওপর ক্রুশ-চিহ্ন আঁকল মাত্র।

ধৈর্যচ্যুতি হল বিচারপতির।

'তুমি দেবতাকে প্রণাম করবে না ?'

'আমি মানব-পুত্রের সঙ্গে বিবাহিতা। এঁরা কেউ আমার প্রণম্য নন।'

অসহ্য ক্রোধে গর্জন করলেন বিচারপতি। বললেন, 'এই মুহূর্তে এই দুর্বিনীত বিধর্মী মেয়েটার শিরশ্ছেদ করা হোক।'

হাসল মেয়েটি। স্বর্গের দ্যুতি জ্বলে উঠল তার চোখেমুখে। শান্ত ধীর পায়ে সে এগিয়ে চলে গেল ঘাতকের খড়্গের দিকে।

পড়তে পড়তে চোখে জল আসে তারাকান্তর। বুক ভরে যায় সেই সঙ্গে।

এই বই অর্চনাকে পড়িয়েছেন তিনি—ব্যাখ্যা করেছেন, এর সত্য সঞ্চার করে দিতে চেয়েছেন তার প্রাণের মধ্যে। হেমন্তর সঙ্গে অর্চনার লৌকিক বিবাহ হয়নি, কিন্তু এই মেয়েটির মতোই অর্চনা নিঃশেষে সমর্পিতা—তার আর কোন অস্তিত্ব নেই—সত্তা নেই, ব্যক্তিগত সুখদুঃখ লাভক্ষতির কোনো প্রশ্নও নেই। হেমন্ত যীশুখৃীষ্ট নয়—যতদিন সে মানুষ ছিল, ততদিন আরো দশজনের সঙ্গে কোনো পার্থক্য তার কোথাও ছিল না। কিন্তু সেই অকাল-মৃত্যুর মধ্য দিয়ে হেমন্ত এখন জ্যোতির্ময়, অতিলৌকিক ; তার পবিত্রতাকে কোনো ধুলো আর স্পর্শ করে না, জীবনের কোনো তুচ্ছতা আর তাকে মলিন করে না। এখন সে একটা বিশুদ্ধ ভাবমূর্তি—যে দিব্য-শুচিতার বিগ্রহ, যার ধ্যানই অর্চনাকে পবিত্র আর ঊর্ধ্বায়িত করতে পারে।

একটি তেরো বছরের মেয়ে হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করতে পেরেছিল। বারো বছরের এত সাধনায়, তারাকান্তর এত শিক্ষাদীক্ষাতেও কি অর্চনা এখনো তৈরী হতে পারেনি ? নিশ্চয় ফাঁক আছে কোথাও, নিশ্চয় কোনোখানে ছায়া পড়েছে একটা, নইলে প্রায়ই এমন অশান্তির পীড়ন কেন অনুভব করতে হয় তারাকান্তকে ?

বই পড়তে পড়তে চোখ বুজে এসেছিল ; চিন্তিত ক্লান্ত কপালে এই সকালেও তন্দ্রার ছোঁয়া বুলিয়ে দিচ্ছিল গঙ্গার হাওয়া। কিন্তু সুলতার ডাকে চমক ভাঙল তাঁর।

'দ্যাখো তো, কিসের টেলিগ্রাম ?'

টেলিগ্রাম ! দপ করে উঠল বুকের ভেতর। বাঙালীর ঘরে আকস্মিক টেলিগ্রাম স্বস্তির অনুভূতি জাগায় না।

দ্রুতহাতে এনভেলপটা ছিঁড়লেন তারাকান্ত।

উদ্বিগ্ন হয়ে সুলতা বললেন, 'সুমন্তরা ভালো আছে তো ?'

তারাকান্তর ভুরু কুঁচকে এসেছিল। বললেন, 'সুমন্তদের খবর নয়।'

'তবে ?'

'টেলিগ্রাম এসেছে কানপুর থেকে।'

'সুধা ঠাকুরপোর ?'—একটু আশ্বস্ত হলেন সুলতা : 'কী হয়েছে ?'

'সুধাকান্তর অসুখ। টেলিগ্রাম করেছে কল্যাণী। যেতে লিখেছে একবার।'

আবার ব্যস্ত হয়ে উঠলেন সুলতা : 'কী অসুখ ?'

'তা লেখেনি। তবে নিশ্চয়ই সিরীয়াস কিছু হবে।'

'তবে তো যেতে হবে তোমাকে।'

বিরস স্বরে তারাকান্ত বললেন, 'হাঁ, যেতে হবে বই কি। তবে আজই তো আর সম্ভব নয়। কালুকে একবার পাঠিয়ে দাও সিটি বুকিঙে। কালকে যদি একটা বার্থ পায় ভালোই—না হলে এমনিই উঠে পড়তে হবে।'

একটু চুপ করে থেকে সুলতা বললেন, 'তোমার খুব কষ্ট হবে। অনেকদিন তো এভাবে যাওয়ার অভ্যেস নেই!'

মেঘে-ঢাকা-মুখে তারাকান্ত উঠে দাঁড়ালেন: 'কষ্ট হলে আর কী করা যাবে! আমার তো আর কেউ নেই। কাকে পাঠাব?'

সারাদিন থমথমে হয়ে রইল বাড়িটা। কালু অবশ্য একটা রিজার্ভেশন অনেক কষ্টে যোগাড় করে আনল, কিন্তু তারাকান্ত তলিয়ে রইলেন তাঁর বিরক্ত-গাম্ভীর্যের মধ্যেই। সুলতা বিষণ্ণ হয়ে রইলেন, বিমর্ষ হয়ে রইল অর্চনাও।

আসলে খুড়তুতো ভাই অধ্যাপক সুধাকান্তকে তারাকান্ত যে পছন্দ করেন তা নয়। সম্পর্কও বিশেষ কিছু রাখেন না। কিন্তু কানপুর-প্রবাসী এই অধ্যাপকটি কলকাতায় এলে এই বাড়িতেই এসে ওঠেন—দিনকতক হৈ-চৈ করেন, গঙ্গার ধারে ইলিশ মাছ খুঁজতে যান, সুলতা এবং অর্চনাকে সিনেমায় টেনে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেন।

বিরক্ত হয়ে তারাকান্ত বলেন, 'সুধা, তুই একজন সিনিয়র প্রফেসর না?'

'কলেজের খাতায় তাই লেখা আছে দাদা।'

'ওখানেও এ-রকম হৈ-হৈ করিস নাকি?'

'করি বই কি। আমাদের একটা আড্ডা আছে, তার নাম হৈ-চৈ ক্লাব। তার মেম্বার হতে গেলে কী কোয়ালিফিকেশন দরকার—জানো? খুব কষে গলা চড়িয়ে বেসুরো গান গাইতে হয়!'

স্থির-স্তম্ভিত চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে তারাকান্ত জিজ্ঞেস করেন: 'তুই প্রফেসর—এতে তোর ডিগনিটি থাকে?'

'ডিগনিটি তো ক্লাসের ব্যাপার দাদা—তার জন্যে কি বাড়িতেও রামগরুড় হয়ে থাকতে হবে? আমাদের ফিজিক্সের হেড, ডক্টর সাক্সেনাকে ক্লাসে দেখলে অতি ত্যাঁদোড় ছেলেরও হৃৎকম্প হয়। সেই বিলিতী ইউনিভার্সিটির বাঘা ডক্টরেট যখন একটা ভাঙা হার্মোনিয়ম নিয়ে হৈ-চৈ ক্লাবে কাওয়ালী গাইতে বসেন—'

'থাক—থাক।'—তারাকান্তর মুখ আরো কঠিন হতে থাকে। আর সেই ফাঁকে সুধাকান্ত ইলিশ মাছ সংগ্রহ করবার জন্যে গঙ্গার দিকে রওনা হন।

একদিন সুধাকান্তর স্ত্রী কল্যাণীকে তারাকান্ত বলেছিলেন, 'তুমি এসবের প্রশ্রয় দাও?'

কল্যাণী একটু হেসেছিলেন, খুব লজ্জিত হয়েছিলেন এমন মনে হয়নি। বলেছিলেন, 'কী করা যাবে দাদা—হৈ-চৈ ক্লাবের আড্ডাটা এক এক মাসে এক এক বাড়িতে বসে, সবাই মিলেমিশে একটু আনন্দ করেন, খাওয়া-দাওয়া হয়। আর নইলে তো শুধুই পড়া আর পড়ানো।'

'হুঁ।'

সুলতা বলেন, 'মন্দ কী! ছেলেপুলে তো নেই—স্বামী-স্ত্রীর সংসার—এই

ভাবেই একটু আমোদে থাকে। যাই বলো, ঠাকুরপো যে এত ভালো স্কলার, ও'কে দেখে—'

'থামো। আমাকে বোঝাতে হবে না।'

স্কলার হলেই চরিত্রের গভীরতা আসে না—অ্যাডভোকেট তারাকান্ত তা জানেন। বিদ্যার সঙ্গে অন্তর্মুখিতার—স্বাভাবিক সিরীয়াসনেসের কোনো সম্পর্ক নেই। যে লঘুচিত্ত, সে ন্যাশানাল লাইব্রেরীর সব বই কণ্ঠস্থ করলেও লঘুচেতাই থেকে যাবে। সে সংশোধনের বাইরে।

তা সুধাকান্ত যেমনই হোন, তাতে তারাকান্তর কিছু আসত যেত না। কিন্তু চোখে পড়ল, অর্চনাকেও তিনি চঞ্চল করে তোলবার চেষ্টা করছেন।

'দাদা—অনুমতি দাও, অর্চনাকে আজ সিনেমা দেখিয়ে আনি!'

যেন কানের কাছে কামানের আওয়াজ শুনলেন তারাকান্ত।

'আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি দাদা। তোমার ভাবনার কিছু নেই।'

'আমি ভাবছি না।'—নিজেকে একটু সামলে নিয়ে তারাকান্ত বললেন, 'কিন্তু ও সিনেমা দেখে না।'

'বলো কি! সিনেমা দেখে না, অথচ বেঁচে আছে?'

পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলতে লাগল তারাকান্তর। তবু অটুট গাম্ভীর্যে বললেন, 'সিনেমা না দেখেও বেঁচে থাকা যায়। আমি তো মারা যাইনি।'

'তোমার কথা আলাদা, দাদা। তুমি অ্যাডভোকেট মানুষ, সারাজীবন এত সত্যিকারের নাটক দেখেছ যে মানুষের তৈরী সিনেমা-থিয়েটারে তোমার অরুচি ধরে গেছে। কিন্তু এই মেয়েটা তো তা নয়। প্লীজ, আজকের মতো অনুমতি দাও। ছবিটা ভালো।'

'কী ছবি?'

'মারী ওয়ালেস্কা। চার্লস্ বয়ারের।'

তারাকান্ত থামিয়ে দিলেন। চার্লস বয়ারের সন্ধান তিনি রাখেন না, কিন্তু ইতিহাসের যিনি এম-এ, অ্যাডভোকেট হওয়ার আগে যিনি একবার নেপোলিয়ন সম্পর্কে একটা পি-এইচ-ডির থীসিস লেখার কথা ভেবেছিলেন, স্মৃতিশক্তির জন্যে আলিপুর বারে যিনি বিখ্যাত ছিলেন, তিনি উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন তৎক্ষণাৎ।

'কী বললে? মারী ওয়ালেস্কা?'

বলার ভঙ্গিতে ঘাবড়ে গেলেন সুধাকান্ত। মাথা নাড়লেন সঙ্গে সঙ্গে!

'সেই মেয়েটা না? নেপোলিয়নের সঙ্গে যার—'

'মনে আছে দেখছি তোমার!'

'মনে না থাকলেই ভালো হত বোধ হয়।'—বিস্বাদভাবে হাসলেন তারাকান্ত: 'কিন্তু একটা ব্রহ্মচারিণী মেয়েকে দেখাবার মতো আর কোনো থীম কি তুমি পেলে না?'

'ব্রহ্মচারিণী!'—সুধাকান্ত ঢোক গিললেন একটা।

'ঈয়েস্—শী ইজ্!'

সিনেমায় অর্চনার যাওয়া হয়নি। কিন্তু সুধাকান্ত প্রায় তারাকান্তকে শুনিয়ে শুনিয়েই অর্চনাকে বলেছিলেন, 'জীবন বেঁচে থাকবার জন্যে, মৃত্যুর সাধনা করবার

জন্যে নয়।'

কথাটার উদ্দেশ্য অর্চনা ঠিক বুঝতে পারেনি, কিন্তু ভয় পেয়েছিল। বাইরের বারান্দায় অধৈর্য চটির শব্দ শোনা যাচ্ছিল তারাকান্তর।

শঙ্কিত শীর্ণ গলায় অর্চনা জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী বলছেন কাকা?'

'কীট্‌সের নাম জানিস?'

'জানি। তার বেশি কিছু জানি না। স্কুল-ফাইন্যালের পরে আমি তো আর পড়িনি কাকা।'

'খুব বড়ো কবি ছিলেন। কিন্তু তাঁর একটা ছোট্ট কবিতার কয়েকটা লাইন তোকে বলি শোন্‌ঃ

The poetry of earth is never dead :
When all the birds are faint
with the hot sun,
And hide in cooling trees,
a voice will run—'

বাইরে থেকে তারাকান্ত হঠাৎ ডাকলেনঃ 'অর্চনা!'

তীব্র—বিস্বাদ স্বর। থমকে থেমে গেলেন সুধাকান্ত, শিউরে উঠে পড়ল অর্চনা, বেরিয়ে এল বাইরে।

তীক্ষ্ন চোখে তার আপাদমস্তক লক্ষ্য করে তারাকান্ত নীরসভাবে বললেন, 'আজ তোমাকে গীতার শঙ্কর-ভাষ্য বোঝাবার কথা ছিল।'

'আচ্ছা বাবা।'

সুধাকান্তরা কানপুরে ফিরে গিয়েছিলেন পরদিনই। আর যাওয়ার আগে তাঁরা অনুভব করে গিয়েছিলেন, এ বাড়িতে এর পরে তাঁরা আর না ফিরলেই তারাকান্ত খুশি হবেন।

সে আজ প্রায় আট বৎসরের কথা। এর মধ্যে বাঁধা নিয়মে এসেছে বিজয়ার চিঠি, খুচরো কুশলসংবাদ। কিন্তু সুধাকান্তদের সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা কেউ কখনো তোলেন নি। এমনিতেই বহুদিনের প্রবাসী পরিবারটা মনের কাছ থেকে অনেকটা দূরে—তার ওপর শেষবার এখানে এসে সুধাকান্ত যে চপলতা দেখিয়ে গিয়েছিলেন—সেজন্যে তারাকান্ত তাঁর সম্পর্কে প্রায় বিরূপই হয়ে আছেন। তবু সুধাকান্তর অসুখের খবরে তারাকান্তকে যেতে হচ্ছে কানপুরে। এই যাওয়ার উৎকণ্ঠা যতখানি, বিরক্তি তার চাইতে অনেক বেশি। ট্রেন-জার্নি পথের কষ্ট। বারান্দার অভ্যস্ত ডেক-চেয়ারটি, গঙ্গার হাওয়া, পরিণত বয়সের আকাঙ্ক্ষিত বিশ্রাম, ধর্মের কথা ভাবা, দু-একখানা সদ্‌গ্রন্থ ইচ্ছেমতো পড়া—সব ফেলে ওষুধ, ডাক্তার, দুশ্চিন্তা আর অনিশ্চিত একটা পরিবেশের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া। তারাকান্তর মনের চেহারাটা চিনতে সুলতার কষ্ট হল না, অর্চনারও নয়।

সুলতা আবার বললেন, 'তোমার একা যেতে অসুবিধে হবে—কালুকে সঙ্গে নাও।'

'অসুবিধে হবেই। কিন্তু কালুকে সঙ্গে নিলেও সেটা দূর হবে না!'

'তা হলে না-ই গেলে। দানাপুরে থেকে কল্যাণীর ভাইয়েরা নিশ্চয় আসবে।'

'তা আসুক। কিন্তু আমার তো একটা কর্তব্য আছে। যেতে হবেই।'

কর্তব্য সম্বন্ধে তারাকান্ত চিরদিন সচেতন। কোর্টে এগারোটায় কেস থাকলে কোনোদিন তাঁর এগারোটা বেজে দু'মিনিট হয়নি; কোনো মক্কেলের কাছ থেকে এক পয়সা বেশি নেননি—এক পয়সা কমও নেননি কখনো। প্রিন্সিপ্‌ল।

অতএব প্রাণের টান থাক আর নাই থাক, কর্তব্যের টানেই তারাকান্ত চলে গেলেন কানপুরে। ধর্ম-সংক্রান্ত খান দুই নতুন পত্রিকা এসেছিল, সেগুলো অর্চনাকে ভালো করে পড়তে বলে গেলেন. এই গরমেও ঠাণ্ডার ভয়ে মাফলার নিতে ভুললেন না. চিনির বদলে তাঁর মধু খাওয়ার অভ্যেস, সুলতা দু'শিশি মধু ট্রাঙ্কের মধ্যে দিয়ে দিয়েছেন কিনা সেটাও কয়েকবার জেনে নিলেন। তারপর অনিচ্ছুক শরীর-মনকে শিকড়সুদ্ধ গাছ তুলে ফেলার বিরক্তিতে টেনে নিয়ে তিনি কানপুরে রওনা হলেন।

একটু যেন ছুটি—যেন একটুখানি মুক্তির আকাশ। কথাটাকে ঠিক এইভাবে ভাবতে চাইল না অর্চনা, অথচ না ভেবেও পারল না। দোতলার বারান্দার কোণায়—একটা থামে হেলান দিয়ে, মেঝের ওপর পা মেলে সেই ছুটির আমেজের মধ্যেই বসে রইল সে।

বাইরে আকাশে শরতের নীল ফুটছে। পানাপুকুরটার জলেও সেই নীলের ছায়া। অর্চনা দেখেছে প্রায় প্রতি বছরই এই সময়ে দু-একটা নীলকণ্ঠ পাখি আসে এদিকে। ওই পুকুরটার পুব কোণে ছাড়া-ছাড়া কয়েকটা কাশের গুচ্ছ ফুটে ওঠে—তার পাশে নীল ফুলের মঞ্জরী দেখা যায়। এখনো তারা আসে নি, কিন্তু অর্চনার মন তাদের আসবার খবর পাচ্ছে। আকাশের নীলে নীলকণ্ঠ পাখি, নীল ফুল তার কাশফুলের রঙ লুকিয়ে রয়েছে।

এমনি শরতের দিনেই, পুজোর ছুটিতে শেষবার এসেছিলেন সুধাকান্ত। মানুষ-টিকে তার অদ্ভুত লেগেছিল। তারাকান্ত যত গম্ভীর হয়ে ওঠেন—ততই উচ্ছল হয়ে ওঠেন তিনি।

'বৌদি, মেয়েটাকে দাও না দিনকয়েক আমাদের সঙ্গে। ঘুরে আসুক।'

তারাকান্ত যে অর্চনাকে সুধাকান্তর কাছে ছেড়ে দেওয়ার আগে ডাকাতের হাতেই ছাড়বার কথা ভাববেন—এই অপ্রিয় সত্যটা চেপে গেলেন সুলতা।

'সে হবে এখন। আমরাই যাব ওকে নিয়ে।'

'আর গেছো তোমরা! এই পনেরো বছরের মধ্যেও তো সময় হল না!'

'কেন—সুমন্ত তো গিয়েছিল?'

'ওই একটা ছেলেই এ বাড়িতে বেঁচে আছে এখনো। তোমরা সব ফসিল হয়ে বসে আছো।'

'জানো তো ভাই—হেমু চলে যাওয়ার পরে—'

এরপরে আর ওখানে দাঁড়ায়নি অর্চনা, পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সুধাকান্তকে সে ভুলতে পারেনি। তাঁকে ভোলা যায় না।

তাঁর অসুখ। ভাবতে ইচ্ছে করে না—ভাবতে কষ্ট হয়। অর্চনার মন বলছে, তাঁর অসুখটা এমন কিছু বেশি নয়, দু-চারদিনের মধ্যেই নিশ্চয় তিনি ভালো হয়ে যাবেন।

সুধাকান্ত তাকে কীট্‌সের কথা বলেছিলেন—বলেছিলেন ইংরেজি কবিতার কয়েকটা পঙ্‌ক্তি। সেগুলো তার শোনবার সঙ্গে সঙ্গেই ভুলে যাওয়ার কথা। তবু একটা লাইন আশ্চর্য ভাবে তার স্মৃতিতে গাঁথা হয়ে আছে : "The poetry of earth is never dead—"

পৃথিবীর কবিতার কখনো মৃত্যু নেই।

কলেজে ভর্তি হয়ে এখন তাকে কীট্‌সের দুটো-একটা কবিতা পড়তে হয়। কিন্তু এই লাইনটা তাদের মধ্যে নেই।

"আটত্রিশ বছর বয়েসে এসে হঠাৎ দেখলুম—এমন মেয়েও কেউ কেউ আছে—নিজের সঙ্গে বার বার যুদ্ধ করেও যাদের ভোলা যায় না—"

বাসুদেব! গঙ্গার ঘাট! সেই সকাল! "The poetry of earth—"

বাইরে একটা কাক ডাকল, যেন কানের কাছে গলাখাঁকারি দিলেন তারাকান্ত। শিউরে উঠল অর্চনা। তারাকান্ত এখানে নেই, তিনি কানপুরে চলে গেছেন, তবু এই বাড়ির চারদিকে যেন তাঁর প্রহরার ছায়া দুলছে, জ্বলজ্বল করছে তাঁর চোখ।

আর হেমন্ত? সেই ভালোবাসা?

"আজ আমি তোমাকে সম্পূর্ণ আমার করে নিলুম, আজ থেকে পৃথিবীর অন্য সব পুরুষের স্পর্শ অশুচি হয়ে গেল তোমার কাছে—"

যেন বুকের মধ্যে একটা বন্দুকের গুলি এসে বিঁধল। ছটফট করে উঠে পড়ল অর্চনা। আজকের দিনটা তার কাটবে হেমন্তর ঘরে। ধুলো জমছে তার মনের ওপর—তাকে আবার নির্মল অম্লান হয়ে উঠতে হবে, আজ সারাদিন ধ্যানের পবিত্রতায় জ্যোতিঃস্নান করবে সে।

॥ দশ ॥

বেরুবার আগে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলটা বুরুশ করে নিচ্ছিল বাসুদেব। দীপা একপাশে মোড়ায় বসে লেস বুনছিল একমনে।

'দীপু!'

'উঁ?'

'তোর অর্চনাদির খবর কি রে?'

দীপা মুখ তুলল। একটুকরো কৌতুক চিকচিক করে উঠল চোখের কোণে।

'ঠিক জানি না।'

'জানিস না মানে?'

'মানে অর্চনাদি চার-পাঁচদিন কলেজে আসছে না।'

'সে কি রে! অসুখ নাকি?'—চুলের ভেতরে বাসুদেবের ব্রাশ থমকে দাঁড়ালো।

'হতে পারে।'—নিরাসক্ত ভাবে আবার লেসের কাজে মন দিলে দীপা।

বিরক্ত হয়ে বাসুদেব বললে, 'বেশ লোক তো! নিজের ক্লাস-মেট—বন্ধু, চার-পাঁচদিন আসছে না—একটু খবর নিতে নেই?'

'ক্লাস-মেট অনেকেই আছে দাদা। অনেকেই ওরকম কামাই দেয়। তাদের সকলের

খবর নিয়ে বেড়াব, অন্য কোনো কাজ-কর্ম নেই আমার ?'

'আচ্ছা হার্টলেস্‌ তো ? তোর বন্ধু না ?'

'বন্ধু তো আরো অনেকই আছে দাদা। তারা আসে যায়, তুমিও তাদের দু-চারজনকে চেনো। কিন্তু তাদের কারো সম্পর্কে তোমার তো এত ইন্‌টারেস্ট দেখিনি।'—ফিক করে হেসে ফেলল দীপা।

'ইউ শাট্‌ আপ!'—বাসুদেব আলগো একটা ধমক দিলে: 'বাজে বকিসনি। দুদিন আগেও অর্চনাদি বলতে অজ্ঞান হতিস, এখন একেবারে ফিলসফার হয়ে গেলি ? বাড়িটা তো চিনিস, একবার খবর নিলেও তো পারতিস ?'

দীপা গম্ভীর হয়ে গেল।

'ওদের বাড়িতে আমরা কেউ যাই—সে ওর বাবা পছন্দ করেন না।'

'সে কি কথা! সেদিন ওর মাকে গঙ্গার ঘাটে দেখলুম—মার সঙ্গে আলাপ করলুম, খুব ভালো লোক বলেই তো মনে হল!'

'ওর মা আর বাবা আলাদা ধরনের দাদা।'

'ও।'—একটু চুপ করে রইল বাসুদেব, হাতের ঘড়িটার দিকে তাকালো, তারপর ক্যামেরাটাকে কাঁধে ঝুলিয়ে বেরিয়ে গেল। বাস-স্টপের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে তার মনে হল, সেদিন গঙ্গারঘাটে আমি কি হঠাৎ ইমোশন্যাল হয়ে পড়েছিলুম, হঠাৎ বেশি কথা বলেছিলুম, বিশ্রীভাবে 'ভালো লাগাটা'-প্রকাশ করে ফেলেছিলুম ?

একবারের জন্যে দাঁড়িয়ে পড়ল বাসুদেব।

প্রথম থেকেই অর্চনা সম্পর্কে সে অকারণে অ্যাগ্রেসিভ, উপযাচকের মতো অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা। বাইশ বছর বয়েসে সেটা সহজ-সুন্দর, আটত্রিশ বছরে তা যেমন সিলি, তেমনি দৃষ্টিকটু! আর ওই ফোটোটা তোলা ? না, উচিত হয়নি—একেবারেই না।

অনুতাপবিদ্ধ বাসুদেব আবার দ্রুতপায়ে চলতে লাগল। আর দেরি করা চলে না। কিন্তু এতদিন পরম নির্ভাবনায় কাটিয়ে যাওয়ার পরে অর্চনাকে দেখে এই যে তার নেশা ধরল, এর ওপর তার নিজেরই কি হাত ছিল ? প্রকৃতির প্রতিশোধ ? লাইফ-ফোর্স ?

কিন্তু জোর করে আর সব পাওয়া গেলেও মেয়েদের মন পাওয়া যায় না, আটত্রিশ বছর বয়সে এই সত্যটা অন্তত বোঝা উচিত ছিল বাসুদেবের। ইউ আর নো লঙ্গার এ কিড!

লাইফ-ফোর্স ? রাবিশ! নিজের ওপর একটা হিংস্র বিদ্বেষে, নীচের ঠোঁটে দাঁতের একটা কঠিন চাপ দিয়ে সামনের বাসটায় লাফিয়ে উঠল তারপর।

বাসুদেব যখন 'হলে' ঢুকল, তখন প্রবল করতালির মধ্যে বসে পড়ছেন অনুষ্ঠানের সভাপতি। বাঁচা গেল, বিরক্তিকর একঘেয়ে বক্তৃতা শুনতে হল না একরাশ। নাচ-গানের আসরে কেন যে এই ভদ্রলোকেরা বকর-বকর করে হলসুদ্ধ লোককে চটিয়ে দিতে আসেন, বাসুদেবের সেটা বোধগম্য হয় না। বক্তাদেরও যে বোধগম্য হয় তা নয়; কিন্তু বক্তৃতা করে করে তাঁদের এমনই বদ-অভ্যেস দাঁড়িয়ে গেছে যে অকারণে খানিক উপদেশ না দিয়ে তাঁরা থাকতেই পারেন না।

পর্দা সরল, আরম্ভ হল 'চিত্রাঙ্গদা।' 'মোহিনী মায়া এল, এল যৌবনকুঞ্জবনে—।' ক্যামেরা ঠিক করে তৈরী হল বাসুদেব। তাকে ছবি নিতে হবে, নিউজটাও কভার করতে হবে। নাটক দেখবার চাইতেও লক্ষ্য রাখতে হবে, কোনখানে কম্পোজিশনটা ভালো, ছবিটা ওৎরাবে। অতএব নাটক চলল, আর তার ফাঁকে ফাঁকে উঠে দাঁড়াতে লাগল বাসুদেব, হলসুদ্ধ লোককে বিরক্ত করে—মুড লাইটকে আঘাত করে ছুঁড়তে হল ফ্ল্যাশ-গানের ধারালো আলো। তারপর ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ল এক কোণায়।

'পরিবে বীরাঙ্গনার হাতে দৃপ্ত ললাটে, সখা, বীরের মরণমালা'—নাটক শেষ হয়ে এল। শুরু হল বসন্তের গান। তারও পরে প্রচণ্ড হাততালির ভেতর পর্দা পড়ল।

ধীরে ধীরে ক্লান্তপায়ে বাসুদেব বেরিয়ে এল। প্যাসেজটা ধরে রাস্তার দিকে এগোচ্ছে, পেছন থেকে একটি মেয়ের ডাক এল : 'বাসুদেব!'

বাসুদেব ঘুরে দাঁড়াল। সুমিত্রা।

সুমিত্রা বললে, 'বেশ লোক! স্পেশ্যাল্ নোট দিয়ে তোমাকে ইনভাইট করলুম—জার্নালিস্টের কাজ শেষ করেই পালাচ্ছ?'

'তাড়াতাড়ি এগুলো করে দেব ভেবেছিলুম। তা হলে শুক্রবারের কাগজে যাবে।'

'ধন্যবাদ। কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা করে যাওয়ার একটা ভদ্রতা তোমার কাছ থেকে আশা করেছিলুম!'

'জার্নালিস্টরা ডিউটি-বাউণ্ড। ভদ্রতায় মাঝে মাঝে অভাব ঘটে। ওটুকু অপরাধ মাপ করে নিতে হবে সুমিত্রা।'

সুমিত্রা হাসল : 'এখন কোথায় যাবে?'

'অফিসে।'

'গাড়ি আছে প্রেসের?'

'না—বাসে যাব।'

'তবে চলো আমার সঙ্গে। আমি তো হ্যারিংটন স্ট্রীট পর্যন্ত যাচ্ছি। লিফ্ট দেব তোমাকে।'

বাসুদেব বললে, 'তুমি এত তাড়াতাড়ি যাচ্ছ? ওরা সব রয়ে গেল যে?'

'ওদের ব্যবস্থা অর্গ্যানাইজাররা করবে। আমি তো পরিচালিকা। আমার ডিউটি শেষ।'

'তাই বুঝি! বেশ চলো।'

বাইরেই মস্ত গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল সুমিত্রার। উর্দিপরা সোফার স্যালুট্ করে দরজা খুলে দিলে। উঠল দুজনে। বিরাট গাড়ির পেছনের সীটে ভদ্রতার ব্যবধান বাঁচিয়ে বসবার মতো জায়গার অভাব ছিল না। গাড়ি চলল।

বাসুদেব বললে, 'বাঁচালে। এই রবীন্দ্র-সরোবর স্টেডিয়াম থেকে অত দূরে যেতে এখন বিলক্ষণ কষ্ট হত। লিফ্টের জন্যে ধন্যবাদ।'

'খুব হয়েছে।'—সুমিত্রা বললে, 'অত সৌজন্যের দরকার নেই আর। এখন আসল কথাটা বলো দেখি! ফাংশন কেমন লাগল?'

'বেশ। ভালোই।'

'প্রথমে বেশ, তারপরে ভালোই? অর্থাৎ মন খুলে ভালো বলতে পারছ না?'

'মুখের কথায় কী আসে যায় সুমিত্রা? কাগজের রিপোর্ট দেখলে খুশিই হবে।'

'মেয়েদের ব্যাপারে তুমি আন্-শিভালরাস হবে না—সে আমি জানি।'—সুমিত্রা আবার হাসল: 'কিন্তু রিপোর্টের ভদ্রতা ছাড়ো। তোমার কেমন লাগল তাই বলো?'

'অভয় দিচ্ছ?'

'নিশ্চয়।'

'তোমার অন্য ফাংশনগুলো এর চাইতে ভালো হয়। এবারের গানগুলো চমৎকার হয়েছে—কিন্তু তোমার স্টেজ-আর্টিস্টদের একটু স্টিফ লাগল।'

সুমিত্রা রাগ করল না। বললে, 'স্টিফ একটু লাগবে—আমি জানতুম। তুমি বোধ হয় জানো না—আমার আর্টিস্টদের বেশির ভাগই ভালো বাংলা বলতে পারে না।'

'কেন, এরা বাঙালীর ছেলে-মেয়ে নয়?'

'একটি পাঞ্জাবী—বাকি সবাই বাঙালী। স্যুভেনির পাও নি?'

'পেয়েছি—অন্ধকারে দেখতে পারিনি। কিন্তু বাঙালী হয়ে বাংলা বলতে পারে না?'

'জন্মের পর থেকেই তো ইংলিশ-মিডিয়াম! বাড়িতে, স্কুলে, কলেজে।'

বাসুদেব হাসল: 'তা হলে সবই তোমার স্বজাতি! এদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে নামালে কেন? কোনো বিলাতী অপেরা ধরিয়ে দিলেই পারতে। অনেক আরাম বোধ করত এরা।'

'রবীন্দ্রনাথ যদি শুধু ঠাকুর হতেন, তা হলে এদের ত্রিসীমানায় আসতে পারতেন না। কিন্তু তিনি টেগোর—সেটা মনে রেখো।'

'বুঝেছি।'

'আর একটা কথাও মনে রাখা দরকার। আজ না হয় আমাকে হ্যারিংটন স্ট্রীটে থাকতে হয়, কিন্তু একদিন আমি শ্যামবাজারের মেয়ে ছিলুম, শান্তিনিকেতন থেকে বি-এ পাস করে তোমাদের সঙ্গে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটে পড়তে এসেছিলুম।'

একটু চুপ করে রইল বাসুদেব। হাজরা রোডের মোড়ে ট্র্যাফিক-সিগন্যালের লাল চোখের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছে গাড়িটা। আঠারো-উনিশ বছর আগে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটে ফিরে গেল বাসুদেবের স্মৃতি। সব মেয়ের ভেতরে অনন্যতায় দীপ্ত একটি মেয়ে। প্রসাধন করত না, প্রায়ই কালো চুলের রাশ মেলা থাকত, সাদা উজ্জ্বল কপালে চুনীর বিন্দুর মতো জ্বলত একটি কুঙ্কুমের টীপ, বেশির ভাগই পরে আসত বাসন্তী রঙের শাড়ি। সেদিন সুমিত্রার কালো চোখের তারায় শান্তিনিকেতনের গাছপালার ছায়া ছিল, শালবনের ওপর ঘনিয়ে আসা মেঘের রঙ ছিল। অন্য মেয়েদের সম্পর্কে ইয়ার্কি করা চলত—এই মেয়েটিকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা যেত।

একজন বলত: 'শেলীর এমিলি!'

আর একজন বলত: 'উঁহু, কোলরিজের জ্যান্ভিয়েভ!'

তৃতীয়জন বলত: 'হল না, লাইলের ক্যাম্পাস্প! Cupid and my Campaspe play'd / At cards for kisses—'

চতুর্থজন বাঙালীমতে বলত: 'রবীন্দ্রনাথের কুমুদিনী। রজনীগন্ধার বৃন্ত।'

গাড়িটা আবার স্টার্ট নিল, উনিশ বছরের ওপার থেকে ফিরল বাসুদেব। স্বর গভীর হল একটু। বললে, 'মনে আছে সুমিত্রা। কিন্তু সেদিনের তুমি কি আর

নিজেকে চিনতে পারো ?'

'চেনবার দরকার কী ?'—বিউটি-পার্লারের ফাঁপানো চুল আর ঠোঁটে তীক্ষ্ণ রঙ নিয়ে হাসল সুমিত্রা : 'জীবন বদলায়। জানো তো, আমার স্বামী কত বড়ো অফিসার ! মাসে কত টাকার মদের বিল দেন, ভাবতেও পারবে না।'

'ভাববার সাহস রাখি না। কিন্তু শ্যামবাজার আর শান্তিনিকেতনকে তোমার আর মনে পড়ে না সুমিত্রা ?'

'হয়ত চিরদিনই মনে থাকত। যদি তুমি সেদিন না পালাতে !'

সব অন্যরকম হয়ে গেল। উনিশ বছর পরে এ কথাটা আজ না উঠলেও কোনো ক্ষতি ছিল না। ভারী হয়ে উঠল আবহাওয়াটা।

বাসুদেব লঘুভাবে হাসতে চেষ্টা করল।

'একটু প্রশ্রয় আমাকেই দিয়েছিলে মনে আছে। কিন্তু তোমাকে বইতে পারি, এমন সাধ্য আছে আমার ? গরীবের ছেলে—বাবা কেরানী !'

'আর আমি শ্যামবাজারের গলি থেকে—'

'অন্ধকারে মাণিক ফুটেছিলে। ভাঙা ঘরে কোথায় রাখতুম ? তারপর অতগুলো ছেলের অভিসম্পাত ! দুদিনেই তোমার বৈধব্য-যোগ ঘটত যে !'

'চালাকি করছ ?'

'চালাকি নয় সুমিত্রা। আরো স্পষ্ট কথায় আসা যাক তা হলে। হ্যারিংটন স্ট্রীটের জন্যেই তুমি জন্মেছ। আমার ঘরে এলে নিজেও সইতে পারতে না। সেপারেশন আসত দুদিন বাদেই।'

একটু চুপ করে রইল সুমিত্রা। তারপর বললে, 'সেন্টিমেন্টাল হব না—হয়তো সত্যি কথাই বলেছ। ঐশ্বর্যের জন্যে আমার লোভ ছিল। শ্যামবাজারের গলিতে মধ্যে মধ্যে আমার কান্না পেতো। কিন্তু সেটা কেবল শান্তিনিকেতনের জন্যেই নয়।'

আবার নীরবতায় কাটল কিছুক্ষণ। তারপর বাসুদেব বললে, 'তুমি নিজের জায়গাই পেয়েছ সুমিত্রা। তাতেই সুখী হতে পেরেছ।'

'সুখী !'—হঠাৎ তীক্ষ্ণভাবে হেসে উঠল সুমিত্রা : 'তুমি ব্যাক-ডেটেড্ হয়ে যাচ্ছ বাসুদেব ! সুখের কথা আমরা ভাবি না। আমরা এক্সাইটেড হতে চাই।'

'শুধু এক্সাইটেড ?'

'আর নইলে অবসন্ন। এক্সাইটমেন্ট আর ফেটিগ। এর মাঝখানে কোনো তৃতীয় জায়গা আমাদের নেই। তাই অবসাদকে ভোলবার জন্যে আমাদের উত্তেজিত থাকতে হয়।'

একটু ভয় পেলো বাসুদেব। সুমিত্রার হাসির আড়ালে আড়ালে কোথাও যেন কান্না ছুঁয়ে গেল একটুখানি। যেন শান্তিনিকেতনের কোনো ঘন গাছের পাতা থেকে হাওয়া লেগে বৃষ্টির জল ঝরল একবিন্দু।

সুমিত্রা ব্যাগ থেকে একটা দামী বিদেশী সিগারেটের প্যাক বের করল, একটা লাইটার।

'নেবে বাসুদেব ?'

'না—স্মোক করি না।'

'উঃ, সেই অসম্ভব ভালো ছেলে !'—লাইটার জেলে সিগারেট ধরালো সুমিত্রা,

চকিত আলোর রক্তরাঙা কটা তীক্ষ্ণ নখ দেখতে পেলো বাসুদেব। ছাত্রজীবনে এই আঙুলগুলোই ছিল কনকচাঁপার কুঁড়ির মতো।

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে সুমিত্রা বললে, 'সুখের কথা তোমরাই ভাবতে পারো—যারা মধ্যবিত্ত, যারা নিম্নবিত্ত, যারা গরীব, যারা আরো গরীব, যারা স্ট্রীট্-পিপ্‌ল। ফুটপাথে যাদের সংসার—গাড়ি-বারান্দার নীচে ময়লা চাদরের তলায় যারা শুয়ে থাকে—সুখ তাদেরও। ও অত্যন্ত চীপ কমোডিটি, আমাদের পাড়ায় বেচাকেনা হয় কদাচিৎ, লুকিয়ে-চুরিয়ে!'

'সুমিত্রা, তোমার কথার ধরনটা ভালো লাগছে না।'

'তোমার আজো বুদ্ধি হল না বাসুদেব, তুমি সেইরকম ব্লকহেডই রয়ে গেলে। নাউ, কাম টু দ্য পয়েন্ট! সুখী হওয়ার অধিকার তোমার ছিল, কিন্তু বিয়ে করলে না কেন আজও?'

'সময় পাইনি।'

'আর সময় কবে পাবে? বয়েস কত হল? সাঁইত্রিশ?'

'পেরিয়েছি। পা দিয়েছি আটত্রিশে।'

'হাঁ, আমার নিজের বয়েসের হিসেবেও ওইরকম দাঁড়ায়। এবার বিয়ে করো।'

'ভাবছি।'

সুমিত্রা কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে থেমে গেল। তারপর বললে, 'মেয়ে পেয়েছ?'

'ঠিক পেয়েছি কিনা জানি না, তবে একজনের কথা মনে এসেছে।'

'সে রাজী?'

বাসুদেব সোজা জবাব দিতে পারল না। অর্চনা। আশ্চর্য, মাত্র ক'দিনের পরিচয়েই কি ভাবে তাকে দুর্বল করে ফেলেছে! তার সম্পর্কে অর্চনা কী ভাবছে সে জানে না—কিন্তু সন্দেহ নেই, আজ বাসুদেব তাকে ঘিরে ঘিরে একটা সুখের কথাই ভাবছে। যদিও গঙ্গারঘাটে হঠাৎ একটা কথা বলে ফেলবার ফলটা শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াবে, তা সে এখনো বুঝতে পারছে না।

'চুপ করে আছো যে?'

'তার মনের খবর এখনো জানি না।'

'তাকে পেলে সুখী হবে?'

'খুব সম্ভব।'

সুমিত্রা আবার হাসল: 'জেলাসি হচ্ছে কিন্তু। আমার মতো মেয়েকেও পাত্তা দিলে না—অথচ কোথাকার কোন্ এক কমনপ্লেস্ মেয়ে তোমার তপোভঙ্গ করল! লেখাপড়া জানে?'

'মাঝারি।'

'আমার চেয়ে দেখতে ভালো?'

'তোমার সঙ্গে কোনো তুলনাই চলে না।'

'তা হলে তোমার মতো সাধারণের টাইপ। সুখী হতে পারবে বাসুদেব। রাজী করিয়ে ফেলো মেয়েটাকে। চল্লিশের কাছে বয়েস হল—এক্সাইটেড হতেও জানো না—বাঁচবে কী নিয়ে?'

বাসুদেব বাইরের দিকে তাকালো।

'গাড়িটা এখানে থামাতে বলো সুমিত্রা। আমি নামব।'

'অফিস পর্যন্ত দিয়ে আসতে পারি।'

'ধন্যবাদ—তার দরকার নেই।'

'সোফার, রোখো।'

গাড়ি থামল। নেমে পড়ল বাসুদেব।

সুমিত্রা বললে, 'রিভিউটা?'

'খুব ভালো করে লিখব।'

'আর মেয়েটিকে রাজী করিয়ে ফেলো বাসুদেব। তোমরা সাধারণ মানুষেরা যে সুখ চাও, তাও হাত বাড়ালেই সব সময়ে আসে না। সুযোগ একবার হারালে সহজে তাকে ফিরে পাবে না।'

আবার এক ফোঁটা জল পড়ল। শান্তিনিকেতনের কোনো একটা ছায়ানিবিড় জামগাছের পাতায় জমে থাকা রাত্রির একটি বৃষ্টিবিন্দু।

রাক্ষসের চোখের মতো দুটো অতিকায় ব্যাক-লাইটের আগুন জেবলে বড়ো গাড়িটা বাঁদিকের রাস্তায় বাঁক নিলে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে চলতে লাগল বাসুদেব, তার নজরে পড়ল অল্পবয়সী একটি গ্রামের মানুষ কলাপাতা রঙের শাড়ি পরা ভীরু দৃষ্টির একটি গেঁয়ো ছোট্ট বউকে নিয়ে বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে।

।। এগারো ।।

প্রেসের জীপে বাসুদেব বাড়ি ফিরল বারোটায়।

শুতে শুতে একটা। সারাদিনের ক্লান্তিতে শরীর-মন আচ্ছন্ন—প্রত্যেকটা স্নায়ু যেন তার এলিয়ে পড়তে চাইছে। তবু ঘুম আসতে অনেক দেরি হল।

সুমিত্রার অনেক টাকা—সুমিত্রার কোনো কাজ নেই। এইসব নানা ধরনের ফাংশন করে তার সময় কাটে—জার্নালিস্ট বাসুদেবের ডাক পড়ে, পুরোনো আলাপের সূত্রে গল্পগুজবও চলে। কিন্তু আজ সুমিত্রা অন্যরকম হয়ে গেছে—আজ অনেকখানি কান্না তার মনে জমে উঠেছিল।

কিন্তু সুমিত্রা আর এক গ্রহের মানুষ, তার কথা ভেবে লাভ নেই। পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটের সেই সব রাঙানো দিনগুলো বড়জোর তার কাছে এক-আধটুকু নস্টালজিয়া আনে, কিন্তু সেই স্মৃতিতে আর বেদনা নেই।

সুমিত্রার সুখ না থাক—উত্তেজনা আছে, সাধারণ উত্তেজনায় যদি না কুলোয়, আরো তীব্র নার্কোটিক কোথাও আছে তার জন্যে। সুমিত্রাকে নিয়ে না ভাবলেও বাসুদেবের চলে।

কিন্তু আজ সুমিত্রার সঙ্গ তার নেশা বাড়িয়েছে। একুশ-বাইশ বছরের একটা বিহ্বলতা কাঁপছে তার রক্তের ভেতর। অর্চনার জন্যে আকাঙ্ক্ষাটা আরো তীব্র হয়ে তাকে পীড়ন করছে। নিজের কাছে যেটুকু আড়াল ছিল, সুমিত্রা এসে তাকে সরিয়ে

দিয়েছে—এই মুহূর্তে সে জানে, অর্চনাকে সে ভালোবাসে।

একটি মেয়েকে দু-দিন দেখেই সে প্রেমে পড়ল? আর এই বয়েসে?

নিজেকে তার কঠিনভাবে বিদ্রুপ করতে ইচ্ছে করল, অর্চনার চিন্তা মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলে আবার ফিরে যেতে চাইল স্বাভাবিক প্রত্যেকটা দিনের ভেতরে। তার অফিস, তার ক্যামেরা, তার আড্ডা-তর্ক, বন্ধু-বান্ধব, তার শৌখিন আর্ট-ক্রিটিসিজম্‌—এগুলোর মধ্যে আবার গুছিয়ে আনতে চাইল নিজেকে। কিন্তু কিছুতেই সে জোর খুঁজে পেল না। আজ রাত্রে সুমিত্রা সব এলোমেলো করে দিয়েছে, আজ আর বাসুদেবের রক্তে কোনোমতেই ঢেউ থামছে না।

'মেয়েটিকে রাজী করিয়ে ফেলো বাসুদেব। সুযোগ একবার হারিয়ে গেলে আর ফিরে আসে না।'

অসম্ভব। এই রাত্রে আর ঘুম আসবে না।

জানলার কাছে একটা চেয়ার টেনে এনে বসে পড়ল সে। চেয়ে রইল আকাশের তারাগুলোর দিকে—যাদের উদ্দেশে চোখ মেলে চিরকাল অসংখ্য মানুষ অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছে, অথচ কেউ কোনোদিন একটি জিজ্ঞাসারও জবাব পায় নি।

মা'র চোখ পড়ল দু-তিনদিন পরে।

'কী হয়েছে বাসু?'

'কিছুই তো হয়নি মা।'

'ভারী ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোকে!'

'অফিসের কাজে ও-রকম ক্লান্তি মাঝে মাঝে আসে।'

নিজের টেবিলে বসে কতকগুলো ফিল্মের নেগেটিভ নিয়ে তাদের ভেতর থেকে কিছু একটা খুঁজছিল বাসুদেব। মা এসে তার পাশে দাঁড়ালেন।

'বাসু?'

'বলো মা।'

'একটা কথা শুনবি আমার?'

'নিশ্চয় শুনব।'

মা হেসে ফেললেন। বললেন, 'ভারী লক্ষ্মী ছেলে হয়েছিস দেখছি আজকাল! সঙ্গে সঙ্গেই রাজী?'

'তার কারণ তুমি অসম্ভব কিছু বলবে না, সে আমি জানি।'

'জানিস?'—মা ছেলের কাঁধে হাত রাখলেন: 'যদি তোকে বিয়ে করতে বলি? 'তোর হিসেবমতো তুই তো এখনো সাবালক হোসনি, আরো তো দু-বছর বাকী আছে তোর!'

বাসুদেব আলোর দিকে ধরে যে নেগেটিভটা পরীক্ষা করছিল, আস্তে আস্তে নামিয়ে রাখল সেটা। ফিরে তাকালো মা'র মুখে, মা'র চোখে চোখ রাখল।

'বাল্য-বিবাহের কথা এখন আমি ভাবতে রাজী আছি মা তোমার খাতিরেই।'

মা চমকালেন না। এইটির আশাই তিনি করছিলেন। স্নেহের একটা প্রসন্ন আভা ছড়িয়ে পড়ল তাঁর কপালে। কাঁধের থেকে হাতখানা উঠে এল ছেলের মাথায়।

'হেঁয়ালি রাখ বাসু, স্পষ্ট কথা বল।'

'মা, সে আমলেও তুমি কলেজে আই-এ পর্যন্ত পড়েছিলে। লেখাপড়ার ধাত তোমার কাঁচা নয়। এর চাইতেও কি সোজা করে আমায় বোঝাতে হবে আর!'

মা একটু চুপ করে থাকলেন। তারপর।

'তা হলে মেয়ে দেখব?'

বাসুদেব বললে, 'আলাদা করে দেখবার দরকার নেই মা। সে মেয়ে তুমি দেখেছ।'

মা বললেন, 'অর্চনা?'

বাসুদেব আবার চোখ তুলে চাইল তাঁর দিকে।

'মা, সবই তো তুমি আন্দাজ করেছ। দীপুর মুখ থেকে আভাস পেয়েই আমার মন বুঝতে এসেছ সেও আমি জানি। আমি সোজা কথা বলি, তুমিও সোজা কথা শুনতে ভালোবাসো। অর্চনার যদি আপত্তি না থাকে, ওদের বাড়ির লোকে যদি রাজী হন—আমি বিয়ে করব।'

'অর্চনা রাজী হবে না মানে? আমার ছেলেকে অপছন্দ করবে এমন মেয়ে আছে নাকি বাংলা দেশে?'—মা'র গর্বে ঘা লাগল।

'নিজের কানা ছেলেকে সবাই পদ্মলোচন দেখে, মা।'

'আমার ছেলে কানা কিনা সে আমি বুঝব।'

'বেশ, তুমিই বুঝবে।'—টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল বাসুদেব: 'কিন্তু আমার আর একটা কথা আছে। ওরা যদি রাজী না হয়, আমার জন্যে আর কোনো পাত্রী তুমি খুঁজো না।'

'তুই তা হলে আর বিয়ে করবি না?'

'একজনের জন্যে তো আটত্রিশ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল। আবার আর এক-জনের জন্যে এইরকম অপেক্ষা করব? আমার আর অত ধৈর্য নেই মা—চল্লিশের ঘরে এসে অত সময়ও আর পাব না।' বলতে বলতে হাতের কাছ থেকে একটা জামা টেনে নিলে বাসুদেব: 'আমার একটু কাজ আছে মা—ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে বেরুচ্ছি।'

মা মনে মনে বললেন, 'যাব, কালই আমি যাব ওদের বাড়িতে। আমার ছেলে কিসের ফেলনা? তা ছাড়া ওদের মেয়েরও তো অনেক বয়স হল, আর বিয়ে দিতে পারবে এরপরে? আমি কালই যাব।'

কিন্তু কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবার দরকার ছিল না। কারণ সুলতা চিঠি পেয়ে-ছিলেন তারাকান্তর। প্রথম স্ট্রোকটা সামলেছেন সুধাকান্ত, অনেকটা ভালো আছেন, আর তারাকান্ত এসে পড়ছেন দিনতিনেকের মধ্যেই।

মনের ভার নেমে গিয়েছিল। সুলতা ভাবছিলেন, আজ দুপুরে কোথাও আড্ডা দেওয়া যাক। আর সর্বপ্রথম—কেন কে বলবে—বাসুদেবের মা-র কথাই মনে পড়ে গিয়েছিল তাঁর। তা ছাড়া—তা ছাড়া আরো একটা কৌতূহলও তাঁর ছিল।

দূর দিয়ে বাসুদেব হনহন করে চলে যাচ্ছিল তখন। একবার ঘাড় ফেরালেই দেখতে পেতো, কালুকে সঙ্গে করে তাদের দরজার সামনে ঠিক সেই সময়েই এসে দাঁড়িয়েছেন সুলতা।

সেদিন সেই গঙ্গারঘাট থেকে ফেরবার পর আর কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছে না অর্চনা—এক মুহূর্তের জন্যেও না। সুলতা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক—এত বেশি স্বাভাবিক যে তাঁর মুখের দিকে চাইতেও এখন ভয় করে। আর তারাকান্ত? তিনি এখন এখানে নেই, অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে, অনিচ্ছুক মন নিয়ে কানপুরে গেছেন, কিন্তু সারাবাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাঁর ছায়া, তাঁর নিঃশব্দ শাসন। এখন কোথাও পালানো দরকার অর্চনার, কোনো এক অন্ধকার আশ্রয়ে তার লুকিয়ে থাকা উচিত, যেখানে কেউ তাকে দেখতে পাবে না, যেখানে নিজের অপরাধের বোঝা নিয়ে সে একান্তে অনুতাপ করতে থাকবে।

কিন্তু অনুতাপ করা যায় না। দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়ালেই আকাশে শরতের আসন্ন নীল। নীলকণ্ঠ পাখির খবর আসছে বাতাসে, নীল রঙের একগুচ্ছ ফুল ফুটবে পানা-ছাওয়া ডোবাটার ধারে, শেষ মেঘের স্মৃতি নিয়ে দেখা দেবে গুটিকয়েক কাশের ফুল। সেইখানে অনুতাপ আসে না, লজ্জা আসে না—সোনালি হয়ে আসা রোদের মতো তার বাসুদেবকে মনে পড়ে।

'যে কথা আপনাকে বলতে পারি, সেকথা আপনার মাকে বলতেও আমার দ্বিধা নেই। যদি থাকত, তা হলে আপনাকেও বলতুম না।'

বাসুদেবের প্রত্যেকটা কথা সে স্পষ্ট শুনতে পায়।

যা বলতে চায়, সোজা করেই বলেছে। তার বুদ্ধির মতোই কথাগুলোও অত্যন্ত স্পষ্ট—কোথাও আড়াল নেই—না ভেতরে, না বাইরে। বাসুদেবের সেই কথাগুলোতে তখন মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করছিল তার। এই সব সে বোঝে, ওই চোখের চাউনি সে চেনে। জীবনে এই কথাগুলো প্রথম তাকে হেমন্ত বলেছিল একভাবে, আজ বাসুদেব বলছে আর একভাবে। কিন্তু দুজন পুরুষের চিন্তা এক, ভাবনা এক, অনুভূতি এক। কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে হেমন্ত আর বাসুদেবের মুখ একাকার হয়ে গিয়েছিল তার সামনে।

তবে কি বাসুদেবের মধ্যে—সেই তখন—হেমন্তর আত্মাই সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল?

অর্চনা শুধু ভয়ই পায় নি—ভয়ের চাইতেও অনেক বড়ো একটা আতঙ্কে যেন রক্ত হিম হয়ে গিয়েছিল তার। তারপরে এলেন সুলতা। তখন পায়ের তলায় তার আর মাটি ছিল না—সব টলছিল, যেন ঢেউয়ের ওপরে দাঁড়িয়ে ছিল সে। সুলতা তো অভয় দিয়েছিলেন, তবু অর্চনা তারই ফাঁকে ফাঁকে ভেবেছিল, তবে কি সে আত্মহত্যাই করবে?

অথচ আশ্চর্য—এই নিদারুণ ভয়, এই আতঙ্ককে আড়াল করে কী একটা উঠে আসতে লাগল, তার শরীরে মনে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। সে তো গ্লানি নয়, লজ্জাও নয়। পায়ের থেকে এই যে মাথার চুল পর্যন্ত এই মুহূর্তে শিউরে শিউরে উঠছে, এই যে আকাশটা নীল চোখ মেলে তার মুখ দেখছে—তাতে কি আড়ালে লুকোতে ইচ্ছে করছে তার? অর্চনা শুনেছে, সাপের বিষেরও একটা নেশা আছে, যন্ত্রণার মধ্যেও সে মাদকতায় অবশ করে আনে, সুখে জড়িয়ে আসে চোখ—এ যে সেইরকম।

কেন এমন হল? এমন তো হওয়ার কথা ছিল না?

পাপ—পাপ, এতদিনের ব্রতভঙ্গের পাপ! সেই পাপের নেশা!

'মা, ভারী মনোরম এই আকর্ষণ। স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। মনে হয়, এর চাইতে সুখ, এর চেয়ে তৃপ্তি আর কোথাও বুঝি নেই। তারপর একদিন এই

সুখের স্রোতই নরকের আগুন হয়ে ওঠে। তখন জ্বালা—কল্পনাতীত জ্বালা।'

তারাকান্তর গলা।

রেলিং ধরে কিছুক্ষণ শক্ত হয়ে রইল অর্চনা। তাকে বাঁচতে হবে। আবার ফিরে যেতে হবে হেমন্তর ধ্যানে। সেইখানেই তার আশ্রয়, তার নিষ্কৃতি।

অর্চনা ধীরে ধীরে উঠে এল তেতলার ঘরে।

সকালের ধূপ নিবে গেছে, কিন্তু তার সুরভি এখনো মূর্ছিত হয়ে আছে ঘরের মধ্যে। প্রদীপটা নেবে নি—এ ঘরের প্রদীপ কখনো নেবে না। সেই প্রদীপের আলোয় দেওয়ালে হেমন্তর ছবি সোনার ফ্রেমের চশমার ভেতর দিয়ে দুটি উজ্জ্বল উদার চোখ মেলে সে যেন সকৌতুকে চেয়ে আছে অর্চনার দিকেই।

গলবস্ত্র হয়ে অর্চনা প্রণাম করল ছবিকে। তারপর লুটিয়ে পড়ল মেজেতে।

'আমাকে ত্রাণ করো তুমি, উদ্ধার করো—এই প্রলোভন থেকে মুক্তি দাও। আমি দুর্বল—আমি পারছি না—তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই।'

কতক্ষণ কেঁদেছিল, জানে না। হঠাৎ যেন ঘোর কেটে গেল তার।

'অর্চি—অর্চি—কোথায় গেলি ?'

সুলতার ডাক। দুপুরে কোথায় একটুখানি পাড়া বেড়াতে বেরিয়েছিলেন, ফিরে এসেছেন।

'যাই মা—' উঠে বসে সাড়া দিল অর্চনা। চোখ মুছল, গায়ের কাপড় গুছিয়ে নিলে, তারপর বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

সুলতা বোধ হয় কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু অর্চনার মুখের দিকে তাকিয়েই থেমে গেলেন।

'কিরে—কাঁদছিলি নাকি ?'

'না তো !'

আরো সন্দিগ্ধ হল সুলতার দৃষ্টি : 'চোখমুখ ওরকম ফুলো-ফুলো কেন তবে ?'

'এমনি। বোধ হয় ঠাণ্ডা লেগেছে।'

'হুঁ।'—সুলতা তেমনি চেয়ে রইলেন অর্চনার দিকে। অস্বস্তি বোধ করে মাথা নামিয়ে নিলে অর্চনা।

একটু পরে অর্চনা ডাকল : 'মা !'

'কি রে ?'

'বাবা তো গুরুদেবকে চিঠি দিয়েছেন—না ?'

'হ্যাঁ—ওই এক খেয়াল হয়েছে ও'র !'—সুলতার গলা বিরস হয়ে উঠল : 'অ্যাদ্দিন তো গুরুদেবের কথা উঠলেই ক্ষেপে যেতেন, বলতেন অশিক্ষিত পেট-সর্বস্ব লোক সব, খালি প্রণামী আদায়ের ফন্দি। এখন দেখছি ভক্তি উথলে উঠেছে—কবে সোনার গোপাল নেমে এসে কার হাত থেকে ননী খেয়েছিলেন, মনে পড়ছে সে-সব। আর শাস্তর শুনছি—যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়িবাড়ি যায়, তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়। যত সব !'

নিজের যন্ত্রণা ভুলে অর্চনা তাঁর দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকালো। এ বাড়িতে সুলতাকেই তার মধ্যে মধ্যে দুর্বোধ্য বলে মনে হয়। নিষ্ঠার তাঁর অভাব নেই, পুজো-

আচ্চাতেও অখণ্ড মনোযোগ, কিন্তু কখনো কখনো এমনভাবে কথা বলেন যে তাঁকে নাস্তিক বলে সন্দেহ হতে থাকে। তারাকান্ত যখন একমনে তাকে যোগবাশিষ্ঠ বোঝাতে থাকেন, তখন প্রায়ই সে তাঁকে মুখ ঘুরিয়ে চলে যেতে দেখেছে।

অর্চনা আস্তে আস্তে বললে, 'ছি মা, গুরুনিন্দা করতে নেই!'

'তুই থাম্ পোড়ারমুখী। মহামহোপাধ্যায় বংশের মেয়ে আমি, আমাকে আর তোর শাস্তর শেখাতে হবে না। কোন্‌টা শাস্তর আর কতটা বাড়াবাড়ি, তা বোঝবার মতো বুদ্ধি আমার আছে।'

অর্চনা তবু ভয়ে ভয়ে বললে, 'কিন্তু গুরুদেব এলে ভালোই হবে মা। আমার তাঁকে দরকার।'

'খুব ভালো। আমি তো আপত্তি করছি না বাপু।'

এভাবে কথা বললে উৎসাহ বাড়ে না—আরো নার্ভাস বোধ হয়। অর্চনা ইতস্তত করল একটু।

'কিন্তু মা, গুরুমন্ত্র জপ করলে তো—'

কথাটা শেষ করতে দিলেন না সুলতা। তাঁর চোখের তারা দুটো দপদপ করে উঠল একবার।

বললেন, 'অর্চি, মন্ত্র নেবার জায়গা যদি মনে না থাকে, তা হলে সে মন্ত্র কোথাও ধরবে না—ঠিকরে ফিরে আসবে। নিজেকে যে ফাঁকি দেয়, দেবতাও তাকে দয়া করেন না—আমার এই কথাটা মনে রাখিস।'

অর্চনা চমকে উঠল। কিন্তু কথাটাকে আর স্পষ্ট করলেন না সুলতা—দুমদাম করে চলে গেলেন নিজের ঘরের দিকে।

॥ বারো ॥

'বাসু!'

ডার্করুমের সামনে দাঁড়িয়ে ডাক দিলেন মা।

'কী মা?'—ভেতর থেকে সাড়া দিলে বাসুদেব।

'একটা দরকারী কথা ছিল বাবা!'

'বাইরে আসতে হবে?'

'এলে ভালো হয়।'

'একটু দাঁড়াও তা হলে। একটা ছবি ডেভেলপ করছি—এখন বেরুলে নষ্ট হয়ে যাবে। এইটের ব্যবস্থা করেই আমি আসছি।'

মা অপেক্ষা করতে লাগলেন। মনের ওপর তাঁর পাথরের ভার। নিষ্ঠুর ভয়ংকর সত্যটা বাসুদেবকে জানানো দরকার। ছেলের বেদনার কথা ভেবে মা'র বুক ফেটে যাচ্ছিল, কিন্তু কোনো উপায় তাঁর ছিল না।

আশ্চর্য মেয়ে অর্চনা! আশ্চর্য তার ভাগ্য! আশ্চর্য মানুষ তারাকান্ত রায়চৌধুরী!

খালি গা, গলায় একটা তোয়ালে জড়ানো বাসুদেব বেরিয়ে এল ডার্করুম থেকে। চোখেমুখে তার পরিতৃপ্তি।

'দারুণ ভালো ছবি হয়েছে মা। ওয়ার্লড্ ফোটোগ্রাফিক কম্পিটিশনে পাঠাব।'
মা জবাব দিলেন না।
বাসুদেব চকিত হল এবার।
'কী হয়েছে মা? মুখ এত গম্ভীর কেন? কী তোমার এমন দরকারী কথা?'
মা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'বাসু, তুই একটু আমার ঘরে আয়।'

তারাকান্ত ফিরলেন কানপুর থেকে। ক্লান্তিতে, বিরক্তিতে সমস্ত মুখ একাকার। রিজার্ভেশন ছিল, কিন্তু বহুদিনের অনভ্যাসে তাঁর একফোঁটা ঘুম হয়নি গাড়িতে। তার ওপর সেই ভেজিটেরিয়ান খাবার! তার যেমন রান্না, তেমনি তাতে পেঁয়াজ রসুনের গন্ধ। অনিদ্রা আর অনাহারে একটা জ্বলন্ত মেজাজ নিয়ে ট্যাক্সি থেকে নামলেন তারাকান্ত।

'কেমন আছে ঠাকুরপো?'

'ভালো আছে। আমি না গেলেও চলত। যেভাবে তার কলেজের শ-দুই ছাত্র-ছাত্রী এসে তাকে নার্স করছে—প্রিন্সিপ্যাল প্রোফেসারেরা এসে দল বেঁধে বসে আছে, তাতে আমাকে টেলিগ্রাম করবার কোনো দরকার ছিল না। শুধু কষ্টটাই সার হল আমার।'

'কিন্তু ঠাকুরপোকে সবাই কত ভালোবাসে—সেটা তো দেখলে!'

উগ্র দৃষ্টিতে তাকালেন তারাকান্ত, উত্তর দিলেন না। সুধাকান্ত অসুস্থ, আত্মীয়তার প্রয়োজনে—মানবিক দাবিতেই গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু বাড়ির কম্পাউন্ডে পা দিয়েই চোখে পড়েছিল সুধাকান্তর মুরগীর সঞ্চয়—ছোট-বড়োতে গোটা-ত্রিশেক চরে বেড়াচ্ছে। তৎক্ষণাৎ মনে হয়েছিল, এ বাড়িতে না এলেই তিনি ভালো করতেন।

একটু পরে তারাকান্ত বললেন, 'আগে একবার গঙ্গায় স্নান করে আসি। ভারী ঘিনঘিন করছে শরীরটা।'

গঙ্গাস্নানে শুচি-পবিত্র হয়ে, খাওয়া-দাওয়া সেরে, দুপুরে কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে অনেকখানি ধাতস্থ হলেন তারাকান্ত। তারপর শেষ বিকেলে যখন বারান্দায় নিজের সেই চেয়ারটিতে এসে বসলেন, নারকেল গাছগুলোর ওপর দিয়ে বয়ে আসতে লাগল গঙ্গার হাওয়া—তখন তাঁর মনে হল, এই সময়ে একবার অর্চনাকে ডাকা যাক। এই দশ-বারো দিন তিনি এখানে ছিলেন না—এর মধ্যে বাইরের কোনো অশুচি-প্রভাব তার মনের ওপর পড়েছে কিনা, সেটা যাচাই করে নেওয়া ভালো। তা ছাড়া অর্চনার কলেজ সম্পর্কেও তিনি নিশ্চিন্ত নন—সেখানে মেল টীচারই বেশি, তখন ঝট করে মেয়েটাকে কলেজে ভর্তি না করলেই ঠিক হত।

অর্চনাকে ডাকবেন ভাবছিলেন, এমন সময় চা নিয়ে এলেন সুলতা।

'এ কি—তুমি কেন?'

সুলতা বললেন, 'এমন বুড়ী অথর্ব হয়ে গেছি নাকি যে তোমার জন্যে চা-টাও করে আনতে পারব না?'

'সে কথা বলছি না। অর্চনা কোথায়?'

'তার একটু জ্বর এসেছে। তবু উঠে আসতে চেয়েছিল, আমি শুইয়ে রেখেছি।'

'জ্বর হল কেন ?'—উৎকণ্ঠিত হলেন তারাকান্ত।

'আমি কী করে জানব ? শেষরাতে উঠে আবার চান করেছে বোধ হয় !'

'সে তো বরাবরই করে। জ্বর তো হয় না।'

সুলতা বললেন, 'আমাকে জেরা করছ কেন ? আমি তো ডাক্তার নই !'—বিরক্তভাবে চলে গেলেন তিনি।

বিমর্ষভাবে বসে রইলেন তারাকান্ত। জীবনে কোথাও শান্তি নেই। এক অসুখের ঝঞ্ঝাট পেরিয়ে বাড়ি আসতেই আর একজন। সব কেমন বেসুরো হয়ে গেছে—মনে হল তারাকান্তর। শেষ বয়েসে মানুষ যে নিজের মতো করে একটু বিশ্রাম করবে, পরলোকের কথা ভাববে দু-দণ্ড—তারও উপায় নেই কোথাও।

অনেকদিন আগে দু-একবার ভেবেছিলেন, এখানকার বাড়িঘর ছেড়ে কোনো তীর্থস্থানে—কাশী কিংবা পুরীতে গিয়ে সবাই মিলে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু সুলতা আপত্তি করেছিলেন। তা ছাড়া তারাকান্তও খানিকটা মানসিক নিষ্ক্রিয়তার জন্যে বিশেষ আর গা করেন নি। এখন মনে হল—চলে গেলেই ভালো হত—দেবতার পায়ে গিয়ে পড়ে থাকলে তিনিই ভার নিতেন—এইসব প্রতিদিনের খুঁটিনাটি নিয়ে বিব্রত বোধ করতে হত না তারাকান্তকে।

বিষণ্ণভাবে চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিলেন তিনি।

ওদিকে অর্চনার জ্বর বাড়তে লাগল।

জ্বরের দোষ ছিল না। দু-তিন দিন থেকেই সর্দিতে ভার-ভার ছিল শরীরটা। তারপর কাল রাত্রে। কাল রাত্রে—

কঠিনভাবে সুলতা বলেছিলেন সেদিন : 'নিজেকে যে ফাঁকি দেয়, দেবতাও তাকে দয়া করেন না। আমার এই কথাটা মনে রাখিস।'

কী বলতে চেয়েছিলেন সুলতা ?

অর্চনা আর বুঝতে চেষ্টা করেনি, কিন্তু একটা সত্য স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল তার কাছে। বাসুদেবকে তার ভুলতে হবে—এই সর্বনাশা মোহ থেকে তাকে নিস্তার পেতে হবে। এতই দুর্বল তার মন, তার এতদিনের সাধনা এতই অর্থহীন যে একজন পুরুষ-মানুষকে দেখবার ভরটুকুও সইল না। ছি-ছি-ছি !

পর পর দুদিন হেমন্তর ছবির সামনে লুটিয়ে কাঁদল সে : 'তুমি আমাকে মুক্তি দাও—তুমি আমাকে শক্তি দাও। তুমি তো বলেছিলে, পৃথিবীর সব পুরুষের জন্যে দরজা চিরকালের মতো বন্ধ করে দিয়েছ। তবু কেন সে দরজা খুলে যায়—তবু কেন নিজের মনকে আমি ধরে রাখতে পারি না ? বাবার উপদেশ—বাবার বই কিছুই আমার কাজে লাগল না ! এখন শুধু তুমিই আমায় বাঁচাতে পারো।'

হেমন্তর ছবি কথা বলল না—কেবল সোনার চশমার ভেতর দিয়ে দুটি উজ্জ্বল চোখ যেন কৌতুকভরা দৃষ্টিতে চেয়ে রইল অর্চনার দিকে।

কাল রাতে—

ঠিক ক'টা অর্চনা জানে না, কতক্ষণ হেমন্তর ছবির সামনে সে লুটিয়ে পড়ে ছিল তা-ও তার খেয়াল নেই। অদ্ভুত নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল সব। বাইরে একটু বাতাস ছিল

না, নারকেল গাছের পাতায় পাতায় এতটুকুও শব্দ ছিল না, একটা ঝিঁঝির আওয়াজ ছিল না, ওপারে ডোবাটার জলে একটা মাছ সাড়া দিচ্ছিল না, একটাও ব্যাঙ ডাকছিল না। যেন কী একটা গম্ভীর মন্ত্র আকাশ থেকে সমস্ত পৃথিবীর ওপরে নেমে এসেছিল—যেন জীবিতের জগৎটা কোথায় মিলিয়ে গিয়েছিল, যেন অর্চনার প্রার্থনায় সাড়া দিতে জীবনাতীতের একটা নিবিড় দুর্ভেদ রহস্য এসে তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছিল।

অর্চনা মাটি থেকে চোখ তুলল। এ-ঘরের যে প্রদীপটি কখনো নেবে না—একটুখানি স্তিমিত হয়ে এসেছে তার শিখা ; ধূপের মৃত-গন্ধে সমস্ত ঘরটা যেন কুম্ভক করে বসে আছে। একটু একটু জ্বরই বোধ হয় এসেছিল অর্চনার—ক্লান্ত, আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে সে হেমন্তর ছবিটার দিকে চাইল।

মনে হল, পরিষ্কার মনে হল, ছবিটা যেন নড়ছে। তারপর এলোমেলো আলোর তরঙ্গের মতো কী কতগুলো যেন কেঁপে গেল ছবিটার ওপর দিয়ে—মুহূর্তের জন্যে সব মুছে গেল, সব সাদা হয়ে গেল। তারও পরে সেখানে ফুটে উঠতে লাগল আর একটা ছবি। সে ছবি হেমন্তর নয়। তার সোনার চশমা নেই, সেখানে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা। হেমন্তর মতো দীপ্ত গৌরবর্ণ সে নয়, রঙ তার শ্যাম ; সাধারণের চাইতে অনেক বেশি চওড়া কপাল, রগের পাশে দুটি-একটি পাকা চুল তার দেখা দিয়েছে।

হাত-পা হিম হয়ে গেল অর্চনার ? এ কে ! বাসুদেব। হেমন্তর ছবিকে মুছে ফেলে দিয়ে সে কী করে এখানে—এই বন্ধ শোকের মন্দিরে চলে এল ?

জ্বর এসেছিল তখন। সেই জ্বরের ঘোরে সে শুনল, কোথায় যেন মিষ্টি করে হেসে উঠল হেমন্ত। বললে, আমাকে ডাকছিলে অর্চনা ? এই তো আমি—এই যে আমি !'

বোবা একটা চীৎকার ফুটে বেরুল গলা দিয়ে। উঠে পড়ল—ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। বিকার—তার নিজের বিকার। সেই বিকারের ঘোরে হেমন্তকে ডাকতে গিয়ে সে বাসুদেবকে ডেকে এনেছে।

মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছিল অর্চনার। অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে পাগলের মতো নেমে গেল নীচে, হোঁচট খেল একবার, একটুর জন্যে আট-দশটা ধাপ গড়িয়ে আছড়ে পড়ল না। তারপর কলঘরে ঢুকে বালতি বালতি জল ঢেলে ধারাস্নান করল।

যখন ঘরে ফিরে এল, তখন অবসাদ আর শ্রান্তিতে সব ঝাপসা। কোনোমতে কাপড় বদলালো, তারপর বিছানায় শোওয়ারও আর তর সইল না। মেজের ওপরেই লুটিয়ে পড়ল—একটা সাময়িক মৃত্যু এসে গ্রাস করল তাকে।

সকালে যখন তারাকান্ত এলেন, তখন এক-গা জ্বর নিয়েই তাঁকে প্রণাম করতে গিয়েছিল অর্চনা। তারাকান্ত নিজের বিরক্তি নিয়ে বসে ছিলেন, তাকে ভালো করে লক্ষ্যও করলেন না। তারপর আর সে দাঁড়াতে পারল না।

'মা, আমার একটু জ্বর এসেছে মনে হয়!'

'ঘুর-ঘুর করে বেড়াচ্ছিস কেন তবে ?'—ব্যস্ত হয়ে সুলতা বললেন, 'যা যা, শুয়ে থাক।'

তারপরে জ্বর বাড়তে লাগল। দুপুরে আর উঠল না অর্চনা।

তারাকান্তকে চা দিয়ে সুলতা আর একবার খবর নিতে এলেন। আর অর্চনার কপালে হাত রেখেই চমকে উঠলেন তিনি।

'জ্বর যে বেশ বেড়েছে, অর্চি! পুড়ে যাচ্ছে গা!'

'সর্দিজ্বর মা, ও কিছু নয়।'

'তুই বললেই হল?'—সুলতা ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন। তারাকান্ত তখন চা শেষ করে অদৃশ্যে শিবমন্দিরগুলোর উদ্দেশে উদাসভাবে তাকিয়ে ছিলেন, খবর দিলেন তাঁকে।

'মেয়েটার জ্বর যে খুব বেড়েছে মনে হচ্ছে!'

'তাই নাকি?'

'একবার এসে দেখে যাও তো!'

অপ্রসন্ন বিপন্ন মন নিয়ে এলেন তারাকান্ত। চোখ মেলে চাইতে পারছিল না অর্চনা—তবু হাসতে চেষ্টা করল।

'আমার বিশেষ কিছুই হয়নি বাবা, আপনারা মিথ্যে ভাবছেন।'

কপাল পরীক্ষা করে ভুরু কোঁচকালেন তারাকান্ত।

'হুঁ—জ্বর একটু বেশিই। থার্মোমিটার আছে?'

সুলতা বললেন, 'কোথায় থার্মোমিটার? যেটা ছিল সেটা তো ভেঙে গেছে সাত-আট বছর আগে!'

ঠিক কথা। আট বছরের মধ্যে—হয়তো আরো আগে থেকে—হয়তো হেমন্তর মৃত্যুর পর থেকেই এ বাড়িতে কোনো অসুখ-বিসুখ করেনি, কোনো থার্মোমিটার দরকার হয়নি; হেমন্ত তার মৃত্যুর মহিমা দিয়ে যেন সব রোগ-বালাই এ বাড়ি থেকে মুছে দিয়েছিল।

সুলতা বললেন, 'সামনের বাড়ি থেকে চেয়ে আনাব কালুকে দিয়ে?'

অর্চনা আবার বললে, 'আপনারা ভাববেন না বাবা, আমি ঠিক আছি। সামান্য সর্দিজ্বর, কালই ভালো হয়ে যাবে এখন।'

'ডাক্তারকে একটা খবর দিই মা?'

'না বাবা, কোনো দরকার হবে না।'

সুলতা বললেন, 'ওর কথা ছাড়ো, ডাক্তার ডাকো তুমি।'

জ্বরের মধ্যে আবার প্রতিবাদ করল অর্চনা: 'না বাবা, না।'

তারাকান্ত বললেন, 'আচ্ছা, আজকের দিনটা তবে দেখি। মনে হচ্ছে ইনফ্লুয়েঞ্জা।'

সুলতা কোনো কথা না বলে ঘর থেকে চলে গেলেন। স্বামীর মন তিনি জানেন। ডাক্তারকে না ডাকতে হলে তারাকান্তও খুশি হন আজকাল। যতই দিন যাচ্ছে, ততই এসব বিলিতী ওষুধ-বিষুধের ওপর ক্রমশ বিশ্বাস হারাচ্ছেন তিনি। 'জাতস্য হি ধ্রুবমৃত্যু'—কোন্ ডাক্তার তাকে রুখতে পারে? আর আধি-ব্যাধি? ও তো আমাদেরই চেতন-অচেতন পাপের প্রায়শ্চিত্ত, ওগুলোর মধ্য দিয়েই আমাদের আত্মশুদ্ধি ঘটে থাকে। এসব ব্যাপারে নামজপ করলেই যথেষ্ট। তাতেও যদি সাংসারিক মনের সংশয় না কাটে, যদি খুঁৎখুঁৎ করে, তা হলে অল্প অল্প হোমিয়োপ্যাথি হলেই চলে যায়।

এইজন্যেই কানপুরে সুধাকান্তর ওখানে বড়ো বড়ো ডিগ্রীধারী ডাক্তারের সমারোহ আদৌ ভালো লাগেনি তাঁর। হোক স্ট্রোক—এত সমারোহের কোনো দরকার ছিল না।

ফার্স্ট সেকেণ্ড্ স্ট্রোক এমনিতেই কাটিয়ে ওঠা যায়, আর লাস্ট্ স্ট্রোকের প্রতিবিধান করবে—এমন ডাক্তার কোথায় আছে ? শুধু একরাশ পয়সা খরচ করে মানুষের অহংকার খানিকটা চরিতার্থ হয় কেবল !

তারাকান্ত বললেন, 'তা হলে আমিই এক ডোজ হোমিওপ্যাথিক ওষুধ এনে দিই মা ?'

আবছায়া গলায় অর্চনা বললে, 'তাই দিন বাবা।'

কথা বলতে তার কষ্ট হচ্ছিল। যন্ত্রণায় ফেটে যাচ্ছিল মাথাটা।

তারাকান্ত ওষুধ আনতে গেলেন। একটা ছোট হোমিওপ্যাথি বাক্স তাঁর আছে। তা থেকে মধ্যে মধ্যে পাড়ার গরিবদের বিনামূল্যে বিতরণ করেন তিনি।

তাঁর ওষুধে কোনো ফল হল কিনা কে জানে, তারপর থেকেই পুরো তিনদিন জ্বরে আর যন্ত্রণায় সমস্ত বিশ্ব-সংসার মিলিয়ে গেল অর্চনার। আর চেতনার সামনে সেই অন্ধকারের পর্দাটাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে এক-একবার এসে দাঁড়াতে লাগল হেমন্ত, ফুটে উঠতে লাগল গঙ্গার ঘাটে বাসুদেবের সঙ্গে সেই দেখা, তার কথার টুকরোগুলো এক-একটা ফুলঝুরির মতো ফেটে পড়তে লাগল থেকে থেকে।

তারপর—

তারপর মধ্যরাত্রে সমস্ত পৃথিবী অন্তহীন স্তব্ধতায় হারিয়ে গেলে, জীবনাতীত একটা রহস্যের ইন্দ্রজাল হেমন্তর সেই শোকমন্দিরকে আড়াল করে দাঁড়ালে—কয়েকটা আলোর বাঁকাচোরা ঢেউ কাঁপতে কাঁপতে মুছে ফেলল হেমন্তর ছবিটা। সেখানে ফুটে উঠল বাসুদেব। শোনা গেল হেমন্তর তীক্ষ্ণ হাসির স্বর : 'অর্চনা, এই যে —এই যে আমি—'

'না—না—না—'

অর্চনা চীৎকার করতে চাইল, পারল না। তখন চারদিকের সেই স্তব্ধতা বিরাট একটা কালো জন্তুর মতো চেপে বসল তার বুকের ওপর, কঠিন পীড়নে দুই হাতে তার গলা টিপে ধরল ; বাতাস ফুরিয়ে যেতে লাগল, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে লাগল।

তারপর ডিগ্রীওলা ডাক্তারের গাড়ি এসে দাঁড়ালো তারাকান্তর বাড়ির সামনে।

অর্চনাকে পরীক্ষা করে কঠিন মুখে ডাক্তার বললেন, 'হার্ট লাংস দুটোই অ্যাফেকট্ করেছে। এক্ষুনি ইন্‌জেক্‌শনটা আনতে পাঠিয়ে দিন।'

অর্চনার মাথার কাছে একখানা গীতা রেখেছিলেন তারাকান্ত। তারই ওপর নিজের ব্যাগটাকে রাখলেন ডাক্তার।

॥ তেরো ॥

ঘোরটা কাটল দিন-পাঁচেক বাদে, তারপর আরো দিন-দশেক পড়ে থাকতে হল বিছানায়। যেন শরীরের সব রক্ত শুকিয়ে গেছে, যেন একবিন্দু শক্তি আর কোথাও অবশিষ্ট নেই —এমনি মনে হচ্ছিল অর্চনার। যেন দেহ-মনে একটা মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে সে নিঃশেষ হয়ে গেছে—এখন এইভাবে পড়ে থাকা ছাড়া, একটা ধূসর শূন্যতায় ডুবে থাকা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই অর্চনার।

জানলা দিয়ে আকাশের নীল আর নারকেল গাছের মাথাগুলোর দিকে তাকিয়েছিল অর্চনা। মেঘ দেখছিল, উড়ন্ত চিলের ডানা দেখছিল, একটা স্টিমারের কালো ধোঁয়া অনেক দূর পর্যন্ত পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে তাই দেখছিল। এমন সময় সুলতা এসে বসলেন তার পাশে।

আসেন সব সময়েই, খবর নেন, খাইয়ে যান, মাথায় হাত বুলিয়ে দেন কখনো কখনো, রাত্রে না ঘুমোনো পর্যন্ত দেখেও যান। অসুখের বাড়াবাড়ির সময় তো দু-তিনদিন অর্চনার কাছছাড়াই হননি, নিজের অসুস্থ শরীর নিয়েও টানা বসে থেকেছেন। আজও এসে বসলেন। কিন্তু আজ তাঁর চোখের দৃষ্টিতে অন্য একটা কিছু ছিল—মনে হল অর্চনার।

'কেমন আছিস অর্চি ?'

'ভালো আছি মা।'

'বার বার তো তোকে বলেছি, শেষরাতে উঠে গায়ে অমন করে বাসিজল ঢালিসনি একরাশ, তা সেকথা কানে তুলছে কে! বুকে এমন ঠাণ্ডা লাগিয়েছিলি যে একেবারে যমের দোরগোড়া পর্যন্ত গিয়ে পেঁছেছিলি লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে। তার ওপর ওঁর ডাক্তারী! অত সহজেই যদি সবাই ডাক্তার হত, তা হলে আর ভাবনা ছিল কী ?'

তারাকান্ত সম্পর্কে সুলতা চিরকাল বিদ্রোহিণী। কিন্তু আজ একটু বেশি ঝাঁঝালো ঠেকল গলার স্বরটা।

'বাবার ওষুধেই আমার সেরে যেত মা।'

'হুঁ, চিরকালের মতো সারছিল !'

'সত্যি বলছি মা, এমনিতেই আমি ভালো হয়ে উঠতুম।'

'বাজে বকিসনি অর্চি। হার্ট লাংস তো প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সময়মতো আমি ডাক্তার ডাকিয়ে না আনলে কী যে হত ভগবানই জানেন!'

'আমি মরব না মা।'

'কী বাঁচাই বেঁচে আছিস!'—হঠাৎ তীক্ষ্ন গলায় সুলতা বললেন, 'যেন জ্যান্তে কবর দিয়ে রেখেছে তোকে। এখন তো ভালো হয়েছিস, এবার আমার একটা কথা শোন অর্চি। মাটিতে যার শেকড় নেই—ধর্মের জল-হাওয়া দিয়ে মিথ্যে তাকে বাঁচাতে চেষ্টা করিসনি। সে বাঁচে না।'

'কী বলছ মা ?'

'বলছি আমার মাথা আর মুণ্ডু!'—যেন ক্ষেপে গেলেন সুলতা: 'সুমন্ত তার বৌকে নিয়ে বাড়ি ছাড়ল, মীরা-নীরাও আসতে চায় না, তুইও একটু একটু করে মরতে যাচ্ছিস! কী লাভ হচ্ছে এতে? অন্যদের দুঃখ দিলে হেমন্তর আত্মা তাতে শান্তি পাবে ?'

অর্চনার অসুস্থ মস্তিষ্কের ভেতর আবার ঝড় দেখা দিল। কান ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল, বুক পর্যন্ত শুকিয়ে এল, হৃৎপিণ্ড হাপরের মতো ওঠা-পড়া আরম্ভ করল। অর্চনা ধরা গলায় বললে, 'মা!'

'আমার দিকে চা অর্চি—সোজা করে চা। সত্যি কথা বল্, এইভাবে তোর বাঁচতে ইচ্ছে করে ?'

'মা !'

'মেয়েমানুষের চোখকে কী করে ফাঁকি দিবি তুই ? আজ দেড়মাস ধরেই তোর মুখ আমি দেখছি। তুই বদলে গেছিস—তোর পুজোআচ্চা শুধু মনকে চোখ ঠারা। আমি তোর মা—অনেক ভেবেছি, কিন্তু তোর এই কষ্ট আমার আর সইছে না। যদি কাউকে তোর পছন্দ হয়—তুই বিয়ে কর্—আমি প্রাণভরে তোকে আশীর্বাদ করব। একটা কুমারী মেয়ের থামোকা এ কি ভোগান্তি !'

দু-হাতে কান চেপে ধরল অর্চনা।

'বোলো না মা, আর বোলো না। আমার এসব শোনাও পাপ। আমি বিধবা।'

'বিয়ে হল না, তবুও বিধবা ? আচ্ছা বেশ, তাই মানছি। কিন্তু বিধবারও তো বিয়ে হয়, হয় না নাকি ?'

'মা !'

'নিজের মেয়ে বলে তোকে জানি, অর্চি। কোন্ মা মেয়ের কষ্ট সইতে পারে ? যদি বুঝতে পারতুম—তুই নিজেকে নিয়ে সুখে আছিস, একটা কথাও আমি বলতুম না—বলিওনি এতদিন। কিন্তু আজ তোর মন যা চায় না, যা তুই না করলে কোনো অন্যায় নেই—জোর করে তোকে তাই করতে হচ্ছে, এ আমি কিছুতেই সইব না অর্চি। যদি বাসুদেবকে তোর পছন্দ হয়ে থাকে, ওকে—'

'বোলো না মা—বোলো না।' বালিশে মাথা গুঁজে শুয়ে পড়ল অর্চনা, কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে : 'এসব আমার শোনাও পাপ। মনের ভেতরে যদি এতটুকুও অশুচি হয়ে থাকে, তুমি আমায় তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও।'

সুলতা থেমে গেলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে চেয়ে রইলেন অর্চনার দিকে। তারপর উঠে পড়লেন বিছানা ছেড়ে—ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কিছুই আড়াল নেই তাহলে—সব তার নগ্ন হয়ে গেছে। কিন্তু সুলতা গঙ্গারঘাটে কয়েক মিনিটের জন্যে তাকে আর বাসুদেবকে একসঙ্গে দেখেই সমস্ত বুঝতে পারলেন ? কিংবা তার মনের ভেতরে যে ভাঙচুর শুরু হয়ে গেছে, বাইরে থেকেই তা তাঁর কাছে এমনভাবে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল ? বারো বছর ধরে নিজের মুখে যে আয়নার মতো স্বচ্ছ পবিত্রতা সে গড়ে তুলেছিল, তার পেছন থেকে যদি একটু পারার রেখাও ফুটে উঠে থাকে —তাকে আড়াল করবার কোনো উপায়ই রইল না ? নাকি জ্বরের ঘোরে সে সব প্রকাশ করে দিয়েছে—তার মনের ভেতরকার একটা কথাও আর গোপন রইল না ?

সুলতা যা খুশি বলুন—এবার নিজের হাতেই সব উপড়ে ফেলবে সে। এতদিন তবু পাড় দেওয়া কাপড় পরত, এবার পরবে গেরুয়া। কলেজে আর সে যাবে না। দীক্ষা নেবার পর সে এই সংসার থেকেও সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যাবে—লোকালয়ে থাকবে না, তারাকান্তর কাছে অনুমতি নিয়ে কোনো মঠে চলে যাবে। হেমন্তকে যদি ধরে রাখতে না পেরে থাকে, তাহলে অন্ততঃ ভগবানের কাছেও নিজেকে সে তুলে ধরতে পারবে—কিন্তু কোনো মানুষের জন্যে আর তার আত্মাকে কলঙ্কিত করবে না।

বাসুদেব কি তার মনের কথাটা বুঝতে পেরেছে ? যদি না-ই পেরে থাকে, তাহলে এমন করে সে এগিয়ে এল কেন ? গঙ্গার ধারে অত সহজে কেমন করে বলতে পারল—

কী কুক্ষণেই কলেজে পড়বার জন্যে জেদ ধরেছিল সে! বাইরের একঝলক বাতাস আসতেই তার এতদিনের সংযমের দেওয়াল ঝরে পড়ে গেল তাসের ঘরের মতো; আর সেই সঙ্গে যোগভঙ্গ করল বাসুদেবেরও—আটত্রিশ বছর বয়েস পর্যন্ত যার জীবনে একটি মেয়েও ছায়া ফেলতে পারেনি!

আরো সাত-আটটা দিন যেন দুঃস্বপ্নের মতো কেটে গেল। সুলতা আর কিছু বলেননি, কেবল মধ্যে মধ্যে তার দিকে তাকিয়ে থাকেন, সে দৃষ্টি অর্চনা সইতে পারে না। তারাকান্তকে দেখলে ভয়ে তার রক্ত হিম হয়ে আসে—যেন মূর্তিমান কালপুরুষের মতো সামনে এসে দাঁড়ান তিনি।

কিন্তু তারাকান্ত কিছুই বলেননি। তিনি জানেন না—তিনি কল্পনাও করতে পারেন না।

প্রায় পনেরো দিন পর অর্চনা আর এক ভোরবেলায় এসে তাঁকে প্রণাম করল।

তারাকান্ত চোখ বুজে বসেছিলেন। যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। অর্চনার ছোঁয়ায় চোখ মেললেন।

'আজ ভালো আছো মা?'

'এখন সম্পূর্ণ ভালো হয়ে গেছি বাবা।'

'অনেকদিন কলেজে যাচ্ছ না, মা। খুব কামাই হয়ে গেল তোমার। যাবে নাকি আজ থেকে?'

'আর যাব না বাবা, কোনোদিন না—', একথা বলতে গিয়েও বলা হল না অর্চনার। একটু চুপ করে থেকে বললে, 'আরো ক'টা দিন যাক বাবা. এখনো মাথার ভেতরে কেমন দুর্বল বোধ করি, পড়ানো কিচ্ছু বুঝতে পারব না।'

'থাক তবে।'

অন্য দিনের মতো অর্চনা উঠে গেল না। কিছুক্ষণ তারাকান্তর পায়ের কাছে বসে থেকে বললে, 'গীতা আনি বাবা?'

'আনো—', তারাকান্ত খুশি হলেন: 'কলেজের পড়ার তাড়া যখন নেই—তখন মা-ছেলেতে মিলে গীতাই পড়া যাক। এ সমস্ত শাস্ত্রের সার মা—আত্মাকে শান্তি দিতে গীতার মতো আর কিছুই নেই।'

শ্রীভগবানের বাক্যামৃতে মগ্ন হয়ে রইলেন তারাকান্ত—অর্চনা প্রাণপণে তলিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু এক ঘণ্টা পরে গীতায়ও ক্লান্তি এল।

বই বন্ধ করে তারাকান্ত বললেন, 'আজ থাক মা। হাঁ, আসল কথাই তোমাকে বলিনি। গুরুদেবের চিঠি পেয়েছি। দিন-দশেকের মধ্যেই এসে পড়ছেন তিনি।'

'দিন-দশেক!'—হঠাৎ রূঢ় একটা ধাক্কা লাগল অর্চনার বুকের ভেতর। এইটের জন্যেই সে মনেপ্রাণে অপেক্ষা করছিল, অথচ সময়টা এত এগিয়ে এসেছে তা যেন ভাবাও যায়নি!

একটু আশ্চর্য হয়ে তারাকান্ত বললেন, 'দিন-দশেকের মধ্যেই তো আসতে হবে। আজ তো—'

'ঠিক বাবা।'—অর্চনা একবারে কালো হয়ে গেল: 'আমার খেয়াল ছিল না। অসুখের জন্যে দিনগুলো কিভাবে যে কেটে গেছে টেরই পাইনি!'

দ্বপ্রে নিজের ঘরে বসে সে ভাবতে লাগল, আর আমার দ্বিধা নেই—আর আমার সংশয় নেই। হেমন্ত আমাকে রক্ষা করতে পারল না—তাহলে দেবতা এসেই আমার মনের দরজায় দাঁড়ান। তাঁরই মধ্যে হেমন্তকে আমি ফিরে পাব, তিনিই আমায় দ্বিচারিণী হওয়ার দ্বর্ভাগ্য থেকে—সমস্ত পরাজয় থেকে আমাকে পরিত্রাণ করবেন।

'অর্চনাদি!'

অর্চনা কেঁপে উঠল। দরজায় দাঁড়িয়ে দীপা।

'দীপা—তুই?'

'কেন, আসতে নেই!'—ঘরে পা দিয়ে দীপা বললে, 'তোমার খবর নিতে এলুম।'

আবার মনের সেই অবাধ্য তরঙ্গ। দীপাকে দেখলেই বাসুদেবকে মনে পড়ে। তবু প্রাণপণে হাসতে চেষ্টা করল অর্চনা: 'আয়।'

সামনের চেয়ারটাতে বসে দীপা কিছুক্ষণ চেয়ে রইল অর্চনার দিকে। বললে, 'ভারী রোগা হয়ে গেছ অর্চনাদি। সবই শুনেছি।'

'শুনেছিস? কে বললে?'

'কেন, মাসীমা? তোমার মা?'

'আসবার আগে নীচে বুঝি দেখা হল মা'র সঙ্গে?'

'আজকে দেখা হবে কেন?'—দীপা হাসল: 'তোমার অসুখটা একটু কমলেই তো গিয়েছিলেন আমাদের ওখানে!'

'তোদের ওখানে?'—অর্চনা আকাশ থেকে পড়ল।

দীপা আশ্চর্য, বললে, 'কেন, তুমি জানতে না? মাসীমা তো দিনতিনেক গেছেন এর ভেতরে। তোমাদের ওই যে বাচ্চা চাকরটা আছে, তাকে নিয়ে যান। মা'র সঙ্গে খুব ভাব হয়েছে, অনেক গল্প করেন দুজনে।'

অর্চনা বিহ্বলভাবে চেয়ে রইল। তারাকান্ত আত্মকেন্দ্রিক হয়ে গেছেন, বাইরের জগতের দরজা তাঁর কাছে বন্ধ, কিন্তু সুলতা এখনো সামাজিক। শরীর ভালো থাকলে, বাতের বাড়াবাড়ি না হলে দুপুরের দিকে এবাড়ি-ওবাড়ি বেরোন। কিন্তু সে-দৌড়টা যে দীপাদের বাড়ি পর্যন্ত গিয়ে পেঁছবে সেকথা কে ভাবতে পেরেছিল!

অস্পষ্ট স্বরে অর্চনা বললে, 'মা আমায় কিছুই বলেননি।'

দীপা একটু চুপ করে থাকল—একটা কিছু সে-ও ভাবছিল। তারপর আস্তে আস্তে বললে, 'অর্চনাদি, রাগ করবে না?'

'কেন রাগ করব?'

'দাদা তোমাকে একটা চিঠি দিয়েছে।'

হৃৎপিণ্ডে একটা তীর বিঁধল অর্চনার। কিছুতেই তাকে আত্মস্থ হতে দেবে না এরা। ঠোঁট কামড়ে ধরে চুপ করে বসে রইল সে।

'তুমি যদি চিঠিটা না নাও—', দীপা আস্তে আস্তে বললে, 'দাদা বলেছে, আমি ফেরত নিয়ে যাব।'

অর্চনা হঠাৎ সোজা সরল দৃষ্টিতে দীপার দিকে তাকালো। আর তৎক্ষণাৎ একটা তীব্র বিতৃষ্ণায় সমস্ত মন তার কালো হয়ে গেল।

'মারং সসেনং মহতীং বিজিত্বা।' গৌতম সসৈন্যে আবির্ভূত 'মার'কে জয়

করেছিলেন—তারাকান্তর উপদেশ। সেই 'মার' শুধু ভয়ের বেশ ধরেই আসেনি ; সে এসেছিল যশোধারার মিনতি হয়ে, মায়া দেবীর আর্তি হয়ে, শাক্যপতির অনুনয় হয়ে। সেই ছদ্মবেশ গৌতমকে বিচলিত করতে পারেনি—তিনি সম্বোধিরূপ অনন্ত জ্ঞানের দ্বারা চরিতার্থ হয়েছিলেন।

আজ তার আর হেমন্তর মাঝখানে ওই 'মারে'র চক্রান্ত। সেই চক্রান্ত সঞ্চালিত হয়েছে তার নিজের রক্তের ভেতর, বাসুদেব এসেছে প্রলোভনের প্রতিমূর্তি হয়ে ; সেই চক্রান্তে যোগ দিয়েছেন সুলতা—বাসুদেবের মা—দীপা সবাই। তাই সুলতা সেদিন মুখ ফুটে যা তাকে নিরাবরণ স্পষ্টভাষায় বলেছিলেন তা আকস্মিক নয়। একটা সুনিশ্চিত জাল তাকে ঘিরে ঘিরে আসছে ; সবাই মিলে ধীরে ধীরে তাকে ব্রতচ্যুত করবার পরিষ্কার প্ল্যান নিয়েছেন একটা—তাই বাসুদেব এই চিঠিটা পাঠাতে সাহস করেছে তাকে।

'মারং সসেনং—'

কিন্তু এরও দরকার ছিল। প্রলোভন না থাকলে তো সাধনার পরীক্ষা হয় না। সেই পরীক্ষা এসেছিল অর্চনার সামনে—কিন্তু বারো বছরেও তার সম্পূর্ণ প্রস্তুতি তার আসেনি ; তাই তার মন টলে উঠেছিল—ভুলে গিয়েছিল নিজের কর্তব্যকে—ঝাঁপ দিয়ে পড়তে যাচ্ছিল সর্বনাশের অন্ধকারে। কিন্তু আর নয়। অর্চনা বুঝেছে, তারাকান্তই তাকে সত্যিকারের শিক্ষা দিয়েছিলেন। যে ভুল সে করেছে, তার জের এইখানেই শেষ হয়ে যাক।

দীপা চুপ করে তাকিয়েছিল তার মুখের দিকে। আবার বললে, 'চিঠিটা তুমি নেবে না অর্চনাদি ?'

হঠাৎ কঠিন গলায় অর্চনা বললে, 'আচ্ছা দে !'

অর্চনার স্বরে ভয় পেলো দীপা।

'জবাব দেবার কোনো তাড়া নেই, অর্চনাদি। দিনসাতেক পরে বরং আবার আসব আমি। তখন—'

'না, জবাব আমি এখুনি দেব। দে চিঠি।'

হাত থেকে তার চিঠিটা প্রায় কেড়েই নিলে অর্চনা। ছিঁড়ে ফেলল খামখানা।

কোনো সম্ভাষণ ছিল না চিঠিতে। শুধু লেখা ছিল ঃ

'তোমার সব ইতিহাস আমি শুনেছি। বাধা কি কেবল এইখানেই ? তোমার নিজের মন কি এখনো সেই অপূর্ণ বিয়ের সংস্কারকে কাটিয়ে উঠতে পারেনি ? আমার বিশ্বাস হয় না। তোমার চোখে আমি আর এক আলো দেখেছি। যদি আমার ভুল না হয়ে থাকে, যদি তোমার মা তোমাকে ঠিক বুঝে থাকেন, তা হলে সমস্ত জীবন তো এখনো তোমার সামনেই পড়ে আছে। আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করে আছি—তোমার মা-ও মত দিয়েছেন। যদি বাবার জবরদস্তিকে ভয় না পাও, তা হলে আসছে মাসের সতেরো তারিখে আমার জন্মদিনে তুমি আসবে। সেইদিন আমি—'

আর পড়তে পারল না অর্চনা। সতেরো তারিখে ! হেমন্তর মৃত্যুদিন—বাসুদেবের জন্মদিন ! তাই হেমন্তর ছবিটাকে মুছে ফেলে ফুটে উঠছিল বাসুদেবের মুখ ! পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত যেন শিউরে গেল তার।

'মারং সসেনং—'

দীপা বলতে লাগল : 'জানো অর্চনাদি—সব কথা শোনবার পরে দাদা দু-রাত ঘুমুতে পারেনি, শুধু বাড়ির ছাতে পায়চারি করে বেড়িয়েছে। শেষকালে আজ আমাকে—'

অর্চনা বাধা দিলে তাকে।

'ওসব কথা আমাকে বলে লাভ নেই, দীপা। এ হয় না।'

দীপা শুকিয়ে গেল। বললে, 'কিন্তু অর্চনাদি—'

'তুই ছেলেমানুষ, এখনো এসব বুঝতে পারবি না। আমার পক্ষে ওভাবে চিন্তা করাও অসম্ভব। তোর দাদার চিঠির জবাব আমি মুখেই দিচ্ছি। বলিস—না।'

ধীরে ধীরে আলো নিবে গেল দীপার মুখ থেকে। একটু চুপ করে থেকে বললে, 'আচ্ছা।'

॥ চৌদ্দ ॥

অফিসের সহকর্মী দাশগুপ্ত এসে বললে, 'মুখার্জি, এত গ্লাম কেন ?'

বাসুদেব প্রকাণ্ড একখানা ছবির বই খুলে টার্ণারের আঁকা একটা ছবি পর্যবেক্ষণ করছিল। আগুন-রঙের ওপর অদ্ভুত ঝোঁক লোকটার। ছবিটায় যেন চোখ জ্বলে।

দাশগুপ্তর ডাকে সে অ্যালবামটা বন্ধ করল। বললে, 'কোথায় গ্লাম দেখলে ?'

'ক'দিন থেকেই লক্ষ্য করছি। তোমার মুখের চেহারা কি রকম জানো ? অল্প-বয়সের কোনো ছেলে জিল্‌টেড্‌ হলে যেরকম দাঁড়ায় !'

কোনো দরকার ছিল না, তবু বাসুদেব চমকালো, টার্ণারের ছবি থেকে একটুকরো আগুন-রঙ যেন ছিটকে এল তার মুখে। বাসুদেব বললে, 'কী বাজে ইয়ার্কি দিচ্ছ দাশগুপ্ত—সব সময় ছ্যাবল্যামো ভালো লাগে না !'

'সিরীয়াস এগেন ? না, সত্যিই তুমি বুড়িয়ে যাচ্ছ মুখার্জি ! গেট ম্যারেড !'

'বোকো না।'

সামনের চেয়ারটাতে বসে পড়ে দাশগুপ্ত বললে, 'দ্যাখো, কোনো মানুষ ইচ্ছে করে বোকা হতে চায় না। কিন্তু জীবনের কতগুলো ইডিয়সিরও আশ্চর্য দাম আছে। বিয়ে তাদের মধ্যে একটা। অত বড়ো গাধামো আর নেই—কিন্তু যে জ্ঞানবৃদ্ধেরা ওটি এড়িয়ে গেছেন তাঁদের প্রত্যেককেই যথাকালে অনুতাপ করতে হয়েছে।'

বাসুদেব বিরক্ত হয়ে ভুরু কোঁচকালো।

'আচ্ছা দাশগুপ্ত, তোমার কি কোনো কাজকর্ম নেই ? খামোকা এখানে এসে বকর-বকর করতে বসে গেলে ?'

সিগারেট ধরিয়ে দাশগুপ্ত বললে, 'আরে নিউজের চাপ তো সন্ধ্যের পর থেকে—তখন হাড় জ্বালাতে থাকবে টেলিপ্রিণ্টার। তখন কি আর আড্ডা দেবার সময় পাব !'

'আড্ডা যদি দিতেই হয়, অন্য টেবিলে যাও। আমাকে জ্বালিয়ো না।'

দাশগুপ্ত গায়ে মাখল না। বললে, 'আজ তোমাকেই টার্গেট করেছি। তুমি যদি চুপ করে থাকো, আমি একাই কথা কইব।'

'কী হলে তোমার মুখ বন্ধ হয় ?'

'চা খাওয়ালে।'

'আচ্ছা খাওয়াচ্ছি। কিন্তু তারপরেই উঠে যেতে হবে এখান থেকে।'

'সেটা পরে দেখা যাবে। চা আনাও তো।'

বেল বাজিয়ে বেয়ারা ডাকল বাসুদেব। চা আনতে দিলে।

দাশগুপ্ত বললে, 'আচ্ছা তুমি কি মনে করো—যামিনী রায়ের ছবি সত্যিই আমাদের পুরোনো ট্র্যাডিশন—র‍্যাদার বাঁকুড়ার নিজস্ব ট্র্যাডিশনকে রিপ্রেজেণ্ট করে ? নাকি ওর অনেকটাই স্টাইলাইজ্‌ড্‌—মানে—'

অধৈর্য হয়ে বাসুদেব বললে, 'তোমার বউ কোথায় হে দাশগুপ্ত ?'

'বাপের বাড়ি গেছে। শিলিগুড়িতে। কিন্তু হঠাৎ এ কথা কেন ?'

'তোমার বকুনির আগ্রহ দেখে। আর্টের বিন্দুবিসর্গ বোঝো না—আবিসিনিয়ার হাইলে সালাসির দাড়ি ক'ইঞ্চি লম্বা সেই সবই তোমার নখদর্পণে। অথচ আর্ট নিয়ে আলোচনা করবার দারুণ উৎসাহ জেগেছে দেখতে পাচ্ছি। তার মানে বাড়িতে কথা কইবার লোক নেই, সেটা পুষিয়ে নিচ্ছ আমার ওপর দিয়ে !'

হা-হা করে হেসে উঠল দাশগুপ্ত।

'ধরেছ ঠিক। সত্যি ব্রাদার, পঁয়ত্রিশ বছরে বিয়ে করে কেমন যেন স্ত্রৈণ হয়ে গেছি। বউ না থাকলে চারদিকে যেন কেমন একটা ভ্যাকুয়াম সৃষ্টি হয়—নিজেকে কি রকম—মানে পথহারা শিশুর মতো বোধ হতে থাকে, তখন যে-কোনো একটা ইন্‌টেলিজেণ্ট সাবজেক্‌ট ডিসকাস করে মেজাজটাকে ফ্রেস-আপ করতে ইচ্ছে হয়।'

'তোমার মাথা। একেবারে গোল্লায় গেছ, গর্দভ কোথাকার !'

চা এল। একটা চুমুক দিয়ে দাশগুপ্ত বললে, 'অ্যাড্‌মিটেড। আমি তো গোড়াতেই তোমাকে বলেছি মুখার্জি—জীবনে এক-একটা ইডিয়সি আছে যা মানুষকে উল্‌টো দিক থেকে—'

'থামো।'

'আজ বলছ থামো, কিন্তু ওয়ান্‌স্‌ ইউ গেট ম্যারেড—সঙ্গে সঙ্গে সুড়সুড় করে আমার পাশে এসে দাঁড়াবে। তখন কোনো একটি ছাতনাতলায় ব্যা-ব্যা করে ডাকতেও তোমার খারাপ লাগবে না। জাস্ট ট্রাই ইট অ্যাণ্ড সী।'

'হুঁ।'

'মুখার্জি, করো না একটা বিয়ে। সত্যি, আর দেরি করা উচিত নয়। বয়েস তো কম হল না।'

বিরস স্বরে বাসুদেব বললে, 'একেবারে ঠানদি দিদিমার মতো আরম্ভ করলে যে ! তোমার তাতে স্বার্থটা কী ?'

'আমার মতো আর একটি স্ত্রৈণকে দলে পাব। বেশি বয়েসে বিয়ে করলে লোকে স্ত্রৈণ হতে বাধ্য। আর তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া—',

দাশগুপ্ত একটু ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে : 'একটি ভালো পাত্রী ভেবেছি তোমার জন্যে !'

'ঘটকালি ধরেছ ?'

'ও তোমাদের বামুনের ব্যবসা। বদ্যির ছেলে মানুষ-মারা কবরেজ হতে পারে, কিন্তু ওসবের ভেতরে নেই।'

'তা হলে আমার জন্যে পাত্রী খুঁজতে কে বলেছে তোমাকে ?'

'কেউ বলেনি।'—দাশগুপ্ত হাসল: 'পরোপকার নিঃস্বার্থভাবেই করতে হয়। শোনো, আমার একটি শ্যালিকা আছে। অসবর্ণ বিয়েতে আঁতকে উঠবে, আশা করি এরকম নীরেট তুমি নও। মেয়েটি ভালো—এম-এ পাস, একটা স্কুলে অ্যাসিস্ট্যান্ট্ হেডমিস্ট্রেস। দেখতেও খারাপ নয়।'

'এঁর জন্যে অনেক সুপাত্র জুটতে পারে। আমি কেন ?'

'তোমাকেও আমার কুপাত্র মনে হয়নি।'—দাশগুপ্তর স্বরে আগ্রহ ফুটে বেরুল: 'রিয়্যালি মুখার্জি—একদিন আলাপ করো না মেয়েটির সঙ্গে!'

বাসুদেব চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বললে, 'দাশগুপ্ত, ঠাট্টা নয়। একটা সত্যি কথা বলি। দ্যাট্ চ্যাপ্টার ইজ্ সীল্ড!'

'তার মানে ?'

'বিয়ে করবার কথা আমিও ভেবেছিলুম।'

'তা হলে আটকাচ্ছে কিসে ?'

'দেখলুম, হেরে গেছি। সারাজীবনেও সে গ্লানি আমি ভুলতে পারব না।'

'মুখার্জি!'—দাশগুপ্ত আশ্চর্য হল: 'একটা গল্পের মতো শোনাচ্ছে যে!'

'গল্প তো আকাশ থেকে নামে না দাশগুপ্ত, জীবন থেকেই তৈরী হয়।'

দাশগুপ্ত কী বলতে যাচ্ছিল, ওপাশের টেবিলে টেলিফোন আওয়াজ তুলল। একজন রিসিভার তুলে ডাকলেন, 'বাসুদেব—তোমার!'

বাসুদেব এগিয়ে গেল টেলিফোন ধরতে।

'বাসুদেব মুখার্জি বলছি।'

'আমি সুমিত্রা।'

'মাথার মধ্যে একবার ছোট্ট একটা ঢেউ দুলল বাসুদেবের।

'হঠাৎ মনে পড়ল কেন ?'

'সেই রিভিউটার জন্যে ধন্যবাদ জানাব।'

'ঘুমুচ্ছিলে নাকি এতদিন ? সে রিভিউ তো বেরিয়ে গেছে প্রায় এক মাস আগে!'

'আমি বম্বে গিয়েছিলুম তিন সপ্তাহের জন্যে। ফিরে আসবার পরে ওরাই কাটিংটা দেখালে। পুরো খুশি হয়েছে মনে হল না।'

'কেন, আমি তো একবারও বলিনি যে বাংলা-না-জানা খাঁটি বাঙালীর মেয়েরা টেগোরকে অবলাইজ করছে!'

'না-না, মেয়েদের সম্পর্কে তুমি কখনো আন্‌শিভালরাস নও। আসলে তোমার প্রশংসাটা আমার ওপরেই একটু বেশি—'

'ওটা তোমার পাওনা।'—বাসুদেব বাধা দিলে।

'তা নয়, বাসুদেব।'—সুমিত্রা খিলখিল করে হেসে উঠল: 'সন্দেহ হচ্ছে এখনো

বোধ হয় এক-আধটু ভালোবাসো আমাকে। সেই বয়েসটাকে ভুলতে পারোনি।'

'কী হচ্ছে সুমিত্রা? খবরের কাগজের লাইন না এটা?'

'নাঃ, তোমাকে আর মানুষ করা গেল না—' সুমিত্রার হাসি থামল না: 'তারপর সেই মেয়েটির খবর কী? হাল ছাড়োনি তো এখনো? রাজী যদি না হতে চায়, রাজী করিয়ে ফেলো। শোনো বাসু, চানস একবার হারালে—'

'ওসব কথা পরে হবে সুমিত্রা। এখন ব্যস্ত আছি একটু। আচ্ছা—'

বাসুদেব লাইন ছেড়ে দিলে।

দাশগুপ্ত তখনো বসেছিল। ফিরে এসে বাসুদেব ক্যামেরাটা তুলে নিলে টেবিল থেকে।

দাশগুপ্ত বলেন, 'কী হল, বেরুচ্ছ?'

'হাঁ, ছুটি নেব আজ। শরীরটাই ভালো নেই।'

পথে-পথেই ফিরল সারাটা দিন। কোথাও ভালো লাগছে না—কোথাও নিজের উদ্‌ভ্রান্ত ভাবনার কাছ থেকে নিষ্কৃতি নেই।

কোনো দরকার ছিল না। নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ আটতিরিশটা বছর পার করে দিয়ে—প্রায় অচেনা একটি দুর্বোধ্য মেয়ের কাছে এইভাবে নির্লজ্জের মতো ভিখারী সাজবার কোনো দরকার ছিল না। দুঃখের চাইতেও লজ্জা বেশি। দীপার কাছে, সকলের কাছে সে ছোট হয়ে গেল—এই গ্লানিটাই কোনোমতে ভোলা যাচ্ছে না।'

বাড়ি ফিরল সন্ধ্যায়। আলো নিবিয়ে নিজের ঘরে বসে রইল চুপ করে।

সুমিত্রা বলছিল, 'রাজী নয়, রাজী করিয়ে ফেলো। সুযোগ একবার হারালে—'

দাবি করতে পারত বাসুদেব। দাবি জীবনের কাছে করা যায়, জীবিতের কাছে করা যায়। কিন্তু মৃত্যু যেখানে পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে, মৃতকে নিয়ে যেখানে লোহার বাসর, সেখানে কোথায় পথ খুঁজে পাবে সে? বেঁচে থেকে যে ভালো-মন্দের সীমায় বারে বারে সাধারণ মানুষ হয়ে আসত, মৃত্যু তাকে দিয়েছে জ্যোতির্ব্যাপ্তি; তার সঙ্গে প্রতিযোগিতার কল্পনাই যে করা চলে না।

দীপা ঘরে এল। চমকে উঠল একবার।

'এ কি দাদা—অন্ধকারে বসে যে!'

'এমনিই।'

'জেলে দিই আলোটা?'

'নাঃ, থাক।'

দীপা আর কথা বলল না। দাদাকে তেমনি করে বসে থাকতে দিয়েই চলে গেল ঘর ছেড়ে।

আজ এই অন্ধকারটাই ভালো—বাসুদেব ভাবল। শুধু আজই নয়। এইরকম অন্ধকার তার আরো অনেকদিন ধরে দরকার হবে, যে অন্ধকার আরো নিবিড় হলে নিজের লজ্জিত মুখটা কেউ দেখতে পাবে না, যে অন্ধকার গভীরতর হলে নিজের পরাজিত মনটাকে নিজেও দেখতে পায় না কেউ।

শুধু একটা ছবি ভাসছিল মনের সামনে—মিলেসের সেই কাব্য-সুরভিত অপূর্ব

ছবিটি ঃ 'ওফেলিয়া'। পুষ্পিত জলাশয়ের ভেতরে শীতের পদ্মের মতো একটি মৃত মুখ। সেই মুখ অর্চনার সঙ্গে আজ একাকার হয়ে যাচ্ছিল বার বার।

॥ পনেরো ॥

আর ভাবনা নেই অর্চনার—আর না।

অগ্নিপরীক্ষাও শেষ হয়ে গেছে তার। যে ছবিটা নিয়ে আসবার লোভ সামলাতে পারেনি, লুকিয়ে লুকিয়ে নিজে বারে বারে দেখেছে, ড্রয়ার থেকে বের করে অসংখ্য টুকরোয় ছিঁড়েছে নিজের সেই নির্লজ্জ বিকারকে।

'মারং সসেনং—'

এই প্রলোভনের প্রয়োজন ছিল—নইলে নিজের সত্য যাচাই হত কী দিয়ে? একবার ভুলের মুখে পা না বাড়ালে কেমন করে সতর্ক হত সে?

রাত্রিদিন তার জপ চলে এখন। হেমন্ত—হেমন্ত—হেমন্ত। তার বিশুদ্ধ শোকের মন্দিরে চিরপ্রতিষ্ঠিত সেই একতম পুরুষ। তার আকাশে ধ্রুবনক্ষত্র। আর কেউ আসবে না তার মন্দিরে, তার নক্ষত্রটির ওপরে কোনো মেঘের অশুচি ছায়া পড়বে না আর।

সুলতা এসে বললেন, 'নাওয়া-খাওয়া বন্ধ করলি নাকি অর্চি? আবার অসুখে পড়তে চাস?'

'না মা, আর আমার কিছু হবে না।'

'ভালো।'—মুখ ঘুরিয়ে চলে গেলেন সুলতা।

অর্চনার এখন ভয় করে সুলতাকে দেখলে। অদ্ভুত কঠিন আর গম্ভীর হয়ে গেছেন তিনি। এমন কি কাল যখন গুরুদেব এলেন, একটা শুকনো প্রণাম করে সরে গেলেন সামনে থেকে, কী যেন বললেন গুরুদেব—তার জবাবটা পর্যন্ত দিলেন না।

কারণ শেষ চেষ্টা তিনিই করেছিলেন। মারের সবচাইতে সাংঘাতিক মূর্তিটা এসেছিল তাঁরই রূপ ধরে। সেই তিন দিন আগের ভয়ঙ্কর রাতটা। সেই দুঃস্বপ্ন ভুলতে পারছে না অর্চনা। আর ভেবেছে, আগে দীক্ষাটা হয়ে যাক, তারপর সে আর তারাকান্ত এই বাড়ি ছেড়ে কিছুদিনের জন্যে চলে যাবে তীর্থে তীর্থে—এখানকার সব ধুলো, সব মলিনতা মুছে ফেলে নির্মল নিষ্পাপ হয়ে ফিরে আসবে।

কিন্তু তিনদিন আগের সেই রাত্রিটায়!

শুতে যাচ্ছিলেন তারাকান্ত। সুলতা সোজাসুজি এসে বললেন, 'কথা ছিল একটা।'

তাঁর ভঙ্গি দেখে তারাকান্ত আশ্চর্য হয়ে গেলেন ঃ 'কী কথা?'

স্বামীর দিকে চোখ রেখে পরিষ্কার ভাষায় সুলতা বললেন, 'গুরুদেবকে একটা টেলিগ্রাম করে দাও কাল সকালেই। আসবার দরকার নেই তাঁর।'

'তার মানে?'—আকাশ থেকে পড়লেন তারাকান্ত।

'জোর করে মেয়েটাকে গলাটিপে মারতে চাও নাকি তুমি?'—ঝনঝন করে বেজে

উঠল সুলতার স্বর : 'মনের দিকে চেয়ে দেখবে না—সুখ-দুঃখের কথা ভাববে না, জোর করে একটা হাড়-কাঠের ভেতর গুঁজে দিলেই হল ?'

তারাকান্ত বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ।

'পাগল হয়ে গেলে নাকি তুমি ?'

'পাগল আমি হইনি, আমরা দুজনেই পাগল ছিলুম। গায়ের জোরে অর্চিকে সন্নিসিনী বানিয়ে লাভ কী! একটা অনাথা মেয়েকে কষ্ট দিলে তো হেমন্তর আত্মা শান্তি পাবে না। দীক্ষা-টীক্ষা এখন থাক।'

'তার মানে ?'

'মানেটা খুব সোজা। ভালো সম্বন্ধ পেয়েছি আমি, অর্চির বিয়ে দাও।'

'কী বললে !'—বিছানা ছেড়ে সোজা দাঁড়িয়ে পড়লেন তারাকান্ত : 'কী বললে ?'

'খাঁটি সত্যি কথাটাই বলেছি।'

থর-থর করে কেঁপে উঠলেন তারাকান্ত—যেন ভূমিকম্পের নাড়ায় তাঁর এতদিনের জীবনটা খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙে পড়ে যাচ্ছে—পায়ের তলায় এতটুকু মাটিও আর খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি।

'অর্চনা—' বার দুই খাবি খেলেন তারাকান্ত : 'তুমি বলছ অর্চনা বিয়ে করতে চায় ?'

'তোমার ভয়ে চায় না। চাইতেই ভুলে গেছে। কিন্তু পেটে না ধরলেও আমি ওর মা—ওর মুখ আমি দেখেছি।'

পাথর হয়ে কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে রইলেন তারাকান্ত। তারপর বুককাটা চিৎকার করে ডাকলেন : 'অর্চনা ?'

কিন্তু অমন করে ডাকবার দরকার ছিল না।

অর্চনা তখন ঠিক দরজার বাইরেই। সুলতাই জোর করে এনে সেখানে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন তাকে।

অর্চনা বাধা দেয়নি তখন—সে জানত, প্রতিবাদের সময় তার আসবে।

ঘরের ভেতরে সুলতার কথা শুনতে শুনতে মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করছিল তার। এই ভেবেছেন তিনি অর্চনা সম্পর্কে—এতদিন এইভাবে দেখবার পর! আজ তাঁর এই ভুল সম্পূর্ণ ভেঙে দিতে হবে অর্চনার।

তারাকান্তর ডাকে সে সোজা ঘরে এসে পা দিলে।

তীব্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে সুলতা বললেন, 'বল হতভাগী, সত্যি কথা বল! নিজের হাতে বিষ তুলে খাসনে—সারাটা জীবন জ্বলে মরবি। তোর ঠাকুরও তোকে বাঁচাতে পারবেন না!'

সুলতার দিকে চাইতে পারল না অর্চনা। তার কানে গমগম করে বেজে উঠল তারাকান্তর কান্নার মতো একটা অসহায় স্বর : 'বৌমা!'

বৌমা!

এই প্রথম—বারো বৎসর পরে এই প্রথম—তারাকান্ত তাকে বৌমা বলে ডাকলেন। কিন্তু কী ভয়ংকর সেই ডাক—কী অসহায় অথচ কী নির্ভুল তার দাবি! কয়েক সেকেণ্ড শক্ত হয়ে রইল অর্চনা, তারপরেই একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ল তারাকান্তর পায়ে।

'মা ভুল বুঝেছেন বাবা, মা সব ভুল বুঝেছেন।'

'অর্চি!'

'আমি গুরুদেবের কাছে দীক্ষা নিতেই চাই বাবা। আর কিছুই চাই না।'

কিছুক্ষণ ঘরে কারো একটা নিঃশ্বাস পর্যন্ত পড়ল না। তারপর:

'মর তুই!'—একটা কর্কশ শব্দ করলেন সুলতা। দাঁতে দাঁতে ঘষে বেরিয়ে চলে গেলেন।

এখন সব শান্তি। কাল গুরুদেব এসেছেন। সমস্ত বাড়িতে যেন নতুন একটা আশ্বাস আর বিশ্বাসের স্পর্শ অনুভব করছে অর্চনা। সুলতাকেও আর তার ভয় নেই। ভক্ত, শান্ত গুরুদেব বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন সব মেঘ সরে গেছে, সব কুয়াশা কেটে গেছে, সব অন্ধকার আলো হয়ে গেছে। একটা অন্ধকূপের মধ্যে ডুবে মরে যাচ্ছিল অর্চনা—সেই অপমৃত্যু থেকে কে যেন তাকে হাত বাড়িয়ে তুলে এনেছে তার আকাশ আর ধ্রুবতারাটির সামনে।

সব শান্তি আজ। এই যে ভোরের আলোয় শরতের নীল নির্মলতা দীপিত হয়ে উঠল, এই যে কাশের মাথায় মুকুল ধরেছে, কুঁড়িতে ভরে উঠেছে নীল ফুলের মঞ্জরী—এ সেই নীলকান্ত নীলমাধবেরই কান্তি। আজ হেমন্তর মৃত্যুদিন—তার সর্বত্যাগের দিন; হেমন্তর ধ্যান আজ মিশে যাবে শ্রীকৃষ্ণে—নদী মিশবে মহাসাগরে। তখন আর কোন্ আবিলতা এসে পঙ্কিল করবে নদীর জলকে?

আজ তার দীক্ষার দিন।

ছোট বাগানটিতে পায়চারি করতে করতে গান গাইছেন গুরুদেব। হাতে তালি দিচ্ছেন অল্প অল্প।

> 'ওঁ হরয়ে নমো কৃষ্ণ, গোবিন্দায় নমো—
> যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমো—'

বেশ সুরটা। অর্চনা কান পেতে শুনতে লাগল।

> 'নমো কৃষ্ণায়—বাসুদেবায়—'

বাসুদেবায়! আবার সেই নাম!

অর্চনা ছুটে পালালো সেখান থেকে। এই মানুষটা কি কিছুতেই তাকে মুক্তি দেবে না? দেবতার আড়াল থেকেও উঁকি মারবে তার মুখ?

তবু—তবু দোতলায় পালিয়ে এসেও ভুলতে পারল না। তার সব ধ্যান—সব মন্ত্রকে উজানে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মনে আসতে লাগল: আজ—আজই বাসুদেবের জন্মদিন। এই দিনেই শেষ বোঝাপড়া করে নেবার জন্যে তাকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিল বাসুদেব।

যোগাযোগ—কী আশ্চর্য যোগাযোগ! একটি মৃত্যুর সীমান্তে আর একটি নতুন জন্মের পদক্ষেপ। আজ বাসুদেব চন্দন পরবে কপালে, পরবে নতুন কাপড়, মাকে প্রণাম করবে, দীপা এসে প্রণাম করবে তাকে। তখন কেমন দেখাবে বাসুদেবকে? সেই উজ্জ্বল দীর্ঘ মানুষটি—

ছি-ছি-ছি, আর ওসব ভাবনা কেন? কদিনের সেই বিকারের ঘোর—রক্তের ভেতরে সেই উত্তাল চঞ্চলতা—সেই আত্মবিস্মৃতি সব আজ কুয়াশার মতো মিলিয়ে যাক; মিলিয়ে

যাক নীল আকাশে, সোনার রোদে—জীবনের এই আবিল নদীটার মুক্তি হোক নীলকান্তি সমুদ্রে। হেমন্তই তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাক।

ছবির সামনে ধ্যানে বসল অর্চনা।

'আজ আমার মুক্তি। শক্তি দাও তুমি—শক্তি দাও—'

তবু আরো তিন ঘণ্টা পরে সব ব্যর্থ হয়ে গেল।

সুলতাই শুধু দীক্ষা নিতে চাননি—অসহযোগ করেছেন তিনি। সেজন্যে চিন্তিত নন তারাকান্ত। মহামহোপাধ্যায় বংশের মেয়ে হয়েও চিরদিন বেসুরো গেয়েছেন সুলতা—তারাকান্ত জানেন, সব জিনিস সকলের হয় না। ডাক যার আসে, মনের ভেতর থেকেই আসে; যার আসে না, মন্ত্র লাভের ভাগ্যও তার অদৃষ্টে নেই।

সুলতা শুধু একবার বলেছিলেন, 'তোমাদের যা খুশি করো, কিন্তু এর পরে বাড়িতে দিনরাত যেন সংকীর্তনের আসর বসিয়ো না। অতখানি কিন্তু আমি পেরে উঠব না।'

তারাকান্ত বিরস স্বরে বলেছিলেন, 'তোমায় অত ভাবতে হবে না—মনে মনে ডাকলেও ঠাকুর সাড়া দেন।'

'খুব ভালো।'

পুজো শেষ করে ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল অর্চনা। পিঠ বেয়ে নেমে এসেছে খোলা চুল, কোমর ছাপিয়ে ভেঙে পড়েছে গুচ্ছে গুচ্ছে। পরনে কালোপাড় তসরের শাড়ী একখানা, কপালে চন্দনের ফোঁটা। কিছুক্ষণ মুগ্ধ ভাবে চেয়ে রইলেন তারাকান্ত।

'তোমাকে দেখে আজ বড়ো ভালো লাগছে, মা।'

নিঃশব্দে স্নিগ্ধ হাসি হাসল অর্চনা।

'আমরা মা-ছেলেতেই তা হলে মন্ত্র নিচ্ছি আজকে?'

'হাঁ, বাবা।'

তখনও সব ঠিক ছিল। দীক্ষার আয়োজন সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। সুলতা কোথায় সরে গিয়েছিলেন—এই দৃশ্য দেখবার রুচি তাঁর ছিল না। আর আসনে বসে অপেক্ষা করছিলেন গুরুদেব।

এমন সময় এসে দাঁড়ালো পরামানিক।

তারাকান্ত সস্নেহে ডাকলেন: 'মা এসো, চুলটা কেটে নাও এবার!'

হঠাৎ একটা ধাক্কা লাগল যেন। মুগ্ধ আবেশের মধ্য থেকে যেন রূঢ়ভাবে জেগে উঠল অর্চনা। ঘন নিবিড় গভীর কালো তার চুল—দীপা মুগ্ধ হয়েছিল দেখে, ইরা নীরা এই চুলের জন্যে তাকে ঈর্ষা করত।

'কেন বাবা, চুল কাটব কেন?'

কোমল ভাবে তারাকান্ত বললেন, 'এসব চুল-টুল রাখা বিলাসিতা মা—বিধবার পক্ষে কেন আর এসব—'

কথাটা আর শুনতে পেলো না অর্চনা। বিধবা—ওই শব্দটা তাঁর মুখে এই মুহূর্তে কী বীভৎস আর অদ্ভুত শোনালো! যা সে বেছে নিয়েছিল, আজ তারাকান্ত

যখন তা জোর করে তার ওপর চাপিয়ে দিতে চাইলেন, তখন তা কী ভয়ঙ্কর শোনালো!

নিবে গেল নীল আকাশের রঙ—সব বিষিয়ে গেল। আর একটা কঠিন কুটিল সত্য আবার স্পষ্ট হয়ে উঠল অর্চনার কাছে।

এ তো হেমন্তর জন্যে শোক নয়! এ তো অর্চনাকে হত্যা করা—তার মধ্য দিয়ে হেমন্তর 'মমি'কে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা! শোক নয়—স্মৃতি নয়—এ এক নিষ্ঠুর আনন্দ তারাকান্তর। তিলে তিলে একটা জীবিত মানুষকে বধ করবার চক্রান্ত—তাকে প্রেতগ্রস্ত করে রাখবার স্বপ্ন।

তাই ব্যক্তি অর্চনার শেষ চিহ্নটুকুও আজ মুছে দেবেন তিনি। হেমন্তর ভালোবাসা তো এ জিনিস ছিল না। এই স্বার্থপরতা সে কি কল্পনাও করতে পারত!

ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মতো উঠে দাঁড়াল অর্চনা।

'মাপ করবেন বাবা, দীক্ষা আমি নিতে পারব না।'

'বৌমা!'

'আমি পারব না বাবা—', টলে পড়ে যাওয়ার উপক্রম করল অর্চনা। কোথা থেকে ছুটে এসে দু হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলেন সুলতা।

গুরুদেব বিব্রত হয়ে বললেন, 'তা হলে বরং দীক্ষা আজ থাকুক। কাল-পরশুর মধ্যে আর একটা কোনো শুভদিন দেখে—'

সুলতা শক্ত গলায় বললেন, 'তার আর দরকার নেই।'

'তার মানে? দীক্ষা হবে না?'

'না।'—তেমনি কঠিন স্বরে সুলতা বললেন, 'ওর আসল দীক্ষা কোথায় হবে সে আমি জানি।'

শুধু নিঃশব্দে কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থাকলেন তারাকান্ত। একটা কথা বললেন না আর, একটা প্রশ্নও জিজ্ঞেস করলেন না। মন্ত্র সকলের জন্যে নয়। সকলের বুকের ভেতরই তার ডাক এসে পেঁছোয় না।

মাথা নামিয়ে তারাকান্ত গুরুদেবকে বললেন, 'আজ থাক গুরুদেব। আপনি বরং ঘরে গিয়েই বিশ্রাম করুন।'

ক্লান্ত পায়ে, যেন পাহাড়ের শেষ চূড়োয় উঠছেন—এইভাবে সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেতে লাগলেন তারাকান্ত। অর্চনাকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে নিয়ে সুলতা বললেন, 'আর তুই পাগলামি করিসনি অর্চি—আয় আমার সঙ্গে।'

স্নায়ু-ছেঁড়া অবসাদে সন্ধ্যার পদ্মের মতো এখন এক-একটি করে সব অনুভূতিগুলো বুজে যাচ্ছিল অর্চনার। তারই মধ্যে মনে পড়ল—পৃথিবীর ওপর জীবনাতীত সেই রহস্যের আবরণটা নেমে এলে একটা ছবি মুছে গিয়ে আর একটা ফুটে ওঠে, শোনা যায় হেমন্তর কৌতুকভরা মিষ্টি গলার আওয়াজঃ 'অর্চনা, এই তো আমি—এই আমি।'

আজ বাসুদেবের জন্মদিন॥

স্রোতের সঙ্গে

"The stream and the broken pottery: what was any art but an effort to make a steath, mold in which to imprison for a moment the shining, elusive element which is life itself—life hurrying past us and running away, too strong to stop, too sweet to lose?"

—Willa Cather

॥ এক ॥

শেষ রাত্রির বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল, মাথার কাছে খোলা জানলা দিয়ে সেই বাতাস এসে মশারি দোলাচ্ছিল, মশারির ভেতর ঘামের গন্ধভরা গুমোটটা স্নিগ্ধ হয়ে গিয়েছিল, আর তার ফলে ঘুমন্ত প্রবীরকুমার ব্যানার্জি চমৎকার ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন দেখছিল একটা।

স্বপ্নটা দেখছিল এই জন্যে যে, আপাতত একজোড়া জুতোর অত্যন্ত দরকার ছিল তার। সম্প্রতি যে জুতোজোড়া তার পাদপদ্ম আলো করছে—ভাঙা টাইমপীস থেকে খালি শিশি-বোতল এবং পুরনো জুতো পর্যন্ত কিনতে যারা দরজায় দরজায় হাঁক দিয়ে বেড়ায়—ছ' মাস আগেই ওই জোড়াকে তাদের হাতে অক্লেশে সমর্পণ করতে পারত সে। কিন্তু শ্রীপ্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায় সংকল্পে অটল। কাঁটা উঠে পা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাক, সেলাই করতে গিয়ে মুচি হতাশ নয়নে তাকিয়ে থাকুক, আরো মাসতিনেক ওই জুতোতেই চালাতে হবে তাকে। অর্থাৎ ওই জুতোয় আরোহণ করেই পার হতে হবে ঘনঘোর বর্ষার জলধারা, তরল কাদার রোমাঞ্চকর প্রলেপ।

মুশকিল হল, রবারের জুতো একেবারেই পরতে পারে না সে। মিনিট পাঁচেক পায়ে রাখলেই অদ্ভুত একটা যন্ত্রণা শুরু হতে থাকে মাথায়, মেঘের মতো ভার নামতে থাকে কপালে। ডাক্তার বলেন, অ্যালার্জি। ওই একটা চমৎকার শব্দ আমদানি করেছেন ডাক্তারেরা—যখন কোনো কিছুর হদিস মেলে না, তখন ওই পরম বাক্য : 'অ্যালার্জি'।

মোটের ওপর, প্রবীরের একজোড়া জুতো দরকার এবং মাসতিনেক আগে সেটা কেনা যাচ্ছে না। ফলে শোবার আগে গোড়ালি দুটোয় হাত বুলিয়ে দেখছিল সবটা বেশ চষা মাঠের মতো আর এখানে-ওখানে চিনচিনে ব্যথার বিদ্যুৎ। শেষরাত্রে বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে মশারির ভেতর খানিকটা স্নিগ্ধ আমেজ ছড়িয়ে দিলে, অতএব ইচ্ছাপূরণের স্বপ্নটা বেশ নিবিড় হয়ে উঠল।

তখন প্রবীরের পায়ে ভাইসরয় কিংবা অ্যাম্বাস্যাডার জাতীয় নামের একজোড়া অতি কুলীন জুতো। সেইটে পায়ে দিয়ে সেই অতীব মসৃণ কোনো পথ বেয়ে (যে রকম পথ মাত্র স্বপ্নেই মেলে, যাদবপুর থেকে চিড়িয়ার মোড় পর্যন্ত যার অস্তিত্ব কোথাও নেই) সে পরম সুখে হেঁটে যাচ্ছিল। তার গান গাইতে ইচ্ছে করছিল এবং মনে হচ্ছিল এরকম জুতো পায়ে থাকলে তিন মাসে পৃথিবী পরিভ্রমণ করে আসা যায়।

স্বপ্নটা নিবিড় হচ্ছিল, স্বাপ্নিক পথের দু'ধারে বসন্তকালের পাখিরা ডাকছিল-টাকছিল, প্রবীর যেন কোত্থেকে এক ঠোঙা গরম চীনাবাদামও পেয়ে গিয়েছিল। সুখের আবেশটা আর একটু ঘন হলে তার পাশে একটি নায়িকার আবির্ভাবও অসম্ভব ছিল না। কিন্তু এর মধ্যে রাত ভোর হল, বাইরের বুড়ো নিমগাছে খ্যা-খ্যা করে বেয়াড়া গলায় কাক ডাকল, আর মা ঘরে এলেন।

মা'র সারারাত ঘুম হয় নি। ছেলের সামনে পারেন না—তাই লুকিয়ে লুকিয়ে অনেকবার কেঁদেছেন। আর পারা গেল না, ভোরের আকাশ সাদা হল, মা আস্তে আস্তে

ভেজানো দরজা ঠেলে ছেলের ঘরে এলেন।

'ভুলু!'

প্রবীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকনাম। এখনকার চোয়ালভাঙা কড়া চেহারা নয়, ছেলেবেলায় ফর্সা গোলগাল ছিল দেখতে, আর জন্মকালীন পোশাক পরে সারা গায়ে ধুলো মেখে ঘুরে বেড়াত। দিদিমা নাম দিয়েছিলেন ভোলানাথ। সেই থেকেই ভুলু।

মা আবার ডাকলেন, 'ভুলু!'

মশারির মধ্যে নড়ে উঠল প্রবীর। স্বপ্ন বিলীন হল হাওয়ায়, ভাইসরয় কিংবা ফিল্ড-মার্শাল জুতো উপযুক্ত পায়ের উদ্দেশে উধাও হয়ে গেল, বাঁ-পায়ের গোড়ালিতে চিনচিন করে উঠল ব্যথার বিদ্যুৎ। ময়লা মশারি আর ঘামের গন্ধভরা বিছানায় প্রবীর চোখ মেলল।

ঘর ছায়া-ছায়া। মা দাঁড়িয়ে। মশারির আবরণ থেকে কেমন সুন্দর মনে হয় তাঁকে। মা'র রোগা শরীরটাকে আরো শীর্ণ, আরো অস্পষ্ট দেখাচ্ছে এখন। স্বপ্নের মতোই মাও যে-কোনো সময় ছায়ার ভেতরে হারিয়ে যেতে পারেন। মমতার একটা ছোঁয়া লাগল চকিতের জন্যে।

মা খুব ভীরুর মতো ডাকলেন, 'তোর ঘুম ভেঙেছে, ভুলু?'

'ভেঙেছে।'

'চা-টা খেয়ে—' সংকোচে মা একবার থামলেন : 'একটু সকাল-সকালই যাবি নাকি মুরারিবাবুর কাছে?'

সব বিস্বাদ হয়ে গেল, মাথাটা জ্বালা করে উঠল। বিছানার পাশে, খোলা জানলার পাল্লার ওপর বসে সেই সময় একটা কাক চাঁচা গলায় ডেকে উঠল খ্যা-খ্যা করে।

এক বন্ধুর কাছ থেকে একসময় দিনকয়েক যোগব্যায়ামের তালিম নিয়েছিল প্রবীর। মা'র কথা শোনবার সঙ্গে সঙ্গে শক্ত হয়ে গেল শরীরটা—শবাসনের ভঙ্গিতে হাত-পা মেলে দিয়ে মরা ব্যাঙের মতো চিৎ হয়ে রইল কয়েক সেকেণ্ড। তারপর তড়াক করে উঠে বসল বিছানার ওপর।

মা একটু পেছিয়ে দাঁড়ালেন।

মশারির বাইরে এসে প্রবীর মা'র দিকে তাকালো। ঘর ছায়া-ছায়া। তবু মা'র শীর্ণ সাদা মুখটাকে দেখা যায়, কঙ্কালের মতো লাগে। মা'র ওপর মিথ্যেই রাগ করা—সবচেয়ে নিরুপায়কে আরো বেশি কষ্ট দেওয়া। সমস্ত জীবন একটানা দুঃখই পেয়েছেন। বাবার ধারণা ছিল তিনিই শেষ গ্র্যাজুয়েটদের একজন—যাদের পরে আর কেউ ইংরিজি শেখেনি। অফিসের নতুন ছেলেদের লেখায় ভুল ইংরিজি—আর্টিকল কিংবা প্রিপোজিশনের খুঁত—এইসব আবিষ্কার করতে এবং তা নিয়ে বিদ্রূপ করতে একটা হিংস্র উল্লাস ছিল তাঁর। তিনি নিজেকে এম-এ, পি-এইচ-ডি ইত্যাদির চাইতেও অনেক বেশি ইন্টেলেকচুয়াল বলে জানতেন, আর—

আর মহাকালী পাঠশালায় ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়া মাকে সম্পূর্ণ ইডিয়ট ভাবতেন। 'তোমার মতো গাধাকে নিয়ে সংসার করা—' এইরকম সিদ্ধান্ত প্রায়ই শোনা যেত তাঁর মুখ থেকে।

মা শান্ত, মা সরল, মা ঝগড়া করতে জানতেন না। খাওয়া চলে না, এমনি এক

সংসার থেকে এসেছিলেন। কাজেই নিঃশব্দে মেনে নিয়েছেন বাবার সিদ্ধান্ত। গাধার মতো খেটেছেন, গাল খেয়েছেন, ছেলেমেয়েদের অবজ্ঞা কুড়িয়েছেন। না, মা'র কোনো ভূমিকা নেই, কিছুই করবার ছিল না তাঁর। যা কিছু করার তা বাবাই করে গেছেন, কারণ প্রতুল নিচের ক্লাসে বার-দুই ফার্স্ট হওয়ার পরে তাঁর বিশ্বাস জন্মেছিল, এই ছেলে ভবিষ্যতে চন্দ্রশেখর বেঙ্কটরামনকে ছাড়িয়ে যাবে।

তারপর—

তারপর এখন যেতে হবে মুরারি হালদারের কাছে। যে লোকটার নাম শুনলেও সকালবেলাটা অশুচি হয়ে যায়।

আবার ছায়ার ভেতর থেকে মা'র গলা ভেসে এল।

'আমি জানি বাবা, তোর কত খারাপ লাগছে। কিন্তু হাজার হোক টুলু তো তোর আপন ভাই।'

টুলু প্রতুলের ডাকনাম। 'টোলানাথ' থেকে নিষ্পন্ন নয়—ভুলুর অনুকার শব্দ। আপন ভাই নিঃসন্দেহ! বাবা বিদ্রূপ করে বলতেন, 'ভুলুর মগজে কিচ্ছু নেই, শেষে পাস-কোর্সে বি-এ পাস করল। টুলুকে আমি এশিয়ার বেস্ট স্কলার করে ছাড়ব।'

বেস্ট স্কলারের নমুনা মৃত্যুর আগেই বাবা কিছু দেখে গিয়েছিলেন। বেঁচে থাকলে আজ পূর্ণ বিকাশ দেখতে পেতেন তার। নিষ্ঠুর কৌতুকের মতো কী একটা নিজের ভেতরে অনুভব করল প্রবীর।

মা আবার বললেন, 'সেইজন্যেই বলছিলুম, একটু তাড়াতাড়ি মুরারিবাবুর কাছে গেলে—'

মা'র ওপর রাগ করা উচিত নয়, তবু বিরক্তিটা ঠেকানো গেল না কোনোমতে।

'তোমার আমার গরজে তো হবে না মা। ওসব বড়লোক ন'টার আগে ঘুম থেকে ওঠে না।'

'কী বলছিস তুই—ন'টা পর্যন্ত ঘুমুতে পারে কেউ?'

'বড়লোকের অসাধ্য কাজ নেই মা, সব পারে।'

ছেলে ঠাট্টা করছে কিনা, মা বুঝতে চাইলেন একবার। তারপরে আবার তাঁর চোখে জল এল।

'তা হোক বাবা, তুই একটু তাড়াতাড়িই যা।'

'কিছু ব্যস্ত হয়ো না মা, বাজারটা সেরে দিয়ে তারপর যাব।'

'বাজার আজ না হলেও চলবে বাবা।' মা'র গলা কাতর হয়ে এল: 'ছেলেটা থানার হাজতে আটকে রইল, হয়তো ওকে মারধোর করছে—'

নাঃ, অসম্ভব, মা'র ওপরে সহানুভূতি জাগিয়ে রাখা অসম্ভব। শুধু জৈবিক অন্ধ স্নেহ একটা। মা কি জীবনে এক মুহূর্তের জন্যেও কঠিন হতে পারেন না কখনো? একটা নির্জীব মেয়েলিপনার মধ্যে তলিয়ে রইলেন চিরকাল, গাধার মতো সংসারের বোঝা টানলেন, নিস্তেজ চোখ মেলে বাবার ইংরিজি-বাংলা-মেশানো বাছা বাছা গালাগালগুলো আত্মসাৎ করলেন, আর ছেলেমেয়েদের অবজ্ঞা কুড়িয়ে গেলেন। একবারও কি মাথা তুলে, মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারতেন না? তা হলে—তা হলে হয়তো সব অন্যরকম হতে পারত। অন্তত ঠিক এরকমটা হতে পারত না।

তক্তপোশ থেকে নেমে চটিটা পায়ে গলাতে গলাতে তীক্ষ্ন অধৈর্য স্বরে প্রবীর বললে, 'যাচ্ছি—যাচ্ছি। গিয়ে না হয় দশটা পর্যন্তই বসে থাকব হালদারের দারোয়ানের পাশে।'

নির্জীব মেয়েলী মা'র কান্না এবার আর রাশ মানল না। টপ করে গাল বেয়ে একটা ফোঁটা গড়িয়ে পড়ল।

ধরাগলায় মা বললেন, 'তুই বিরক্ত হলে কী করব বল্—টুলু তো আমার পেটের ছেলে।'

'হুঃ—কুলতিলক!' আরো কতগুলো বীভৎস কথা এগিয়ে আসছিল ঠোঁটে, প্রবীর সামলে নিলে। বললে, 'যাব মুরারিবাবুর কাছে, যাচ্ছি। কিন্তু আরো দিনকতক পুলিসের হেপাজতে থাকলে তোমার ছেলের ক্ষতি হবে না মা—বরং ওর স্বাস্থ্যের জন্যেই ওটা দরকার।'

মা চুপ।

'একটু চা-টা দেবে, না এইভাবেই দৌড়োব?'

ব্যস্ত হয়ে মা বললেন, 'চা দিচ্ছি, তুই মুখটুখ ধুয়ে নে।'

অতএব ভোরের স্বপ্নে পাওয়া জুতো নয়, যে জুতোজোড়াকে ছ' মাস আগে অনায়াসে বিদায় দেওয়া চলত, সেইটে পায়ে পরে, গোড়ালিতে কয়েকবার চিনচিনে ব্যথা অনুভব করতে করতে এবং কোনো এক ফাঁকে মুচিকে দিয়ে কয়েকটা উঠতি-গজাল ঠুকে নিতে হবে, এই কথা ভাবতে ভাবতে বেলা সাতটা নাগাদ মুরারি হালদারের বাড়ির দিকে রওনা হল প্রবীর।

কারণ আর কিছু নয়—থানার ও-সি গৌরবাবুর সঙ্গে মুরারি হালদারের অত্যন্ত খাতির আছে। তিনি একটু বলে দিলে ছেলেটা হয়তো ছাড়ান পেয়ে যেতে পারে। আর কিছু না হোক, পুলিসের ঠ্যাঙানি বন্ধ হতে পারে অন্তত।

এই ঠ্যাঙানি যে তার সম্পূর্ণ প্রাপ্য, এ ব্যাপারে কিছুমাত্র সংশয় নেই প্রবীরের। আজ তিন বছর ধরে রিহার্সাল দেবার পরে প্রতুল এখন পাড়ার বিশিষ্ট মস্তান। এশিয়ার ব্রাইটেস্ট স্কলার হায়ার সেকেণ্ডারী আর দেয় নি, ফীজের টাকা নিয়ে দিন কয়েকের জন্যে উধাও হয়ে গিয়েছিল। সেইবারে বাবার প্রথম স্ট্রোক।

দ্বিতীয় স্ট্রোক একটি বালিকা-ঘটিত ব্যাপারে। কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছ থেকে ছুরির খোঁচা খেয়ে প্রতুল হাসপাতালে গিয়েছিল। বাবা সে স্ট্রোক আর সামলাতে পারেন নি। কারণ সে ভদ্রলোক এশিয়ার উঠতি বেস্ট্ মস্তানের জন্যে মনে মনে আদৌ তৈরি ছিলেন না খুব সম্ভব।

তারপর থেকে টুলুর বিবিধ কীর্তির ইতিহাস। মারামারি তো আছেই, কয়েকটা বোমাবাজির সঙ্গেও সে জড়িত ছিল—এইরকম জনশ্রুতি। কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক, এতদিন পুলিসের নজর পড়ে নি তার ওপর। কিন্তু যে সিগারেটের দোকানটার সামনে টুলু এবং তার ক'টি বন্ধুর আস্তানা ছিল, যেখানে দাঁড়িয়ে অদূরের কোনো মহিলা কলেজের ছাত্রীদের তারা নিপুণভাবে পর্যবেক্ষণ করত—কী কারণে সেই সিগারেটওলার ওপরেই খেপে গেল তারা। ফলে দোকান লুট, সোডার বোতল ছোঁড়াছুঁড়ি, তারপর টুলু এবং তার দু-একটি বন্ধুর হাজত-যাত্রা।

আর এরপরেই মা'র সমস্ত রাত ঘুম নেই। এর জন্যেই মা'র ছায়া-ছায়া শরীরটা আরো অস্পষ্ট। চুল রুক্ষ, চোখের দুধারে শুকনো জলের দাগ। অথচ এই টুলু মাকে কী বলত?

'ইউ শাট আপ! অয়েল ইয়োর ওন মেশিন!'

প্রবীর হয়তো চেঁচিয়ে উঠল: 'এই টুলু!'

দাদাকে কোনোদিন খুব ভক্তি করবার দরকার হয় নি প্রতুলের। কারণ বাবাই বাণী দিয়েছিলেন: 'ও পাস-কোর্সের বি-এ, ওর মগজে কিছু নেই।' সুতরাং দাদার কথায় কোনো জবাব না দিয়ে—তার স্কিন-টাইট ট্রাউজারের পকেটে হাত দিয়ে শিস টানতে-টানতেই হয়তো বেরিয়ে গেল সে।

চলতে চলতে প্রবীর ভাবল, অদ্ভুত! এই টুলুর জন্যেই মা কাল সারাটা দিন কেঁদেছেন, কাল রাতে ঘুমুতে পারেন নি; আর প্রবীর চলেছে মুরারি হালদারের কাছে, সকালবেলা যে লোকটার নাম করলেও দিনটা বিশ্রী হয়ে যায়!

মুরারি হালদার কী করবে?

থানার ও-সি গৌরবাবুর সঙ্গে খাতির আছে তার। অনুগ্রহ করে সে যদি একখানা চিঠি দেয়, তা হলে চিঠিটা নিয়ে প্রবীর থানায় দৌড়োবে। তারপর এশিয়ার বেস্ট্ স্কলার হয়তো ছাড়া পাবে, হয়তো দারোগা বলবেন, 'আচ্ছা ওকে আর পিটব না। আর যদি নিতান্তই ঠ্যাঙানোর দরকার পড়ে, একটু ধীরে-সুস্থে পেটাতে বলব।'

সকালের রোদ নরম। আকাশে হালকা হালকা মেঘ। দিনটা স্নিগ্ধ। যে-কোনো একটা স্বপ্নের পথ ধরে গাছের পাতার শব্দ শুনতে শুনতে এগিয়ে চলার মতো দিন।

কিন্তু তাকে যেতে হচ্ছে প্রতুলের জন্যে মুরারি হালদারের কাছে। আর বাঁ পায়ের গোড়ালিতে থেকে থেকে যন্ত্রণার চমক।

॥ দুই ॥

না—একটু ভুল হয়ে গিয়েছিল। বেলা দশটা পর্যন্ত ঘুমোন না মুরারি হালদার।

বাইরের ঘরে তাকে বসিয়ে চাকর বললে, 'একটু বসতে হবে, বাবু পুজোয় বসেছেন।'

এটা একটা খবর। প্রবীর ঠিক তৈরি ছিল না এজন্যে।

'পুজো করেন নাকি?'

'আগে করতেন না।' চাকরটা একটু চাপা হাসি হাসল কিনা ঠিক বোঝা গেল না: 'গত বছর হরিদ্বারে গিয়ে দীক্ষা নিয়ে এসেছেন। সেই থেকেই—'

'বুঝেছি।'

চাকর চলে গেল, মুরারি হালদারের বাইরের ঘরে পুজো শেষ হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল প্রবীর।

এ ভালো—এইসব পুজো-টুজো। মনপ্রাণ ঠাণ্ডা হয়, ইষ্টদেবতা খুশি থাকেন, নিজের কাজকারবারের দায়িত্ব শ্রীশ্রীঅন্তর্যামীর ওপরে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া চলে। আমি কে? নিমিত্ত মাত্র। তোমরা ভালোই বলো আর মন্দই বলো—আমি কিছুই করছি না। ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন—

এখন যদি হৃষীকেশ বলেন, ম্রারি, লেবারগুলো বড্ড জ্বালাচ্ছে—ওদের আর লাই দিয়ো না—দাও কারখানা বন্ধ করে—ম্রারি হালদার দিতে বাধ্য ; যদি শ্রীভগবান আদেশ করেন—দাও গুণ্ডা পাঠিয়ে ইউনিয়নের দু-চারটে পাণ্ডাকে ঠাণ্ডা করে—সে আদেশ না মেনে কী করতে পারেন তিনি ? যদি অন্তরে এই দৈববাণী মেলে যে কারখানার জন্যে যেসব কেমিক্যালের লাইসেন্স আছে—ভুয়ো হিসেব দাখিল করে সেগুলোকে চোরাবাজারে চালান করো—তা হলে সে নির্দেশ না মানবার আমি কে ? জানামি ধর্মং, জানাম্যধর্মং—কিন্তু কী করা যাবে, যথানিযুক্তোঽস্মি, তথা করোমি।

এবং গুরু।

এমন সেফ্‌টি-ভাল্‌ভ আর কোথায় পাওয়া যাবে ? বড় মামার কিঞ্চিৎ আধ্যাত্মিক মতিগতি ছিল, গুরুর চরণে শরণ নিয়েছিলেন তিনি। বলতেন, 'বুঝলি, গুরু করবার দারুণ সুবিধে আছে একটা। একবার শিষ্য হয়ে যা—তারপর তোর যা কিছু পাপতাপ তিনিই নেবেন হাত পেতে, তোর গায়ে আঁচটিও লাগবে না।'

তার মানে, গুরু ড্রেনেজ্ নাকি ? কিন্তু প্রশ্নটা মামাকে করা যায় নি তখন। মামা অত্যন্ত সিরিয়াস লোক। সেই মামা যখন একতলা স্টেট বাসের হাতল ধরে ঝুলে ঝুলে অফিসে আসবার সময় ধাক্কা খেয়ে সোজা চলে গেলেন চাকার তলায়, তখন তাঁর হয়ে গুরুই কেন চাপা পড়লেন না—এই জিজ্ঞাসাটা প্রবীরের মনে জেগেছিল। কিংবা সবই হয়তো গুরুর লীলা, তিনিই তাঁকে শর্টকাট করে নিয়ে চলে গেলেন দিব্যধামে।

অতএব ম্রারি হালদার গুরু করলেন এবং পুজোয় বসে গেছেন—আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই এতে। আর টাকা-পয়সা বেশি থাকলে পুজো-টুজোয় মন বেশ নিবিষ্ট হতে পারে, রেশন বাজার মাসের শেষ—এসবের নিতান্ত বাজে ভাবনাগুলো আর বিরক্ত করতে পারে না তখন।

আধ্যাত্মিক চিন্তার ঘোর কাটিয়ে প্রবীর সামনের টেবিল থেকে ইংরিজি কাগজটা টেনে নিলে। এই কাগজটা একসময়ে নির্লজ্জভাবে ইংরেজের তাঁবেদারি করত—এইটেই ছিল তখন ব্যুরোক্রেসির আদি এবং অকৃত্রিম কণ্ঠস্বর। স্বাধীনতা পাওয়ার পর এ হয়ে দাঁড়িয়েছে ইন্টেলেকচুয়ালদের মুখপত্র।

সম্প্রতি দেশের জন্যে কাগজটি অতি চিন্তিত। প্রায়ই নানারকম রোমহর্ষক সংবাদ পরিবেষণ করে যাচ্ছে। সত্যি-মিথ্যে যাচাই করবার দরকার নেই, পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই হৃৎপিণ্ড থমকে যায়। গোটা বাংলা দেশ এখন আদিগন্ত নরখাদকের লীলাভূমি, এ কাগজ তিনদিন পড়লেই সে ব্যাপারে আর সন্দেহ থাকে না।

কাগজটার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে একবার ভুরু কোঁচকালো প্রবীর। ইয়েলো জার্নালিজিম বলে একটা কথা আছে ইংরিজিতে। কিন্তু কাকে বলে, ঠিক মনে করতে পারল না।

ভারী পায়ের আওয়াজ নামছে সিঁড়ি দিয়ে। প্রবীর চকিত হল। কাগজটা ভাঁজ করে টেবিলে রাখল যথাস্থানে। তারপর অপেক্ষা করতে লাগল।

'গাড়িটা বের করতে বলু। একটু পরেই আমি বেরুব।'

এবং ঘরে ম্রারি হালদার ঢুকলেন।

'আরে ভুলু যে ! কী মনে করে ?'

ছেলেবেলা থেকেই চেনেন—পাড়ার লোক। তা ছাড়া ভালো ইংরিজি-গর্বিত পুরনো গ্র্যাজুয়েট বাবার ধারণা ছিল, মুরারিবাবুকে আইডিয়াল ভাবা উচিত। সেলফমেড ম্যান। ছিলেন কোন্ স্টিভেডোর ফার্মের কেরানী—সেখান থেকে দ্যাখ্ কোথায় উঠেছেন!

অবশ্য এই উত্থানটা প্রবীরের খুব ভালো লাগে নি। কিন্তু তার বাবা তাঁকে ভক্তি করতেন, দেখা হলেই একগাল হাসিতে নুয়ে পড়ে নমস্কার করতেন— এ কথাটা মুরারি-বাবুর মনে আছে।

'কী খবর হে ভুলু?' প্রসন্ন চোখ মেলে চাইলেন তিনি: 'আরে দাঁড়িয়ে পড়েছ কেন, বোসো বোসো।'

বসবার আগে কয়েক সেকেণ্ড দোটানায় দুলল প্রবীর। সন্দেহ নেই—এসময় মুরারিবাবুকে দেখলে কেমন শিরশির করে ওঠে গায়ের ভেতর, ফস করে একটা প্রণাম করে ফেলাও অসম্ভব নয়। খালিগায়ে নেমে এসেছেন, শ্যামবর্ণ রোমশ বুকে ধবধব করছে সাদা পৈতে, কপালে বেশ বড় একটি সাদা চন্দনের ফোঁটা। হঠাৎ মনে হয়, মুখখানা বেশ জ্যোতির্ময়, এখনো একটা ঐশ্বরিক ভাবের মধ্যে রয়েছেন।

কিন্তু সেই বেয়াড়া বিরূপতা। একথা কিছুতেই মনে না হয়ে যায় না যে এই লোকটার মুখ দেখলেও সকালটা—

সামনাসামনি ভারী চেয়ারটায় বসে পড়ে মুরারি জিজ্ঞেস করলেন, 'কিছু কথা আছে নাকি?'

'আজ্ঞে—' বলতে আত্মগ্লানিতে জিভ জড়িয়ে এল। মা যদি সারাটা জীবন ধরে মার না খেতেন, যদি কাল সমস্ত রাত জেগে চোখের জল না ফেলতেন, তা হলে—তা হলে থানায় টুলুকে কম্বল-ধোলাই দিলেও তার ভাবনার কিছু ছিল না, বরং মনে হত ওটা টুলুর পক্ষে স্বাস্থ্যকর হবে। কিন্তু মা—

'আজ্ঞে, টুলুকে ধরে নিয়ে গেছে, শুনেছেন বোধ হয়!'

'অ, সেই পানের দোকানে মারামারি? টুলুও ছিল নাকি তাতে?'

আত্মগ্লানিটা যন্ত্রণার মতো মস্তিষ্কের কোষে কোষে ছড়িয়ে যাচ্ছে। মাথা নামিয়ে চুপ করে থাকল একটু।

'কী আর বলব বলুন!'

'আশ্চর্য!' মুরারি ভুরু কোঁচকালেন: 'আশ্চর্য, তোমার বাবা কত যে আশা করতেন ওর ওপরে! ছেলেটা যে কী করে এমন বয়ে গেল!'

ঠিক কথা—কী করে এমন বয়ে গেল টুলু! তার তো কোনো দরকার ছিল না। সে তো সেই সব পরিবার থেকে আসে নি—যেখানে ছিন্নমূল কতগুলো অগোছালো সংসারে প্রত্যেক দিন ক্রোধ, ঘৃণা, অবিশ্বাস, প্রতিবাদ আর নৈরাজ্য চেতনা জন্ম নেয়—যেখানে ইতিহাস দিনের পর দিন উশুল করতে থাকে তার দেনা। তারা তো উদ্বাস্তু নয়। যত ছোটই হোক, এ তাদের পৈতৃক বাড়ি। বাবা যা চাকরি করতেন, তাতে একটু টানাটানি হয়েও এশিয়ার সম্ভাব্য বেস্ট্ স্কলারের জন্যে এম-এ, এম-এসসি পর্যন্ত খরচ চালাতে পারতেন তিনি। অথচ—

অথচ!

আসলে বাতাসটাই কালো হয়ে যাচ্ছে। কারো নিস্তার নেই। বস্তিতে এপিডেমিক লাগলে পাশের প্রাসাদের সব জানালা-দরজা বন্ধ করে দিয়েও ব্যাকটিরিয়াকে ঠেকানো যায় না।

প্রবীর জবাব দিতে পারল না। ঠোঁট কামড়ে চুপ করে রইল।

'ভারী দুঃখের কথা।' মুরারিবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলবার চেষ্টা করলেন।

'মা বলছিলেন—' প্রবীর গলাটা পরিষ্কার করল একটু: 'আপনি যদি থানার ও-সি গৌরবাবুকে একটা চিঠি দেন—'

মুরারির চোখ দুটো একটু ছোট হয়ে এল।

'কেন হে, তোমাদের লোক্যাল এম-এল-এ—'

ছোট্ট খোঁচা একটা। এই এম-এল-এ-টিকে মুরারিবাবুর পছন্দ নয়। তাঁর কারখানার বেয়াড়া শ্রমিকগুলোর সঙ্গে সে ভদ্রলোকের রাজনৈতিক আঁতাত আছে। এবং গত ইলেকশনের সময় প্রবীর তাঁর পোলিং এজেন্টের কাজ করেছিল, ব্যাপারটা তুচ্ছ হলেও মনে আছে মুরারিবাবুর। তাঁকে এসব অনেক খুঁটিনাটি মনে রাখতে হয়—নাহলে এমনভাবে ওপরে উঠতে পারতেন না।

প্রবীর একবার ভাবল, এরপরে উঠে পড়া যেতে পারে। কিন্তু মা! কী আশ্চর্য ক্ষমতা নিয়েই মেয়েরা জন্মায়!

'আজ্ঞে আপনিই তো পাড়ার মুরুব্বী—' গলার স্বরটা নিজের কানেই নির্লজ্জ চাটুকারের মতো ঠেকল: 'মা বললেন, আর কাউকে দিয়ে কিছু হবে না। আপনিই যদি—'

মা এতটা বলেন নি। কিন্তু চারদিকে বাতাসটা কালো হয়ে যাচ্ছে। টুলু কী হয়ে গেল! তাকেও নিচে নামতে হচ্ছে।

'আপনি যদি একটা চিঠি—'

'চিঠির দরকার নেই, ফোনে বলে দেব এখন।'

'তা হলে তো আরো ভালো হয়।'

বলতে ইচ্ছে করল, দয়া করে ফোনটা যদি এখনি করেন! কিন্তু অনুগ্রহের ওপর অতটা চাপ দেওয়া যায় না।

কিন্তু অনুগ্রহ মুরারি হালদার নিজেই করলেন।

'কিছু ভেবো না হে। তুমি বললে, আমি শুনলুম। এরপরে যা করবার আমিই করব। তা ছাড়া পাড়ার লোক। এ তো আমাদের কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে।' মুরারি গলা তুলে ডাকলেন: 'গাড়ি বের করেছে?'

চাকরটা এসে দাঁড়ালো দোরগোড়ায়।

'আজ্ঞে।'

তার মানে মুরারি হালদার এখুনি বেরুবেন। আর তাঁর সময় নষ্ট করা যাবে না। মা তাড়া দিয়ে পাঠিয়ে ভালোই করেছেন দেখা যাচ্ছে। আর একটু দেরি হলেই ধরা যেত না ত্রাণকর্তাকে।

কিন্তু ফিরে গিয়ে মাকে কোনো একটা ভরসা দেওয়া দরকার। নইলে সারাদিন না খেয়ে বসে থাকবেন হয়তো। পৃথিবী জুড়ে মায়েদের এত মমতা, এত চোখের

জল ! তাতেও চারদিকের সব কালো ধুয়ে-মুছে কেন নির্মল উজ্জ্বল হয়ে যায় না ?

উঠে পড়ে প্রবীর বললে, 'আমি কি আর একবার খবর নেব ?'

'দরকার হবে না। বললুম তো, শুনে রেখেছি. এরপরে যা করবার আমিই করব। তবে—' একবার থামলেন : 'ইচ্ছে করো তো একবার আসতে পারো সন্ধ্যের দিকে।'

'আজ্ঞে, আচ্ছা।'

বেরিয়ে যেতে যেতে একবার মনে হল, এরপরে একটা প্রণাম করা উচিত ছিল কিনা মুরারি হালদারকে, ভক্তির জন্যে না হোক, অন্তত কৃতজ্ঞতার খাতিরেও। আর মুরারি হালদার সেটা প্রত্যাশা করেছিলেন কিনা !'

কিন্তু নাঃ, কিছুতেই প্রবৃত্তি হল না।

অতএব বাড়ি ফেরা এবং মাকে বিশদ বিবরণ জানানো।

আবার ছায়ায় ভরে গেল মা'র মুখ। হতাশ চোখ মেলে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ।

'তার মানে, ছেলেটাকে আজো ছাড়বে না !'

'আমি কী করে বলব ?'

'হাজতে হয়তো মারধোর করছে. হয়তো খেতেও দেয় না—'

না, মা'র ওপরে বেশিক্ষণ কোমল হয়ে থাকা শক্ত। মুরারি হালদারের কাছে ছোট হয়ে যাওয়ার গ্লানিটা মনের ভেতরে জ্বালা ছড়াচ্ছিল তখনো। সব ওই রাস্কেলটার জন্যে !

দ্যাখো মা, সব জিনিসের লিমিট আছে একটা। মস্তানি করবার সময় খেয়াল ছিল না ? উল্লুকটা তো আর নাবালক নয়। খেটে আসুক না মাসকয়েক জেল, ওর পক্ষে সেটা ভালোই হবে।'

মা একেবারে চুপ।

এখন বাড়িতে বসে থাকলে দম আটকে আসতে চাইবে। মা আর কথা বলবেন না, একটা কথাও জিজ্ঞেস করবেন না আর, শুধু যুক্তিহীন স্নেহ আর বোবা দুঃখের ভার নিয়ে বাড়ির সব আবহাওয়াটাকে ভারী করে তুলবেন আরো। অসম্ভব, সহ্য করা যাবে না। তার চেয়ে বেরিয়ে পড়া ভালো।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকালো একবার।

'এখন সাড়ে ন'টা। আমি একটু বেরুচ্ছি মা। ঘণ্টা দুই পরে ফিরে আসব।'

মা সেই হতাশ গলায় বললেন, 'আচ্ছা।'

রবিবারের পথ। কলকাতা ফাঁকা। বাইরে থেকে কত মানুষ পেটের দায়ে বাকী ছ'টা দিন পথে পথে ভিড় জমায়, এই ছুটির দিনে খানিকটা আন্দাজ করা যায় তার।

বাসের দরকার ছিল না। ঢাকুরিয়া থেকে রেল লাইন পেরিয়ে একটু সোজা পথে এলেই বালিগঞ্জ। তারপর সাদার্ন অ্যাভিনিউর উদার ফুটপাথ ধরে খানিকটা হাঁটলে বাঁদিকে সেই পরিচ্ছন্ন রাস্তাটা। বাড়িগুলো সুন্দর, গাছগুলো নতুন সতেজ পাতায় ঝিরঝিরে।

এই রাস্তায় দিদির ফ্ল্যাট। পুব-দক্ষিণ খোলা। 'খুব একটা বেশি নয়—ভাড়া মোটে সাড়ে পাঁচশো—' মণীশদা বলেছিল একবার। মণীশদা তাদের ভগ্নীপতি।

ভাই-বোনদের ভেতরে দিদিই বুদ্ধিমতী সবচাইতে। কলেজে পড়বার সময় এক

বছরের সিনিয়ার মণীশদাকে বিয়ে করেছিল ভালবেসে। দিদির হিসেবী চোখ। সে দেখেছিল, মণীশদার বাবা বেশ জাঁদরেল অ্যাটর্নি, মণীশদা নিজেই একটা গাড়ি ড্রাইভ করে কলেজে আসে। চেহারা মোটা, গোলগাল, বেঁটে, তখনই মাথায় টাকের আভাস। তা ছাড়া দিদির চেহারা ভালো, বেশ ভালো। এক-আধটু নাচও শিখেছিল।

কাজেই সে মণীশদাকে বিয়ে করে ফেলল। বাবা তখন অফিস থেকে ফিরে চা খেয়ে, খবরের কাগজ খুলে তা থেকে দুটো-একটা ভুল ইংরিজি বের করবার দৈনন্দিন চর্চার মধ্যে ছিলেন। এমন সময় দিদি মোটর থেকে নামল মণীশদার সঙ্গে।

'আশীর্বাদ করুন বাবা, আমরা বিয়ে করেছি।'

সিভিল ম্যারেজ হলে কী হয়, দিদি অনুষ্ঠানের ত্রুটি করে নি। সিঁথিতে সিঁদুরের দাগও টেনে এসেছিল একটা।

ইন্টেলেকচুয়াল বাবাও এতটার জন্যে তৈরি ছিলেন না। প্রথমে গলা দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ বেরুল তাঁর। তারপর বললেন, 'ও! তা বেশ বেশ!'

অন্তঃপুরে 'ইডিয়ট' মা একটু কেঁদে ফেলেছিলেন।

'কায়েত-বদ্যি হলেও কথা ছিল, এ যে একেবারে—'

বাবা বললেন, 'চোপরাও।'

কাঁটা যে তাঁরও বিঁধছিল না তা নয়, কিন্তু ইন্টেলেকচুয়্যাল হওয়ার ল্যাঠা অনেক। সমস্ত কুসংস্কার সম্পর্কে কঠিন ভাষায় ধিক্কার দেওয়া যায়, কিন্তু নিজের ওপর ঘা-টা এসে পড়লে কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা লাগে প্রথমটায়!

দিদির হিসেবে ভুল হয় নি। মণীশদাও অ্যাটর্নি। উত্তর কলকাতার সেকেলে বনেদী বাড়িতে লোকের কিচির-মিচির, ব্যাকডেটেড চালচলন বেশিদিন ভালো লাগল না। দিদিই ভালো লাগতে দিল না খুব সম্ভব।

তারপর দক্ষিণ কলকাতার এই ফ্ল্যাট। বেশি নয়—ভাড়া মাত্র "সাড়ে পাঁচশো"! মণীশদার মতে—"র‍্যাদার চীপ"। নতুন গাছের সতেজ পাতায় ঝিরঝির শব্দ। ছিমছাম পথ, সুঠাম বাড়ির সার। দু' পা বাড়ালে সাদার্ন অ্যাভিনিউ। তারপর লেক।

কী তফাত তাদের ঢাকুরিয়ার সঙ্গে! সেখানে কাঁচা ড্রেন থেকে দুর্গন্ধ ছড়ায়। ঘর-বাড়িগুলো যেন এ ওর গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। গাছগুলো পর্যন্ত বুড়োটে, তাদের ডালে কাকের বাসা।

দোতলায় দিদির ফ্ল্যাটে ওঠবার আগে সামনের সাদা দেওয়ালে একবার চোখ পড়ল তার। কতকগুলো কালো কালো প্রকাণ্ড অক্ষর। নিষ্কৃতি নেই—এখানেও না।

"নকশালবাড়ির লাল আগুন দিকে দিকে ছড়িয়ে দাও—"

"শ্রীকাকুলম্ জিন্দাবাদ—"

প্রবীর একটু হাসল। উঠে গেল তেতলায়।

মস্তবড় সিটিং রুমে তখন রেডিয়োগ্রামে বাজছিল 'অলিভারে'র গান। আর তার তালে তালে নাচছিল দিদির বড় মেয়ে টিনটিন।

॥ তিন ॥

দরজার গোড়ায় একটু দাঁড়িয়ে পড়ল প্রবীর।

দিদির মেয়ে 'অলিভারে'র নাচ নাচছে, খুব ভালো কথা। কিন্তু বেছে বেছে ফ্যাগিনের নাচটা কেন? সোনার চামচে মুখে করে যে জন্মেছে, তার তো পকেট মারতে শেখাটা খুব জরুরী কাজ নয়!

মণীশদা তখনো সকালের কাগজটা পড়ছিল, দিদি একটা সচিত্র মহিলা পত্রিকা কোলের ওপর রেখে বেশ মনোযোগের সঙ্গে নাচ দেখে যাচ্ছিল টিনটিনের। দিদির চোখে বেশ উৎসাহ প্রকাশ পাচ্ছিল, পায়ের চটিতে তাল পড়ছিল, বোঝা যাচ্ছিল দিদিরও মনে মনে নাচটা চলছে।

ছুটির সকাল। বেশ একটি পরিতৃপ্ত স্বচ্ছন্দ দিন। খোলা জানলা দিয়ে দক্ষিণের হাওয়া সাঁতার কাটছে ঘরে। একফালি রোদ এসে পড়েছে দেওয়ালের একখানা অ্যাবস্‌ট্রাক্‌ট্‌ আর্টের ছবির ওপর। ছবিটা প্রবীর বোঝে না—দিদি কিংবা মণীশদা যে বোঝে তাও নয়। তবু ওসব এক-আধখানা রাখতে হয় ঘরে—নইলে ঠিক রুচির পরিচয় দেওয়া যায় না। দেওয়ালের আর একদিকে রবীন্দ্রনাথ—বিষণ্ণ এবং গম্ভীর।

এমন একটি রমণীয় পারিবারিক আসরে—এই সংস্কৃতি-চর্চার ভেতরে, দাড়ি না কামানো মুখ, আধময়লা জামা-কাপড় এবং যে জুতোটাকে আর কিছুতেই পরা উচিত নয়, সেটা পায়ে গলিয়ে ঢুকে পড়াটা ঠিক হবে কিনা প্রবীর একবারের জন্যে তা ভাবল। কিন্তু তার আগে দিদির চোখ পড়ল তার ওপর।

'কে, ভুলু? আয়—আয়!'

হাত বাড়িয়ে বন্ধ করে দিলে রেডিয়োগ্রামটা।

মণীশদা কাগজ সরিয়ে তাকালো। অনিচ্ছায় পা থামল টিনটিনের।

'এসো হে—এসো। খবর-টবর কী?' মণীশদা ডাকল।

আসরটা নিশ্চয় মাটি হয়ে গেল, কিন্তু এখন আর করবার কিছুই নেই। সাক্ষাৎ রসভঙ্গের মতো বেয়াড়া জুতোটা পায়ে দিয়ে এবং দাড়ি না কামানো মুখ নিয়ে প্রবীর ঢুকে পড়ল। তারপর সামনের সোফায়।

'খবর আর কী—এমনিই দেখা করতে এলুম!'

'মা ভালো আছে?' দিদির জিজ্ঞাসা।

'হ্যাঁ, ভালোই আছেন।'

'টুলু?'

এক পলকের জন্যে নরম সোফার ভেতরে শক্ত হয়ে গেল প্রবীর। বলা উচিত হবে? এই পূর্ব-দক্ষিণ খোলা ফ্ল্যাটের এমন সাংস্কৃতিক নির্মল আবহাওয়ার মধ্যে বলা যায় কথাটা? বলা যায় যে মস্তান প্রতুল একটা পানের দোকানে মারামারি করে এখন হাজতে? এবং সে এক্ষুনি এল মুরারি হালদারের কাছে তদ্বির করে—যাতে সে ছাড়া পায়, নেহাৎপক্ষে থানার ও-সি তাকে কম্বল-ধোলাই না দেন!

কী লাভ বলে? এদের কিছু আসে-যায় না। সেই বিজয়ার সময় একবার মাকে

প্রণাম করতে গিয়েছিল। তারপর এই ক'মাসের মধ্যে কোনো খবর নেয় নি আর।

'টুলু?' আস্তে আস্তে জবাব দিলে: 'হ্যাঁ, সেও ভালো আছে।'

মণীশদা বললে, 'পড়াশোনা তো আর করল না।'

'না। বলে, যে দেশে হাজার হাজার এন্‌জিনীয়র বেকার, সেখানে এডুকেশনের কোনো মানেই হয় না।'

'হুঁ, চরম জ্ঞানের বাক্য—' চিবিয়ে চিবিয়ে শব্দগুলো উচ্চারণ করল মণীশদা, তারপর টেবিল থেকে একটা চুরুট তুলে নিয়ে ঠোঁটে পুরল: 'এসব জ্ঞানলাভ হলেই পরীক্ষা দিতে গিয়ে চেয়ার-ডেস্ক ভেঙে বেরিয়ে আসতে হয়, তারপর সম্পূর্ণ মুক্ত পুরুষ।'

'তুমি থামো—' দিদি ঝনঝন করে উঠল: 'এগুলো পড়াশুনো না করবার প্রী ছাড়া কিছু নয়। আগে বেরিয়েই আসুক না এন্‌জিনীয়র হয়ে—তারপর যদি চাকরি না পায়, তখন আন্দোলন করুক।'

না, টুলুর জন্যে ওকালতির কিছু নেই। চাকরি পাব না—একথা ভেবে সে পড়াশুনো ছেড়ে দেয় নি। তাকে ডেকে নিয়েছে সেই অন্ধকার—যাকে আমরা কেউ চাই নি, অথচ ইতিহাসের দেনা যাকে আপনিই ঘনিয়ে এনেছে। কিন্তু সে প্রশ্ন নয়। দিদির বলার ঢংটাই খারাপ লাগল।

'যারা আন্দোলন করছে—মানে যেসব এন্‌জিনীয়র এখনো বেকার, তাদেরই কি খুব সুবিধে হচ্ছে দিদি?'

একটু অস্বস্তি বোধ করল দিদি। ঠিক এইরকম একটা পাল্‌টা প্রশ্নের জন্যে তৈরি ছিল না।

চুরুটটাকে গালের একপাশে ঠেলে সরিয়ে দিলে মনীশদা।

'লেট মী আনসার দিস কোয়েশ্চেন অন হার বিহাফ! আই নো প্রবীর, তোমার একটা লেফটিস্ট টেনডেনসি আছে। তুমি আগে আমার এই প্রশ্নটার জবাব দাও। চাকরির সোর্স'গুলো যদি নিজেরাই বন্ধ করে দাও—এমপ্লয়মেণ্ট সমস্যার সমাধান কী করে হবে বলতে পারো?'

'খুলে বলুন।'

এই অতি বিরস আলোচনায় টিনটিনের বিরক্তি লাগছিল। সে বাধা দিলে মাঝখানটায়।

'আইসক্রীম খাবে বড় মামা?'

আইসক্রীম! সব কটা চোখ ঘুরে গেল টিনটিনের দিকে। প্রবীর হাসল।

'হঠাৎ আইসক্রীম কেন রে?'

'আমি নিজে তৈরি করেছি যে। নিয়ে আসব ফ্রীজ থেকে?'

'ও তোরাই খা। আমার একটা দাঁত কনকন করছে ক'দিন ধরে, ওতে সুবিধে হবে না। বরং একটু চা খাওয়াতে পারিস।'

দিদি বললে, 'মঙ্গলকে একটু চা করতে বলে দাও টিনটিন।'

'বলছি—' ওড়না উড়িয়ে নাচের ভঙ্গিতে টিনটিন বেরিয়ে গেল।

একটু অন্যমনস্ক হল প্রবীর। একটা অস্বস্তিকর স্মৃতি যেন। দিন চারেক আগে—

রাত নটা নাগাদ—পার্ক স্ট্রীটে। তখন তার ভাবনা অন্যদিকে ছিল, একটা ছায়া যেন পড়েছিল চোখের ওপর, মনে পড়ে নি। এখন সবটা যেন হঠাৎ তীক্ষ্ণ রেখায় ফুটে উঠল, সব বিস্বাদ হয়ে গেল, অত্যন্ত বিশ্রীভাবে সে অনুভব করল, সেই মেয়েটি টিনটিনই বটে। কিন্তু সঙ্গের ছোকরাটা—

মণীশদা আবার শুরু করল, 'তোমরা রাতদিন ঘেরাও করবে—কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাবে, কনস্ট্যাণ্ট লেবার-ট্রাবল। ফ্যাক্টরীগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে—চলে যাচ্ছে অন্য স্টেটে। মহারাষ্ট্র তো আছেই, পাঞ্জাব-হরিয়ানা কিভাবে ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের ডেকে নিচ্ছে, দেখছ তো? ফার্মগুলো বন্ধ করে দেবে—অথচ বেকার এন্‌জিনীয়রের চাকরি চাই—এ তো মন্দ রসিকতা নয় হে!'

'মণীশদা, বাংলা দেশে না হয় ঘেরাও শুরু হয়েছে সেদিন। কিন্তু প্রব্‌লেমটা যে তার অনেক আগেই জট পাকিয়েছে—একথা আপনি ভুলে গেছেন বোধ হয়।'

দিদি বিরক্ত হয়ে উঠল: 'থাম্ তো বাপু, কী কচকচি আরম্ভ করলি তোরা! রাতদিন এসব শুনছি কানের কাছে, মাথা ধরে গেল। হ্যাঁ রে, টুলুর কি এইভাবেই চলবে নাকি?'

মণীশদা একটু হেসে আবার তুলে নিলে কাগজটা। প্রবীর বললে, 'আমি জানি না। তুই-ই জিজ্ঞেস করিস ওকে।'

'জিজ্ঞেস করব যে, পাচ্ছি কোথায় ওকে?'

প্রবীর চুপ করে রইল।

দিদির ভুরু দুটো জুড়ে এল একসঙ্গে: 'ভাবতেই পারা যায় নি, ওটা বয়ে যাবে এভাবে। অথচ বাবা কত আশা করতেন ওর ওপরে। লেখাপড়ায় এমন জ্ঞান ছিল—'

হয় তো ছিল। কিন্তু বাবা যে ভাবতেন, প্রতুল একেবারে আইনস্টাইন হয়ে উঠবে, স্কুলের নীচু ক্লাসের রেজাল্ট থেকে সেটা প্রমাণ হয় কিনা বলা শক্ত। আসলে যে বাবা নিজেকে ইণ্টেলেকচ্যুয়াল ভাবতেন ইংরিজি খবরের কাগজ খুলে তা থেকে ভুল বের করবার চেণ্টা করতেন, তিনি যে শুধুই এ-জি বেঙ্গলে একজন সিনিয়র ডিভিশন ক্লার্ক—এই গ্লানিটা তাঁর মন থেকে কিছুতেই যেত না। তাই প্রতুল লেখাপড়ায় একটু ভালো—এই সম্ভাবনাটাকেই তিনি নিজের মনের মতো করে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে বেলুনের মতো গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু স্বপ্নের বেলুনটা টিকল না বেশিক্ষণ—বাবার অতিরিক্ত প্রশ্রয়েই ফেঁসে গেল সেটা।

প্রবীরের চটক ভাঙল। ঝাঁঝালো গলায় দিদি কিছু বলছিল।

'বাবা চেণ্টা করেছিলেন, কিন্তু মা এমন হোপলেস্—'

প্রবীরের বুকে ব্যথা চিনচিন করে উঠল একটা। বাবার আর একটি দান। রাতদিন নিরীহ নির্জীব মাকে শুনিয়েছেন: 'তুমি কিচ্ছু বোঝো না—তুমি একটি ইডিয়ট।' সেই শিক্ষাটা পুরো নিয়েছে দিদি—মাকে চিরকাল অবজ্ঞা আর অনুকম্পা করে এসেছে। সেইজন্যেই বাবার মৃত্যুর পর টুলু এত বেপরোয়া। আর দাদা—বাবার ভাষ্যে সে তো ডালার্ড—কে তাকে আর গ্রাহ্য করে?

বাবা আর একটু কম ইণ্টেলেকচ্যুয়াল হলে ভালো করতেন।

দিদি বলে যাচ্ছিল, 'মা এমন হোপলেস্ যে ছেলেটাকে একটু কণ্ট্রোল পর্যন্ত করতে

পারল না।'

বিরসভাবে প্রবীরের বলতে ইচ্ছে করল : মা তো সংসারে চিরদিন ছায়ার মতো আড়ালে থাকলেন—তাঁকে মিথ্যে টেনে আনছিস কেন ? টুলুর কণ্ট্রোল বিগড়ে দেবার পক্ষে বাবা আর তুই-ই যথেষ্ট। কিন্তু বললেই দিদির মুখ ছুটবে, আরো একরাশ গালাগাল করবে মাকে। কখনো কখনো দিদি আশ্চর্যরকমের নিষ্ঠুর হতে পারে। কী লাভ মা'র অপমানের বোঝা বাড়িয়ে ?

মণীশদার যে আলাদা কোনো মত এ ব্যাপারে আছে তা নয়। সে বুদ্ধিমান মানুষ—অ্যাটর্নি—লাভ-ম্যারেজের মুগ্ধতা নিয়ে দিদিকে আগে ঠিক আন্দাজ করতে পারে নি। কিন্তু বিয়ের পরে নিশ্চয় বুঝেছে যে, দিদির সঙ্গে যত বেশি একমত হওয়া যায়, সংসার এবং শান্তি ততই বেশি নিরাপদ।

কিন্তু শ্যালকের সামনে—গলা খুলে শাশুড়ীর এই নিন্দা তার চক্ষুলজ্জায় বোধ হয় একটু বাধল।

'আঃ উমা, কী বকছ ! এভাবে বলা ঠিক নয়।'

দিদি ঝাঁঝিয়ে উঠল : 'তুমি চুপ করো। এগুলো আমাদের বাড়ির ব্যাপার, তোমার কন্‌সার্ন নয়।'

মণীশদা বললে, 'কিন্তু—'

'থামো না। আসল কথা কী জানো ? ছেলেমেয়েদের ট্রেনিং দিতে হয়। আর সে ট্রেনিংয়ের ভার থাকে মা'র হাতেই। মাতৃদোষেণ মূর্খতা—কারেক্ট।'

তা হলে টিনটিনের ট্রেনিং দিদির হাতেই হচ্ছে—নিঃসন্দেহ। বিলিতী স্কুলে পড়ছে, জুনিয়র কেমব্রিজ দেবে। কিন্তু—কিন্তু ওই অস্বস্তিটাই কাটছে না। বয়েস এখনো পুরো পনেরো হয় নি বোধ হয়, কিন্তু—, প্রবীরের কপাল কুঁচকে এল : রাত নটার পরে—পার্ক স্ট্রীটের রেস্তোরাঁ থেকে—একটা ছোকরার হাত জড়িয়ে—কিংবা কে জানে, এও হয়তো দিদির ট্রেনিংয়ের অংশ !

মঙ্গলের হাতে ট্রে এল। দিদির বক্তৃতা থামল।

চা তৈরি করে এগিয়ে দিয়ে দিদি বললে, কিছু খাবি ? ভালো কেক আছে।'

'না দিদি, খিদে নেই।'

মণীশদা আবার কাগজ নামালো কোলের ওপর।

'তারপর ব্রাদার, তোমাদের যুক্তফ্রণ্ট গভর্ণমেণ্টের খবর কী ?'

'তোমাদের বলছেন কেন ? ফ্রণ্ট যাদেরই হোক, গভর্ণমেণ্ট তো সকলেরই !'

'না হে, সকলের গভর্ণমেণ্ট নয়। এরা কৃষক আর শ্রমিক নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, বাকি সবাই এদের হিসেবে একেবারে আগাছা।'

আবার খানিক বিরস তর্কের সূচনা।

চুরুট নিবে গিয়েছিল, ধরাতে ধরাতে মণীশদা বলে চলল, 'তোমরা তো আমাদের স্বর্ণ-দিগন্ত দেখেছিলে হে ! ভেবেছিলে তিন মাসের ভেতরেই দেশ একেবারে আলোতে ঝলমল করে উঠবে। এখন তো দেখছি, নিজেদের কামড়ানো ছাড়া আর কোনো প্রোগ্রাম নেই তোমাদের।'

'আমাকে টানছেন কেন ? দেশের অধিকাংশ লোকই আশা করেছিল।'

'আশা মিটেছে ?' চশমার ফাঁক দিয়ে মণীশদার চোখে বিদ্রূপ ঝিকমিক করতে লাগল : 'যা শুরু করেছ তোমরা—তোমাদের যৌথ দেশসেবা তো গঙ্গাযাত্রা করল বলে।'

'অন্যেরা তো অনেকদিন চালালেন মণীশদা ! তাঁরা নির্ভুল ছিলেন না—এঁদেরও ভুল-ভ্রান্তি হতে পারে।'

'সব ভেঙে-চুরে ?'

'হয়তো তারও দরকার আছে। ভুলের ভেতর দিয়ে নিজেদের চেনা যায়।'

'কিন্তু ভুলগুলো বড্ড কস্টলি, ব্রাদার। দেশ জুড়ে যা চলছে, স্রেফ খুনোখুনি। সাধে কি তোমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেন—'

'মুখ্যমন্ত্রীর কথাটা ব্যক্তিগত, কিংবা তাঁর দলের। ও থেকে কিছুই প্রমাণ হয় না।' ভেতরে ভেতরে উত্তাপ বোধ করতে লাগল প্রবীর : 'মণীশদা, সময়ের চেহারাটা বড্ড তাড়াতাড়ি বদলে যাচ্ছে। সমস্যাগুলো নিষ্ঠুর আর বাস্তব হয়ে উঠছে, তাই কঠিন হয়ে যাচ্ছে সব, পথ জটিল হচ্ছে—যারা নেতৃত্ব নিচ্ছে তারাও সমস্তটাকে মুঠোর মধ্যে ধরে রাখতে পারছে না। অনেক অন্যায় তো জমে গিয়েছিল, তার দাম দিতে হবে, ঠেকে শিখতে হবে বার বার।'

'বার বার ?' মণীশদা কুটিলভাবে হাসল : 'ভাবছ এবার ফ্রন্ট ভাঙলে আবার এরা ভোট পাবে ?'

'ফ্রন্ট যে ভাঙবেই, আপনি কী করে জানলেন ?'

'আমাদের জানবার দরকার কী—তোমাদের লীডাররাই তো গলা খুলে ভবিষ্যদ্বাণী করছেন। এই তো স্বয়ং তোমাদের—'

দিদি আবার বাধা দিলে বিরক্ত হয়ে।

'উঃ, আবার সেই পলিটিক্সের কিচির-মিচির ! ও-সবে কিছু হবে না। দেশ উচ্ছন্নে যাচ্ছে, তাই যাবে। নে ভুলু, মুখ বন্ধ করে চা খা এখন। একদম ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে।'

এই দক্ষিণ হাওয়ায় ভেসে যাওয়া, নিশ্চিন্ত বসবার ঘরটিতে দিদিই সভাপতি, তার কথাই চূড়ান্ত। মণীশদা আবার একটু হেসে খবরের কাগজটা তুলে নিলে। খুব সম্ভব শরিকী-সংঘর্ষের কোনো বিবরণ পড়তে লাগল প্রসন্ন মনে। চা-টা নিশ্চয় ভালো, কিন্তু কোনো স্বাদ পাচ্ছিল না প্রবীর। আজকের সকালটাই বিস্বাদ হয়ে গেছে।

মণীশদা স্বগতোক্তির মতো একবার পড়ল : 'ওয়ান স্পীয়ার্ড টু ডেথ—হাউসেস গাটেড—'

দিদি কান দিলে না সেদিকে।

'টুলুকে একবার আসতে বলিস তো আমার কাছে।'

'আচ্ছা ফিরে এলে বলব।'

'ফিরে এলে মানে ?' দিদি কৌতূহলী হল : 'গেছে নাকি কোথাও ?'

সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিতে হল প্রবীরকে।

'মানে বাড়ি ফিরে এলে বলব।'

'বলিস। বেশ তো ছিল, কিন্তু কী যে হল লক্ষ্মীছাড়াটার—এভাবে বয়ে যাবে ভাবাই যায় নি। আসলে মা'র যদি ব্রেন বলে কিছু না থাকে—'

চায়ের পেয়ালা সরিয়ে দিয়ে প্রবীর বললে, 'দিদি, আজ উঠি। অনেক বেলা হয়ে গেল।'

পথে রোদের ধার বাড়ছে। সাদার্ন অ্যাভিন্যুর বাড়িগুলোরও নিস্তার নেই—'নকশালবাড়ির লাল আগুন', 'শ্রীকাকুলম', 'চেয়ারম্যান মাও', 'সশস্ত্র বিপ্লব'। রোদে লেখাগুলো ক্রোধের মতো জ্বলছে।

দেশ। অনেক ঋণ জমে উঠেছিল, অনেক দুঃখের ভেতর দিয়ে শোধ করবার পালা। সেদিন আসছে—আসবেই। কিন্তু কী হবে সেই ঋণশোধের চেহারাটা? কাদের সঙ্গে হিসেব-নিকেশ? কী ভাবে?

চলতে চলতে রাসবিহারী অ্যাভিন্যু। একটা ছোট শোভাযাত্রা।

'যুক্তফ্রন্ট জিন্দাবাদ—'

'যুক্তফ্রন্ট চলছে—চলবে—'

চলছে—চলবে? ঠিক কথা, চারদিকে ভাঙনের রেখা। অতি বড় আশাবাদী সমর্থকদেরও মন জুড়ে ছায়া। তবু আশা ধরে রাখতে হয় শক্ত মুঠোতে। জীবন তাই। হার মানতে সে জানে না।

কী থাকবে—কী যাবে কে বলতে পারে এই কাল-সন্ধিতে দাঁড়িয়ে? কিন্তু সব দুঃখ, সব ক্রোধ, সমস্ত যন্ত্রণা—আর—আর হয়তো অনেক অপচয়ের রক্ত—একদিন কোথাও না কোথাও এসে সংহত হবে। অনেক নেতৃত্ব উড়ে যাবে ঝড়ের পাতার মতো, এই কঠিন—অতি কঠিন কালটাকে যারা মুঠোর মধ্যে ধরে রাখতে পারছে না—যারা দিশেহারা—ইতিহাস তাদের কোন্ অন্ধকারে যে ঠেলে দেবে, কেউ জানে না। খুব বড় একটা কিছুকে পেতে গিয়ে অনেক কিছু হারাতে হবে—কিন্তু না হারিয়ে কারা কী পেয়েছে কোন্দিন?

রোদ বাড়ছে, পায়ের জুতোটায় অস্বস্তি, জ্বালা করছে মাথার ভেতরে। আচ্ছা, টুলু তো রাজনীতি করতে পারত? যদি সব কিছুর বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ জেগে থাকে, বেশ তো—নিজের জায়গা করে নিতে পারত যে-কোন একটা দলে? বলতে পারত—এ চলবে না, একে বদলাব?

কিংবা তারও চেয়ে সোজা নৈরাজ্যের রাস্তা। তার আকর্ষণ বেশি, প্রলোভন বেশি। হয় লড়ো, নইলে ডুবে যাও অবক্ষয়ের অন্ধকারে। অন্ধকারটাই সহজে হাতছানি দেয়। বিপ্লবের বিকল্প বিকার।

'প্রবীরদা?'

প্রবীর দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনের বাস স্টপে স্বপ্না।

'কিরে, এ সময় এখানে?'

'একটু কাজে এসেছিলুম এদিকে। তুমি কোথায় চললে?'

'দিদির বাসায় এসেছিলুম। বাড়ি ফিরব এবার।'

'সবাই ভালো?'

'চলছে—' বলতে গিয়ে প্রবীর একবারের জন্যে ঠোঁট কামড়ালো: 'তোদের খবর কী?'

'এক রকম—' একটু বিষণ্ণ হল স্বপ্না : 'তবে ছোটদা অ্যাবসকনড্‌ করে আছে।'

'বুঝেছি।'

ছোটদা—অর্থাৎ আনন্দ রাজনীতিতে চরমপন্থী। সে জানে, পার্লিমেন্টারী পলিটিক্সে কিছু হবে না—ওগুলো সব ভাঁওতা। সে কলেজ ছেড়ে চলে গেছে গ্রামে।

স্বপ্না আস্তে আস্তে বললে, 'মার্ডার চার্জ আছে ওর নামে।'

'বুঝেছি।'

'আমাদের জন্যে ভাবছি না—,' স্বপ্না আবার আবছা স্বরে বললে, 'কষ্ট হয় বাবার জন্যে।'

সান্ত্বনা দেবার কিছু নেই—কী বলা যাবে? অনেক দাম অনেককে দিতে হবে—কে জানে কোন্‌ পথে, কী ভাবে একদিন শোধ হবে এতকালের সমস্ত দেনাগুলো।

রোদ ধারালো। সামনের দেওয়ালে আধছেঁড়া একটা পোস্টার উড়ছে হাওয়ায়। ময়দানে কবে যেন বিরাট জনসমাবেশ ছিল, তারই ঘোষণা। স্বপ্নার কপালে কয়েকটা ঘামের বিন্দু।

'যাব একদিন তোদের বাসায়।'

'নিশ্চয় যেয়ো।'

স্বপ্নার বাস এসে পড়ল।

'চলি প্রবীরদা—'

'আয়।'

বাস চলে গেলে আরো কিছুক্ষণ ধারালো রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল প্রবীর, তার মাথাটা আরো বেশি জ্বালা করছিল। সে জানে। এই মেয়েটা টুলুকে ভালবেসেছিল।

রাস্কেল! দাঁতে দাঁত ঘষে স্বগতোক্তি করল প্রবীর : 'রাস্কেল! এই রকম এক টুকরো উজ্জ্বল ভালোবাসাই তো যে-কোনো জীবনকে বদলে দিতে পারে—তুই কি অন্ধকার ছাড়া পথ খুঁজে পেলি না আর?'

॥ চার ॥

বাগানে একটি ফুলও বাঁচানো শক্ত। নীচু প্রাচীর টপকে ছেলেপুলেরা যা সামনে পাচ্ছে ছিঁড়ে নিয়ে যাচ্ছে। গন্ধরাজ গাছটায় প্রথম কুঁড়ি এসেছিল, শিবপ্রসাদ কদিন ধরেই ফুল ফোটবার অপেক্ষা করছিলেন। কাল সন্ধ্যায় দেখেছিলেন বসন্তের হাওয়ায় দুটি কুঁড়ি একটু একটু পাপড়ি মেলেছে, কাছে মাথা নামিয়ে আনতে শান্ত একটুখানি মৃদু গন্ধ অভ্যর্থনা জানিয়েছিল তাঁকে। সকালে ফুল দুটির সন্ধানে এসে দেখলেন তারা নেই—ডালটাই যখন মুচড়ে ভেঙে নিয়ে গেছে। সে ডালে আরও দু-তিনটি কুঁড়ি ছিল।

বুকের ভেতরে ঘা লাগল একটা। বিমূঢ় বেদনায় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ।

সেই ছোট ছোট ছেলেরা। নিম্নবিত্ত, বিত্তহীন ঘরের সন্তান সব।

চারদিকের বঞ্চনার মধ্যে জন্মেছে। উদ্বাস্তু সব পরিবারের ছন্নছাড়া উপনিবেশের ভেতর। জোড়াতালি দেওয়া দুঃখের সংসার। কারো একটা নামমাত্র দোকান, কারো

যৎসামান্য চাকরি, কারো উঞ্ছবৃত্তি। অনিশ্চয়তা, নৈরাশ্য, অভাব, যন্ত্রণা। প্রাণপণে ভালো হয়ে বাঁচবার চেষ্টা করেও সব সময় অন্ধকারের দরজা খোলা যায় না। সমাজ-বিরোধী শক্তিগুলো এই সমস্ত পরিবেশ থেকেই সবচেয়ে বেশি প্রেরণা পায় বলে পুলিসের ধারণা।

কিন্তু এ নিয়ে ভাবতে ভালো লাগে না শিবপ্রসাদের। একটা নিরুপায় পরাভবের মতো মনে হয়। উনিশশো চব্বিশ থেকে উনিশশো ছেচল্লিশ। চোদ্দ বছর বয়সে নন-কো-অপারেশন দিয়ে শুরু করেছিলেন, "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনে শেষবার জেল খাটলেন। বুকের ভেতরে ধক-ধক করে একটা আলো জ্বলত তখন, মনে পড়ত রবীন্দ্রনাথের অভয় বাণী : বীরের রক্তস্রোত, মায়ের চোখের জল কিছুই মিথ্যে হবার নয়। বিশ্বের ভাণ্ডারীর খাতায় ঋণ শোধের হিসেব-নিকেশ আসতে দেরি নেই।

সে ঋণ শোধ হল তারপরে। র‍্যাডক্লিফ অ্যাওয়ার্ডে।

গন্ধরাজ গাছটার দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করলেন শিবপ্রসাদ। মুচড়ে ভেঙে নিয়ে গেছে ডালটা। অন্তত ফুল দুটো নিয়ে কুঁড়িগুলো রেখে যেতে পারত। কিছুই রাখে নি। এই নয়-দশ-এগারো-বারো বছরের ছেলেগুলো এর মধ্যেই জেনে গেছে—কোথাও কোনো ফুলকে ফুটতে দেওয়া যাবে না। তারা জন্মাবার আগেই তাদের মূলে যারা কীট ছড়িয়ে দিয়েছে, তাদের এই সৌখিন বিলাসিতা অসহ্য।

কী করেছে এই ফুলগুলো নিয়ে? উত্তর পাওয়ার জন্যে বেশি কষ্ট করতে হবে না শিবপ্রসাদকে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে কয়েক পা হাঁটলেই দেখতে পাবেন। ফুলগুলো কুচি কুচি করে ছড়িয়ে দিয়েছে কাঁচা ড্রেনের দুর্গন্ধ জমাট জলের ভেতরে। এ অভিজ্ঞতা আগেও হয়েছে তাঁর।

ওরা ফুল ছিঁড়ছে না, প্রতিহিংসা নিচ্ছে। প্রতিহিংসা নিচ্ছে শিবপ্রসাদের ওপর।

হ্যাঁ, তিনিও ছিলেন ওই দলে। উনিশশো চব্বিশ থেকে উনিশশো ছেচল্লিশ পর্যন্ত। বার-সাতেক জেল খাটলেন। এই জন্যে? এই জন্যেই কি?

কিন্তু দাম কি তিনিও দেন নি? বাড়ি-ঘর, দেশ?

শিবপ্রসাদ বারান্দায় উঠে এলেন। আজকাল কী যে হয়েছে, একটুখানি রোদের তাপও সইতে পারেন না—গায়ের মধ্যে জ্বালা করতে থাকে, মাথা ধরে ওঠে। অথচ একসময় দিনে কুড়ি-বাইশ মাইল হেঁটে পাড়ি দেওয়া খুব স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল তাঁর কাছে—আগুন-ঝরা জ্যৈষ্ঠের রোদও তাঁকে ছুঁতে পারত না—তিনি দেশের কাজ করতেন।

দেশ!

পুরনো ঈজিচেয়ারটায় শুয়ে পড়ে ভাবলেন : দেশ! কিন্তু এই দেশের কোনো চেহারা কি স্পষ্ট ছিল তখন? আইডিয়া, স্বপ্ন, বিশ্বাস! রবীন্দ্রনাথের গান : 'তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।' উনিশশো তিরিশের সত্যাগ্রহী বাহিনীর আগে আগে তিনিই গাইতে গাইতে চলেছেন :

'ঝাণ্ডা উঁচে রহে হামারা—
ইসি ঝাণ্ডেকো নীচে নির্ভয়
বোলো—ভারত মাতাকে জয়—'

তখন ভারতমাতার সেই রঙিন ছবিটা মনের মধ্যে। মাথায় হিমালয়ের মুকুট জ্বলছে। পায়ের তলায় রক্তপদ্ম হয়ে ফুটে আছে সিংহল ; একটি বরাভয় কর উদ্যত রয়েছে কচ্ছকে স্পর্শ করে—আর একটি বাংলাদেশের ওপর প্রসারিত হয়ে রয়েছে—মুঠোয় ধরা শস্যের মঞ্জরী। তলায় লেখা 'ভারতলক্ষ্মী'।

সেই ছবিটা এখন কোথায় ?

তার উত্তর এই গন্ধরাজের পাপড়িগুলো দিতে পারে। সেই ছবিটা এখন টুকরো টুকরো হয়ে ভাসছে কাঁচা নালাটার খানিকটা আবদ্ধ দুর্গন্ধ জলের ওপর। ছন্নছাড়া উদ্বাস্তু কলোনিগুলোর দিকে তাকিয়ে সব কিছুকে বিকট একটা ঠাট্টার মতো মনে হয় এখন।

নিজের ভাবনার গতিতে শিবপ্রসাদ বিরক্ত হয়ে উঠলেন। পাশের ঘরে তাঁর নাতি—বড় ছেলে স্বরাজের একমাত্র সন্তান—আট বছরের নীলাঞ্জন সুর তুলে স্কুলের পড়া করছে। শিবপ্রসাদ ডাকলেন, 'নীলু!'

'আসতাছি দাদু।'

ছেলেটা বেরিয়ে এল। নাম নীলাঞ্জন। কিন্তু গায়ের রঙ ফর্সা, চাঁপা ফুলের মতো রঙ। অপুষ্ট রোগা চেহারা, চোখ দুটো ভীরু আর কোমল। আস্তে আস্তে দাদুর ঈজিচেয়ারের পাশে এসে দাঁড়ালো।

'দাদু, ডাকলা আমারে ?'

একদা জেলখাটা স্বদেশী, দু' বছর আগেও সরকারী স্কুলের হেডমাস্টার ঠাকুর্দাকে সে তুমিই বলে। এই সম্পর্কটাই গড়ে উঠেছে প্রথম থেকে।

দাদুর অদ্ভুত একটা মমতা হয় বাচ্চাটার দিকে তাকালে। রোগা, শান্ত, ভালোমানুষ। সামান্য দোষে মা-বাপের কাছে এক-আধটা চড়চাপড় খেলে চুপ করে এক কোণায় গিয়ে বসে থাকে। জ্বরে গা পুড়ে যায়, মুখ টকটকে লাল, তবু একটা শব্দ করে না কখনো। এই শান্ত, নিরীহ ছেলেটা চারদিকের এই জীবনের মধ্যে কোথায় দাঁড়াবার জায়গা পাবে—যেখানে জীবন ক্রমশ আরো নিষ্ঠুর, আরো কঠোর, আরো জটিল হয়ে উঠছে ?

একটু চুপ করে থেকে শিবপ্রসাদ বললেন, 'জানোস, গন্ধরাজ ফুল দুইটারে ছিঁড়্যা লইয়া গ্যাছে। ডালটারেও ভাইঙা নিছে।'

ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলল নীলু। এই ফুলের পরিচর্যায় সে-ই দাদুর প্রধান সহকারী। জল যুগিয়ে দেয়, খুরপি এনে দেয়, মধ্যে মধ্যে পরম আনন্দে এসে জানায় : 'দাদু, দেইখ্যা যাও—আট-দশটা দো-পাটির গাছ উঠছে।' শিবপ্রসাদ জানেন, নীলুই তাঁর সমব্যথী।

নীলু ম্লান গলায় বললে, 'জানি দাদু। ভোরে উইঠাই আমি দেখছি। তুমি তখন পূজা করতাছিলা, তোমারে কই নাই, শুনলে তো তুমি দুঃখু পাইবা।'

'নাঃ, দুঃখ পাওনের আর কিছু নাই—' শিবপ্রসাদ একবার দাঁতে দাঁত চাপলেন : 'আর থামাথা করুম না এই সমস্ত। কাইট্যা, মুড়াইয়া, ব্যাবাক গাছগুলান ফ্যালাইয়া দিমু বাইরে। অরাও শান্তি পাইবো, আমারও হাড় জুড়াইবো।'

চুপ করে রইল নীলু। দাদুর রাগের কথা।

'কত ফুল আছিল দেশের বাড়িতে। নতুন পুকুর কাটা হইছিল অ্যাকটা—সেই মাটিতে যে কী ফুল হইত! গোলাপে ভইর‍্যা যাইত। আর স্থলপদ্ম। পুকুরের চাইরদিক ঘিরা গাছ লাগানো হইছিল, হাজারে হাজারে ফুল ফুটত—জলে ছায়া পোড়তো, মনে হইত, পুকুর ভইর‍্যা পদ্ম ফুটছে। সংস্কৃত কাব্যে পড়ছিলাম সরোজলক্ষ্মীং স্থলপদ্মহাসৈ—আলোর সেই ছবি।'

শিবপ্রসাদ চুপ করে রইলেন আবার। খেয়াল হল, এসব তিনি নীলুকে বলছেন না, তাঁরই স্বগতোক্তি। সেই স্থলপদ্ম, সে-সব গোলাপ কেউ কোনোদিন চুরি করতে আসে নি; কারণ তখনো ভারতমাতার ছবিটা আলোয়-আশায়-বিশ্বাসে ঝলমল করত—মাথায় তাঁর হিমালয়ের মুকুট—পায়ের তলায় সিংহলের কমল পীঠ।

শিবপ্রসাদ বললেন: 'কারা ফুল ছিঁড়্যা নিছে, জানোস তুই?'

'কেমনে কমু? দেখি নাই তো। কাইল বিকালে পংকজ, রত্না আর দেবু ঘুরতাছিল বাগানের ধার দিয়া—কী য্যান কইতাছিল। অরাই নিছে।'

'ডাইক্যা আনতে পারোস?'

'আইবো না। গাইল দিবো।'

'আমি তো কিছু কমু না। খালি জিগামু, চাইয়া লয় না ক্যান? গাছ ভাইঙা—সর্বনাশ কইর‍্যা কী লাভ হয়?'

'অরা আইবো না দাদু। কইবো, আমরা ফুল নিছি—দ্যাখছস তোরা?' নীলুর স্বর আরো বিমর্ষ হল: 'জানো দাদু, অরা ইস্কুল থিক্যা পলাইয়া বায়োস্কোপে যায়। পংকজ পরশু বাস স্টপের সামনে খাড়াইয়া খাড়াইয়া সিগারেট খাইতাছিল, আমি দেখছি।'

'বুঝছি।'

এ আমার, এ তোমার পাপ। কী বলবেন শিবপ্রসাদ, কাকে বলবেন?

'আইচ্ছা যা তুই, পড় গিয়া।'

নীলু আবার চলে গেল পড়ার ঘরে। শিবপ্রসাদ চোখ বুজলেন।

গন্ধরাজের কুঁড়ি থেকে অনেক দূরে। সেই রাতটায়। স্বাধীনতার রাত্রে।

শহর কলকাতা—তার শহরতলী উত্তাল উতরোল। যুদ্ধ, দাঙ্গা—সব কিছুর শেষ। পলাশীর যুদ্ধের পরে—একশো নব্বুই বছরের শৃংখল মোচন। মধ্যরাতের বেতারে দিল্লীর প্রাণ-তরঙ্গ। কলকাতা—তার শহরতলী—আনন্দে, আবেগে উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে। আলোর দীপালী। জাতীয় পতাকায় আকাশ দেখা যায় না, মাইক্রোফোনে জাতীয় সঙ্গীত—যেন শিউরে উঠছে নক্ষত্রলোক পর্যন্ত।

আর ভিড়। এত মানুষ—এত উত্তেজনা—কেউ কখনো দেখে নি।

এই আনন্দিত কোজাগরীর মধ্যে কোথাও এতটুকু ছায়া নেই আজকে। সেদিনও মুসলিম এলাকায় হিন্দু পা বাড়াতে পারত না—হিন্দু অঞ্চলের কাছাকাছি কোনো মুসলমান হঠাৎ এসে পড়লে প্রাণভয়ে ঈশ্বরের নাম জপ করতে হত তাকে। আজ কোথাও বাধা নেই—কোথাও আশংকা নেই—এ ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করছে। একজন আর একজনকে বলছে—'চল যাই জ্যাকেরিয়া স্ট্রীটে, নাখোদা মসজিদের পাশে সেই রেস্তোরাঁটার বিরিয়ানি পোলাও কতদিন খাই নি। এক দল পাঠান

পুলিস—সেদিন পর্যন্তও যারা হিন্দুদের বিভীষিকা ছিল, একটা লরীতে যেতে যেতে তারা জয়ধ্বনি করে গেল : 'আজাদ হিন্দুস্তান জিন্দাবাদ !' তাদের পেছনে পেছনে একটা জীপে একদল যুবক নাচানাচি করে হিন্দী ফিল্মের গান গাইছে : 'দূর হটো সব দুনিয়াবালে—হিন্দোস্তান হামারা হ্যায় ! দূর হটো—দূর হটো—'

মনে হয় সব বদলে গেছে একটা যাদুমন্ত্রে। কোথাও পড়ে নেই মন্বন্তরের একটা কঙ্কাল—গ্রেট ক্যালকাটা কিলিঙের একটা রক্তের বিন্দু নেই কোথাও—যুদ্ধের সময়কার ব্ল্যাক-আউটে বীভৎস সেই তামসী রাত্রিগুলো নিশ্চিহ্ন হয়েছে চিরকালের মতো। হিমালয়ের তুষার গলে নেমে এসেছে নির্মল জলধারা—উত্তাল হয়ে উঠে এসেছে বঙ্গোপসাগরের ঢেউ, সব ধুয়ে মুছে নিষ্কলঙ্ক হয়ে গেছে।

'তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে,
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে—'

সেই সোনার মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়েছিল শিবপ্রসাদের।

কে একজন তাঁর মধ্যে বলেছিল, 'তবু দেশটা ভাগ হয়ে যাবে ? গান্ধীজী চাইলেন না—তবুও ?'

'তা হোক। শান্তি আসুক।'

'আসবে ?'

'নিশ্চয়। জিন্না যা চেয়েছেন, তা তো পেয়েছেন। তা ছাড়া কমিউনিস্ট পার্টিও তো সাপোর্ট করছে।'

'হুঁ। কিন্তু—'

'কিন্তু নেই এর ভেতরে। দেখছ না অবস্থা ? ভারতবর্ষ ভাগ না হলে থামবে এই হেট্রেড্ ক্যাম্পেন, এই সিভিল ওয়ার ? দাঙ্গায় কলকাতায় অন্তত হাজার পঞ্চাশেক নিরীহ মানুষ প্রাণ দিয়েছে, তোমরা কি চাও তাই চলুক ? আর পাঞ্জাবের নরক ? যা সমস্ত প্রিমিটিভ বর্বরতাকে হাজার গুণে ছাড়িয়ে চলে গেছে ? চাও এসব ?'

'না—তা কেউ চায় না।'

'তা হলে শান্তি আসুক। ওরা ওদের অধিকার নিয়ে খুশি হোক, আমরা আমাদের সীমায় নতুন ভারতবর্ষ গড়তে থাকি। বাড়বাড়ন্ত হোক আজাদ পাকিস্তানের, আজাদ হিন্দুস্তান ফুলে-ফসলে ভরে উঠুক।'

তখন এই পর্যন্তই। এর বেশি ভাববার ক্ষমতা ছিল না তাঁর। তা ছাড়া সমাধানের পথই বা কোথায় ? ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলিম নেতৃত্ব তখন দুই মেরুতে দাঁড়িয়ে—মাঝখানে ঘৃণা আর ভ্রাতৃহত্যার রক্ত-সমুদ্র। কী করা যেত এ ছাড়া ? কী করতে পারতেন মাউন্টব্যাটেন ?

হ্যাঁ, শান্তি আসুক। যে-কোন মূল্যে।

কিন্তু সে মূল্য যে কতখানি দিতে হবে তা তখন কেউ কল্পনাও করতে পেরেছিলেন ? কোন গন্ধরাজ আর থাকবে না। একটু ফুলকেও আর ফুটতে দেবে না কেউ।

'পশ্চিম বাংলা—পশ্চিম বাংলা। পূর্বদিকে আসাম ও পূর্ব পাকিস্তান—' নীলু পড়া করছে।

শিবপ্রসাদ চমকে উঠলেন। পশ্চিম বাংলা—পূর্ব পাকিস্তান।

'নীলু ?'

'কি কও দাদু ?'

'আর কিছু পড়নের নাই তর ? তখন থিক্যা ভূগোল নিয়া চ্যাঁচামেচি কোরতে আছস ?'

'আমি তো অখনি ভূগোল পড়্তাছি দাদু।'

'তা হউক, আর কিছু পড়্।'

নীলাঞ্জন কী বুঝল কে জানে। একটু চুপ করে থেকে বললে, 'তাইলে অংক কষ্তাছি।'

'হ, তাই কষ্।'

বড় ছেলে স্বরাজ বাজার করে ফিরল। সাইকেলটা দাওয়ায় ঠেস দিয়ে রেখে, বাড়ির ভেতর যেতে যেতে ব্যাজার মুখে বলল, 'মাছ আর খাওন যাইবো না। কুড়ি টাকার কমে কথা কয় না।'

ভেতর থেকে স্ত্রীর গলা শুনলেন শিবপ্রসাদ।

'রেশনে কী চাউল দিছে রে স্বরাজ ? ফুইট্যা উঠতে না উঠতেই পিণ্ড পাকাইয়া গেল।'

'ওই পিণ্ড গিলতে হইবো। নইলে খোলা বাজারের চাউল আনতে হইবো দুই টাকা কে-জি—পারবা সেই রাজভোগ খাইতে ? স্বরাজ গজগজ করতে লাগল : 'দেশ তো চিরকালের মতোই ডুবছে—মইর‍্যা শেষ হইছে। অখন ওই র‍্যাশনের চাউল দিয়াই দেশের শ্রাদ্ধে পিণ্ড দেওন লাগবো।'

শিবপ্রসাদ একবার ঠোঁট কামড়ে ধরলেন। বড় ছেলের জন্মের সময় স্বাধীনতার সৈনিক তার নাম দিয়েছিলেন স্বারজপ্রসাদ। রাজনীতির বাড়ি। অল্প বয়েস থেকে স্বরাজও রাজনীতি করত। শিবপ্রসাদ বাধা দেন নি—কেন দেবেন ? কলেজে পড়বার সময় সে পুরোদস্তুর একজন ছাত্রনেতা—বামপন্থী চিন্তা তার, কংগ্রেসী সোসালিজ্মের নির্মম সমালোচক। অনেক উত্তপ্ত তর্ক চলেছে বাপ-ছেলের ভেতরে—কেউ কাউকে বশীভূত করতে পারেন নি।

পাস করবার পরে স্বরাজ চাকরি নিল, তখনো পুরো বামপন্থী। তারপর কী যে হল ! নিজেদের শিবিরেই ভাঙন ধরল তাদের। কিছুদিন পাগলের মতো ছুটোছুটি করল স্বরাজ,শেষে একদিন বাড়ি ফিরে বিস্বাদ বিরস গলায় ঘোষণা করল : 'চুলায় যাউক পলিটিক্স—এই সমস্ত আবর্জনার মধ্যে আমি আর নাই।'

আর একবার ধাক্কা লেগেছিল শিবপ্রসাদের।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে তিনি তখন একটা সরকারী স্কুলের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেড-মাস্টার। ছেলের বামপন্থী রাজনীতিতে তাঁর অবস্থা যে খুব স্বস্তিজনক ছিল তা নয় ; মধ্যে-মধ্যেইনানা অপ্রীতিকর কথা তাঁকে শুনতে হয়েছে। এমনও ভেবেছেন, না হয় দেবেনই চাকরি ছেড়ে, টিউশন করবেন তার চাইতে। ছেলের সঙ্গে তাঁর মতের মিল নেই, পথেরও না। কিন্তু চাকরির খাতিরে তাঁর ছেলের স্বাধীন রাজনৈতিক মতামতে তিনি বাধা দিতে পারেন না। ইংরেজ সরকারকেই জীবনে কখনো ভয় করলেন না—মাথা নীচু

করবেন স্বদেশী সরকারের চোখ-রাঙানিতে ?

সেই ছেলে বলছে—চুলোয় যাক পলিটিক্স। শিবপ্রসাদের ভালো লাগে নি। যেন নিজেকেই পরাভূত মনে হয়েছে তাঁর। যে পথ ধরে তাঁরা এগিয়ে গিয়েছিলেন, সে পথের প্রান্তে দাঁড়িয়ে তখনই তাঁর মনে প্রশ্ন জাগতে শুরু হয়েছে : এই কি চেয়েছিলুম আমরা —এই কি আমাদের সোনার মন্দিরের দ্বার খুলে যাওয়া ? শেয়ালদা স্টেশনে নতুন উদ্বাস্তুদের ভিড় দেখে এবং গেদেতে একবার গিয়ে পেঁছবার দুর্ভাগ্যের পর তাঁর মনে যে ছায়া নামছিল, সেই ছায়ায় এই নতুন ছেলেরাও ডুবে যাবে ?

'দাদু, এই অংকটা একটু দেইখ্যা দাও। এই প্রশ্নের অংকটা।'

নীলাঞ্জন।

চিন্তাটাকে ফিরিয়ে আনলেন, হাতে নিলেন অংকের বইটা।

'অ। এইটা। কিচ্ছু শক্ত না। ত্রৈরাশিকে করতে হইবো। একটু ঘুরাইয়া দিছে।'

নীলু চলে গেল। অংক কষতে আর একজন খুব ভালবাসত। একটা অংকও ভুল হত না তার। স্কুল-ফাইন্যালে পুরো একশো পেয়েছিল।

স্বাধীনতার পরে তার জন্ম। তখনো আকাশে ত্রিবর্ণ পতাকার রঙ অম্লান। তখনো আশায় বিশ্বাসে জ্বলজ্বলে মন। ছেলের নাম রেখেছিলেন আনন্দপ্রসাদ।

আনন্দ।

একবার ঠোঁট কামড়ে ধরলেন শিবপ্রসাদ। বরাবর ভালো ছাত্র। এই নীলুর সঙ্গে অনেক মিল ছিল তার ছেলেবেলায়। এমনি শান্ত, নরম, ফুটফুটে চেহারা। কথা কম বলে, তলিয়ে থাকে নিজের ভেতরে। স্বরাজ যখন উদীয়মান নেতা, তখন টেবিলে সরস্বতীর ছবিকে ভক্তিভরে প্রণাম করে সে অংকের পর অংক কষে যায়।

তিনটে লেটার নিয়ে পাস করল। একটা স্কলারশিপ।

'আমি এন্‌জিনীয়ারিং পড়ব, বাবা।'

'খুব ভালো—খুব ভালো। উই নীড্ এন্‌জিনীয়ার্স টু বিল্‌ড্ আপ আওয়ার কান্‌ট্রি!'

আনন্দ ভর্তি হল এন্‌জিনীয়ারিঙে। এক বছর দু' বছর। তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কারো কোনো সন্দেহ ছিল না, কিন্তু তারপর—

না, এই শান্ত নিরীহ ছেলেগুলোকেই বিশ্বাস নেই। এরাই বুকের ভেতরে সব চেয়ে ভয়ংকর আগুনকে নিঃশব্দে বয়ে বেড়ায়—বাইরে থেকে বুঝতেও পারা যায় না। সাধে কি ইংরেজ আমলের আই-বি-রা সবচেয়ে ভালো ছাত্রদেরই বিপ্লববাদী বলে সন্দেহ করত ?

সেই ইতিহাস যেন ফিরে এসেছে আবার। মরণ নিয়ে খেলা। সর্বাত্মক বিপ্লব। পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের ধোঁকাবাজি ধ্বংস হোক। সশস্ত্র শ্রেণীসংগ্রাম। রাইফেলই শক্তির উৎস।

আনন্দ চলে গেল। ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই ডাকে। এখন পুলিস তাকে খুঁজছে। মার্ডার চার্জ তার নামে।

ঠোঁট চেপে বসে রইলেন শিবপ্রসাদ। না, একটা কথাও তিনি আনন্দের সম্পর্কে ভাবতে চান না। ওদের পথ—ওদের আদর্শ—সব তাঁর চিন্তার সীমা থেকে অনেক

দূরে। আনন্দ কোনোদিন রাজনীতি নিয়ে তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে আসে নি স্বরাজের মতো। স্বরাজরা জানত তাঁরা প্রতিপক্ষ, তাই তর্ক তুলেছে। আনন্দেরা জানে তাঁরা মৃতদেহ—শবের সঙ্গে আলোচনা নিরর্থক।

কিন্তু—

না, আনন্দের সম্বন্ধে তিনি কিছু ভাববেন না। এই বাড়ির কেউ আর ভাবে না। অন্তত তাঁর সামনে ভাবতে সাহস নেই কারুর।

শুধু স্বরাজ একবার বলেছিল, 'অ্যাডভেনচারিজম্। কিন্তু অ্যাডভেনচার আর বিপ্লব কি এক?'

কে জানে! কে বলবে?

'বাবা, এত বেলায় বইস্যা বইস্যা ঝিমাইতাছ? উঠ্‌বা না—চান কর্‌বা না?'

চেয়ে দেখলেন মেয়ে স্বপ্না। অনেক দূর থেকে এল। রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে এখন। মেয়েটার মুখে-কপালে ঘামের ফোঁটা।

'গেছিলি কই মা?'

'গরচা লেনে। এ্যাকজনে এম. এ-র কিছু নোট দিবে কইছিল।'

'পাইলি নোট?'

'না, বাড়িতে নাই। কই গেছে। দেড় ঘণ্টা বইস্যা থাইকাও দেখা হইল না। কাইল ইস্কুল থিক্যা আসনের কালে আর একবার যামু অখন।'

রোদে মেয়েটার মুখ লাল। ঘাম ঝরছে। প্রাইভেটে এম. এ-টা দিতে পারলে স্কুলের চাকরিতে গ্রেড বাড়বে। সেই আশাতেই ঘুরছে স্বপ্না।

'নোট পরে হইবো।' কোমল গলায় শিবপ্রসাদ বললেন, 'তুই জিরা গিয়া।'

'জিরামু। আগে তুমি ওঠো দেখি—চান কইর‍্যা লও।'

॥ পাঁচ ॥

দুপুরে মা কী খেয়েছেন অথবা আদৌ কিছু খেয়েছেন কিনা, প্রবীর জানবার চেষ্টা করল না। মাকে কোনো কথা বলা অনর্থক। টুলু না আসা পর্যন্ত মা'র মুখে কিছুই রুচবে না।

সেই যুক্তিহীন অন্ধ মমতা। মা বাবার মতো বুদ্ধিজীবী নন। অবশ্য বাবা বেঁচে থাকলে এই মুহূর্তে বুদ্ধি দিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা সহজ করে নিতে পারতেন কিনা কিংবা এশিয়ার সম্ভাব্য বেস্ট্ স্কলারের এই সামারসল্ট তাঁর কি রকম লাগত সে কথা এখন জোর করে বলা শক্ত। যে মা চিরদিন ছায়ার মতো রইলেন, একান্ত নির্বোধের মতো ভার টেনে নিলেন, যে মা'র অপদার্থতা সম্বন্ধে বাবা, দিদি এবং টুলুর কোনো সন্দেহ জাগে নি—টুলু ফিরে না আসা পর্যন্ত আড়ালে সে মা'র চোখের জল পড়তেই থাকবে।

কাজেই যে মুরারি হালদারের মুখ দেখলেও সকালটা মাটি হয়ে যায়, সন্ধ্যাবেলায় আবার যেতে হল তাঁর কাছে।

মুরারি বসবার ঘরেই ছিলেন। আরো দুজন কারা ছিল। তাদের তিনি বলছিলেন,

'ঠিক আছে, ওই সেভেন পার্সেণ্টেই সেট্‌ল করে নাও।' তারপর প্রবীরকে বললেন, 'এই যে!'

'টুলুর কী হল জানবার জন্যে—'

মুরারির ভুরু কুঁচকে এল।

'কেন, টুলু বাড়ি যায় নি?'

'ছাড়া পেয়েছে?'

'হ্যাঁ, তিনটে নাগাদ। গোরবাবু বললেন, একটা বণ্ড লিখিয়ে নিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন। আর—' একটু হাসলেন: 'আর বলেছেন এই দলটা সম্পর্কে নানা কমপ্লেন আছে। ভবিষ্যতে হাতে পেলে আর সহজে ছাড়বেন না। একটু সামলে চলতে বলে দিয়ো।'

ঘরের বাকী দুজন লোকের চোখে কৌতূহল। সরু গোঁফের নীচে একজনের বাঁকা হাসি দেখা দিল একটু।

'মস্তান বুঝি?'

'আর বলো কেন? ভদ্রলোকের ছেলেরা যে কী রাস্তায় যাচ্ছে—'

প্রবীরের কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল।

'আচ্ছা কাকা, আসি আজকে। অনেক উপকার করলেন।'

'না না, উপকারের আর কী আছে! এ তো সামান্য ব্যাপার। কিছু ভেবো না —টুলু একটু পরেই বাড়ি ফিরে আসবে। হয়তো একটু লজ্জা হয়েছে—তাই—আচ্ছা এসো—হ্যাঁ, টুলুকে একবার দেখা করতে বোলো তো আমার সঙ্গে!'

'আজ্ঞে বলব।'

প্রবীর বেরিয়ে এল। মুরারি হালদারের গলা শোনা গেল ভেতর থেকে: 'না—না, সেভেন পার্সেণ্টের বেশি হলে—'

টুলু ছাড়া পেয়েছে। আর ভাববার কিছু নেই—করবারও না। কিন্তু কী আশ্চর্য হতভাগা হয়ে গেছে ছেলেটা! তিনটেয় বেরিয়েছে হাজত থেকে, এখন আটটা বাজে। এর মধ্যে একবার বাড়িতে আসবার কথা ভাবতে পারল না? নাকি ইডিয়ট মা'র ওসব বাজে সেণ্টিমেণ্টের কোনো দামই নেই তার কাছে?

ইচ্ছে করল, কান ধরে টেনে নিয়ে আসে।

কোথায় পাওয়া যাবে নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে লেকের ধারে একটা ফুচকা আর আলুর দমের দোকানের পাশে রেলিঙে হেলান দিয়ে সে বন্ধুদের কাছে বক্তৃতা করছে—সাদার্ন অ্যাভিনিউ দিয়ে বাসে আসতে আসতে এই দৃশ্যটা কবারই চোখে পড়েছে প্রবীরের।

যাব তাকে খুঁজতে? কিংবা মাকে আগে দিয়ে আসব খবরটা?

নিশ্চিত কিছু ভেবে নেবার আগে প্রবীর রাস্তার একটা ল্যাম্পপোস্টে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল একটু। মুরারি হালদার থানার ও-সি গোরবাবুকে বলে দিয়েছেন, সেই খাতিরে এযাত্রা একটা মুচলেকা নিয়েই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে প্রতুলকে। এখন তাকে ভালো করবার পালা।

বাবার মতোই, নিজের বুদ্ধিতে অসীম বিশ্বাসী দিদির ধারণা: প্রতুল একবার কাছে

এলে তার উপদেশে সম্পূর্ণ বদলে যাবে, কারণ দিদির ট্রেনিং দেবার ক্ষমতা অসাধারণ—নিজের মেয়ে টিনটিনকে অতি চমৎকার ভাবে মানুষ করছে সে। উপদেশ মুরারি হালদারও দিতে চান—দেবার রাইট আছে তাঁর—নইলে হয়তো আরও ক'দিন থানার হাজতে ভালোরকম ধোলাইয়ের ব্যবস্থা হত প্রতুলের, চাই কি গৌরবাবু একটা কেসেই ফাঁসিয়ে দিতেন তাকে।

কিন্তু উপদেশ তাঁরা দিতে চাইলেও প্রতুলকে পাঠানো যাবে কিনা ঘোরতর সন্দেহ আছে এ ব্যাপারে। সে স্বয়ংসিদ্ধ পুরুষ, কারো মতামতেরই তোয়াক্কা করে না। যদি করত, সব অন্যরকম হয়ে যেত তা হলে।

প্রতুলের যা হওয়ার হোক। কিন্তু মুরারি হালদার! ল্যাম্পপোস্টে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে প্রবীরের মনে প্রশ্ন জাগল—জিনিসটা এখন কি রকম দাঁড়ালো?

'এই সব লোকেরাই শত্রু। এরাই বুর্জোয়া—শ্রমিকের রক্ত শুষে নিয়ে এদেরই বাড়বাড়ন্ত। ইতিহাসে এদের জন্যে কোনো ক্ষমা নেই—' এই সমস্ত মৌলিক তত্ত্ব প্রবীরও ঘোষণা করেছে ইলেকশানের সময়। কিন্তু কী আশ্চর্য, কনট্র্যাডিকশ্যান থিয়োরী আর প্র্যাকটিসের ভেতরে। প্রতিদিনের জীবনে সামান্য বিপদে পড়লেই এরা ছাড়া যেন ত্রাণকর্তা কেউ নেই। স্বার্থসিদ্ধির প্রশ্ন উঠলে এদের কাছে গিয়েই ধরনা দিতে হয়ঃ 'আপনার তো দিল্লীতে অনেক জানাশোনা সোর্স আছে—যদি আমার জন্যে—'

না—দাবি-দাওয়া নয়। এ আমার ন্যায্য পাওনা—আমাকে দিতেই হবে, একথা বলবার মতো জোর তো গলায় কোথাও নেই। তখন স্রেফ ভিক্ষুকের ভূমিকা, চাটুকারের ব্রত। সভায় দাঁড়িয়ে মুরারি হালদারের মুণ্ডপাত করা—আর বাড়ি গিয়ে হাত কচলে বলাঃ 'আমার ভাই গুণ্ডামি করে হাজতে আছে—সুতরাং যদিও কাজটা সম্পূর্ণই বে-আইনী, তবু অনুগ্রহ করে—আপনার ইনফ্লুয়েন্সে তাকে আপনি ছাড়িয়ে আনুন।'

খাসা!

এরপর প্রবীর ব্যানার্জি কোনো ইলেকশান মিটিঙে বলতে পারবেঃ 'আপনারা জনগণের শত্রু শোষক মুরারি হালদারকে ভোট দেবেন না?'

যারা ইউনিয়নের নেতাদের ওপর হামলাবাজি করে, মালিকের টাকা খায়, কোলিয়ারী অঞ্চলের যে পেশাদার খুনেরা দিনদুপুরে শ্রমিকদের বল্লম-কৃপাণ দিয়ে খুন করে—তারপর ফেলে দেয় কোনো পোড়ো খাদের ভেতর—তারাও এর চেয়ে ভালো, তাদের কোনো মুখোশ নেই। অথচ প্রবীর ব্যানার্জি বামপন্থী ক্যাণ্ডিডেটের জন্যে প্রাণপণে লড়ে থাকে।

সব—সব ওই স্কাউনড্রেল টুলুর জন্যে। পারিবারিক সম্পর্ক—আপন ছোট ভাই! চুলোয় যাক ছোট ভাই। উল্লুকটা বছর পাঁচেক জেল খেটে এলেও এই বিশ্বসংসারে কার কী আসত-যেত?

আর মা!

সেই অন্ধ অর্থহীন স্নেহ। কেন, মা কি একথা ভাবতে পারেন না যে ফলটা পচে গেছে, তার গাছ থেকে ঝরে যাওয়াই ভালো? মা'র কি এমন মনে হতে পারে না—টুলু বলে যে ছেলে তাঁর ছিল, অনেকদিন আগেই মরে গেছে সে, কিংবা আদৌ

তার জন্মই হয় নি ?

ডান হাতের মুঠোটাকে শক্ত করে চেপে ধরল প্রবীর। বাবা-দিদি-টুলুর কথাই হয়তো ঠিক। মা কেবল কতকগুলো ইন্‌সটিংক্ট দিয়ে তৈরি—ব্রেন বলে, লজিক বলে তাঁর কিছু নেই। নইলে আজ নিজের মনের কাছে এমন ভাবে ছোট হয়ে যেতে হত না প্রবীরকে।

চিন্তাটা থমকে গেল। একটু দূর থেকে দুটি ছেলের কথা কানে আসছে। একটির বয়েস চোদ্দ-পনেরো, আর একটির কুড়ি-বাইশ বছর হবে।

কথা ছোটটাই বলছিল।

'সেই দুটো বোন একসঙ্গে যাচ্ছিল। যেটা ছোট—স্কুলে পড়ে না? এমন সেজেছিল মা—'

চোদ্দ বছরের ছেলের মুখে কী অপরূপ ভাষা!

বড় ছেলেটা বললে, 'ছোটটা খাসা দেখতে মাইরি। চাকু চালিয়ে দেয়।'

'সেই জন্যেই তো আমি একটু ইয়ার্কি মেরেছিলুম। তা বলে কিনা—এক চড় মারব! আমি বললুম, দু' চড় মারব—'

'খিক খিক খিক—'

বড় ছেলেটা শেয়ালের মতো শব্দ করে হাসল: 'তাপ্পর মা?'

'তাপ্পর কী হল, সেটা শোনবার জন্যে আর দাঁড়ালো না প্রবীর। এ এমন একটা কিছু নতুন ব্যাপার নয়—পৃথিবীর প্রথম দিন থেকেই এগুলো ঘটে আসছে। কিন্তু আজ যেন চারদিকে সব কিছুই কদাকার হয়ে উঠেছে, এখন একটা ছোট ঘামাচিও বিষফোড়া হয়ে দেখা দেয়।

প্রতুলের দোষ নেই। এবার স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিলেই হল। তারপর যে রসাতলের দিকে যেতে চাও।

বাড়ির দিকে চলতে চলতে রেডিওর খবর। স্থানীয় সংবাদ ছড়িয়ে পড়ছে হাওয়ায়।

'যুক্তফ্রন্টের সংকট আরো ঘনীভূত হয়ে উঠেছে বলে তাঁরা মনে করেন। বাংলা কংগ্রেসের যে ক'জন মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাঁদের পদত্যাগপত্র দাখিল করেছেন—'

না—কোথাও দাঁড়াবার জায়গা নেই। পায়ের তলায় যেটাকে পাথরের শক্ত ভিত বলে মনে হয়েছিল, তার তলায় এতখানি চোরাবালি জমে আছে কে জানত?

দেশ কারুর নয়। দলটাই পরম এবং চরম।

'তোর জন্যে আমি একদিন গলায় দড়ি দেব। তুইও বাঁচবি—আমিও বাঁচব।'

'সত্যি বলছি মা, আমার কোনো দোষ ছিল না। আমি ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলুম কেবল।'

বাড়িতে পা দিতে গিয়ে প্রবীর দাঁড়িয়ে পড়ল। তার মানে, টুলু ফিরে এসেছে। খুব সম্ভব ইডিয়টিক ইমোশন্যাল মা-টাকে একটু সান্ত্বনা দিতে চায় কিংবা বন্ধু-বান্ধবগুলো হাজতে আটকে আছে বলে কোথাও আড্ডা দেবার জায়গা নেই এখন?'

'কেন দাঁড়িয়ে থাকলি? গণ্ডগোল হচ্ছিল—কেন ওখান থেকে চলে গেলি না তখন?'

প্রবীর উঠোনে এসে দাঁড়ালো। বারান্দায় একটা মোড়া পেতে প্রতুল বসে, দাদার দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিলে। বাস্তবিক, চক্ষুলজ্জার বালাইটা তা হলে এখনো আছে তার!

মা বসে ছিলেন উঠোনের দিকে পিঠ দিয়ে। একটু আগেই খুব কেঁদেছেন, গলার স্বর এখনো ধরা: 'হ্যাঁরে, তোর কি একটু মায়াও হয় না আমার জন্যে?'

'টুলু!'

প্রবীর ডাকল। মা ফিরে তাকালেন।

'কে রে, ভুলু? টুলু এসেছে।'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি—' প্রবীরের স্বর শক্ত হয়ে গেল। সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠতে উঠতে বললে, 'তুই আমার ঘরে একটু আয় টুলু—তোর সঙ্গে কটা কথা আছে আমার।'

শুনেই মা ছটফট করে উঠলেন।

'তুই আর ওকে এখন কিছু বলিস নি ভুলু, বাড়িতে আসবামাত্রই তো আমি—'

'মা, তুমি চুপ করো তো!' কর্কশ গলায় প্রবীর ধমক দিলে একটা। বিস্বাদ বিরক্ত মনটা দপ করে তার জ্বলে উঠল বারুদের মতো—বেরিয়ে এল একেবারে দিদির প্রতিধ্বনি: 'তুমিই আদর দিয়ে ওর মাথাটা খেয়ে দিয়েছ।'

মা চুপ করেই গেলেন। দুটো ভিজে ভিজে চোখ ভরে উঠল ভয়ে—যন্ত্রণায়।

সেদিকে তাকালে মায়া হয়। প্রবীর তাকালো না। অন্ধ মমতার সময় নয় এখন।

'টুলু—আয় আমার ঘরে।'

টুলু উঠে এল। দু' ভাই বসল ঘরে এসে। মুখোমুখি। টুলু একটা চেয়ারে, প্রবীর খাটের কোণায়।

মিনিটখানেক স্তব্ধতা। ঘরের টাইমপীসটার শব্দ। তারপর:

'তোর জন্যে আমাকে মুরারি হালদারের কাছে তদ্বির করতে যেতে হয়েছিল।'

মাথা নীচু করে বসে ছিল প্রতুল, চোখ তুলল।

'কেন গেলে?'

'নইলে আরো আটকে রাখত। কেসে জড়িয়ে দিত। শুধু নিজেই ডুবছিস না টুলু—আমাদেরও ডোবাচ্ছিস একসঙ্গে।'

'কী কেস করত?' প্রতুল এবার পিঠ সোজা করল: 'আমি ও-সবের ভেতরে ছিলুম না।'

'মিথ্যেই জড়িয়ে নিয়েছে তোকে?'

'তাই।'

'মারামারির ভেতরে তোর বন্ধুবান্ধবেরা ছিল না? ছোরা বের করে নি?'

'আমি বলতে পারব না—দূরে দাঁড়িয়ে ছিলুম।'

'ও—তাই বুঝি!' একটু চুপ করে থেকে প্রবীর জিজ্ঞেস করল, কখন ছাড়ল তোকে থানা থেকে?'

'এই সন্ধ্যের সময়।'

'না—বেলা তিনটেতে!'

প্রতুল একবার চমকালো।

'কে বললে ?'

'থানার দারোগা।'

টুলু সামলে নিলে।

'এই বেরিয়ে—আসতে আসতে—'

বাধা দিয়ে প্রবীর বললে, 'টুলু, কী লাভ এসব বলে ? একটা মিথ্যেকে ঢাকতে গিয়ে আরো দশটাকে টেনে আনতে হয়। তোর সঙ্গে কথা বাড়াতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। শুধু একটা কথার জবাব দে আমার। এইভাবেই চলবে ?'

গোঁজ হয়ে প্রতুল বললে, 'যা ভাবছ তা নয়। আমি কাজ খুঁজছি।'

'সে তো খুব সুখের কথা। কিন্তু সকালবেলা মেয়েদের কলেজটার রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকলে, সন্ধ্যায় লেকের কাছে গুলতানি করলে, এখানে-ওখানে মারামারি করে বেড়ালে কাজ পাওয়া যাবে ? না কি এইটেই কাজ ?'

'দাদা, বড্ড বাড়িয়ে বলছ !'

নির্লজ্জতায় মাথার ভেতরটা জ্বালা করে উঠল প্রবীরের। ইচ্ছে করল, ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেয় ওর গালে। কিন্তু তেইশ বছরের ভাইকে শাসন করবার রাস্তা নয় ওটা। অনেক দেরি হয়ে গেছে।

'আমি বলছি না, পুলিসে বলে।'

'পুলিসে ও-রকম বলেই থাকে।'

'তা হবে, ওরা মিথ্যে শত্রুতা করছে তোর সঙ্গে !' প্রবীর একবার নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরল : 'কিন্তু হায়ার সেকেণ্ডারীও যে পাস করল না—কেউ তাকে চাকরি দেবে ? টুলু, এখনো তো সময় যায় নি। তুই পরীক্ষা দিতে পারিস, পাস করতে পারিস—'

'পাস করে কি হবে দাদা ? হাজার হাজার বেকার এনজিনীয়ারই তো চাকরি পায় না।'

মোক্ষম যুক্তি। জবাব মুখে তৈরিই আছে।

'তাতে তোর কী আসে-যায় ? তুই তো চেষ্টা করে দেখিস নি !'

'এম. এ., এম. এস্‌সি. পাস করব, অথচ কাজ একটা কোথাও জুটবে না—অতখানি এনার্জি আমি অকারণে নষ্ট করতে চাই না দাদা।'

না, কলেজের মেয়েদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলে এনার্জির সাশ্রয় হয়। অনেক এনার্জি বেঁচে যায় পথে-ঘাটে মস্তানি করে বেড়ালে। আবার একটা জিঘাংসা ফুটে উঠল মনের ভেতরে। কিন্তু তেইশ বছরের ভাইয়ের গায়ে হাত তোলা যায় না। তা ছাড়া পকেট থেকে যে একটা ছোরা বেরিয়ে আসবে না, তাই বা কে বলতে পারে !

'তুই কী করতে চাস তা হলে ?'

'বললুম তো—কাজের ব্যবস্থা করছি একটা।'

'কী কাজ—জানতে পারি ?'

'ভাবছি, এজেন্সি নেব কিছু কিছু।' টুলু যেন প্ল্যান গুছিয়ে নিতে চাইল একটা : 'ধরো, স্কুলে-কলেজে এটা-ওটা সাপ্লাই দেব। কিংবা কলেজ-ল্যাবরেটরিতে তো অনেক

কিছু লাগে—সেগুলোও যোগান দিতে পারি ওদের। এই সব ভাবছি।'

'তা হলে ভাবনাটা কাজে লাগালে হয়!'

'কিছু ক্যাপিটাল দরকার। অন্তত শ'পাঁচেক টাকা।'

প্রবীর টুলুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

'তুই সিরীয়াস?'

'তুমি আমাকে কী ভাবো দাদা?'

আমি কিছুই ভাবতে চাই না—কিছু না ভাবতে হলেই বেঁচে যাই। টুলু ব্যবসা করবে—রোজগার করবে—দায়িত্ব নেবে—এমন আশ্চর্য শুভ ঘটনা ঘটে গেলে ভাববার আর কিছুই থাকে না। কিন্তু—

টুলু আবার বললে, 'তুমি টাকাটার ব্যবস্থা করে দাও—আমি লেগে পড়ব।' বলতে বলতে একটু উজ্জ্বল হল তার চোখ।

মিনিটখানেক চুপ করে রইল প্রবীর।

'আচ্ছা দেব টাকা। তোর আমার জয়েন্ট অ্যাকাউণ্টে বাবা যে সামান্য কিছু রেখে গেছেন, তাই থেকেই তুলে দেব। কিন্তু তার আগে এক মাস আমি তোমায় দেখব। আর তোমার ওই অ্যাসোসিয়েশনটি ছাড়তে হবে।'

টুলু বললে, 'তুমি মিথ্যে অবিচার করছ। আমার বন্ধুরা কেউই মস্তান নয়। কাজ-কর্ম নেই বলে—। কিন্তু আমরা ঠিক করেছি, জনতিনেকে মিলে পার্টনারশিপে ব্যবসাটা আরম্ভ করব।'

'ও, পার্টনারশিপ!' প্রবীর যেটুকু কোমল হয়ে উঠেছিল, সঙ্গে সঙ্গে সেটা শক্ত হয়ে গেল।

'হ্যাঁ। মাণিক আর প্রমোদ—'

'ওরাও নিশ্চয় পাঁচশো করে টাকা দেবে?'

টুলু একটু থামল।

'হ্যাঁ—তা—তা দেবে বইকি।'

'খুব ভালো কথা। ওদের টাকা যোগাড় করতে বলো তা হলে। এক মাস পরে পার্টনারশিপ ডীড রেজিস্ট্রি করিয়ে দেব। তোমায় কিছু ভাবতে হবে না—আইন-কানুনের ব্যাপারগুলো আমিই দেখব এখন।'

ব্যবসায়ের উৎসাহে কোথায় যেন ভাটা পড়ে গেল টুলুর।

'অল্প থেকে আরম্ভ করব, তার জন্যে এত সবের দরকার আছে দাদা?'

কঠোর মুখে প্রবীর বললে, 'আছে। তোমার পাঁচশো টাকা নিয়ে দুই বন্ধুতে সেটা পরম আনন্দে উড়িয়ে দেবে, টাকা এত সস্তা নয়!'

'ওরা এত ইরেস্‌পন্‌সিব্‌ল্‌ নয়, দাদা।'

'কতখানি রেস্‌পন্‌সিব্‌ল্‌ তার প্রমাণ তো এখনো পাওয়া যায় নি!' তীক্ষ্ন চোখে প্রবীর টুলুর দিকে তাকিয়ে রইল: 'আইনসম্মতভাবে না হলে একটা পয়সাও আমি দেব না।'

'আচ্ছা, আমি কথা বলব ওদের সঙ্গে—' টুলু নির্জীব হয়ে গেল।

প্রবীর আবার তাকিয়ে রইল টুলুর দিকে। ব্যবসা করবে! আসলে শ'পাঁচেক

টাকা হাতে পেলে কিছুদিন চমৎকার কেটে যায় বোধ হয়। তারপর বললেই চলে : 'সুবিধে হল না দাদা—বিজনেস ফেল করেছে। আরো শ'পাঁচেক হলে—'

প্ল্যানটা ভালো। খুব ইণ্টেলিজেণ্ট। কোনো প্রাণের বন্ধুই যোগান দিয়েছে খুব সম্ভব।

একবার ইচ্ছে হল, বলে—'রাস্কেল, তোর পয়সা-কড়ি বাড়ি-ঘরের অংশ যা আছে সব ভাগ করে নে—তারপর ঝাঁপিয়ে পড় যে নরকে তোর খুশি।' কিন্তু মা! একটা যুক্তিহীন, অন্ধ, অবিবেচক মমতার দেওয়াল রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। কিছুই করা যায় না—কেবল নীলকণ্ঠ হওয়া ছাড়া।

কিংবা—কিংবা এমন হতে পারে, নিজের মনটাই সংকীর্ণ হয়ে গেছে তার। নিজের ভাইকে সে আর বিশ্বাস করতে পারছে না—সে ভালো হতে চাইলেও না।

একটু চুপ করে থেকে, ক্লান্ত একটা নিঃশ্বাস ফেলে প্রবীর বললে, 'টুলু, আজ স্বপ্নার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।'

আর একবার চমকালো টুলু। এবার মুখটা একটু বিবর্ণ হল তার।

প্রবীর আস্তে আস্তে বললে, 'মেয়েটা কোনো স্কুলে চাকরি করছে বোধ হয়। টুলু, তোর জন্যে ও কতখানি করেছিল, মনে আছে? ওই মেয়েটার জন্যেও কি তুই ভালো হতে পারিস না?'

টুলু উঠে দাঁড়ালো।

মাথা নামিয়ে বললে, 'আমি এখন একটু শুয়ে পড়ব দাদা, শরীরটা ভালো লাগছে না।'

ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

তার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে প্রবীরের মনে হল, হয়তো এখনো সব শেষ হয়ে যায় নি, হয়তো এখনো আশা আছে। কাল-পরশু একবার যেতে হবে স্বপ্নাদের বাড়িতে।

আর মনে পড়ল—আজ দু' মাস, না—তারও বেশি—সাবিত্রীর সঙ্গে তার দেখা হয় না।

॥ ছয় ॥

বি-টি আছে, প্রাইভেটে এম. এ-টা পাস করিলে গ্রেড বাড়ে। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর একটু বইপত্র নিয়ে বসল স্বপ্না। কিন্তু নিশ্চিন্ত হয়ে পড়বার জো নেই, একরাশ হোম-টাস্কের খাতা দিয়েছে মেয়েরা।

সেই খাতাগুলো দেখে, ভাষা আর বানানের বিপর্যয়ে লাল কালির দাগ টানতে টানতে রাত এগারোটা বাজল। তারপর এম এ-র নোটগুলো। কিন্তু কিছুই স্পষ্ট বোধগম্য হচ্ছিল না তার, কাণ্ট-হেগেল-দর্শনের তত্ত্ব, সব একসঙ্গে জড়িয়ে যেতে লাগল, মনে হতে লাগল সব লাল কালি দিয়ে কাটাকুটি করা।

একমাত্র বাবার ঘরে আলো। বড়দা শুয়ে পড়েছে, ছোড়দার ঘর তালাবন্ধ। বাবার ঘুম কমে গেছে, অনেক রাত অবধি এটা-ওটা পড়েন, আবার ঘুম থেকে উঠে পড়েন চারটে সাড়ে চারটে না বাজতেই। ছোড়দা উধাও হয়ে যাওয়ার পর থেকেই বাবার

অনিদ্রা আরও বেড়েছে। ছোড়দা সম্পর্কে বাবার কী যে আশা ছিল।

নোটগুলো সরিয়ে রেখে স্বপ্না চোখ তুলল। পাশের বাড়িতে একতলা-দোতলায় সব আলো নিবে গেছে। নারকেলগাছের শব্দ উঠছে হাওয়ায়—নির্জন পথের ওপর পাতার ছায়া দুলছে। একটা সাদা কুকুর ঘণ্টাখানেক আগে চলে-যাওয়া কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীর উদ্দেশে সামনের দিকে মুখ ঘুরিয়ে একটানা সুরেলা ভঙ্গিতে ডাকছে ঃ ভু-ঔ-ঔ-ঔ—

বাবার অনেক আশা ছিল ছোড়দার ওপর। কিন্তু ছোড়দা ঝড়ের মধ্যে পা ফেলে এগিয়ে গেল। সে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার আগে পর্যন্ত কিছু বোঝাই যায় নি; নিয়মিত পড়াশুনো করছিল, শেষ পরীক্ষায় খুব ভাল রেজাল্ট করে বেরিয়ে আসবে, তাতেও কোনো সন্দেহ ছিল না।

অথচ ছোড়দা মনে মনে তৈরি হচ্ছিল। সে চিরদিন কম কথা বলে, বাইরে থেকে মনের চেহারা কখনো বোঝা যায় না। সে যে রাজনীতি নিয়ে ভাবত—এমন সন্দেহই কারো জাগে নি কোনো দিন। অথচ এ বাড়িতে রাজনীতি চিরকাল সজাগ—দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে পর্যন্ত বাবা ও ছাড়া আর কিছুই ভাবেন নি আর স্বাধীনতার পরে বড়দা গলা চড়িয়ে বলত ঃ 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়।'

ছোড়দা থাকত নিজের পড়াশুনো নিয়ে। সেই ছিল তার তপস্যা।

বড়দা বলত ঃ 'একেবারে বুক-ওয়ার্ম'। বইয়ের বাইরে পৃথিবী বলে কিছু নেই ওর কাছে।'

সেই বড়দা এখন রাজনীতির নামে বিরক্ত। দু-একটা বামপন্থী সভা-সমিতিতে কখনো-সখনো যায়, পত্রিকা কিংবা বই-টই পড়ে, তার বেশি আর কিছুই নয়। বলে, 'দেশ বলে আর কিছু নেই, যা আছে তা দলাদলি। কমন এনিমির কথা ভুলে গিয়ে ওরা নিজেদের মধ্যে লড়তে চায় এখন—শ্রমিকের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয় শ্রমিককে, কৃষককে দিয়ে কৃষকের রক্ত ঝরায়। বাংলা দেশে লেফটিস্ট পলিটিক্সের বারোটা বাইজ্যা গেছে।'

আবার বাবা তলিয়েছেন নিজের ভেতর। তিনি আর কথা বলেন না।

কী পেয়েছেন ? তিনিই জানেন। অথবা বাবার মতো পুরনো আদর্শবাদীরা কিছুই চান না। একটু আগেই কান্ট পড়ছিল সে। বাবার জীবনের তত্ত্ব ইমানুয়েল কান্টের জীবন-ভাষ্যের মধ্যেই আছে। 'অন্যের সুখের জন্য, সকলের সুখের জন্যেই তো তোমার সাধনা ; কিন্তু তোমার নিজের জন্যে আছে পূর্ণতা ; সেই পূর্ণতা তোমার ব্যক্তিগত সুখ দেবে সে আশা রেখো না—হয়তো যন্ত্রণা, হয়তো চরম দুঃখই তুমি পাবে —কিন্তু পূর্ণতা ছাড়া আর কিছুই তোমার কাম্য নেই।' নান্য তস্মাৎ—আর কোন আশঙ্কা তুমি রেখো না।

বাবা দেশের জন্যে, সকলের জন্যে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন। নিজে চেয়েছিলেন 'পূর্ণ" হতে—কী পেয়েছেন ? ছোড়দাও সেই পথই বেছে নিয়েছে। 'ঘরের মঙ্গল শঙ্খ নহে তোর তরে।' বাবা ছোড়দার কাছে অনেক আশা করেছিলেন, কিন্তু ছোড়দা কি তাঁকে নিরাশ করেছে ? সেও যন্ত্রণার পথ ধরে যেদিকে চলেছে—

'ঘুমাস নাই ?'

স্বপ্না চমকালো। বৌদি।

'অখন শো গিয়া। বারোটা বাজে।'

'এই এটটু নোটগুলান দ্যাখতাছিলাম। পড়নের সময় পাই না তো সমস্ত দিন।'

'ছাই পড়তাছস।' বৌদি বিছানার কোণটায় বসে পড়ল: 'পাঁচ-সাত মিনিট ধর্যা আইস্যা খাড়াইয়া রইছি—তর চক্ষু তো বইয়ের দিকে নাই।'

'না', স্বপ্না হাসল: 'ঠিকই ধোরছো—পড়ায় মন বসতাছে না। এটা-ওটা ভাবতাছিলাম। তা তুমি উইঠ্যা আইলা ক্যান ?'

'ঘুম আসতাছে না। আইজ আবার একটু টানের মতন উঠল।'

বৌদির হাঁপানি আছে। মধ্যে মধ্যে খুব কষ্ট পায়, আবার হয়তো বছরখানেক কোনো চিহ্নও থাকে না।

স্বপ্না বললে, 'বেশি ?'

'না, সেই রকম কিছু না। উইঠ্যা একটা ট্যাবলেট খাইলাম, তারপর একটু কম। কিন্তু ঘুম আর আসল না। দেখলাম তর ঘরে আলো জ্বলতাছে—তাই আইলাম।'

স্বপ্না বললে, 'আমার জন্য ভাবতে হইবো না, অখন শোও গিয়া।'

বৌদি একটু চুপ করে রইল।

'ভালো লাগতাছে না। একটা চাকরি-বাকরি করলে হইত।'

'এই শরীর নিয়া ?'

শুধু হাঁপানি নয়, সেটা বড় কথাও নয়। বৌদির শরীর নীলু হওয়ার পর সেই যে ভাঙল, তারপর থেকে তার এটা-ওটা অসুখের বিরাম নেই আর। অল্প অল্প জ্বর হয় যখন-তখন। ডাক্তার বলেন, অ্যানিমিয়ার জন্যে।

বৌদির নিঃশ্বাস পড়ল একটা।

'সত্যি, শরীরটা যে কীভাবেই ভাঙল! সব কাজের বাইরে চইল্যা গেছি। এক-একদিন বিছানায় পইড়্যা থাকি, তর আর মায়ের উপর সংসারের সমস্ত খাটুনি গিয়া পড়ে। অথচ—'

অথচ এ শরীর অন্য রকম ছিল এক সময়। সারাদিন এখানে-ওখানে ছুটোছুটি করে কিংবা মিছিলের সঙ্গে চার-পাঁচ মাইল পথ হেঁটেও এতটুকু ক্লান্তি অনুভব করা যেত না।

বৌদির একটা নিঃশ্বাস পড়ল। নির্জন পথটার ওপর একটা শিরীষগাছের পাতার ছায়ানাচ। নারকেলগাছের শব্দ। বৌদির মনে ছবির পর ছবি আসছিল।

স্বরাজের সঙ্গে তার পরিচয়, মিছিলের ওপর পুলিস-চার্জের পর।

স্বরাজ বসে পড়েছিল ময়দানে। মাথা দিয়ে রক্ত পড়ছিল তার। বৌদি—সুজাতা—ছুটে গেল সেদিকে।

['নিন আমার এই রুমালটা। কপালটা বেঁধে ফেলুন।'

'ধন্যবাদ কমরেড।'

'ধন্যবাদ পরে দিলেও চলবে। ও কি হচ্ছে, কীভাবে বাঁধছেন ? দিন আমাকে—ঠিক করে দিচ্ছি।'

'বাঁচালেন। এসব আপনারাই ভালো পারেন।'

'সে তো হল। কিন্তু খুব লেগেছে নাকি? উঠতে পারবেন?'

'পারব আশা করি। অচল হয়ে যাই নি।'

একটু তাড়াতাড়ি তা হলে সচল হোন কমরেড। আবার মাউণ্টেড পুলিস আসছে এদিকে। নিন—উঠে পড়ুন, ধরুন আমার হাত—']

'বৌদি!' স্বপ্না ডাকল।

সুজাতার চোখে তখনো স্বপ্নের ঘোর। হাসল একটু।

'তর দাদার লগে আলাপ হইছিল রাজনীতির মধ্য দিয়া। এক জেলায় বাড়ি শুইন্যা ভাবটা বেশি হইয়া গেল, চইল্যা আইলাম এই সংসারে। ভাঙা শরীরটা নিয়া—সংসারের মধ্যে জড়াইয়া গিয়া সেই সব ভুইল্যা থাকনের চেণ্টা করি। কিন্তু এক এক সময় কেমন যেন ফ্রাস্ট্রেশন আসতে চায়।'

'মন খারাপ কইর‍্যা কী লাভ বৌদি? বড়দা তো ওই সব ছাইড়্যাই দিছে।'

'হ, ছাড়ছে অনেক দুঃখে। এককালে যারা আছিল পাশাপাশি, একসঙ্গে থাকল, জীবনের সমস্ত কিছু স্টেক করল—তারা অখন এ অর নামে কুৎসা ছড়ায়, কয় দালাল, কয় বিশ্বাসঘাতক! বোঝলাম খুবই দুঃখের কথা। কিন্তু তাই বল্যা হাল ছাইড়্যা দিতে হইবো? লড়াই শেষ হইয়া গেছে? সব প্রব্লেম্ মিট্যা গেছে দেশের?' বৌদির স্বরে বিষন্নতা ঝরে পড়তে লাগল: 'এ তো পার্সোনাল ডিফীট—হার স্বীকার কইর‍্যা সইর‍্যা যাওয়া—এতে আর কী লাভ হইবো?'

স্বপ্না চুপ করে রইল। আবার ছবি ফুটল সুজাতার চোখে।

['সুজাতা!'

'বলো।'

'ওরা মদ খাইয়ে আর্মড পুলিস এনেছে আজ। গুলি চলবে।'

'চলুক। মেরে ফেলবে, তার বেশি তো কিছু করতে পারবে না।'

ঠিক কথা। কয়েকজনকে মেরে ফেলবে, কিন্তু বিপ্লব থামবে না। লক্ষ-কোটি বন্দুকেও না। তুমি জানো, ফ্রান্স সিন্ডিক্যালিস্টরা কী বলত ক্লেমাসো সম্পর্কে? ঝাঁটা হাতে নিয়ে যেমন সমুদ্রের ঢেউকে—]

সুজাতা ম্লান গলায় বললে, 'কি রকম হইয়া গেল সমস্ত। অথচ জীবনটারে এইভাবে কখনো দেখি নাই। আমরা যেন ক্যামন হাইর‍্যা যাইতাছি। রেডিয়োর নিউজ শুনছস আইজ?'

'শুনেছি।

'ক্রাইসিস বাড়্তাছে। তর্ কী মনে হয়? ভাঙবো?'

'কি জানি!'

'একটা বছরও বত্রিশ পয়েণ্টের উপর স্টিক করতে পারল না। কী কৈফিয়ৎ দিবো লোকের কাছে?'

'অরাই ভাববো।'

'হ, অরাই ভাববো। দোষ চাপাইবো এ ওর ঘাড়ে। এ যদি বিট্রেয়াল না হয়, তাইলে—'

'বৌদি, তোমার আমার ভাবনের কিছু নাই। ভাইবা কিছু করনও যাইবো না।

যাও—শোও গিয়া অখন।'

সুজাতা বসে রইল চোখ নামিয়ে। করবার কিছু নেই? নিজেদের এত বড় ব্যর্থতা নিয়ে মাথা নামিয়ে সরে যেতে হবে? বলতে হবে, আমরা পারলুম না—নিজেদের লক্ষ্যই আমরা ঠিক করতে পারি নি এখনো?

সুজাতা ঠোঁট কামড়ে ধরল একবার। 'স্বপ্না, আবার পলিটিক্স্ করুম।'

'এই শরীর নিয়া?'

ঠিক। এই শরীর। সুজাতা তাকিয়ে রইল জানলা দিয়ে। সামনে নির্জন পথটা নয়, গাছের ছায়া নয়, ঘুমন্ত রাত্রির হাওয়া নয়—অনেক দূরে একটা সমুদ্র দেখা যায়। তার ঢেউ ভাঙছে, ফেনা উঠছে, ডাক শোনা যাচ্ছে রক্তের ভেতরে। একদিন ওর ঢেউয়ে ঢেউয়ে সাঁতার কেটেছে সুজাতা। কিন্তু আজ সেই সমুদ্র অনেক দূরে সরে গেছে, সেখানে যাওয়ার আর পথ নেই তার।

বুকের মধ্যে একটা যন্ত্রণার অনুভূতি। ওষুধ খাওয়ার পরে হাঁপানির যে টানটা তখন থেমে গিয়েছিল, সেটা আবার বেড়ে উঠছে মনে হয়।

স্বপ্না আবার বললে, 'বৌদি, যাও শোও গিয়া। আমার আর একটু পড়তে হইবো।'

শিথিলভাবে উঠে দাঁড়ালো সুজাতা। সেই তখন আর একটা কথা মনে হল তার। এই যে বই-খাতা খুলে নিয়ে রাত জেগে বসে আছে স্বপ্না, তার একটা অর্থ যেন আভাস দিল তার কাছে।

'একটা কথার জবাব দিবি স্বপ্না?'

'কী?'

'টুলুর লগে এর মধ্যে দেখা হইছিল তোর?'

সঙ্গে সঙ্গে শক্ত হয়ে গেল স্বপ্না। বুকের ভেতরে ধক্ করে উঠল তার।

'না।'

'দেখা না হওনই ভালো—' এক ঝলক মমতা ঝরে পড়ল সুজাতার গলায়: 'একেবারে নষ্ট হইয়া গেছে। তরু দাদায় কইতাছিল—'

'বৌদি, তুমি শোও গিয়া।'

না—কার্ট্ নয়। পরীক্ষার প্রয়োজনেও না। কী হবে এসব আদর্শে, বিশ্বাসে, পরিশুদ্ধ জ্ঞানের আরাধনায়? স্বপ্না বইখাতাগুলো বন্ধ করে ফেলল।

প্রতুলকে তার অনেকদিন আগেই ভুলে যাওয়া উচিত ছিল। সে জানে, প্রতুল এখন এক নৈরাজ্যের আনন্দে ভাসিয়ে দিয়েছে নিজেকে। তার সঙ্গী আলাদা, তার মন আলাদা। সব কিছুকে অস্বীকার করবার, সব দায়িত্বকে এড়িয়ে যাবার, জীবনকে নিয়ে জুয়ো খেলবার সহজিয়া আনন্দটাই বড় হয়ে উঠেছে তার কাছে।

অথচ, আশ্চর্য—ভাবাই যায় না।

তখনও বাবা এ বাড়ি তৈরি করেন নি। প্রতুলদের পাশের বাড়িতে তারা ভাড়াটে থাকত। প্রায় সাত-আট বছর ছিল। সেই সময়।

এক বয়েসী দুজনে। বোধ হয় মাস তিনেকের বড়ো ছিল টুলু। সহজ পরিচয় —সরল মেলামেশা। তারপর ধীরে ধীরে মনের কাছে এই সত্যটা ধরা পড়ল যে টুলুদা ছাড়া জীবনে আর কাউকে ভাবাই যাচ্ছে না।

তখন বয়েস কত আর? পনেরোর বেশি নয়।

টুলু গান গাইতে পারত। বিশেষভাবে যে শিখেছিল তা নয়, স্বাভাবিক সুর ছিল তার গলায়। স্বপ্না বলেছিল, 'তুমি আমার শক্ত অঙ্কগুলো কষে দাও—আমি তোমায় হারমোনিয়মে সা-রে-গা-মা'র পাঠ দিই।'

টুলু বলেছিল, 'একটা আইডিয়া এসেছে মাথায়।'

'কী আইডিয়া?'

'তুই আর আমি লেখাপড়া ছেড়ে দিই।'

'চমৎকার আইডিয়া। কিন্তু তারপর?'

'তুই আর আমি পথে পথে গান গেয়ে বেড়াব।'

'তার মানে?' স্বপ্না হেসে উঠেছিল: 'পথে পথে গান গেয়ে গেয়ে ভিক্ষে করতে হবে? এটা এমন কি চমৎকার আইডিয়া যে—'

'আঃ, থাম্ না—আমাকে বলতে দে। আমরা চারণ-চারণীর মতো—রাজপুতদের হিস্টরি জানিস তো—সেই রকম পথে পথে স্বদেশী গান গাইব। দেশের লোককে মাতিয়ে তুলব। খুব মহৎ কাজ হবে—তাই না?'

রোমাঞ্চ জেগেছিল। সে আর টুলু। পথে পথে গান গেয়ে ঘুরছে।

'সে তো ভালোই হবে। কিন্তু তার আগে হায়ার সেকেণ্ডারীটা পাস না করলে বাবা তাড়িয়ে দেবেন কিন্তু বাড়ি থেকে!'

'দূর—তোর যত বাজে ভাবনা! পড়াশুনা করে কিচ্ছু হবে না—শুধু বেকারের দলে লাইন দিতে হবে। জানিস—আজকাল আমার পড়তেই ইচ্ছে করে না একেবারে—'

'স্বপ্না—'

স্বপ্না কেঁপে উঠল।

না, টুলু নয়। জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে আনন্দ। একরাশ রুক্ষ বিশৃঙ্খল চুল আর পাণ্ডুর মুখের ওপর ঘরের আলোটা ছড়িয়ে পড়েছে।

'ছোড়দা!'

ঠোঁটে আঙুল দিয়ে আনন্দ বললে, 'চুপ।'

'ভেতরে আয়।'

'না। ঘরে রুটি কলা-টলা কিছু থাকে তো দে আমাকে। এখুনি পালাতে হবে।'

॥ সাত ॥

রেলিংয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে, একটা পা ঠুকতে ঠুকতে টুলু বললে, 'ধুর, ভালো লাগছে না কিছু।'

একজোড়া অল্পবয়েসী ছেলেমেয়ে হাতে হাত জড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল লেকের দিকে। আড়চোখে তাদের লক্ষ্য করতে করতে শিস দিচ্ছিল মানিক। টুলুর কথাটা তার কানে গেল না।

'মেয়েটা বেড়ে দেখতে মাইরি!'

টুলু আবার বললে, 'কিচ্ছু ভালো লাগছে না।'

'চল্ না—ফলো করি। দ্জনে বেশ মজে রয়েছে মনে হচ্ছে রে। নিশ্চয় কোথাও নিরিবিলিতে বসবে—' চোখ চিকচিক করতে লাগল মানিকের : 'চাই কি দ্'একটা—'

'আঃ, কী বকে যাচ্ছিস তখন থেকে! যাক্ না!'

মানিক কপাল কোঁচকালো।

'হল কী তোর? অমন ভোম্বা মেরে গেছিস কেন?'

'তোকে তো আর থানার লক-আপে থাকতে হয়নি, প্লিস আসতে দেখে কেটে পড়লি। বাপ্স—কী মশা রে! মনে হচ্ছিল মশা নয়—চামচিকের বাচ্চা সব। আর কী ঠুকরেছে মাইরি! আর একটা রাত থাকতে হলে গায়ের চামড়াটা স্দ্ধ্ উপড়ে নিত।'

'ফনে আর কার্তিক তো রয়েছে।'

'ও দ্টোর গণ্ডারের চামড়া—' ট্ল্ম্ মুখ বেঁকিয়ে বললে, 'মশার চোদ্দপ্রুষও ওদের কিচ্ছ্ করতে পারবে না। বললে বিশ্বেস করবি নে, আমি যখন সারারাত বসে বসে মশা চাপড়াচ্ছি, তখন কাত্তিক রাস্কেলটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে নাক ডাকাচ্ছিল।'

মানিক হাসল : 'ওদের অব্যেস আছে।'

'সে আর বলতে হবে না। কিন্তু আমার এ-সব পোষাবে না মাইরি। তোদের পাল্লায় পড়ে আমি বখে গেল্ম। এবার তোদের দল আমায় ছাড়তে হবে।'

'রিয়্লি!' ট্যারা চোখে তাকিয়ে মানিক জিজ্ঞেস করল, 'তারপর?'

'একটা কাজকর্ম খ্ঁজতে হবে।'

'কাজকর্ম! তোমায় দেবার জন্যে—' একটা অশ্লীল উপমা দিয়ে মানিক কথাটা শেষ করল, 'বসে আছে! ইঞ্জিনীয়াররা পর্যন্ত আর্দালীর চাকরির জন্যে ফ্যা-ফ্যা করছে, তোমায় কে কাজ দেবে চাঁদবদন?'

'ভিড়ে পড়ব যে কোনো কলে-কারখানায়।'

'কটা কারখানায় লক-আউট হয়ে আছে, সে খেয়াল রাখো যাদ্? লাল ঝাণ্ডা-ওয়ালারা দিয়েছে সেদিকে বারোটা বাজিয়ে। যে-সব জায়গা খোলা আছে সেখানেই কি ঢোকবার উপায় আছে তোমার? ওদের ইউনিয়নের লোক না হলে?'

'বিজনেস করব। চায়ের দোকান দেব একটা।'

'কারা তোমার দোকানে চা খেতে আসবে চাঁদ? এই আমরাই তো! ভাবিসনি, বাকী খেয়ে সাত দিনেই তোর গণেশ উল্টে দেব।'

সব কথায় ঠাণ্ডা জল ছিটিয়ে দিসনে—বলে দিচ্ছি মানিক।' ট্ল্ম্ বিরক্ত হল : 'না, কিছ্ একটা করতে ইচ্ছে। রাতদিন দাদা খ্যাচ-খ্যাচ করছে—বাড়ি ফিরলেই মা ফোঁস ফোঁস করে কাঁদে। আর সহ্য হয় না এসব। ভারী ভুল হয়েছে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে।'

[illegible]লি কেন?'

'কী করব? সরস্বতী প্জোর ফাণ্ড থেকে টাকা মেরে দিয়ে এমন কেলেঙ্কারি হল—'

'টাকা মেরে দিয়েছিলি?'

'তখন হঠাৎ—' বলতে গিয়ে ট্ল্ম্ থামল। একটি মেয়ের ম্খ। স্বপ্না। অনেক

জল গড়িয়ে গেছে তারপরে। টুলু ভেবেছিল রোগা ওই ছোটমতন মেয়েটাকে সে ভুলে গেছে অনেকদিন আগে। কিন্তু ইচ্ছে করলেই ভোলা যায় না। মনে পড়ে— আর মনে পড়লেই কি রকম কষ্ট হয় একটা। সব কিছু কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে গেল—অথচ এ-রকম না হলেও বোধ হয় ক্ষতি ছিল না।

মানিক বললে, 'তারপর ?'

'তারপর আর কী ?' টুলুর ঘোর ভাঙল : 'দেখতেই পাচ্ছিস।'

ট্রাউজারের পকেট হাতড়ে একটা সিগারেটের বাক্স বের করল মানিক।

'নে।'

দুজনে দুটো সিগারেট ধরালো।

'সত্যি বল্ তো মানিক, এভাবে তোর ভালো লাগে ?'

মানিক মুখ ছুঁচলো করে আস্তে আস্তে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে লাগল কয়েক সেকেন্ড। তারপর :

'এসব কথা তুলে কেন ব্যাজার করে দিস, বল্ তো ? ভালো লাগে কি না সে কথা ভাবতেও ভালো লাগে না। প্রাণপণ টুকেও শালা দু-বারেও স্কুল-ফাইন্যাল পেরুতে পারলুম না। বাবাকে তো দেখেছিস সারাদিন খেটেখুটেও দু-বেলার সংস্থান করতে পারে না—তিরিক্ষি হয়ে থাকে। জুতো দিয়ে পিটতে আরম্ভ করল। জুতোটা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে পাল্টা বসাতে যাচ্ছিলুম—তারপরে মনে হল, দুর শা—, জন্মদাতা তো বটে, গায়ে জুতো তোলাটা কেমন ইয়ে হয়ে যায়। ছাড়লুম বাড়ি। উঠে এলুম মাসীর কাছে। বেশ আছে এরা—বুঝলি ? মেসো ডকে চুরি-চামারি করে—তিনটে মাসতুতো ভাই ওয়াগন ভাঙে।'

'তুইও যাস ?'

'কী করব, বল্ ! ওদের সংসারে থাকব, খাব, কাজকর্ম না করলে চলে ? তোকে কতদিন বললুম, চলে আয় আমাদের লাইনে, কিন্তু তুই ব্যাটাচ্ছেলে মনে মনে স্রেফ ভদ্দরলোক, কিছুতেই রাজী হলি না। তোর তো ঘরে খাবার ভাবনা নেই—ধেনো আর ফুর্তির খরচটা অন্তত চলে আসত।'

টুলু চুপ করে রইল একটু।

'ওয়াগন ভেঙে সারাজীবন চলবে ?'

'চালালেই চলবে। আমরা তো মাইরি চিনির বলদ—স্রেফ কিছু কমিশন পাই। দেখে আয় না ভুঁড়ো শেঠজীদের, চোরাই মাল বেচে লাল হয়ে উঠছে সব। ওরা যদ্দিন আছে, তদ্দিন আমরাও আছি।'

'কিন্তু এ ছাড়া কোনো রাস্তা নেই ?'

'সব রাস্তাই তো একদিকে যাচ্ছে রে—চোর নয় কোন্ ব্যাটাচ্ছেলে ! মনে কর্— রেলের কোনো কেতা-দুরস্ত বাবু চুলের ডগা থেকে পায়ের জুতো পর্যন্ত ভদ্দরলোক— ওয়াগনভর্তি লাখ টাকার মালকে চালান করে দিলে সাইডিঙে—বললে, এম্‌টি ওয়াগান। তারপর লরী এনে মাল ধীরে-সুস্থে বের করে নিলেই হল। বল্—এ-সব ভদ্দরলোকের চলছে না ?'

'ওরা তো গা বাঁচিয়ে চলে। তুই একদিন গুলি খেয়ে মরবি।'

'ব্যাস্—ওই পর্যন্তই। মরবার পরে তো আর কোনো ভাবনা নেই। আমি বলছি টুলু, চলে আয় আমাদের সঙ্গে। মধ্যে মধ্যে কেমন বেসুরো গাস তুই—ভিড়ে পড়—দেখবি কী থ্রিল—শরীর-মন টান-টান হয়ে থাকবে।'

'তার চেয়ে পলিটিক্স করলে কেমন হয়?'

'ধ্যাৎ!' সিগারেটটায় মানিক এমন টান মারল যে আঙুলের কাছে পৌঁছে গেল তার আগুনটা। 'ওদের মালকড়ি কী আছে? যা দু-চারটে টাকা ছোঁয়ায় ইলেকশনের সময়। একবার পেরিয়ে গেল তো আর পাত্তা নেই মক্কেলদের। তবে এক ধাক্কায় মন্ত্রী-টন্ত্রী হতে পারলে নেহাৎ মন্দ হত না—কিন্তু সে মওকা তো আর তোমায় কেউ দিচ্ছে না।'

টুলু আবার চুপ করে রইল।

সামনে সাদার্ন অ্যাভেনিউ দিয়ে ডবল-ডেকার গেল একটা। মানিক হাসল।

'এই দোতলা বাসগুলো যখন পোড়ে না, তখন বেশ লাগে দেখতে।'

'পুড়িয়েছিস বুঝি?'

'হ্যাঁ, দুবার।'

'ও-সব তো পলিটিক্সওয়ালারা করে, তুই কী বলে গেলি ওর ভেতর?'

কৌতুকে চোখ দুটো ঝিকমিক করতে লাগল মানিকের।

'সে বেশ মজা হল, জানিস! ছেলেগুলো খেপেই বেরিয়েছিল মিছিল নিয়ে। একটা দোতলা বাস দাঁড়িয়ে গেল সামনে। বেশ চকচকে নতুন বাস রে—কোথাও চোটফোট খায়নি তখনো। বললুম, 'এগিয়ে আসুন দাদারা—ওই তো রয়েছে সরকারী বাস—দিন ওটাকে জ্বালিয়ে! কাছেই কেরোসিনের একটা দোকান ছিল, আনলুম একটা টিন টেনে। তারপর—' মানিকের চোখ দুটো ক্রমেই উজ্জ্বল হতে থাকল: 'যা জ্বলল না—কী বলব তোকে! ফায়ার-ব্রিগেড আসছিল, খানকয়েক ইট খেয়েই হাওয়া।'

সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মানিক বললে, 'শালা ঝকঝকে চকচকে কিছু দেখলেই মাথায় আমার আগুন ধরে যায়। ধবধবে আদ্দির পাঞ্জাবি পরে এক ভদ্দরলোক যাচ্ছিল, পাশ থেকে এমন এক কনুইয়ের ঘা মারলুম যে হুড়মুড়িয়ে একরাশ ময়লার মধ্যে পড়ে গেল। দু-তিনটে মেয়ে বেশ বাহার দিয়ে বোধ হয় বায়োস্কোপে যাচ্ছিল—এক শিশি কালি ছুঁড়ে দিলুম তাক করে—বুঝলি, ঠিক বোমার কাজ করল—কাঁদতে কাঁদতে সব কটাই দৌড়ুল বাড়ির দিকে। আচ্ছা গোটা কলকাতার সব বড় বড় বাড়ি, সব ট্রাম-বাস যদি একসঙ্গ আগুনে পুড়তে থাকে আর সব মেয়ে-পুরুষকে যদি কালি দিয়ে নাইয়ে দেওয়া যায়. তা হলে বেশ হয়—না রে? খুব চমৎকার লাগে—তাই না?'

'কী বিটকেল সব ভাবনা তোর!'

'তুই উল্লুক একটা, মনেপ্রাণে নিপাট ভদ্দরলোক। এ-সব তুই বুঝবি না—' বলতে বলতে মানিকের দৃষ্টি চলে গেল অন্যদিকে, টুলুর কাঁধে একটা থাবড়া মারল সে।

'ওই মেয়েটাকে দেখছিস! ওই যে—গোলাপী শাড়ি পরা?'

'হুঁ, দেখছি।'

'কিভাবে জামা-কাপড় পরেছে বল্ তো মাইরি! ওটুকু আর রাখা কেন দিদিমণির? মামলা একেবারে মিটিয়ে ফেললেই তো হয়!'

'তুই গিয়ে বলে আয় না কথাটা।'

'বলতুম। কিন্তু সঙ্গের লোকটা একটু ষণ্ডা চেহারার, তা ছাড়া দলটাও তো নেই আজকে। কিন্তু মাইরি—তুই-ই বল্ না—এমনি করে সেজে লোককে উস্কানি দেবে, আর আমরা একটা সিটি মারলেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল? আমাদের দেখাবে বলেই রাস্তায় নেমেছ, আর আমরা দেখবার জন্যে তাকালেই মানে টোসকা পড়ে যায়? সাধে কি আর ওদের গায়ে কালির বোতল ছুঁড়তে ইচ্ছে করে!'

'তুই বড্ড বকছিস আজকাল। চল্, চা খাওয়া।'

'চা কেন—' মানিক পকেট থাবড়ালো: 'পকেটে কিছু আছে আজ। চল্ না সন্ধ্যের পরে একটু—'

টুলু মাথা নাড়ল।

'না—দু-চারদিন যাক। মা বড্ড কান্নাকাটি করছিল।'

'তুই ভালো ছেলে হওয়ার চেষ্টা করছিস!'

'ক'দিন একটু সামলে চলতে হবে—', টুলু আবার অন্যমনস্ক হল। কাল রাত্রে দাদা ভারী বিশ্রীভাবে স্বপ্নার কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছে। কিছুতে ভোলা যাচ্ছে না—কোনোমতেই না। বুকের ভেতরে সেই থেকে যন্ত্রণা থমথম করছে একটা। মনে হচ্ছে কোথায় যেন গোলমাল হয়ে গেল, সব অন্যরকম হতে পারত, সব অন্যরকম হলে কোনো ক্ষতি ছিল না।

'তা হলে চল্ ব্রীজের ওপারে। ক'দিন ধরে দেখছি দুটো কালো কালো অল্প-বয়েসী মেয়ে একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে খুব খলবল করে—চনমনে চোখ। ভাব জমানো যাবে মনে হচ্ছে। শিকার ধরার লাইনে—'

'ধেৎ—এসব ছাড়া কিচ্ছু ভাবতে পারিস নে তুই?'

'আর কী ভাববার আছে, তুই বল্?' মানিক হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল: 'তা হলে চল্ সন্ধ্যেবেলা মাঠের দিকে, ক'দিন ধরে খুব কেত্তন-টেত্তন হচ্ছে। ধম্মো হবে।'

টুলু বললে, 'থাম্—সিগ্রেট দে আর একটা।'

আবার সিগারেট ধরালো দুজনে। আর এতক্ষণে মানিকের একটা কথা মনে হল।

'ভালো কথা, তোকে যে আগে ছেড়ে দিলে?'

'দাদা তদ্বির করেছিল।'

'ও-রকম দাদা থাকা ভালো মাইরি।' মানিকের নিঃশ্বাস পড়ল: 'আমার বাবা হলে কী বলত, জানিস? ধরে নিয়ে গেছে, বেশ হয়েছে। যদি ফাঁসি দেয় আরো ভালো হবে তা হলে।'

'দাদা ভালো না কচু! এমন এক-একটা কথা বলে যে—'

টুলু আবার থামল। সেই স্বপ্না। কিভাবে শুরু হয়ে কোথায় যে থমকে গেল সমস্ত! আর এগুলো মনে পড়ে গেলে কিছুই আর ভালো লাগে না, কিছুই না। রাত্রে যখন ঘুম আসে না, শরীরটা এলিয়ে পড়ে থাকে—মনের সামনে যতদূর চোখ যায় ধু-ধু করতে থাকে সব, তখন স্বপ্নাকে ভাবলে—ভাবলেই বুকের ভেতরে কী যেন তির-তির করে কান্নার মতো কাঁপে। আচ্ছা স্বপ্না যদি কথনো জানতে পারে যে, সে গুণ্ডামি

করে হাজতে গিয়েছিল, তা হলে তখন—

'ও দুটোকে ছাড়ল না, না ?'

'না। তবে হয়তো দু-একদিন পরেই বের করে দেবে।'

'আমার সন্দেহ আছে।' মানিক চিন্তিত হল : 'ওদের ধারণা ফনে ছিনতাইয়ের দলে আছে।'

'তাই কি ?'

বাঁকা চোখে তাকিয়ে মানিক বললে, 'আমি কী জানি ?'

'তুই জানিস নে ?'

'তোমার মা তো লুকিয়ে-চুরিয়ে হাতখরচা দেয় চাঁদ। ওর খরচ কে যোগায় ? একজন ভদ্দরলোকের একটা হাতঘড়ি গেলে সে পরদিনই আর একটা কিনতে পারবে, কিন্তু ওকে তো মা-বাপকে খাওয়াতে হবে। ওর বাপ তো এক বছর কারখানার চাকরি খুইয়ে বসে আছে।'

'তবু এসব করে—'

'কী করবে রে রাস্কেল, কী করবে ? রাস্তা বাতলে দিতে পারিস ?'

মানিকের চোখ হঠাৎ দপ করে উঠল : 'আমাদের পাড়ার একটা মেয়ে খুব ভালো মেয়ে বুঝলি—আমরাও কোনোদিন কুনজর দিইনি, বাড়িসুদ্ধ খেতে না পেয়ে এখন কী করছে জানিস তুই ? জানিস কেন সে এখন বড় বড় মোটরগাড়িতে চেপে ঘুরে বেড়ায় ?'

টুলু চুপ করে রইল।

'ভালো ভালো কথা বলিসনি, শুনলে গা জ্বালা করে।'

'মরুক গে, চল্—চা খাওয়াবি। পকেটে কিচ্ছু নেই।'

'মার কাছ থেকে কিছু পাসনি ?'

'চাইতে সাহস হল না। মার মেজাজ ভালো নেই।'

'বললুম তো, চলে আয় না আমার সঙ্গে। পয়সাও আছে, থ্রীলও আছে।' পকেট থেকে দুটো দশ টাকার নোট বের করল মানিক : 'দেখছিস তো !'

'না—আমি পারব না।'

'তুই একটা কাওয়ার্ড।'

'তা বলতে পারিস।'

'তোর আমাদের সঙ্গে আসাই ভুল হয়েছে।'

'তাই ভাবছি। এবার দল ছাড়ব তোদের।'

'তারপর কী করবি ? ভদ্দরলোক হবি ?'

'চেষ্টা করে দেখব।'

মানিক আবার খিলখিল করে হেসে উঠল।

'হাসলি যে ?'

'পারবি না। আবার টাকা মেরে দিয়ে, কেলেংকারি বাধিয়ে আমাদের কাছেই ফিরে আসবি। আর—'

সেই সময় একটা মোটর এসে একেবারে ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গেল। ভেতর থেকে দিদির তীক্ষ্ণ গলা কানে এল : 'টুলু—'

টুলু চমকে উঠল। হাত থেকে পড়ে গেল সিগারেটটা।

দিদি নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করছিল। পেছনের সীটে টিনটিন আর বাড়ির কুকুর ক্যাসিয়াস।

দিদি গলা বাড়িয়ে তেমনি তীক্ষ্ন নীরস গলায় বললে, 'গাড়িতে উঠে আয় টুলু, তোকে আমি অনেকদিন ধরে খুঁজছি।'

॥ আট ॥

ব্লক সি, এগারো নম্বর ফ্ল্যাটের ডোর-বেলটা টিপেও মিনিট দুই দাঁড়িয়ে থাকতে হল। তারপর মনে হল, দরজার ওপরে কাচ-বসানো ছোট গোল গর্তটির ভেতরে যেন একটি তীক্ষ্ন চোখের দৃষ্টি। দরজাটা খুলল তারও পরে।

সাবিত্রী বললে, 'ও তুমি ?'

প্রবীর বললে, 'খুব নিরাশ হয়েছ মনে হচ্ছে। আর কাউকে আশা করেছিলে নাকি ?'

একটু অপ্রস্তুতভাবে হাসল সাবিত্রী।

'আশা করতে দোষ কী ? তুমি তো ভুলেই গেছ। কিন্তু দরজাতেই দাঁড়িয়ে থাকবে—ভেতরে আসবে না ?'

দু'ঘরের কো-অপারেটিভ ফ্ল্যাট। একা সাবিত্রীর জন্যে এর বেশি জায়গা দরকার হয় না। বাইরের ঘরে তার বইপত্র, কটি বসবার আসন। অল্প খরচে যেটুকু সাজিয়ে রাখা যায়।

সাবিত্রী বললে, 'একটু বোসো, আসছি।'

একটা টিপয় থেকে দুটো চায়ের পেয়ালা তুলে নিয়ে ভিতরে চলে গেল।

দুটো পেয়ালা। তার মানে দুজনে চা খাচ্ছিল একসঙ্গে। এবং অনুমান করা যেতে পারে, চা খাওয়াটা এইমাত্র শেষ হয়েছে। আজ সাত বছর ধরে সাবিত্রীর স্বভাব তার জানা। সব জিনিস সে গুছিয়ে পরিপাটি করে রাখতে ভালবাসে। চা খাওয়া হয়ে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ ধরে পেয়ালা-পিরিচ ফেলে রাখবে সে ধাতই তার নয়। তা হলে এক্ষুনি একটু আগেই আর কারো সঙ্গে চা খাচ্ছিল সে।

অবশ্য সে যে-কেউ হতে পারে। হয়তো তার কলেজের কোনো সহকর্মী এসেছিল, কোনো ছাত্রী আসতে পারে, যে-কোনো আত্মীয়স্বজনেরও আসা অসম্ভব নয়। কিন্তু দরজার বেল বাজিয়েও দু' মিনিট ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হল কেন ? এবং সাবিত্রী দরজা খুলে দিলে কেন মনে হল, তার মুখে-চোখে একটা ভয়ের ছাপ পড়েছে কোথাও !

নিজের ভাবনার গতিটা লক্ষ্য করে প্রবীর লজ্জিত হল। ছি ছি, গোয়েন্দাগিরি করছে নাকি সে ! অথবা একটা জেলাসির কাঁটা খচ-খচ করে উঠেছে তার মনের ভেতরে ? কিন্তু জেলাসির তো কারণ নেই কিছু। সাবিত্রীর সঙ্গে সম্পর্কটা তার গড়ে উঠেছে গভীর একটা বন্ধুত্বের মতো। হয়তো যে-কোনোদিন একদিন বলা যেতে পারত : 'এসো আমরা বিয়ে করে ফেলি' এবং সাবিত্রীও হয়তো বলতে পারত : 'আপত্তি নেই, করো বন্দোবস্ত।' কিন্তু বলা হয়নি। ঠিক বলবার মতো সময়টাই আসেনি, কিংবা

মেজাজটাই তৈরি হয়নি, অথবা অবচেতনভাবে এই বাধাটাই প্রবীরের ছিল—সাবিত্রী এম. এস-সি., কলেজে পড়ায়, তার মতো সাধারণ গ্র্যাজুয়েট একজন করণিককে বিয়ে করাটা তার পক্ষে—

অতএব সময় গড়িয়ে গেছে। সাবিত্রীও তো এগিয়ে এল ত্রিশের দিকে। এখন যদি কাউকে তার ভালো লেগে থাকে, বিয়ে ঠিক হয়ে যায় এবং এই মুহূর্তে লাল কালিতে ছাপা একখানা হলুদ রঙের চিঠি হাতে করে সে যদি এসে বলে, 'আসছে সোমবার আমার বিয়ে, এসো কিন্তু—' তা হলে হাসিমুখে অভিনন্দন জানাতেও তার কিছুমাত্র দ্বিধা হওয়া উচিত নয়।

সাবিত্রী এল। হলুদ রঙের চিঠিখানা অবশ্যই তার হাতে ছিল না।

'তোমার জন্যে জল চাপিয়ে দিয়ে এলুম।'

'আর তুমি ?'

'আমি এক্ষুনি খেয়েছি।'

'কার সঙ্গে'—এই প্রশ্নটা এগিয়ে এল মুখের সামনে। সেই জেলাসি। ছি ছি, কোনো মানে হয় !

সাবিত্রী মুখোমুখি বেতের চেয়ারটায় বসে পড়ে বললে, 'একেবারে ভুলে গেছ মনে হয়।'

'কী করব ? আমি থাকি দক্ষিণের শহরতলীতে, তুমি ফ্ল্যাট কিনলে উত্তর মেরুতে। তোমার কাছে আসতে হলে এক মাস আগে থেকে প্রোগ্রাম করতে হয়।'

আবার হাসল সাবিত্রী।

'আগে হলে আমার কাছে আসবার জন্যে বর্ধমান পর্যন্ত ডেলি প্যাসেঞ্জারি করতেও তোমার আপত্তি হত না।'

'ঠিক কথা। কিন্তু উভয়ত। আগে হলে সপ্তাহে অন্তত দিনতিনেক দক্ষিণ শহরতলীর আলো-বাতাস তোমার খুব স্বাস্থ্যকর বলে মনে হত।'

'শোধবোধ। কিন্তু কী হয়েছে জানো—ল্যাবরেটরি থেকে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস সেরে বেরুতে বেরুতে প্রায়ই সন্ধ্যে হয়ে যায় ! তাছাড়া দু-চারজন স্টুডেন্টও আসে, তাদেরও দেখিয়ে দিতে হয় এক-আধটু।'

'মানে টিউশন ? কলেজের মাইনেয় একা মানুষের চলে না ? খুব টাকা জমাচ্ছ বোধ হয় ?'

সাবিত্রী আবার হাসল : 'সবাই টাকা দেয় না। কিন্তু টিউশন তো করতেই হবে। কিস্তিতে ফ্ল্যাট কিনেছি জানোই তো ! সে টাকা শোধ তো করতে হবে।'

'ঠান্ডা জল ছিটিয়ে দিলে। ভেবেছিলুম, ধার চাইব।'

'টাকার দরকার তোমার ?' সাবিত্রী সঙ্গে সঙ্গে উৎসুক হল : 'নেবে তুমি ? শ'-তিনেক টাকা পেয়েছি ইউনিভার্সিটির খাতা দেখে—কাছেই রয়েছে। নিয়ে যাও না।'

'যদি শোধ না দিই ?'

'দিতে হবে না।'

'এরকম মহাজন তো পাওয়া যায় না !'

'মহাজন ঠিকই বসে আছে।' সাবিত্রীর চোখের তারা নিবিড় হয়ে এল : 'বসে বসে

তার দিন কাটে। কিন্তু খাতকেরই দেখা নেই—সাধ্য-সাধনা করেও তাকে পাওয়া যায় না।'

সেই সাবিত্রী। জেলাসির খোঁচাটুকু নিশ্চিহ্ন হয়ে কোথায় মিলিয়ে গেল।

সাবিত্রী আবার বললে, 'সত্যি, নাও না টাকা। তুমি টাকা নিলে আমার খুব ভালো লাগবে। তোমাকে তো কোনোদিন আমি কিছু দিতে পারিনি।'

সময়টা ঠিক এখনই। এখনই বলা যায়, শুধু টাকা কেন, টাকার মালিককে পর্যন্ত আমার দরকার। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত যে বাধাটা একটা সীমার পরে আর এগোতে দেয়নি, এবারও সেইটেই এসে দাঁড়িয়ে গেল মাঝখানে।

সাবিত্রীর একটা হাত মুঠোর মধ্যে টেনে নিলে প্রবীর।

'সত্যি টাকার দরকার নেই এখন। হলে নিশ্চয় চাইব। তুমি ছাড়া কার কাছে চাইতে পারি আর!'

হাতের চাপটা বোধ হয় একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল। একটা চাপা যন্ত্রণার শব্দ বেরুল সাবিত্রীর মুখ থেকে।

'কী হল, লাগল?'

'না না—' সাবিত্রী লজ্জা পেলো: 'এমন কিছু নয়।'

হাত খুলে গিয়েছিল দুজনের। প্রবীরের চোখে পড়ল,সাবিত্রীর বাঁ হাতের তর্জনীতে ফ্লেশ-কালার ব্যাণ্ডেজ একটা।

'কী হয়েছে হাতে?'

'কিছু না। ল্যাবরেটরিতে একটা টেস্ট-টিউব ভেঙে গিয়ে—'

'সাবিত্রী?'

'অ্যা!'

'আমাদের দুজনেরই বয়েস বাড়ছে—না?'

'বাড়ছে।'

'এরপরে আমরা বুড়িয়ে যাব।'

'তাই নিয়ম।'

'এখন ভাবছি—'

সাবিত্রী দু চোখভরা স্নিগ্ধতা নিয়ে তাকালো।

কিন্তু কী বলা যায়? সময়টা আবার ফিরে এসেছে। কিভাবে বলা যায় কথাটা? অথবা বলা যায় না আদৌ? কতখানি পর্যন্ত মনের দিক থেকে এগিয়ে আছে সাবিত্রী? সে নিজেও? টুলুটা বখে যাচ্ছে। চারদিকে থমথম করছে অনিশ্চয়তা। সেও কি তৈরি হতে পেরেছে?

'দিদি, অগত্যা চা-টা আমাকেই করে আনতে হল।'

ঘরের ভেতরে একটা বোমা ফাটলেও এতখানি চমক লাগত না দুজনের। সাবিত্রী প্রায় লাফিয়ে উঠল চেয়ার ছেড়ে, বেকুবের মতো চেয়ে রইল প্রবীর।

চায়ের পেয়ালা হাতে করে আনন্দ।

আনন্দ আবার বললে, 'দেখলুম চায়ের জল চাপিয়ে স্রেফ ভুলে গেছে সাবিত্রীদি, ওদিকে সব জল স্টীম হয়ে আকাশে রওনা দিয়েছে। তাই তোমাদের আর ডিস্টার্ব না

করে নিজেই ভুলুদার জন্যে চা করে আনলুম। কিছু মনে কোরো না সাবিত্রীদি, যদিও তুমি একুনি আমায় চা খাইয়েছ, তবু নিজের জন্যে আর একবার হাফ কাপের লোভ সামলাতে পারলুম না।'

বলে নির্বিকারভাবে চায়ের একটা পেয়ালা নামিয়ে দিলে প্রবীরের সামনে।

প্রবীর এক ঢোক গিলল: 'আনন্দ, তুমি এখানে?'

'একেবারে চলতি অর্থে অতিথি, ভুলুদা। ভোরবেলা উঠে সাবিত্রীদিকে জাগিয়েছি, আবার আজকে শেষরাতে উধাও হয়ে যাব। তোমাদের গল্পে ডিস্টার্ব করলুম, কিছু মনে কোরো না। আমি আবার গা-ঢাকা দিচ্ছি যবনিকার অন্তরালে।'

'তোকে আর জ্যাঠামো করতে হবে না—' সাবিত্রীর ফর্সা গালে লালের ছোপ পড়ল। হাতে হাত মেলানোটা লক্ষ্মীছাড়া আড়াল থেকে দেখেছে কিনা কে জানে! সাবিত্রী বললে, 'বলেছিলি তোর কথা যেন কাকপক্ষীতেও জানতে না পারে! বেরিয়ে এলি যে?'

'ভুলুদার অনারে।' আনন্দ হাসল: 'পাশাপাশি বাড়িতে যখন থাকতুম, তখন অনেক আইসক্রীম আর ডালমুট খাইয়েছে ভুলুদা। ওর জন্যে এক কাপ চাও আমি করে দেব না?'

সাবিত্রীর গালে তখনো লালের আভা। 'সত্যি—চায়ের জল যে চাপিয়ে এসেছি, মনেই ছিল না। ডাকলিনি কেন আমাকে?'

'ডিসটার্ব করাটা উচিত হবে বলে মনে হল না।'

'তুই ভারী ফাজিল হয়ে গেছিস আনন্দ।'

শব্দ করে হেসে উঠতে গিয়েও আনন্দ সামলে নিলে। আবার ভেতরের দিকে চলে যাচ্ছিল, প্রবীর তাকে ডাকল। আনন্দ ফিরে এল।

'বোসো আনন্দ।'

আনন্দ আড়চোখে সাবিত্রীর দিকে তাকিয়ে বললে, 'থ্রী ইজ এ ক্রাউড!'

'বেশি জ্যাঠামো করিসনি, চড় লাগাবো একটা।'

ডোর-বেল টিপে দু মিনিট দাঁড়িয়ে থাকা, গর্ত-বসানো কাচের ভেতর দিয়ে তীক্ষ্ণ সতর্ক চোখের দৃষ্টি, সাবিত্রীর মুখে একটা ভয়ের ছায়া—প্রবীরের কাছে সবগুলোর অর্থ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছিল। আনন্দ বসে পড়ে বললে, 'চা খাচ্ছ না কেন ভুলুদা? একেবারে অখাদ্য হয়নি তা বলতে পারি তোমাকে।'

চায়ে চুমুক দিলে প্রবীর।

'চায়ের কথা ভাবছি না, কিন্তু এ কী চেহারা করেছ আনন্দ?'

'এর চেয়ে ভালো কী করে থাকা যায় প্রবীরদা! তোমাদের পুলিস রাতদিন তাড়া করে ফিরছে যে। তাদের ধারণা দু-তিনটে জোতদারের যে অপঘাত ঘটেছে, তার জন্যে নাকি আমিই দায়ী।'

'কে দায়ী, সে তোমরাই জানো আর পুলিসই জানে! কিন্তু আমাদের পুলিস বলছ কেন?'

আনন্দ নিজের চা-টা শেষ করে পেয়ালাটা নামিয়ে রাখতে রাখতে হাসল একটু।

'তোমাদেরই তো রাজত্ব এখন। যুক্তফ্রন্টের।'

'যুক্তফ্রন্ট সকলেরই—', সাবিত্রী বলে উঠল, 'তোদেরও।'

'আমাদেরও? না। আমরা ওতে বিশ্বাস করি না।'

'কেন করিস নে? তোরা যা করছিস সে পথ ধরে কোথায় পৌঁছুবি?'

'আমরা কোথায় পৌঁছুব তার জবাব পরে দিচ্ছি—' চোয়াল ভেঙে যাওয়া গালের ওপর কালিপড়া কোটরের ভেতরে দুটো চোখ দপদপ করে উঠল আনন্দর: 'কিন্তু সাবিত্রীদি—যুক্তফ্রন্ট বলতেও দেশ নয়—চোদ্দটা দল মাত্র। তারপর এর হাঁড়ি ধরে ওর টানাটানি, এর নামে ওর কুৎসার পাঁচালি, শেষে এর মাথায় ওর লাঠি হাঁকড়ানো। কী হল শেষ পর্যন্ত? অক্সিজেন দিয়েও বাঁচাতে পারবে না এখন। অথচ কী বিশ্বাসই করেছিল দেশের লোক, আর কত স্বপ্নই দেখেছিল আবু হোসেনের মতো!'

প্রবীর উত্তেজিত হয়ে উঠল: 'কিছুই হয়নি বলতে চাও?'

'ষোলো আনার প্রমিজ ছিল, দিয়েছ আধ পাই। এর চাইতে কোন্ অংশে খারাপ ছিল কংগ্রেস? তাদের অন্তত একটা পার্টিগত ইউনিটি ছিল। তোমরা হয়তো তাদের চেয়ে আধ পাই কিংবা এক পাই বেশি দিয়েছ, কিন্তু কোন্ মূল্যে? আগে অন্তত শ্রমিক-কৃষকদের মধ্যে একটা সাধারণ ঐক্য ছিল—সংগ্রামের একটা সর্বজনীন রূপ ছিল। তোমরা তাদের মধ্যে তৈরি করেছ ভাঙন—একদল কৃষক নিয়ে আর একদল ক্ষুধিত কৃষকের গ্রামে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে, এক জঙ্গী শ্রমিক, মালিকের দালালকে নয়—আর এক জঙ্গী শ্রমিককে বল্লম দিয়ে খুঁচিয়ে মারছে, এই হল তোমাদের যুক্তফ্রণ্টের অবদান!'

'বেনামদার জমি দখলের ব্যাপারে দু-চারজন কৃষক খুন হয়েছে হয়তো। ধান-কাটা নিয়ে প্রতি বছর বাংলায় যে সব দাঙ্গা হয়—'

'মন্ত্রীত্বের গদীতে বসে প্রেসের কাছে ও-রকম বিবৃতি দাও দাদা—বেশ ভালো দেখাবে। কিন্তু নিজেরাই ভালো করে জানো যে কত ফাঁকি আছে এ-সবের মধ্যে! কিন্তু তোমাদেরও দোষ নেই। পার্লামেণ্টারি রাস্তায় বিপ্লব করতে গেলে এইরকম অত্যাশ্চর্য ফলই লাভ হবে।'

'কিন্তু তোমাদের সশস্ত্র বিপ্লব এত সহজে আসবে? তোমরা চীনের পথ সামনে রেখেছ, কিন্তু লং-মার্চের দেশ-কালের সঙ্গে আকাশ-পাতাল তফাৎ ঘটে গেছে এখন। এই ভারতবর্ষে ক'ইঞ্চি জমি আছে যেখানে মুক্তাঞ্চল গড়বে তোমরা? ইণ্ডিয়ান আর্মি চিয়াঙের সেই অসন্তুষ্ট বিশৃঙ্খল বাহিনী নয় যে রাইফেল কাঁধে করে তোমাদের সংগ্রামের শরিক হবে। ম্যাকাডাম রোড—হেলিয়োকপ্টার—সাঁজোয়া গাড়ি—মডার্ন মিলিশিয়া—কতক্ষণ দাঁড়াতে পারবে সামনে?

আনন্দ মুচকে হাসল।

'একটু স্মৃতিভ্রংশ হচ্ছে ভুলুদা। সামনে ভিয়েতনাম রয়েছে।'

'হ্যাঁ, ভিয়েতনাম। কিন্তু কিছু বিদেশী আর কিছু ভাড়াটে সৈন্য ছাড়া সেখানে প্রতিজন দেশপ্রেমিক, প্রত্যেকের মনে মার্কিন জঙ্গীবাদের ওপর অসহ্য ঘৃণা। কিন্তু সেই মানসিক ঐক্য আছে ভারতবর্ষে? যেখানে থেকে থেকে সাম্প্রদায়িকতার নাড়ীতে টংকার বেজে ওঠে, গুপ্তধন পাবার আশায় এখনো লোকে নরবলি দেয়, গো-হত্যা বন্ধ নিয়ে দিল্লিতে সব চাইতে বড় আন্দোলন ফেটে পড়ে আর সাধুরা নেয় তার নেতৃত্ব, সেখানে কিছু বিক্ষুব্ধ ছাত্র আর বঞ্চিত কৃষক কতদূর পর্যন্ত এগোবে বিপ্লবের রাস্তায়?

রাইফেলই শক্তির উৎস—নিশ্চয়। কিন্তু কটা রাইফেল যোগাড় করতে পারবে তোমরা? আর বাকী সম্বল কি তীর-ধনুক? এবং তাই দিয়ে মোকাবিলা করবে ট্যাঙ্ককে, মেশিনগানকে, বোমারুকে?'

'ভিয়েতনামের গেরিলারা কী করে মোকাবিলা করছে ভুলুদা?'

'কারণ তাদের মধ্যে ট্রেটর নেই। সভ্যতার সমস্ত মুখে কালি মাখিয়ে সেখানকার মার্কিনী ফৌজ শিশু-নারী-বুড়োর ওপর সব রকম ডায়াবোলিক এক্সপেরিমেণ্ট চালাচ্ছে—কিন্তু একজনের মুখ থেকে একটি গেরিলার খবর বের করতে পারে? এখানে তোমাদের ঘরে ঘরে শত্রু দেখা দেবে। তারা সবাই ট্রেটর নয়, কিন্তু তাদের অন্য মত আছে, অন্য আদর্শ আছে। ভারতবর্ষের দক্ষিণপন্থী শক্তির চেহারা বাংলা আর কেরল থেকে—অন্বেরর কটি অঞ্চল থেকে—তোমরা অনুমানও করতে পারো না। শেষ পর্যন্ত সেই শক্তির চূড়ান্ত রূপ যখন শিক্ষিত সেনাবাহিনীর পাশে এসে দাঁড়াবে—তখনকার অবস্থা ভাবতে পারো? ভারতবর্ষে ইন্দোনেশিয়ার অবস্থা তৈরি হোক, তাই কি তোমরা চাও? দেশের মাটি যদি পায়ের তলায় জায়গা দিত, তা হলে চে গুয়েভারার মতো অত বড় বিপ্লবীকে অমন করে হারাতে হয়?'

একটু চুপ করে রইল আনন্দ। খুব সম্ভব প্রবীরের বক্তৃতার তোড়ে কথা বলবার জায়গা পাচ্ছিল না, নিজের ভাবনাগুলোর খেই হারিয়ে ফেলছিল।

সাবিত্রী বললে, 'কেন তর্ক বাড়াচ্ছ? এর শেষ হবে না।'

আনন্দ মাথা নাড়ল: 'হ্যাঁ, তর্কের শেষ হবে না ভুলুদা। কিন্তু সত্যটা সূর্যের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে আছে। বিপ্লব যখন আসে, তখন সৈনিক আপনিই দেখা দেয়—তখন তার উজ্জ্বল প্রবলতার সামনে সমস্ত কূট-কচাল কুটোর মতো উড়ে চলে যায়। লেনিন তা জানতেন বলেই অক্টোবর বিপ্লবকে জাগিয়ে দিতে পেরেছিলেন, তোমাদের মতো এই সব মেনশেভিক চিন্তার ভেতরে পাক খাননি। তোমরা আমাদের বলো অ্যাড্‌ভেঞ্চারিস্ট, কিন্তু সারা ভারতবর্ষ নাড়া খেয়ে উঠেছে, টের পাচ্ছ সেটা?'

'একটা টেরর তৈরি হয়েছে, তার প্রথম শক। ভয় এবং বিহ্বলতা। সেটা কাটিয়ে উঠলেই প্রতিক্রিয়া। পার্লামেণ্টারি ডিমোক্র্যাসি ভেঙে ফেলতে চাও? চমৎকার কথা। কিন্তু তার পরের অধ্যায়টা কী জানো? বীভৎস এক সিভিল ওয়ার। তাতে জমিদারী-পুঁজিবাদী-সাম্প্রদায়িকতাবাদী সব একসঙ্গে হাত মেলাবে। তার শেষ ফল: নৃশংসতম নরহত্যার পালা শেষ হয়ে পাকা ফ্যাসিজমের রাজত্ব। তখন ইন্দোনেশিয়ার মতো তোমাদের চিহ্নও আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

'কিংবা উল্টোটা। নিশ্চিহ্ন হবে ভারতবর্ষের জমিদার-কুলাক্-হোয়াইট্ গার্ডস। তোমরা যারা সংসদীয় গণতন্ত্রের লেজুড় আঁকড়ে পড়ে আছো—যে দলেরই হও, হয় আমাদের সঙ্গে আসবে, নইলে উড়ে যাবে আস্তাকুঁড়ের আবর্জনায়। ভুলুদা—তোমরা ব্যালট বাক্সের মধ্য দিয়ে রক্তহীন বিপ্লব ঘটাতে চাও। তুমি কি মনে করো পৃথিবী-জোড়া শয়তানদের ওভাবে শায়েস্তা করা যায়! যখনই ব্যালট বাক্স তখনই দল। যখন দল, তখনই দল বাঁচাবার আর বাড়াবার জন্যে নানা লোকের সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করছ তোমরা—অ্যাণ্টিসোশ্যালগুলোকে পর্যন্ত সৈনিকের তক্‌মা দিচ্ছ—যারা পরে তোমাদেরই গলায় ছুরি দেবে। তোমাদের যুক্তফ্রণ্টের সাপোর্টার এক জোতদারকে আমরা সাবাড়

করেছি। এই লোকটার টাকা কি করে হল জানো?' বলতে বলতে কপালের শিরা ফুলে উঠল আনন্দর, দপদপ করতে লাগল চোখঃ 'মাত্র দুশো টাকা ধার দিয়ে কম্পাউণ্ড ইন্টারেস্টে একটা লোকের বারো বিঘে সে কেড়ে নিয়েছে—সে লোকটা এখন ক্ষেতমজুর, তার বউ গত বছর খেতে না পেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। এদের সঙ্গে গলাগলি করে তোমাদের রক্তহীন বিপ্লব কবে আসবে জানি না ভুলুদা, কিন্তু আমরা আর এক দিনও দেরি করতে রাজী নই—এক মুহূর্তও না। উই আর নট টু মেনড এনিথিং, বাট উই আর টু এণ্ড এভরিথিং!'

বলতে বলতে ঘরময় পায়চারি করছিল আনন্দ—মনে হচ্ছিল যেন খাঁচার ভেতরে একটা বুনো জানোয়ার অশ্রান্তভাবে ছট্‌ফট করছে। কথা শেষ করে সে জানলাটার পাশে দাঁড়ালো, পর্দাটা একটু সরালো, কিছু দেখল, তারপর ফিরে এল দুজনের কাছে।

মুখের রেখাগুলো কোমল হয়ে গেছে তার। হঠাৎ যেন দপ করে নিবে গেছে উত্তেজনাটা।

সাবিত্রীর সামনে এসে একটু হাসল আনন্দ।

'নাঃ, রাতে তোমার রান্না খাওয়া আমার বরাতে নেই দিদি। হয়তো তোমাকেও বিপন্ন করলুম। যে লোকটি এইমাত্র তোমার জানলার দিকে লক্ষ্য রাখছিল, তাকে আমার খুব পছন্দ হচ্ছে না কিন্তু। সুতরাং এবারে আমায় ঝোলাটা দাও—আর কোথাও ঠাঁই মেলে কি না দেখি।'

॥ নয় ॥

থানার দারোগার সামনেও বোধ হয় এমন বিপদে পড়তে হয়নি।

দিদির দু' চোখ বাঘিনীর মতো জ্বলছিল। ভেতরে উত্তেজনা যত বাড়ছে, দিদি ততই ঘেমে উঠছে, ফোঁটায় ফোঁটায় গলে পড়ছে গলার পাউডার। মাথার ওপরে বাহান্ন ইঞ্চি পাখার ঘূর্ণিতেও দিদির ঠাণ্ডা হওয়ার লক্ষণ নেই কোথাও।

'তুই গোল্লায় গেলি—অ্যাঁ? ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে গুণ্ডার দলে ভিড়লি শেষে?'

'দিদি, এসব বাজে কথা—'

শেষ বোমাটি এতক্ষণ পর্যন্ত দিদির হ্যাণ্ডব্যাগের মধ্যে ছিল। এইবারে দিদি ফাটিয়ে দিল সেটাকে।

'বাজে কথা এসব? তা হলে তোকে কেন ধরে নিয়ে গিয়েছিল থানায়?'

প্রতুলের মুখ বন্ধ হল সঙ্গে সঙ্গে—প্রাণ চমকে উঠল। এ খবরটাও পৌঁছে গেছে? অন্তর্যামী নাকি? কিংবা—

'ছি-ছি-ছি! তোর জন্যে শেষে আমাদের সবাইকে কলকাতা ছাড়তে হবে টুলু? লোকের কাছে মুখ দেখাব কী করে বলতে পারিস?'

'দাদা বলে গেছে বুঝি?'

'ভুলু বলবে কেন? কীর্তির ঢাক তো চারদিকে বাজছে। আজকে হাইকোর্টে ওঁর সঙ্গে মুরারি হালদারের দেখা হয়েছিল। সেই ভদ্রলোকই তো দারোগাকে বলে তোকে ছাড়িয়ে দিয়েছেন—দেননি?'

প্রতুল চুপ।

'উনি তো হাইকোর্ট থেকে ফিরে একেবারে শুয়ে পড়লেন। বললেন, উমা, তোমার ছোট ভাইয়ের জন্যে এ পাড়ায় আর থাকা যাবে বলে তো মনে হচ্ছে না। তার চাইতে চলো—শ্যামবাজারের বাড়িতেই ফিরে যাই। তুই শেষে এই করলি টুলু?' দিদি কেঁদে ফেলল। এতক্ষণ ঘামে গলার পাউডার গলছিল, এবার গালের রঙ গলতে লাগল।

আঁচল দিয়ে চোখ মুছে দিদি বললে, 'মা-টা না হয় ইডিয়ট, কিন্তু ভুলু কী করছে? সে তো দারুণ লেফ্‌টিস্ট, অফিসের ইউনিয়ন নিয়ে বিস্তর মাথা ঘামায়। সেও তোকে একটু দেখতে পারে না? আর তুই বা কী? লেখাপড়ায় এত ভালো ছিলি, এত মাথা ছিল—এমনভাবে শয়তানে তোকে পেয়ে বসল কী করে?'

'সত্যি দিদি, আমার কোনো দোষ ছিল না। আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলুম—'

'চুপ কর্ লক্ষ্মীছাড়া।' দিদির ভিজে ভিজে চোখে আবার আগুন ধরে উঠল: 'আমি তোমার দলবলকে চিনি নে—না? লেকের ধারে কাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াস তুই? যে ছোকরাটা তোর সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা কইছিল—কে ও? ভদ্রলোকের ছেলে? ওই রকম পোশাক-আশাক—ওই চেহারা?'

কিছু একটা বলবার কথা ভেবে এবং বলে কোনো লাভ হবে না বুঝে প্রতুল এবার চুপ করে রইল। দিদির ধিক্কার আর ক্ষোভের পালা প্রায় দশ মিনিট ধরে একটানা আর একতরফা চলতে লাগল। ফলে প্রতুলের গলা-বুক শুকিয়ে উঠল, ঘাম জমতে থাকল তারও কপালে, শুকনো ঠোঁটের ওপর জিভ বুলোতে লাগল মধ্যে মধ্যে, আর থেকে থেকে যেন মনে হতে লাগল পর্দার ওপারে টিনটিনের একজোড়া কৌতূহলী চোখ বারে বারে উঁকি দিয়ে যাচ্ছে। দিদি এ ঘরে প্রতুলকে বসিয়েই টিনটিনকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, বলেছিল, 'তোমার ছোট মামার সঙ্গে আমার কিছু ডিস্কাশন আছে, তুমি এখান থেকে চলে যাও। না ডাকলে কক্ষনো আসবে না।'

এবং তা থেকে যা ঘটবার তাই ঘটেছে। এমনিতেই হয়তো টিনটিন চলে যেত নিজের ঘরে, কিন্তু দিদি তার কৌতূহল জাগিয়ে দিয়েছে। আর টিনটিন নিঃশব্দে মায়ের আদেশ পালন করছে। ভেতরের দরজার দিকে পিঠ দিয়ে বসে আছে বলে দিদি কিছু টের পাচ্ছে না; কিন্তু পর্দার জোড়ের ভেতর দিয়ে মধ্যে মধ্যে স্কার্টের ঝলক, দুটো ছোট ছোট পা এবং একজোড়া চোখের আভাস প্রতুলের দৃষ্টি এখন আর এড়িয়ে যাচ্ছে না। মেয়েটা খুব ভালো আড়ি পাততে পারে দেখা যাচ্ছে।

অন্য সময় হলে শব্দ করে হেসে উঠত সে। কিন্তু সামনে এখন দিদি বসে আছে হাইকোর্টের জজের মতো, আর তাকে নিয়েই বিচারটা চলছে। অগত্যা মুখের পেশী শক্ত করে প্রতুল বসে রইল।

দিদি বললে, 'হাজার হোক, তুই আমার ভাই। তোকে আমি এভাবে বয়ে যেতে দিতে পারি না। এবার তোর ভার আমাকেই নিতে হবে।'

প্রতুল কান খাড়া করল।

'কালকে দশটার আগে চলে আসবি এখানে। ওঁর সঙ্গে খেয়ে বেরুবি।'

'মণীশদার সঙ্গে?'—প্রতুল থতমত খেলো: 'কোথায় বেরুব?'

'ওঁর অফিসে। হাইকোর্ট পাড়ায়।'

এবার বিস্ময়ে হাঁ করল প্রতুল।

'আমি কী করব সেখানে গিয়ে ?'

'অলস মগজেই শয়তানের কারখানা তৈরি হয়—', ইংরিজি বচনটাকে উমা বাংলায় অনুবাদ করল, গলার স্বর কঠোর হতে থাকল তার : 'হাইকোর্ট পাড়ায় অ্যাটর্নিদের অফিস, আর সেখানে অনেক বন্ধুবান্ধব আছেন ওঁর। তাঁদের কোনো অফিসে তোকে ঢুকিয়ে দেবেন বলে-কয়ে।'

প্রতুলের হৃৎকম্প দেখা দিল।

'আমি—আমি ওসবের কী জানি ?'

দিদি ভ্রূকুটি করল : 'তোকে তো আর অ্যাটর্নিগিরি করতে বলছে না কেউ। দলিলপত্র গুছিয়ে রাখবি, চিঠিপত্র নকল করবি আর এর মধ্যে শর্টহ্যান্ড আর টাইপ-রাইটিং শিখে নিবি। তোর বুদ্ধি আছে, উন্নতি করতে পারবি।'

'কী উন্নতি ?' প্রতুল বেকুবের মতো প্রশ্ন করল একটা।

এইবারে উমাকেও একটু অস্বস্তি বোধ করতে হল। অ্যাটর্নি অফিসে ফাইল গোছালে, চিঠিপত্র নকল কিংবা টাইপ করলে উন্নতিটা কী এবং কতদূর পর্যন্ত হতে পারে সেটা চট করে বোঝানো গেল না। এবং এই বেয়াড়া জিজ্ঞাসায় অত্যন্ত বিরক্ত হল সে।

'রোজগারপত্র করবি, রেসপনসিবল হবি, ভদ্র-সমাজের যোগ্য হবি—আর কী উন্নতি হবে এর চেয়ে ? না কি রাস্তায় রাস্তায় হল্লাবাজী করে না বেড়ালে পেটের ভাত হজম হয় না ?' দিদি আবার ভুরু কোঁচকালো : 'তোকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না। উনি তো আছেনই, সব তোকে পাখিপড়া করে শিখিয়ে দেবেন।'

হৃৎকম্পন দেখা দিয়েছিল, এখন সেখানটিতে যেন প্রকাণ্ড একটা বরফের চাঙাড় চাপিয়ে দিলে কেউ। মণীশদার পাল্লায় পড়া! একা দিদিই যে-কোনো মানুষকে ঘায়েল করবার পক্ষে যথেষ্ট, তার সঙ্গে মণীশদা জুটলে বেঁচে থাকবার সমস্ত ইচ্ছে যেন চিরতরে লুপ্ত হয়ে যায়। দাদার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে—সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মণীশদার সঙ্গে গল্প করতে পারে, তর্ক চালাতে পারে। কিন্তু প্রতুল চিরকাল লোকটিকে দেখলেই পালাবার রাস্তা খুঁজেছে। হয় আইন আর মোকদ্দমার গল্প (শুনতে শুনতে দমবন্ধ হয়ে আসে), নইলে কি ভাবে অ্যালসেসিয়ান কিংবা বুলটেরিয়রকে তত্ত্বাবধান করতে হয় তার উপদেশ, আর না হলে চেঞ্জে গিয়ে কোথায় ফার্স্ট ক্লাস হোটেলে উঠতে হয়—কী কী ডিশ দেয়—কুক-বেয়ারাদের কত টিপ্‌স দিতে হয়—তার বাইরে আর কোনো জগৎ নেই মণীশদার। রসিকতা অবশ্য করে, সেটা কেবল বামপন্থী রাজনীতিকে খোঁচা দিয়ে, দাদাকে চটাবার জন্যে।

দিদির বক্তৃতা একটিমাত্র—কী করে শিশুদের মানুষ করতে হয়। দিদি নাকি চাইল্ড সাইকোলজি নিয়ে অনেক পড়াশুনো করেছে—মা'র মতো ব্রেনলেস্ অপদার্থ সে নয়, ছেলেমেয়েকে কি ভাবে যে ট্রেনিং দিতে হয়, টিনটিনের মধ্য দিয়েই প্রমাণ করছে সে। ওগুলো একরকম শুনতে মন্দ লাগে না। আর দিদি চলে যেতে বলার পরেও টিনটিন এই যে উঁকিঝুঁকি মারছে, তাতে তার সার্থক ট্রেনিং মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু মণীশদা! দিদি এই লোকটাকে কী করে ভালবেসে বিয়ে করেছিল দিদিই জানে—কিন্তু দশ মিনিটের বেশী মণীশদার সঙ্গে থাকলে মৃত্যুযন্ত্রণা! সেই মণীশদা

তাকে হাইকোর্ট-পাড়ায় নিয়ে গিয়ে পাখিপড়া করে শেখাবে !

প্রতুল যেন সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছিল। হতাশ গলায় বললে, 'দিদি, একটু জল খাব।'

'জল কেন ?' এবার সত্যিই দিদি জেগে উঠল উমার ভেতরে : 'তোর জন্যে খাবার করছে, নিয়ে আসছে এখুনি।'

আর খাবার ! এ ফ্ল্যাট থেকে বেরুতে পারলে হাড়ে বাতাস লাগে।

'না দিদি, খাবার না হলেও চলবে, একটু জল চাই।'

'বোস্—বোস্, কাটলেট করতে দিয়েছি তোর জন্যে। না খেয়ে যাবি কেন ?' উমার গলা কোমল হয়ে এল : 'রাগ করেছিস এসব তোকে বললুম বলে ?'

'রাগ করব কেন ?' প্রতুল দুর্বল স্বরে বললে, 'আমার ভালোর জন্যেই তো বলেছিস।'

'সেইটেই বুঝে দ্যাখ্। বয়েস তো অনেক হল, এসব ছেলেমানুষি করলে আর চলে ? ওদের ওই কুসঙ্গগুলোকেও তোকে ছাড়তে হবে। দাঁড়া, জল এনে দিই। কিন্তু জল খাবি, না কোল্ড ড্রিংক ?'

'জল।'

'বরফ দিয়ে আনব ?'

'না না, শুধুই জল।'

দিদি জল আনতে গেল। একবারের জন্যে প্রতুলের মনে হল, পালানো যাক। এই ফাঁকে তিন লাফে রাস্তায় গিয়ে পড়ি—তারপর ভাইফোঁটার দিন ছাড়া দিদির ফ্ল্যাটের ত্রিসীমানা কে মাড়ায় ! কিন্তু প্রতুল উঠতে পারল না। মণীশদার খপ্পরে পড়তে হবে, সেটা নিদারুণ বিভীষিকা সন্দেহ নেই, তবু—তবুও কোথায় একটা যন্ত্রণা কাল থেকে বিঁধে চলেছে তাকে। হাইকোর্টে যাওয়ার কথাটা পরেও ভাবা যেতে পারে, কিন্তু দাদা কালকে স্বপ্নার কথাটা মনে না করিয়ে দিলেও পারত।

দিদি জল আনল। গ্লাসটা সামনে রেখে বললে, 'কাটলেট আমিই ভেজে আনছি, একটু বোস্। কুকিং রেঞ্জটা নতুন, ওতে আর চাকরবাকরকে হাত দিতে দিই না।'

এবার নিশ্চিন্তে পালানো যায়। কিন্তু তবুও পালানো যায় না। সমস্ত মনটায় বেসুরো বাজছে। জীবনটা অন্য রকম হলেও হতে পারত। যা থাকে কপালে বলে কাল থেকে হাইকোর্টেই বেরুবে নাকি মণীশদার সঙ্গে ?

'ছোট মামা !'

পর্দা সরিয়ে প্রায় পা টিপে টিপে টিনটিনের আবির্ভাব। উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে চোখমুখ।

'সত্যি ছোট মামা, তোমাকে থানায় ধরে নিয়ে গিয়েছিল ?'

টিনটিনের সামনে লজ্জা পাওয়াটা উচিত কিনা প্রতুল ঠিক বুঝতে পারল না।

'তুই আড়াল থেকে সব কান পেতে শুনছিলি ?'

টিনটিন ঝুপ করে প্রতুলের একেবারে পাশটিতেই বসে পড়ল ডিভানে।

'তুমি কিন্তু তাই বলে মাম্মীকে কিছু বলে দেবে না ছোট মামা।'

'তা বলব না। কিন্তু কাজটা ভালো হয় নি টিনটিন।'

টিনটিন কানই দিলে না কথাটায়। গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বললে, 'কী হয়েছিল,

বলো না ছোট মামা ?'

'তুই ছেলেমানুষ, এত সব খবরে তোর কী দরকার ?'

'বলো না। মারামারি করেছিলে, তাই না ?' টিনটিনের স্বরে কেবল আবদার নয়, রীতিমতন উৎসাহ ফুটে বেরুল : 'আমার বেশ ভালো লাগবে শুনতে।'

প্রতুল চমকে গেল। টিনটিনের চোখ দুটো চক্‌চক্‌ করছে। গালের রঙ লাল।

'ছি ছি, এসব শুনতে তোর ভালো লাগে ?'

একটু চুপ করে রইল টিনটিন। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে লাগল তার।

'একটা কথা তোমায় চুপি চুপি বলব ছোট মামা ?'

'কী কথা ?'

'কাউকে বলবে না ? কক্ষনো না ?'

'আগে শুনেই নিই, প্রতিজ্ঞা করব তার পরে।'

'না—', টিনটিন আরো অন্তরঙ্গ আর আরো উত্তেজিত হল : 'বলো, কাউকে বলবে না ?'

'আচ্ছা বলব না।'

'জানো, আমার এক বন্ধু আছে। তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল।'

প্রতুল আকাশ থেকে পড়ল একেবারে।

'তোর বন্ধুকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল ? সে কি রে ! অত বাচ্চাদের কখনো ধরে ?'

'না—সে বাচ্চা নয়। তার বয়েস কুড়ি বছর হল। তার নাম ডন।'

'ডন !' প্রতুল একটা খাবি খেলো : 'সায়েব ! তোর বন্ধু !'

'তুমি কিছু বোঝো না ছোট মামা—', টিনটিন বিরক্ত হয়ে প্রতুলের পিঠে একটা ছোট্ট কিল মারল : 'সায়েব হবে কেন ? ডন হল সাউথ ইণ্ডিয়ান—নেটিভ ক্রিশ্চান। সে কী বলছিল জানো ? ও ইট ওয়াজ সাচ্‌ এ থ্রীল—সাচ্‌ অ্যান্‌ এক্‌স্‌পিরিয়ান্স্‌ ! জানো ছোট মামা—', টিনটিনের মুখের চেহারা যেন বদলে যাচ্ছিল ক্রমশ : 'জানো—এভ্‌রিথিং ইজ সো বোরিং—বোরিং ! ডন বলেছিল—'ইট ওয়াজ এ রিলিফ, ওয়েলকম রিলিফ !'

মস্তান দলের প্রতুলও নার্ভাস বোধ করতে লাগল এবার।

'কেন ধরেছিল ডনকে ?'

'বিশেষ কিচ্ছু না। একটু ড্রিংক করে ফেলেছিল বেশি মাত্রায়, তারপর ঝগড়া করেছিল একটা পুলিস সার্জেণ্টের সঙ্গে।'

'এইসব বন্ধুর সঙ্গে তুই মিশিস টিনটিন ?'

'তুমি জানো না—ডন কী লাভ্‌লি ছেলে ! ওর পপ সং শুনলে কিংবা নাচের স্টেপিং দেখলে তুমি থ হয়ে যাবে। জানো, ওর কথা শুনে আমার যে কি রকম এক্‌সাইটমেণ্ট হচ্ছে—কী বলব ! আমার ভীষণ ইচ্ছে করছে আমিও জেলে যাই !'

দিদি আর কোন্‌ বিভীষিকা, মণীশদাই বা কতটা হৃৎপিণ্ড কাঁপিয়ে দিতে পারে ! টিনটিনের কথা শুনে প্রতুলের মনে হতে লাগল সে দুঃস্বপ্ন দেখছে !

প্রতুল বলে ফেলল : 'ড্রিংক ক'রে ?'

'ধুৎ—ওসব ছেলেদের মানায়। আমি অন্য কিছু করব।'

অভিভূত হয়ে প্রতুল বললে, 'কী করবি ?'

'ধরো—যদি টুপ করে একদিন বাপীর গাড়িটা নিয়ে বেরুই, আর রাস্তার একটা ভিখিরীকে চাপা দিয়ে দিই—কেমন হয় ?'

'চমৎকার হয় !'—ছোট মামার শিরদাঁড়া বেয়ে এবার বরফগলা জল নামতে লাগল : 'কিন্তু তুই—তুই গাড়ি চালাতে পারিস ? এই একফোঁটা মেয়ে ?'

'কেন পারব না ? ডনের গাড়ি রয়েছে—সে-ই তো শিখিয়েছে আমায়। ছোট মামা—সব বোরিং লাগে, সব। বই, সিনেমা, স্কুল, আমাদের ক্লাব—অ্যাট্ টাইম্‌স ইউ ফীল সাচ্ অ্যান্ আনুই ! ছোট মামা, আমি গাড়ি করে যদি একটা ভিখিরীকে চাপা দিয়ে দিই—'

প্রতুল এইবার একটা আর্তনাদ করে উঠত কিনা বলা যায় না, কিন্তু সেই সময় দিদির ডাক এল : 'টুলু !'

'কিচ্ছু বোলো না মাম্মীকে—কিচ্ছু বোলো না—' কানের কাছে যেন তীব্র বেগে একটা শিস টেনে চকিতে মিলিয়ে গেল টিনটিন। আর সোফার ভেতরে প্রতুল একেবারে জমাট বেঁধে বসে রইল।

আনন্দ পেছনের স্পাইরাল সিঁড়িটা বেয়ে নেমে গেল। অপেক্ষা করল না আর।

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল দুজন। মাত্র আট-দশ মিনিট আগেও ঘরের আবহাওয়াটা রাজনীতির তর্কে উতরোল হয়ে উঠেছিল, তৈরি হয়েছিল খানিকটা প্রবল উত্তাপ—এখন শান্ত বিষণ্নতা থমথম করতে লাগল সেখানে।

আস্তে আস্তে সাবিত্রী বললে, 'আশ্চর্য !'

'আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই সাবিত্রী। কালটাই এই রকম।'

'কিন্তু ছেলেটা এ পথ বেছে না নিলেই পারত।'

'ওদের ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়েছে। টগবগ করছে ভেতরটা। পথের বিচার করবার আগে ছুটে বেরুবার তাড়াটাই এখন বড় হয়ে উঠেছে ওদের কাছে।'

'যাঁরা এইসব খাঁটি সোনা ছেলেদের ঝড়ের ভেতরে বের করে আনলেন, তাঁরা এদের চালাতে পারবেন ঠিকমতো ? একটা দুর্দান্ত শক্তিকে তাঁরা জাগিয়েছেন—সেই শক্তিকে সংগঠন করবার, তাকে কাজে লাগাবার মতো স্থির-ধীর পরিকল্পনা তাঁদের আছে তো ? এর মধ্যেই তো এরাও কতগুলো টুকরো ভাগে ছড়িয়ে পড়েছে !'

বিমর্ষভাবে হাসল প্রবীর।

'ডিনামাইটের পলতেয় যাঁরা আগুন ধরিয়েছেন, তাঁদের দায়িত্ব তাঁরাই জানেন। শোধনবাদ—নয়া শোধনবাদকে তাঁরা নরকে পাঠাচ্ছেন—নিশ্চয়ই পাঠাতে পারেন। কিন্তু এর দুটো পরিণতি আছে। যদি ভুল হয়, তা হলে তৈরি হবে সুইসাইড স্কোয়াড—সে দারুণ অপচয়ের চেহারা কল্পনাই করা যায় না। আর নইলে আসবে বিপ্লব, একেবারে সাইক্লোনের মতো চলে আসবে। আমরা মনেপ্রাণে কামনা করব—থাকুক মতভেদ, আসুক সেই বিপ্লব, কারণ আনন্দর মতো ছেলেদের উত্তেজনার বলি হতে দেওয়া যায় না।'

আবার নৈঃশব্দ্য। প্রবীর দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথের ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইল। সাবিত্রী আঙুলের স্টিকিং প্লাসটারটার ওপর আর একটা হাত বুলিয়ে চলল

অন্যমনস্ক ভাবে।

দাঁড়িয়ে পড়ে প্রবীর বললে, 'আজ উঠি।'

'বসবে না আর একটু ?'

'থাক আজকে। রাত হয়ে যাবে।'

'আবার কবে আসবে ? তুমি সত্যিই আমাকে ভুলে যাচ্ছ প্রবীর।'

'ভুলে যাচ্ছি না সাবিত্রী—' প্রবীর আবার ক্লান্ত মুখে হাসল : 'আসলে আমাদের বয়েস বেড়ে যাচ্ছে, আমরা নিজেদের জালে জড়িয়ে পড়ছি চারদিক থেকে। তুমিও তো ল্যাবরেটরি আর টিউশনের বাইরে আর বেরুতে পারছ না। কিন্তু শীগগিরই আমি আসব। তোমাকে কয়েকটা কথা বলতে চেয়েছিলুম, কিন্তু আজ থাক।'

গভীর চোখ তুলে সাবিত্রী তাকালো। কী কথা প্রবীর বলতে চেয়েছিল, হয়তো বুঝেছে, হয়তো মনের মধ্যে আভাস পেয়েছে তার। কিন্তু আজ থাক। আনন্দ সব অন্যরকম করে দিয়ে গেছে।

সাবিত্রী বললে, 'একটু দাঁড়াও। আমি চট করে শাড়িটা বদলে নিই—তোমার সঙ্গে এগিয়ে যাব খানিকটা।'

'আচ্ছা, এসো কাপড় বদলে।'

ভেতরে ঢুকেই মিনিট দেড়েকের মধ্যে বেরিয়ে এল সাবিত্রী। তার হাতে রুমালে জড়ানো একটা জিনিস, দু চোখে ভয়ের বিহ্বলতা।

ফিসফিস করে সাবিত্রী বললে, 'এটা ভুলে ফেলে গেছে আনন্দ।'

জিনিসটা মুঠোর মধ্যে ধরেই বুঝতে পারল প্রবীর। খুলে দেখবারও দরকার হল না। দুরু-দুরু করে উঠল বুকের ভেতর।

'এ তুমি নিজের কাছে রেখো না সাবিত্রী, এত বড় রিস্ক নেওয়া উচিত নয় তোমার। আমাকে দাও—আমি নিয়ে যাচ্ছি।'

'কিন্তু—কিন্তু—' বিহ্বল হয়ে সাবিত্রী বললে, 'তুমিও তো বিপদে পড়তে পারো।'

'আমার কোনো ভাবনা নেই—' প্রবীর হাসতে চেষ্টা করল : 'শুনলে না, আনন্দ বলে গেল, সরকার এখন আমাদেরই ? প্রবীর জড়ানো রুমালটাকে ট্রাউজারের পকেটে পুরে ফেলল : 'তবে এটা সঙ্গে নিয়ে আর বাসে ফেরা যাবে না—ট্যাক্সির খরচা হবে কিছু।'

সাবিত্রী বিবর্ণ মুখে বললে, 'আমি তোমার সঙ্গে যাব—অন্তত বালিগঞ্জ পর্যন্ত।'

'আমাকে পাহারা দিয়ে ?' প্রবীর প্ল্যাসটার করা আঙুলটার কথা ভুলে গিয়ে আবার সাবিত্রীর হাতটা টেনে নিলে : 'যদি ধরাই পড়ি—তুমি তো বাঁচাতে পারবে না, উলটে বিপদ বাড়াবে। পাগলামি কোরো না।'

'যদি আনন্দ চাইতে আসে ওটা ?'

'আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে বোলো কাউকে। সেটুকু বিশ্বাস আমাকে করে।'

সাবিত্রী শীর্ণ স্বরে বললে, 'আমার ভীষণ ভাবনা থাকবে। কাল একটা টেলিফোন করবে আমার কলেজে ? করবে তো ?'

স্নিগ্ধ চোখে একটু চেয়ে থেকে প্রবীর বললে, 'করব।'

॥ দশ ॥

বোধির সীমা কতদূর পর্যন্ত যায় ? যতদূর পর্যন্ত অভিজ্ঞতার সীমা। কিন্তু যুক্তি তাকে ছাড়িয়ে চলে যেতে পারে আরো অনেক—অনেক বেশি, সেখানে আর এক বৃহত্তর জগতের কথা ভাবতে পারে, সংকীর্ণ অভিজ্ঞতা দিয়ে যাকে স্পর্শও করা যায় না ; এই ভাবেই মানুষের ঊর্ধ্বায়ন, প্রত্যক্ষের বাইরে তার মুক্তি, এই ভাবেই জানে সে ভাব-লোককে—আত্মার জগৎকে। আত্মা তো প্রত্যক্ষের বিষয় নয়—কিন্তু যুক্তি বলে, সমস্ত মানসিকতার সমন্বয়ই হল আত্মা—কান্টের মতে—

স্বপ্না আবার নোটগুলো থেকে মাথা তুলল। ট্র্যানসেনডেণ্টাল ওয়ার্লড্ খুব ভালো। কোনো পরিশুদ্ধ যুক্তির ওপর আশ্রয় করে সেখানে পেঁছুতে পারলে কোথাও আর কোনো দুঃখ থাকত না। কিন্তু বাস্তব জগৎটাই এত নিষ্ঠুর!

এই সকালটা—বাইরে বাতাস-লাগা গাছের পাতাগুলো—প্রথম রোদে সাদা সাদা মেঘের টুকরো ছড়ানো নীলনির্মল আকাশ—সব কেমন মগ্নতার মধ্যে ডুবে আছে। একটু আগেই রেডিওতে রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজছিল : 'তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে কেউ তা জানে না।' সে ডাক যে পাঠিয়েছিল পাতা-দোলানো হাওয়া তার খবর আনে, আকাশ বহন করে তার বার্তা। অভিজ্ঞতা তাকে জানে না, কিন্তু পরিশুদ্ধ জ্ঞান তার উপলব্ধি বয়ে আনে হৃদয়ে। কে সে ? ইটার্নাল ইগো ?

কাণ্টের মতো করে যদি ভাবা যেত! যদি রবীন্দ্রনাথের মতো সমস্ত প্রাণকে মেলে দিয়ে বলা যেত : 'এই তো তোমার প্রেম ওগো হৃদয়হরণ!'

এই বাড়ির মেয়ে হয়েও স্বপ্না কোনোদিন রাজনীতি ভাবে না। তার ভালোই লাগে না। তর্কাতর্কি শুনতে শুনতে মাথা ধরে যায়। আজকাল খবরের কাগজ যা হয়েছে, খুললেই সমস্ত মন বিরস হয়ে ওঠে। সবাই উত্তেজিত, সবাই অসহিষ্ণু, সবাই তিক্ত। কোথাও এমন জায়গা পাওয়া যায় একটা যেখানে শান্তি, স্তব্ধতা, গভীরতা ?

এ বাড়ির মেয়ে হয়েও সে এ বাড়ির নয়। কারো সঙ্গে তার মেলে না। বাবা ভেতরে ভেতরে জ্বলছেন। বড়দা চব্বিশ ঘণ্টা ছট্ফট করে অস্বস্তিতে। বৌদি ভাঙা শরীর নিয়েও ফেলে-আসা মিছিলের দিনগুলোর কথা ভাবে—যেন আকাশ থেকে টেনে এনে খাঁচায় তাকে আটকে দিয়েছে কেউ। স্কুলে চাকরি করতে যায়—সেখানে টীচারদের ভেতরে রাজনীতির তর্ক। বাসে করে ফেরে—সেই একই কচকচি। আর ছোড়দা—

রাত্রে জানলার পাশে এসে দাঁড়ালো, কিছু খাবার চেয়ে নিলে, তার পরেই কোন্ দিকে মিলিয়ে গেল অন্ধকারের ভেতর। কোন্ আগুনের সমুদ্র সাঁতরে কোথায় যে পেঁছুতে চায়, সে-ই জানে।

সব ছেড়ে—এইভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে, আনন্দ একদিন বলেছিল, 'বনে যখন আগুন লাগে, তখন পাখির বাসাও নিস্তার পায় না, স্বপ্না। তুই যা চাইছিস সেটা পেতে গেলে সব বদলে দিতে হবে। আগে মরা গাছ আর বিষাক্ত ব্যাক্‌টিরিয়াগুলো পুড়িয়ে দিই—তারপরে না হয় স্নিগ্ধ তপোবন গড়ে দেব তোদের জন্যে।'

ঠাট্টা।

না—তপোবন সে চায় না। তার নিজের আলাদা ছায়া আছে, আলাদা ভাবনা আছে ; সব যন্ত্রণা, সব ক্রোধ, সমস্ত বিদ্বেষের একান্তে একটি ছোট্ট জায়গা পেলেই তার কুলিয়ে যেত। আবার রবীন্দ্রনাথ। 'চামেলির গন্ধটুকু জানালার ধারে ভোরের প্রথম আলো জলের ওপারে,/তাহারে জড়ায়ে ঘিরে—'

বাবার গলা কানে এল। উপনিষদ পড়ছেন ঃ

'নৈষা তর্কেন মতিরপনেয়া

প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।

যাং ত্বমাপঃ সত্যধৃতির্বতাসি

ত্বাদৃঙ্ নো ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা—'

কঠোপনিষৎ। আত্মতত্ত্বকে তর্ক দিয়ে উপলব্ধি করা যায় না। একমাত্র নচিকেতার মতো সত্যজিজ্ঞাসু শিষ্যই তা লাভ করতে পারে। কাণ্টও অনেকটা এইভাবেই বলেছেন। বাবা আজকাল আর তর্ক দিয়ে বুঝতে চান না—তিনি আত্মতত্ত্ব সন্ধান করছেন। কিন্তু স্বপ্নার ভালো লাগল না। বাবাও তো সারাটা জীবন রাজনীতি করে কাটালেন, আদর্শ তাঁর ছিল, কিন্তু ভাবের বাষ্পও ছিল না তাঁর ভেতরে। গান্ধীজীর আধ্যাত্মিকতা তিনি কখনো মেনে নেননি—গান্ধীয়ান সোস্যালিজমের বৈজ্ঞানিক প্রয়োগেই তাঁর উৎসাহ ছিল সবচেয়ে বেশি।

'তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।' তিনিই সব কিছুকে প্রকাশ করেন, তাঁর উদ্ভাসেই সব বিভাত হয়—বাবা এখন আত্মসমর্পণ করছেন। এ তাঁর উপলব্ধি নয়, তিনি হেরে যাচ্ছেন, কোথাও দাঁড়াতে পারছেন না। দেশবিভাগ, স্বাধীনতা, আজকের রাজনীতি। ছোড়দার ওপরে অনেক আশা-ভরসা ছিল। স্রেফ দেউলে হয়ে গেলেন—এখন আত্মায় পরম চৈতন্যকে লাভ করে চাইছেন 'শান্তিঃ শাশ্বতী'। মনে হল, বাবা উপনিষদ পড়ছেন না—কাঁদছেন।

স্বপ্না হঠাৎ বিরক্ত হয়ে উঠল। মানে হয় না—কোনো কিছুরই মানে হয় না। একটা প্রচণ্ড স্রোত টেনে নিয়ে চলেছে সবাইকে—সেই বন্যা সময়ের, সেই বন্যা ইতিহাসের ; কাউকে দাঁড়াতে দেবে না, থামতে দেবে না এক সেকেণ্ডের জন্যে। কাণ্ট-স্পিনোজার বাঁধা ঘাট সেই বন্যায় ভেঙে ভেসে যাবে—আকাশ থেকে আশ্রয়ের জন্যে জ্যোতির্ময় হাত বাড়িয়ে দেবে না উপনিষদ, রবীন্দ্রনাথের মহাবটে নোঙর বেঁধেও নিষ্কৃতি নেই—বন্যার টান সে বটকে উপড়ে নিয়ে যাবে।

তার পরে কোথায় ?

একেবারে অকূলে ? কিংবা নতুন কোনো মহাদেশে ?

যেখানেই হোক—স্বপ্নার জায়গাটুকু কোথাও মিলবে না। যদি মেলবার হত, তা হলে টুলুদাই কি এমন করে—

'পিসিমা !'

ঘরে নীলাঞ্জন। নীলু। যেন বেঁচে গেল স্বপ্না। এতক্ষণ ধরে এইসব ভাবনাগুলো এক-একটা করে ভারের মতো চেপে বসছিল তার মনের ওপর—যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে আনছিল তার।

'কি রে নীলু ?'

নীলু আস্তে আস্তে এসে স্বপ্নার চেয়ারের পাশে দাঁড়াল। চুপ করে রইল তারপরে।

'কী, লেবেনচুষের পয়সা দিতে হইবো ?'

নীলু ঘাড় নাড়ল, না—লজেন্সস্ তার দরকার নেই।

'কী হইল তর্ ? কথা কস্ না ক্যান ?' স্বপ্না হাসল। নীলুর এলোমেলো নরম চুলগুলোর ভেতরে স্নেহভরা দুটি আঙুল বুলিয়ে দিয়ে বললে, 'তাইলে ? বোকছে নাকি কেউ ?'

'না পিসি, কেউ বকে নাই—' আবার একটু চুপ করে থেকে আরো ভীরু আরো ম্লান গলায় নীলু বললে, 'পিসি, আইজ রাত্তিরে আমারে তোমার ধারে শুইতে নেবা ?'

'ক্যান ?' স্বপ্না আবার হাসল ঃ 'হঠাৎ আমার ধারে শোওনের কী হইল ? মায়েরে ছাইড়া তুই থাকতে পারবি আমার কাছে ?'

'পারুম—', নীলুর গলা এবারে কান্নায় ভিজে উঠল ঃ 'পারুম। আমি আর মায়ের ধারে শুমু না পিসিমা—কোনোদিন না।'

নীলুর চুলের ভেতরে স্বপ্নার আঙুল শক্ত হয়ে গেল।

'কী হইছে রে ? এই নীলু, হইছে কী ?'

প্রাণপণে কান্নার একটা দারুণ উচ্ছ্বাসকে সামলে নিলে নীলু। ধরাগলায় বললে, 'রোজ রাত্তিরে বাবায় আর মায় ঝগড়া করে। বাবায় বকে, মায় কান্দে।' অনিচ্ছা সত্ত্বেও এবার টুপ করে একফোঁটা জল ঝরে পড়ল নীলুর চোখ থেকে।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল স্বপ্না। তারপর কাছে টানল নীলুকে, আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিলে চোখ।

'মায়েরে ছাইড়া আমার কাছে শুইলে তোর কষ্ট হইবো না নীলু ?'

নীলু জবাব দিল না। কষ্ট যে কত বেশি হবে, সেকথা তার মতো আর কে জানে ! সে এখন বড় হয়েছে, স্কুলে প্রশ্নের অঙ্ক কষতে হয় তাকে, তবু রাত্রে মাকে জড়িয়ে না শুলে, মায়ের বুকের ছোঁয়াটুকু না পেলে, মা'র কি রকম ভিজে ভিজে ঠাণ্ডা হাতটা গালে-মুখে আদর ছড়িয়ে না দিলে তার ঘুম আসে না। তবু সে থাকতে পারছে না মা'র কাছে। সে ঘুমিয়ে পড়েছে ভেবে মা-বাবা একটু একটু করে চাপা গলায় ঝগড়া আরম্ভ করে, বাবা রেগে উঠতে থাকে—ইংরিজিতে বাংলায় মা-বাবা তর্ক করতে থাকে, বাবা আরো কী বলে, তারপর মা কাঁদতে থাকে।

মা'র বুকে মুখ গুঁজে, ঘুমের ভান করে সেই কান্না টের পায় নীলু। কান্নায় মা'র বুকটা ওঠে-পড়ে, কখনো বা গরম একটা জলের ফোঁটা গড়িয়ে আসে নীলুর গলায়। তার পরে মা'র বুকের ভেতর সাঁ-সাঁ করে শব্দ হতে থাকে, বাগানে ঝাউ গাছটায় বাতাসের দোলা লাগলে যে-রকম শব্দ হয়, ঠিক সেই রকম—মা'র হাঁপানি ওঠে—মা ছটফট করে। বাবা পাশ ফিরে কি রকম কাঠ হয়ে থাকে, ঘুমোয় কিনা কে জানে, কিংবা এক-একদিন বিছানা থেকে উঠে গিয়ে জানলার ধারে চেয়ারে বসে থাকে, অন্ধকার ঘরে একটা সিগারেটের লাল আগুন জ্বলে, কখনো বাবা জোরে সিগারেটটা টানে—আগুনটা যেন বাড়ে, বাবার মুখখানা অচেনা আর অদ্ভুত দেখায়, নীলুর ভীষণ—ভীষণ ভয় করতে থাকে।

কিন্তু এর একটা কথাও পিসিমাকে বলা যাবে না। নীলু চুপ করে থাকল।

বলবার দরকার ছিল না, স্বপ্না বুঝতে পারছিল। বড়দা রাজনীতির ব্যাপারেই বিরক্ত হয়ে উঠেছে এখন। বাবার সঙ্গে এদিক থেকে মিল আছে তার। বাবা অবসাদের মধ্যে তলিয়ে যেতে যেতে উপনিষদের মধ্যে আশ্রয় খুঁজছেন—বড়দা রাতদিন জ্বলে যাচ্ছে যন্ত্রণার দহনে। বাবা দেখছেন, তাঁর সব বিশ্বাস—সমস্ত স্বপ্নের অপমৃত্যু ঘটেছে, বড়দা দেখছে যা তার কাছে দুই আর দুইয়ে চারের মতো সহজ ছিল, তা যেমন জটিল তেমনি অর্থহীন হয়ে উঠেছে।

বাবা সব নিজের ভেতরে টেনে নিয়েছেন নীলকণ্ঠের মতো ; কিন্তু বড়দা জ্বলছে—নিজের ওপরে তার রাগ, যারা রাজনীতি করতে চায়, তাদের প্রত্যেকের ওপর। আর ভাঙা শরীর নিয়ে, সংসারে জড়িয়ে গিয়ে বৌদি এখন ছট্‌ফট করে—ভাবে এমনি করে ফুরিয়ে যাওয়ার কোনো মানে হয় না—আবার আমি সেই সব দিন, সেই জীবনের মধ্যে ফিরে যাব। সেদিন রাত্রেই তো বৌদি—

স্বপ্না ডাকল ঃ 'নীলু !'

'উঁ ?'

'বাবা-মায়ের মধ্যে ওই রকম কথা-কাটাকাটি হয়ই। মন খারাপ করতে নাই।'

'না, মন খারাপ করি নাই।'

'ওই সব শুনতেও হয় না পোলাপানের।'

'আমি তো শুনি না পিসি।' নীলু ফিসফিস করে বললে, 'আমার ভয় করে।'

'আইচ্ছা, আমি বৌদিরে কইয়া দিমু অখন।'

'না, কিছু কইবা না—' ভয়ের ছায়া পড়ল নীলুর মুখে ঃ 'মায়ে রাগ কোরবো।'

স্বপ্না আবার আঙুল বুলোতে লাগল নীলুর চুলের ভেতরে। জবাব দিল না।

'রাত্তিরে আমারে কিন্তু তোমার ধারে শুইতে নিবা।'

'আইচ্ছা, হইবো অখন।'

নীলু অনিশ্চিতভাবে চলে গেল ঘর থেকে।

এই এক আশ্চর্য দুর্ভাগ্য—স্বপ্না ভাবল। আমাদের দুঃখ-যন্ত্রণা, আমাদের বিস্বাদ বিরক্ত দিনগুলো কিভাবে যে ছোটদের আচ্ছন্ন করে দেয়! আমরা টেরও পাই না, কিন্তু একটু একটু করে বিষ ছড়াতে থাকে ওদের মধ্যে, বিমর্ষতা, হতাশা আর নিরানন্দের ভেতর দিয়ে ওরা বাড়তে থাকে। তারপর একদিন দেখি ওরা অন্য রকম হয়ে গেছে—আমরা ফুল ফোটাতে চেয়েছিলুম, কিন্তু কখন ওদের শিকড়ে কীটের সংসার বাসা বেঁধেছে।

সকালটা আরো বিশ্রী হয়ে গেল। বইখাতাগুলো গুছিয়ে উঠে পড়ল স্বপ্না।

স্বরাজ বেরিয়ে গেছে বাজার করতে। আজও তেমনি বিশ্রী মেজাজ নিয়ে ফিরবে। সাইকেল থেকে নামতে নামতে বলবে, 'দ্যাশসুদ্ধ চোর হইয়া গেছে—অ্যাক্‌টা জিনিস হাত দিয়া ছোওন যায় না—না খাইয়া মরতে হইবো এরপর।'

বাবা উপনিষদ রেখে খবরের কাগজে মন দিয়েছেন। কোথাও কোনো আশার আলো দেখতে পাওয়া যায় কিনা, তারই সন্ধান করছেন খুব সম্ভব। মা পুজোয় বসেছেন। আজকাল পুজো করতে মা'র আরো বেশি সময় লাগে। যে ঠাকুর-দেবতাকে বড়দা

ছোড়দা অট্টহাসিতে উড়িয়ে দেয়, সেই ঠাকুরের কাছেই মা'র হয়তো প্রার্থনা চলছে এখন। ঠাকুর যেন আপদে-বিপদে আনন্দকে রক্ষা করেন।

এইসব মাদের নিয়েই যত মুশকিল। তবু ছোড়দা এখনো অস্বস্তি বোধ করে। সেদিন রাত্রে বলেছিল, 'মায়ের লগে একবার দেখা করবি না ছোড়দা?'

একটু চুপ করে থেকে আনন্দ বলেছিল, 'আইজ থাকুক। পরে আসুম অন্য সময়।'

বিপ্লবী ছোড়দাও মাকে ভয় পায় এখনো।

স্বপ্না রান্নাঘরে উঁকি মারল। উনুনে ডাল চড়ানো। বৌদি নেই।

এল বড়দার ঘরে। ড্রেসিং টেবিলের টুলটার ওপরে বসে নীলুর শার্টে বোতাম লাগাচ্ছে সুজাতা। নীলু আবার পড়তে চলে গেছে—বাইরে থেকে গুনগুন করে পড়ার আওয়াজ আসছে তার।

'বৌদি!'

চোখ না তুলেই সুজাতা বললে, 'আয়।'

চেয়ারে বসে পড়ে বিনা ভূমিকাতেই স্বপ্না বললে, 'অ্যাক্‌টা কথা আছিল তোমার লগে।'

সুতো টানতে টানতে সুজাতা বললে, 'ক।'

'কিছু মনে করবা না বৌদি।' গলার স্বর নামিয়ে স্বপ্না বললে, 'রাত্তিরে তোমরা ঝগড়া কোরতে চাও করো, কিন্তু বাচ্চা পোলাডার সামনে সীন ক্রিয়েট—'

সুজাতা চোখ তুলল। ভুরু দুটো কুঁচকে এল তার।

'নীলু কিছু কইছে তোর ধারে?'

'নীলুর কওনের কী আছে?' স্বপ্না সোজাসুজি জবাব না দিয়ে এড়িয়ে গেল: 'এইগুলিন চাপা থাকে?'

সুজাতা সেলাইটা নামিয়ে রাখল। তারপর স্বপ্নার মাথার পাশ দিয়ে তাকালো দেওয়ালের দিকে। সেখানে পাশাপাশি দুটো ছবি একভাবে বাঁধিয়ে সাজিয়ে রাখা। একটি রবীন্দ্রনাথের, আর একটি লেনিনের।

'বাবার কানে গেছে?' শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করল সুজাতা।

'জানি না। না গেলে যাইবো।'

'যাউক।' সুজাতা তেমনি শুকনোভাবে বললে, 'এইভাবে আর চোলতে পারে না।'

স্বপ্না প্রায় আর্তনাদ করে উঠল।

'বৌদি, কী কইতে আছ?'

সুজাতা বললে, 'স্বপ্না, ইউ মাস্ট্ ফেস্ ফ্যাক্‌ট্‌স্। স্বরাজরে বিয়া করছিলাম বৌ হইয়া ঘরের মধ্যে বইস্যা থাকনের লইগ্যা, না? একসঙ্গে কাজ করতে চাইছিলাম—অ্যাজ কম্‌রেড্‌স্। তর্ দাদার ফ্রাস্ট্রেশন আসতে পারে, তার ইচ্ছা হইলে ডি-পলিটিক্যালাইজ্‌ড্ হইয়া যাক্, কিন্তু আমি এইভাবে থাকতে পারুম না।'

'কী করতে চাও?'

'অ্যাক্‌টিভ পলিটিক্‌স্।'

'এই শরীর নিয়া?'

'চিরদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছি। আবার পথে বাইর হইয়া পোড়লেই শরীর ঠিক

হইয়া যাইবো। স্বপ্না, দিস্ ইজ্ গ্যাংগ্রীন, দিস ইজ ডেথ্। আমি আর এই লাইফ স্ট্যান্ড কোরতে পারতাছি না।'

'আর বড়দা কী কইবো?'

'তার পছন্দ না হয়, আমারে বিদায় কইর‍্যা দিবো। আমাগো সিভিল ম্যারেজ হইছিল, কারো কোনো ক্ষতি হইবো না।'

চেয়ারের মধ্যে স্বপ্না কাঠ হয়ে গেল।

'বৌদি!'

'কী করুম্ তাই ক। অনেক স্ট্রাগ্‌ল করছি নিজের লগে। আর সহ্য হইতাছে না। পরশু ময়দানের র‍্যালীতে কমরেড নাম্বুদ্রিপাদ আসবো। যাইতে চাইলাম, তবু দাদার আপত্তি। কইলাম, আমি যামুই, যা হওনের তা হইবো।'

স্বপ্নার কপালে ঘাম জমে উঠল। বুঝতে পারছে কোথা থেকে হঠাৎ এমন করে যন্ত্রণা জেগে উঠেছে সুজাতার ভেতরে।

এতদিন ধরে আস্তে আস্তে এই সংসারটার মধ্যে মিশে যাচ্ছিল বৌদি, এখানকার এই ধরা-বাঁধা জীবনের সঙ্গে আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছিল, জীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল এর ভেতরে। তারপরে একদিন আর যে-কোনো মেয়ের সঙ্গে কোনো তফাৎ থাকত না সুজাতারও, সক্রিয় রাজনীতির দিনগুলো তারও কাছে স্মৃতি হয়ে যেত। কিন্তু হঠাৎ একটা ঝড়ের জানলা গেছে খুলে। পথ মেলে নি, কিন্তু মুক্তির খবর পৌঁছে দিয়েছে আনন্দ—আবার আকাশের জন্যে ডানা ঝটপটিয়ে উঠেছে সুজাতার।

হ্যাঁ, আনন্দই। নিজে ঘর ছাড়ল, আরো অনেককে ঘরছাড়া করবে।

স্বপ্নার ভয় করতে লাগল।

'আমাদের জন্য তোমার কষ্ট হইবো না বৌদি?'

সুজাতার চোখের পল্লব দুটো নেমে এল। নিঃশ্বাস পড়ল একটা।

'হইবো। কিন্তু রেভোল্যুশন তো অন্যের উপর বরাত দিয়াই আসবো না ঠাকুরঝি। দাম সকলেরেই দিতে হইবো—ঘরে বইস্যা আমরা তার মুনাফা নিমু—এমন কথা ইতিহাসে লেখে নাই।'

'আর মা-বাবা?'

ক্ষীণ রেখায় হাসতে চেষ্টা করল সুজাতা।

'ওনাগো কাছে যে অ্যাফেক্‌শন পাইছি, সেকথা ভুলতে পারুম না। বাবার জন্যও খুব মন খারাপ হইবো। কিন্তু—'

সুজাতা যেন লঘু হতে চাইল একটুখানি: 'ওনারাও আস্তে আস্তে বৌডারে ভুইল্যা যাইতে পারবেন। তবু দাদারও বেশিদিন দুঃখু রাখবো না—আবার বিয়া কোরবো, একটা ডোমিস্টিকেটেড্ মাইয়া ঘরে আইন্যা সংসারে সকলেরে সুখী কোরবো।'

একবারের জন্য নীচের ঠোঁটে দাঁতের চাপ দিল স্বপ্না।

'আর নীলু? নীলুর কী হইবো?'

সেলাইটা হাতে তুলে নিয়েছিল সুজাতা, ছুঁচটা আঙুলে বিঁধে গেল কি? সঙ্গে সঙ্গে মুখের রঙ বদলে গেল তার, ভেসে উঠল যন্ত্রণার ছায়া।

সেলাই আবার নামিয়ে রেখে চকিতে উঠে দাঁড়ালো সুজাতা।

'এই রে, ডাইল চড়াইয়া আসছি সেই কখন। ধইর‍্যা গেল বুঝি।'
চলে গেল রান্নাঘরের দিকে। যেন পালিয়ে গেল।
তখন বাইরে সাইকেলের বেলের আওয়াজ উঠল। স্বরাজ ফিরেছে বাজার করে।

॥ এগারো ॥

"Let every class-conscious worker, remember what great tasks of the people's struggle now rest on his shoulders. Let him not forget that he represents the needs and the interests of the entire peasantry as well, of the entire mass of the toiling and exploited, of the entire people, against the enemy of the entire people—"

উনিশশো পাঁচ সালে লেনিনের ডাক। তারপর ৯ই জানুয়ারীর রক্তস্নান। সেই রক্ত দিয়ে বিপ্লবকে মুছে ফেলা যায়নি। দমন, পীড়ন, নির্বাসন, নির্যাতন যত বেড়েছে—শক্তি বেড়েছে তার সঙ্গে সঙ্গে। ঝড় উতরোল হয়েছে যত বেশি, বজ্র গর্জেছে, সাগর ক্ষেপেছে—গোর্কী দেখেছেন ঝড়ের পাখিরা ততই ঝাঁপিয়ে পড়ছে তার ভেতরে।

ক্রমে ক্রমে আরো মিলেছে, আরো ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, সব দ্বিধা-সংশয়-বিভ্রান্তি-গুলো পার হয়েছে একে একে।

সমস্ত কৃষকের স্বার্থে, সব শোষিত শ্রমিকের প্রয়োজনে, সমগ্র জনসাধারণের জন্যে সমস্ত মানুষের সব শত্রুর বিরুদ্ধে। বিপ্লবের নিয়মই তাই। অন্তত প্রবীর তার সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে এই পর্যন্ত বুঝেছিল।

অথচ কী আশ্চর্য এই ভারতবর্ষের ইতিহাস! এই বাংলা দেশের!

যখন মনে হয়েছিল সমাজতন্ত্রবাদী শক্তিগুলো সব এক হয়েছে, হাতে হাত মিলিয়ে, পথের নিশানা নিশ্চিত করে নিয়ে এগিয়ে চলেছে, তখন চাকাটা ঠিক উল্টো দিকে ঘুরতে আরম্ভ করল। শ্রমিকের সংহতি ভাঙছে, কৃষক কৃষকের বিরুদ্ধে হানাহানিতে নেমেছে, ছাত্র, মধ্যবিত্তের সংগ্রামী শক্তি এ ওর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। লেনিনের শিক্ষার সঙ্গে কোথায় মেলে? অত্যাশ্চর্য আজকের এই বামপন্থী আন্দোলনের নেতৃত্ব!

প্রত্যেকেরই উত্তর অতি সহজ এবং সোচ্চার। আমরাই মাত্র নির্ভেজাল বিশুদ্ধ বিপ্লবী। বাকী সবাই প্রতিক্রিয়াশীল, ধনতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদের ছদ্মবেশী গুপ্তচর। সুতরাং হাতে-কলমে এবং মুখে পরস্পরের মুণ্ডপাতই বিপ্লবকে এগিয়ে আনবার রাজপথ —অটো বান্!

আনন্দরা অট্টহাস্য করে বলবে, 'দুই আর দুয়ে চার হয়—পার্লামেন্টারী পলিটিক্সে এ ছাড়া কী হবে! গদি পেতে গেলে ভোট চাই—অতএব সমর্থক বাড়াতে হবে। দলটাই যখন প্রথম কথা; তখন বিপ্লবকে মন্ত্রদানের বক্তৃতার জন্যে শিকেয় তুলে রাখলেই চলে। এর মধ্যে ভাঙো ইউনিয়ন—দু' মণ ধান আর চার ছটাক জমির ভাগাভাগি নিয়ে মাথা-ভাঙাভাঙি শুরু করো কৃষকদের ভেতরে। এসব ধোঁকাবাজির দিন ফুরিয়েছে —ধরো অস্ত্র, নিপাত করো শত্রু—আনো বিপ্লব।'

ভালো কথা। কিন্তু অব্‌জেক্‌টিভ্‌ কন্‌ডিশ্যন?

ধরো, কোথাও কিছু তরুণ বিপ্লবী তাদের দুজন 'শ্রেণী শত্রু'কে খতম করল। তারপর গা-ঢাকা দিল তারা। তারও পরে এল কৃষকের ওপর পুলিসের পীড়ন। সেই পীড়নের প্রতিক্রিয়া কী? কৃষক আরো একতাবদ্ধ হল, বিপ্লবের সম্ভাবনা তীব্র হল আরো? কিংবা জনসাধারণ সন্ত্রস্ত হল, পেছিয়ে গেল, যেখানে ঘাঁটি তৈরি হচ্ছিল মনে হয়,—সেখানে পায়ের নিচে মাটিটাই পেছল হয়ে গেল?

বাইরে থেকে গিয়ে ক্ষুধিত মানুষকে নাড়া দেওয়া কঠিন নয়—ক্রোধের পটভূমি তার তো আছেই। কিন্তু সে ক্রোধের আগুনটাকে জ্বালিয়ে রাখবার—তাকে নিয়ন্ত্রিত করবার—তাকে ছড়িয়ে দেবার জন্যে অনেক বিস্তৃত আয়োজনের দরকার নেই? সে অবস্থা তৈরি আছে তো?

অথবা আনন্দরা তা তৈরি করছে। আর ইন্ধন তো দেশ জুড়ে আছেই—কয়েকটা মশালই দাবানল জ্বালিয়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। যুদ্ধ শুরু হলে ড্রাগনের বীজের মতো মাটি থেকেই হয়তো সৈনিক জন্ম নেয়।

না, কিছু ভাবা যাচ্ছে না। প্রবীর কপালের ঘাম মুছে ফেলল।

"পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় আজ এক বিবৃতিতে বলেছেন, বাংলা কংগ্রেসের যে তিনজন মন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন—"

পাশের বাড়ির রেডিয়ো খবর বলছে। আবার বিস্বাদ বিরক্তির তরঙ্গ একটা।

প্রবীর উঠে তৎক্ষণাৎ জানলাটা বন্ধ করে দিলে। রেডিয়োর আওয়াজ একটু কমে গেল বটে—কিন্তু শব্দভেদী বানের মতো ঠিক কানে আসছে। না শোনবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করলে যেন আরো বেশি করে শোনা যায়—মনকে যতই সরিয়ে নেবার চেষ্টা চলে, ততই সে উৎকর্ণ হয়ে ওঠে।

নিজের কপালটা টিপে ধরে কিছুক্ষণ বসে রইল। তারপর হঠাৎ একটা চিৎকার করে ওঠবার ইচ্ছে জাগল তার। আমরা—এই প্রবীর ব্যানার্জি'রা—আমাদের মতো আরো অসংখ্য অগণিত যারা—আমাদের শুধু পারস্পরিক বিদ্বেষের মন্ত্রে বিষিয়ে তুলছ কেন? তোমরা যারা নেতা—যারা ইতিহাসে পাঠ নিয়েছ—যারা ভবিষ্যৎকে অনেক স্বচ্ছ, অনেক উজ্জ্বল দৃষ্টিতে দেখতে পাও, তোমরা কেন আমাদের নিশ্চিত, কোনো গঠনমূলক প্রোগ্রাম দিচ্ছ না? এই যে আমরা চোখ বেঁধে কানামাছি খেলছি, এতে কী লাভ, কার লাভ?

অদ্ভুত অবস্থা একটা। এই সেদিনও এক হয়ে—এক দাবিতে ইউনিয়নের স্বার্থে দাঁড়িয়েছি আমরা। অথচ আজ নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে এ ওর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছি। আমরা তো কেউ দালাল হয়ে যাইনি—মালিকের কাছে গোপন দাসখৎ লিখে দিয়ে আন্দোলনকে ধ্বংস করবার উদ্যোগ নিইনি। তবু আমরা আলাদা হয়ে যাচ্ছি—সেদিনের একান্ত বন্ধুর সঙ্গে আজ মুখ-দেখাদেখি বন্ধ। চীন আর সোভিয়েটের মধ্যে নীতিগত প্রশ্নে মতভেদ দেখা দিতে পারে—তাই বলে আমাদের স্বার্থও বদলে গেল?

"Of the entire people, against the enemy of the entire people—"

এই সেই একতার নমুনা? কোন্‌ পাকে ঘুরছে বিপ্লবের চাকা?

দূর তোর!—নেতারাই বুঝবেন। ভাবতে গেলে মাথা ঘুরতে থাকে। তবু বিভ্রান্ত

বুদ্ধির প্রশ্ন থামে না : আমরা এগোচ্ছি, না পিছিয়ে যাচ্ছি ? আর এই-ই যদি, তা হলে পার্লামেণ্টারী রাজনীতির পথ নেবার কী দরকার ছিল ? সোজা নামলেই হত সংগ্রামে—তা হলে অধৈর্য, ক্রুদ্ধ আনন্দরা এমন করে ঝড়ের মধ্যে ছুটে বেরিয়ে যেত না।

অফিস-ক্যাণ্টিনে শৈলেশকে বলেছিল, 'একটা কো-অর্ডিনেশন কমিটি করা যায় না ?'

শৈলেশ যথারীতি তার আধপোড়া চুরুটটা ধরিয়ে আধ-খাওয়া চায়ের পেয়ালাটা সামনে নিয়ে ভুরু কুঁচকে বসেছিল। মাথায় তেল দেয় না—ঝাঁকড়া কোঁকড়ানো চুলগুলোতে এখানে-ওখানে ধূসর ছায়া। অসময়েই পাক ধরেছে। বামপন্থী আন্দোলনের সূত্রে দু'বার জেল খেটেছে। মুখে, কপালে অনেকগুলো ক্লান্ত রেখা।

মোটা ফ্রেমের চশমার ভেতর দিয়ে সন্দিগ্ধভাবে তাকালো শৈলেশ।

'কিসের কো-অর্ডিনেশন ?'

'অ্যাপার্ট ফ্রম আওয়ার পলিটিক্যাল ডিফারেন্‌সেস—আমাদের সাধারণ স্বার্থে—'

'অসম্ভব।'

'কেন অসম্ভব ?'

'পার্টি থেকে আর কোনো জিনিসকে আজ বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না।'

সেই এক কথা। পার্টি—পার্টি। প্রবীর উত্তেজিত হয়ে উঠল।

'তার মানে এই দাঁড়াচ্ছে যে পাড়ায় যদি ডাকাত পড়ে, তা হলেও পার্টি লীডারশিপের কাছ থেকে ডিকটেশন আনতে হবে যে, অন্য দলের সঙ্গে এক হয়ে আমরা ডাকাত তাড়াতে পারি কিনা ?'

শৈলেশের ঠোঁটের ওপর দিয়ে আলতোভাবে একটুখানি সিনিক হাসি বয়ে গেল। চুরুটটাকে ধরাতে ধরাতে বললে, 'ফল্‌স্‌ অ্যানালজী।'

'মোটেই না। তুমি পাশ কাটিয়ে যাচ্ছ। দলীয় চিন্তায় তফাত থাকতে পারে, কিন্তু নিজেদের প্রয়োজনে কেন আমরা কমন প্ল্যাটফর্ম গড়তে পারি না ?'

শৈলেশ উত্তরে ইংরিজী একটি বচন আওড়ালো। পূর্ব পূর্ব—পশ্চিম পশ্চিম। দুই মেরু কখনো একসঙ্গে মিলতে পারে না।

'রুডিয়ার্ড কিপলিং ? শেষকালে ওই ডাই-হার্ড ইম্পিরিয়ালিস্টকে কোট করতে হল ?'

আবার হাসল শৈলেশ : 'চা খাবে ?'

তার মানে আলোচনা করতে চায় না। এখন যেন কোনোমতে জাত বাঁচিয়ে চলা। রাজনীতির মধ্যেও কাস্ট-সিস্টেম। আমরাই বিপ্লবের সঠিক পথ ধরেছি। বাকীরা অচ্ছুৎ।

তার মানে, ফ্রন্ট গড়াটা ট্যাকটিক্যাল। আমরা তখনই জানতুম, তেলে আর জলে মিশ খায় না।

অথচ কত বড় সুযোগটা এসে গিয়েছিল। প্রমাণ করবার সময় এসেছিল—

টুলু এসে ঘরে ঢুকল—থেমে গেল বিরক্তিকর ভাবনাগুলো। ভালোই হল। এসব ভাবতে গেলেই যন্ত্রণা। ঘাড়ের পেছনে শিরাগুলো দপ দপ করতে থাকে—তারপর মাথার ভেতরে যেন একতাল লোহা জমাট বাঁধে এসে।

টুলু এসে বসে পড়ল চেয়ারে। প্রবীর তাকালো তার দিকে।

'এতক্ষণে ছুটি মিলল ?'

ক্লান্তভাবে টুলু বললে, 'হ্যাঁ। পাঁচটা সাড়ে-পাঁচটার আগে বেরুনো যায় না অফিস থেকে।'

কিছুক্ষণ স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে প্রবীর চেয়ে রইল টুলুর দিকে। দিদির হাতযশ আছে বলতে হবে। কি বক্তৃতা সে টুলুর কাছে দিয়েছে তা টুলুই জানে। তার পর থেকেই হঠাৎ যেন বদলে গেছে ছেলেটা। আজ তিন-চারদিন ধরে নিয়মিত বেরোচ্ছে মণীশদার সঙ্গে হাইকোর্ট পাড়ায়। মণীশদার কোনু বন্ধুর অফিসে কেরানীর কাজ শিখছে।

দিদি সম্পর্কে একটা সূক্ষ্ম ঈর্ষাবোধ করল প্রবীর। টুলু হঠাৎ সব ছেড়েছুড়ে এরকম লক্ষ্মী ছেলে হয়ে উঠবে—এ কল্পনাই করা যায় না। দিদি যে ম্যাজিক করতে পারে, এ খবরটা আগে জানা ছিল না তার।

'খুব বোরিং লাগে, না ?'

টুলু শ্রান্ত রেখায় হাসল : 'কী করা যায়, দাদা ! কাজ তো করতেই হবে।'

টুলুর দিকে তাকিয়ে এখন তার অতীতটাকে মনে আসে না—পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে এই যে কতগুলো বাজে ছোকরার সঙ্গে সে ভিড়ে পড়েছিল, এ কথাটাও ভুলে যেতে ইচ্ছে করে। বাস্তবিক এত বুদ্ধি ছিল, এত মাথা ছিল তার পড়াশোনায়! আজ নথিপত্রের স্তূপে দম-আটকানো হাইকোর্ট পাড়ার এক অফিস ঘরে—দেড়শো-দুশো টাকার ভবিষ্যৎ সামনে রেখে সে ফাইল গোছাচ্ছে—ভাবতেও ভালো লাগে না।

কথাটা টুলু নিজেই তুলল।

'পড়াশোনাটা আবার শুরু করলে কেমন হয়, দাদা ?'

'আমি তো লক্ষবার বলেছি তোকে। তুই-ই তো পাল্টা তর্ক করছিলি—বলছিলি কী হবে, চাকরি জুটবে না। তোর মাথায় ব্যবসার প্ল্যান ঘুরছিল।'

'না, একটা কাজে যখন ঢুকেইছি—' টুলু নিঃশ্বাস ফেলল : 'তখন অন্তত স্কুল-ফাইন্যালটাও পাস না করলে বেয়ারাগিরির ওপরে আর উঠতে পারব না।'

'সে তো নিশ্চয়। কিন্তু প্রাইভেটে ছাড়া—'

'এই বয়সে কি আর স্কুলে ভর্তি হওয়া যায়, দাদা ? আমার চাইতে ছোট টীচার পড়াতে আসবে যে। একটা কোচিং ক্লাসে ভর্তি হয়ে যাব সন্ধ্যের পর।'

'কিন্তু এতক্ষণ অফিস করে—'

'সে হয়ে যাবে দাদা। একটু কষ্ট করতেই হবে কয়েক মাস। ভালো একটা কোচিংয়ের জায়গা আছে গড়িয়াহাটের মোড়ে। অফিস-ফেরত সেখানে পড়াশোনা করে বাড়ি ফিরব।'

'খুব কষ্ট হবে।'

'ও কিছু না। খেয়ে নেব রাস্তায়।'

সত্যিই দিদি ম্যাজিক জানে, প্রবীর ভাবছিল। হঠাৎ যেন প্রাণপণে ভালো হওয়ার চেষ্টা করছে টুলু। হয়তো টুলুর মতো যারা, এই রকমই তাদের স্বভাব। যত জোরে বাইরের দিকে ছুটে গিয়েছিল, তত জোরেই ছুটে আসতে চাইছে ভেতরদিকে। প্রবীর এত সহজে অভ্যেস বদলাতে পারত না—অনেক সময় লাগত তার। কিন্তু একটা খটকা তবুও লেগে রইল কোথাও। যারা এত সহজে ফিরে আসে, তাদের বেরিয়ে

যাওয়ার পথও কি—

ভাবছিল টুলুও। বিশ্রী লেগেছে হাজতে যাওয়াটা। বিশ্রী লেগেছে তার জন্যে দাদার তাদ্বির করে বেড়ানো—মুরারি হালদারের কাছে যাওয়া, আসবার সময় দারোগার কাছে প্রায় নাকে-কানে খৎ দিয়ে আসা ; বিশ্রী লেগেছে দিদির কাছে খবর পেঁছোনো ; রতন আর ফণীর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মনে হয়েছে—যে পথে চলেছে তার শেষে পেঁছে হয় তাকে ওয়াগন ভাঙতে হবে, নইলে ফণীদের সঙ্গে নেমে পড়তে হবে ছিনতাইয়ের কাজে—শুধু মাঝখানে দাঁড়িয়ে ইয়ার্কি মারলেই চলবে না। তারপর স্বপ্নাকে মনে হলে—

হয়তো তবুও রাজী হত না। কিন্তু টিনটিন! যাকে দিদি নিজের হাতে সুশিক্ষা দিয়ে মানুষ করছে—সে! ভাবতেও বুকের ভেতরটা পর্যন্ত শুকিয়ে ওঠে। কী বলতে চায় টিনটিন? এসব লেখাপড়া—গানবাজনা—বাড়ির এই জীবন কিছুই তার ভালো লাগে না? তার অ্যাডভেঞ্চার চাই—ছোট মামার মতো সে একবার জেলে গিয়ে স্বাদ বদলাতে চায়?

'ডু ইয়ু নো—ইটস সো বোরিং—সো বোরিং!'

টিনটিনকে সে সম্পূর্ণ বুঝতে পারেনি। কিন্তু যেটুকু বুঝেছে, তা থেকে অন্তত একটা জিনিস গোপন নেই। দিদি যতই উপদেশ দিক, টিনটিনের কাছে সেই ছোট মামাই এখন নায়ক হয়ে উঠেছে—যার জন্যে ভদ্রসমাজে দিদির মুখ দেখানো শক্ত হয়ে উঠেছে।

টিনটিনকে মনে হলেই আবার তার শিরদাঁড়া বয়ে যেন একটা বরফের স্রোত নামে। ডন কে—তারা কারা, সে জানে না। কিন্তু টিনটিন যে পথে যেতে চাইছে, সেটা কোন্ পথ? আর সেই পথ দেখাচ্ছে সে নিজেও?

ভাগনীকে তার দুর্বোধ্য মনে হয়েছে। কিন্তু ভাগনীর আয়নায় যেন নিজের চেহারাটাই ফুটে উঠেছে তার। এরপরে টিনটিন কী জানতে চাইবে তার কাছে? কেমন করে ছোরা বসাতে হয়? কিভাবে বোমা তৈরী করে? তারপরে বলবে তোমার বন্ধু রতন, ফণী, কার্তিকের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দাও?

টুলুর গলা দিয়ে সেদিন কাটলেট নামতে চাইছিল না। বলেছিল, 'তাই হবে দিদি, আমি কাল থেকে মণীশদার সঙ্গেই বেরুব।'

হ্যাঁ, আমাকে বদলাতে হবে। শুধু আমি নিজেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছি না—আমার অশুভ ছায়া পড়ছে আশপাশে। আমি নিজেও টের পাইনি—কখন আমি ছেলেমানুষ টিনটিনকেও বিষিয়ে তুলেছি।

এই ভালো। সকাল নটায় বেরিয়ে যাওয়া। ছটায় বেরিয়ে কোচিং ক্লাস। সাড়ে আটটায় বাড়ি ফেরা। খেয়েদেয়ে যতক্ষণ পারি পড়াশুনো। সময়টা একেবারে নিশ্ছিদ্র, জমাট। কোথাও ফাঁক নেই এতটুকুও। রতন, প্রমোদ, ফণী, কার্তিক—কারো কথা মনেও পড়বে না তখন।

টুলু চোখ তুলল।

'স্কুল-ফাইন্যালের পরে তো আরো পড়তে পারি দাদা?'

'নিশ্চয়। বাধা কিসের?'

'কলেজে আর ভর্তি হব না—সায়েন্স পড়াও চলবে না। আমি তো এইভাবেই বি. এ. পর্যন্ত পাস করতে পারি, দাদা ?'

'এম. এ-ও পাস করতে পারিস—' প্রবীর হাসল : 'তোর তো আমার মতো অর্ডিনারী ব্রেন নয়, কোথাও আটকাবে না। রাত্রে ল কলেজ হয়—যদি এগিয়ে যাস, নিজেই অ্যাটর্নি হতে পারবি একদিন।'

টুলু হাসল : 'সে স্বপ্ন দেখা দাদা। অনেক দেরি হয়ে গেছে এখন।'

'কিছুই দেরি হয়নি। জীবনে কোথাও কখনো দেরি হয় না। তোর চাইতেও বেশি বয়সে পড়াশুনো ধরে অনেকে ডক্টরেট পর্যন্ত এগিয়ে গেছে।'

টুলু চুপ করে রইল। হঠাৎ কতকগুলো রঙিন ছবি ঝলমল করছে তার সামনে। যেন নেশা ধরে যাচ্ছে। এতদিন চলেছিল একটা ঝোঁকের মাথায়, আজ আবার আর একটা দিক রূপকথার মতো হাতছানি দিচ্ছে তাকে। 'আমি ভালো হয়ে যাচ্ছি—দারুণ ভালো হয়ে যাচ্ছি—' এই উত্তেজনা, এই রোমাঞ্চ ধক্ ধক্ করতে লাগল তার বুকের মধ্যে।

এই উত্তেজনার স্বাদে মগ্ন হয়ে যেতে যেতে টুলুর মনে হল, আমি সংকল্পকে আরো কঠিন করতে পারি, ভালো হওয়ার জন্যে আরো বেশি জীবনপণ সাধনা করতে পারি। এখন আমার অসাধ্য আর কিছুই নেই। বাবা আমার ওপরে অনেক ভরসা রাখতেন। স্বপ্না বলেছিল—

'দাদা !'

'কি রে ?'

'এই সঙ্গে সপ্তাহে দু'দিন শর্টহ্যান্ড টাইপরাইটিংও শেখা যায় না ?'

প্রবীর হাসল : 'ব্যস্ত হচ্ছিস কেন—সব হবে। কিন্তু একসঙ্গে এত বেশি চাপ সইবে না।'

বাইরের দরজায় কড়া নড়ল। বোঝা গেল, মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে দরজা খুলে দিলেন। আর তার পরেই শোনা গেল আশ্চর্য হয়ে মা বলছেন : 'আপনি ?'

'হ্যাঁ, হঠাৎ চলে এলুম—অনেকদিন তো দেখা হয় না। তা সব খবর ভালো ?'

এই ঘরের মধ্যে যেন বিদ্যুৎ চমকে গেল। চেয়ারের ওপর নড়ে উঠল টুলু।

ওই ভরা গভীর গলার স্বর চিনতে ভুল হয় না। শিবপ্রসাদ ঘোষাল এসেছেন। স্বপ্নার বাবা।

মা বলছিলেন, 'হ্যাঁ, চলছে একরকম। কিন্তু খোঁজখবর তো নেন না !'

'কী করে আর নেব, আমি তো বুড়ো মানুষ বৌমা। তা ছাড়া—' একবার থেমে গেলেন, তারপরে বললেন, 'আজ একটু বিশেষ কাজে আসতে হল। ভুলু আছে বাড়িতে ?'

'আছে বইকি, আসুন—আসুন—'

ও'রা সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠছেন, শিবপ্রসাদের জুতোর শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। টুলু চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল : 'আমি আমার ঘরে যাচ্ছি, দাদা।'

'সে কি রে ! জ্যাঠামশাই আসছেন—একবার দেখা করে—'

'আজ থাক দাদা—আজ থাক—' টুলু আর অপেক্ষা করল না। মাঝের দরজা

দিয়ে চকিতে অদৃশ্য হল পাশের ঘরে।

পরক্ষণে বারান্দার দিকের দরজার চৌকাঠে শিবপ্রসাদের ছায়া পড়ল। প্রবীরও উঠে দাঁড়িয়েছিল, বললে, 'আসুন জ্যাঠামশাই, আসুন।'

॥ বারো ॥

যে চেয়ারটায় টুলু বসেছিল, তাতেই বসলেন শিবপ্রসাদ। তারপরেই তাঁর দৃষ্টি সোজা চলে গেল সামনের দেওয়ালের দিকে। শুকনো একছড়া মালা দুলছে প্রবীর-প্রতুলের বাবা প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়ের এনলার্জ করা ছবিটার ওপর। নিঃশ্বাস ফেললেন একটা। তারপর যেন নিজের মনেই বললেন, 'আমার চাইতে চার বছরের ছোট ছিল প্রভাত, অথচ কত আগে চলে গেল!'

চাপা হতাশার স্বর বাজল গলায়? প্রবীর বুঝতে পারল না। বাবার আগে চলে যেতে পারলেই খুশি হতেন শিবপ্রসাদ? সন্দেহ নেই, অসম্ভব ক্লান্ত আর ভারগ্রস্ত তাঁর চেহারা। আনন্দের জন্যে? অনেক আশা করেছিলেন তার ওপর, সেই নিষ্ফলতার যন্ত্রণা?

এইখানেই বাবার সঙ্গে তাঁর মিল। টুলু যখন স্কুলে সেই কেলেঙ্কারিটা করবার পর দু মাসের জন্যে নিরুদ্দেশ হল, তখন বাবাও হঠাৎ এই রকম নুয়ে পড়েছিলেন—যেন পঁচিশ বছর বয়েস বেড়ে গিয়েছিল তাঁর। কারো সঙ্গে কথা বলতেন না—এমন কি এত প্রিয় খবরের কাগজও পড়তে পারতেন না—কোলের ওপর মেলে নিয়ে চুপ করে বসে থাকতেন। কেবল মা'র কান্নাকাটি একটু সরব হয়ে উঠলে দাঁতে দাঁত চেপে এক-আধবার বলে বসতেন: 'কী চাও তোমরা—কী চাও? আমি সুইসাইড করি?'

মিনিট দুই পরে প্রবীর সচেতন হল, লজ্জিতও হল তার সঙ্গে। কোনো মানে হয়? এতদিন পরে শিবপ্রসাদ এসেছেন, অথচ তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে আছে সে? এটা কোন্ দেশী ভদ্রতার নমুনা?

'কেমন আছেন জ্যাঠামশাই?

অন্যমনস্কতা থেকে শিবপ্রসাদও জেগে উঠলেন। হাসলেন শীর্ণ রেখায়।

'ভালোই আছি। এই বয়েসে আর এর চেয়ে কী ভালো থাকব, বলো।'

এড়িয়ে-যাওয়া জবাব। অথবা বলতে হয় তাই বলা। ভালো তিনি নেই। তাঁর চোখ-মুখ, তাঁর চেহারা তা বলে না।

'বাড়ির দোতলার কাজ আরম্ভ করলেন?'

শিবপ্রসাদ মাথা নাড়লেন।

'আমাকে দিয়ে আর হবে না। ছেলেরা যদি পারে, করে নেবে।'

ছেলেরা! আনন্দ সম্পর্কে এখনো আশা রাখেন তা হলে? কিন্তু আনন্দ আর ঘরে ফিরবে? চারদিন আগেও তো সাবিত্রীর ফ্ল্যাটে আনন্দর সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। যদি ফেরে ঝড় বয়ে নিয়ে ফিরবে, যদি না ফেরে তাহলে ঝড়ের মধ্যেই হারিয়ে যাবে। অন্তত দোতলা তৈরি করবার জন্যে সে আসবে না—এ কথা নিশ্চিত।

ঘরের বাতাসটা আবার গভীর হতে যাচ্ছিল, এমন সময় মা এলেন।

'চা খাবেন দাদা ?'

শিবপ্রসাদ আবার হাসলেন। এ হাসিটা কোমল।

'ভুলে গেলেন ? আমি তো সকালে একবার ছাড়া চা খাই না ?'

'ঠিক মনে ছিল না।' মা বললেন, 'তা হলে সরবৎ করে দিই একটু লেবু দিয়ে ?'

সন্ধ্যাটা গরম। আজ বাতাস নেই—চারিদিক গুমোট হয়ে আছে। শিবপ্রসাদের মনে হল, এখানে আসবার সময় পথেই তার তেষ্টা পেয়েছিল। এখন বুকের ভেতরটা পর্যন্ত কাঠ।

বললেন, 'আচ্ছা তা দিতে পারেন।'

মা চলে গেলে শিবপ্রসাদ কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন মেঝের দিকে। যে কথাটা বলতে এসেছেন, এখনো যেন সেটাকে ভালো করে গুছিয়ে তুলতে পারছেন না। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'ভুলু, তোমার সঙ্গে আমার একটা পরামর্শ ছিল। খুব জরুরী।'

প্রবীর আশ্চর্য হল একটু। তার সঙ্গে কী পরামর্শ থাকতে পারে ওঁর ? এতদিন পরে ?

'বলুন।'

'একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটেছে।'

আনন্দ ধরা পড়েছে নাকি ? ধক্ করে উঠল বুকের ভেতরটা।

'কী হয়েছে জ্যাঠামশাই ?'

আবার ইতস্তত করতে লাগলেন শিবপ্রসাদ।

'স্বরাজের সঙ্গে তোমার দেখা হয় ?'

'অফিস-পাড়ায় দেখি কখনো কখনো।'

'কোনো কথা হয়েছে এর ভেতরে ?'

'না, বিশেষ কিছু নয়।' প্রবীর ভাবছিল, জ্যাঠামশাই আনন্দর কথাই তুলবেন, কিন্তু এর মধ্যে স্বরাজ এল কী করে ?

'ও তো একসময় বিশেষ বন্ধু ছিল তোমার।'

প্রবীর ভুরু কোঁচকালো : 'বন্ধু এখনো আছে, তবে দেখাসাক্ষাৎ নিয়মিত হয় না। কিন্তু এসব কথা কেন জ্যাঠামশাই ?'

'বলছি—' একটু চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন, 'ওর বিয়ের কথাটা তোমার মনে আছে বোধ হয় !'

প্রবীর আরো আশ্চর্য হল : 'কেন মনে থাকবে না ? রেজিস্ট্রির সময় তো আমি একজন উইটনেস ছিলুম !'

শিবপ্রসাদ শ্রান্তভাবে বললেন, 'ওরা একসঙ্গে রাজনীতি করত, তারপরে নিজেরা পছন্দ করে বিয়ে করল। তুমি তো জানো, আমি খুশিই হয়েছিলুম। বৌমা ভালো মেয়ে, বি. এ. পড়ছিল, বুদ্ধিমতী। এখনকার ছেলেমেয়ে রাজনীতি করবে—খুব স্বাভাবিক, আমার জীবনের দশ আনাও তো তাই করেই কেটেছে। তারপর নীলু এল, বৌমার একটা শক্ত অপারেশন হয়েছিল তখন—তোমাকেও অনেকবার হাসপাতালে দৌড়োতে হয়েছিল।'

'হ্যাঁ, সবই মনে আছে। কিন্তু এসব—'

'বলছি—বলছি। সেই জন্যেই তোমার কাছে আসা।'

আবার দ্বিধা করতে লাগলেন। একটা যন্ত্রণা বিঁধছে বুকের ভেতর, কথাগুলো বলতে কষ্ট হচ্ছে, সইয়ে নিচ্ছেন ধীরে ধীরে।

সরবতের গ্লাস নিয়ে মা এলেন। হাত বাড়িয়ে নিলেন শিবপ্রসাদ, বড় চুমুক দিলেন একটা।

'আঃ, বাঁচালেন! বুকটা শুকিয়ে গিয়েছিল একেবারে।'

মা বললেন, 'কিছু খাবেন দাদা?'

'পাগল নাকি? এই বয়েসে, এই সময়? এতেই যথেষ্ট।'

মা চলে গেলেন। না ডাকলে মা কোনো দিন কোনো কথার মধ্যেই দাঁড়ান না। বাবার ট্রেনিং। ধমক দিয়ে বলতেন, 'সব ব্যাপারে কেন নাক গলাও ইডিয়টের মতো? তোমার কাজ রান্নাঘরে—গো দেয়ার!' বাবা বুঝে নিয়েছিলেন, কোনো সিরিয়াস আলোচনায় মা'র মতো অশিক্ষিতার কোনো ভূমিকা নেই।

সরবৎ শেষ করে গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রাখলেন শিবপ্রসাদ। যেন খানিকটা সজীব হয়েছেন এতক্ষণে। একবার পরিষ্কার করে নিলেন গলাটা।

'এতদিন পরে ওদের মধ্যে একটা মিস-আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং—'

প্রবীর চমকে উঠল।

'সে কি! ওদের তো খুব লাভিং কাপল বলে—'

শিবপ্রসাদ আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন।

'ঠিক। আমরাও তাই জানতাম। আসলে কী জানো—তোমাদের লেফ্‌ট্‌ পার্টির ভেতরে এইসব মতভেদ, নিজেদের ভেতরে এই সমস্ত ঝগড়াঝাঁটি—এগুলো এখন ডোমেস্টিক লাইফের মধ্যে ঢুকে পড়তে শুরু হয়েছে।'

'আমি বুঝতে পারছি না জ্যাঠামশাই।' প্রবীর অস্বস্তি বোধ করতে লাগল: 'স্বরাজদা কি আজকাল আর রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামায়? মাসখানেক আগেও একদিন আমাকে বলেছিল.আয়্যাম ফেড আপ উইথ পলিটিক্‌স্‌—একটা মীটিং অ্যাটেণ্ড করার চাইতে এনি ননসেন্‌স্‌ হিন্দী ফিল্মও আমি প্রেফার করব।'

শিবপ্রসাদ বললেন, 'রাগে, দুঃখে। ওটা রাজনীতির ওপর বিরাগ নয়, নিজের বিকার। পথ খুঁজে পাচ্ছে না বলে দেওয়ালে মাথা ঠুকছে। বৌমাকে তো জানো, শরীর ভেঙে গিয়ে বাইরে বেরুনো একেবারে ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু এই পলিটিক্‌স্‌ নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে দুজনের মধ্যে তর্কাতর্কি চলছিল।'

'তর্কাতর্কি!'

'যতদূর বুঝতে পারছি, স্বরাজের এই ডিপ্রেস্যানটা বৌমার একেবারে সহ্য হয় নি। এই নিয়ে একটা অশান্তি ছিলই। কিন্তু দিন দুই আগে—'

আবার একটা যন্ত্রণার ঢেউকে সামলে নেবার চেষ্টা করলেন শিবপ্রসাদ। একটু থেমে গিয়ে বলে চললেন, 'বৌমা ময়দানের একটা মিটিং-এ যেতে চেয়েছিল, স্বরাজ আপত্তি করে। শেষে একটা বিশ্রী ঝগড়া। বিলিভ্‌ ইট অর নট—বৌমার অমন চেহারা এর আগে আমি কখনো দেখিনি। চোখ দুটো পাগলের মতো, গায়ের আঁচল খসে পড়েছে, আমি সামনে দাঁড়িয়ে—অথচ আমায় যেন দেখতেও পাচ্ছে না। আর সেই

চিৎকার : আয়্যাম নট ইয়োর স্লেভ, তুমি রেনিগেড্—বাট আই মাস্ট গো! শেষে ফেণ্ট হয়ে পড়ল।'

সমস্ত জিনিসটা যেন বিশ্বাসের বাইরে। প্রবীর বোকার মতো শিবপ্রসাদের পীড়িত শ্রান্ত মুখের দিকে চেয়ে রইল। সুজাতা বৌদির স্নিগ্ধ চেহারাটাই চোখের সামনে ভাসছে এখন। সেই বিয়ের পর। চোখ দুটো ঝকঝক করছে জীবনের পূর্ণতায়। স্বরাজের সঙ্গে হাত-পা নেড়ে জোরালো আলোচনা চলছিল, সুজাতা বৌদি দু' পেয়ালা চা এনে রাখল সামনে।

'অনেকক্ষণ ধরে চ্যাঁচাচ্ছ দুজন। গলা ভিজিয়ে নাও।'

'থ্যাংক ইউ বৌদি, থ্যাংক ইউ। তোমাদের এরকম নজর আছে বলেই বিপ্লবের প্রেরণা এত বেশি করে পাওয়া যায়। কবি বলেছেন, প্রেরণা দিয়েছে—শক্তি দিয়েছে বিজয়লক্ষ্মী—'

'নজরুল কোট করে আর চেঁচিয়েই বিপ্লব আসবে?'

'আমরা বাঙালী। কণ্ঠই ভরসা। চিৎকারের চোটেই বুর্জোয়া আর ইম্পিরিয়া-লিস্টদের হার্টফেল করাব।'

'অত সস্তায় নয়। আমরা মেয়েরা শুধু তোমাদের গলাবাজীর বিপ্লবে চা যোগাব, ভুলেও ভেবো না সেকথা। যদি চলতে না চালাও, আমরাই চালাব।'

হা হা করে হেসে উঠল স্বরাজ।

'ওটা নতুন কথা নয় সুজাতা। তোমরাই তো আমাদের চালাচ্ছ পিতা আদমের কাল থেকে। নইলে জ্ঞানবৃক্ষের ফলই বা কে খেতো—এত দুর্গতিই বা আসত কোত্থেকে!'

'ভালোবাসা। স্নিগ্ধতা। উজ্জ্বলতা। কিন্তু একটা সত্যের আভাস কি সেদিনও ছিল? তোমরা যদি চলতে না চালাও, আমরাই চালাব।'

শিবপ্রসাদ আবার গলা পরিষ্কার করলেন। প্রবীর সজাগ হল সঙ্গে সঙ্গে।

'এখনো এই অবস্থা চলছে জ্যাঠামশাই?'

'আরো গড়িয়েছে—' শিবপ্রসাদের চোখ আবছা হয়ে এল : 'বৌমা কাল চলে গেছে ওর দাদার কাছে—বারাসাতে। যাওয়ার সময় আমাকে প্রণাম করে বলে গেল, আমাকে ক্ষমা করবেন বাবা, আপনাদের বাড়ির বৌ হবার মতো যোগ্যতা নেই আমার।'

'স্বরাজদা?'

'চুপ করে বসে আছে। কথা বলা বন্ধ করেছে সকলের সঙ্গে—' বলতে বলতে শিবপ্রসাদের চোখে জল এল : 'আমি নীলুর দিকে তাকাতে পারছি না ভুলু। আর তোমার জেঠিমা—'

ঘরের বাতাস থমথম করতে লাগল। একটা কথাও বলা গেল না।

সময়—এখন অন্যরকম সময়। সে তার পাওনা দাবি করছে। অনেক কিছু মিটিয়ে দিতে হবে আমাদের। তাতে যদি বুকের পাঁজরা গুঁড়িয়ে যায়, যাবে। কাল মিটিয়ে নেবে তার হিসেব, একবিন্দুও ছেড়ে দেবে না সে।

শিবপ্রসাদ একটু সামলে নিলেন। মুছে ফেললেন চোখ।

'কোথায় যেন আমাদের সব ভুল হয়ে গেছে। এতদিন ধরে যেগুলোকে বিশ্বাস

করে এসেছিলুম সেগুলোকে আর ধরতে পারছি না মুঠোর ভেতরে। আমাদের সময় শেষ হয়ে এল, নতুনভাবে কিছুই করবার নেই আর। কিন্তু যাবার আগে অন্তত সংসারটা যদি—' বলতে বলতে থামলেন একবার : 'কী করা যায় বলো তো ভুলু?'

মনের আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছেন না কোথাও। শেষে ডুবতে ডুবতে যেন একমুঠো ঘাসের মতো প্রবীরকেই আঁকড়ে ধরেছেন।

প্রবীর বললে, 'ওজন্যে ভাববেন না জ্যাঠামশাই। এক-আধটু ঝগড়ার ব্যাপার—বৌদি দুদিন পরেই ফিরে আসবে।'

শিবপ্রসাদ মাথা নাড়লেন।

'আমার বয়েস হয়েছে ভুলু। এ সে জিনিস নয়।' আচ্ছন্ন চোখে চেয়ে রইলেন প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিটার দিকে, যেন মনে মনে ঈর্ষা করছেন তাকে। অনেক দুর্ভাগ্যের হাত থেকে বেঁচে গেছে লোকটা। মরে বেঁচেছে। তারপর আবার বললেন, 'তোমাকে বলতে আমার সংকোচ হয়, কিন্তু তুমি তো বৌমার বারাসাতের বাড়ি চেনো। যাবে একবার? তাকে বলতে পারো যে অন্তত নীলুর দিকটা কনসিডার করেও—'

'নিশ্চয় যাব জ্যাঠামশাই—' মনে মনে শীর্ণ সঙ্কুচিত হয়ে উঠছিল প্রবীর, বুঝতে পারছিল সুজাতার সঙ্গে এই দেখাটা খুব সহজ হবে না। ভেদটা মনের নয়, ধর্মের। এবং সেইটেই সবচাইতে দুস্তর। কিন্তু এসব বলে শিবপ্রসাদের দুঃখ বাড়ানো যায় না। তার বদলে বলতে হল, 'আপনি ভাববেন না জ্যাঠামশাই, রাগ পড়ে গেলে বৌদি নিজেই ফিরে আসবে।'

শিবপ্রসাদ বিশ্বাস করলেন কিনা বোঝা গেল না। বসে রইলেন চুপ করে।

'তার আগে স্বরাজদার সঙ্গেও কথা বলব একবার!'

'যাবে আমার বাড়িতে? অনেকদিন তো যাওনি?'

'এসব ব্যাপার বাইরে আলোচনা করাই ভালো জ্যাঠামশাই, বাড়িতে ঠিক সুবিধে হবে না। আমি অফিস-পাড়াতেই কাল ধরব স্বরাজদাকে।'

'যা ভালো বোঝো কোরো, আমি আর ভাবতে পারছি না—' নিঃশ্বাস ফেলে শিবপ্রসাদ উঠে দাঁড়ালেন : 'শুধু একটা কথাই মনে হচ্ছে বার বার—সব ভুল হয়ে গেছে কোথাও। দু রাত ঘুমুতে পারিনি, শেষে তোমার কথাই মনে পড়ল। তুমি তো ওদের দুজনকেই চিনতে—হয়তো—'

'আমি বলছি জ্যাঠামশাই, কিছু ভাববেন না আপনি।'

একটু হাসতে চেষ্টা করলেন শিবপ্রসাদ, তারপর বেরিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়ালেন দরজার দিকে। আর সেই সময় হঠাৎ প্রবীরের মনে হল, এর মধ্যে একবারও তিনি আনন্দর কথা বলেননি।

টুলুরও না।

ডনের টু-সীটার ছুটছিল। হু-হু করছে ময়দানের হাওয়া। সেই বাতাসে উড়ছিল টিনটিনের হর্সটেল চুল।

টিনটিন বললে, 'ডন, এবার আমাকে স্টিয়ারিং দাও। আমি একটু চালাব।'

ডন বললে, 'ওহো, নো। তুমি একটু বেশি বীয়ার খেয়েছ আজকে। নেশা হয়েছে তোমার।'

'না, কিছু হয়নি।'

ডন একটা ইংরিজি শপথ আওড়ালো।

'উহুঁ, তুমি অ্যাকসিডেণ্ট করবে!'

'না হয় হবে অ্যাকসিডেণ্ট! দ্যাট উড্ বী কোয়াইট এ থ্রীল্!'

'দুঃখিত, মাই বার্ড! অত কণ্ট্রীল থ্রীলে আমি রাজী নই। আমার আরো কিছুদিন বাঁচা দরকার।'

টিনটিন চটে উঠল।

'তুমি একটা কাওয়ার্ড। নামিয়ে দাও আমাকে গাড়ি থেকে।'

'দেব নামিয়ে—তোমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে।'

'আমি এখন বাড়ি যেতে চাই না।'

'টিনটিন, তোমার নেশা হয়েছে।'

'হ্যাং ইট—হ্যাং ইয়োর বীয়র! এরপর একদিন হুইস্কি খাব এক বোতল, একটা রিভলবার যোগাড় করব। অ্যাণ্ড দেন ডন—আই উইল শুট্ ইউ!'

ডন জবাব দিল না—ভয় ধরে যাচ্ছিল তার। গাড়িটাকে সার্কুলার রোড দিয়ে ঘুরিয়ে সে রওনা হল দক্ষিণের দিকে।

আর তীক্ষ্ণ স্বরে টিনটিন বলে চলল, 'না, আমি বাড়ি যাব না। ইট্স্ বোরিং—সো বোরিং! ডন, সাম ডে আই মাস্ট শুট্ ইউ—আই মাস্ট শুট্ ইউ—'

॥ তেরো ॥

রাসবিহারীর মোড়ে, আধ মাইল লম্বা শাটল্ বাসের লাইনে দাঁড়িয়েছিল টুলু। সামনেই একটি অল্পবয়সী মেয়ে। পুরনো অভ্যাসে মেয়েটির ঘাড়-গলার দিকে বার বার চোখ পড়তে যাচ্ছিল, একবার পাশের দিকে মাথা ফিরিয়েছিল মেয়েটি, মনে হয়েছিল বেশ মিষ্টি মুখখানা, তার চুল থেকে চাপা একটা সুগন্ধিও বয়ে আসছিল। কিন্তু প্রাণপণে নিজেকে সামলে নিচ্ছিল টুলু, যেন একান্তভাবে জপ করতে চাইছিল : এসব নয়, এসব নয়। অনেক হয়েছে ইয়ার্কি-ফাজলামো, যাকে বকে যাওয়া বলে তার কোথাও কোনো ত্রুটি ছিল না। কয়েকবার টেনে নিয়ে গেছে বাজে জায়গায়। তবু ভাগ্য ভালো, চোলাই মদের আড্ডায় ভেড়াতে পারেনি আর। ওইখানেই কোথায় বেধেছে, মানিক, ফণী কিংবা কার্তিকের বন্ধুত্ব যেমনই হোক—বাকী লোকগুলোর সঙ্গে ভাঁড়ে করে ওই দুর্গন্ধ মদগুলো গিলতে—

প্রবৃত্তি হয়নি, সাহসও না। ওই গন্ধ মুখে নিয়ে বাড়ি ফিরব? মা'র সামনে, দাদার সামনে? নেশাটা ধরেনি, কিন্তু আর কিছুই তো বাকী ছিল না। আরো কদিন গেলে হয়তো মানিকের সঙ্গে রওনা হত ওয়াগন ভাঙতে কিংবা ফণীই তাকে টেনে নিয়ে যেত ছিনতাইয়ের দলে। ঠিক এমন সময় দিদি এল। বেঁচেছে সে।

না, আর ওসব ভাবব না। কোনো বাজে কথা নয়, কোনো কুচিন্তা নয়। তাকিয়ে দেখব না কোনো মেয়ের দিকে। যদি কখনো সময় আসে—টুলুর বুকের ভেতরে হঠাৎ হাতুড়ি পড়তে লাগল : তখন যাব স্বপ্নার কাছে। তার আগে আমাকে অন্তত প্রাইভেটে বি-এটা পাস করতে হবে, চাকরিতে—

অবশ্য মধ্যে মধ্যে অফিসে যেন দম আটকে আসতে চায়। শুকনো কাগজপত্র, ফাইল আর দলিলের স্তূপ, টাইপরাইটারের আওয়াজ, ফাইফরমাস—মাথা ঘুরতে থাকে। বুড়ো হ্যাংলা চেহারার হেড ক্লার্কটার ডিসপেপসিয়া আছে, একটু এদিক-ওদিক হলেই খ্যাচ-খ্যাচ করে ওঠে। খুন চেপে যায় কখনো কখনো, ইচ্ছে হয় এক ঘা মেরেই বসি বুড়োকে। সন্ধ্যেনাগাদ যখন ছুটি মেলে, তখন পিঠের ওপর যেন একমণী বোঝা চেপে আছে একটা।

অ্যাটর্নী ঘোষ সাহেব মণীশদার বন্ধু। তাঁর ব্যবহার অবশ্য ভালো। মাঝে মাঝে হেসে পিঠ-টিঠ চাপড়েও দেন। উৎসাহ দিতে থাকেন।

'খাটো হে, একটু খাটো। বুঝতেই পারছ রেস্‌পন্‌সিব্‌ল কাজ এসব, শিখে নিতে সময় লাগবে।'

কোচিং ক্লাসে এখনো ভর্তি হওয়া হল না। সময়ই পাওয়া যাচ্ছে না। বিশ-পঁচিশ লাখ টাকার একটা বড় মামলা চলছে হাইকোর্টে। ঘোষ সাহেব অসম্ভব ব্যস্ত, দারুণ কাজের চাপ। কিন্তু লেখাপড়াটা আরম্ভ করতে পারলে ভালো হত। যাহোক একটু নিঃশ্বাস ফেলা যেত এই দমচাপা আবহাওয়া থেকে।

সাতটা বাজে। লাইনটা শাট্‌ল্ বাসের আশায় দাঁড়িয়ে। ধৈর্যের প্রতিমূর্তি। কিন্তু টুলুর বিরক্তি লাগছিল। এর চাইতে জোরে জোরে পা চালালে এতক্ষণে যাদবপুরে পৌঁছে যেত।

কাঁধের ওপর কার হাত পড়ল পাশ থেকে। টুলু চমকে তাকালো। মানিক।

'কি রে, ডুমুরের ফুল হয়ে গেলি? পাত্তা নেই যে আর!'

'সময় পাচ্ছি না। অফিস থেকে ফিরতে দেরি হয়ে যায়।'

'ও—অফিস!' মানিক ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসল : 'ভুলেই গিয়েছিলুম, তুই কাজের লোক হয়ে গেছিস। তা কী করছিস এখানে?'

'দেখতেই পাচ্ছিস। বাসের জন্য দাঁড়িয়ে আছি। বাড়ি ফিরব।'

'এখন কী হবে বাড়ি ফিরে? আয়!'

'না ভাই, এখন আর আড্ডা নয়। ভারী খিদে পেয়েছে।'

'খিদে পেয়েছে তো খাওয়াব। আয়—আয়—'

হাত ধরে হ্যাঁচ্‌কা মারল একটা।

টুলুর বুক কেঁপে উঠল। আবার সেই সঙ্গ। অনেক কষ্টে লোভ এড়িয়েছে। গড়িয়াহাট ব্রীজ থেকে রাসবিহারী পর্যন্ত সে চোখ বুজে থাকে—প্রাণপণে ভাবে ওদের সঙ্গে যেন আর তার দেখা না হয়—কোনোমতেই না। সে এখন ভালো হতে চাচ্ছে—এখন তার নিজেকে বদলাতে হবে।

মানিক বললে, 'বেকুবের মতো দাঁড়িয়ে আছিস কী? আমি কি তোকে খেয়ে ফেলব? চল্ চল্—দু ঘণ্টা বাদে বাড়ি ফিরলে তোর চরিত্তির খারাপ হয়ে যাবে না।'

বলে আবার হ্যাঁচ্‌কা মেরে হাতখানেক টেনে সরিয়ে নিলে। মানিকের শেষ কথাটায় সামনের মেয়েটি মুখ ফিরিয়ে তাকালো। আশপাশের আরো কজনের দৃষ্টি ঘুরে এল এদিকে।

নাঃ, এখান থেকে বেরিয়ে না গেলে এতগুলো লোকের সামনে বিশ্রী কাণ্ড ঘটবে একটা। যা আলগা মুখ, কী বলে বসবে শেষ পর্যন্ত ঠিক নেই তার। বিশেষ করে মেয়েটির কানে যাচ্ছে কথাগুলো।

টুলু বেরিয়ে এল লাইন থেকে। জোরপায়ে এগোতে এগোতে বললে, 'জ্বালালি!'

'দৌড়োচ্ছিস কেন ঘোড়ার মতো?' মানিক তৎক্ষণাৎ এসে সঙ্গ নিলে। তারপর চোখ টিপে বললে, 'বুঝেছি।'

'কী?'

'রসভঙ্গ করে দিয়েছি।'

'মানে?'

'মেয়েটার গা ঘেঁষে বেশ দাঁড়িয়েছিলি! তা মাইরি—'

একটা বিশ্রী কিছু বলতে যাচ্ছিল, টুলু প্রায় ধমকে উঠল।

'খারাপ কথা ছাড়া কিছু আর মুখে আসে না—না? মেয়ে দেখলেই নোলা লক লক করে?'

'লে ব্বাবা!' মানিক দাঁড়িয়ে পড়ল: 'তুই স্লা যে ভগ্নীপোতের পাল্লায় পড়ে একেবারে পাটভাঙা ভদ্দরলোক হয়ে গেলি আচম্‌কা! একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে রে টুলু!'

'হোক বেশি। আমাকে ছেড়ে দে। আমি বাড়ি ফিরব।'

'ফিরো চাঁদ, ফিরো। বাড়ি গিয়ে মা'র কোলে শুয়ে ঝিনুক-বাটিতে দুদু খেয়ো।' বলে শক্ত করে আবার হাত চেপে ধরল টুলুর: 'তার আগে চল্‌ ওই চায়ের দোকানে। দরকারী কথা আছে তোর সঙ্গে।'

'কী দরকারী কথা আবার? আমি তোদের দল ছেড়েছি।'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি—' মানিক বাঁকা চোখে তাকালো: 'কিন্তু তুমি দল ছাড়লেই দল তো তোমায় ছাড়তে পারে না। হচ্ছে—সে-সব হচ্ছে। তার আগে চল্‌ তোকে কিছু খাওয়াই। খিদে পেয়েছে বলেছিলি।'

পরিত্রাণ নেই, কামড়ে ধরেছে জোঁকের মতো। খিদে পেয়েছিল নিশ্চয়ই—কিন্তু বিরক্তিতে তার খাওয়ার প্রবৃত্তি নেই আর। অথচ বোঝাই যাচ্ছে, মানিক তাকে ছাড়বে না। বিস্বাদ আর ক্লান্ত মন নিয়ে সে মানিকের সঙ্গে ঢুকল চায়ের দোকানে।

দোকানটা কুলীন নয়। টিনের চাল, বেড়ার ঘর। মিস্ত্রি-মজুর, অল্প পয়সার সাধারণ মানুষ এখানকার খরিদ্দার। সস্তায় চা, সস্তায় খাবার। মাংসভাজার তীব্র গন্ধ আসছে রাস্তা পর্যন্ত। ভেতরটা জমাট।

দুজনে ভেতরে ঢুকে এসে কোণার দিকে নিরিবিলি একটা ছোট টেবিল বেছে নিলে। টুলু হাতের ব্যাগটা ঠেস দিয়ে রাখল বেড়ার গায়ে।

মানিক বললে, 'বাঃ, চকচকে একটা ব্যাগও কিনেছিস দেখছি!'

'ফাইল কেস।'

'ওসব বুঝি নে। কী আছে ওতে? টাকা?'

'না, কাগজ-পত্তর।'

'ধুস!' মানিক ভুরু কোঁচকালো: 'কী খাবি?'

'তোমার যা ইচ্ছে।'

'চপ?'

'আচ্ছা।'

দুটো করে চপের হুকুম দিয়ে মানিক বললে, 'বুঝলি টুলু, এবার একটু দেশের কাজ-টাজ করব ভাবছি।'

'কী করবি বললি?' টুলু খাবি খেলো একটা।

'দেশের কাজ। পলিটিক্স্।'

'পলিটিক্স্!' টুলু একটু হাঁ করে রইল: 'বাস জ্বালানো? সে তো ফাঁক পেলেই করছিস!

'দূর, ও তো মজা। ওসব না। ওরা আমায় বলছিল।'

'কারা?'

'আমাদের ও-তল্লাটে যারা ঝাণ্ডা-ফাণ্ডা নিয়ে বেড়ায়—জিন্দাবাদ আর কবর দিন বলে চ্যাঁচায়! ওদেরই জন-দুই আমাকে খুব বোঝাচ্ছিল—জানলি? বললে, কেন এসব করছ, এখন ইনকিলাব আসছে, তোমরা কী বলে দেশের যুব—যুব—যুবশক্তি, কেন মস্তানি করে বেড়াও—সামিল হয়ে যাও। খারাপ কাজ-টাজ ছাড়ো, এসো আমাদের সঙ্গে।'

'তুই রাজী হয়ে গেলি?'

'দাঁড়া না—' অসংখ্য দাগধরা ময়লা টেবিলটায় আঙুল বাজাতে বাজাতে মানিক বললে, 'অত সস্তায়? বললুম, কী দেবেন দাদারা, সেইটে আগে বলুন। ভোটের সময় ওদের হয়ে চিল্লিয়েছি, ভলেন্টারী করেছি, দিনে চার টাকা আর দু'বেলা মাংস-পরোটা দিত। সেই রেট দেবেন তো! বললে, ওসব নয়, ওর চেয়ে বেশি দেব।' গুণ্ডাবাজী ছাড়ো, ইনকিলাবের জন্যে জান লড়িয়ে দাও। সময় এসে গেছে—ইনকিলাব হয়ে যাক, সবাইকে কাজ দেব, খাবার দেব, ভালো হয়ে বাঁচবার পথ করে দেব।' হঠাৎ মানিকের চোখের ওপরে ছায়া নামল: 'মাইরি, তোর কী মনে হয় রে? ভালো লাগে না শালা ওয়াগন ভাঙতে। চোরে চোরে ভাগ-বাঁটোয়ারা আছেই, কিন্তু বিশ্বাস তো নেই—কোন্‌দিন এক ব্যাটা আর-পি হয়তো দিলে ধাঁই করে রাইফেল চালিয়ে। সেদিন মাইরি কাঁকুড়গাছি ইয়ার্ডে আমার মামাতো ভাইয়ের কান ঘেঁষে গুলি বেরিয়ে গেল একটা। আচ্ছা ওরা সত্যি কথা বলে—সব বদলে দেবে? খাটব, খেতে পাব?'

টুলু বললে, 'জানি না।'

'তোকে বলছি ভাই, যদি একটা বাঁধা রোজগার থাকত না, ঠিক একটা বিয়ে-থা করে একটু অন্যরকম হয়ে যেতুম। অবিশ্যি এক-আধটু চোলাই না হলে আমার চলবে না। বৌ তাতে রাগ করবে না—কী বলিস?'

'বোধ হয় করবে না—' টুলু ক্লান্তভাবে হাসল। একটু অন্যরকম হয়ে যাওয়া! সে কথা তো সে নিজেও ভাবছে। তার না হয় দিদি আছে, মণীশদা আছে, দাদা আছে, মা'র চোখের জল আছে আর বাড়ির কথা ভেবে একটা লজ্জার জায়গাও আছে। কিন্তু

মানিকের তো এসব বালাই নেই—সেও জীবনকে বদলাতে চায় ?

ঘোর-লাগা চোখে অন্যমনস্ক ভাবে তাকিয়ে ছিল মানিক। টুলু আবার বললে, 'তুই স্বপ্ন দেখছিস, মানিক ?'

'মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখতে ইচ্ছে করে রে। দূর শালা, কী মানে হয় এভাবে বেঁচে থাকার ? বাবা ব্যাটাচ্ছেলেই ঠিক বলত, আমি একটা শুয়োরের বাচ্চা হয়ে গেছি !'

'নিজের বাপকে গাল দিলি ?'

'থাম, বকিসনি। ওরা সত্যি কথা বলে ? আমরা ওদের সঙ্গে মিশে জান লড়িয়ে দিলে ইনকিলাব এসে যাবে ?'

'আমি বলতে পারব না। আমার দাদাকে জিজ্ঞেস করিস। এসব নিয়ে ও মাথা ঘামায়।'

'তোর দাদাকে মাইরি আমার ভাল্লাগে না। এমন করে তাকায় যে মনে হয়, আমাকে নয়—একটা কাঁকড়াবিছে দেখছে !'

খাবার এল। মানিক বললে, 'নে, খা।'

টুলু বিরক্তিটা ভুলতে লাগল আস্তে আস্তে। কোথায় যেন মানিকের সঙ্গে মনের সুর মিলতে শুরু হয়েছে তার। এক ভাবনা—একটা স্বপ্ন। মাইরি কোথায় চলেছি আমরা, কী মানে হয় এর ? এরকম না হয়ে জীবনটা আর কিছু হলে ভালো হয়, খুব ভালো হয়।

মানিক বললে, 'ভাবছিস কী, খা !'

দুজনে খেতে শুরু করল। মানিক খুশি হয়ে বললে, 'বেশ করে এরা খাবারগুলো। ঝাল-মাংসটা আরো বেড়ে হয়। চাটের সঙ্গে যা জমে !'

'তা জমুক।' টুলু আবার আলোচনাটার জের টানল : 'তা হলে তুই পালিটিকস্ করবি, ঠিক করেছিস ?'

'ভাবছি।'

'কী করতে বলছে ?'

'বলছিল সোনারপুরের ওদিকে কোথায় গাঁয়ে যেতে।'

'কী করবি সেখানে গিয়ে ?'

'ওরা বলছিল, বেনামদার জমি দখল করতে হবে। দিতে হবে চাষী ভাইদের।'

'তুইও জমির ভাগ পাবি নাকি ?'

'ধ্যাৎ—আমি জমি দিয়ে কী করব ? আমাদের সাতপুরুষ লাঙলে হাত দিয়েছে কখনো ?'

'তা হলে তোর কী লাভ ?'

'সকলের লাভ। ইনকিলাবের রাস্তা তৈরি হবে।' মানিকের চোখ ঝকঝক করে উঠল : 'আরো মজা আছে রে। লেগে যেতে পারে।'

'কী ?'

'দাঙ্গা। খুনোখুনিও হতে পারে।'

টুলু চমকালো। মুখ থেকে নামিয়ে ফেলল চামচেটা : 'খুনোখুনির মধ্যে যাচ্ছিস ?'

'আরে এ তো আর দুশমনী করে মানুষের পেটে চাকু চালালো নয়। এ হল দেশের

কাজ। দুশো-পাঁচশো—দু-দশ হাজার জন চলে না গেলে ইনকিলাব আসে ?'

টুলু চুপ করে রইল। তারপর বললে, 'তুই খুনোখুনির লোভে যাচ্ছিস না তো ?'

'না রে না। ওদের কথায় সেই থেকে কিরকম যেন লাগছে। ভাবছি দেখিই না, অন্য কোনো রাস্তা আছে কিনা।'

'যাবি ঠিক করেছিস ?'

মানিক বললে, 'দেখি।'

'আর ওয়াগন ভাঙা ?'

'সে তো আছেই হাতের পাঁচ। কিন্তু ওদের কথাতেই চট করে কিছু করব না। ভাবতে হবে আর একটু—বুঝলি ?'

কিছুই বলা যায় না—টুলু ভাবল। হয়তো সত্যিই সময় বদলাচ্ছে। কাল টুলু ভেবেছে, আজ মানিক ভাবছে। এরপরে ফণী, কার্তিক, প্রমোদ—সবাই ভাববে। আমাদের কাজ নেই, আমাদের পয়সা নেই, আমরা ভালো হতে পারি নি। আমরা যা-তা হয়ে গেছি। ঝকঝকে তকতকে কিছু দেখলে আমাদের পুড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে—কাদা ছিটোতে ইচ্ছে করে ধোপদুরস্ত জামা-কাপড়ে—ইচ্ছে হয় মেয়েদের গায়ে কালি ছিটিয়ে দিই। আমাদের কেউ পয়সা দেয় না বলে আমরা যেভাবে হোক পয়সা কামাই, কেড়েকুড়ে নিই ; আমাদের কোনো আনন্দ নেই বলে আমাদের ফুর্তি বেপরোয়া। মাঝে মাঝে যখন কিছু ভালো লাগে না, কিছুই না—তখন তেতে উঠবার জন্যে মারামারি বাধিয়ে দিই—বোমা-পটকা ফাটিয়ে গুলজার করে তুলি। কিন্তু লাগিয়ে দাও আমাদের কাজে, দেখিয়ে দাও রাস্তা, করো খেটে-খাওয়ার ব্যবস্থা—দেখি আমরা অন্যরকম হতে পারি কিনা।

হয়তো এইভাবেই মানিকও কিছু ভাবছিল। চা এসেছিল, তাতে চুমুক দিতে দিতে মানিকের আর একটা দরকারী জিনিস মনে পড়ল তখন।

'এই টুলু, একটা সত্যি কথা বলবি ?'

'কী ?'

'থানার দারোগার কাছে তুই কী বলেছিস ?'

টুলুর মনে আশঙ্কার ছায়া পড়ল একটা।

'একথা কেন ?'

'কারণ আছে। জবাব দে। থানার দারোগার কাছে তুই মুচলেকা দিয়ে এসেছিস না ?'

টুলু একবার ঠোঁট চাটল। নিজের কাপুরুষতার জন্যে লজ্জা হচ্ছিল তার। একটু চুপ করে থেকে বললে, 'কিছুই তো বলিনি। কেবল আর কখনো বাজে দলে থাকব না, কোনো হাঙ্গামা-হুজ্জুতের মধ্যে যাব না—এইটে লিখে সই করে দিয়েছি।'

'আর কিছু না ?'

মানিকের চোখের দৃষ্টি, তার বলবার ভঙ্গিটা—শিরশির করে উঠল টুলুর বুকের ভেতর। কী বলতে চায় মানিক ?

'আর কী বলব ?'

'তুই জানিস, ফণের লুকিয়ে রাখা আট-দশটা বোম পুলিস খুঁজে বের করেছে।'

'তার আমি কী করব ?'

'কার্তিককে গো-বেড়েন দিয়ে কাল ছেড়ে দিয়েছে, কেস আছে ওর নামে। পরে তারিখ পড়বে। কে যেন জামিন দিয়েছে ওর। ফণেকে ছাড়বে না। বোমগুলোর জন্যে ওর জেল হবে বোধ হয়। আর ফণে কী বলেছে, জানিস ? বোমের খবর পুলিসকে নিশ্চয় টুলু শালাই দিয়েছে। নইলে খোঁজ পাওয়ার তো কথা নয়।'

গলায় চা আটকে বিষম খাওয়ার জো হল টুলুর। মানিক তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে রইল তার দিকে।

'সত্যি কথা বল্ ! হাজত থেকে ছাড়ান পাবার জন্যে নেমকহারামি করেছিস তুই ?'

অবিশ্বাস আর ঘৃণা ঠিকরে পড়ছে মানিকের চোখ থেকে। টুলু যেন ডুবে যাচ্ছিল।

'না, বলিনি। কখনো না। বিশ্বাস কর্ তুই। আর আমি যদি বলেই দিলুম, তা হলে তো সঙ্গে সঙ্গেই ওরা ওগুলো বের করে আনত। পানরো-ষোলো দিন দেরি হবে কেন ?'

'তা ঠিক—' একটু কোমল হল মানিকের দৃষ্টি, আবার টকটক করে টেবিলের ওপর আঙুল বাজাতে লাগল সে : 'কিন্তু তোর ওপর যাতে কারুর সন্দো না হয়, সেই জন্যেই হয়তো ইচ্ছে করে দেরি করেছে ওরা !'

'না মাইরি, কখনো না—' টুলু প্রায় আর্তনাদ করে উঠল : 'আমি দল ছাড়তে পারি, কিন্তু হারামী করব ? কী করে এসব বিশ্বাস করিস তুই ?'

'আমার বিশ্বেস-অবিশ্বেসে কিছুই আসে-যায় না—' চিন্তিতভাবে মানিক বললে, 'কিন্তু ফণে শালাকে বোঝাতে পারলে হয়। কার্তিক উল্লুকটাও রটিয়ে বেড়াচ্ছে। ফণের ছিনতাইয়ের দলের কেউ আবার তোকে আচমকা চাকু মেরে না বসে, তাই ভাবছি।'

আতঙ্কে সাদা হয়ে গেল টুলু : 'আমাকে চাকু মারবে ?'

'দেখি ওদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে পারি কিনা। তবে দিনকয়েক একটু সাবধান হয়ে চলিস। আসলে এই কথাটা বলবার জন্যেই তোকে ডেকেছিলুম। দাঁড়া, আগে এদের বিল মিটিয়ে দিই, তারপর তোকে আমি সঙ্গে করে বাসে তুলে দেব। এই তল্লাটে এখন একা তোকে ছেড়ে দিতে আমার ভরসা হয় না। কিন্তু বার বার তিনবার—সত্যি বলছিস, হারামী করিসনি তুই ?'

'না—না—না—'

জোর করে বলবার চেষ্টা করল টুলু, কিন্তু স্বর ফুটল না ভালো করে। সবটা যেন একরাশ দীর্ঘনিঃশ্বাসের মধ্যে মিশে গেল।

ঠিক একই সময় চৌরঙ্গীর আর একটা চায়ের দোকানে নিঃশব্দে চুরুট খাচ্ছিল স্বরাজ। রাশি রাশি ধোঁয়ায় মুখটা তার একবার ফুটে উঠছে, আর একবার আড়াল হয়ে যাচ্ছে।

প্রবীর বললে, 'এড়িয়ে যাচ্ছ কেন ? এর একটা উপায় তো করতেই হবে ?'

প্রায় পাঁচ মিনিট পরে এতক্ষণে আবার কথা বলল স্বরাজ।

'কোনো উপায় নেই ভুলু। এখন এ-ই হবে। কালটাই এইরকম।'

॥ চৌদ্দ ॥

কথাটা জানা, কথাটা অনেকবার বলা : কালটাই এই রকম। স্বরাজের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চুপ করে চেয়ে রইল প্রবীর। সামনের রাস্তাটা ছোট, তবু এই পাড়ার সান্ধ্য ট্র্যাফিকের স্রোত বইছিল সব রকম শব্দ তুলে। আর তারই ফাঁকে ফাঁকে ওধারের বাড়িটার দোতলা থেকে মধ্যে মধ্যে উঠে আসছিল পিয়ানোর সুর—আবার ভেসে যাচ্ছিল চলন্তি গাড়ি আর মানুষের কলরবের মধ্যে।

ঠিক, সময়টাই এই রকম। কলরবে, গর্জনে, শব্দের সংঘাতে সব সুরগুলো হারিয়ে যাচ্ছে। সাবিত্রীর কাছে সেদিন সে গিয়েছিল কয়েকটা কোমল আর মধুর মুহূর্তের সন্ধানে—একটা কথা বলতে চেয়েছিল, হয়তো বলাও যেত। কিন্তু দেখা দিল আনন্দ। তখন নিজেকে যেমন লোভী তেমনি নির্লজ্জ মনে হল তার। না, একথা সে কিছুতেই মানতে রাজী নয় যে, আনন্দরাই ঠিক পথ বেছে নিয়েছে, সারা ভারতবর্ষের ক্রুদ্ধ বিরোধী শক্তিগুলোকে এত সহজেই মোকাবেলা করা যাবে না, আরো অনেক এগিয়ে —অনেক ব্যাপ্ত হয়ে—অনেক মতকে সংহত করে তবেই চূড়ান্ত আঘাত হানা যাবে। কিন্তু সে তো তর্কের কথা। তার আগে এত বড় ত্যাগ, এমন সাহসকে শ্রদ্ধা করবে না—অন্তত অতখানি গোঁড়ামি প্রবীরের নেই। তাই আনন্দই সেদিন তার স্বার্থপর সন্ধ্যাটাকে বজ্রবিদ্যুতে ভরে দিয়ে গেল।

কিন্তু স্বরাজ আর সুজাতা! সেসব দিনগুলোকে সে তো দেখেছে। আর নীলু! শিবপ্রসাদের দু'চোখে সেই অন্ধকার! খারাপ লাগছিল, খুব খারাপ লাগছিল তার।

প্রবীর বললে, 'স্বরাজদা, আর এক কাপ চা ?'

স্বরাজ নড়ে উঠল। একটা হাতে মাথা রেখে টেবিলের ওপর যেন ঝিমিয়ে পড়েছিল সে।

'অ্যাঁ, চা ? হোক।'

চা বলে দিয়ে আবার কয়েক সেকেণ্ড সময় নিল প্রবীর।

'স্বরাজদা, অকারণেই বাড়িয়ে তুলছ তুমি। এ নিছক মান-অভিমানের ব্যাপার। জাস্ট গো টু সুজাতা বৌদি, অ্যাণ্ড আই থিংক—'

বাঁ হাত নেড়ে বিরক্তিভরে কথাটা থামিয়ে দিলে স্বরাজ। বললে, 'কমিউনিস্ট পার্টির একটা স্টেজে কমরেড বাটলিওয়ালা আর তাঁর স্ত্রী নার্গিস বাটলিওয়ালার কথা মনে আছে তোর ?'

'শুনেছি।'

'কেরালার টমাস আর—'

'এসবের কোনো মানে হয় না স্বরাজদা—' প্রবীর বিরক্ত হল। 'তোমাদের ব্যাপার অত সিরিয়াস কিছু নয়। ইচ্ছে করলেই এগুলো মিটিয়ে ফেলতে পারো।'

'তার মানে, সুজাতাকে অ্যাকটিভ পলিটিকসে ছেড়ে দেব ?'

'অত ভাবছ কেন ? বৌদির শরীর আর আগের মতো নেই যে এসব স্ট্রেন সে সহ্য করতে পারবে। তা ছাড়া এখন সংসারে জড়িয়ে পড়েছে, ওভাবে কাজকর্ম করতেও

পারবে না। এক-আধটা মিটিঙে যদি যেতে চায়—যাক না।'

হঠাৎ স্বরাজের চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

'কেন যাবে মিটিঙে? কী হবে গিয়ে?'

'কী আশ্চর্য, তুমি—'

স্বরাজ বিস্বাদ গলায় বললে, 'থামো ভুলু। কিসের পলিটিক্স? কাদের জন্যে পলিটিক্স? ভারতবর্ষের জন্যে? কিছু হবে না ভারতবর্ষের। যাই করো, যতই করো—শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে শোভিনিজ্‌ম? কোন প্রভিন্সে অয়েল রিফাইনারী হবে কি হবে না তাই নিয়ে চলবে লাইন ওপড়ানো, স্টেশন জ্বালানো। লড়াই চলবে,মহারাষ্ট্র-মহীশূরে, অন্ধ্র-তামিলনাড়ুতে, পাঞ্জাবে-হরিয়ানায়—দেখবে দু'দিন বাদে সারা দেশ জুড়ে চলবে খেয়োখেয়ি, বল্‌কানাইজেশ্যন। তার ওপরে ধর্ম আছে, নানা সেনা আছেন, গোরুরা রয়েছে, আর তার ওপর রয়েছে কয়েকশো পলিটিক্যাল পার্টি। আরো কিছুদিন যাক, ভেঙে পড়ুক সেন্টারের বুর্জোয়া ডেমোক্র্যাটিক গভর্নমেন্ট, তখন অনিবার্য সিভিল ওয়ার এবং পাকাপাকি হয়ে বসবে ফ্যাসিজম। কিছু ভেবো না, তখন তোমাদের যত ঘোর লাল, মাঝারি লাল, ফিকে লাল—সবাইকে লাইন করে দাঁড় করিয়ে দিয়ে মেশিনগান চালাবে। হিটলারের জার্মানী, মুসোলিনীর ইতালী কিংবা ফ্রাঙ্কোর স্পেন—দ্যাট ইজ ইয়োর ফিউচার। দেন থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার—ব্যাস নিশ্চিন্ত।'

ওপাশের টেবিলে তিন-চারটি ছেলে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করছিল, তারা উৎকর্ণ হল। একজন চাপা গলায় কী বলল, বাকী ছেলেরা হেসে উঠল একসঙ্গে।

স্বরাজ একবার উগ্র চোখে তাকালো সেদিকে, প্রবীর লক্ষ্যও করল না।

প্রবীর উত্তেজিত হয়ে উঠল: 'অকারণে তুমি পেসিমিস্ট হচ্ছ। ভিয়েৎনাম—'

'স্টপ দ্যাট্! ভিয়েৎনাম ভিয়েৎনাম! ওই এক নামই জপ করতে পারো তোমরা, কিন্তু ক্যান ইউ প্রোডিয়ুস ওয়ান হো চি মিন, ওয়ান জেনারেল গিয়াপ? এক হয়ে রুখে দাঁড়াতে পারো ইম্পিরিয়ালিস্ট অ্যাগ্রেসনের বিরুদ্ধে? পারো না, কোনো দিন পারবে না। ইণ্ডিয়া ইজ এ ডিফারেণ্ট কানট্রি—ইটস্ রটন টু দ্য কোর, এখানে প্রতি তিনজনে একটা করে পলিটিক্যাল পার্টি। প্রত্যেক পলিটিক্যাল পার্টির কাজ হল অন্যকে ভিলিফাই করা—এর ওর মাথা ভাঙা। আসল কথা কী জানো? ভারতবর্ষ কখনো বিপ্লব করেনি, যুদ্ধ করেনি, বাইরের আঘাতের মুখোমুখি হয়নি। ইংরেজের ওপর অভিমান করে অহিংসার মাটির পাত্রে ভাত খেয়েছে, দু-চারটে ইংরেজ মেরে বোমা-বন্দুকের ফুলঝুরি ছুটিয়েছে, শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের নাম করে যত এগিয়েছে, বিত্রে করেছে তার চেয়েও বেশি। আর গোকুলে বাড়ছে ক্যাপিট্যালিস্ট বংশ, এক-একটা ফ্যামিলির ইনকাম দাঁড়াচ্ছে দৈনিক লাখ টাকা করে। শ্রমিক আন্দোলন স্ট্রাইকের ভোঁতা অস্ত্রটা মারছে এখন নিজের কপালে, কৃষক ফলিডল খাচ্ছে। এক দোজ নকশালবাড়ি চ্যাপ্স্—দে মেণ্ট সাম বিজনেস। কিন্তু তারাও ওভারজেলাস—ভারতবর্ষের গোবর-গাদাকে ভাবছে বারুদের স্তূপ, সেখানে তারা এক্সপ্লোসান ঘটাবে। উদ্দেশ্য ভালো,কিন্তু তারাও ক'টা দলে ভাগ হয়েছে হে? চারটে, পাঁচটা, ছটা।'

অন্য টেবিলের ছেলেরা পয়সা মিটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। দরজা থেকে একটা মন্তব্য শোনা গেল: 'যত দলেই ভাগ হোক—গোবরগাদার গুবরে পোকাদের উড়িয়ে

দেবে নিশ্চয়। বাদ যাবেন না দাদারা, ভয় নেই।' অর্থাৎ ওদের সহানুভূতি নকশাল-বাড়ির দিকে।

ছেলেরা রাস্তায় নেমে গেল। বাঁকা একটা বিদ্রূপের হাসি দেখা দিল স্বরাজের মুখে।

'ওই গুবুরে পোকাই উড়িয়ে দিতে পারবে। ওই পর্যন্তই তোমাদের দৌড়।'

প্রবীর ভেতর ভেতরে ক্লান্ত হয়ে উঠছিল। নৈরাজ্যবাদ—মেণ্টাল অ্যানার্কি। পার্টি ভাঙাভাঙির সূত্র ধরে স্বরাজ একেবারে দেউলে হয়ে গেছে। এ এক ধরনের নার্ভাস ব্রেকডাউন। তর্ক করা বৃথা, শুধু কথাই বাড়বে।

'স্বরাজদা, এসব থাক। কিন্তু তুমি সুজাতা বৌদির ব্যাপারে—'

চা দিয়েছিল একটু আগে, ফ্যানের হাওয়ায় ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল। এতক্ষণে যেন খেয়াল হল স্বরাজের। একটা পেয়ালা তুলে নিয়ে বললে, 'হ্যাঁ, সুজাতা। সেই জন্যেই আমি বলেছিলুম, সুজাতা, তোমার যা খুশি তা করতে পারো, তুমি যদি অ্যাক্‌টিভিটি চাও বস্তির ছেলেদের বিনিপয়সায় পড়াতে পারো, বাট ডোণ্ট গো ইনটু পলিটিক্‌স্‌। নন্‌সেন্স—সীয়ার নন্‌সেন্স!'

'তা হলে দেশের জন্যে কিছু করবার নেই?'

'না—ইট্‌স ডুম্‌ড্‌!'

'ডুম্‌ড্‌?'

'হ্যাঁ। কংগ্রেসের একটা বুর্জোয়া চক্ষুলজ্জা ছিল, লেফ্‌ট পলিটিক্‌সের সে বালাইও নেই। বাড়ি গিয়ে নাকডাকিয়ে ঘুমোও ভুলু, তোমাকে কিচ্ছু করতে হবে না, তোমাদের নেতারাই ভারতবর্ষকে ভারত মহাসাগরের কয়েক হাজার মীটার জলের তলায় ডুবিয়ে দেবে। নেতা—নেতা—নেতা! দোজ পেট্রিয়টস অ্যাণ্ড দেয়ার পলিটিক্‌স্‌! "It has been called patriotism to flatter those in power at the expense of the people—to mislead first and then betray—" কার লেখা বলতে পারো?'

'না, জানি না।'

'জেনেও দরকার নেই তোমাদের। লাভই বা কী? কিন্তু হ্যাঁ—সুজাতা। আমি চাই না, সুজাতা রাজনীতি করে। আই হেট্‌ পলিটিক্‌স্‌, হেট্‌ ইয়োর পলিটিশ্যানস্‌, হেট্‌ ইয়োর বম্বার্ডিং স্লোগানস! তাই সুজাতা যখন মিটিঙে যেতে চায়, হব্‌নবিং করতে চায় রাজনীতি নিয়ে, তখন আমার মাথার ভেতরে আগুন ছুটে যায়।'

চা খেতে গিয়ে প্রবীর দেখল সেটা কখন ঠাণ্ডা জল হয়ে গেছে। এক চুমুকেই তার সবটা গিলে ফেলল সে। অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে স্বরাজকে। মনে হচ্ছে, পাগল হয়ে যাবে। কেমন ভয় ধরে গেল তার।

'চলো, স্বরাজদা, উঠি।'

'চলো।'

দুজনে রাস্তায় নামল। সামনের বাড়িতে পিয়ানো বাজছে তখনো, কোনো জনপ্রিয় ইংরিজি ছবির সুর। কিন্তু সুরটা ফুটতে পারছে না সম্পূর্ণ—চারদিকের কোলাহলে হারিয়ে যেতে চাইছে। কালটাই এই রকম। সব সুর এখন হারিয়ে যাচ্ছে ঘূর্ণির ভেতরে।

রাস্তায় হাওয়া। সারাদিনের গুমোটের পর উতরোল হয়ে এসেছে দক্ষিণ সাগরের উদারতা। একটা পানের দোকানে রেডিয়ো বাজছে। সন্ধ্যার খবর।

'দু'দল সমর্থকের সংঘর্ষের ফলে তিনজন প্রাণ হারিয়েছে, সাতজন আহত হয়েছে। প্রাপ্ত সংবাদে আরো জানা যায় যে, কয়েকটি বাড়িতেও অগ্নিসংযোগ করা হয়—'

একবারের জন্যে দাঁড়িয়ে পড়ল স্বরাজ : 'শুনলি ? এই হচ্ছে বামপন্থী ঐক্যের চেহারা। লীডারশিপ।' আবার ঠোঁটে বাঁকা বিদ্রূপের হাসি ফুটল : 'তুই এখনো খুব অপটিমিস্ট—তাই না ?'

চব্বিশ পরগণার কোন দূর গ্রাম থেকে আগুনের হল্‌কা এসে দক্ষিণ বাতাসের শীতলতাকে গ্রাস করল। প্রবীর চুপ করে রইল একটু।

'এর পরেও রাজনীতিতে উৎসাহ থাকে তোর ?'

'অনেক ভুলের মধ্য দিয়েই পথ তৈরি হয়।'

'কাঁপবুক আউড়ে কোনো লাভ নেই ভুলু, ইউ নো হোয়াট ইজ হোয়াট! এই পলিটিক্‌সে আমি সুজাতাকে যেতে দেব ? তার চেয়ে সে রোজ হিন্দী ফিল্ম দেখুক, আমি আপত্তি করব না।'

'কিন্তু স্বরাজদা, রাজনীতির ভেতর দিয়েই তোমরা একসঙ্গে মিলেছিলে !'

'আজ রাজনীতির মূর্খতা মিটিয়েই আমরা মিলে থাকতে চাই। কিন্তু দেয়ার ইজ দ্য বোন্‌ অব কনটেনশ্যন ! সুজাতা এখনো নেতাদের বিশ্বাস করে, তাদের বাণী তার কাছে বেদবাক্য। সে বলে আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি, আমি একটা টোটাল ফ্রাস্ট্রেশ্যন। অবস্থাটা কী জানিস ? আমরা যেন দুটো ধর্মের মানুষ, ঘোর কম্যুনাল, চব্বিশ ঘণ্টা এ ওর বিরুদ্ধে ছুরি শানাচ্ছি। এ চলতে পারে না, কিছুতেই চলতে পারে না ভুলু। চলে যাক সুজাতা, ওর নেতাদের বাণী শুনে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখুক, শরিকী বোমাবাজিতে খুন হয়ে যাক। আমার যথেষ্ট হয়েছে। আমি একা থাকব, সুখেই থাকব।'

'আর নীলু ?'

'এখন কাঁদবে। আর একটু বড় হলে মাকে ভুলে যাবে। অনেক ছেলেরই তো অল্পবয়সে মা হারিয়ে যায়।'

'তুমি কী বীভৎস ভাবে নিষ্ঠুর হয়ে গেছ স্বরাজদা !'

'নিষ্ঠুর হইনি—' নিষ্ঠুরভাবে স্বরাজ বললে, 'চলে গিয়ে ও-ও বেঁচেছে, আমিও বেঁচেছি। আর কিছুদিন এভাবে দুজনের মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধ চললে আমি পাগল হয়ে যেতুম।'

পাগল হতে আর বাকী কতখানি—প্রবীর ভাবল। সেই স্বরাজদা। ছাত্রনেতা। মিছিলের আগে আগে। বক্তৃতা দিচ্ছে এক হাতে মাইক চেপে ধরে, আর এক হাত মুঠো করে পাকিয়ে—সেই রুদ্ধ মুষ্টিতে বজ্রের শপথ।

'কমরেডস্, এই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা আমাদের করতে হবে। ভেঙে গুঁড়িয়ে দেব প্রতিক্রিয়ার ঘাঁটি, টেনে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে দেব প্রতিক্রিয়াশীলদের মুখোশগুলো। ধনতন্ত্র আর জঙ্গীবাদকে চিরকালের মতো কবর দেব মাটির তলায়। ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক ঐক্য জিন্দাবাদ। ইনকিলাব—'

'জিন্দাবাদ—' ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিট্যুট কাঁপিয়ে প্রলয়রোল।
'তুমি সুজাতা বৌদির কাছে যাবে না ?'
'না।'
'কিন্তু জ্যাঠামশাই, জেঠিমা—'
'বাবা সারাজীবন অনেক দুঃখ সয়েছেন, তাঁর আরো সইবে। মা বাবার জন্যে অনেক দুঃখ পেয়েছেন, এ ভারও তিনি বইতে পারবেন। ওসব ছেড়ে দে ভুলু।' স্বরাজ একটু হাসল : 'এর চাইতে দেশে এখনো ইংরেজ রাজত্ব থাকলে অনেক ভালো হত—না রে! আমরা সবাই মিলে গলা ছেড়ে অন্তত সেই সাধারণ শত্রুকে গাল দিতে পারতুম, নিজেদের মধ্যে এভাবে খেয়োখেয়ি হত না।'
প্রবীর নিঃশ্বাস ফেলল : 'জানি না।'
তার মন অন্য কথা ভাবছিল। সাবিত্রী আর সুজাতা বৌদি একই কলেজের ছাত্রী ছিল না একসময়? সাবিত্রী সায়েন্সে, সুজাতা আর্টসে। বোধ হয় বছরখানেকের সিনিয়র ছিল সুজাতা। একসঙ্গে কলেজে ইউনিয়নও করত। সাবিত্রী একটু আলগা ভাবে ছিল, তাই মোটামুটি ভালো রেজাল্ট করে কলেজে চাকরি নিলে, আর সুজাতা—একবার সাবিত্রীকে বলা যায় সুজাতার সঙ্গে যোগাযোগ করতে? বলা যায়?
হঠাৎ স্বরাজের গলা যেন অনেক দূর থেকে ভেসে এল তার কাছে।
'ওই সামনের বাসটা ধরতে হবে ভুলু। এখন আর কথা নয়—বাড়ি ফেরা দরকার।'
'তুমি যাও স্বরাজদা। আমার একটা কাজ আছে।'
'এখন আবার কী কাজ ?'
'আছে একটু। তুমি এগোও।'
স্বরাজ আর দাঁড়ালো না। বাস ধরবার জন্যে দৌড়ে এগিয়ে গেল।
সাবিত্রীকে বলা যাক। আজ—এই রাত্রেই। বাড়ি ফিরতে রাত এগারোটা হোক, ক্ষতি নেই। সে টুলু নয়—মা তার জন্যে ভাববেন না।
তার ভয়ংকর বিশ্রী লাগছে। সাবিত্রীর সঙ্গে একবার দেখা না হলে আজ রাত্রে তার ঘুম আসবে না।

॥ পনেরো ॥

শংকর মাছের ল্যাজের তৈরি চাবুকটা সাত-আট বছর আগে কেনা হয়েছিল পুরীতে। এতকাল ওটা দেওয়ালেই শোভা পাচ্ছিল, কোনোদিন কাজে লাগতে পারে এরকম চিন্তাই কারো মনে জাগেনি। আজ উমা সেইটেই খুলে নিলে দেওয়াল থেকে। রাগে টকটক করছে মুখের রঙ, চোখের কাঁপল তারা দুটো থেকে ছিটকে পড়ছে আগুন। দাঁতে দাঁতে কিশকিশ করে হাঁপানো গলায় বললে, 'এই চাবুক দিয়ে পিঠের চামড়া তুলে নেব তোর। আই 'ইল স্কিন ইয়ু অ্যালাইভ!'
আতঙ্কে সিঁটিয়ে গিয়ে দেওয়ালের দিকে সরে যাচ্ছিল টিনটিন। বললে, 'না।'
'খুন করে ফেলব তোকে নচ্ছার মেয়ে! ভেবেছো কী? বাইরে গিয়ে তুমি ড্রিংক করে—'

'বা রে, কোথায় ড্রিংক করেছি ? আমি তো একটু বীয়র ছাড়া—'

'একটু বীয়র ! কী বলা হয়েছিল তোমায় ? জাস্ট অকেজনালি এক-আধটু বীয়র খাওয়ার পারমিশ্যন দেওয়া হয়েছিল তোমায়, তার বদলে তুমি টিপ্‌সি হয়ে বাড়ি ফিরবে ? এইটুকু মেয়ে—এর মধ্যে এত বখে গেছ তুমি ? আজ তোকে খুন করে ফেলব !'

এবার দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল টিনটিন। মুখ ফ্যাকাশে, একটু একটু কাঁপছে ঠোঁট দুটো। বাঘিনীর মতো এগোচ্ছিল উমা, চাবুকটা উঠে এল এবার।

'না, আমাকে কক্ষনো মারতে পারো না তুমি, কক্ষনো না—' হঠাৎ তীব্র তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল টিনটিন।

আচম্‌কা চিৎকারে উমা থমকে দাঁড়ালো।

'কেন মারব না, শুনি ?'

'আমি তো গোড়াতে খেতে চাইনি—' টিনটিন অস্বাভাবিক জোর নিয়ে এল গলায় : 'তুমি আর বাপীই তো আমাকে ডিনারের পর পেগ দিয়েছ—বলেছ, এসব ম্যানার্স, সোসাইটিতে মিশতে গেলে এগুলো শিখতে হয়। এখন বুঝি সব দোষ আমার ?'

উমা দাঁড়িয়ে পড়ল। এবার ভয়ের ছায়া তারই মুখে।

ছেলেমানুষ হলেও টিনটিন বুঝতে পারছিল, মাম্মী একটু থমকেছে। তেমনি জোরের সঙ্গে বলে চলল, 'আমি তো খেতেই চাইনি, বিচ্ছিরি তেতো লাগত। তোমরাই তো শেখালে !'

উমা আবার জ্বলে উঠল : 'টেবল্‌-ম্যানার্স শেখাতে চেয়েছি, মাতাল হতে বলেছি সেই জন্যে ?' উমা নিজের ম্যানার্স ভুলে গিয়ে বাঙালী-মতে চিৎকার ছাড়ল একটা : 'হারামজাদা, বজ্জাত মেয়ে কোথাকার !'

'মাম্মী, ইয়ু আর সো ভাল্‌গার !' টিনটিনের মুখে ঘৃণার চিহ্ন দেখা দিল।

'ভাল্‌গার ?' পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে গিয়ে উমা গর্জন করল : 'ইয়ার্কি দেওয়া হচ্ছে আবার ? আমি যদি আজ তোকে খুনই না করে ফেলি—'

'না।' আবার টিনটিনের সেই অস্বাভাবিক জোরালো প্রতিবাদ : 'আমাকে তুমি মারতে পারবে না। আমাদের কিটেন ক্লাবে বীয়র ছাড়া আর কিছু দেয় না। সবাই-ই তো তাই খায়।'

'তা খায়। তুই কতটা খাস ? ক' বোতল ?'

'বেশি তো খাই না।'

'বেশি না খেলে নেশা হয় ? এর মধ্যেই মাতাল হতে শিখেছ—গোল্লায় যাচ্ছ ? আমি ভেবেছিলুম, তোকে আমি একটা আইডিয়াল মডার্ন গার্ল করে তুলব, আর তুই—'

শাঁৎ করে চাবুকের একটা জোরালো ঘা পড়ল টিনটিনের কাঁধের ওপর।

যন্ত্রণায় শিউরে উঠল টিনটিন, চোখ-মুখ বিকৃত হয়ে উঠল।

'আমাকে মারলে তুমি—চাবুক মারলে আমায় ? তুমি বীস্ট্—তুমি বীস্ট্ ! নিজের বেলায় মনে থাকে না ? পার্টিতে গিয়ে তুমি মাতাল হও না ? বাপী এক-একদিন বাইরে ডিনারের পর ক্রল করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসে না ? যত দোষ আমার বেলায় !'

উমা থরথর করে কাঁপতে লাগল। হাত থেকে খসে পড়ল চাবুকটা।

'আমরা বড়রা যা করব, তুইও তাই করবি ?'

'কেন করব না ? তোমরাই তো শিখিয়েছ !'

টলতে টলতে সরে এল উমা, ধপ করে বসে পড়ল সোফার ওপর। যেন পায়ের তলা থেকে মেঝেটা কেউ টেনে সরিয়ে নিয়েছে তার। ধরা গলায় বললে, 'শেষে তুই এত বড় কথা বলতে পারলি টিনটিন ? এত করে তোকে ট্রেনিং দেবার চেণ্টা করলুম, আর তুই এইরকম বেয়াড়া আর নচ্ছার হয়ে গেলি ? আয়্যাম রুইণ্ড—আয়্যাম ক্রাশ্‌ড—আমি সুইসাইড করব !'

দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল উমা। চাবুকের ঘায়ে তখনো গলার কাছটা জ্বালা করছিল টিনটিনের, কিন্তু মাকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হতে দেখে জয়ের আনন্দের সঙ্গে এইবার একটু সহানুভূতিও বোধ হল তার।

আস্তে আস্তে সরে এল উমার কাছে।

'ও মাম্মী, ডোণ্ট ব্রেক ইয়োর হার্ট ! আচ্ছা, মাই ওয়র্ড অব অনার—এর পর থেকে আমি খুব কম করে খাব। জাস্ট্ লাইক এ গুড্ গ্যার্ল। প্লীজ মাম্মী, অমন করে কেঁদো না—আমার মনে ভারী কণ্ট হচ্ছে।'

পাকামো করে পিঠচাপড়ে দেবার জন্যেই বোধ হয় হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, উমা একটা ঝট্‌কা মারল তার হাতে। আবার সেই ভাল্‌গার 'বাঙালী' গালাগাল দিয়ে বললে, 'দূর হয়ে যা হারামজাদী—দূর হয়ে যা সামনে থেকে ! তোর আর মুখ দেখব না আমি। আসুক তোর বাপী—আর তোকে কলকাতায় রাখব না, হাজারীবাগের সেই স্কুলটায় ভর্তি করে দেব, মাদাররা কম্পাউণ্ডের বাইরেও বেরুতে দেবে না। চলে যা আমার সামনে থেকে—চলে যা বলছি ! ও আয়্যাম রুইণ্ড—আয়্যাম ক্রাশড্ !'

টিনটিন শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক সেকেণ্ড। হাজারীবাগের সেই স্কুল। এর আগে মাম্মী আর বাপী মধ্যে মধ্যে এক-আধবার ঠাট্টা করেছে স্কুলটাকে নিয়ে। সে তো স্রেফ জেলখানা। সেখানে গিয়ে থাকতে হবে কলকাতা ছেড়ে, কিটেন ক্লাব ছেড়ে, ডনকে ছেড়ে ! ওয়েল ওয়েল, তা হলে মাম্মীর আগে তাকেই সুইসাইড করতে হবে !

'দাঁড়িয়ে রইলি কেন—দূর হ বলছি ! তোকে হাজারীবাগে পাঠিয়ে তবে আমি আমি নিশ্চিন্ত হব !'

'আমি যাব না হাজারীবাগে।'

উমা সোফা থেকে লাফিয়ে উঠল, ব্যাপার বুঝে টিনটিন ছুটে পালিয়ে গেল পাশের ঘরে। উমা খুব সম্ভব আবার চাবুকটা কুড়িয়ে নিত, ঠিক এই সময় ডোর-বেলটা বেজে উঠল।

মণীশ। উমা সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হল বিস্ফোরণের জন্যে। আজ স্বামীর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হয়ে যাবে তার। সে-ই অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিয়েছে মেয়েকে। এখন দেখুক, একফোঁটা মেয়ে কিভাবে বখে যাচ্ছে, উদ্ধত হয়ে উঠছে, মুখের ওপর তুরুক্ জবাব দিয়ে বলছে, 'তোমরাই তো শিখিয়েছ আমাকে !' মনে মনে গাছকোমর বাঁধল উমা—একেবারে বাঘিনীর মতো।

আবার ডোর-বেলের আওয়াজ। কিন্তু—মণীশ ! কই, গাড়ির শব্দ তো পাওয়া গেল না ?

বাইরে থেকে বেয়ারা ডাকল : 'মেমসাহেব ?'

চোখ মুছে স্বাভাবিক ভাবে উমা বলতে চেষ্টা করল : 'কে এসেছে ?'

'ছোট মামা।'

তার মানে টুলু। উমা বললে, 'একটু বসতে বল্—আমি আসছি।'

সঙ্গে সঙ্গেই টুলুর সামনে যাওয়া যায় না এখন। এতক্ষণ রাগারাগি আর কান্নাকাটি করে নিশ্চয় মুখ-চোখের চেহারাটা ভারী বিশ্রী হয়ে আছে।

'বসতে বল্ ছোট মামাকে, আমি আসছি।'

খবর সামান্যই দেবার ছিল। অফিস থেকে বেরুবার মুখে মণীশদার সঙ্গে দেখা। গাড়ি করে বেরুচ্ছিল। বললে, 'ভালোই হল টুলু—বাড়ির টেলিফোন লাইনটা খারাপ, অনেক চেষ্টা করেও কানেকশ্যন পাচ্ছি না। তুই একটা খবর দিবি ? জরুরী একটা ট্রানজ্যাকশ্যনের কাজে আমাকে এক্ষুনি যেতে হচ্ছে দমদমে। ফিরতে রাত হবে। যাওয়ার পথে তোর দিদিকে একবার বলে যাস।'

বলবার ছিল এইটুকুই। কিন্তু আজ আর দিদি বসতে বলল না তেমন করে। কি রকম গম্ভীর আর অন্যমনস্ক হয়ে আছে। একবার কেবল আলতো ভাবে জিজ্ঞেস করল, 'চা খাবি একটু ?'

'থাক এখন। বাড়ি ফিরতে হবে।'

'আচ্ছা।'

টুলু পথে বেরিয়ে এল। রাস্তায় হাওয়া। গাছের পাতার শব্দ। ওপাশ দিয়ে ওরা সব জোড় বেঁধে ঢুকছে লেকের দিকে। সাদার্ন অ্যাভিন্যুর এদিকটায় বড় বড় বাড়ি আর ছায়ার শান্তি। দু-চারজন লোকের চলাফেরা। কেবল কালীবাড়িটার সামনে বিরাট ভিড়। দল বেঁধে মেয়ে-পুরুষেরা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে। কোনো এক সিদ্ধপুরুষ নাকি ভুত-ভবিষ্যৎ বলে দেন ওখানে।

সেও যাবে নাকি একবার ? নিজের ভাগ্যটা গণিয়ে আসবে ?

দূর, বাজে কথা ওসব। কোনো মানে হয় না। টুলুর মন ছটফট করে উঠল একবার। কিছুই হচ্ছে না, কিছুই করা যাচ্ছে না। কোচিং ক্লাসে ভর্তি হওয়া কবে যে হবে ? অ্যাটর্নি অফিস থেকে বেরিয়ে আসবার সময় মেরুদণ্ডটা যেন ভেঙে যেতে চায়। দাদাই ঠিক বলেছিল, তাড়াতাড়ি করে কিছুই—কিন্তু বুড়ো হেড ক্লার্কটাকে কিছুতেই সহ্য করা যাচ্ছে না। এক-একদিন মেরে বসতে ইচ্ছে হয় বুড়োকে।

লেকের দিক থেকে হাওয়া, ছায়া, পাতার শব্দ, মধ্যে মধ্যে মাথার ওপরে ঝরে-পড়া ফুলের পাপড়ি—এরই ভেতরে ক্লান্ত শরীর ডুবিয়ে হেঁটে চলছিল প্রতুল। আরো একটা চাপা অস্বস্তি—সন্ধ্যার পরে এই দিকটা দিয়ে হাঁটতে গেলেই চাড়া দিয়ে ওঠে সেটা। মাণিক বলছিল, ফণী আর কার্তিক—

মিথ্যে—সব মিথ্যে। গৌরবাবু দারোগার কাছে কারো নামে একটা কথাও বলেনি সে। বোমার খোঁজ কোথা থেকে পেয়েছে পুলিসই জানে। ওদের আর কী, মাথামোটা ইডিয়ট সব—যে হোক কাউকে সন্দেহ করতে পারলেই হল। টুলুর মাথার ভেতরটা জ্বালা করে উঠল। শয়তানের সঙ্গই এইরকম—একবার তার জালে জড়িয়ে

গেলে তার হাত থেকে বুঝি আর নিস্তার মেলে না।

একটি ছোটখাটো চেহারার মেয়ে তার আগে আগে হেঁটে যাচ্ছিল, ছাড়া ছাড়া আলোছায়ায় প্রতুল লক্ষ্য করেনি তাকে। সে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে মেয়েটি দাঁড়িয়ে পড়ল, একবার দ্বিধা করল, একবার ভাবল থাক, তারপর ছোট্ট করে ডাকল: 'টুলুদা!'

তৎক্ষণাৎ থেমে গেল প্রতুল। পা দুটো আড়ষ্ট হয়ে গেল।

স্বপ্না পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে।

'টুলুদা, চিনতে পারছ না?'

ফণী নয়, কার্তিক নয়, ছোরা হাতে কোন বিভীষিকা নয়—তার চাইতেও বড় আতঙ্ক। এই মেয়েটির সঙ্গে দেখা না হলেই সব চেয়ে সুখী হত সে।

সহজ স্বাভাবিক গলায় স্বপ্না বললে, 'কী, কথা বলবে না নাকি?'

এতক্ষণে জোর করে হাসতে চেষ্টা করল প্রতুল।

'মানে, অন্ধকারে ঠিক চিনতে পারিনি।'

'কিংবা চিনতে চাও না!'

'না না—মানে আমি—'

'কৈফিয়ৎ দেবার দরকার নেই—' স্বপ্না বিষণ্ণভাবে হাসল: 'তুমি তো ভুলে যেতেই চাও। আমিই পেছন থেকে ডেকে তোমাকে বিরক্ত করলাম।'

'স্বপ্না, তুমি জানো না—' অস্পষ্টভাবে প্রতুল বলবার চেষ্টা করল, 'মানে, তোমার কাছে আমার মুখ দেখাতে লজ্জা করে। একদিন তুমি আমার জন্যে—অথচ আমি—'

'কেন বিব্রত হচ্ছ টুলুদা?' স্বপ্না স্নিগ্ধ গলায় বললে, 'তোমায় কিছু বলতে হবে না। এখন অফিস থেকে বাড়ি ফিরছ, না? খুব ক্লান্ত।'

'আমি অফিসে চাকরি করছি, তুমি জানো?' হঠাৎ যেন পায়ের তলায় মাটি পেলো প্রতুল। আত্মবিশ্বাস নিয়ে দাঁড়াবার মতো একটু জায়গা। তাহলে স্বপ্নাও জানে যে সে এখন বদলে যাচ্ছে—সে আর অপদার্থ একটা মস্তান নয়!

স্বপ্না বললে, 'শুনেছি। সেদিন বাবা এসেছিলেন তোমাদের বাড়িতে, তিনিই বললেন ফিরে গিয়ে।'

'আমি সেদিন জ্যাঠামশাইয়ের সামনে যেতে পারিনি। সাহস হয়নি আমার।'

'বাবাকে তুমি ঠিক বুঝতে পারোনি। বাবা যে কতখানি ক্ষমা করতে পারেন, তা তুমি জানো না—' কথা বলতে বলতে দুজনে এগিয়ে যাচ্ছিল: 'একদিন এসো আমাদের বাড়িতে।'

'না, সে আমি পারব না।'

'কোন ভাবনা নেই তোমার—' হঠাৎ স্বপ্না টুলুর হাত চেপে ধরল: 'কাউকে ভয় করতে হবে না।'

স্বপ্নার হাতের ছোঁয়ায় টুলু শিউরে উঠল। একটা কিছু বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় সামনে এসে দাঁড়ালো ওরা জনচারেক। কার্তিক সকলের আগে।

টুলুর দিকে তাকিয়ে সাপের মতো একটা তীক্ষ্ণ শব্দ করে বললে, 'এই যে শালা! আজ ক'দিন ধরে তোকেই তো খুঁজে বেড়াচ্ছি!'

॥ ষোলো ॥

নিদারুণভাবে চমকে উঠে তিন পা পিছিয়ে গেল স্বপ্না। টুলুর মুখ শুকিয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

'অ্যাই কার্তিক, কী হচ্ছে? জামা ছাড় বলছি!'

'জামা ছাড়ব মক্কেল এমনিতেই! খুব ভদ্দরলোক হয়ে গেছিস, না রে শালা?'

জামা ছাড়ানোর নিষ্ফল চেষ্টা করে টুলু বুঝল, লাভ হবে না, জামাটাই ছিঁড়বে মাঝখানে থেকে। স্বপ্না সঙ্গে থেকে সমস্ত ব্যাপারটা দেখতে পাচ্ছে—এই কথা ভেবে লজ্জায় দুঃখে তার চোখে জল আসছিল। নিজে খুব দুর্বল সে নয়, অন্য সময় হলে এখন সোজা একটা ঘুঁষি বসিয়ে দিত কার্তিকের মুখে। কিন্তু স্বপ্না—তা ছাড়া দলে ওরা জনচারেক, আর মানিক বলছিল—

ঠাণ্ডা একটা ভয় শিরশিরিয়ে ছড়িয়ে গেল বুকের ভেতরে। সব ব্যাপারটাকে বেশ হাল্কা একটা রূপ দেবার চেষ্টা করল সে, 'স্বপ্না, ইয়ে—কিছু মনে কোরো না, মানে এরা আমার পুরোনো বন্ধু, মাঝে মাঝে এক-আধটু ঠাট্টাফাট্টা করে। এ হল কার্তিক—এরা—'

কথাটা শেষ করতে পারল না টুলু, তার আগেই বানরের মতো দাঁত খিঁচিয়ে উঠল কার্তিক।

'ঠাট্টা? ব্যাটা কুত্তার ছা—ব্যাটা হারামী! নিজের জান বাঁচাবার জন্যে দারোগার কাছে ফণেকে ফাঁসিয়ে এসেছিস, নইলে পুলিস মালের খোঁজ পায় কী করে? আজ শালা এইখানে তোর লাশ ফেলে না যাই তো আমার নাম কার্তিক সমাদ্দারই নয়।'

দলের বাকি তিনজন সঙ্গে সঙ্গে তিন দিক থেকে একটা ব্যূহের মতো তৈরি করে ফেলল। কার্তিকের একটা হাত ঢুকে গেল পকেটের ভেতর. সেখানে বড় একটা আলুর গায়ে সেফ্‌টি রেজরের একটি ব্লেড্‌ গাঁথা। বেশি কিছু করবার দরকার নেই, বার-কয়েক আলতোভাবে মুখের ওপর আলুটা বুলিয়ে নিলেই চমৎকারভাবে বদন বিগড়ে যাবে।

কিন্তু হাতটা পকেট থেকে বেরুবার আগেই সবাইকে হকচকিয়ে দিয়ে টুলু আর কার্তিকের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে গেল স্বপ্না। কোমল গলায় ডাকল: 'কার্তিকদা, আমার একটা কথা শুনুন আগে!'

খরখরে গলায় হেসে উঠল দলের একটা ছেলে।

'লে মাইরি! এ শালার ময়না যে আবার দাদা বুলি ছাড়ছে রে!'

কার্তিকের হাতটা কিন্তু শক্ত হয়ে গিয়েছিল পকেটের মধ্যে। হঠাৎ চড়াগলায় একটা ধমক দিয়ে উঠল কার্তিক।

'চুপ কর্, উল্লুক। ভদ্দরলোকের মেয়েছেলেকে কথা কইতে দে।'

দলের তিনটে ছেলের চোখ গোল হয়ে উঠল। এরকম তো কথা ছিল না। দু' মিনিটের মধ্যে মামলা মিটিয়ে দিয়ে সট্‌কে পড়বার কথা বলেছিল কার্তিক। হঠাৎ ভদ্দরলোকের মেয়েছেলেকে কথা কইতে দেবার সুবুদ্ধি তার কোথা থেকে গজিয়ে

উঠল! একজনের লুব্ধ দৃষ্টি স্বপ্নাকে লেহন করছিল, কার্তিকের কাজ শুরু হয়ে গেলে সে নিজেও একটুখানি মতলব হাসিল করে নিত। কিন্তু এ যে একেবারে আলাদা ঠেকছে।

স্বপ্না বললে, 'কার্তিকদা, বোনের মতো একটা অনুরোধ করছি। টুলুদা কী অন্যায় করেছে জানি না, কিন্তু আজ ওকে ছেড়ে দিন। আমার শরীর ভালো নেই, অনেক দূরে থাকি। টুলুদা সঙ্গে করে আমাকে পেঁছে দিতে যাচ্ছে।'

আশাভঙ্গে মরীয়া ছেলেটা বলে ফেলল: 'মাইরি আর কী! বললেই ছেড়ে দিতে হবে? আজ এই শুয়োরকে আচ্ছামতন ধোলাই দিয়ে তবে অন্য কথা। বাড়ি পেঁছে দেবার জন্যে ভাবতে হবে না, আদর করে—'

চাউনি আর গলার আওয়াজে স্বপ্না শিউরে উঠল এবং তৎক্ষণাৎ ঠাস করে একটা প্রকাণ্ড চড়ের আওয়াজ। মাথা ঘুরে উলটে পড়তে গিয়ে সামলে নিলে ছেলেটা।

কার্তিক গর্জন করে উঠল: 'চোপরাও কুত্তার বাচ্চা! ইয়ার্কির জায়গা পাওনি আর? ফের যদি একটু বদিয়তী করেছিস শ্লা, তাহলে একদম জবাই করে লেকের জলে ভাসিয়ে দেব!'

চড়-খাওয়া ছেলেটার দু চোখ অক্ষম ক্রোধে জ্বলতে লাগল, হিংসার নীলচে আলো মিটমিট করতে লাগল সেখানে। বাকী ছেলে দুটো যেন স্বপ্ন দেখছে, দাঁড়িয়ে রইল এমনিভাবে। টুলু একটা কাঠের পুতুলের মতো নিঃসাড় হয়ে কার্তিকের দিকে চেয়ে রইল, আর স্বপ্নার ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল থরথর করে।

'কিছু মনে করবেন না দিদি, ও শ্লা ছোটলোক, ওর পেটে এক ডজন বোম ঝারলেও একটা ভাল কথা বেরুবে না। আচ্ছা চলে যান আপনারা—আপনার জন্যেই হারামীর বাচ্চা এই টুলুটাকে আজ ছেড়ে দিলুম, কিন্তু ফয়সালা বাকী রয়ে গেল!' বলে একটা ঘাড়ধাক্কা দিয়ে টুলুকে হাতিতিনেক এগিয়ে দিলে: 'যা শ্লা, খুব বেঁচে গেলি আজকে।'

'বড় উপকার করলেন কার্তিকদা।' আবার নরম গলায় স্বপ্না বললে, 'আচ্ছা আসি তা হলে। নমস্কার।'

'অ্যা? হ্যাঁ হ্যাঁ—ন্-নমস্কার!'

'চলো টুলুদা।'

ভূতে পাওয়ার মতো টুলু স্বপ্নার সঙ্গে পা বাড়ালো, আর ওখানে দুজন হাঁ করে দেখতে লাগল কার্তিককে, যেন তারা তাকে চিনতে পারছে না। একটু তফাতে দাঁড়িয়ে থাকল মার-খাওয়া ছেলেটা, চড়ের জ্বালায় গাল চিনচিন করছে এখনো, চোখে ঝিকঝিক করছে নীল হিংসা।

নীরবতা ভাঙল একজনের কথায়।

'এটা কী হল কার্তিকদা?'

আবার বোকার মতো হাসল কার্তিক।

'কিরকম করে কার্তিকদা বলে ডাকল রে মেয়েটা—সব গোলমাল হয়ে গেল! নিজেকে বেজায় ছোটলোক বলে মনে হল তখন। ভাবলুম, বলছে যখন ভদ্দরলোকের মেয়ে—'

মার-খাওয়া ছেলেটা অশ্লীল গাল দিয়ে উঠল একটা।

'টুলো শালার সঙ্গে আবার ভদ্দরলোকের মেয়ে! কোত্থেকে—'

লাফিয়ে উঠে কার্তিক তেড়ে গেল তার দিকে।

'আর একটা বদজোবান করবি তো তোকে এইখানেই সাবাড় করব আজকে!'

ছোকরা পাশের একটা রাস্তা দিয়ে জোরপায়ে দৌড় দিল। যেতে যেতে বলে গেল, 'আচ্ছা শালা, দেখে নেব তোকে।'

আবার তিনজনের বিমর্ষ সমাবেশ। সব অন্যরকম হয়ে গেল। ক'দিন তক্কে-তক্কে ঘুরে টুলুটাকে আজ পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু কোথা থেকে কী যে হয়ে যায় কেউ জানে না।

কার্তিক একবার সঙ্গীদের দিকে তাকালো। অপ্রতিভ ভঙ্গিতে বললে, 'কেমন যেন বোকা বানিয়ে দিয়ে গেল, না রে!'

সঙ্গীরা চুপ।

'মাইরি বোন-ফোন তো নেই—তা ছাড়া ছেলেবেলা থেকে চাদ্দিকে যাদের দেখেছি, সব খেলোয়াড় মেয়ে। কিরকম গলায় যে কার্তিকদা বলে ডাকল, শুনে মেজাজই খারাপ হয়ে গেল। তবে টুলো শালা আর যাবে কোথায়—এক মাঘে তো শীত যায় না, ইঁদুরের গর্তে লুকিয়ে থাকলেও টেনে বের করব।'

একজন গম্ভীর গলায় বললে, 'তবে হীরুটাকে না মারলেও পারতিস! ও আবার কথায় কথায় চাকু চালায়।'

'যা—যা। ওসব ছুঁচো-চামচিকেকে কার্তিক সমাদ্দার পরোয়া করে না। এখন একটা সিগ্রেট দে—কিচ্ছু ভালো লাগছে না মাইরি।'

প্রবীর বলেছিল, 'তোমাকেই একটু চেষ্টা করতে হবে।'

সাবিত্রী জবাব দিয়েছিল, 'চেষ্টা করতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু তুমি সঙ্গে গেলে ভালো হয়।'

'উল্টো ফলও হতে পারে। আমি তো অন্য পার্টির লোক। সুজাতা বৌদি হয়তো ভাববে যে, স্বরাজদার কুপরামর্শে আমি ওর বিপ্লবের কাজ পণ্ড করতে এসেছি!'

'সে তো আমার সম্বন্ধেও ভাবতে পারে।'

'ভাববে কেন? তোমরা তো একসঙ্গে কলেজে ইউনিয়ন করতে!'

'করেছি। কিন্তু সুজাতা আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করত না। বলত, আসলে আমার মন অ্যাকাডেমিক ক্যারিয়ারের দিকে, আমি পুরো স্যাক্রিফাইস করতে পারি না। ওদের মতো ভোক্যাল হওয়া আমার পক্ষে সব সময় সম্ভব হত না, প্রিন্সিপ্যালের ঘরের সামনে অ্যাংরি ডেমোনস্ট্রেশনে একটু অস্বস্তি বোধ করতুম।'

'বুঝেছি।'

'তা ছাড়া কী জানো—' সাবিত্রীর মুখে একটা ছায়া পড়েছিল: 'ওদের সঙ্গে একটা জায়গায় আমার সম্পূর্ণ মত মিলত না। আমি বলতুম পার্টি পলিটিক্স্ প্রত্যেকের আলাদা ভাবে থাকে থাকুক, কিন্তু স্টুডেন্টস ফ্রন্টে আমাদের কতগুলো সাধারণ স্বার্থ—কমন প্রবলেম নিয়ে এগোতে হবে। সেখানে পার্টির চাইতেও বড় দরকার ইউনিটি। প্রত্যেকে যদি নিজের দলের প্রোগ্রামকে স্টুডেন্টস্ ফ্রন্টে টেনে আনতে চায়, তা হলে

ছাত্র-আন্দোলন নষ্ট হয়ে যাবে—জোর পাবে রি-অ্যাকশনারীরা। সেইখানেই ওদের আপত্তি। পার্টি-লীডারশিপের ডিকটেশন ছাড়া ওরা পা ফেলবে না।'

প্রবীরের ভুরু কুঁচকে এসেছিল। সেই পার্টি! যুক্তফ্রন্ট সরকার শ্বাস টানছে, ছাত্র-ঐক্য টুকরো টুকরো। কৃষক সংগঠন তো গেছেই, ট্রেড ইউনিয়নও হয়তো যাবে। চমৎকার!

প্রবীর বলেছিল, 'তুমি তো এখন পুরোপুরি কলেজের দিদিমণি! রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক নেই!'

'তা বলতে পারো। সম্পর্ক রাখবার সময় কোথায়। এত কাজ। তার ওপর থিসিসটাতেও হাত দিয়েছি।'

'এবার ডক্টরেটও হবে তা হলে! এমনিতেই তো কত দূরে ছাড়িয়ে গেছ, এরপরে একেবারে দূর আকাশের নক্ষত্রের মতো—'

সাবিত্রী এবার দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছিল প্রবীরের গলা: 'খুব হয়েছে, আর চালাকি করতে হবে না।'

'ছি ছি, এমন ভালো ছাত্রী, অধ্যাপিকা, ভাবী ডক্টর—শেষকালে একজন বি এ.-ফেল কেরানীকে—'

অমোঘ উপায়ে সাবিত্রী তার মুখ বন্ধ করে দিয়েছিল। কতকাল পরে—এই সময়, এই যন্ত্রণার কালে জীবনের এইসব সুর—এইসব মুহূর্তগুলোকে কীভাবে যে নির্বাসন দিতে হয়!

একটু পরে সাবিত্রী বলেছিল, 'তাহলে আমি গেলেই ভালো হবে বলছ!'

'আমার তাই মনে হয়। একালে কারো দলে না থাকলে সে বরং সহনীয়, এমন কি ঝানু দক্ষিণপন্থীও অসহ্য নয়, কিন্তু এক লালকে দেখলেই আর এক লালের মাথায় আগুন ছোটে। তুমিই যাও।'

'কিন্তু রবিবারের আগে তো সময় পাব না।'

'রবিবারেই যেয়ো।'

রবিবারেই এসেছে সাবিত্রী। এ বাড়ি তার অচেনা নয়—কলেজে পড়বার সময় এসেছে কয়েকবার, সুজাতার সঙ্গে বিয়ের পরেও। আর এই বাড়িতেই প্রবীরের সঙ্গে তার প্রথম দেখা—স্বরাজদার বন্ধু হিসেবে।

কতদিন আগে? আট-ন বছর নিশ্চয়। নীলু তখন আসছে। প্রবীর বি. এ. পড়ছে, সে বি. এস-সি.। তার বছর-তিনেকের সিনিয়র সুজাতা। দুবার বি. এ-তে ড্রপ করে স্বরাজের সঙ্গে বিপ্লবী জীবনের জোড় মিলিয়েছে।

হ্যাঁ, অন্তত আট বছর—কিছু বেশিই হবে। এর মধ্যে কত বদলে গেছে জায়গাটা। মানুষ বেড়েছে, বাড়ি বেড়েছে, দোকানপাট বেড়েছে—এত রিক্সা, এত বাসও বুঝি তখন ছিল না। কিন্তু বিশেষ বদলায়নি এই বাড়িটাই। সামনের একটুখানি ঘাসের জমিতে সেই রঙ্গন গাছটা, একদিকে নালার ধার ঘেঁষে তেমনি বুনো ওলের জঙ্গল।

সুজাতা বিকেলে গা ধুতে গিয়েছিল, তার মা এসে আদর করে বসালেন।

'তোমার মেসোমশাই কলে বেরিয়েছেন, ছেলেমেয়ে দুটো ব্যারাকপুরে গেছে তাদের

পিসির কাছে বেড়াতে। বাড়িতে আমি আর মনুই আছি। বোসো—মনু এক্ষুনি আসবে।'

মনু সুজাতার ডাকনাম।

ভেতরের একটি ঘরে গিয়ে বসেছিল সাবিত্রী। ঘরটা চেনা। কুমারী জীবনে এই ঘরেই থাকত সুজাতা, সেলফে এখনো বোধ হয় তারই বইপত্র। দেওয়ালে লেনিন-স্তালিন-মার্কসের ছবি। রবীন্দ্রনাথও আছেন। একদিকে একটা ভাঙামতন আলমারীর মাথায় একগাদা পুরনো কাগজপত্র বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে, না দেখেও বুঝতে পারা যায় ওগুলো রাজনৈতিক পত্রিকা আর বুকলেট। বোধ হয় ফিরে এসে এই ঘরেই আবার জায়গা নিয়েছে সুজাতা। এদের মধ্যে বসে আবার পুরনো দিনগুলোকে অনুভব করতে চায় সে।

বাইরে দিনের আলো বিষণ্ণ হয়ে আসছিল। গাছপালার ছায়া লম্বা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে বাড়িটার ওপর। পাখিদের ক্লান্ত ডাক। একটা উত্তপ্ত বেলা কেটে গেছে, এখন বেলাশেষের হাওয়ায় ঝোপ-জঙ্গল-মাটির সেই সোঁদা গন্ধ।

বেড-কভার-ঢাকা বিছানাটার ওপর চুপ করে বসে রইল সাবিত্রী, সুজাতার মা বসেছেন সামনে একটা মোড়া টেনে। সাবিত্রী দেখল, বিকেলের বিমর্ষতায় মাসিমার মুখের ওপরেও ছায়া নেমেছে।

মাসীমা বললেন, 'কী করছ এখন ?'

'একটা কলেজে পড়াই।'

'হ্যাঁ, শুনেছি বটে। বিয়ে করবে না ?'

একবার একটু রাঙা হল সাবিত্রীর মুখ।

'এখনো ও নিয়ে ভাবিনি মাসীমা।'

ডাক্তারের স্ত্রী, ম্যাট্রিক পাস করা মাসীমার কপালে কয়েকটা রেখা পড়ল।

'কী জানি, হয়তো বিয়ে না করাই ভালো। তোমাদের আজকাল ছেলেমেয়েদের আমরা চিনতে পারি না।'

সাবিত্রী মাসীমার দিকে তাকালো। কথাটার অর্থ সে বুঝেছে। দশ বছর স্বরাজের সঙ্গে ঘর করবার পরে, নীলুকে ফেলে কত সহজে চলে আসতে পেরেছে সুজাতা ! চল্লিশ-বেয়াল্লিশ বছর আগে যে মাসীমা ম্যাট্রিক পাস করে বিদুষীর মহিমা পেয়েছিলেন, তাঁর পক্ষে সুজাতাদের মনের চেহারা আঁচ করা শক্ত। সুজাতার বছর ছয়েকের বড় বোন সুলতা—সেও গ্র্যাজুয়েট—সে তো বিয়েই করল না, চাকরি করছে মুর্শিদাবাদের কোন স্কুলে। না, একালের মন তিনি বুঝতে পারবেন না।

মাসীমা ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেললেন।

'মনু চলে এসেছে, জানো বোধ হয় !'

মাথা নামিয়ে সাবিত্রী বললে, 'জানি।'

'কিছু বুঝতে পারছি না। কী নিয়ে এরকম হল ! আমি স্বরাজকে চিঠি লিখতে চেয়েছিলাম, তাতে বললে, তুমি যদি ওদের চিঠি দাও তাহলে এক্ষুনি আমি এ বাড়ি ছেড়ে চিরকালের মতো বেরিয়ে যাব, আর কোনদিন আমার খোঁজও পাবে না। জানো তুমি, কী হয়েছে ?'

সাবিত্রী দ্বিধা করল। প্রবীরের মুখে যেটুকু শুনেছে, তা কি বলা যায়? বলা উচিত—স্বরাজদা আর কোনো রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না, আর সুজাতা রাজনীতি বাদ দিয়ে জীবনটাকে ভাবতে পারছে না? ওদের বিয়ের আসল মন্ত্রটাই ব্যর্থ হতে চলেছে?

আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়ল সাবিত্রী। না, সে কিছুই জানে না।

'ওর বাবা তো রাতদিন তার ডাক্তারী নিয়ে আছে। বলে, কিছু না, একটু ঝগড়া-ঝাঁটি হয়েছে, দু'দিন পরেই সব মিটে যাবে। এরকম হয়।'

'আমারও তাই মনে হয় মাসীমা।'

মাসীমা একটু চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন, 'কিন্তু আমার ভালো লাগছে না। তাহলে নীলুকে সঙ্গে করে আনল না কেন? কোনোদিন তো তাকে ফেলে আসে না? তা ছাড়া—'

নিঃশব্দ কৌতূহলে চেয়ে রইল সাবিত্রী।

'জানো—' মাসীমা শিউরে উঠলেন: 'জানো, ওর সিঁথিতে এবার সিঁদুর নেই?'

শিউরে উঠল সাবিত্রীও, অনেকদূর পর্যন্ত শিকড় ছড়িয়েছে তাহলে! জোর করে হাসল একটু।

'ওরা ওসব মানে না মাসীমা।'

'জানি। কিন্তু বিয়ের পর থেকে বরাবর তো ও সিঁদুর পরত। আমার ভারী খারাপ লাগছে সাবিত্রী। ঠিক কথা, স্বরাজের সঙ্গে ওর বিয়েতে আমাদের মত ছিল না—মেয়েটা দুরন্ত, ছেলেও জেলখাটা। কিন্তু বিয়ের পরে স্বরাজের দায়িত্ব এসে গিয়েছিল, চাকরি-বাকরি করত, দেখেছি অপাত্র নয়। আর বেয়াইমশাই তো শিবতুল্য লোক। কেন যে এতদিন পরে—'

মাসীমা থেমে গেলেন। ঘরের বাইরে পায়ের শব্দ।

ডাকলেন, 'মনু!'

'আইত্যাছি মা কাপড় ছাইড়্যা।'

মাসীমা স্বর নামালেন: 'সেই অসুখের পর থেকে মেয়েটার শরীর বলে আর কিছু নেই। কিন্তু এখানে এসে আবার সেই পাগলামি আরম্ভ করেছে। পার্টি অফিসে যায়, আবার সব দলের ছেলেমেয়েরা আসে, তর্ক করে, চেঁচামেচি করে। অথচ আমরা ভেবেছিলুম, ওসব ও ছেড়ে দিয়েছে।'

এতদিনের নিষ্ক্রিয়তার প্রায়শ্চিত্ত তাহলে দ্বিগুণভাবে শুরু করে দিয়েছে সুজাতা!

'ওর বাবা বলছিল, শরীরে একেবারে হিমোগ্লোবিন নেই, যত্ন দরকার, বিশ্রাম দরকার। সে বিশ্রামের এই নমুনা? এ যে কী পাগলামি ওর আরম্ভ হয়েছে—'

এবার পায়ের শব্দ ঘরের দরজায়। তৎক্ষণাৎ থেমে গেলেন সুজাতার মা। তারপর গলার স্বর বদলে ডাকলেন, 'মনু, দ্যাখ—কেডা আসছে!'

'কে?'

দরজায় পা দিয়ে সুজাতা থমকালো। ঘরে আলো জ্বালবার সময় নয়, অথচ বাইরের ছায়া এসে সব আচ্ছন্ন আর আবিষ্ট করে ধরছে। সেই ছায়াসঞ্চারে সুজাতা সঙ্গে সঙ্গেই সাবিত্রীকে চিনতে পারল না। কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থেকে, বারকয়েক চোখ কুঁচকে, তারপর খুশিতে আর বিস্ময়ে বলে উঠল, 'সাবিত্রী!'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'তুই এতদিন পরে ? আকাশ থেকে পড়লি নাকি ?'

'আকাশ থেকে পড়ব কেন ! বাসে চেপে সোজা চলে এসেছি।'

সুজাতা এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরল সাবিত্রীকে। এইমাত্র স্নান করে এসেছে, একটা শীতল শীর্ণ শরীরের ছোঁয়ায় সাবিত্রী যেন কেঁপে উঠল একবার।

'যাক, তাহলে মনে পড়েছে আমাকে!' উল্লসিত গলায় সুজাতা বললে, 'মা, হেনাদিরে এট্টু চা দিতে কও আমাগো।'

হেনাদি বাড়ির পুরনো কাজের লোক। মা মোড়া ছেড়ে উঠে বললেন, 'হেনা ক্যান, আমিই যাইত্যাছি। খালি চা দিমু নাকি মাইয়াটারে ?'

মা বেরিয়ে গেলে সাবিত্রীর দিকে তাকালো সুজাতা। ঘরের আবছায়া আলোতেও সাবিত্রী টের পেলো, তাকে দেখে খুশি হওয়ার আনন্দটা হঠাৎ মিলিয়ে আসছে সুজাতার, তার চোয়াল-ওঠা মুখটা শক্ত হয়ে আসছে একটু একটু করে।

॥ সতেরো ॥

দু বছরের সিনিয়র হলেও মেয়েদের ভেতরে দূরত্বটা কম—স্বাভাবিক নিয়মেই কম। তারপরে একসঙ্গে ইউনিয়ন করা। এ ওকে নাম ধরেই ডাকে। সাবিত্রী আস্তে আস্তে বললে, 'তুই খুব রোগা হয়ে গেছিস সুজাতা!'

ঘরে আলো জ্বলেনি, আলো জ্বলবার সময় হয়নি এখনো। সুজাতার ভাঙা গাল শক্ত হয়ে উঠছে, রেখা পড়ছে কপালের ওপর, ঘনিয়ে আসা ছায়ার ভেতরেও তা দেখতে পাচ্ছিল সাবিত্রী।

একটুকরো বিস্বাদ হাসি ফুটল সুজাতার মুখে।

'বাংলা দেশের মেয়েদের মা হওয়ার দাম এমনি করেই দিতে হয়। সংসারও তার পাওনা ছেড়ে দেয় না।'

পাথরের মতো একটা ভার কিছুক্ষণ নেমে রইল দুজনের ভেতরে। বাইরে থেকে বেলাশেষের সোঁদা গন্ধ। মশার শব্দ উঠতে শুরু হয়েছে। কোথায় ডাহুক ডাকছিল। সামনের রাস্তা দিয়ে চলতি লরীর গর্জন কানে এল। সুজাতার স্নান করা ঠাণ্ডা শরীরের চাইতেও গলার স্বরটা শীতল। মা হওয়ার সময় খুব ভুগতে হয়েছিল ঠিক কথা, কিন্তু সেদিন সুজাতার চোখে অন্য আলো দেখেছিল সাবিত্রী, আর যত দূর মনে পড়ছে সংসারটাকে সেদিন তার খুব খারাপ লাগেনি। এখন সুজাতা নিষ্ঠুর। এখন অন্য রকম। ছায়া ছড়ানো ঘরে, মশার ডাক আর সোঁদা গন্ধের ভেতর হঠাৎ কেমন একটা অবসাদ বোধ করল সাবিত্রী। মনে হল, প্রবীর তাকে না পাঠালেই পারত, তার এখানে আসবার দরকার ছিল না। যেখানে রাগ, যেখানে উত্তেজনা, সেখানে কিছু বলবার থাকে, স্নায়ুগুলো শান্ত হয়ে এলে তার সঙ্গে তর্ক করা যায়, বিচার করা চলে। কিন্তু বিতৃষ্ণা আর অবসাদের ভার গলায় বেঁধে নিয়ে যে ডুবছে, তাকে তুলতে গেলে নিজেকেই বুঝি তলিয়ে যেতে হয়।

সাবিত্রী টের পেলো, খুব খারাপ দেখাচ্ছে এই চুপ করে বসে থাকাটা—এখানে এসে

সে যেন আরো বেশি বিষণ্ণ করে তুলছে সুজাতাকে। সুতরাং খুব স্বাভাবিক ভাবে কিছু একটা শুরু করতে চাইল।

'তোরই দোষ, শরীরের তো কোনো কেয়ার নিস্‌নে!'

সুজাতা চেয়ে রইল, জবাব দিল না।

'নীলুকে তো দেখছি না, ওকে আনিসনি সঙ্গে করে?'

এবারও জবাব দিল না সুজাতা। উঠে পড়ল, সুইচ টিপে জ্বালিয়ে দিলে ঘরের আলোটা। ফিরে এসে বসল নিজের জায়গাটিতে। বললে, 'সাবিত্রী!'

'কী বলছিস?'

'একটা সত্যি কথা বলবি?'

সাবিত্রীর অস্বস্তি বোধ হল।

'কেন বলব না?'

'তোকে এখানে আসতে বলেছে কে? স্বরাজ?'

একেবারে তীক্ষ্ণ সোজা কণ্ঠস্বর। সাবিত্রীর মনে পড়ে গেল কলেজের কমন-রুম। ঠিক এইরকম ধারালো স্পষ্ট গলায় প্রতিপক্ষের মুখের ওপর প্রশ্ন ছুঁড়ছে। কেমন কুঁকড়ে গেছে অরুন্ধতী রায়—হঠাৎ যেন তর্ক করতে ভুলে গেছে। সুজাতা তাকে জিজ্ঞেস করছেঃ তোর এত আপত্তি কেন? যেহেতু তোর বাবার কলকাতা শহরে সাতখানা বাড়ি আছে বলে?

সাবিত্রী একটা ঢোক গিলল।

'একথা বলছিস কেন? বছর তিনেকের ভেতরে স্বরাজদার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।'

'এমনিই এসেছিস?'

'কোনো ক্ষতি আছে?'

'না—ক্ষতি নেই—', সুজাতা হাসলঃ 'তোকে দেখলে এখনো ভালো লাগে। যদিও তুই পলিটিক্‌সে চিরকাল গা বাঁচিয়ে চলেছিস, তবু তোর মন ভালো। কিন্তু সাবিত্রী, এতদিন যখন মনে পড়ল না—তখন এই কো-ইন্‌সিডেন্সটা ঠিক বিশ্বাস করা যায় না। তুই বরং বলতে পারতিস—বানিয়েও বলতে পারতিস—এদিকে একটু কাজ ছিল, যাওয়ার সময় তোর সঙ্গে দেখা করে গেলুম।'

সাবিত্রীর গাল রাঙা হল একটু।

'তুই সিনিক হয়ে গেছিস সুজাতা।'

'সিনিক?' সুজাতা বললে, 'না—আমি মার্কসিস্ট। সিনিক হওয়ার মতো ডিজেনারেশান আমার ঘটেনি। তার স্পেসিমেন দেখতে চাস তো তোর স্বরাজদা তো আছেই।'

সাবিত্রী চুপ করে রইল। স্বাভাবিক ভাবে কথা শুরু করা যাচ্ছে না। সব বিস্বাদ করে দিচ্ছে সুজাতা।

সুজাতা আবার বললে, 'ওই সিনিসিজমের কাছ থেকে বাঁচতে চাই বলেই চলে এসেছি। সাবিত্রী—প্রিটেনশানের কোনো মানে হয় না। সত্যি বল্‌ তো—কেন এসেছিস আজকে?'

আর কোনো মানে হয় না আড়াল রাখবার। সত্যের মুখোমুখি হওয়াই ভালো।

সাবিত্রী সোজা সুজাতার মুখের দিকে তাকালো।

'সব আমি জানি না, কিছু শুনেছি। কিন্তু সুজাতা, যে নিজেকে মার্কসিস্ট বলে দাবি করে—এত সহজেই তার ধৈর্যচ্যুতি হওয়া উচিত নয়। স্বরাজদার কেন এসব ফ্রাস্ট্রেশান এসেছে? অব্জেকটিভ কনডিশানগুলো তো ভেবে দেখবি তুই। একসময় মনপ্রাণ দিয়ে কাজে নেমেছিল, পনেরো-ষোলো বছর পলিটিক্স করেছে। তারপর যদি দেখে কেবল কনফিউশান—'

'কে বলেছে কনফিউশান?' কোটরের ভেতরে দপদপ করে জ্বলে উঠল সুজাতার চোখ: 'কনফিউশান কোথাও নেই। সে যদি কতগুলো পুরনো বিশ্বাসে স্থির হয়ে থাকে, তা হলে দুঃখ তাকে পেতেই হবে। কমিউনিজ্‌ম স্ট্যাটিক নয়—সময় বদলায়, অবস্থা বদলায়, প্রত্যেক দেশের কতগুলো নিজস্ব প্রব্লেম আছে। দেশকাল বুঝে মার্কসের থিয়োরীকে প্রয়োগ করেছেন লেনিন, ব্যবহার করেছেন মাও-সে-তুং, হো চি মিন কিংবা কাস্ট্রোকেও নতুন করে ভাবতে হয়েছে। স্বরাজ যদি এই সহজ সত্যিটাকে বুঝতে না পারে, যদি বিশ বছর আগেকার পার্টি-নীতিই তার লাস্ট ওয়ার্ড বলে মনে হয়, তা হলে তার ফ্রাস্ট্রেশানের জন্যে সে কারো সহানুভূতি পেতে পারে না।'

'কিন্তু নিজেদের ভেতর ভাঙাভাঙি—'

'কী করে ঠেকাবি? প্রথম দিকে একটা ব্রড আউটলাইন থাকে, তখন অনেকে একসঙ্গে চলতে পারে। তারপর আন্দোলন যত এগোয়, কাজের চেহারা তত স্পষ্ট হয়, দায়িত্ব কঠিন হয়, অনেক বেশি স্যাক্রিফাইসের সময় আসে। তখনই ধরা পড়ে কে সাচ্চা, কে মেকি, কে বিপ্লবী, কে ভীরু। ভাঙন তখন আসবেই। লেনিনও মেন্‌শেভিক আর সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের নিয়ে চলা শুরু করেছিলেন, আর তারাই শেষে লেনিনকে খুন করবার জন্যে ক্ষেপে গিয়েছিল।'

অনেকদিন শীতল নির্বাণের পর হঠাৎ যেন জ্বলে উঠেছে সুজাতা, অনেক বেশি জ্বলে উঠেছে। একটু চুপ করে রইল সাবিত্রী। এইভাবে তর্ক চালিয়ে গেলে সারারাতেও শেষ হবে না। সুজাতা দশ বছর আগে ফিরে গেছে আবার। ঘরের ভেতরটা থমথম করতে লাগল।

তখন মাসিমা এলেন। সঙ্গে হেনাদি। পরোটা আর তরকারী করে এনেছেন, আর মিষ্টি।

সাবিত্রীর যেন স্বস্তির শ্বাস পড়ল।

'এত কেন মাসিমা?

'বেশি নয়, খাও।'

'কিন্তু কেবল আমার জন্যে কেন? সুজাতা খাবে না?'

সুজাতা বললে, 'বিকেলে আমি কিছু খেতে পারি না। মানে সহ্য হয় না।'

'শরীরটাকে কী করেছিস বল্ তো?'

আবার সেই বিস্বাদ রেখা ফুটল সুজাতার মুখে।

'বাঙালী মেয়ের সংসার—বুঝলি! তার পরম তীর্থ। এতদিন যখন একাই আছিস, তুই আর ওই বোকামোটা করিসনি সাবিত্রী।'

মাসিমার কপাল জুড়ে ছায়া নামল। একবার তাকালেন সাবিত্রীর দিকে। তারপর বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

সুজাতা বললে, 'হেনাদি, আমাগো চা দিলা না ?'

'হ—আনি।'

সাবিত্রীর খিদে পেয়েছিল, অথচ খাওয়ার স্বাদ মুখ থেকে মুছে গেছে এখন। একবার বলতে ইচ্ছে করল, মাসিমার সামনে কথাটা অমন করে না বললেও পারতিস, কিন্তু ভালো লাগছিল না, নিঃশব্দে তরকারির একটা আলু নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল সে।

সুজাতা বললে, 'থেকে যা আজ। অনেকদিন পরে দেখা হল, প্রাণ খুলে গল্প করা যাবে।'

'গল্পের নমুনা তো দেখছি। আগুন হয়েই রয়েছিস তুই।'

সুজাতার কঠিন মুখটা এবারে কোমল হয়ে উঠল একটু।

'আলোচনা তো তুই-ই তুললি। স্বরাজের কথা টেনে আনিসনি, তা হলেই আর কোনো গোল থাকবে না।'

'তুই আর ফিরে যাবি না ?'

'না।'

'কোনো উপায় নেই ?'

'না—ইট্‌স্‌ এ সীলড্‌ চ্যাপটার !'

'কী করবি তা হলে ?'

'সারাজীবন যা করতে চেয়েছি। আমি আমার কুমারী জীবনে ফিরে এসেছি আবার। ও'দের ছেলের বয়েস বেশি হয়নি, চাকরি করে—সুপাত্রই বলা যায়। ও'রা স্বচ্ছন্দে আবার ছেলের বিয়ে দিতে পারবেন।'

বুকের ভেতরে একটা যন্ত্রণা বোধ করল সাবিত্রী।

'তুই এত নিষ্ঠুর হতে পারলি সুজাতা ?'

'অনেক তর্ক করেছি, কে'দেছি, তিন বছর ধরে প্রাণপণে অ্যাডজাস্ট করতে চেয়েছি। পারা গেল না। স্বরাজের স্যানিটি বলে আর কিছু নেই। ও বাড়িটারই হাড়ে হাড়ে ঘুণ ধরেছে। তাই ওখান থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল আনন্দ। তার প্রাণ আছে, তার জোর আছে। যদিও একটা অন্ধ অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে—তবু ওদের ওই থিয়োরীটা আমি মানি যে জলে না নামলে যেমন সাঁতার শেখা যায় না—তেমনি বিপ্লবে নেমেই সৈনিক হতে হয়। তোকে একটা সত্যি কথা বলি সাবিত্রী। ঠাকুরপো যদি ওইভাবে ভেঙে বেরিয়ে না যেত, তা হলে আমি এত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতে পারতুম না—ধীরে ধীরে তোদের স্বরাজদার সঙ্গে চূড়ান্ত ডিফিটিজমের চিতায় সহমরণে যাত্রা করতুম।'

হেনাদি চা দিয়ে গেল।

একটা পেয়ালা তুলে নিয়ে সুজাতা বললে, 'ও কি, হাত ধুচ্ছিস যে ? খেলি না তো কিছুই !'

'আর খিদে নেই।'

'মানে, আমার ওপর রাগ করে তুই খেলি না।'

'না, না—তা নয়।' সাবিত্রী হাতের ঘড়িটার দিকে তাকালো : 'আর বেশিক্ষণ বসব না—এবার ফিরতে হবে কলকাতায়।'

'ফিরবি কেন? থেকে যাবি আজকে।'

'না রে, অনেক কাজ আছে।'

সুজাতার মুখে শ্রান্ত একটা হাসির আভাস ফুটল : 'আমাকে খুব অসহ্য লাগছে, না?'

চায়ে চুমুক দিয়ে সাবিত্রী ম্লান গলায় বললে, 'সম্পূর্ণ ভালো লাগছে একথা বলতে পারলে খুশি হতুম। তুই নীলুর কথাটাও একবার ভেবে দেখলি না!'

সুজাতার চোখ নেমে এল। একটা যন্ত্রণার ছায়া পড়েছে—সেটা চোখ এড়িয়ে গেল না সাবিত্রীর। মাথা নামিয়ে সুজাতা বললে, 'ওকে নিয়ে এলে আমার শ্বশুরের ওপর দারুণ নিষ্ঠুরতা হত একটা—ওই মানুষটি ভালো, ওঁকে আমি শ্রদ্ধা করি। তা ছাড়া ওঁদের ছেলে ওঁরা ইচ্ছে মতন মানুষ করুন—আমি দাবি করতে চাই না।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা রূঢ় মন্তব্য এসে গেল সাবিত্রীর ঠোঁটে।

'নিজের পথও তোর নিষ্কণ্টক থাকে, এই তো?'

হঠাৎ যেন সম্পূর্ণ নিবে গেল সুজাতা। বেদনায় কালো হয়ে গেল মুখ।

'তুইও তো কম নিষ্ঠুর হতে পারিস না সাবিত্রী!'

সঙ্গে সঙ্গে সাবিত্রী অনুতাপ বোধ করল।

'আমি—আমি ঠিক ওভাবে কথাটা বলতে চাই নি সুজাতা। মানে, আমি—'

'তোর দোষ নেই সাবিত্রী—' ক্লান্ত গলায় সুজাতা বললে, 'সকলে এই কথাটাই ভাববে। আমার কিরকম লাগছে তা আমিই জানি। কিন্তু বিপ্লবীকে দাম দিতে হয়।'

আবার ঘরের হাওয়াটা গুমোট হয়ে গেল। বাইরে অন্ধকার নেমেছে। এখন ঝিঁঝির ডাক। এখানে-ওখানে টুকরো টুকরো ছায়া জমে আছে মনের ভারের মতো। দেওয়ালে লেনিনের ছবিটা যেন জীবন্ত হয়ে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে।

হেনাদি এসে বললে, 'দীপকবাবু আর মণ্টুবাবু আসছে।'

'বসতে কও হেনাদি—আমি আসতাছি।' হেনাদি চলে গেল, সাবিত্রীর দিকে তাকিয়ে সুজাতা বললে, 'আমাদের পার্টির ছেলেরা। তুই একটু বস সাবিত্রী—আমি দু-মিনিট ওদের সঙ্গে কথা কয়েই ফিরব।'

সাবিত্রী বললে, 'তুই বুঝি এখানে এখন হোলটাইম পার্টি-ওয়ার্কার?'

'কী করব বল্? চারদিকে জমি দখলের লড়াই চলছে। এই মুভমেণ্টটা যদি একবার দেখতিস সাবিত্রী! চিরকালের এক্সপ্লয়টেড ভাগচাষী আর ক্ষেতমজুরের ভূমিহীন মানুষগুলোর একটুকরো জমির জন্যে কী আকুলতা! চীনের থিয়োরীই ঠিক—আমাদের আগে দরকার কৃষি-বিপ্লব। তুই একটু বস্—আমি দু মিনিট ওদের সঙ্গে কথা কয়ে আসছি।'

'আমি উঠব। আমার দেরি হয়ে যাবে।'

'কিচ্ছু দেরি হবে না। বিস্তর বাস পাওয়া যাবে অনেক রাত পর্যন্ত। এই তো

সন্ধ্যে—বস্—বস্।'

আসবার আগে মাসিমা এক কোণায় ডেকে নিয়ে বললেন, 'কিছু বুঝলে? ও কী করতে চায়?'

'অনেকদিন বসে থেকে একঘেয়ে লাগছিল মাসীমা, একটু রাজনীতি করে দিনকয়েক ঝালিয়ে নিতে চায়। কিছু ভাববেন না, স্বরাজদাকে—নীলুকে ফেলে ও কি থাকতে পারে? দুদিন পরেই ফিরে যাবে আবার!'

'আগে যা করত করত—কিন্তু এখন ওই শরীর নিয়ে দৌড়োদৌড়ি করছে—'

'বেশিদিন চালাতে পারবে না মাসিমা, আপনিই ক্লান্ত হয়ে পড়বে।'

নিরাশ স্বরে মাসিমা বললেন, 'কিছু বুঝতে পারছি না। কিন্তু কপালের সিঁদুরটা মুছল কেন?'

'ওটা খেয়াল মাসিমা, নিশ্চিন্ত থাকুন।'

'আবার আসিস—' সুজাতা বলেছিল।

'আসব।'

কিন্তু বাস যখন দু'পাশের ঘরবাড়ি, বাগান, ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে তীরবেগে ছুটছে, তখন জানলার ওপর হাওয়ার মধ্যে মাথাটা মেলে দিয়ে সাবিত্রী ভাবছিল। আসব? কেন আসব? এসে কী হবে? প্রবীর তাকে মিথ্যেই পাঠিয়েছিল এখানে। যে সান্ত্বনা সে মাসিমাকে দিয়ে এল, নিজেই তা সে কি বিশ্বাস করে?

বাসে কে একজন ট্র্যানজিস্টর রেডিও খুলেছে। সেই খবর! সেই তিক্ততার ইতিহাস!

শরিকী সংঘর্ষ। মুখ্যমন্ত্রীর উক্তির প্রতিবাদে উপমুখ্যমন্ত্রী এক বিবৃতিতে বলেছেন—

হঠাৎ মনে হল, এই বাসটা—এই সব যাত্রীরা এক অন্ধকার আর অনিশ্চিত লক্ষ্যের দিকে ছুটে যাচ্ছে—কোন্ পরিণামে গিয়ে যে পৌঁছোবে কেউ জানে না। দূরে দমদম এয়ারপোর্টের রানওয়েতে সারি সারি আলোগুলো চোখে পড়ল, বোধ হল যেন একরাশ আলেয়া।

॥ আঠারো ॥

বুড়োটার যেন আর কাজকর্ম নেই—খ্যাকশেয়ালের মতো খ্যাক খ্যাক করছে সমস্ত দিনটা। বাঁধানো দাঁত দিয়ে যে অমন করে খিঁচোনো যায়—আশ্চর্য! আসল দাঁতগুলো থাকলে কামড়েই দিত খুব সম্ভব।

এই বুড়োটার জন্যেই মনে হয়—দুত্তোর, দিই এই কচুপোড়ার চাকরি ছেড়ে! কিন্তু তা হলে দিদি আর আস্ত রাখবে না। আর মণীশদা এলেই তো খুব গম্ভীরী চালে পিঠ-ফিট চাপড়ে দেয়, আড়ালে ডেকে নিয়ে বলে, 'একটু মন দিয়ে কাজকর্ম কোরো হে, আমার প্রেস্টিজের কথাটা মনে রেখো।'

তাও সরে পড়া যেত, কিন্তু আর কটা দিন কাটিয়ে দিতে পারলেই যে মাইনেটা

পাওয়া যাবে, সেকথা ভোলা যাচ্ছে না। নিজের রোজগার করবার একটা আলাদা সুখ এখন নেশার মত জড়াচ্ছে তাকে। তা ছাড়া কিছু কিছু বাড়তি পয়সাও আছে। এই হপ্তাতিনেকের ভেতরেই অনেক কিছু শিখেছে সে—শিখে নিতে হয়েছে। খুঁটি-নাটি কাজে পয়সা মেলে, জমি-বাড়ি বিক্রীর ব্যাপারে পার্টিকে রেজেস্ট্রি অফিসে নিয়ে গেলে দুটো-একটা টাকা হাতে আসে। এখন নিজের ওপর একটা মর্যাদার বোধ আসছে ক্রমশ। আমি কেবল রকবাজ নই—আরো দশজন বেকার মস্তানের সঙ্গে হুল্লোড়বাজী করে বেড়াই না—যেসব কাজের লোকেরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে দশটা-পাঁচটায় অফিসের বাস ধরে আমি তাদের একজন।

এসব ভালো—কিন্তু দুটো জিনিস, বুড়োটাই জীবন অতিষ্ঠ করে তুলল, আর তা ছাড়া—তা ছাড়া কিছুতেই কোচিং ক্লাসে ভর্তি হওয়া যাচ্ছে না। অথচ লেখা-পড়াটা আরো একটু না শিখলে কিছুতেই স্বপ্নার কাছে—

সঙ্গে সঙ্গে গলার কাছে যন্ত্রণা উঠল একটা। মনে হল কার্তিকের সেই শক্ত হাতটা এখনো যেন ফাঁসির মতো আটকে আছে। হঠাৎ এই কাগজপত্র-ঠাসা গুমোট ঘরটা যেন দম আটকে আনল তার।

বুড়োর কাছে সে বললে, 'মাখনদা, আমি একটু আসছি বাইরে থেকে চা খেয়ে।'

মাখনদা খানিকটা শর্টহ্যান্ডে লেখা থেকে টাইপ করছিল। ব্যস্ত ছিল, তাতেই দাঁত খিঁচোবার সময় পেলো না।

'সাহেব একটু পরেই আসবে হাইকোর্ট থেকে। অনেক কাজ আছে। আড্ডায় জমে যেয়ো না।'

'না না, আমার দেরি হবে না।'

গাড়ির সার, লোকের ভিড়। মাথার ওপর সূর্যের আগুন। গঙ্গা ছুঁয়ে—গড়ের মাঠ পেরিয়ে যে হাওয়া আসছে তাতে পর্যন্ত গা-জ্বালা করতে থাকে। এখানে মামলা-মোকর্দমা, বিষয়-সম্পত্তি, স্বার্থ, আইনের কুট-কচাল। মানুষের মুখের চেহারা পর্যন্ত বদলে যায় এখানে এলে। যেন চারদিকে শিকার খুঁজে ফিরছে সব, চোখগুলো ধূর্ততায় ধারালো—এদের সঙ্গে কোনো তফাৎ নেই মাণিকের, ফণীর, কার্তিকের।

আবার কার্তিক! টুলু চোখ-কান বন্ধ করে এগিয়ে চলল। মোড়েই খাবারের বড় দোকানটা।

সব সময়েই জমাট, এখনো বিস্তর লোক। তবু বসবার জায়গা মিলল।

'দুটো সিঙাড়া, চা এক কাপ।'

খিদে পেয়েছে। সেই নটায় বেরুতে হয় বাড়ি থেকে। বাসের ঝাঁকুনিতেই কখন পেটের ভাত হজম হয়ে যায়।

সিঙাড়া এল। চামচে করে ভেঙে খেতে খেতে অন্যমনস্ক হল টুলু।

কার্তিক জামার কলারটা শক্ত হাতে টেনে ধরেছিল। পকেট থেকে ছোরাই বের করতে যাচ্ছিল হয়তো, মাণিক যেমন বলেছিল, হয়তো তক্ষুনি পেট ফাঁসিয়ে দিত। শালা খুনে!

অথচ সব মিথ্যে। সে কারো নামে চুকলি খায়নি। ওরা কসবার কোথায় বসে বোমা বানায়, তাও সে জানত না। ইয়ার্কি ফাজলামো, এক-আধটু আজেবাজে ফুর্তি,

না-হয় হয়েই গেল কিছু হাতাহাতি। কিন্তু ওসব বোমাবাজি তার পোষায় না—সে মাথাও ঘামায়নি কোনোদিন।

গৌরবাবু দারোগাকে মুচলেকা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই সে বলেনি। পুলিসের টিকটিকি কোত্থেকে বোমার খবর পেলো তারাই জানে। অথচ হারামীর বাচ্চাদের যত রাগ তারই ওপরে।

মাণিক নিশ্চয় কলকাতায় নেই। তার কানে মন্ত্র দিয়েছে ওই পলিটিক্সের দাদারা—কোথায় যেন কাদের হয়ে ধান কাটতে গেছে সে। তাকে ভরসা দিয়েছে, এসব কাজে নেমে পড়লে তার জীবনটাই অন্যরকম হয়ে যাবে, আর ওয়াগন ভাঙতে হবে না, একেবারে সুখের স্বর্গে গিয়ে চড়বে। হবে ঘোড়ার ডিম! পলিটিক্সের দাদারা তো কেবল লাল কাপড় দুলিয়ে দেশসুদ্ধ ষাঁড় খেপিয়ে তাদের লড়াই দেখছে—আর নিজেরা বেশ মৌজের সঙ্গে হাততালি বাজাচ্ছে।

ধুস্! সিঙাড়া থেকে এক টুকরো পচা আলু মুখে পড়তে আরো মেজাজ খারাপ হয়ে গেল টুলুর। মাণিকটা থাকলে তবু কার্তিকদের খানিক সামলে রাখতে পারত—তার মাথা একটু ঠাণ্ডা। এ ব্যাটারা তো খ্যাপা কুকুর হয়ে আছে, আবার বাগে পেলে—

স্বপ্নাই বাঁচিয়ে দিলে এযাত্রা। স্বপ্না।

টুলুর মাথাটা ঝুঁকে পড়ল টেবিলের ওপর। সন্ধ্যাটা তখন কি রকম হয়ে গিয়েছিল। আগের রাতে বৃষ্টি হয়ে কী সবুজ দেখাচ্ছিল সাদার্ন অ্যাভেন্যুর ঘাসগুলো, কী হাওয়া দিয়েছিল, লেকের গাছগুলোতে কী ফুল ফুটেছিল, আর কতদিন পরে হাতটা চেপে ধরেছিল স্বপ্না। টুলুর মনে হচ্ছিল, আবার সে আগের দিনগুলোর মতো ভালো হয়ে যাচ্ছে—এতদিন যা কিছু ঘটেছে, সব স্বপ্নের ভেতর, হঠাৎ স্বপ্না বলে বসবে, 'টুলুদা, এই অঙ্কটা পারছি না, বুঝিয়ে দাও।' এমনি করে টুলু যখন আবার ভালো, আবার নতুন হয়ে যাচ্ছিল তখন কার্তিকরা এল। সমস্ত কালো হয়ে গেল, ঘুলিয়ে গেল সমস্ত।

স্বপ্না তাকে আর একবার বাঁচিয়ে দিলে। সেই স্কুলের টাকা ভেঙে কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে যাওয়ার পর নিজের গলার হার যেমন খুলে দিয়েছিল সেদিন। কার্তিক ছেড়ে দিলে বটে, কিন্তু আর সে দাঁড়াতে পারল না। একটা মোড় ঘুরতেই সামনে চল্‌তি বাস—এক লাফে উঠে পড়েছিল তাতে।

বাসটা কোন্ দিকে, কোথায় চলেছে সেটা বড় কথা নয়। কার্তিক তাকে ছোরা মারলেও হয়তো ভালো হত এর চাইতে। লজ্জায়, অপমানে সে যেন টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছিল তখন।

স্বপ্না বোধ হয় তাকে ডাকছিল। কিন্তু জোর করে পা-দানির ভিড় ঠেলে উঠে সে বোঝাই বাসের মধ্যে লুকিয়ে গেল। বাস কোথায় যাচেছ? সল্ট লেক? শিবপুর? যেখানে খুশি যাক।

দাঁতে দাঁত চাপল টুলু। নাঃ, বার বার এভাবে নীচু হওয়া যায় না। আমি ফিরেছি, আমি ফিরব। আমি চাকরি করব, আমি কোচিং ক্লাসে ভর্তি হব, আমি মাথাটাকে ঘাড়ের ওপর সোজা করে ধরব, তারপর গিয়ে দাঁড়াব স্বপ্নার কাছে। কার্তিক ব্যাটাচেছলেরা কী করতে পারে আমার? এবার থেকে আমিও একটা ছোরাটোরা নিয়ে বেরুব সঙ্গে। যদি মারতেই আসে, অন্তত একটাকে সাবাড় করে তবেই মরব।

আসলে আমি দল ছেড়েছি, তাতেই রাগ। আমি ভদ্রলোক হতে চেষ্টা করছি, তাইতেই জ্বালা ধরেছে শালাদের।

সেদিন বাসটায় চেপে ভবানীপুর পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এসেছিল। তারপর বাড়ি ফিরে সমস্ত রাত তার মাথায় আগুন জ্বলেছে। দাদার ওপরেও তখন বিশ্রী একটা রাগ হচ্ছিল তার। কী দরকার ছিল মুরারি হালদারকে বলে তাড়াতাড়ি তাকে ছাড়িয়ে আনবার? না হয় আরো দুটো দিন ঠেঙিয়ে—কার্তিককে যেমন ছেড়েছে তেমনিভাবে তাকেও ছেড়ে দিত। মাঝখান থেকে—

'টুলু নাকি?'

টুলু একটা ঝাকুনি খেলো ভাবনার ভেতরে। চেয়ে দেখল, কালীঘাটের ভেতরে ভেটকি মিত্তির। ওদের দলেই ঘুর-ঘুর করত, তারপর কিছুকাল বে-পাত্তা। একটা ভালো নাম তার নিশ্চয় ছিল, কিন্তু ভেটকি নামেই সে বিখ্যাত। বড়লোকের ছেলে, চেহারাটা খুব চটকদার। জীবনে তার একটিমাত্র উদ্দেশ্য—মেয়ে শিকার করা। এ পর্যন্ত যত মেয়েকে কিভাবে সে মজিয়েছে, রসিয়ে রসিয়ে সেই গল্প করতেই আনন্দ। নোংরা কথা তাদের দলে সবাই বলে থাকে, কিন্তু বড়লোকের ছেলে বলেই তার মুখ সবচেয়ে বেশি খোলা—খিস্তি করবার সময় জিভ যেন তার লকলক করত, এমন কি ফণী পর্যন্ত বলে বসত: 'থাম্ মাইরি, আর তো বরদাস্ত হয় না—তুই আমাদের চরিত্তির খারাপ করে দিবি যে!'

'আহা, কী সব চরিত্তিরের ধ্বজা রে!'

এই ভেটকি মিত্তিরের কিছুদিন পাত্তা ছিল না। কিন্তু হঠাৎ এখানে—এই হাইকোর্ট-পাড়ায়?

ভেটকি মিত্তির কেবল দোকানে ঢুকেছিল মনে হল, এসে বসে গেল টুলুর পাশে।

'তুই এখানে কী করছিস টুলু?'

'চাকরি করি একটা। চা খেতে এসেছি। খাবি তুই?'

'বলে দিয়েছি। কিন্তু ব্যাপার কী—অ্যাঁ? তুই চাকরি করছিস?'

'কেন, দোষ আছে?'

'না, দোষ আর কী, ভালোই তো। তোর দাদার পাল্লায় পড়ে বুঝি?'

'কেন, নিজে থেকে আমি একটা চাকরি নিতে পারি না?'

'পারিস বই কি, আলবৎ পারিস। তা দল-টল কি ছেড়ে দিলি?'

টুলু এড়িয়ে গেল কথাটা। বললে, 'তুই এ-পাড়ায় যে?'

'ভবানীপুরের একটা বাড়ি বিক্রী করে দিতে হল মাইরি। দেনায় এমন জড়িয়ে গেলুম যে—' ভেটকি মিত্তিরের মুখটা ঝুলে পড়ল: 'খুব বাগিয়ে নিলে পাঞ্জাবী সর্দারজী, বুঝলি? কম্‌সে কম দেড় লাখের বাড়ি—ছাড়তে হল পঞ্চাশে!'

'ছাড়লি কেন?'

'আর বলিসনি। মানে একটা মেয়ে—'

'শুধু একটা বলছিস কেন? তুই তো মেয়েদের গায়ের এঁটুলি!'

ভেটকি মিত্তির মুখটাকে বিশ্রী করল: 'ধুৎ! মেয়েছেলেতে এবার অরুচি ধরে গেছে।'

'বটে !'

'আরে, এটা ইস্কুলের মেয়ে। দেখতে খাসা, বুঝেছিস? পটিয়ে নিয়ে গিয়েছিলুম একটা খালি কুঠিতে। বরাতের ফের—হল পুলিস রেড। ধরে হাজতে। বলে, নাবালিকা—পাঁচটি বচ্ছর ঘানি ঘোরাব তোমায়। সে ঝকমারি মেটাতে—বুঝলি, স্রেফ বিশটি হাজার টাকা। বাবা বন্দুক নিয়ে এল, বললে, যা চলে দেশের বাড়িতে, কলকাতায় আর একদিনও থাকবি তো ত্যাজ্যপুত্তুর করব। কী করা যায় বল্! তা মাসছয়েক তো বনবাসে কাটল। তারপর বাবা হঠাৎ স্ট্রোকে চোখ বুজলেন, ফিরে এসে সম্পত্তির প্রোবেট নিতে গিয়ে দেখি, কাকা তলায় তলায় সব ফাঁক করে রেখেছে। তারপরে ডেথ-ডিউটি, এটা-সেটা—যাঃ শালা, চোখে-কানে দেখি না! দিতে হল বাড়িটা বেচে। ও ব্যাটার কাছ থেকে মাঝে মাঝে ধার নিতুম, শেষে বাড়িটা ওর পেটেই গেল। দূর, কিচ্ছু ভালো লাগছে না! নাঃ, মেয়েছেলের মধ্যে আমি আর নেই। মা বিয়ে করতে বলছে, তাই করে ফেলব একটা।'

'মেয়েছেলের মধ্যে নেই তো বিয়ে করবি কাকে? বেটাছেলেকে?'

'বউ—বউ! তাকে কি মেয়েমানুষ বলে? চায়ে চুমুক দিতে দিতে ভেটকি মিত্তির বললে, 'তারপর আর খবরটবর কী? প্রমোদ ফণী কার্তিক—'

সামনের ঘড়িটায় তিনটে বাজল। চমকে উঠল টুলু। একটু পরেই হাইকোর্ট থেকে ফিরে আসবেন ঘোষ সাহেব।

'সব ভালো।' টুলু দাঁড়িয়ে পড়ল: 'আমি চললুম। কাজ আছে। পরে দেখা হবে আবার।'

'আসিস না একদিন আমার বাড়িতে। এখন বাবা তো নেই, ভাবনারও কিছু নেই। আমিই মালিক। দরজায় নেমপ্লেট বসিয়েছি, বুঝলি? পি মিটার, ল্যান্ডলর্ড। চলে আসিস।'

'দেখা যাবে।'

চা আর খাবারের পয়সা মিটিয়ে দিয়ে টুলু নেমে পড়ল। সেই ভিড়, গাড়ির সার, সেই ধারালো রোদ, জ্বালা-ধরানো হাওয়া, মানুষের ধূর্ত হিসেবী চোখ। মনটাকে আরও বিশ্রী করে দিয়েছে ভেটকি মিত্তির। জেল খাটলেই ভালো হত ওর।

যেতে যেতে, ভিড়ে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে, প্রায় চোখ বুজে টুলু নিজেকে বলতে লাগল: আমি বেঁচেছি, এদের খপ্পর থেকে আমি বেঁচেছি। কিছুই বলা যায় না—হয়তো ওর সঙ্গী হয়ে আমিও খালি কুঠিতে যেতুম—ও বেরিয়ে আসত টাকার জোরে আর আমাকে জেল খাটতে হত। আমি বেঁচেছি, আমি বাঁচব। কার্তিকদের ভয় করি না, দরকার হলে আমিও একটা ছোরা নিয়ে বেরুব সঙ্গে।

স্বপ্নার কাছে আমি ফিরে যাব মাথা উঁচু করে, বুক টান করে। যেতে যেতে মনে হল, সেই সন্ধ্যাটার মতো স্বপ্না তার হাত ধরে আছে।

অফিসে মজুমদার সাহেব ঘেরাও। সেন আর চ্যাটার্জী—আরো দুজন কর্তাব্যক্তি গোলমাল শুনে ব্যাপারটা জানতে এসেছিলেন, তাঁরাও আটকে পড়েছেন জালের ভেতর। এখন খাবি-খাওয়া মাছের মতন ছট্‌ফট করছেন তাঁরা।

পাখা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গরমে দরদর করে ঘামছেন সুখী ভদ্রলোকেরা। আর তাঁদের ঘিরে উঠছে স্লোগানের পর স্লোগান।

'দালালেরা ধ্বংস হোক।'

'মুর্দাবাদ, মুর্দাবাদ!'

মজুমদার সাহেব যে খুব চমৎকার লোক তা নন। একসময়ে সিংহবিক্রমে চলতেন এখন জমানা বদলের ফলে মেষশাবক। যুক্তফ্রণ্টের টলমল অবস্থা দেখে উৎসাহে একটু নড়ে বসেছিলেন, একটা চার্জশীট দিয়ে ফেলেছিলেন একজনকে, তার ফলে আজ এই প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে।

একবার ক্ষীণগলায় বলতে চাইলেন, 'দেখুন উইদাউট নোটিশ, দিনের পর দিন কামাই করলে—'

'শাট আপ্!'

'আপনারা যে-রকম গবর্নমেণ্ট চেয়েছিলেন, তাই তো হয়েছে। এখন আপনারা সবাই সিন্সিয়ারলি—'

'শাট আপ্—শাট আপ্! ব্যাটা শয়তান, ধর্মকথা শোনাতে এসেছে প্যাঁচে পড়ে!'

তারপর চলল গালাগালি। ওর স্ত্রীর অচিরে বৈধব্য ঘটবে—এই কথাগুলো জানানো হতে লাগল বেশ পরিষ্কার স্থূল ভাষায়। দু-একটি অকথ্যও শোনা যাচ্ছিল ফাঁকে ফাঁকে। সেন আর চ্যাটার্জীও বাদ যাচ্ছিলেন না।

আসলে অনেক দিনের জ্বালা। মজুমদারের ওপর রাগ থাকতে পারে, থাকাই স্বাভাবিক। ঘেরাও করতেও কিছুমাত্র বাধা নেই। কিন্তু এইসব কুৎসিত গালাগাল? আলো-পাখা সব বন্ধ করে দিয়ে নিগ্রহ? এও কি ঘেরাওয়ের নীতি? তাহলে ঘেরাওয়ের দরকার কী—টেনে এনে প্রচণ্ড প্রহার করলেই তো চুকে যায়!

প্রবীর দাঁড়িয়ে ছিল একটু দূরে। ঘেরাও হোক, কিন্তু এইটে ঠিক পছন্দ হয় না তার। বামপন্থী রাজনীতির পদ্ধতিটা কী? নীতি, না নৃশংসতা? সময়বিশেষে নীতিও নিশ্চয় নির্মম হতে পারে, কিন্তু যে-কোনো উপলক্ষে আন্দোলনকে উদ্দামতায় পৌঁছে দিলে—

কে জানে, ঠিক বোঝা যায় না। আর ইউনিয়ন তো প্রবীরদের হাতে নয়, তারা মাইনরিটি। তাদের দালাল বলা হয়ে থাকে।

তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকে যায়। কথা ছিল, যুক্তফ্রণ্টের আমলে আমরা প্রমাণ করব, আগের দিন আর নেই—এখন দেশ আমাদের, দায়িত্ব আমাদের হাতে। আমাদের সরকারকে সব দিক থেকে দুর্নীতিমুক্ত করব আমরা—কাজ করব' পরিশ্রম করব, প্রশাসনের পথ মসৃণ করে তুলব। তবু কেন আমরা কাজে ঢিলে দিই, কামাই করি, মজুমদার সাহেবদের হাতে সুযোগ এনে দিই, আমরাই বিরোধী পক্ষের হাতিয়ার হয়ে উঠি?

পাশে এসে দাঁড়ালো মুকুল প্রামাণিক।

চলো ব্যানার্জী, কী হবে দাঁড়িয়ে থেকে? এদের রেভোলিউশ্যানের দৌড় তো দেখছ!'

প্রবীর আশ্চর্য হল। মুকুল এই পক্ষেরই একজন উৎসাহী সৈনিক বলে এতদিন

ধারণা ছিল তার।

'তুমি হঠাৎ—'

মুকুল বললে, 'কিস্সু হবে না। আয়্যাম ডিজইল্যুশ্যান্ড। নকশালবাড়ির লাল আগুন ছাড়া কোনো পথ নেই—কোনো পথই নেই। ও এক-আধটা মজুমদারকে টর্চার করে কী হবে, ঝাড়ে-মূলে সব জ্বালিয়ে দেওয়া দরকার। চলো আমার সঙ্গে—'

'কোথায় যেতে হবে ?'

'চলোই না।'

প্রায় জোর করে টেনে নিয়ে চলল। একদিক থেকে নিষ্কৃতি। পেছনের ওই প্রবল চিৎকার তার খুব ভালো লাগছিল না—অন্তত আজকের মানসিকতায় তো নয়ই।

করিডোরে দুটি ছেলে কথা কইতে কইতে যাচ্ছিল: 'আমাদের যুক্তফ্রন্ট—'

মুকুল প্রামাণিক সংক্ষেপে বললে, 'এ মেয়ারস্ জেস্ট্!'

॥ উনিশ ॥

নীলাঞ্জনের ঘর থেকে পড়বার শব্দ আসছে। গুনগুন করে কিছু একটা মুখস্থ করছে মনে হয়।

বারান্দায় নিজের ইজিচেয়ারটায় বসে শিবপ্রসাদ তাকিয়ে ছিলেন সামনের গন্ধরাজ গাছটার দিকে। সকালের রোদ ঝিকমিক করছে ঘন সবুজ পাতাগুলির ওপর, খুশি হয়ে একটা টুনটুনি নাচানাচি করছে সেখানে। শিবপ্রসাদ জানেন, এবারেও কুঁড়িগুলো থাকবে না, সেই ছোট ছোট ছেলেরা আবার আসবে, জীবনে কোথাও যাদের রঙ নেই, স্বপ্ন নেই, আশা নেই—তারা জন্মগত বিদ্বেষে ভালো করে ফোটবার আগেই কুঁড়িগুলোকে ছিঁড়ে নিয়ে যাবে, তারপর রাস্তায় কিংবা নর্দমার জলে টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দেবে তাদের।

কাল বিকেলে বাড়ি থেকে বেরুবার সময় পথের পাশে দু'তিনটি প্রায়-শিশুর খেলা দেখেছিলেন তিনি। তাদের এক-আধটা কথার টুকরো কানে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়েছিল একবার।

একজন বাখারির একটা ছোট্ট ফালি দেখিয়ে বলছিল: 'আমি মাস্তান, বুঝলি আমি মাস্তান! বেশি চালাকি করবি তো ছুরি মেরে দেব!'

আর একজন একটা ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে জবাব দিচ্ছিল: 'আমার হাতে বম্ দেখছিস না ? একবার দুম করে ঝেড়ে দিই তো—'

কাছেই একটি ছোট্ট মেয়ে ঘাগরা ঘুরিয়ে নাচের ভঙ্গি করছিল একটা। ঘাগরা তার ছিল না, ছেঁড়া ফ্রকের একটা কোণা ধরে সে মহড়া দিচ্ছিল, 'তুম্সে প্যার হো গয়া'-গোছের একটি গানের কলি শোনা যাচ্ছিল তার মুখে।

এই এদের খেলা—বাংলা দেশের এইসব ছেলেমেয়ের খেলা। শিক্ষাস্বাস্থ্য-খাদ্যহীন নৈরাজ্যের শিকার এই শিশুরা কোন্ বাংলা দেশ, কোন্ ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ রচনা করছে ?

সারাজীবনের আদর্শ, দেশসেবা, স্কুলের মাস্টারী—নিজে কী পেলেন, কী দিলেন

দেশকে ? নীল্ হয়তো বস্তির এইসব ছেলেমেয়েদের চেয়ে একধাপ ওপরে বাস করছে, কিন্তু আজ সকালে, এই সুন্দর রোদ আর হাওয়ায়, তাঁর ছোট্ট বাগানটির এই স্নিগ্ধতার মধ্যে, ওই টুনটুনিটার খুশির ভেতরে—শিবপ্রসাদ সুখী হতে পারছিলেন না। নীলু বস্তির ছেলেদের চাইতে একটু ওপরে—কিন্তু কত দিন ? হাওয়ায় যেখানে মড়ক ছড়ায়, সেখানে কতক্ষণ নীলুকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন তিনি ? আজ যারা অন্ধ হিংসায় গন্ধ-রাজের পাপড়ি ছিঁড়ছে, সেইখানেই থেমে দাঁড়াবে তারা ? ইতিহাসের প্রতিশোধ নেই একটা ?

অথচ সেই রাত ! সেই পনেরোই আগস্ট ! স্বাধীনতা !

স্বা-ধী-ন-তা !

সারা ভারতবর্ষের কথা ভাবতে শিবপ্রসাদের উৎসাহ হয় না। হয়তো সুখ আর সমৃদ্ধির মাত্রা দিনের পর দিন উছলে উঠছে দিকে দিকে। কিন্তু বাংলা দেশকে এতবড় বঞ্চনা কেউ করেনি—কখনো না।

স্বপ্না এসে বলল, 'বাবা, তোমার চা।'

পাশের ছোট টিপয়টি টেনে চা রাখল।

শিবপ্রসাদ একবার মেয়ের দিকে তাকালেন। বিষণ্ণ, শান্ত চেহারা। দুই ছেলে, বড় ছেলের বউ এ বাড়ির এদের সকলের চেয়ে মেয়েটি আলাদা। কোনোদিন রাজনীতির কথা ভাবেনি, মা-বাবাকে ভালোবেসেছে, লেখাপড়া করতে চেয়েছে, বি. এ-টা পাস করে চাকরি জুটিয়েছে একটা, এখন প্রাইভেটে এম. এ. দেবার চেষ্টা করছে। স্ত্রী তো আনন্দ চলে যাওয়ার পরেই ভেঙে পড়েছিলেন, তারপর সুজাতা চলে যেতে এখন আদৌ স্বাভাবিক অবস্থায় আছেন কিনা বোঝা যায় না। অকারণে চিৎকার করে ওঠেন, অহেতুক ধৈর্য হারান, একা-একাই বসে কাঁদেন কখনো কখনো। স্বরাজের সঙ্গে কথা বলতেই ভরসা হয় না তাঁর। শুধু এই মেয়েটিই এর ভেতরে স্থির হয়ে আছে যথাসাধ্য, শুধু ওর কাছেই শিবপ্রসাদ যেন মনের আশ্রয় পান খানিকটা।

স্বপ্না বললে, 'খাবার আনি ?'

'অখন না। এট্টু পরে।'

স্বপ্না চলে যাচ্ছিল, শিবপ্রসাদ তাকে ডাকলেন।

'বস্। একটা কথা আছে।'

স্বপ্না একটা মোড়া নিয়ে বসে গেল বাবার পাশে।

'পড়াশুনা কেমন চল্‌তাছে ?'

'একরকম। তবে খালি নোট পইড়্যা কিছু হয় না।' স্বপ্না নিঃশ্বাস ফেলল : 'দুই-একদিন ইউনিভার্সিটির ক্লাস অ্যাটেন্ড করলে ভালো হইত। কিন্তু যামু কখন ? ইস্কুলে এত কাজের প্রেসার !'

'ইংরাজি হইলে আমি অল্প-স্বল্প হেল্‌প করতে পারতাম। কিন্তু ফিলসফি তো পড়ছি পাসকোর্সে, কিছুই জানি না।'

স্বপ্না বললে, 'দেখি, কী করন যায় ! পুজোর পরে না হয় দুই-চাইর দিন ছুটি নিয়া ইউনিভার্সিটিতে যামু।'

একটু চুপ। তারপর একবারের জন্যে কান খাড়া করলেন শিবপ্রসাদ। তেমনি

গুনগুন করে পড়ে যাচ্ছে নীলু।

প্রায় নিঃশব্দ গলায় শিবপ্রসাদ জিজ্ঞেস করলেন, 'নীলুরে কেমন বোঝতাছস্ অখন ?'

স্বপ্নার মুখে-চোখে ছায়া ঘনিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিতে পারল না।

শিবপ্রসাদ বললেন, 'রাত্তিরে আর কান্দে ?'

'না।' আবার নিঃশ্বাস ফেলল স্বপ্না : 'আমারে জড়াইয়া ধইর‍্যা রাখে সমস্ত রাত্তির। এট্টু পাশ ফিরনেরও জো নেই। কয়, পিসি, কই যাও ?'

ভয়। মা চলে গেছে, পাছে পিসিও চলে যায় সেই ভয়। শিবপ্রসাদ একবার নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরলেন। তারপর বললেন, 'অর মায় আর আইবো না—না ?'

'আইবো ঠিকই। কদ্দিন পোলাডারে ফালাইয়া থাকতে পারবো, বাবা ?'

সান্ত্বনা। শিবপ্রসাদ বিশ্বাস করেন না—স্বপ্নাও কি করে ?

'কিছুই কওন যায় না—' স্বগত-ভাষণের মতো শিবপ্রসাদ বললেন, 'অখন সমস্তই অন্য রকম হইয়া গেছে। আমাদের সময়ও ঘরের বৌ-ঝিরা যে পলিটিক্স্ করত না তা তো না। তখন ইংরাজ আছিল সকলের শত্রু। দল আছিল ঠিকই, কিন্তু অ্যাক্টা লক্ষ্যও মোটামুটি সকলের আছিল। অখন অনেক লক্ষ্য হইয়া গেছে—অখন স্বামী-স্ত্রীর পথও আলাদা হইয়া গেছে, অখন ঘরে ঘরে আমরা এ ওর শত্রু হইয়া উঠছি।'

স্বপ্না আনন্দ নয়, স্বরাজও নয়, এসব চিন্তার উত্তর তার জানা নেই। আবার নৈঃশব্দ্য ঘনিয়ে রইল কিছুক্ষণ।

আবার সান্ত্বনার জেরটাই টেনে আনল স্বপ্না।

'ক্যান্ এই সমস্ত ভাব্তাছ বাবা ? বৌদি আসবো—ঠিক ফির‍্যা আসবো।'

'হুঁ।'

কপালে ভ্রূকুটি ঘনিয়ে এল, শিবপ্রসাদ কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন সামনের দিকে। আকাশটা নিবিড় নীল। কয়েকটা নারকেল গাছ দুলছে হাওয়ায়। ডানা-মেলা নিশ্চিন্ত চিলের বিন্দু। কিছুই দরকার ছিল না, কিছুই না। সারাজীবনের টানা পরিশ্রম, দেশের কাজ, হেডমাস্টারী—সব কিছু মিটিয়ে, এখন দুই যোগ্য ছেলের হাতে সংসারের দায় তুলে দিয়ে আকাশের নীলে দু চোখ ডুবিয়ে বসে থাকতে পারতেন শিবপ্রসাদ। কিন্তু—

কিন্তু স্বাধীনতা! নইলে কেন এমন শূন্যতায় তলাবে স্বরাজ, কেন চলে যাবে সুজাতা, কেন এমন করে ঝড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে আনন্দ ?

পনেরোই অগস্টের ঋণ শোধ করতে হবে। অনেক—অনেক ঋণ।

সুজাতার কথায় আর একটা জিনিস মনে এল শিবপ্রসাদের। বিভ্রান্ত হয়ে প্রবীরের কাছে ছুটে গিয়েছিলেন তিনি। আবার ফিরে চাইলেন স্বপ্নার দিকে।

'এর মধ্যে প্রবীর আসছিল নাকি রে ?'

'ভুলুদা ? কই, না তো!'

'আমি তো বাইর-টাইর হইয়া যাই, আসে নাই ভুলু ?'

'না, দেখি নাই।'

'ও।'

তার মানে কোনো খবর নেই। কিছুই করতে পারেনি। নিজেকে ভারী ছোট মনে

হল। ওভাবে প্রবীরের কাছে সেদিন ছুটে না গেলেই ভালো করতেন, কিন্তু নীলুর ভাবনায় মাথাটা যেন কেমন গোলমাল হয়ে গিয়েছিল।

'প্রবীরদার কথা কইতাছ ক্যান ?'

'এমনেই। এ্যাকদিন গেছিলাম অদের ওইদিক। কইছিল, আইবো।'

'আসে নাই বাবা।'

প্রসঙ্গটা বদলে দেওয়া ভালো। স্নায়ুর ওপর চাপ পড়ছিল অতিরিক্ত।

'বাবা, তোমার অর্ধেক চা জুইড়য়া জল হইয়া গেল!'

'ভুইল্যা গেছিলাম।'

'আর এক কাপ কইর‍্যা আনি ?'

'অখন থাউক।' শিবপ্রসাদ একবার মেয়ের দিকে তাকালেন। তাঁর যা হওয়ার হোক, এই মেয়েটাকে এখান থেকে মুক্তি দিলে ভালো হয়। এ সংসার থেকে অন্তত একজন নিষ্কৃতি পাক, বেঁচে যাক সে।

'এ্যাট্টা কথা কই ? রাগ করবি না মা ?'

'কী কইতে আছো, বাবা ? রাগ করুম ক্যান ?' স্বপ্না চকিত হল।

'বসন্ত চাটুজ্যার মাইজ্যা পোলা এম. এস-সি. পাস কইর‍্যা কোন ফার্মে কেমিস্ট হইছে। পোলাডা ভালো। তর লগে মানাইবো। পাকেপ্রকারে চাটুজ্যা কাইল কথাডা কইতাছিল। আমি গা করি নাই, অখন ভাবতাছি—'

সাপের ছোবল পড়ার মতো চমকে উঠল স্বপ্না। শিবপ্রসাদ থেমে গেলেন।

'না বাবা, ওই সবে কাম নাই অখন।'

'কিন্তু বিয়া তো তর একটা দেওন লাগবো মা!'

'অখন থাউক বাবা।' স্বপ্নার মুখে রক্তের কণা জমতে লাগল, মাটিতে চোখ নামালো সে: 'এইসব নিয়া তুমি অখন কিছু ভাববা না। এই সমস্ত অশান্তির মধ্যে—'

'অশান্তি আছে, অশান্তি থাকবো। কিন্তু তর জীবনডা তো আমারে দেখতে হইবো।'

'আমার বিয়ায় কাম নাই বাবা। আমি খুব ভালোই আছি।'

সেই টুলু। শিবপ্রসাদের মাথার ভেতর দিয়ে যেন খানিকটা যন্ত্রণা ছুটে গেল: এখনো কি তার কথা ভুলতে পারেনি মেয়েটা ? এতদিন বাদে ? এত কাণ্ডের পরেও ? অথচ শুধু শিবপ্রসাদ কেন, এ বাড়ির প্রত্যেকে জানে, টুলু সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে, কতগুলো শয়তান ছেলের দলে ভিড়েছে, তার বদনামে কান পাতা যায় না. তার বাবার যাকে নিয়ে এত আশা ছিল, চূড়ান্ত অধঃপাতে নেমে গেছে সে।

স্বপ্না এখনো তার কথা ভাবে ? এখনো ?

প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করা যায় না। কিন্তু আর একটা উত্তর এল স্বপ্নার কাছ থেকে।

'অখন ওই সব ভাইবো না, বাবা। তাইলে মা আর বাচবো না, নীলু মইর‍্যা যাইবো।'

নীলু! তার মা-ই তার কথা ভাবল না, অথচ—। শিবপ্রসাদ কিছু একটা বলতে চাইছিলেন, এমন সময় ভেতর থেকে চটির আওয়াজ এগিয়ে এল। স্বরাজ।

বিনা ভূমিকায় স্বরাজ বললে, 'বাবা, তোমারে এট্টা কথা কই নাই।'

শ্বকনো, নীরস গলার স্বর। বাপ আর মেয়ের চোখ চকিতে ঘ্বরে গেল তার দিকে।

স্বরাজ দরজার একটা থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল শক্ত হয়ে। তেমনি নীরস ভঙ্গিতে বললে, 'আমারে ট্র্যান্সফার করছে কইলকাতা থিক্যা।'

'ট্র্যান্সফার!' একসঙ্গেই এই দ্বজনের চমক লাগল।

শিবপ্রসাদ বললেন, 'তর পোস্ট তো ট্র্যান্সফারেব্‌ল্‌ না।'

'অপ্‌শ্যন দেওন যায়।'

'তুই ইচ্ছা কইরা ট্র্যান্সফার নিতে আছস?'

স্বরাজ বললে, 'হ। কইলকাতায় আর থাকন যায় না। আর কিছ্বদিন এইখানে থাকলে আমার মাথাটা খারাপ হইয়া যাইবো।'

বাতাস স্তব্ধ হয়ে গেল কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে।

শিবপ্রসাদ বললেন, 'যাইতাছস্‌ কই?'

'কানপ্বরে।'

'কানপ্বরে?'

স্বরাজ খানিকটা তিক্ত হাসি হাসল: 'যাইতে পরে সকলেরই হইবো। এইখানে যা চলতাছে, অরা হেড্‌ অফিসও আর রাখব না—ফ্যাক্টরী তিনটারও ক্লোজার হইবো। আগেভাগে যাওনই ভালো।'

চমৎকার সম্ভাবনা। আনন্দ নেই, স্বরাজও চলল। তার মানে এখন সংসারের সব ভার বইবেন শিবপ্রসাদ, হাট-বাজার করবেন, অস্বস্থ উন্মাদপ্রায় স্ত্রীর মনোযন্ত্রণায় প্রতি ম্বহূর্তে একটু একটু করে জ্বলতে থাকবেন। রিটায়ার করবার পরে নীল আকাশের শান্তিতে ডুবে থাকবার কী অপ্বর্ব অবসর!

স্বপ্নার ঠোঁট কাঁপতে লাগল।

'আর মায়-বাবারে দেখবো কে?'

'ছ্বটিছাটায় তো আস্বম্‌ই। আর তুই তো আছসই।'

একটা চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করল স্বপ্নার: অপদার্থ, স্বার্থপর, কাওয়ার্ড! কিন্তু নিজেকে সামলে নিলে সে, ধ্যানী ব্বদ্ধের মতো নিঃশব্দে বসে রইলেন শিবপ্রসাদ, আর স্বপ্নার চোখ জ্বলতে লাগল।

স্বপ্না বললে, 'আর নীল্বর কী হইবো? তার দায় কে নিবো?'

স্বরাজের চোখেও এবার ছ্বরির শাণ পড়ল: 'ভয় নাই, সে আমি ঠিক কইর‍্যা ফ্যালাইছি। তার জন্য তোমাদের অস্ববিধায় পড়তে হইবো না। আমি তারে লইয়া যাম্ব।'

শিবপ্রসাদ বলে ফেললেন: 'তুই!'

'হ। আমার পোলার রেসপনসিবিলিটি আমারেই তো নিতে হইবো বাবা! তোমারে ক্যান-ট্যাক্স্‌ করম্ব?'

শিবপ্রসাদ চুপ করে রইলেন। স্বপ্না বললে, 'তুমি তারে নিয়া রাখবা কই?'

'যে কোনো একটা বোর্ডিংয়ে।'

স্বপ্না এবারে প্রায় চিৎকার করে উঠল: 'তোমার মাথা সত্যিই খারাপ হইয়া গেছে বড়দা। ওইটুকু বাচ্চা থাকতে পারবো বোর্ডিংয়ে?'

'পারবো।' স্বরাজ ঝাঁঝালো গলায় বললে, 'অর থিক্যা ছোট বাচ্চাও থাকে। কষ্ট হইবো প্রথম প্রথম, তারপর ঠিক হইয়া যাবো। এই বাংলা দেশে অরে আমি রাখ্‌মু না। এইখানে সব ডিশিন্নেটেড হইয়া গেছে।'

স্বপ্না আবার তীক্ষ্ণস্বরে কী বলতে যাচ্ছিল, শিবপ্রসাদ বাধা দিলেন। আশ্চর্য শান্তস্বরে বললেন, 'সেই ভালো। আমার পোলা দুইডারে আমি তো মানুষ করতে পারি নাই, তর পোলার ভার তুই-ই নে। লইয়া যা নীলুরে।'

স্বপ্না বললে, 'বাবা!'

শিবপ্রসাদ আচ্ছন্নের মতো চোখ বুজলেন। আবার বললেন, 'হ, তুই-ই লইয়া যা।'

পড়ার ঘর থেকে বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এল নীলু।

॥ কুড়ি ॥

টানতে টানতে প্রায় নিয়ে চলল মুকুল।

'ঘেরাওয়ের ফার্স—যুক্তফ্রন্ট! আর কেন হে ব্যানার্জি, এবার চলো এখান থেকে।'

'কোথায়?'

'কোথায় আবার কী—রাস্তায়! এর মধ্যেও অফিস করবার কথা ভাবছ নাকি?'

'না, অফিস আর কোথায়?'

প্রায় লক্ষ্যহীনভাবে চলা খানিকক্ষণ। ড্যালহাউসি পেরিয়ে, এস্‌প্ল্যানেডের দিকে। রোদ জ্বলছে মাথার ওপর। কিন্তু ধার নেই এখন। হাল্কা হাল্কা মেঘ ছায়া ফেলছে তার ওপর। মধ্যে মধ্যে যেন পথ ভুলেই আসছে উত্তরের হাওয়া, শীতের ছোঁয়াচ নেই তাতে—বাংলা দেশের অনিশ্চিত রাজনীতির ওপর বিষণ্ণ বসন্ত ছড়িয়ে পড়ছে।

চলতে চলতে মুকুল বললে, 'ভাবছি চাকরি ছেড়ে দেব।'

'কোনো একটা স্টেট লটারীর টাকা পেয়ে গেছ নাকি!'

মুকুলের গলার স্বর গাঢ় হল: 'না, ঠাট্টা নয়। চাকরি ছাড়ব।'

'ব্যবসা করবার ইচ্ছে হয়েছে?'

'ব্যানার্জি, বী সিরীয়স! এখন আর এভাবে বসে থাকবার সময় নেই। নাউ টু অ্যাক্‌শন! বিপ্লব এসে গেছে—আর দেরি করা চলবে না।'

প্রবীর আবার নতুন করে সজাগ হল।

'মুকুল, তুমি তা হলে—'

হ্যাঁ, তোমরা যাকে বলো নক্‌শালাইট।'

'কিন্তু দুদিন আগে পর্যন্ত সি-পি—'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মুকুল বলেল, 'আই-এম-এল এখন।'

'হঠাৎ এই দল-বদল কেন?'

মুকুল বললে, 'সহ্য করা যাচ্ছে না বলে। আসলে দেখতে পাচ্ছি সবটাই এক চক্রাবর্ত—একটা ভিশস্‌ সার্কল! একটা রুলিং পার্টি যাবে, আর একটা আসবে। আসলে সব ব্যুরোক্র্যাসির এক চেহারা। কোনটা চড়া লাল, কোনটা ফিকে লাল। সব এক সুরে বাঁধা—রঙ যেমনই হোক, চামড়ার তলায় সব সমান। নইলে ব্যাঙ্ক ন্যাশানালাইজ করেই

প্রোগ্রেসিভ হলেন তোমাদের প্রাইম মিনিস্টার আর জগজীবন রাম ? একেবারে বিপ্লবী ?'

মুকুলের ঠোঁট বিদ্রূপের হাসিতে ভরে গেল : 'তোমাদের অভিনন্দনের ঘটা দেখে মনে হচ্ছে সেন্ট্রাল ক্যাবিনেটে একেবারে ডিক্টেটরশীপ অব প্রোলেটারিয়্যাট চালু হয়ে গেল !'

তর্ক করা যেত, বলবার ছিল। কিন্তু আজ তিন মাস ধরে তর্ক করে করে এখন ক্লান্তি এসে গেছে। এখন সময়টাই আলাদা। তর্ক করে, যুক্তি দিয়ে কাউকে কিছুই আর বোঝাবার নেই। সহিষ্ণুতা থাকলেই নিজের কথা অন্যকে বোঝানো চলে, শোনবার উৎসাহ থাকলেই বলা যায়। কিন্তু এখন কেউ কারো কথা শুনতে চায় না, অন্যের যুক্তি শোনবার মতো ধৈর্য কারো নেই। এখন প্রত্যেক মানুষ নিজের বিশ্বাসের একটা দুর্ভেদ্য বৃত্তে স্থির হয়েছে—সব শোনা, সব বোঝা শেষ হয়ে গেছে সকলের। এখন রাজনীতি ধর্মের গোঁড়ামিকেও ছাড়িয়ে গেছে, যে তর্ক করে সে অবাঞ্ছিত, শুধু বিশ্বাসের পায়ে চোখ বুজে বসে থাকা ছাড়া কিছুই আর করবার নেই।

এই জন্যই প্রবীর তর্ক করল না। একটা কৌতূহল জাগল। এই পরম বিশ্বাস, একান্ত আনুগত্যের যুগেও মুকুল হঠাৎ দল-বদল করল কেন ? কলেজের ছাত্রদের না হয় বোঝা যায়, কিন্তু মুকুল তো তা নয়—সেই ছাত্র ফেডারেশনের সময় থেকে তো সে রাজনীতি করে আসছে।

'খুব অবাক লাগছে তোমার এই পরিবর্তন দেখে।'

মুকুল পকেট থেকে রেড বুক বের করল একটা।

'পড়েছ এইটে ?'

'পড়েছি বই কি।' প্রবীর হাসল : 'এই আন্দোলনটাকে আমি ঠিক মানতে পারি না, তাই বলে পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীর বাণী-সংগ্রহ পড়ব না ? তাঁর কথাগুলো তো কোনো দলের একচেটে নয়। বরং যে-কোনো বিপ্লবীর এ থেকে অনেক কিছু নেবার আছে। আমাদের আপত্তিটা প্রয়োগের প্রশ্নে।'

মুকুল বইটা আবার পকেটে পুরে ফেলল : 'ব্যানার্জি, ওই প্রয়োগের প্রশ্নটাই আসল। ফাঁকি দিয়ে এড়িয়ে যাবার রাস্তাই ওইটে। এখন সময় নয়, দেশকাল অনুকূল নেই, আমাদের প্রোব্লেমের চেহারা আলাদা—এসব কথা বলবার একটাই অর্থ আছে। আমাদের পেটিবুর্জোয়া লীডারশীপ আগুনের আঁচ বাঁচিয়ে বিপ্লব করতেই জানে, তাই তেলেঙ্গানা থেকে কোনো শিক্ষা নিতে পারল না, নিতে পারল না হাজং বিদ্রোহীদের কাছ থেকে, কলকাতায় এতগুলো আন্দোলনে এত রক্ত ঝরতে দেখে। মানে, বিপ্লবের আঁচে আগুন পোয়াতে চাই, কিন্তু নিজের ঘরের চালাটা ঠিক রাখতে হবে। এখন তো গদির সুখ মিলেছে—শোধনবাদ নয়া শোধনবাদ বিপ্লব আনবে এ স্বপ্ন যারা দেখছে, তাদের ঘুম ভাঙতে আর বেশি দেরি হবে না। আমরা অপেক্ষা করব না, কারণ লড়াই শুরু না করলে লড়াই শেষ করা যায় না।'

প্রবীর একটু চুপ করে থাকল। তার আনন্দকে মনে পড়ছিল। হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেল সে। কোথায় আছে এখন আনন্দ, কিভাবে আছে ? তার রিভলবারটা পড়ে রয়েছে প্রবীরের ড্রয়ারের ভেতর। কবে আসবে ফিরিয়ে নিতে ?

মুকুল বললে, 'ভাবছ কী ?'

'না, বিশেষ কিছু না।'

'কাম্ উইথ্ আস।'

প্রবীর বিষণ্ণভাবে বললে, 'এখন থাক। যদি সময় হয় দেখা যাবে।'

'সময়ের প্রশ্ন নেই। হয় আমাদের সঙ্গে আসবে, নইলে ঝড়ের মুখে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। শ্রীকাকুলামের কিছু জানো?'

'কাগজে খবর পড়ি। আর সাউথ ইস্টার্ণ রেলে যেতে ওড়িশা পেরিয়েই মাঝামাঝি একটা স্টেশন যেন দেখেছিলুম—শ্রীকাকুলাম রোড।'

'ঠিক। শ্রীকাকুলাম রোড। সারা ভারতবর্ষে ওই একটি রাস্তাই আছে। বিপ্লবের পথ।'

'বুঝেছি। কিন্তু চাকরি ছাড়বে কেন?'

'হোল টাইম ডিভোট করতে হবে।'

'এতই জরুরী?'

'নিশ্চয় জরুরী। নন্-কো-অপারেশ্যনের সেই ফার্স মনে আছে? দেশের লোকের মেরুদণ্ডটাকে দু-ভাঁজ করে দেবার, অহিংসার আফিং খাওয়ানোর সেই আশ্চর্য আন্দোলনটি? অথচ তাতেও দ্যাখো দেশ কীভাবে ত্যাগ স্বীকার করেছিল, স্কুল-কলেজ ভেঙে বেরিয়ে গিয়েছিল ছাত্রেরা, হাজার হাজার মানুষ চাকরি ছেড়েছিল, জেলে গিয়েছিল, লাঠি খেয়েছিল। আজ আমি চাকরি ছাড়তে চাইছি শুনে এত আশ্চর্য হচ্ছ কেন? নিছক মক ফাইটে'র জন্যে দেশ যদি এত বড় দাম দিতে পেরে থাকে, সত্যি-কারের বিপ্লবের জন্যে এটুকু আমি পারব না?'

অকাট্য যুক্তি। কিছু বলবার নেই।

'কী করবে?'

'পার্টি থেকে যেমন নির্দেশ আসে।'

'যদি গ্রামে যেতে বলে?'

'তাই যেতে হবে। আর কাজ তো এখন গ্রাম দিয়েই। বিপ্লবী কৃষকই শহর দখল করবে। কলকাতা-বোম্বাই-দিল্লী-মাদ্রাজ-কানপুর—ক্যাপিটালিস্টরা তাদের শেষ দুর্গে ধ্বংস হয়ে যাবে।'

পারলে ভালোই, প্রবীর ভাবল। কিন্তু ভারতবর্ষ কি কেবল অন্ধ্র, কেরল, বাংলাদেশ?

চলতে চলতে দুজনে কখন এস্প্ল্যানেড ইস্ট পার হয়ে ধর্মতলার মোড়ের দিকটায় এসে পড়েছিল। ট্র্যাফিক স্তব্ধ। নিশ্চল ট্রাম-বাস-মোটরের সার। একটা শোভাযাত্রা চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যু পার হয়ে এস্প্ল্যানেড গুমটির দিকে ঢুকছিল। শহীদ মিনারের নিচে সভা আছে একটা।

'ইন্কিলাব জিন্দাবাদ—'

'—পার্টি জিন্দাবাদ—'

'যুক্তফ্রন্ট ভাঙছে কারা?'

'— — —!'

ওদের ঠিক পাশ ঘেঁষেই যাচ্ছিল দলটা। মুকুল প্রামাণিক হঠাৎ বলে ফেলল:

'তোমরাই ভাঙছ, আবার কে ?'

সঙ্গে সঙ্গে তিন-চারটি ছেলে ফিরে দাঁড়াল।

'কী বললেন ?'

'পর্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ! সঙ্গে সঙ্গে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে মুকুলকে তিন হাত সরিয়ে নিলে প্রবীর। বেশি কিছু দরকার নেই, পাইকারী হারে কয়েকটি ঘুষি পড়লেই যথেষ্ট; কিংবা কয়েকটি ফেস্টুনের লাঠি নেমে এলেই একেবারে ছাতু করে দেবে। মুকুলকে আড়াল করে প্রবীর সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'কিছু না—কিছু না দাদারা, আপনারা যান।'

'কিছু বললেন না আপনারা ?'

'না—না, আমরা নই।'

'কী হয়েছে—কী হয়েছে রে ?' আরো কয়েকজন এসে দাঁড়ালো।

মুকুল বোধ হয় এগিয়ে আসবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু প্রাণপণে প্রবীর ঠেলে রাখল তাকে। মুকুল না হয় এখন অকুতোভয় সৈনিক, কিন্তু এভাবে জনতার হাতে শহীদ হতে বিন্দুমাত্রও উৎসাহ ছিল না প্রবীরের।

'আপনারা এগিয়ে যান—ভুল শুনেছেন।'

পেছন থেকে শোভাযাত্রার চাপ পড়ছিল, ছেলেরা আর দাঁড়ালো না। তবু যেতে যেতে একজন বলে গেল: 'মুখ সামলে কথা কইবেন, নইলে মুণ্ডু উড়িয়ে দেব।'

'ব্যাটারা—র দালাল—' আর একটি মন্তব্য।

ফাঁড়া কাটল। স্বস্তির শ্বাস ফেলে, মুকুলকে টানতে টানতে আরো খানিকটা সরিয়ে আনল প্রবীর।

'মাথা খারাপ নাকি তোমার ? কাণ্ডজ্ঞান নেই একটা ?'

'নির্ভাজ সত্যি কথা বলেছি।'

'সব সত্যিই সব সময়ে কিন্তু নিরাপদ নয়।'

'ওটা শোধনবাদী নয়া-শোধনবাদীরা বলে।'

'মানছি। কিন্তু দোহাই প্রামাণিক, বীরত্বটা দলবল জুটিয়ে কোরো। দেখতে পাচ্ছ, তিনদিক থেকে প্রোসেশ্যন আসছে এখন ? গায়ে হাত তোলবারও দরকার নেই, স্রেফ স্ট্যাম্পীড্ হলেই আমরা ধুলোয় মিলিয়ে যাব।'

মুকুল দাঁতে দাঁত ঘষল।

'একদিন ওদের সঙ্গেই আমাদের ফয়সালা করে নিতে হবে।'

'তা নিয়ো। কিন্তু ময়দানে র‍্যালীটা কি রকম হবে আন্দাজ করতে পারছ কি ? বরং চলো এখান থেকে।'

'চলো।' মেঘে-ঢাকা-মুখে মুকুল বললে, 'কিছু খাওয়া যাক্।'

'সামনেই তো কে. সি. দাশ।'

'না না,—মিষ্টিফিষ্টি নয়। মেট্রোর গলির ওদিকে চেনা পাঞ্জাবী দোকান আছে। ভালো তন্দুরী রুটি আর কাবাব করে। খরচ কম, পেটও ভরবে।'

'বেশ, তাই যাওয়া যাক্।'

তখনো রাস্তা বন্ধ—আর একটা শোভাযাত্রা ঢুকছে ধর্মতলা স্ট্রীট দিয়ে। রাস্তা পার

হয়ে—শোভাযাত্রাটার দিকে চোখ পড়তেই প্রবীর থমকে দাঁড়ালো।

প্রসেশ্যানের মুখে যে মেয়েরা রয়েছে, তাদের সঙ্গে কে ও? চলার ভঙ্গি ক্লান্ত, শেয়ালদা থেকে তো হেঁটেই আসছে। ওই বিবর্ণ মুখ, ওই পাতলা ফ্রেমের চশমা—সুজাতা বৌদি! অথচ ডাক্তার বলেছিল—

রবিবারে সাবিত্রী বারাসাত যাবে কথা ছিল। গিয়েছিল কিনা সে জানে না, দেখা করবার সময় পায়নি। এখন মনে হল, যাওয়ার কোনো দরকার নেই, গেলেও কোনো লাভ নেই।

এগিয়ে যাওয়া শোভাযাত্রা আর উত্তরোল স্লোগানের ভেতরে কোথায় হারিয়ে গেল সুজাতা। স্বরাজ ঠিকই বুঝেছিল, পথ আলাদা হয়ে গেছে, আর মিলবে না কোনোদিন।

বিরক্ত মুকুল বললে, 'কী, দাঁড়িয়ে গেলে কেন?'

প্রবীরের নিঃশ্বাস পড়ল।

'না, দাঁড়িয়ে কোনো লাভ নেই। এই সময় কাউকে দাঁড়াতে দেবে না।'

শহীদ মিনারের দিকটা পতাকায় লালে লাল। সেদিনও এই রঙ দেখলে বুকের মধ্যে সমুদ্র দুলত। কিন্তু এখন চোখ দুটো জ্বালা করছিল।

এই লালে এখন আর এক রঙ মিশেছে। আত্মীয়-বিদ্বেষের রঙ।

॥ একুশ ॥

মণীশদা এসেছিল ঘোষ সাহেবের কাছে। কী জরুরী আলোচনা চলছিল দুজনের। বিকেল পাঁচটা নাগাদ হাতের কাজ নামিয়ে টুলু বেরুতে যাচ্ছিল, মণীশদা বললে, 'একটু বোসো টুলু, তোমায় লিফ্‌ট্ দেব।'

মন্দ কী, বারো আনা রাস্তার বাসের ঝাঁকুনি বেঁচে যায়, কটা পয়সাও। পার্টিশনের ওপার থেকে ওঁদের কথা কানে আসছিল, কোন্ এক কারখানা, ফ্যাক্টরী আইন, লক-আউট, কোম্পানীর লিকুইডেশনে যাওয়া—এসব নিয়ে খুব বিব্রত আর উত্তেজিত ছিলেন দুজন।

'ওদের ইউনিয়নের অন্ততঃ জনতিনেক পাৰ্চেজেবল্—' ঘোষ সাহেব বলছিলেন।

'কিন্তু সাহসে কুলোবে না—' মণীশদা বলছিল, 'যেরকম আগুন হয়ে আছে লেবার! একটু আঁচ পেলে একেবারে জ্যান্তে কবর দিয়ে দেবে।'

'ওরা আজকাল কবর দেওয়াটা খুব পছন্দ করছে।' ঘোষ সাহেব ঠাট্টা করছিলেন: 'সব সময় বলছে, এই মাটিতে কবর দিন। কিন্তু হিন্দুরা তো কবরে যেতে আপত্তি করতে পারে!'

'সে ব্যবস্থাও আছে। পুড়িয়ে মারো পুড়িয়ে মারো—এটাও খুব ফেবারিট্ স্লোগান।'

এসব টুলু শুনছিল, শুনছিল না। বাইরের রাস্তায় গাড়ির আওয়াজ বাড়ছিল ক্রমশ, এখন সব ঘরে ফেরবার তাড়া। আর ঘণ্টা দেড়-দুই বাদে এমন ব্যতিব্যস্ত হাইকোর্ট-পাড়া একেবারে ঝিমিয়ে যাবে। তার এদিকের জানলা দিয়ে বিশাল লাল বাড়িটার

যেটুকু দেখা যায়, তার ওপর এখন ছায়া ঘন হচ্ছে। এ ঘরে আলো সারাদিন জ্বলেই—দুপুরে তার অস্তিত্ব ভালো করে টের পাওয়া যায় না, কিন্তু সেই আলোটা টেবিলের তলায়, আলমারির কোণায়, র‍্যাকের আশেপাশে ছায়ার ছক কাটছে এখন। বেলা একটু একটু করে পড়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে ধুলো, কাগজ আর ক্লান্তির গন্ধে ভরে উঠেছে ঘরটা।

মণীশদার কথা চলছে—চলছেই। টুলুর হাই উঠতে লাগল অবসাদে। বেরিয়ে বাস ধরলে এতক্ষণে ভবানীপুরে পেঁৗছে যেত সে। কিন্তু মণীশদা বসতে বলেছে। বসাই যাক্।

উঠে টাইপরাইটারটার সামনে গিয়ে বসল। অল্প অল্প শিখছে, সামান্য স্পীডও আসছে। উৎসাহটা এ-সময়ে একটু বেশিই থাকে। হাতের আঙুলগুলো এখনো সেট হয়নি, প্রায়ই দেখে দেখে টেপাটিপি করতে হয়।

বাঁকা চোখে তাকিয়ে হেড ক্লার্ক মধ্যে মধ্যে বলেন, 'মেশিনটার বারোটা তো তুমিই বাজাবে দেখছি! দয়া করে ভেঙো না—এখন আবার রেমিংটন কোম্পানীতে গণ্ডগোল যাচ্ছে।'

হেড ক্লার্ক বেরিয়ে গেছেন, এই সুযোগ। টুলু মেশিনে কাগজ চাপিয়ে যা খুশি টাইপ করতে লাগল।

এস-ডাবলু-এ-পি-এন-এ, এস-ডারু-এ—

স্বপ্না!

টুলুর আঙুল থেমে গেল। ঘুরেফিরে ওই নামটা। এই পাঁচ-সাতটা বছর তো বেশ ছিল, আড্ডা মেরে, ইয়ার্কি দিয়ে, বখামো করে চমৎকার কেটেছে। তখন কিছুই মনে পড়ত না। বাড়ি ফিরলে দাদা চ্যাঁচামেচি করত এক-একদিন, মা কাঁদত—কিছুই আসত-যেত না। স্বপ্না কোথাও ছিল না, কোনো স্বপ্নের মধ্যেও না। কিন্তু তারপরে দিদির পাল্লায় পড়বার আগে সেই হাজত—একজন কনস্টেবল কয়েকটা থাপ্পড় মেরেছিল, দারোগা দুটো লাথি বসিয়েছিলেন—আর হাজতের সেই দুর্গন্ধ। মার খেয়ে ফ্যাক-ফ্যাক করে হেসেছিল কার্তিক, ফণী গোঁ-গোঁ করে বলেছিল, 'শালাদের একবার রাস্তায় জুৎমতো পেলে—' আর লজ্জায়, দুঃখে, অপমানে টুলু সারারাত ঘুমোতে পারেনি। যত কামড়েছে মশায়, মনের ভেতরটা জ্বলেছে তার চাইতেও বেশি।

দাদা ছাড়িয়ে আনল মুরারি হালদারকে ধরে। এমন সময় দিদি। নিজের মধ্যে একটা কিছু ঘটে গিয়েছিল নিশ্চয়, না হলে হঠাৎ এমন ভালো ছেলে হওয়ার সুবুদ্ধি জাগল কেন তার? আর তখন স্বপ্না ফিরল।

স্বপ্না ফিরল।

এই মেয়েটা তাকে ভালোবেসে ফেলেছিল। সেই ছেলেবেলার ভালোবাসার যদি মানে থাকে কোনো। কবে কথাটা প্রথম জানা গিয়েছিল—কবে?

…ইস, তুমি কী ভালো অংক কষতে পারো টুলুদা! কত তাড়াতাড়ি!

'অংক তো ভালো করেই শিখতে হবে। নিখুঁত চুলচেরা হিসেব জানা চাই, যন্ত্রপাতি চেনা চাই। না হলে তো একেবারে সোজা ক্র্যাশ—দারুণ অ্যাক্সিডেন্ট।'

'সে কি! কিসের ক্র্যাশ? কিসের অ্যাক্সিডেন্ট?'

'বা রে, আই. এস-সি. পাস করে আমি পাইলট হবো যে। জানিস স্বপ্না, দমদমে

একটা এক্‌জিবিশন করেছিল একবার, আমি দেখতে গিয়েছিলুম। এরোপ্লেনের এগ্‌জিবিশন। মানে ঠিক এরোপ্লেন নয়—নানা রকম প্লেনের এঞ্জিন, তার যন্ত্রটন্ত্র সব দেখিয়েছিল। কত যে সব সূক্ষ্ম ব্যাপার না—দেখলে তোর মাথা একেবারে ঘুরে যেত। সেই দেখেই তো আমার মনে হল যে, আমাকে পাইলট হতে হবে। আর অঙ্কে মাথা না থাকলে, সব হিসেব করে, বুঝে প্লেন না চালাতে পারলে, ব্যাস্‌—হয়ে গেল !'

'না টুলুদা, না। তোমার পাইলট হয়ে কাজ নেই।'

'কেন রে, কত সম্মানের কাজ। তা ছাড়া ভেবে দ্যাখ্‌—কিরকম থ্রিলিং ! মেঘের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছি—পায়ের তলায় পড়ে থাকছে নদী-পাহাড়-সমুদ্র—বোঁ করে দেখতে দেখতে ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে একেবারে লণ্ডনে পেঁৗছে গেলুম।'

'যেতে হবে না তোমার লণ্ডনে, প্লেন চালিয়ে।'

'তবে কী করব ?'

'কেন, ডাক্তার হবে, এন্‌জিনীয়র হবে, আরো কত কী হতে পারো।'

'আরে, ঠিকমতো চালাতে পারলে অ্যাক্‌সিডেণ্ট হবে কেন ? আর কত লোকই তো পাইলট হয়।'

'হোক গে। তুমি চালাতে যাও না প্লেন, তার আগে আমি মরে যাব।'

'তুই মরে যাবি কেন ?'

'আমি—আমি যে—'

বাকিটা চোখের জলে মিলিয়ে গেল তারপর।···

টুলু টাইপ করা কাগজটার দিকে চেয়ে রইল। এস-ডব্লু-এ—স্বপ্না। না, এখনো যে সব সময়ে ভাবছে স্বপ্নার কথা তা নয়। কিন্তু কোথায় জড়িয়ে গেছে মনের ভেতর, একটা সুরের মতন ঝিনঝিন করে বুকের মাঝখানে কাঁপতে থাকে কখনো কখনো। আর বিশেষ করে সেদিন, সেই কার্তিক আর তার দলবলের হাতে পড়বার সময়—

মণীশদা ডাকল : 'টুলু, চলো।'

'আসছি মণীশদা।'

মেশিনটা বন্ধ করে টুলু উঠল। টাইপ করা কাগজটাকে ছিঁড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছিল, কী ভেবে ভাঁজ করে নিলে নিজের পকেটে।

ঘোষ সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই মণীশদা নামল, টুলু মণীশদার ফোলিয়ো ব্যাগটা হাতে টেনে নিয়ে পিছে পিছে চলল। এখানে আর মণীশদা তার ভগ্নীপতি নয়—তার মনিবের বন্ধু। এখানে মণীশদাকে আলাদা সম্মান করা উচিত, সে সঙ্গে থাকতে ভারী ব্যাগটা তাকে বইতে দেওয়া যায় না।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে ঘোষ সাহেব নিজের গাড়ির দিকে এগোলেন, মণীশদার সঙ্গে টুলু উঠল তার গাড়িতে। কিছুক্ষণ ব্যাজার মুখে চুপ করে মণীশদা স্বগতোক্তি করল : 'আ—দিস লেবার-ট্রাব্‌ল ! বাংলা দেশে একটা ইণ্ডাস্ট্রিও আর থাকবে না।'

টুলু চুপ করে থাকল। তার কিছু বলবার নেই। এসব ভাবনার ভার সে বইতে পারে না—ওগুলো দাদার এক্তিয়ারে। লেবারের জন্যে কোনো মাথাব্যথা নেই তার।

'লেবার মুভমেণ্ট নয়—স্রেফ ইউনিয়নবাজি। চমৎকার হয়েছে এই যুক্তফ্রণ্ট সরকার !

যুক্তফ্রণ্ট মানেই চোদ্দ দলের লাঠিবাজি। যেমন করে হোক নিজের পার্টি বাড়াতে হবে। ইণ্ডাস্ট্রির অবস্থা বোঝবার দরকার নেই, ডিম্যাণ্ড কতটা রিজনেবল—শেষ পর্যন্ত কোম্পানীই উঠে যাবে কিনা সে-সব ভাবনাও নেই—স্ট্রাইক কল দিতে পারলেই পপুলারিটি! ইম্‌পসিবল! দিস প্রভিন্স অব ওয়েস্ট বেঙ্গল ইজ ডুম্‌ড্‌!'

টুলু তেমনি চুপ করে রইল।

মণীশদা একটা সিগারেট ধরিয়ে ভুরু কুঁচকে চেয়ে থাকল বাইরের দিকে। ময়দানে শহীদ মিনারের নিচে বিরাট জনসভা। চৌরঙ্গীর ট্র্যাফিক চলছে, তার আওয়াজ ছাপিয়েও মাইকের গর্জন কানে আসে।

'সেই বিশ্বাসঘাতকদের চিনে নিন কমরেডরা—যারা প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে—'

মণীশদা বিষ-ছড়ানো-গলায় বললে, 'হুঃ, তোমরাই কেবল সিজার্স' ওয়াইফ—বাকি সবাই বিশ্বাসঘাতক!'

গাড়ি চলল। পার্ক স্ট্রীট ছাড়াতে ট্র্যাফিক হাল্কা হয়ে আসছে। বাতাসে দক্ষিণের অজস্রতা। ঝরা পাতা উড়ে উড়ে আসছে পথের ওপর।

একটু চুপ করে থেকে মণীশদা বললে, 'কাজকর্ম কেমন চলছে?'

'ভালোই।'

'শিখে নিচ্ছ তো?'

'যতটা পারি।'

'যদি এক-আধটা পরীক্ষাও দিতে, তা হলে অনেক বেটার জায়গায় দেওয়া যেত তোমাকে। আজকাল এসব কোয়ালিফিকেশনে বেয়ারার কাজও জোটে না। নেহাত ঘোষ আমার বন্ধু বলেই—'

অপমানের একটা কাঁটা টের পেলো টুলু। ঠিক কথা, মণীশদার অনুগ্রহের সীমা নেই। কিন্তু অনুগ্রহ যিনি করেন, বার বার সেটা তিনি মনে করিয়ে দিলে ভালো লাগে না, কেমন বিস্বাদ হয়ে যায় সব। তখন বলতে ইচ্ছে করে—দরকার নেই আপনার দয়ায়, ওটা বরং ফিরিয়েই নিন আপনি।

কিন্তু বলা যায় না সেকথা। মণীশদা এ নিয়ে বোধ হয় বার-সাতেক তাকে মনে করিয়ে দিল, তবুও বলা যায় না। টুলু এখন জীবনকে বদলাতে চাইছে; এখন সাত বছরের সমস্ত অপচয়গুলোকে তার মুছে ফেলা দরকার; এখন আবার রক্তের ভেতরে সুর তুলেছে স্বপ্না, অল্প বয়সে, বয়ে যাওয়ার আগে যে সুরটা তার মনকে খানিক নেশার মধ্যে তলিয়ে রাখত।

টুলু একবার ঠোঁট চাটল।

'আমি প্রাইভেটে পাস করবার কথা ভাবছি মণীশদা।'

'তাই নাকি?'

'ইচ্ছে আছে শীগগিরই পড়াশোনাটা আরম্ভ করে দেব।'

ইচ্ছে নিশ্চয়ই আছে, তবু এখনো কোচিং ক্লাসে ভর্তি হওয়া গেল ন। অথচ যাওয়া-আসার রাস্তার ধারেই তো কটা টিউটোরিয়াল হোম পড়ে। কী যে হচ্ছে, কোনো-মতেই আর সময় পাওয়া যাচ্ছে না!

মণীশ সামান্য একটু হাসল। অবিশ্বাসের হাসি।

'সে তো খুব ভালো কথা। কিন্তু পড়াশুনোর এনার্জি আছে এখনো? যে দলে মিশেছিলে!'

'এনার্জি আমার আছে মণীশদা। তবে অফিসে কাজের যা চাপ—'

মণীশ টুলুর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো। হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠল মুখটা।

'পরিশ্রম না করলে মাইনে দেবে কেন তোমাকে? আর পরিশ্রম না করা ছাড়া কোন্ যোগ্যতা তোমার আছে?'

আবার সেই অপমানের আঘাত।

খিদেয় ক্লান্তিতে শরীর যেন ভেঙে আসতে চাইছিল, একরাশ তীক্ষ্ণ বিরক্তি মনের ভেতর দিয়ে বয়ে গেল টুলুর। বলতে ইচ্ছে করল: 'বার বার শোনাচ্ছেন কেন ওভাবে, গাধার মতো খাটুনি আর হেড ক্লার্কের সারাদিন দাঁতখিঁচুনির পরে ওই মাইনের মুষ্টি-ভিক্ষা আমি চাই না। কাল থেকেই দেব ঘোষ সাহেবের চাকরি ছেড়ে।'

কিন্তু, এখনো, এত অসহ্য হলেও বলা যায় না। জীবনটা বদলাতে হবে তাকে। স্বপ্না এখনো তাকে মনে রেখেছে। স্বপ্নার জন্যেই তৈরি হতে হবে তাকে।

নেবা গলায় টুলু বললে, 'তা ঠিক।'

মণীশদা তেমনি শক্ত ভঙ্গিতে বললে, 'কাজ করো, কাজ। খাটো। এসব কমপ্লেন কখনো তুলো না। আর মনে রেখো ঘোষ নেহাৎ মার্সি গ্রাউণ্ডেই তোমায় চাকরি দিয়েছে, আমার রিলেটিভ না হলে—'

টুলু আর কথা বলল না, কেবল একটা হাতের মুঠো তার শক্ত করে সীটটাকে আঁকড়ে রাখল। মণীশদার গাড়িতে ইহজীবনে আর কখনো লিফ্‌ট্ নেবে না সে। এর চাইতে বোঝাই বাসের পা-দানীতে প্রাণ হাতে করে ঝুলতে ঝুলতে যাওয়া অনেক ভালো।

আর অ্যাটর্নি অফিসের এই চাকরি ছাড়া ভদ্র জীবিকার আর কি পথ নেই কোনো? এর চাইতে রাস্তার মোড়ে মোড়ে খবরের কাগজ বিক্রি করলে কেমন হয়?

মণীশ বলছিল, 'গোটা বাঙালী জাতটাই যা হয়েছে—পরিশ্রম করতে হলেই—'

জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল টুলু। গলার ভেতরটা যেন কেমন পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে, তার কান্না পাচ্ছিল।

গাড়িটা বাড়ির সামনে পেঁছোনোর অপেক্ষা মাত্র। প্রায় ছুটতে ছুটতে নেমে এল দিদি। একেবারে পাগলের মতো চেহারা।

অদ্ভুত স্বরে দিদি বললে, 'তুমি ছিলে কোথায়? তোমার অফিসে তিনবার ফোন করেছি, কোথায় গিয়েছিলে তুমি?'

টুলু আগেই নেমে যেতে চেয়েছিল, মণীশদা বলেছিল, 'তোমার দিদির ওখান থেকে চা খেয়ে যাবে।' কিন্তু এখন আর চা খাওয়ার প্রশ্ন নয়—ভয়ে থমকে গেল দুজনে।

মণীশদা কাঁপা গলায় বললে, 'আমি ঘোষের অফিসে গিয়েছিলুম, কাজ ছিল। কিন্তু ব্যাপার কী? অমন করছ কেন উমা?'

দিদি এবার চিৎকার করে কেঁদে উঠল।

'টিনটিনকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

অন্য ফ্ল্যাটগুলো থেকে অনেকগুলো মুখ উঁকি মেরেছে তখন।

মণীশ আর টুলু পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। সাদা হয়ে গেল মণীশের মুখ, থর থর করে কাঁপতে লাগল ঠোঁট।

'কী বলছ তুমি? পাওয়া যাচ্ছে না মানে?'

'পাওয়া যাচ্ছে না—স্কুল থেকে সে ফেরেনি। স্কুলে নেই, তার বন্ধুদের বাড়ি কোথাও যায়নি।' উমা কাঁদতে কাঁদতে বসে পড়ল মাটির ওপর: 'ওগো, কোথায় গেল আমার মেয়ে—ফিরিয়ে আনো—যেখান থেকে পারো নিয়ে এসো তাকে—'

দিদি এখন সম্পূর্ণ অন্যরকম। অবিকল আরো দশজন বাঙালী মেয়ের মতো ভুকরে ভুকরে কাঁদতে লাগল: 'ফিরিয়ে আনো, আমার টিনটিনকে ফিরিয়ে আনো—'

॥ বাইশ ॥

সাবিত্রী বললে, 'কী হল, মুখের চেহারা ও-রকম কেন?'

'এক গ্লাস জল দাও, তারপরে বলছি।'

'চা খাবে?'

'না—দরকার নেই। মুকুলের পাল্লায় পড়ে বড় এক পেয়ালা গ্রীন টী খেয়েছি। চায়ে উৎসাহ নেই আর। জলই আনো।'

জল নিয়ে এল সাবিত্রী। এক চুমুকে শেষ করল গ্লাসটা।

'কী হয়েছে তোমার?' একটা স্নিগ্ধ উৎকণ্ঠা নিয়ে সাবিত্রী প্রবীরের দিকে চাইল।

'বলছি। তুমি কখন ফিরেছ কলেজ থেকে?'

'আজ ক্লাস হয়নি। স্ট্রাইক করেছে মেয়েরা।'

'কিসের স্ট্রাইক?'

'ওদের ইউনিয়নের দুজন লীডারকে কলেজ থেকে টি-সি নিতে বলা হয়েছে, তারই প্রতিবাদে।' সাবিত্রী একটু হাসল।

'বুঝেছি। কিন্তু এই দুটি মেয়েকে কলেজ থেকে সরিয়ে দেওয়া কি এতই জরুরী?'

'গভর্নিং বডি মনে করে এরাই ট্রাবল্-মেকার। আমি অবশ্য স্টাফ রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে আছি গভর্নিং বডিতে। আমি বলেছিলুম, এখনি এসব ড্রাসটিক অ্যাকশন নিয়ে লাভ নেই, বরং অন্যভাবে—কিন্তু ও'রা রাজী হলেন না। বললেন, মেয়ে দুটো অত্যন্ত উদ্ধত—ওদের কিছুতেই রাখা চলবে না।'

'তা হলে স্ট্রাইক এখন চলতে থাকবে?'

'খুব সম্ভব।'

'সময়টাই ওদের উদ্ধত করে তুলছে—ওদের দোষ নেই। সেই সঙ্গে যদি তোমরাও অসহিষ্ণু হও, তা হলে জটটা আরো পাকাবে—খুলবে না।'

সাবিত্রী বললে, 'কী করা যাবে, বলো। ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে যারা স্কুল-কলেজ থেকে পাস করে গেছেন, তাঁদের চোখে সেই সময়ের ইমেজটাই ভাসছে। টীচার আর স্টুডেন্টের ভেতরে তাঁরা সেই ভয় আর শ্রদ্ধার সম্পর্কটুকুই আশা করছেন এখনো।'

'ভয়ের কথা জানি না, কিন্তু শ্রদ্ধাটা এখনো থাকতে বাধা নেই। মুশকিল হল,

দু'পক্ষ দুটো যুগের মধ্যে দাঁড়িয়ে। তোমরা যারা পড়াও—তারা একটু বেশি করে যদি ওদের চিনতে চাও—'

'খুব বেশি সরল করে ফেললে প্রবীর। সব কিছুর মূলটা যে কোথায় সে তুমিও জানো, আমিও জানি। দেশ-সমাজ-জীবন—সব কিছু যে হতাশা আর অনিশ্চয়তায় পাক খাচ্ছে, তাকে একটা উজ্জ্বল লক্ষ্যে যদি তুলে ধরতে না পারি, তা হলে এর শেষ কোথাও নেই।' সাবিত্রী একটা নিঃশ্বাস ফেলল: 'জানো একসময় আমি ভেবেছি—এখনো ভাবি ছাত্র-রাজনীতি কেন তার নিজস্ব পথ ধরে এগোয় না—কেন সব সময় পার্টি-পলিটিকসে জড়িয়ে যায়? কিন্তু তারপরেই দেখি—আজ পার্টি-পলিটিকস্ ছাড়া আর কী আছে বাংলা দেশে? সব লেফ্‌ট-পার্টিগুলোর ইডিয়োলজীর দিকে তাকাও—নিছক কতগুলো থিয়োরীর পার্থক্য ছাড়া আর সেগুলো এখন শেল্‌ফে তুলে রাখলেও দেশের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই—প্রত্যেকে যা চাইছে, তার মধ্যে তফাৎ কোথায়? অথচ পার্টি বাঁচাতে কিংবা বাড়াতে হয়, নেতারা তাঁদের মহিমায় ডিসটিংটিভ থাকতে চান, অতএব যেখানে সাধারণ ঐক্যে এক বছরে দশ বছর এগিয়ে যাওয়া যেত—সেখানে তাঁরা ক্যাডারদের খেপিয়ে দেন—পঁচিশ বছরের চেষ্টা পঞ্চাশ বছর পেছিয়ে যায়, লেবার-কৃষক-ছাত্র সিভিল ওয়রের আবহাওয়া তৈরি করে।' সাবিত্রী একটু চুপ করল: 'প্রবীর, একটা অদ্ভুত সময়ের মধ্যে বাস করছি আমরা, সবচেয়ে বড় সুযোগ যখন এল, তখন সেই সুযোগটাকে আমরা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলছি। ছেলেমেয়েদের দোষ দিয়ে কী করব—ওরা তো সময়ের বাইরে নয়।'

একটু চুপ। তারপর সাবিত্রী অপ্রস্তুতের মতো হাসল।

'যাক গে, এসব থাকুক এখন। আমি তো একেবারে চুপ করেই থাকব ভাবি, তবু মধ্যে মধ্যে এমন অস্বস্তি লাগে যে—কিন্তু তোমার কথা বলো। মুখ দেখে মনে হচ্ছে, মেজাজ ভালো নেই।'

সাবিত্রীর কথাগুলো প্রবীরের ভাবনাটাকে আবার একটা বিরস দিকে সরিয়ে নিয়েছিল, কাগজে অজয় মুখোপাধ্যায় এবং জ্যোতি বসুর বিবৃতি পাল্টা-বিবৃতির বিস্বাদ অনুভূতিটা জাগিয়ে তুলছিল। মুখ্য এবং উপমুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্য কোন্দলে গলা চড়াচ্ছেন—কী রমণীয় যুক্তফ্রন্টের চেহারা! ওদিকে আর এক নেতা দিনক্ষণ গুনে ঘোষণা করছেন কবে এই মন্ত্রিত্বের বারোটা বাজবে। খাসা চলছে!

আর শ্রমিক ঝরাচ্ছে শ্রমিকের রক্ত, কৃষক কৃষকের ঘরে আগুন দিচ্ছে। আমরা দায়ী নই—ওরা। ওরা কারা? প্রতিবিপ্লবী? তা ছাড়া আর কী—আলাদা পার্টি যখন!

সাবিত্রীর কথায় প্রবীর জোর করে নিজেকে ছিনিয়ে আনল মানসিক অবসাদ থেকে।

'তুমি বারাসাতে গিয়েছিলে?'

একটা ছায়া পড়ল সাবিত্রীর মুখে।

'গিয়েছিলুম। কিছু করা যায়নি। ভেবেছিলুম, অফিসে ফোন করে তোমায় খবর দেব, কিন্তু কেমন লজ্জা করল। সুজাতা আর ফিরতে চায় না। স্বরাজদার নাম শুনলেই জ্বলে ওঠে। বলে, এবার ভালো দেখে স্বরাজদা আর একটা বিয়ে করুক, এতটুকুও আপত্তি নেই তার।'

'এত অভিমান?'

'অভিমান ?' সাবিত্রী কপাল কু'চকে অন্যমনস্ক ভাবে চেয়ে রইল : 'ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'দশ বছরের সম্পর্ক মুছে যায় এত সহজে ? স্বামী-স্ত্রীর ?'

'ভাঙনটা খুব আস্তে আস্তে শুরু হয়, প্রবীর। তখন বুঝতে পারা যায় না, কিন্তু তারপর একদিন একসঙ্গে নেমে আসে। তা ছাড়া—' সাবিত্রী যেন নিজের সঙ্গে কথা বলে চলল : 'তা ছাড়া সুজাতা যে স্বরাজদাকে ভালোবেসেছিল, সেখানে স্বরাজদার আর একটা ইমেজ ছিল। আজকের রাজনীতিতে স্বরাজদা এমন করে ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে গেছে বলেই এমন বিশ্রী হয়ে এসেছে ভাঙনটা।'

'স্বরাজ যদি যে-কোনো একজন মানুষ হত—'

'আর সুজাতার যদি কোনো পলিটিক্যাল কন্‌ভিক্‌শান্ না থাকত। কোথাও বাধত না ভুল্—ওদের জীবনটা চমৎকার এগিয়ে যেত।'

হয়তো তাই, হয়তো তা নয়। একালে আমাদের মনগুলো অতিমাত্রায় আত্মসচেতন। আসলে আগেকার মতো স্ত্রী, বন্ধু, আত্মীয়—কাউকেই আমরা সবটুকু দিয়ে ফেলতে পারি না—অনেকখানিই নিজেদের জন্যে রেখে দিতে হয়। সেই বাড়তি জায়গাটুকুতেই কখনো কখনো কাঁটাবন জন্ম নেয়। যাদের আমরা খুব স্বাভাবিক বলে জানি, তারা কি সত্যিই স্বাভাবিক ? সবটা ?

প্রবীর সাবিত্রীর দিকে তাকালো। চোখ দুটো ক্লান্ত। সুজাতার কথাই ভাবছে বোধ হয়।

সাবিত্রী বললে, 'কিন্তু তোমার কথা তো বললে না ?'

'আজ ময়দানে ওদের পার্টির ম্যামথ্ গ্যাদারিং ছিল একটা। সেখানে সুজাতা বৌদিকে দেখলুম।'

'তাই নাকি ?'

'একটা মিছিলের সঙ্গে আসছিল।'

'দেখা হল তোমার সঙ্গে ?' একটু উত্তেজিত হল সাবিত্রী : 'কিছু বললে ?'

'দূর থেকে দেখেছি। তা ছাড়া সঙ্গে ছিল মুকুল—সে নক্‌শালাইট্—এমন একটা কমেণ্ট্ করে বসল যে আর একটু হলে মার খেয়ে হাসপাতালে যেতে হত। তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিতে হল ওকে।'

'তা হলে আবার পুরো পলিটিকসে নামল সুজাতা !'

'হ্যাঁ, ফেরবার পথটা বন্ধ করে দিলে চিরকালের মতো।'

'কিংবা এইটেই ওর দরকার ছিল। এখন নিজেকে কাজের মধ্যে ভুলিয়ে না দিলে নীলুকে ও ভুলতে পারবে না।'

'নীলুর জন্যে টান ওর আছে নাকি ?'

'সেইটে ছিল বলেই হয়তো এতদিন ওখানে থাকতে পেরেছে। কিন্তু আর সইল না।'

প্রবীর আবার চুপ করে গেল। দাম দিতে হয়—নিশ্চয়। কিছু না দিয়ে বিপ্লবের সৈনিক হওয়া যায় না—নিজের নাড়ী পর্যন্ত ছিঁড়ে দিতে হয় কখনো কখনো। আজ সুজাতাকেও এইভাবেই ছেড়ে যেতে হয়েছে নীলুকে। কিন্তু এই মূল্য কোথায় গিয়ে পৌঁছচ্ছে শেষ পর্যন্ত ? ময়দানে যারা বিপ্লবের ডাক দিচ্ছিলেন, তাঁরা কতটা সংগ্রামের

কথা বলছিলেন, কতখানিই বা বিদ্বেষের ?

'সাবিত্রী !'

'কী ?'

'ভাবছি, ভাগ্য ভালো যে সাহস করে কখনো বলিনি যে আমার মতো একজন সাধারণ কেরানীকে তুমি বিয়ে করে ফেলো।' সাবিত্রীর গাল লাল হয়ে উঠল।

'এতই ভয় আমাকে ?'

'ভয় তোমাকে নয়—সময়কে।' সাবিত্রীর হাতটা আবার মুঠোর মধ্যে টেনে আনল প্রবীর : 'এই যা, তোমার আঙুলে আবার ব্যথা দিলুম নাকি ?'

'না, ওটা সেরে গেছে।' সাবিত্রীর চোখের দৃষ্টি ঘন হয়ে এল : 'কিন্তু কাকে ভয় করো বললে ?'

'সময়কে। জানো—' প্রবীরের মুঠোটা আরো শক্ত হতে লাগল : 'সময়টাকে আমরা যত বেশি আশা-আনন্দ-ভবিষ্যৎ—ভালোবাসা দিয়ে গড়ে তুলতে চাইছি ততই সে ভেঙে যাচ্ছে, হাত থেকে ছড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে। একটা স্রোতের টানে আমরা ভাসছি—যেটাকে মনে হয়েছিল অনুকূল, ঠিক এইবারে একটা নিশ্চিত আর শক্ত ডাঙায় পৌঁছে যাব, তখন দেখছি আমরা মোহানায় হারানো নৌকার মতো চলে যাচ্ছি সমুদ্রের দিকে। আমরা পরস্পরকে পাশে চাইছি আর ক্রমাগত আলাদা হয়ে যাচ্ছি। জানি তোমার হাত ধরে আমি রওনা হবো—তারপর দেখব শ্বরাজদা আর সুজাতা বৌদির মতো আমরাও কখন—'

'কিন্তু ভুল—' সাবিত্রী প্রায় নিঃশব্দ গলায় বললে, 'আমি তো তোমাকে কখনো কোনো আলাদা চোখ দিয়ে দেখব না। আমি তো কোনোদিন কল্পনা করব না যে, সম্রাটের মতো তুমি মাথা ছাড়িয়ে উঠবে সকলের। তুমিও সাধারণ, আমিও সাধারণ। যদি স্রোতে ডুবতেই হয়, গাঁটছড়া বেঁধেই ডুবব। সুজাতার মতো আমার স্বপ্ন নেই—স্বপ্ন কোনোদিন ভাঙবেও না।'

'কী জানি !'

'আমাকে বিশ্বাস হয় না ?'

'তোমাকে নয়—সময়কে। কিন্তু একটু ভুল বললে সাবিত্রী। আমি সাধারণ সন্দেহ নেই, কিন্তু তুমি সাধারণ নও। তুমি এম. এস্‌সি. পাস করেছ, কলেজে পড়াও। আমি পাসকোর্সের বি-এ, বিদ্যেয় তোমার কাছে কিছু নই। কাজেই তোমাকে বিয়ে করব—এরকম ধৃষ্টতা আমি ভাবতেই পারি না। তবু হয়তো তোমার দয়া হল—'

'এই, চুপ।'

'না—না, কথাটা বলতে দাও। তবু হয়তো তুমি—'

'আবার !'

আর বলতে দিল না সাবিত্রী। প্রবীরের মুঠো থেকে ছাড়িয়ে এনে হাতটাকে জড়িয়ে দিলে প্রবীরের গলায়। একেবারে টেনে আনল নিজের কাছে।

'ভীরু—ভীরু কোথাকার! সময়ের কাছে হার মানবে কেন, সময়ের কাছ থেকে নিজের পাওনা ছিনিয়ে নিতে হয়।'

সাবিত্রী একটু আগে স্নান করে এসেছে, তার হালকা সুগন্ধ ; সারা শরীরে ঠাণ্ডা

দীঘির জলের শীতল শান্তি ; প্রবীরের মুখের ওপর নিঃশ্বাস পড়তে লাগল ঘন ঘন।
'ভীরু—ভীরু কোথাকার ! এরকম কাপুরুষকে কে ভালোবাসে !'
ভালো যে বাসে না, তার প্রমাণ দিল তৎক্ষণাৎ। আর এক হাতে কাপুরুষের মুখটা নিজের দিকে তুলে ধরে গভীর গলায় বললে, 'চুপ।'
তারপর প্রবীরের ঠোঁটে শক্ত করে চেপে ধরল নিজের ঠোঁট দুটো।

সময়ের কাছ থেকে নিজের পাওনা আদায় করে নিতে হয়। ঠিক কথা। কিন্তু কিভাবে ? আমরা তো ভেবেছিলুম—অনেক দুঃখের পাড়ি শেষ হয়ে গেছে, এইবার আমরা ঘাটে পেঁছুব। অনেক রক্ত, অনেক ভুল শেষ হল, অনেক শত্রুর সঙ্গে আমাদের মোকাবেলা আমরা করে নিয়েছি। এর পরে আরো অনেক পরীক্ষা দিতে হবে—আরো অনেক নিষ্ঠুর কঠোর দায় মেটাতে হবে—কিন্তু তখন আমরা প্রস্তুত। প্রাচীর যখন একবার ভেঙেছি, লক্ষ্য যখন একবার নিশ্চিত—
কিন্তু ঘাটে আমরা পেঁছুতে পারিনি। স্রোত আমাদের কূলে উঠতে দিল না। আমরা কি—
বাস-কণ্ডাক্টর এসে দাঁড়ালো : 'দাদা—আপনার টিকিটটা—'
চিন্তাটা কেটে গেল।
ডবল-ডেকারের দোতলায় হাওয়ার ঢেউ। বাতাসে বসন্ত। এক-একটা ভালো লাগার দিনকে মনে পড়ে এইরকম হাওয়ায়। একদিন সে আর সাবিত্রী—একদিন কেন, কতদিন এইভাবে হাওয়ার ভেতরে নিজেদের ভাসিয়ে দিয়ে পাশাপাশি বসেছে বাসে-ট্রামে, গাছের তলা দিয়ে—পাতার শব্দ আর ছায়ার মধ্য দিয়ে হেঁটেছে কতক্ষণ। আশ্চর্য, আজ সাবিত্রীর সঙ্গে মাসে একবার দেখা করবার সময় পর্যন্ত হয় না ! নিজের কাজ বেড়েছে, সাবিত্রী সন্ধ্যা পর্যন্ত ল্যাবরেটরীতে কাজ করে ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসে।
তবু—তবু এখনো এই বিস্বাদ দিনগুলোতে—যখন মনে হয়, জীবনটার কাছে অনেক কিছু চাওয়ার ছিল, নেবার ছিল, যখন কিছুই নেওয়া যাচ্ছে না—কেবল মুঠো থেকে ছিটিয়ে-ছড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে, তখনো কিছুক্ষণের জন্যে সাবিত্রীর কথা মনে পড়ে। হঠাৎ মনে হয়—এখনো আশা আছে, আমরা হারব না, আমরা হারাবো না।
এতক্ষণে একটা মাধুর্যের স্বাদ স্বপ্নের মতো তাকে ঘিরতে লাগল।
বাড়ির সামনে পেঁছে আশ্চর্য লাগল তার। একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে। কে এল ? রাত তো এখন সাড়ে দশটার কাছাকাছি। কে বাড়িতে এসেছে এই অসময়ে ?
চিনতে দেরি হল না। দিদির গাড়ি।

॥ তেইশ ॥

এখন ঘন ঘন বক্তৃতা—এখন নিয়মিত মীটিং এখানে-ওখানে। কিন্তু মীটিং-এর চেহারাই বদলে গেছে। সেই একতা নেই, সেই শপথ নেই—একই মঞ্চে সব দলের নেতার সেই উজ্জ্বল সমাবেশ নেই। সেদিন সব শ্রোতার মন এক উৎসাহ—এক প্রত্যয়ে ঝকঝক করত : সময় বদলেছে, অনেক যুদ্ধ—অনেক দুঃখের পর আমাদের এই জয় : আগের

ভুল আর করব না—এবার সব নতুন করে গড়বার পালা।

দলের প্রশ্ন আর নয়—সব নেতাই জনমন অধিনায়ক। জ্যোতি বসু? আনন্দিত করতালি। সোমনাথ? জয়ধ্বনি। হেমন্ত বসু—বরদা মুকুটমণি—সুধীন কুমার—সুশীল ধাড়া—উল্লাসের পর উল্লাসের ঢেউ। 'এক দল—এক মন—এক পথ।

কিন্তু মিলিয়ে গেল মরীচিকার মতো।

'যুক্তফ্রণ্ট ভাঙছে কারা?'

এক এক পক্ষের এক এক জবাব।

বেনামদার জমি কে দখল করবে? আমরা—আমরা। যেসব লাঠি-সড়কি-তীর-ধনুক এক লক্ষ্যে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, তারা ঘুরে গেল নিজেদের ভেতর: এর মাথায়, তার বুকে। কে কাটবে জমির ধান? আমরা—না, তোমরা নয় আমরা—ঐক্যের লাল পতাকায় আঁকা কাস্তে ধানে পড়ল না—রাঙা হল নিজেদের রক্তে। কারা করবে ভেড়ী দখল? ছুটল বল্লম—মাছ গাঁথল না, মানুষের বুকে বিঁধল। তোমার ইউনিয়ন? মানব না—আমি দখল করব, আমাকে বাড়াতে হবে পার্টির স্ট্রেংথ—অতএব লাল পতাকার হাতুড়ি শ্রমিকের হাতেই শ্রমিকের মাথায় পড়ল। সেদিনও স্ট্রাইকে যারা একতাল জমাট লোহার মতো সামিল হয়েছিল, আজ অফিসে পাশাপাশি বসেও তারা কেউ কাউকে চিনতে পারছে না—আমরা আমরা, তোমরা তোমরা। 'ছাত্র ঐক্য জিন্দাবাদ!' নিঃসন্দেহ! কলেজ, ইউনিভার্সিটিগুলোর দিকে তাকাও—সব মোহ মুহূর্তে মিলিয়ে যাবে।

আমি জানতুম—এ যে হবেই আমি জানতুম। যেদিন কতগুলো অস্পষ্ট ইডিয়োলজীর সুতো ধরে, কিছু দলীয় নেতার জেদ আর অহংকারের কোঁদলে তোমরা ভেঙে গেলে, আমি সেদিনই জানতুম। জনতা তোমাদের বিশ্বাস করেছিল, তাকিয়েছিল তোমাদের মুখের দিকে, কিন্তু তাদের দিকে তাকাওনি। একচক্ষু হরিণের মতো চেয়ে থেকেছ দলের দিকে, পুজো দিয়েছ নিজেদের অহমিকার পায়ে। এখন তার দাম শোধ করতে হবে কড়ায়-গণ্ডায়। তোমাদের সেই ভুলের ঋণ মেটাতে গিয়েই আনন্দরা অন্ধের মতো ঝাঁপ দিয়েছে স্রোতে।

'বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা।' বাংলা দেশে জন্মে ভুল করেছেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁর কথাগুলোকে অসংলগ্ন প্রলাপের মতো মনে হয় এ-দেশে। কোনো বিশ্বের ভাণ্ডারীর ঘরে এত অতিরিক্ত সঞ্চয় নেই যে নিবুদ্ধিতার দেনা শুধে দেবেন তোমাদের।

রাত দশটা বাজে—তবু বক্তৃতা চলছিল সমান তেজে। খানিক দূরের মাঠ থেকে অ্যামপ্লিফায়ারে ভেসে আসা সেই আওয়াজ ছাড়া-ছাড়া হয়ে কানে আসছিল স্বরাজের। মুখ বাঁকা হয়ে উঠছিল সিনিকের হাসিতে। 'যুক্তফ্রণ্ট ভাঙছে কারা?' কেউ ভাঙছে না—কতকগুলো ভাঙা কাঁচের টুকরোকে কাগজের পটি দিয়ে তোমরা জুড়ে নিয়েছিলে, একটা বর্ষারও ভর সইল না, কাগজ গলে গেল।

হঠাৎ দুমদাম করে বোমার আওয়াজ। তারপরে দারুণ কলরব।

যাক, জমে উঠল তাহলে! এক ধরনের তৃপ্তিতে স্বরাজের মুখ ভরে উঠল: এইটেই দরকার ছিল, এরই জন্যে অপেক্ষা করছিল সে। এতক্ষণ একতরফা নিন্দে-মন্দ

চলছিল, এবার ওপক্ষ থেকেও তার জবাব এল। বক্তৃতার চাইতে ঢের জোরালো—লাউড়েস্ট্ প্রোটেস্ট্ !

আবার বোমার শব্দ।

কিন্তু বোমার শব্দ নয়। একটা ছবি মনে এল। কোন এত হতভাগা মানুষকে ডোমেরা পোড়াচ্ছিল কেওড়াতলার শ্মশানে। একজন বিরক্ত হয়ে লাঠির ঘা বসিয়ে ফাটিয়ে দিলে মাথাটা—ছিটকে ছড়িয়ে পড়ল হলদে রঙের গলিত মগজ—মড়াপোড়া গন্ধের সঙ্গে আর বাড়তি দুর্গন্ধ পাক খেয়ে উঠল শ্মশানের গরম বাতাসে।

যুক্তফ্রন্টের চিতা তো জ্বলছিলই। এবার খুলি ভাঙবার আওয়াজ আসছে।

লোকজনের দৌড়োদৌড়ির শব্দ পাওয়া যায়। ওদিকের বড় রাস্তাটা দিয়ে ঝড়ের বেগে একটা বাস পালিয়ে গেল। পুলিস ভ্যান ছুটে গেল মনে হয়।

অতঃপর শান্তি।

এবং কবরের শান্তি।

দেওয়ালের দিকে চোখ পড়ল স্বরাজের। সুজাতার ছবি একখানা। বিয়ের পর ছবিটা তুলে দিয়েছিল সুজাতার বন্ধু সাবিত্রী, তার দামী ক্যামেরা ছিল একটা, ছবিটা ভালো তুলেছিল। সুজাতার মোটামুটি সুশ্রী চেহারা—কিন্তু ছবিতে অনেক বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে। তার চেয়েও আশ্চর্য—

তার চেয়েও আশ্চর্য—এবং ঠিক এই মুহূর্তে আবিষ্কার করল নাকি স্বরাজ, এই ছবিতে ভারী কোমল, ভারী শান্ত মনে হচ্ছে সুজাতাকে। আর এমনও মনে হওয়া অসম্ভব নয় যে, কোনো পাড়াগাঁয়ের একটি কিশোরী মেয়ে—দু চোখে লজ্জা জড়ানো, জীবনকে এখনো সে জানে না, ভীরুর মতো একটা অনিশ্চয়ের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

কী ভয়ানক বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে ফোটোগ্রাফ ! এই সুজাতা ?

নীলু হওয়ার পরে কিছুদিন কেমন নিবে গিয়েছিল, ভেঙে গিয়েছিল শরীর, তারপর একটা ধারণা জন্মে গিয়েছিল সে আর বেশিদিন বাঁচবে না। তখন স্বরাজই বলত—সেই ময়দান-মিছিলের দিনগুলোকে জাগিয়ে তোলবার জন্যে বলত : 'সুজাতা, এত সহজে মরলে চলবে কেন ? আমাদের সব পথ তো পড়ে রয়েছে সামনে। আমাদের কবি সুভাষদার কথা ভুলে গেলে : "কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না" ?'

'স্বরাজ, আমি বোধ হয় চিরদিনের মতো ফুরিয়ে যাচ্ছি।'

'কে বলে ? "This is our day, so turn my Comrade, turn like infant's eyes"—'

তারপর ?

তারপর তার নিজের চোখেই নিবে গেল সূর্যমুখী। ধরতে চাইল মাটি আঁকড়ে, মুঠো ভরে উঠল ভাঙা কাঁচের ধারালো টুকরো, হাত রক্তারক্তি হয়ে গেল। দেখল তার নিজের চারদিকে লোহার বাসরের মতো প্রাচীর উঠেছে, সেখানে মাথা ঠুকে কপাল ফাটে—কিন্তু প্রাচীর নড়ে না।

এবং তখন সুজাতা জেগে উঠল।

'তুমি কী করবে ?'

'কিছুই করবার নেই, কিছুই করব না।'

'মানে ?'

'আই হেট্ পলিটিক্স্—আই হেট্ পলিটিশ্যান্স্, আই হেট্ এভ্রিথিং !'

'স্বরাজ, শেষে তুমি—'

'আই ওয়াজ এ ফুল। এসব না করে আমি কালোবাজার করতে পারতুম। বিরাট বাড়ি হত, লাইমুজিন হত, প্রায়ই পৃথিবী ঘুরে আসতুম। আর কালোবাজারীদের স্ট্রীট ল্যাম্পের পোস্টে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেওয়া হবে—জওহরলালের এই স্ল্যাপস্টিক নিয়ে আমার মদের আসর খুব ভালো জমে উঠত।'

'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে !'

'আমার নয়—বাংলা দেশের।'

প্রথমে কাঁদল সুজাতা। তারপরে ক্ষেপে উঠল আস্তে আস্তে।

এখন সময়টা অত্যন্ত ক্রিটিক্যাল। আমাদের প্রত্যেককে নামতে হবে এখন। এতদিন বাইরে ছিল শত্রু, এবার ভেতর থেকে ঘা দিয়েছে তারা।

'কারা শত্রু ?'

'ওরা।'

'সত্যটা আবিষ্কার হল বছর ত্রিশেক একসঙ্গে থাকবার পরে ? একসঙ্গে জেল খেটে, দুঃখ সয়ে, লাঠি খেয়ে, রাইফেলের মুখে দাঁড়িয়ে ?'

'ওদের পতন হয়েছে।'

'আর তোমরা তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছ ! একেবারে দেবলোকের দিকে !'

'গায়ে পড়ে ঝগড়া করছ কেন ? তুমিও ওদের দলে।'

'আমি ঈশ্বর মানি না। But Oh, God, if here be any God, please save me from all these political parties !'

এর পরে দিনগুলো বিস্বাদ থেকে কটু, কটু থেকে বিষাক্ত। প্রত্যেক দিন চারপাশে তাকিয়ে—দেশের চেহারা দেখে মাথা ঠিক থাকে না, রক্ত চড়ে যায়, এক-এক সময় বাড়িতে ফেরে পৃথিবীর সমস্ত জিঘাংসা মাথার ভেতরে জড়ো করে। আর তখনই হয়তো—

'আমি এভাবে থাকতে পারছি না। তুমি কি এটা মিড্ল ইস্ট পেয়েছো যে আমাকে একেবারে হারেমে বন্দী করে রাখবে—বাইরের আলোও দেখতে দেবে না !'

'আলো নেই সুজাতা। অন্ধকারে প্যাঁচা উড়ছে।'

'তুমি চূড়ান্ত ফ্রাস্ট্রেশনে ডুবে গেছ।'

'ফ্রাস্ট্রেশন নয়—এতদিনে আমার চোখ খুলেছে।'

'না স্বরাজ, এভাবে ভেঙে পড়লে চলবে না। ইয়ু মাস্ট্ ওয়েক-আপ।'

'কিসের জন্যে ? রাতের অন্ধকারে প্যাঁচার ঝগড়াটা আরো জমিয়ে তুলব বলে ?'

বিষ বাড়ছিল, ক্রমেই বাড়ছিল। তারপরে যন্ত্রণা আর কারোই সইল না।

'আমি চলে যাচ্ছি। আর ফিরব না।'

'তোমার অভিরুচি।'

'তুমি আর একবার বিয়ে করতে পারো। ডিভোর্সের সুট ফাইল কোরো, এক্সপার্টি ডিগ্রি পাবে, আমি কনটেস্ট করব না—অভয় দিচ্ছি তোমাকে।'

'অনুগ্রহের জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

একবার ফিরে তাকিয়েছিল সুজাতা, মনে হচ্ছিল তার শক্ত মুখখানা লোহার ছাঁচে ঢালাই করে তৈরি করেছে কেউ, কোটরের ভেতর চোখ দুটো ধিক্ ধিক্ করে জ্বলছিল। হয়তো ব্রুট্ কিংবা রাস্কেল বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে ঝড়ের মতো বেরিয়ে গিয়েছিল ঘর থেকে।

একটা আদিম ক্রোধে পেছন থেকে স্বরাজ ডাক দিয়ে বলেছিল: 'পার্টির স্পেশ্যাল ট্রেনে ইন্‌কিলাবটা যখন নিয়ে আসবে, তখন খবর দিয়ো, আমি স্টেশনে রিসিভ করতে যাব।'

আনুক—ওরাই বিপ্লব আনুক। স্বরাজ আর সুজাতার কথা ভাববে না। কিন্তু দেওয়ালের ওই ফোটোটা! কী ডিসেপ্‌টিভ ছবিই তুলেছিল সাবিত্রী—যেন পাড়াগাঁয়ের একটি শান্ত কিশোরী মেয়ের মতো লজ্জাভরা চোখে চেয়ে আছে সুজাতা, জীবনটাকে এখনো চেনে না, এখনো পৃথিবী তার কাছে স্বপ্নে আর বিস্ময়ে ভরে আছে।

না, সুজাতার কথা ভাববার কোনো মানে হয় না আর। ইট্‌স্ এ সীল্‌ড্ চ্যাপ্‌টার!

বাইরে বক্তৃতা নেই, বোমার আওয়াজ নেই, কোলাহল নেই, হঠাৎ যেন একটা স্তব্ধতার মধ্যে ডুব মেরেছে সব। কবরের শান্তি। এর পরে আরো বোমার দিন আসছে, কালের চিতায় আরো অনেকগুলো মাথা ভাঙবার আওয়াজ জেগে উঠবে, তারপরে—তারপরে সারা বাংলা দেশ জুড়ে শ্মশানের ছাই উড়ে চলবে কেবল।

গুনগুন করে একবার কান্নার আওয়াজ এল যেন। স্বরাজের শরীরটা শক্ত হয়ে উঠল একবারের জন্যে। নীলু বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিল, মাকে স্বপ্ন দেখে কেঁদে উঠল।

স্বপ্নার গলার আওয়াজ—মা যেন কান্নাভরা সুরে কিছু বললেন, বাবা রোজকার অভ্যাসে নিজের ঘরে লুই ফিশার বা ওই রকম কিছু একটা পড়ছিলেন, তিনি কয়েকবার কেশে উঠলেন।

নীলু ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মা'র স্বপ্ন দেখছে। সুজাতা জেগে বসে দেখছে বিপ্লবের স্বপ্ন। আবার একটা সিনিক হাসিতে মুখ ভরে উঠল স্বরাজের।

টেবিল থেকে সিগারেট, দেশলাই তুলে নিয়ে সিগারেট ধরালো একটা। দিল্লীতে ট্রান্সফারের ব্যবস্থাটা হয়ে যাবে সামনের মাসেই। নীলুকে নিয়ে যাবে সঙ্গে করে। সেখানে যে-কোনো একটা রেসিডেনসিয়াল স্কুলে ভর্তি করে দেবে তাকে। তারপর মাকে ভুলতে, এমন কি এই পরিবারটাকে ভুলে যেতেও তার সময় লাগবে না।

বাইরে পায়ের শব্দ। দরজার ও-পাশে কে দাঁড়িয়ে।

'কে?'

'আমি, বড়দা।'

'স্বপ্না? ভেতরে আয়।'

স্বপ্না ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকল, তারপর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল খাটের পাশটিতে।

'কিছু ক'বি?'

'নীলুডা খুব কষ্ট পাইতাছে বড়দা।'

এতক্ষণের জ্বালা স্বপ্নার দিকে তাকিয়ে যেন মমতায় জড়িয়ে এল। বাড়িতে এই

একটি মেয়ে। এত স্নিগ্ধ, এত করুণ। কোনোদিন রাগ করল না কারুর ওপর, অভিমান করল না এতটুকুও, যেন নিজের ছায়ার ভেতরে তলিয়ে রইল চিরকাল। ওকে এতটুকুও দুঃখ দিতেও কী যে খারাপ লাগে!

শান্ত গলায় স্বরাজ বললে, 'দুই-চাইর-দিন। ভুইল্যা যাইবো তারপরেই।'

'না, ভুলবো না। ছোট্ট পোলাপান মায়েরে ভুলতে পারে?'

স্বরাজ চুপ করে রইল। জবাব পাচ্ছে না।

ভিজে গলায় স্বপ্না ডাকল: 'দাদা!'

'কী?'

'তুমি একবার যাইবা বৌদির ধারে?'

আর কেউ কথাটা বললে আগুনের মতো জ্বলে উঠত। বলত: চুপ করো, আমার সামনে উচ্চারণ কোরো না সুজাতার নাম। কিন্তু স্বপ্নার সামনে সমস্ত মনটা মমতায় স্নিগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। ক্লান্তভাবে হাসল স্বরাজ।

'ক্যান এইসব ভাব্‌তাছস্‌। সে আর আইবো না। আমি গ্যালে হয় তো দ্যাখাও কোরবো না।'

স্বপ্নার চোখে জল ছলছল করতে লাগল।

'বৌদি নীলুর কথাডাও ভাব্‌বো না বড়দা?'

'সকলের আগে দ্যাশ। সেইডাই ভাব্‌তাছে।'

'আমি অ্যাক্‌বার গিয়া বৌদিরে বুঝামু বড়দা?'

'না, যাইতে হইবো না। খামাখা অপমান হইয়া লাভ নাই।'

'বৌদির কাছে আবার অপমান কিসের? কাইল আমি বরং—'

ইচ্ছে ছিল না, তবু স্বরাজের স্বর শক্ত হয়ে উঠল: 'না, সে আর বৌদি না। সমস্ত সম্পর্ক শেষ কইর‍্যাই চইল্যা গ্যাছে এইখান থিকা—তবে আর কাঙালের মতন গিয়া তারে সাধতে হইবো না। তরা যদি অপমান না ভাবস্‌, আমার সম্মানে লাগে।'

ঠোঁট কাঁপতে লাগল স্বপ্নার। খাটের একটা কোণা ধরে রাখল এক হাতে।

স্বপ্না আস্তে আস্তে কাছে এগিয়ে এল তার। একখানা হাত রাখল কাঁধের ওপরে। স্বপ্না চোখ তুলল, দু চোখে জল ছলছল করছে তার।

'বুইন!'

বড়দার এমন গলা অনেকদিন শোনেনি স্বপ্না। চোখ দিয়ে টপ করে একফোঁটা জল গাড়িয়ে পড়ল তার।

'উঁ?'

'তর এ্যাকটা বিয়া দিমু ভালো দেইখ্যা। যেইখানে পলিটিকস্‌ নাই—ইডিয়োলজীর তর্ক নাই—যে তরে সুখী করতে পারবো, তরে সত্যিকারের দাম দিতে পারবো—'

এবার কান্নাটা আর বাধা মানল না।

'না বড়দা, বিয়ায় কাম নাই আমার। আমি বেশ আছি।'

সেই সময় একটা শব্দ হল জানলার বাইরে। চমকে দুজনে তাকালো সেদিকে। জানলার রেলিং ধরে অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় একটা মূর্তি!

আনন্দ!

॥ চব্বিশ ॥

মা একটা ইডিয়ট—মা'র মাথায় কোনো বস্তু নেই—এই পরম আবিষ্কারটি সেকালের বি. এ. পাস আর দারুণ ইন্টেলেক্‌চুয়াল বাবা কখনো গোপন রাখতেন না। বরং আরো রসিয়ে বলতেন: শী ইজ্‌ এ ডোমেস্টিক অ্যানিম্যাল—হু ডিলাইটস্‌ ইন্‌ কুকারী। অথচ খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে নিজে যে বিন্দুমাত্রও উদাসীন ছিলেন তা নয়—বরং ভালো-মন্দের ব্যাপারে রীতিমতো উৎসাহী থাকতেন, মাছের কালিয়া কিংবা ভুনি খিচুড়িতে একটু এদিক-ওদিক হলেই এই দারুণ বুদ্ধিজীবীর ধৈর্যচ্যুতি হত।

ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে তখন। তাদের সামনেই পরিষ্কার আর নির্লজ্জ ভাষায় বলতে পারতেন: 'আশ্চর্য আমার ট্র্যাজিডী! সারাটা জীবন ঘর করতে হল একবস্তা রাবিশের সঙ্গে!'

দিদি এদিক থেকে ষোলো আনা বাবার মেয়ে। কিংবা আঠারো আনা। কলেজে পড়বার সময় তার ঝাঁঝে বাবা পর্যন্ত তটস্থ হয়ে উঠতেন।

'কী যে করো মা সারাটা দিন বসে বসে! এতবার বললুম, আমার শাড়িটা একটু ইস্ত্রি করে রেখো—তোমার মাথায় কী কিচ্ছু ঢোকে না?'

কাজটা এমন অসাধ্য দিদির পক্ষেও নয়। কিন্তু বিনে মাইনের এমন আশ্চর্য নীরব একটি ঝি থাকতে দিদি এসব তুচ্ছ ব্যাপারে কেন হাত দিতে যাবে!

বাবা চলে গেলেন, টুলু হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল একেবারে মুক্তপুরুষ হয়ে। দিদি একবার আগুন হয়ে এসে মাকে যা নয় তাই বলে গেল।

'তুমি কী! এ-রকম ব্রিলিয়্যান্ট ছেলেটা একেবারে বখে গেল তোমার চোখের সামনে?'

'যদি কথা না শোনে—'

'কথা না শোনে!' প্রায় পাড়া কাঁপিয়ে দিদি চিৎকার করে উঠেছিল: 'কথা শোনাতে হয়, মা-বাপের সেইটেই রেসপনসিবিলিটি। তোমার যদি ব্রেন বলে ছিটে-ফোঁটাও বস্তু থাকত, তা হলে টুলু নষ্ট হয়ে যেতে পারে এভাবে? ট্রেনিং দিতে হয়—ছেলেমেয়েকে হাতে করে গড়তে হয়। কী আর বলব, বাবাই তোমাকে ঠিক চিনেছিলেন। তুমি একেবারে অপদার্থ—টোট্যালী হোপ্‌লেস্‌!'

এবং কী আয়রনি—আজ সেই দিদি মা-র বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

'আমার টিনটিন—মা, আমার টিনটিন কোথায় গেল?'

দু'চোখভরা ভয় আর বিবর্ণ মুখ নিয়ে মা সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন সাধ্যমতো। এরই মধ্যে আস্তে আস্তে সমস্ত ব্যাপারটা বোধগম্য হল প্রবীরের।

মা বলছিলেন, 'ছেলেমানুষ, কোথায় যাবে আর? ওর কোনো বন্ধুর বাড়ি গিয়ে বসে আছে হয়তো। বকাবকি করেছিলি নাকি?'

উমা একটু ঠাণ্ডা হয়ে এসেছিল, এবারে শক্ত হয়ে গেল।

'একটু কড়া শাসন করেছিলুম মা—', কিন্তু এই পর্যন্ত বলেই সে থামল। ওইটুকু

মেয়ে অতিরিক্ত বীয়ার খেয়ে প্রায় মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরেছে আর সেই জন্যে সে শঙ্কর মাছের চাবুক দিয়ে তাকে মারতে গিয়েছিল, এ-কথাটা মার কাছে বললে মান থাকে না।

মা বললেন, 'ছেলেপুলেকে কি অত বেশি শাসন করতে আছে রে ?'

এটা সময় নয় এবং ঠিক এই মুহূর্তে খুবই অন্যায়—তবু প্রবীর দারুণ কৌতূহল বোধ করল একটা। উমা কী করবে এবার ? নিশ্চয় ফণা তুলবে, ফোঁস করে বলে বসবে : তুমি থামো, ছেলেমেয়ে মানুষ করার উপদেশ তোমার মতো নির্বোধের কাছ থেকে নিতে চাই না আমি—ও ব্যাপারে স্পেস্যাল ট্রেনিং আছে আমার। কিন্তু দিদি কিছুই করল না, ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল আবার।

মা বললেন, 'ওর বন্ধুদের বাড়িতে খোঁজ নিয়েছিলি ?'

'ও যাদের কথা বলত, যারা ওর সঙ্গে আসত, সব জায়গায় তো গিয়েছি।'

'তার বাইরেও তো থাকতে পারে।'

উমার মুখে একটু আলো ফুটল কি ফুটল না : 'তা অবশ্য পারে। কিন্তু—'

'কেন এত ব্যস্ত হচ্ছিস মা ? ছেলেমানুষ—কোথায় আর যাবে ? ভালোই আছে কোথাও—আজ রাত্রে কিংবা কাল সকালেই এসে পড়বে। মণীশ আর টুলু তো খুঁজতে বেরিয়েছে।'

'তা বেরিয়েছে। আমাদের নেবার দাশগুপ্তের গাড়িটা নিয়ে। আর আমি তো সেই থেকে চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছি মা। কোথাও না পেয়ে তোমাদের কাছে ছুটে এলুম—যদি এখানে এসে থাকে !'

টিনটিন আসবে মামারবাড়িতে ? উচিত নয় এখন, সময়ও নয়—তবু প্রবীরের মনে হল কিরকম সিনিক হয়ে যাচ্ছে সে—হাসি পাচ্ছে তার। দিদির সঙ্গে টিনটিন এ বাড়িতে বছরে একবারও আসে কিনা সন্দেহ। আর এলেই পাঁচ মিনিটের মধ্যে ছটফট করতে থাকে : 'মাম্মী, যাবে না ?' খারাপ লাগবার কথাই। গল্প করবার মতো বন্ধু নেই—পুরনো একটা গ্রামোফোন আছে অথচ রেডিওগ্রাম নেই, 'পপ' গানের রেকর্ড নেই, এমন কি এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাবার মতো ফ্রীজ পর্যন্ত নেই !

একটা ছবি চোখে এল। যদি তার দেখবার ভুল না হয়ে থাকে—এবং চোখে চশমা থাকা সত্ত্বেও, উলটো দিকের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে পার্ক স্ট্রীটে—রাস্তার নিয়ন আর চারদিকের ঝকমকে আলোর ভেতরে ভুল হওয়ার কারণ নেই বিন্দুমাত্র—রাত সাড়ে আটটা নাগাদ—কাউবয়-মার্কা পোশাক-পরা একটা ছোকরার হাত জড়িয়ে ঘনিষ্ঠভাবে যে হাঁটছিল সে টিনটিন ছাড়া আর কেউ হতেই পারে না।

একবার ডাকবে কি না ভেবে প্রবীর থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। একটি পত্রিকার স্টল থেকে একখানা বিদেশী কাগজ নির্বাচন করছিল ছেলেটি—তার রঙিন কভারের ছবিটি এবং এস-ই-এক্স জাতীয় একটি নামও যেন দেখা যাচ্ছিল এত দূর থেকে—মানে, টিনটিনের জ্ঞানের ভাণ্ডারটি বোঝাই হয়ে উঠছিল এই বয়েসেই।

ব্যাক-নাম্বার আর ইউনিয়ন করা প্রবীর ধাক্কা খেয়েছিল একটা—তারপর নিজেই সরে গিয়েছিল। প্রথম প্রেরণা যেটা জেগেছিল সেটা হল দ্রুত রাস্তা পার হয়ে—ওই ফুটপাথে গিয়ে টিনটিনের কান ধরে ঠাস ঠাস করে গোটাকয়েক থাপ্পড় দেওয়া, তারপর

মাথার আধছাঁটা চুল ধরে টানতে টানতে সোজা দিদির কাছে এনে জিম্মা করা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছিল, এ-ও বোধ হয় জুভেনাইল সাইকোলজিতে স্পেস্যালিস্ট্ দিদির একটা স্পেশ্যাল ট্রেনিং—মানে গোড়া থেকেই ছেলেপুলেকে সবরকম জ্ঞানের দরজা খুলে দেওয়াটা ভালো।

তারই মধ্যবিত্ত রক্ষণশীলতায় এগুলো অসহ্য, সুতরাং অনধিকার-চর্চা না করে সে-ই জোর পায়ে সরে গিয়েছিল—টিনটিন তাকে দেখবার আগেই।

এখন স্বচ্ছন্দে বলা যায়ঃ 'দিদি, খাঁচার দরজা তো খুলেই রেখেছিলি, মিথ্যে দুঃখ করবার কী আছে? তোর সাইকোলজিক্যাল এক্সপেরিমেণ্ট কমপ্লীট হয়েছে।'

কিন্তু বলা যায় না—কিছুতেই বলা যায় না এখন। দিদি কাঁদছে আর নিতান্ত ইডিয়ট মা সান্ত্বনা দিচ্ছেন তাকে।

মা বলছিলেন, 'চলে আসবে—আজকেই চলে আসবে। বোকা মেয়ে তো নয়—অত চিন্তা করিসনি। কিংবা মণীশ আর টুলুই নিয়ে আসবে ওকে।'

'কলকাতা এখন আর শহর নেই মা—' দিদি ফোঁপাতে থাকল: 'একেবারে সুন্দরবন হয়ে গেছে। সেই জন্যেই তো এত বেশি করে ভাবছি। এই যুক্তফ্রণ্ট না কী হয়ে না—চারদিকে গুণ্ডা-বদমায়েস একেবারে স্বরাজ পেয়ে গেছে। আগেকার দিন হলে—' দিদির আত্মমর্যাদা আবার টনটনিয়ে উঠল: 'আমাদের যা সোর্স ছিল—যা ইনফ্লুয়েন্স ছিল—তাতে করে চীফ মিনিস্টারকে পর্যন্ত নড়িয়ে দিতুম। এখন আমাদের কথা শুনছে কে! যত ক্রিমিন্যালের পকেটে একটা করে লাল রুমাল। কাগজে যেসব হরিড রিপোর্ট বেরুচ্ছে—মানে সকলের চোখের সামনে—চৌরঙ্গীর মতো জায়গায়—মোটরসুদ্ধু ভদ্রলোকের স্ত্রীকে তুলে নিয়ে গেল, বলে গেল ক'দিন পরে ফেরত পাবেন। আমরা আছি কোথায়?'

প্রবীরের ঠোঁট নড়ে উঠল। মুখে এল, হ্যাঁ, এসব খবর বেরুচ্ছে বটে, কিন্তু পুলিস একটাও বোধ হয় কনফার্ম করেনি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই দিদি বলবে: পুলিস? পুলিস বলে কিছু আছে নাকি? সব তো হুকুমের চাকর—পেটের দায়ে গুণ্ডাদের শেল্টার দিচ্ছে!

মা কেঁপে উঠলেন একবার।

'কী বলছিস এসব? না না, ও সমস্ত কিচ্ছু হয়নি।'

দিদি ধরা গলায় বললে, 'আমার কোনো ভরসা হচ্ছে না মা—ইন্ দিস জাংগল্ অব ওয়েস্ট বেঙ্গল এভরিথিং ইজ পসিবল—যুক্তফ্রণ্টকে গদিতে বসিয়ে চারদিকে একটা স্যাংচুয়ারি খুলে দেওয়া হয়েছে—রোভিং প্রিডেটরস্ এভরিহোয়্যার!' বলতে বলতে দিদি আবার জ্বলে উঠল: 'আসুক হারামজাদা মেয়ে একবার ফিরে—তারপর যদি বাংলা দেশের বাইরে একটা কড়া বোর্ডিং স্কুলে ওকে চালান না করি, তা হলে আমার নাম উমা ব্যানার্জীই নয়।'

রাগে-দুঃখে সত্যি-সত্যিই দিদির মাথার ঠিক নেই—নইলে কুমারী পদবী ব্যানার্জী মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসত না, হারামজাদা শব্দটাও না। কিন্তু পার্ক স্ট্রীটে একটা কাউবয়-মার্কা ছেলের হাত জড়িয়ে এবং বিদেশী একটি বিশেষ পত্রিকার ভেতর দিয়ে যে সংস্কৃতির চর্চা ওইটুকু মেয়ে টিনটিন করছিল, সেটা আর যারই হোক—যুক্তফ্রণ্টের

অবদান নয়।

কিন্তু এখন এসব বলা যায় না। বলা যায় না যে, যে কুকুরকে মারতে হবে, তাকে সবরকম বদনাম দিয়ে দেগে দেওয়াই ভালো। আর তা ছাড়া সুনাম রাখবার জন্যে নিজেদের চেষ্টাও তো অসীম—বিবৃতি, প্রতি-বিবৃতি—দলে দলে খুনোখুনি—চমৎকার ইমেজ তৈরি হচ্ছে নিজেদের!

মা বললেন, 'শান্ত হয়ে বাড়ি যা উমা। হয়তো গিয়ে দেখবি মেয়ে পেঁৗছে গেছে এতক্ষণে!'

'তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক মা—' দিদি আবার বাঙালী মতে বলে ফেলল: 'আমার বুকের ভেতরটা যে কি রকম করছে! টিনটিন যদি আজ ফিরে না আসে, তা হলে আমি সত্যি-সত্যিই হার্টফেল করব।'

মা বললেন, 'বালাই ষাট। ভগবান আছেন, কিছু ভাবিসনি। দ্যাখ্ গে, হয়তো বাড়িতে—'

দিদি আর বসল না। লাফিয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

'আঃ, তা যদি হয় মা—আমি চললুম।'

'দিদি ফিরে এলে সঙ্গে সঙ্গে খবর দিস মা। আমরাও তো স্বস্তি পাব না।'

'নিশ্চয় নিশ্চয়—' দিদি বেরিয়ে ছুটল গাড়ির দিকে।

'চলু দিদি, আমিও যাচ্ছি সঙ্গে—' প্রবীর পেছনে পেছনে পা বাড়ালো: 'যদি কোনো দরকার হয়!'

'তা হলে তো বেঁচে যাই ভাই, আয়—আয়। আমি যেন সাগরে পড়েছি, আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে—কিছু ভাবতে পারছি না।' তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, 'হ্যাঁরে, তোর সঙ্গে জ্যোতিবাবুর আলাপ আছে?'

'জ্যোতি বসু?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তোদের ডেপুটি চীফ—পুলিস মিনিস্টার?'

'না, আমাকে তিনি চেনেন না।'

'যদি ওঁকে স্পেশ্যালি রিকোয়েস্ট করা যেত—'

'দেখা যাবে—কাউকে দিয়ে যদি বলাতে পারি!'

'চল ভাই—সেই চেষ্টাই করা যাক তা হলে। নাহলে আমি গিয়ে তাঁর দরজায় ধর্ণা দেব, হিন্দুস্থান পার্ক তো দূরে নয়।'

'তুই অত ব্যস্ত হোসনি দিদি—ব্যবস্থা একটা হবেই।'

ভাই-বোন বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। বাইরে থেকে মোটর ছাড়বার আওয়াজ

এতক্ষণ মা মেয়েকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছিলেন, এবার তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। আর একটা কথা মনে হল, এত রাতে ভুলু ফিরে এল—ছেলেটা দুটো খেয়েও গেল না।

কিন্তু টুলুও তো ফেরেনি। মেয়ে-জামাইয়েরও তো খাওয়া জুটবে না আজকে।

না—কোথাও নেই। হাসপাতাল নয়, থানা নয়, রেলস্টেশন নয়। চেনা, আধচেনা,

নামশোনা—কোথাও টিনটিনের খবর নেই।

শুধু আশ্চর্য হল সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের একটি মেয়ে। একটু ওপরের দিকে পড়ে।

'বাড়ি যায় নি ? কেন, ও তো আপনাদের রাস্তার সামনেই স্কুল-বাস থেকে নামল !'

'স্কুল-বাস থেকে নামল বাড়ির কাছে ?'

'হ্যাঁ, সাড়ে চারটের সময়।'

'তা হলে—তা হলে বাড়ি থেকে তিনশো গজের মধ্যে সে গেল কোথায় ?'

তার মা বললেন, 'মিস্টার নন্দী, মিথ্যে চিন্তা করবেন না। পাড়াতেই আছে কারো কাছে।'

মণীশদা কিছুক্ষণ কাঠ হয়ে থেকে নেমে এল সেখান থেকে। তারপর গাড়িতে উঠেই হু-হু করে কেঁদে ফেলল।

'মণীশদা !'

'তুমি জানো না টুলু—ইয়ু কানট্ আণ্ডারস্ট্যাণ্ড ! মেয়েটা আমার দারুণ অভিমানী। ওর মা একটু বেশি শাসন করেছিল সেদিন—আমি নিশ্চয় বুঝতে পারছি—সেই অভিমানে ও নেমেই রাস্তা পার হয়ে উল্‌টো দিকে চলে গেছে, তারপর সুইসাইড্ করেছে লেকের জলে।'

দুঃখে মণীশদা না হয় বলতে পারে, কিন্তু টুলুর কাছেও ব্যাপারটা অত্যন্ত অবাস্তব ঠেকল।

'বেলা সাড়ে চারটের পরে লেকের জলে ডুববে, মণীশদা ? সে কি সম্ভব ? চারদিকে অত লোকজন থাকতে ? তা ছাড়া ও তো লাইফ সেভিং সোসাইটিতে সাঁতার শিখেছে ! যে সাঁতার জানে, সে কি ইচ্ছে করে জলে ডুবে মরতে পারে কখনো ?'

মণীশদা ফোঁৎ ফোঁৎ করে রুমাল দিয়ে নাক মুছতে লাগলেন।

'ওর পক্ষে সব সম্ভব। ওই মায়েরই তো মেয়ে—যেমন মেজাজ, তেমনি জেদ।' মণীশদার কথায় দিদির ওপর একটা গভীর অনুরাগ ফুটে উঠল তা নয়ঃ 'ও মেয়ের অসাধ্য কাজ নেই, সাঁতার জেনেও ও ডুবে মরতে পারে।'

তা হলে পারে। বেলা পাঁচটা নাগাদ—একগাদা লোকের চোখের সামনে অদৃশ্য-ভাবে লেকের জলে ঝাঁপ দিতে পারে আর সাঁতার জেনেও হাত-পা গুটিয়ে একটুকরো পাথরের মতো তলিয়ে যেতে পারে !

মণীশদা আবার নাক মুছতে মুছতে বললেন, 'লেক কতটা ডীপ হে ? ফুট চল্লিশেক—না?'

'আমি বলতে পারব না।'

'তা হলে ডুবুরি নামিয়ে—' মণীশদা কেঁদে উঠলেন।

'আগে থেকেই এসব কেন ভাবছেন মণীশদা ?' টুলু আস্তে আস্তে বললে, 'একবার ডনের কাছে খোঁজ নেবেন ?'

'ডন ?' মণীশদা চকিত হলেনঃ 'ডন—ও ওর সেই বয়ফ্রেণ্ড ! কিন্তু এ পাড়ায় কোথায়, সে তো থাকে উড স্ট্রীটের এক বাড়িতে।'

'সাদার্ন অ্যাভিনিউ থেকে উড স্ট্রীটে যাওয়াটা কিছু শক্ত নয়।'

'কিন্তু—আচ্ছা—' নাক মুছতে মুছতে ভারী গলায় মণীশদা বললে, 'সোফার—জলদি চলো। হ্যাঁ, সোজা ল্যান্সডাউন ধরে।'

॥ পঁচিশ ॥

স্বপ্না চমকে উঠল : 'ছোড়দা ?'

স্বরাজ সহজভাবে বললে, 'আনু ? ভিতরে আয়।' এগিয়ে গিয়ে বাইরের দিকের দরজাটা খুলে দিলে। আনন্দ আস্তে আস্তে ভেতরে ঢুকল, দরজাটা বন্ধ করে দিলে সাবধানে। তারপর বললে, 'জান্‌লাডারেও বন্ধ কইর‍্যা দে স্বপ্না !'

কয়েক সেকেণ্ড চুপ। স্বরাজের বিছানার একপাশে বসে পড়ে আনন্দ চেয়ে রইল দেওয়ালের দিকে। লেনিনের ছবি, হো চি মিনের ছবি। পাশেই স্বরাজ আর সুজাতার বিয়ের পরের সেই বাঁধানো ফোটোটা। আনন্দ যেন নিজের মনে বললে, 'মাও-সে-তুংয়ের একটা ছবি থাকলে—'

জ্বালাধরা একটুকরো হাসি হাসল স্বরাজ।

'তাঁরে রেভোলিউশ্যানের মহান নেতা কইল্যা কিছুমাত্র আপত্য নাই, সেই শ্রদ্ধা তিনি চিরডাকালই পাইবেন। কিন্তু তাঁরে তোমাগো চেয়ারম্যান না বানাইলেই—'

এবার আনন্দও হাসল। অনুকম্পার ভঙ্গিতে।

'বড়দা, তোমার পোলিটিক্যাল্ ট্র্যাডিশন আছে—ইন্টেলিজেন্সও আছে বইল্যা জানি। কিন্তু তুমিও যখন জিনিসটার মানে না বুইঝ্যা শিয়ালগুলার সঙ্গে গলা মিলাও, তখন দুঃখ হয় !'

স্বরাজের চোয়াল কঠোর হয়ে উঠল। একটা ঝগড়া বাধতে যাচ্ছিল অবধারিত ভাবে, বাধা দিল স্বপ্না : 'কী আরম্ভ কর্‌লা বড়দা ! ছোড়দা এইভাবে বাড়ি আসছে, আর অখন তর্ক আরম্ভ কোর্‌লা ?'

স্বরাজ যেন একটু লজ্জিত হল।

'ঠিকই কইছস্। নর্থ পোল—সাউথ পোল—এ তর্কের মীমাংসা এভাবে হইবো না। তারপর আনন্দের দিকে তাকিয়ে চোখের দৃষ্টি তার কোমল আর বিষণ্ণ হয়ে এল।

'শরীরডারে কী করছস আনু ! তরে যে চিনন যায় না !'

'এট্টু কম চিনলেই ভালো বড়দা। পুলিসের চক্ষু এড়াইতে সুবিধা হয়।' চকিতের জন্যে নিজের মধ্যেও একটা কোমলতা অনুভব করল আনন্দ। আর এক বড়দাকে মনে পড়ল—যার জন্যে ছেলেবেলায় ভয়-বিস্ময়-ভালোবাসার একটা মিশ্র বিচিত্র অনুভূতি ছিল তার নিজের মধ্যে। সে তখন রাজনীতি করত না, রাজনীতির কথাও ভাবত না—পরীক্ষায় ভালো করা ছাড়া আর কোনো স্বপ্নই ছিল না সামনে। তখন বড়দা দু'বার আণ্ডারগ্রাউণ্ডে গেছে, অন্তত বারতিনেক অ্যারেস্ট হয়েছে।

মনে আছে, গ্রেপ্তার করতে এসেও সসম্মানে পুলিস অফিসার কথা কইত বড়দার সঙ্গে।

'একসকিউজ মী, আপনাকে যেতে হবে আমাদের সঙ্গে। এই দেখুন ওয়ারেণ্ট।'

বড়দা হাসত।

'ওয়ারেণ্ট দেখবার দরকার নেই, আমি তৈরিই আছি।' তারপর মা'র দিকে তাকিয়ে

হাসত : 'আবার চললাম মা। কাইল অ্যাকটা স্যুটকেসে কইর‍্যা কয়ডা কাপড়-জামা পাঠাইয়া দিবা।'

সেই বড়দা। এখন পুরোপুরি একটা অ্যানার্কি'র জগতে চলে গেছে। এ-ই হয়। শোধনবাদ নয়া শোধনবাদের রাজনীতি এ ছাড়া আর কোথাও নিয়ে যায় না। শেষ পর্যন্ত ব্লাইন্ড লেন। তখন হয় পার্লামেণ্টারী ডিমোক্র্যাসীর আশ্রয়, আর নইলে সম্পূর্ণ মানসিক পরাভব।

আনন্দর চিন্তার ধারাটা থামল। স্বপ্না।

শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছছে স্বপ্না। মেয়েটা আশ্চর্য রকমের নরম, অত্যন্ত বেশিমাত্রায় ইমোশন্যাল। বাবা শক্ত, দাদা শক্ত, নিজের মুঠোর ভেতরে এখন বজ্রকে আঁকড়ে ধরবার মতো প্রবল সবলতা অনুভব করে আনন্দ ; কিন্তু এই মেয়েটাই আলাদা —একেবারে ষোলো আনাই মেয়ে। দলের শুভশ্রীদিকে মনে পড়ল আনন্দর। নামের সঙ্গে কী তফাত—কী তীক্ষ্ণ জ্বলন্ত চোখ! তারা জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে, দুদিন খাবার জোটেনি, একটা গাছের ডালে হাত রেখে শক্ত সোজা হয়ে শুভশ্রীদি।

'কমরেড, এ দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ দিনের পর দিন না খেয়ে কাটায়। দু দিন উপোসী থেকে যদি ভেঙে পড়ি, তবে বিপ্লবী নামের যোগ্যই নই আমরা!'

আর ঠিক এই সময় স্বপ্না বললে, 'ছোড়দা, কিছু খাবি না ?'

স্বপ্না একেবারেই মেয়ে, ষোল আনাই মেয়ে। শুভশ্রীদির সঙ্গে কোথাও মেলে না। বিপ্লবের কোনো কাজেই আসবে না কোনোদিন। তবু মমতার একটা তরঙ্গ ভেঙে পড়ল আনন্দর বুকের মধ্যে।

স্বরাজ ঘোষাল নয়, একসময়ের বিখ্যাত ছাত্রনেতাও নয়, যে বড়দা ছেলেবেলায় তাকে ভালোবাসত, সে আস্তে আস্তে আনন্দর রুক্ষ চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। কখন যে কি রকম হয়ে যায়, আনন্দর চোখ বুজে এল একবারের জন্যে, ইচ্ছে করল বড়দার বিছানায় হাত-পা এলিয়ে শুয়ে পড়ে সে।

স্বরাজ বললে, 'খাওনের কী আছে—কী দিবি অখন ?'

'রুটি আছে খানকয়। ইলশা মাছ ভাজা আছে। বিকালে ও-বাড়ির মাসিমা দেওঘরের প্রসাদী প্যাঁড়া দিয়া গেছে কয়ডা—তাও আছে।'

মুহূর্তে নড়ে উঠল আনন্দ।

'না স্বপ্না, ওই প্রসাদ আমার চলবে না। রুটি আর মাছভাজা হইলেই হইবো। অনেকদিন ইলশা মাছ খাই নাই।'

স্বরাজ হেসে ফেলল।

'প্রসাদের কথাডা কইয়াই মাটি কোরছস্ স্বপ্না, আমার ফায়ার-ব্র্যান্ড্ ভাইডিরে আর ছোঁয়াইতে পারবি না ওই সব। আনু, আমি কই কি, প্রসাদের কথাটা ভুইল্যা দুইখান প্যাঁড়া খাইয়া ল। খাওনের ব্যাপারে প্রিন্সিপলগুলি এট্টু রিল্যাক্স্ কোরতে হয়।'

চাপা ঠোঁটে আনন্দ বললে, 'না দাদা, পারুম না। যেগুলিন বিশ্বাস করি না— সেইগুলি সম্পর্কে কোনো রিল্যাক্সেশন আমার পক্ষে সম্ভব না। ও প্রসাদ-ক্সাদে আমার প্রবৃত্তি হইবো না।'

স্বরাজ বললে, 'তরা যা অর্থোডক্স হইছস—'

'আদর্শের ব্যাপারে বিপ্লবীরে চরম অর্থোডক্স হইতে হয়। সেইখানে কোনো কম্‌প্রোমাইজ্‌ চলে না।'

'তাই বুঝি? দরকার হইলেও না? লেনিন কী কইছিলেন? টু ট্যাক্‌টিক্‌সে—'

'লেনিনের মিসইন্টারপ্রেট্‌ কইর‍্যা প্রোলিট্যারিয়ান রেভোল্যুশনের দফা তোমরা শ্যাষ কইরা আনছ।'

স্বরাজ সামলে নিলে। অনেক কষ্টে।

'নাঃ, তর লগে আর তর্ক করুম না। যা স্বপ্না, রুটি আর মাছভাজাই আন্‌। প্যাঁড়া খাওন অর কপালে নাই, তুই আর কী করবি?'

স্বপ্না বললে, 'আমি যাইতাছি। কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা কইর‍্যা থাকবা দুইজনে। আবার তর্ক বাধাইবা না।'

আনন্দ একটু হাসল: 'না, তর্ক করনের কিছু নাই।'

একটু চুপ। বাইরে ঘাসে ঝিঁঝির ডাক। রাস্তার ইলেক্‌ট্রিকের আলোয় গাছের পাতা কাঁপছে। অনেক রাত।

তর্ক নয়, উত্তেজনা নয়, একটা বিষণ্ণতা ছড়াচ্ছে ঘরের ভেতর। স্বরাজ দেখছিল, কী কালো হয়ে গেছে আনন্দ! চোয়াল দুটো উঠে পড়েছে, চোখের কোলে অন্ধকার। আজ কখন খেয়েছে কিংবা আদৌ খেয়েছে কিনা সন্দেহ। অথচ এই ছোট ভাইটা চিরকাল একটু বেশি আদর পেয়েছে, কোনোদিন খিদে সইতে পারত না, মাথার বালিশ নরম না হলে ঘুমুতে পারত না সে।

কিন্তু সময় বদলায়—কী আশ্চর্য ভাবে মানুষ বদলায়! যে রাজনীতির পথে আনন্দ কোনোদিন চলবে বলে কখনো কল্পনা করা যায়নি, আজ সেই পথে সে ঘূর্ণি হাওয়ার সঙ্গে ছুটেছে; আর যে স্বরাজ ঘোষালের কাজে জলের ভেতরে মাছের মতো রাজনীতি ছাড়া নিজের কোনো অস্তিত্বই ছিল না—সে-ই আজকে থমকে থেমে দাঁড়িয়েছে। এখন সে গলা তুলে বলতে পারে: আই হেট পলিটিক্‌স্‌—হিউম্যানিটি ইজ্‌ ডুম্‌ড্‌—আসুক থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার—পড়ুক কটা অ্যাটম বোমা—অল্‌ দি ওয়রিং ক্যাম্প্‌স্‌—ক্যাপিটালিস্ট-কমিউনিস্ট-সোস্যাল ডেমোক্র্যাট্‌—সব একসঙ্গে ধ্বংস হয়ে যাক!

সন্দেহ নেই, চূড়ান্ত নৈরাশ্যবাদীর মতো সে দিনের পর দিন মানসিক অবসাদে তলাচ্ছে। অথচ আনন্দ দাঁড়িয়ে উঠেছে উদ্যত তলোয়ার হয়ে—জ্বলছে। জ্বলুক—আঘাত করুক—বদলে দিক ইতিহাস। কিন্তু ওদের পথ দেখাচ্ছে কারা? কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? যদি শেষ পর্যন্ত ভুলের খেসারত দিতে হয়—তা হলে তার পরিণামটা এত বীভৎস রকমের নিষ্ঠুর যে, বাংলা দেশের রাজনীতি তা দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারে না।

তার সামনে আনন্দ। দুদিন বাদেই এঞ্জিনীয়র হয়ে বেরিয়ে আসত। যদি বিপ্লবের আহুতি হয়, একবিন্দু দুঃখ হবে না; যদি অজ্ঞানের বলি হয়, তবে প্রতিটি ভুলের জন্যে ইতিহাসের কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

আনন্দর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কেমন একটা যন্ত্রণা হচ্ছিল স্বরাজের। কিছু একটা ভাবছে আনন্দ। অন্যমনস্ক চোখ স্থির হয়ে আছে দেওয়ালে হো চি মিনের

ছবিটার ওপর।

'আনু ?'

'কী কও ?'

'বাবা-মায়ের লগে দ্যাখা করবি একবার ?'

বিষণ্ণতা বোধ হয় আনন্দর মনেও জমা হচ্ছিল। একটা নিঃশ্বাস পড়ল তার।

'না, থাউক। কষ্ট দিয়া লাভ নাই।'

অন্য সময় হলে স্বরাজ বিদ্রূপ করে বলত : ওই সব বালাই অথনো আছে নাকি ? কিন্তু এখন ঘরের আবহাওয়াটা বদলে গেছে। এখন একটা বেদনা। আনন্দর চেহারাটা খুব খারাপ হয়ে গেছে।

'বৌদিরে তো দেখি না দাদা—' আনন্দই কথা বলল আবার।

সঙ্গে সঙ্গে একটা কটু স্বাদ সমস্ত মনটাকে ভরে তুলল।

'সে এইখানে নাই। বাপেরবাড়ি গেছে।'

'শরীর সারল একটু ?'

'জানি না—', একবার দাঁতে দাঁত চাপল স্বরাজ : 'খুব পলিটিক্‌স্‌ কর্‌তাছে।'

'অ।' একটু হেসে আলোচনাটা এইখানেই থামিয়ে দিলে আনন্দ। সে নিজের ভেতরে অনেকটা তলিয়ে আছে এখনো, স্বরাজের মুখের চেহারা লক্ষ্য করল না, তার কথার ধরনটাও না। খুব সহজভাবে বললে, 'নীলুরে নিয়া গেছে ?'

'না, নীলু এইখানেই আছে। ঘুমাইতাছে স্বপ্নার ঘরে।'

আবার কিছুক্ষণের নীরবতা। তারপর স্বরাজ ডাকল : 'আনু ?'

'কী কও ?'

'ট্রান্‌স্‌ফার নিয়া দিল্লী যাইতাছি।'

'মা-বাবারে ফেইল্যা যাবা ?'

'স্বপ্না দেখবো। তুই তো আর রেসপন্‌সিবিলিটি নিলি না।'

একবারের জন্যে ছায়া পড়ল আনন্দর মুখে। কিন্তু সে ভাবটাকে থাকতে দিল না বেশিক্ষণ।

'দাদা, সেই কথা কইয়া আর লাভ নাই।'

লাভ নেই, কারণ স্বরাজের কথায় যে জবাবটা দিতে হয়, সেটা এখন অত্যন্ত নিষ্ঠুর শোনাবে। স্বরাজ আবার মিনিটখানেক চেয়ে রইল আনন্দর দিকে, তারপর বললে, 'আনু ?'

'অ্যাঁ ?'

'যাবি আমার লগে ?'

'কই ?'

'দিল্লী।'

'ক্যান ?'

'কয়দিন রেস্ট্‌ নিয়া আসবি। এইখানে তো বিশ্রাম পাবি না একদিনও। তবে রেভোলিউশনারী লাইন ছাইড়্যা দিতে কই না—দিন কয়েক—'

আনন্দ হাসল।

'না দাদা, অখন না। সময় নাই।'
'এত কাজ?'
'এতই কাজ।'
স্বরাজ থেমে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু ওদের থামবার সময় নেই। এখন ঝড়ের মধ্য দিয়ে চলছে। ইতিহাস না বদলালে ওরা থামতে পারে না। অনেক যুদ্ধ, অনেক মৃত্যু ওদের সামনে।
কিন্তু ওই প্রশ্নটাই ভোলা যায় না। আত্মবলি? না অজ্ঞানের বলি?
আনন্দ বললে, 'দাদা, একটা কথা কমু?'
'ক।'
'গোটা পনেরো টাকা দিতে পারবা?'
'তর নিজের জইন্য হইলে নিশ্চয় দিমু।'
'যদি কই, আমাগো পার্টি ফাণ্ডে?'
স্বরাজের মুখের রেখাগুলো শক্ত হয়ে উঠল।
'তাইলে এক পয়সাও দিমু না।'
আনন্দ হাসল: 'প্রিন্সিপল?'
'তাই। তুই তো প্রসাদের প্যাঁড়া খাইতে চাস নাই।'
হাসিমুখেই চুপ করে রইল আনন্দ। তারপরে বললে, 'দাদা, একদিন বুঝবা। সেইদিন জানবা—এই গেরিলা যুদ্ধ আর কৃষক বিপ্লব ছাড়া পথ নাই।'
আই হেট পলিটিক্স। আবার স্বরাজের মাথার মধ্যে সেই জ্বালাটাই জ্বলে উঠল। বললে, 'ঠিক আছে। যদি কোনোদিন বুঝি, রাইফেল নিয়া সঙ্গে দাঁড়ামু। কিন্তু অখন না। অখনও এই বিশ্বাস আমার যায় নাই যে, তরা চল্‌ছস অ্যাডভেঞ্চারিজমের পথ ধইর‍্যা। তাতে অ্যানার্কি আইবো, রিয়্যাকশনারী ফোর্স আরো অ্যালার্ট হইবো, আর যাই আসুক, বিপ্লব আইবো না।'
খাবারের থালা নিয়ে স্বপ্না ঢুকল।
'অখনো ওই করতাছ তোমরা?'
'না, এইখানেই ইতি। দেখি, কী আনছস? খুব ক্ষুধা পাইছে।'
শুধু রুটি আর মাছভাজা নয়, একটু তরকারীও এনেছে স্বপ্না। আজকের একটু বাড়তি রান্না, কালকের জন্যে তোলা ছিল।
আনন্দ খেতে লাগল। তার খাওয়ার দিকে চাইতে পারল না স্বরাজ, সরে এল ঘরের আর এক পাশে। স্বপ্নার চোখে জল আসছিল।
'ছোড়দা?'
'কী কস?'
'দুধ আনুম একটু?'
'দুধ খায় পোলাপানে। আজ মাছভাজাটা ফার্স্ট ক্লাস লাগ্‌তাছে।'
'আনি আর খান দুই?'
'পাগল! অখন আবার অনেকখানি দৌড়াইতে হইবো। বেশি খাইলে আইল্‌সামি ধোরবো—ওই সব বড়লোকী পোষায়?'

'ছোড়দা, থাইক্যা যা রাত্তিরে।'

'না, থাকনের জো নাই—' খেতে খেতে আবার অন্যমনস্ক হল : 'অ্যাকটা কথা কই। কয়দিনের ভিতরেই অনেক দূরে চইল্যা যাইতাছি—কবে আসুম, আর কোনোদিন আসুম কিনা জানি না।'

স্বরাজ ফিরে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে।

'কী কইলি ? কই যাবি ?'

আনন্দ হাসিমুখে এড়িয়ে গেল জবাবটা। তারপর হঠাৎ খাওয়া বন্ধ করে বললে, 'এই, কয়টা বাজল রে ?'

স্বপ্না বললে, 'সোয়া এগারোটা হইবো।'

'সোয়া এগারোটা !' বিদ্যুদ্বেগে এক গ্লাস জল গিলল আনন্দ, তারপর পকেট থেকে একটা ময়লা রুমাল বের করে মুখ মুছতে মুছতে বলে, 'ঈশ্, খুব দেরি হইয়া গেল ! জরুরী কাজ আছে একটা—চললাম।'

আর অপেক্ষা করল না। একটা সম্ভাষণও করল না আর। দরজা খুলে নেমে পড়ল বাইরের ঘুমন্ত রাত্রির ভেতরে।

স্বপ্না কেঁদে উঠতে যাচ্ছিল, স্বরাজ বললে, 'চুপ, করস কী ? লোক জাগাবি নাকি পাড়ার ?'

মুখে আঁচল চেপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল স্বপ্না। আনন্দর আধখাওয়া থালাটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে স্বরাজেরও চোখ ঝাপসা হল, মনে হল পনেরোটা টাকা ওকে দিলেই হত।

॥ ছাব্বিশ ॥

ডনের বাবা নেমে এলেন। খুব খুশি হয়ে নয়। রাত সোয়া দশটার কাছাকাছি, বোধ হয় শোবার উদ্যোগ করছিলেন ভদ্রলোক।

কোনো ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে বড় চাকরি করেন। বয়েস ষাটের কাছাকাছি। উজ্জ্বল চোখ, চওড়া কপাল। আপাতত কপালটা একটু কুঁচকানো।

মণীশদাকে চিনতেন না, কিন্তু টিনটিনকে অবশ্য দেখেছেন। এ স্মল, প্রেটি গার্ল। হাঁ, তাঁর ছোট ছেলে ডনের বন্ধু। কয়েকবার এসেছে তাঁর ফ্ল্যাটে। ইয়েস—দ্য গার্ল ওয়জ সুইট !

না, তাঁর এখানে তো টিনটিন আসে নি !

ডন ? ডন তো কলকাতায় নেই। তিনদিন ধরেই নেই। তাঁর বড় ছেলে জামশেদপুরে এনজিনীয়ার, টিস্‌কোতে। সেখানে বেড়াতে গেছে সে।

খবর এই পর্যন্তই।

অসময়ে ভদ্রলোককে বিরক্ত করা হল, এজন্যে তিনি যেন মার্জনা করেন। না না, সেকথা কেন আসছে ? মেয়েটিকে পাওয়া যাচ্ছে না—উৎকণ্ঠা তো খুবই স্বাভাবিক। অ্যান্ড দিজ ডেজ ইন্ হিয়ার—ইন ক্যালকাটা ! মণীশদার কথারই পুনরুক্তি : অ্যাট টাইমস্ ইয়ু থিংক—ইয়ু আর লিভিং ইন এ স্যাংচুয়ারী। যাই হোক, টিনটিনকে পাওয়া

গেলে তাঁকে যেন একটা খবর দেওয়া হয়। তিনিও খুব চিন্তিত থাকবেন। দ্য গার্ল ইজ ভেরী সুইট অ্যান্ড এ প্রেটি ওয়ান।

তারপর গাড়িতে ফেরা। কিছুক্ষণ দু পাশের ঘুমন্তপ্রায় নৈঃশব্দ্য প্রাচীর ঘেরা সাহেবী আমলের বড় বড় বাড়ি থেকে পুরনো গাছের ছায়াপথের ওপর কলকাতায় অবাক-লাগানো এক-আধকা জোনাকির হঠাৎ সেই ছায়া থেকে বেরিয়ে এসে নিয়নের আলোয় হারিয়ে যাওয়া। আর মোটরের চলা—মোটরের শব্দ।

মণীশদা কিছুক্ষণ গুম। তারপরেই আবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে মেয়েলি ধরনের কান্নার পালা।

'মেয়েটা ঠিক সুইসাইড করেছে টুলু। লেকেই। আমি বাড়ি গিয়ে—'

বলতে বলতেই থেমে গেল। ভাঙা গলায় আর একটা সুর বেরুল এবার।

'কিন্তু ফায়ারব্রিগেডে ফোন করেই বা কী করব? মরা মেয়েটাকে জলের তলা থেকে টেনে তুলবে, এই তো? সেও কি সইতে পারব? আর তোমার দিদি—তোমার দিদি তো পাগল হয়ে যাবে!'

পাগল হয়ে যেতে কারই বা বাকী আছে, টুলু ভাবল। দুশ্চিন্তা হতে পারে, যন্ত্রণা হতে পারে—সবই স্বাভাবিক; দিদিকে বোঝা যায়। কিন্তু মণীশদা—এমন ধুরন্ধর অ্যাটর্নি হয়ে এত বেশি এগিয়ে না ভাবলেও পারত। লেক ছাড়া আর কি জায়গা নেই পৃথিবীতে? টিনটিন ছেলেমানুষ হতে পারে, কিন্তু আদৌ বোকা নয়। মণীশদা যাদের জানেন, তাদের বাইরেও বন্ধু-বান্ধব থাকতে পারে তার, বালিগঞ্জে লুকোনোর মতো একটা জায়গার অভাব নাও ঘটতে পারে। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই একটা চরম ভাবনা না ভাবলেও বোধ করি চলে।

টুলু আস্তে আস্তে ডাকল: 'মণীশদা?'

'অ্যাঁ!'

'এমনও তো হতে পারে—'

'কী হতে পারে?' শেষ করার আগেই মণীশদা মুখ থেকে কেড়ে নিলে কথাটা।

'ডন তো জামশেদপুরে চলে গেছে।'

'সে তো তিন দিন হল।' ভাঙা গলায় মণীশদা বললে, 'তার সঙ্গে আর সম্পর্ক কী?'

'এ তো হওয়া সম্ভব যে টিনটিন তার কাছেই চলে গেছে। আমাকেও বলেছিল, ডন তার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু।'

'একা চলে যাবে জামশেদপুরে?' মণীশদা বললে, 'এখান থেকে হাওড়ায় চলে গিয়ে, তারপরে ট্রেনে চেপে? অত সাহস হবে ওর?'

টুলুর হাসি পেলো। যে মেয়ে ওভাবে পালাতে পারে, তার পক্ষে এ কাজটা একেবারেই অসম্ভব?

বললে, 'ঝোঁকের মাথায় সব পারা যায়।' নিজের কথা মনে পড়ে গেল তার, সেও তো একবার অল্প বয়সে মা'র সঙ্গে ঝগড়া করে কৃষ্ণনগরে পালিয়ে গিয়েছিল মাসীমার বাড়িতে।

মণীশদা আবার বললে, 'ট্রেনের ভাড়াও তো আছে। টাকা পাবে কোথায়?'

'হাতখরচ থেকে জমাতে পারে, ওর কোনো বন্ধুর কাছ থেকে ধার নিতে পারে।'

'রাইট।' মণীশদা তৎক্ষণাৎ সোজা হয়ে উঠে বসল : 'তা হলে আবার যাওয়া যাক ওদের ফ্ল্যাটে।'

'সেটা কি ঠিক হবে? ভদ্রলোক বোধ হয় এতক্ষণে—'

পাগল ক্ষেপিয়ে দিলে যা হয়, শুনেই জ্বলে উঠল মণীশদা।

'শুয়ে পড়েছেন তো কী হবে? ওঁর ছেলে আমার মেয়েকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যাবে, আমি রাস্তায় রাস্তায় পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াব আর উনি নিশ্চিন্তে ঘুমুবেন? অল রাইট, আগে যাব পার্ক স্ট্রীট থানায়, কমপ্লেন লজ করব, পুলিস সঙ্গে নেব—' মণীশদার উত্তেজনার পর্দা চড়তে লাগল : 'অ্যান্ড আই হ্যাভ গ্রেভ ডাউট্স্—হয়তো ডন মোটেই জামশেদপুরে যায় নি, ওই বাড়িতেই মেয়েটাকে লুকিয়ে রেখেছে!'

টুলু বিব্রত বোধ করল। পুলিসের ব্যাপারে সে আর যেতে চায় না—থানায় একটি-দুটি রাত্রিবাসই তার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়েছে। এবং কে জানে, থানার কেউ তাকেই বলে বসবে কিনা : তুমি একজন মস্তান না? লেকের দিকে তোমাকে তো ঘোরাফেরা করতে দেখেছি।

কাতর হয়ে টুলু বললে, 'আগেই অতটা করে বসবেন? যদি সত্যিই বাড়িতে না পাওয়া যায়, যদি ডন তিন দিন আগেই জামশেদপুরে চলে গিয়ে থাকে? তা হলে ভদ্রলোক রাগ করে—'

মণীশদা একটু সচেতন হল। বাস্তবিক। ডনের বাবা যে-কেউ নন, উড স্ট্রীটের বনেদী পাড়ায় ফ্ল্যাট নিয়ে থাকেন, বড় অফিসার, রাশভারী চেহারা, চাপা ঠোঁট। মিথ্যে একটা নোংরা কমপ্লেন করে তাঁর বাড়িতে পুলিস ঢোকালে তিনি যে মানহানির মামলা করবেন না, একথা জোর করে বলা যায় না। মণীশদার অ্যাটর্নিসুলভ বুদ্ধি একটু সজাগ হল এবার।

'হুঁ।' একটু চুপ করে থেকে বললে, 'কিন্তু ডনের জামশেদপুরের ঠিকানাটা তো পাওয়া দরকার!'

'সেটা কাল—'

'কাল?' মণীশদার চোখে আগুন ছুটল : 'আমার এই অবস্থায় কাল পর্যন্ত আমি বসে থাকব?'

'তা হলে বাড়িতে গিয়ে একটা ফোন করা যায়।' ভয়ে ভয়ে টুলু জানালো।

মণীশদা আবার একটু গুম হয়ে রইল। বোধ হয় ভেতরে ভেতরে ক্লান্তও বোধ করছিল একটু। বললে, 'আচ্ছা, তবে তাই।'

ওদিকে সে-সময় ভুলু—অর্থাৎ প্রবীর আর একটা চাকরি করছিল।

দিদিকে নিয়ে তো বাড়িতে আসা হল। এবং—না, টিনটিন ফেরে নি।

তারপরে দিদি যে কাণ্ড আরম্ভ করল, তা ধারণারও বাইরে। মাথার চুল ছিঁড়তে আরম্ভ করল এবং সেই সঙ্গে প্রচণ্ড চিৎকার।

'আমাকে এক্ষুনি নিয়ে চল জ্যোতি বসুর বাড়িতে—আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব।'

রাজনীতির ঘূর্ণিপাকে সে ভদ্রলোক এই মুহূর্তেই যথেষ্ট বিব্রত, তাঁর কাছে গিয়ে

এখন হানা দেওয়া উচিত কিনা এবং দিলেও দেখা পাওয়া যাবে কিনা এসব বাস্তব সমস্যার কথা ভাবতে হল প্রবীরকে।

'দিদি, এমন করছিস কেন? মণীশদা তো এখনো ফেরেন নি?'

কে কার কথা শোনে! দিদি দেওয়ালে মাথা খুঁড়তে আরম্ভ করল। জুভেনাইল সাইকোলজীতে তার অগাধ জ্ঞান এবং সে একেবারে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সন্তান মানুষ করে থাকে—তাকে দেখে এই মুহূর্তে সেটা কল্পনা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো।

প্রবীর ভাবছিল, এর চেয়ে দৌড়ে এখান থেকে পালানো ভালো। কিন্তু সেও অসম্ভব। অন্তত নিজের বোন—নিজের ভাগ্নী। তাকে এই সংকট থেকে বাঁচালেন পাশের ফ্ল্যাটের মিসেস দাশগুপ্ত এসে। একটু বয়স্কা মহিলা, কোন কলেজের প্রিনসিপ্যাল, সহৃদয়া। তিনি এলেন সান্ত্বনা দিতে, তাঁর সঙ্গে আরো কারা সব মেয়েরা এসে গেলেন।

ভালোই হল। এ অবস্থায় মেয়েরাই সান্ত্বনা দিতে পারেন।

'ভুলু, তুই একটু রাস্তায় দাঁড়া। যদি টিনটিন এসে পড়ে, যদি ওরা সঙ্গে করে তাকে নিয়ে আসে—'

স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল প্রবীরের। এর চাইতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকাও সুখকর।

রাত বাড়ছে। ঘরে ঘরে আলো নিভছে, পথের আলো জোরালো হয়ে উঠছে। সারাদিনের ক্লান্তিতে মাথা ঘুরছিল, মনে পড়ল মনটা ভালো ছিল না, সুজাতাকে দেখেছিল ময়দানের মিটিঙে—সাবিত্রীর কাছে গিয়েছিল। বাড়ি ফিরেই দিদির এই ব্যাপারটা।

সকালে উঠেই বিস্বাদ খবরের কাগজ। সংকট বাড়ছে—বাড়ছেই। বক্তৃতা—প্রতি-বক্তৃতা। বিবৃতি—প্রতি-বিবৃতি। ফসলের মাঠে ভ্রাতৃঘাতী রক্ত। এর প্রয়োজন ছিল? হয়তো ছিল। ইতিহাস জানে।

একটা গাড়ি এসে থামল, চকিত হল প্রবীর। আচ্ছন্নের মতো নামল মণীশদা, শুকনো মুখে টুলু। জিজ্ঞেস করবার দরকার ছিল না, টিনটিনের খবর মেলে নি। একবারের জন্যে মণীশদার মুখ উদ্ভাসিত হল একটু।

'তুমি এখানে? টিনটিন ফিরেছে?'

দ্বিতীয় প্রশ্নটার জবাব দিল না।

'দিদি আমাদের বাড়িতে গিয়েছিল টিনটিনকে খুঁজতে।'

'ওঃ!' দুর্বল পায়ে বাড়ির দিকে এগোতে এগোতে মণীশদা ফিরে দাঁড়ালো একবার, একটু ইতস্তত করল।

'তোমার দিদি কেমন আছে এখন?'

'অন্য মেয়েরা সব রয়েছেন দিদির কাছে।'

একটু চুপ করে রইল মণীশদা। তারপর বললে, 'তোমরা দু ভাই তো অনেকক্ষণ রইলে, আর থেকে কী করবে? রাত অনেক হয়ে গেল, বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম করো এবার।'

'যদি কোনো দরকার হয় মণীশদা—'

'খবর দেব, ভুলু। কিন্তু রাত অনেক হয়ে গেল, এখন তো বাস পাবে না আর। আমার ড্রাইভার বোধ হয় এখনো আছে, তাকে বলি—তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আসুক।'

'আমরা একটা ট্যাক্সি নিয়ে নেব মণীশদা, সেজন্যে ভাবতে হবে না। কিন্তু আমি বলছিলুম, টুলু ফিরে যাক—আমি বরং রাতটা এখানে থাকি।'

'তাতে কোনো লাভ হবে না ভুলু, তোমার দিদি আজ সারারাত ঘুমোবে না, তোমাদেরও ঘুমুতে দেবে না। শুধু শুধু কষ্ট করবে কেন? বললুম তো, সে রকম দরকার হলে আমি তোমাদের খবর দেব।'

'মুরারি হালদার মশাইকে যদি একটা ফোন করেন—উনি আমাদের মেসেজ দেবেন। হালদার এম-সি, থ্রী ট্যাঙ্কস রোড—'

'সে আমি দেখে নেব—' সিঁড়ির দিকে আড়ষ্ট পায়ে এগোতে লাগল মণীশদা: 'আচ্ছা, এসো তোমরা—'

দু ভাই একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। এর পরে থাকা উচিত? প্রবীরের মনে হল, না, চলে যাওয়াই ভালো। বেদনার একটা স্তর আছে—যখন নিজের মধ্যে তাকে আর রাখা যায় না, উপচে পড়ে, আকুল আর অসহায় হয়ে যায়—আরো অনেককে তখন তার ভেতরে টেনে আনতে চায়, সান্ত্বনা খোঁজে ও তারপর আসে নিজের সময়—একান্তে সেই দুঃখকে নিয়ে বসা, তখন সেখানে বাইরের কাউকে দরকার হয় না, এমন কি সহ্যও করা যায় না।

বিকেল থেকে এতক্ষণ ওদের ঝড়ের মতো কেটেছে। এইবারে—সারাটা রাত ধরে যেমন করে একটানা ক্লান্ত বৃষ্টি পড়তে থাকে, তেমনি করে দুজনের সময়। এখন চলে যাওয়াই ভালো।

টুলুকে বললে, 'চল।'

টুলু ঘাড় নাড়ল। তার আপত্তি নেই।

দু'ভাই চলতে আরম্ভ করল। লেকের দিকে শ্মশানের নীরবতা। উদ্বাস্তু কুটির-গুলোর আলো কখন নিভে গেছে, আলো-আঁধারিতে দুলছে গাছপালার সার—একটা চাঁদের টুকরো ঝুলে আছে দক্ষিণায়নের আকাশে। বিশাল সাদার্ন অ্যাভিনিউতেও নীরবতা—বড় বড় বাড়িগুলোতে ঘুম, রাস্তায় নির্জন আলো—এক-আধটা মোটরের দ্রুতগতি। একটা হরিধ্বনির রোল উঠছে। কে যেন চলল কেওড়াতলার দিকে।

ক্লান্ত পায়ে দু'ভাই এগোচ্ছিল। ট্যাক্সি দেখা যাচ্ছে না।

প্রবীর বললে, 'গোল পার্কের কাছে গেলে পাব ট্যাক্সি।'

'সাউথ-এন্ড পার্কের মুখেও স্ট্যান্ড আছে। ওখানে ট্যাক্সি প্রায় সব সময়েই থাকে।'

যেখানে একটা প্রকাণ্ড প্রাসাদের মতো বাড়ি এদিকের সমস্ত নতুন ঐশ্বর্যের ভেতরেও পোড়ো মহলের মতো পড়ে আছে—ভরে আছে জঙ্গলে আর আগাছায়, যার আশেপাশে কটা চা ইত্যাদির দোকান গড়ে উঠেছে হয়তো জবরদখলেই, তার পাশ দিয়ে একটা ছোট নির্জন রাস্তা ধরে ওরা চলছিল গড়িয়াহাট রোডের দিকে।

সেই সময় তারা তিনজন এল।

ওদের জন্যে হয়তো অপেক্ষা করছিল না। হয়তো অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু হঠাৎ পাওয়ার এমন সৌভাগ্যকে কে ছেড়ে দেয় হাতের মুঠো থেকে!

'এই যে শ্লা—টুলে!'

না, কার্তিক ছিল না। ছিল সে, কার্তিকের কাছ থেকে মার খেয়ে যে ছুটে

পালিয়েছিল, বলেছিল, 'আচ্ছা—আচ্ছা—দেখে নেব।'

টুলু চিৎকার করে উঠল: 'দাদা—দাদা, গুণ্ডা!'

তার আগেই ছোরা ঝলকে উঠেছিল একটা। সেটা নামবার আগেই প্রবীর এগিয়ে এসে প্রচণ্ড একটা ঘুঁষি বসিয়ে দিলে ছেলেটার মুখে। টলতে টলতে হাতকয়েক পেছিয়ে গেল সে। সেই সুযোগে এক ধাক্কায় টুলুকে দূরে সরিয়ে দিলে প্রবীর।

টুলু চিৎকার ছাড়ল: 'গুণ্ডা - গুণ্ডা—হেল্প্—'

ছোরা আরও ছিল। পাশ থেকে আর একজনের অস্ত্র এসে বিঁধল পাঁজরে। একবার—আর একবার।

'গুণ্ডা—খুন—খুন—'

চিৎকারে নির্জনতা দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে গেল। পাঁজরে হাত দিয়ে টলতে টলতে প্রবীর বসে পড়ল ফুটপাথের ওপর। হাতের আঙুল ছাপিয়ে ছিটকে বেরিয়ে আসতে লাগল রক্ত, প্রবীর শুয়ে পড়ল এবার।

'দাদা—দাদা—দাদা—'

ছোরা টুলুর ওপরেও আসছিল, কিন্তু এবারেও বেঁচে গেল সে। চায়ের দোকানের দিক থেকে কারা যেন কোলাহল তুলছে। কোত্থেকে তীরবেগে আসছে পুলিস-ভ্যান।

ছেলে তিনটে ছায়া হয়ে মিলিয়ে গেল রাত্রির ভেতরে।

॥ সাতাশ ॥

তিনটি স্ট্যাবিং উণ্ড সবসুদ্ধ। বাঁদিকের পাঁজরার ঘা-টাই ফেটাল হতে পারত, আধ ইঞ্চির জন্যে বেঁচে গেছে হৃৎপিণ্ডটা। দেখা করতে দিলে দিনচারেক পরে।

না, ভয়ের আর কিছু নেই। তবে প্রচুর রক্তক্ষয়। একটু সময় লাগবে সেরে উঠতে।

সেই ভালোমানুষ, নিতান্তই বাঙালী ঘরের মা—বাবা যাকে ইডিয়ট বলে মনে করতেন—কান্নায় ফেটে পড়লেন ছেলেকে দেখতে এসে। অনেক কষ্টে নার্স তাঁকে শান্ত করে বাইরে নিয়ে গেল। টিনটিনের এখনো খবর পাওয়া যায় নি, দিদির দিন কাটছে প্রায় পাগলের মতো—সে এল না, তার আসবার কথা মনেও পড়ল না কারুর। মণীশদার অবশ্য কর্তব্যে ত্রুটি হল না, শুকনো মুখ, বসা চোখ আর রুক্ষ চেহারা নিয়ে সে দেখতে এল একবার।

'কেমন বোধ করছ ভুলু?'

সর্বাঙ্গে স্টিচ, ব্যাণ্ডেজ আর যন্ত্রণা নিয়েও প্রবীর নিজের কথা ভুলে গেল।

'এ কি চেহারা করেছেন মণীশদা?'

'আমি ঠিক আছি ভুলু, আমি ঠিক আছি। কিন্তু তোমার দিদি—' জায়গাটা নিতান্তই হাসপাতাল বলে মণীশদা ডুকরে কেঁদে উঠলো না: 'তাকেও বোধ হয় আর রাখতে পারব না। টিনটিন—আমি জানি, শী ইজ অলরেডি ডেড্—অভিমানে আত্মহত্যা করেছে, কিন্তু তোমার দিদিও আর বাঁচবে না।'

পেটে, পাঁজরে ব্যাণ্ডেজ নিয়ে ক্ষীণ গলায় প্রবীরকে সান্ত্বনা দিতে হল: 'আপনি

ভাববেন না মণীশদা—দু-চার দিন অপেক্ষা করুন, টিনটিন ঠিক ফিরে আসবে।'

কাঁদাটা সম্ভব নয় বলেই মণীশদা হাসতে চেষ্টা করল।

'ভুলু, যা ঘটবার তা ঘটে গেছে, উই মাস্ট ট্রাই টু বেয়ার ইট উইথ পেশেন্স! টিনটিন নেই, আমি জানি—' বলতে বলতে গলা ধরে এল, একটা ঢোক গিলল মণীশদা: 'ওসব থাক—কিন্তু কারা তোমাকে ছোরা মারল ভুলু, কী তাদের মোটিভ? তোমার সঙ্গে তো কারো শত্রুতা নেই বলেই জানি।'

সেই রাত্রে—হাসপাতালে এসে একটা ঘোরের মধ্যে যে কৈফিয়ৎ সে পুলিসকে দিয়েছিল, তারই পুনরাবৃত্তি করতে হল তাকে।

'কিছু না মণীশদা—একেবারেই গুন্ডা। ছিনতাই করতে এসেছিল। বাধা পেয়ে ছুরি মারে। টুলুর চিৎকারে পুলিস ভ্যান এসে যায় একটা।'

'ছিনতাই—একেবারে সাদার্ণ অ্যাভিনিউর ওপর!' চকিতে জ্বলে উঠল মণীশদা: 'এই হল ইউনাইটেড ফ্রন্ট গভর্নমেন্টের চেহারা—আর ডেপুটি চীফ মিনিস্টার—পুলিসের মন্ত্রী, তাঁর বাড়ি সেখান থেকে কত দূরে? অ্যান্টি-সোস্যাল এলিমেন্টকে রাজনীতির স্বার্থে লাগালে এই হয়, তখন ফ্র্যাংকেনস্টাইনের সাব-হিউম্যান বৈজ্ঞানিক ফ্র্যাংকেনস্টাইনকেই হত্যা করতে আসে।'

সেই যুক্তফ্রন্ট—অসংখ্য মানুষের যন্ত্রণা, প্রতি মুহূর্তের চক্ষুশূল। আর অবশ্য বেশি দেরি নেই তারও, যাঁরা তাকে গড়েছিলেন, তাঁরাই তাকে ভাঙবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছেন এখন—বাংলা দেশের ছিন্নমস্তা রাজনীতি নিজেদের রক্ত খাওয়ার জন্যে জিভ মেলেছে; দেশ নয়, জাতি নয়, ভবিষ্যতের দিকে আলোকিত পদক্ষেপ নয়, এখন শান্ত সাধু সংকল্পকে দলের উপাসনায় বলি দেওয়া চলে। মণীশদাদের আর বেশি দিন মর্মবেদনা ভোগ করতে হবে না—যুক্তফ্রন্টের নাভিশ্বাস ঘনিয়েছে।

মণীশদা এই মুহূর্তে দুঃখী, তার শরীর-মনের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে। এখন তার আর যুক্তি বলে কিছু নেই—নিজের জ্বালায় তার মনে হচ্ছে, যুক্তফ্রন্ট সরকার যদি গদীতে না থাকত, তা হলে টিনটিন এমন করে হারিয়ে যেত না। আর প্রবীর—শরীরে তিনটে ছোরার ঘা নিয়ে যদিও বিপদের সীমাটুকু মাত্র এড়িয়েছে এবং কথা বলতে তার কষ্ট হয়, তবু এ কথাগুলো শুনতে এ অবস্থাতেও তার খারাপ লাগে, একটা তীব্র প্রতিবাদ জেগে ওঠে গলার কাছে।

কিছু একটা বলতেও যাচ্ছিল, কিন্তু মণীশদাই উঠে পড়ল। কর্তব্যের তাগিদেই খবর নিতে এসেছিল, কোথাও বেশিক্ষণ স্থির হয়ে সে থাকতে পারে না—ছট্‌ফট করছে সারাক্ষণ, আজ ছ'দিন সে অফিসে বেরোয় নি।

মণীশদা বললে, 'আমি চললুম। তোমাকে আর বিরক্ত করা ঠিক নয়।'

চলে গেল। হাসপাতালের এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে—নিজের বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে রইল প্রবীর। মাথার অনেক ওপরে ছাত, শীতের প্রথম ছোঁয়ায় একটা ইলেকট্রিক পাখা নিশ্চল হয়ে আছে তার নীচে। হাসপাতালের এই ঘরে অনেক দুঃখ, অনেক যন্ত্রণা, অনেক মৃত্যু, অনেক কান্না, দিনের পর দিন। এখানকার ভারী বাতাসে, তীব্র অ্যান্টিসেপ্‌টিকের গন্ধে, রোগীদের কাতরতায়, নার্সদের সতর্ক চলাফেরায়, ডাক্তারদের গম্ভীর মুখে সেই যন্ত্রণা আর মৃত্যুর আবির্ভাব অনুভব করা যায় সব সময়।

মণীশদা চলে গেল, কাতর অসুস্থ শরীর-মনে মৃত্যুর অনুভব জানিয়ে গেল আর একটা। সেটা কেবল এই ঘরেই নয়—সারা বাংলা দেশে—অনেকগুলো মানুষের প্রত্যাশার ওপর কী নিষ্ঠুর ভাবেই যে নেমে আসছে!

'প্রবীর!'

চেয়ে দেখল, সাবিত্রী।

সাবিত্রী এসে প্রায় আছড়ে পড়ল বেডের ওপর। নিজের ভেতরে মগ্ন হয়ে থাকা এই শান্ত মেয়েটি প্রবীরের অবস্থা দেখে চকিতের জন্যে ধৈর্য হারালো: 'ভুলু, কী করে হল এরকম—কী করে হল! নিউজপেপার আমি মিস্ করেছি, কেউ আমাকে খবর দেয় নি, হঠাৎ তোমাদের অফিসের অঞ্জন ঘোষের সঙ্গে দেখা হয়ে—' সাবিত্রী ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল: 'তোমাকে কেন মারল? তুমি তো কারুর শত্রুতা করো না!'

পাশের বেড থেকে একজন উৎসুক হয়ে ফিরে তাকালো। ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওদিক থেকে ছুটে এল নার্স।

নার্স বোধ হয় একটা ধমক দিতে যাচ্ছিল সাবিত্রীকে, কিন্তু একবার মুখের দিকে তাকিয়েই থেমে গেল। মেয়েরা মেয়েদের চোখ দেখলেই বুঝতে পারে।

সহানুভূতি-ভরা কোমল গলায় নার্স বললে, 'অত এক্সাইটেড্ হবেন না, পেশেণ্টের ক্ষতি হতে পারে। তাছাড়া ভাবনার কারণ নেই বিশেষ, হি ইজ আউট অব ডেন্‌জার নাউ।'

সাবিত্রী নিজেকে সামলে নিলে। চোখের জল মুছে ফেলে বললে, 'থ্যাংক ইউ সিস্টার। আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি হঠাৎ নার্ভাস হয়ে পড়েছিলুম।'

'দ্যাটস অল রাইট।' নার্স হাতের ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখল একবার: 'আর কিন্তু সময় নেই। মিনিট দশেকের ভেতরেই ভিজিটিং আওয়ার শেষ হয়ে যাবে।'

'আমার মনে থাকবে, সিস্টার।'

পৃথিবীতে যখন কোথাও কিছু থাকে না, তখন সাবিত্রীরা থাকে। এতক্ষণ পরে প্রবীরের মনে হচ্ছিল, এত মানুষের ভেতরে আজকে সাবিত্রীকেই তার সবচাইতে বেশি দরকার ছিল।

একটা দুর্বল হাতের মুঠোয় সাবিত্রীর একটা হাত জোর করে আঁকড়ে ধরল সে। নার্স বলেছে, মাত্র দশ মিনিট। দুর্লভ সময়—বিন্দু বিন্দু করে ঝরে যাচ্ছে তার, এখন আর একটা কণাও অপচয় করা চলে না।

আস্তে আস্তে বললে, 'সাবিত্রী, ফিরে গিয়ে তোমাকে ছাড়া আর বোধ হয় চলবে না।'

সাবিত্রীর মাথাটা অনেকখানি নুয়ে এল তার মুখের দিকে। দুটো বড় বড় কালো চোখ টলটল করতে লাগল জলে। এই ঘর, মৃত্যু, মধ্যে মধ্যে এর-ওর কাতরতার কখনো স্পষ্ট, কখনো চাপা গোঙানি—সব ছাপিয়ে একটা সুরভিত ভালোবাসা মেঘের মতো নেমে এল প্রবীরের ওপর।

প্রায় নিঃশব্দ স্বরে সাবিত্রী বললে, 'তুমিই তো ভীরু, তুমিই তো জোর করে নিতে জানো না।'

টুলু গুম হয়ে বসেছিল।

চোখের সামনে সমস্ত ব্যাপারটা যখন ঘটতে আরম্ভ করল, তখন প্রথমটায় যা তাকে পেয়ে বসল তা ভয়—কাপুরুষের চূড়ান্ত আতঙ্ক। কারা যে রাত এগারোটার সময় সাদার্ণ অ্যাভিনিউয়ের ওপর সমস্ত ব্যাপারটার ফয়সালা করতে এসেছে—সেটা বুঝতে দু' সেকেণ্ডেরও বেশি সময় লাগে নি তার। স্বপ্না সঙ্গে থেকে সেদিন বাঁচিয়ে দিয়েছিল বটে, কিন্তু কার্তিকের দল যে এত সহজেই তাকে ছেড়ে দেবে না সে তা জানত। বোমাগুলোর খবর সেই যে পুলিসকে দিয়েছে এমন কোনো প্রমাণ নেই। কিন্তু ওদের কাছে সন্দেহটাই যথেষ্ট, আর টুলু শালার যদি ভেতরে ভেতরে শয়তানী না-ই থাকবে তাহলে অত সহজেই পুলিস ওকে ছেড়ে দিলে কী বলে, আর ওই বা হঠাৎ আচমকা এমন ভালো ছেলে হয়ে গেল কী মতলবে? মানিক থাকলে হয়তো ওদের সামলে রাখত, কিন্তু ঝাণ্ডাওলারা তার মাথা খেয়ে দিয়েছে, ওয়াগন ভাঙা ফেলে সে দৌড়েছে কোথায় কার জমি দখল করতে। এখন আর তাকে বাঁচাবার কেউ নেই।

সুতরাং দাদার হাতের ধাক্কায় ছিটকে সরে গিয়ে গোড়াতে তার মনে হচ্ছিল, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালানো যাক এবার। কিন্তু তারপরেই ঝলকে উঠল তিনদিকে তিনখানা ছোরা—দাদা শুইয়ে দিলে একজনকে—বাকী দু'জন বাঘের মতো পড়ল দাদার ওপর। তখন তার গলাফাটানো চিৎকার—লোকজনের ছুটে আসা—পুলিসের গাড়ি—

সেই অবস্থাতেও দাদা বলেছিল, 'না না—গুণ্ডা—রাহাজানি—'

অর্থাৎ দাদা বুঝেছিল, ওরা টুলুরই দলের—আগের কোনো শত্রুতার শোধ নিতে এসেছিল। আর তখনো অজ্ঞান হয়ে যেতে যেতে—পুলিসের ঝামেলা থেকে টুলুকে বাঁচানোর কথাই আগে মনে জেগেছিল তার।

'গুণ্ডা—রাহাজানি করতে এসেছিল!'

হাসপাতাল থেকে বলেছে, ভয়ের কারণ নেই, অল্পের জন্যে ছোরাটা হার্টে লাগে নি, দাদা এযাত্রা রক্ষা পেয়ে যাবে। কিন্তু মানিক, স্বপ্না, দাদা—এমন কি মণীশদা, ঘোষ সাহেব—সবাই তাকে কেবল বাঁচিয়েই যাবে? সে এমন অপদার্থ, এত বড় কাপুরুষ যে কেবল পালিয়ে পালিয়ে অন্যের আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষা করে চলবে? অপমান—আত্মগ্লানি!

টুলুর মাথায় আগুন জ্বলছিল। মনে হচ্ছিল, একটা কিছু তারও করা দরকার। সেও ছোরা নিয়ে বেরুবে একখানা—ওদের দলের যাকে সামনে পাবে তাকেই শেষ করবে। তারপরে ফাঁসি হয় তো হোক, এভাবে আর বাঁচা যায় না। বাঁচা যায় না—কারণ দাদাকে দেখতে গিয়ে দাদার দিকে তাকাতে পারে না সে, মায়ের মুখের দিকে চাইলে লজ্জার সীমা থাকে না আর, দাদার এই অবস্থার জন্যে সে-ই তো দায়ী!

ঠিক এই যন্ত্রণার ভেতরে মা বলেছিল, 'দেরাজটা একবার খোল তো, ভুলুর ক'টা টাকা দরকার।'

দাদা দেরাজের চাবি মা'র কাছেই রাখে। কিন্তু মা কখনো চাবি খোলে না—বাবার আমল থেকেই পয়সাকাড়িতে হাত দেবার কথা মা ভুলে গেছে। টুলু দেরাজ খুলল, এবং—

এবং টাকা-পয়সার আগে যা তার চোখে পড়ল, সেটা একটা রিভলভার।

রিভলভার সে জীবনে কখনো ছোঁড়ে নি। কিন্তু ফণী একবার একটা দেখিয়েছিল

তাকে। কী করে খুলতে হয়, কী করে টোটা ভরতে হয়।

রিভলভারটা হাতে তুলে নিয়ে কিছুক্ষণ কাঠ হয়ে বসে রইল সে। দাদার ড্রয়ারে রিভলভার কেন? দাদা গণবিপ্লবের কথা বলে, কিন্তু রিভলভার নিয়ে—অন্তত এই মুহূর্তেই বেরিয়ে পড়তে চাইছে, একথা তো কোনোদিন শোনা যায় নি তার মুখ থেকে। তা হলে এটা কোথা থেকে এল?

কিন্তু যেখান থেকেই আসুক, টুলুর মনে হল, এটা দাদা তার জন্যেই রেখে দিয়েছে। কার্তিকের দলটার সঙ্গে মোকাবেলা করবার জন্যে এইটেই তার দরকার ছিল। এইবারে সে বদলা নেবে।

রিভলভারটা খুলে দেখল। ছটা চেম্বারই ভরা।

ঠিক তখন বাইরে থেকে মেয়েলি গলায় কে ডাকল: 'কাকিমা!'

টুলু চমকালো। রিভলভারটা কেঁপে উঠল মুঠোর মধ্যে।

'কাকিমা!'

দরজা খোলবার আওয়াজ এল। আর মা বললেন, 'স্বপ্না! আয় আয়—'

'টুলুদা নেই?'

'আছে বৈকি। ডেকে দিচ্ছি এক্ষুনি।'

॥ আটাশ ॥

রিভলভারটা হাতের মধ্যে কেঁপে উঠলো টুলুর। বাইরে স্বপ্নার গলার আওয়াজ। মা'র সাদর আহ্বান কানে গেল। স্বপ্না তার সঙ্গেই দেখা করতে আসছে। অতএব দেরাজটা খুলে যথাস্থানে সেটাকে রেখে দিতে দিতেই স্বপ্না ঘরে ঢুকে পড়লো।

'টুলুদা, একটু আসবে—তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল!'

'বেশ বল—' টুলুর মুখটা তখনও ছায়ের মত সাদা।

'এখানে হবে না। চল একটু বাইরে।'

'তুমি যাও, আমি আসছি—।'

স্বপ্না!

সেদিন তার সঙ্গে থেকে তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু কার্তিকের দল এত সহজেই তাকে ছেড়ে দেবে না। বোমাগুলোর খবর সে পুলিসকে দিয়েছে এমন কোন খবর নেই। কিন্তু ওদের কাছে সন্দেহই যথেষ্ট।

চিন্তায় ছেদ পড়লো: 'টুলুদা?' স্বপ্না ডাকলো।

'আসছি।' গায়ে জামাটা চড়িয়ে সে বেরিয়ে পড়লো।

সোজা পথ। গাছের সারি। দুজনে চুপ করেই চলছিল। ট্রাম-বাসের লোক সব কিছুর পথ ছেড়ে ওরা বাঁয়ে দুধারে গাছের সারিওলা নির্জন পথটাই ধরলো। স্বপ্না তার পাশে থাকলে যেন তার রক্তে কেমন একটা নেশা ধরে। এতদিন চলছিল সে একটা ঝোঁকের মাথায়। আজ আবার যেন রূপকথার একটা জগৎ তাকে হাতছানি দিচ্ছে। "আমি ভাল হয়ে যাচ্ছি—দারুণ ভালো হয়ে যাচ্ছি।"—এই রোমাঞ্চটা তার স্বপ্নাকে দেখলেই যেন বুকের মধ্যে ধকধক করে ওঠে। দাদার কথাগুলো তার কানে বাজতে

লাগলো ঃ "দেরি হয় না, কোনো কিছুতেই দেরি হয় না। তোর চাইতেও বেশি বয়েসে পড়াশুনা ধরে অনেকে ডক্টরেট পর্যন্ত এগিয়ে গেছে।"

কিন্তু— ? হাতের মধ্যে যেন শক্ত রিভলভারের স্পর্শটা তখনও জড়িয়ে ছিল।

টুলু চমকে উঠলো স্বপ্নার ডাকে।

'টুলুদা এসো, বসি।' ওরা দুজন লেকের ধারে ঘাসের ওপর বসলো। কোনো ভূমিকা না করেই স্বপ্না বললো, 'দাদাকে কানপুরে ট্রান্সফার করেছে। দাদা সেখানেই চলে যাবেন।'

'বৌদি, নীলু সবাই তো যাচ্ছে সঙ্গে ?' টুলু জিজ্ঞেস করলো।

'গেলে তো ভালই হতো। ওরা কেউই যাচ্ছে না।' বেশ গম্ভীর গলায় স্বপ্না বললে।

'যাচ্ছে না কেন ? ও, বাড়ি পান নি বুঝি ? আগে নিজে গিয়ে জয়েন করে পরে বাড়ি ঠিক করে সবাইকে নিয়ে যাবেন ?'

'হুঃ, এতো যদি সোজাই হতো তবে আর আজ তোমাকে ডাকতাম না। ব্যাপারটা অনেক দূরে গড়িয়েছে।'

'কি রকম ?' টুলু জিজ্ঞেস করলো।

'তুমি জান, বৌদি বিয়ের আগে পলিটিক্স করতো ? তারপর তাদের বিয়ে ? কিন্তু কিছুদিন হলো ওঁদের একেবারে এডজাস্টমেণ্ট হচ্ছিল না। বৌদির ধারণা, দাদা কতগুলো পুরনো বিশ্বাসেই স্থির হয়ে আছে। তাঁর ধারণা, কমিউনিজম স্টাটিক নয় —সময় বদলায়, অবস্থা বদলায়, প্রত্যেক দেশের কতগুলো নিজস্ব প্রবলেম আছে, তাকে বুঝে চলতে হবে। দেশকে বুঝে মার্কসের থিয়োরীকে প্রয়োগ করেছেন লেনিন, ব্যবহার করেছেন মাও-সে-তুং, হো চি মিন কিংবা কাস্ত্রোকেও নতুন করে ভাবতে হয়েছে। তাঁর ধারণা, দাদা এসব কিছুই বুঝতে পারে না। কুড়ি বছরের আগেরকার পার্টির নীতিই তার কাছে লাস্ট ওয়র্ড। সে ফ্রাসটেশনে ভুগছে, সুতরাং তার সঙ্গে কোনমতেই তার এডজাস্টমেণ্ট হতে পারে না।'

'বৌদি কি চলে যাবেন বলে ঠিক করেছেন ?'

'তিনি চলে গেছেন, আর ফিরবেন না।' ভারাক্রান্ত গলায় স্বপ্না বললে।

'কি করে জানলে যে তিনি আর ফিরবেন না ?' টুলু বললে।

'সাবিত্রীদি গিয়েছিলেন, তাঁর কাছে বৌদি বলেছে ঃ 'আমি আবার কুমারী জীবনে ফিরে এসেছি। ওদের ছেলের বয়স বেশি নয়, ভালো চাকরি করে, সুপাত্রই বলা যায়—ওরা স্বচ্ছন্দে আবার ছেলের বিয়ে দিতে পারে।'

'বৌদি একথা বললেন ? কিন্তু নীলু— ?'

'বৌদি এয়োতির চিহ্ন পর্যন্ত কপাল থেকে মুছে ফেলেছেন। আর নীলু ? সে আমাদের কাছেই আছে।' স্বপ্না থেমে গেল হঠাৎ।

'নীলুকে উনি সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন কানপুরে ?' টুলু জিজ্ঞেস করলো।

'নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু নীলু যাবে না। তার দাদুর কাছে থাকবে সে। বাবাকে একা রেখে সে কিছুতেই যেতে চাইলো না দাদার সঙ্গে।'

টুলু চুপ করে যেন কথা খুঁজতে লাগলো। বেলা-পড়া আলো রাস্তার মাথায় পাশের

বাড়িগুলোর মাথা ছুঁয়ে ছুঁয়ে গাছের ওপর হয়ে যেন লেকের জলে সাতনরী হারের মত রেখা কেটে কেটে মিলিয়ে যেতে লাগলো। গঙ্গাজলী ডুরেশাড়ির মত ধার তুলে তুলে জলটা কালো হয়ে এলো। বকের সারি ফিরছে—পাখীর ঝাঁক বাসায় এলো লেকের গাছগুলোর ওপর। হঠাৎ স্বপ্নাই আগে কথা বললো।

'কি যে করি তাই ভাবছি! বাবার মনটা খুব ভেঙে গেছে। বৌদি চলে গেল বটে, কিন্তু ওর স্বাস্থ্য তো একেবারে ভেঙে গেছে। পলিটিক্সের ধকল ওর সহ্য হবে? তার নীলু, সে বড্ড কষ্ট পেয়েছে।'

অন্যমনস্ক ভাবে টুলু ভাবছিল, স্বপ্নাকে এসময় দাদার খবরটা দেওয়া উচিত হবে কিনা। স্বপ্না ব্যাপারটা কি ভাবে নেবে?

হঠাৎ দুজনেই চমকে ফিরে তাকালো। একটা মিছিল চলেছে। ইনক্লাব জিন্দাবাদ—আমাদের দাবী মানতে হবে—ছাঁটাই করা চলবে না।

কোন একটা কারখানা যেন বন্ধ হয়ে গেছে। মালিক নাকি ইউনিয়নের নেতাদের সঙ্গে আপোস-আলোচনায় বসতে গররাজী, তাই এই বিশেষ মিছিল।

বিক্ষোভ মিছিল সারা কলকাতায়। বাইশ মাসের যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে গেছে। চলেছে রাষ্ট্রপতির শাসন। হবেই, হতে বাধ্য, চারদিকে অনিশ্চয়তার ছায়া। কারু মনে শান্তি নেই। সারা দেশ জুড়ে যেন অরাজকতার তাণ্ডব চলেছে। সকালে খবর কাগজ খুললেই খুনখারাপি, গণ্ডগোল আর মারপিটের খবর। এর পরিণতি কোথায়?

ওরা উঠে পড়লো। সাড়ে সাতটার খবর হচ্ছে। চমকে তাকালো স্বপ্না। সর্বজনশ্রদ্ধেয় প্রবীণ, প্রসিদ্ধ ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা হেমন্ত বসু অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে আজ নিহত হয়েছেন!

পা যেন কে পেছন থেকে টেনে ধরলো। স্বপ্না শুধু অস্ফুট কণ্ঠে বললে, 'টুলুদা, শুনলে খবর?'

॥ উনত্রিশ ॥

কত ফুল আছিল দেশের বাড়িতে। নতুন পুকুর কাটা হইছিল অ্যাকটা—সে মাটিতে যে কী ফুল হইত। গোলাপে ভইর‍্যা যাইত। আর স্থলপদ্ম! পুকুরের চাইরদিক ঘিরা্যা গাছ লাগানো হইছিল, হাজারে হাজারে ফুল ফুটতো। জলে ছায়া পড়তো, মনে হইত, পুকুর ভইর‍্যা পদ্ম ফুটছে।

মনে হয় সব বদলাইয়া গেছে একটা যাদুমন্ত্রে—

'—বাবা?' শিবপ্রসাদ চমকে উঠলেন। স্বপ্না ডাকছে।

ক্লান্ত দুটো চোখ তুলে তাকালেন শিবপ্রসাদ: 'কিছু বলবা মা?'

'না বাবা, কিছু বলুম না।' শান্ত চোখ দুটো স্বপ্নার স্নেহে ভরে ওঠে: 'ভাইব্যা কি করবা বাবা! যা হইবার তা হইবই।'

'বইস্যা বইস্যা ভাবত্যাছি মা, বৌমা কি কইর‍্যা নীলুকে ফালাইয়া চইল্যা যাইতে পারলো! যতই কস দ্যাশ—পলিটিকস্, কিন্তু সকলের আগে তো সে মা!'

'আজকালকার দিনে ক্ষুদ্র স্বার্থের খাতিরে মানুষ বৃহৎ জগতের ডাক উপেক্ষা

করতে পারে বাবা ?' স্বপ্নার ঠোঁটটা কাঁপতে লাগলো : 'দ্যাশের ডাকের কাছে সবই তুচ্ছ হইয়া যায় বাবা।'

চমৎকার সম্ভাবনাময় জীবন শিবপ্রসাদের সামনে। আনন্দ নেই, স্বরাজও চললো। তার মানে এখন সংসারের সব ভার শিবপ্রসাদের ওপর। হাটবাজার করবেন, অসুস্থ উন্মাদপ্রায় স্ত্রী মনোযন্ত্রণায় একটু একটু করে পুড়তে থাকবেন—অসহায়ভাবে তাঁকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে হবে। নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা এখন তাঁর। রিটায়ার্ড করবার পর নীল আকাশের শান্তিতে ডুবে থাকবার কী অপূর্ব অবসর !

পড়ার ঘর থেকে বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এসেছিল নীলু। রেলিং ধরে সে দাঁড়িয়ে ছিল। নীলুর চোখ তার সামনে প্রসারিত আকাশের দিকে।

'স্বপ্না !'

'বাবা, কিছু বলবা ?' আশ্চর্য সহিষ্ণুতা আর সংযম দিয়ে গড়া এই মেয়েটি। কথা বলে কম কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি বোঝায় তার চেয়েও বেশি। এমন কথা-ভরা শান্ত চোখ দেখা যায় না।

'তোর বড়দা আজই যাইবো ?' গলার ভেতর যেন খানিকটা কান্না তাঁর ঠেলে উঠতে চাইল।

'হ বাবা, তাই তো বলত্যাছিল বড়দা।'

অন্যমনস্ক হয়ে যেন স্বগতোক্তি করে চলছেন শিবপ্রসাদ : 'সেই ভালো। আমার পোলা দুইডারে আমি তো মানুষ করতে পারি নাই, তর পোলার ভার তুই-ই নে—নিয়া যা নীলুরে !'

'তোমার খুব কষ্ট হইত্যাছে, না বাবা ?' স্বপ্না বাবার কাছে এসে বসলো।

'না মা। কষ্ট হইবো ক্যান। যার পোলা সে যদি তার রেসপনসিবিলিটি লইতে চায় তাতে আমার আপত্তি করণের কি আছে ? কিন্তু তোর মা আবার খানিকটা সেক্যাইলা কিনা। তাঁরে সামলাই কি কইর‍্যা ?'

চুপ করে রইলো স্বপ্না। সে জানে বাবার এই রিটায়ার্ড লাইফে নিয়ত সঙ্গী নীলু। সে চলে গেলে তাঁর থাকাই দায়। কিন্তু বাবা নিজেকে কিছুতেই ধরা দিতে চান না।

'নীলু রাত্তিরে আর কান্দে না অখন, না ?' শিবপ্রসাদ আবার জিজ্ঞেস করলেন।

'না বাবা, আমার বুকের মধ্যে মুখ গুঁইজ্যা আমারে জড়াইয়া ধইর‍্যা ঘুমায়। একটু পাশ ফিরবার জো নাই। অমনি চমকাইয়া চাইবো আর কইবো : পিসি, তুমি কই যাও !'

'আচ্ছা ধরু, তোর বড়দা নীলুরে লইয়া চইল্যা গেল। তারপর হঠাৎ তর বৌদির স্মৃতি ফিরা আসলো, সে আইস্যা দেখলো তার পোলা তার বাপের সঙ্গে চইল্যা গ্যাছে। তখন—'

স্বপ্না আনন্দ নয়, প্রবীরও নয়, সুজাতাও নয়। এসব প্রশ্নের উত্তর তার জানা নেই। আবার নৈরাশ্য ঘনিয়ে এলো দুজনের মধ্যে।

আবার সান্ত্বনার জেরটাই টেনে আনতে চাইলো স্বপ্না : 'বাবা, যতই পলিটিক্স করুক, বড়দার সঙ্গে যতই ঝগড়া থাকুক, নীলুর জন্যই ফিরতে হইবো বৌদিকে।'

'কি জানি কি করবো !' সামনের দিকে খোলা জানলা দিয়ে চোখের দৃষ্টি প্রসারিত করে দিলেন শিবপ্রসাদ। সামনের নারকেল গাছটায় চিলের বাসা। হয়তো সেখানে

তার কটা বাচ্চা হয়েছে। হাড়সর্বস্ব বাচ্চা দুটোকে কি যেন কোথা থেকে সংগ্রহ করে এনে খাওয়াচ্ছে চিলটা। হাওয়ায় পাতাগুলো কাঁপছে গাছটার। গাছের মাথার ওপর দিয়ে কি যেন একটা পাখীর ঝাঁক উড়ে গেল।

নীলু ধীরে ধীরে এসে দাদুর কাছে বসলো।

সঙ্গে সঙ্গে প্রসঙ্গটা বদলে ঘরের ভারি হাওয়াটা লঘু করতে চাইলেন শিবপ্রসাদ ঃ 'নিচে কারা জানি কথা কইতেছিল! কতগুলি পোলাপানের গলা শুনতেছি!'

'হ্যাঁ দাদু, ওরা তোমার দেওয়ালে চুনকাম করত্যাছে।' নীলু বললো।

'অগো এতো সুবুদ্ধি হইল ক্যান? পরের কারণে স্বার্থ বলি দিয়া ওরা বিনা পয়সায় পরের দেওয়ালে চুন দিবার ব্রত নিলো ক্যান?'

'না দাদু, ওরা ওখানে স্লোগান লিখবো। আমি তো তাই এতক্ষণ খাড়ায়ে খাড়ায়ে দেখতে ছিলাম।'

'কিছু কস নাই তো?' শিবপ্রসাদের মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া পড়লো।

'না দাদু, আমি জানি। সামনের বাড়িতেও ওসব লিখত্যা ছিল। ওরা না করণে ওগো কইছে—"রাস্তায় তো লামতে হইবো, তখন মাথা থাকে কোথায় দেখবেন।" আমি শুধু খাড়ায়ে খাড়ায়ে দেখতে ছিলাম। অগো সকলরেই আমি খুব ভালো কইর‍্যা চিনি। তবু অরা জিগাইলো ঃ এই খোকা, তুই কি দেখছিস? আমি কইলাম ঃ পাখী দেখি। অরা কইলো ঃ তাই দেখ। আমাদের দিকে তাকাবি না। কেউ জিজ্ঞেস করলেও বলবি আমাদের চিনিস না।'

একটু হেসে নীলু বললো, 'দাদু, আমি কইলাম আমি তো আপনাগো চিনি না। আর আমি ওসব কিছু দেখত্যাছিও না।'

'ভালো কইছস।'

অতটুকু ছেলেরা এখন কত সতর্ক কত সাবধান হয়ে গেছে। ওরা আগেকার ছেলেদের তুলনায় অনেক বুদ্ধিমান। অনেক বেশি বোঝে বলেই ওদের মনের ওপর সব জিনিসটারই প্রতিক্রিয়া হয় বেশি। সুজাতা চলে গেছে স্বরাজের সঙ্গে ঝগড়া করে, নীলকণ্ঠের মত সবটুকু বিষপান করেছে নীলু—কিন্তু কোন প্রতিবাদ করে নি সে। একবারও মা'র সঙ্গে চলে যেতে চায় নি। শুধু রাতে স্বপ্নার বুকটাকে আঁকড়ে রাখে দু হাতে। হয়তো ভাবে, মাও চলে গেছে, হয়তো পিসিও তাকে ফাঁকি দিয়ে পালাবে।

কিন্তু আজ বারবারই শিবপ্রসাদ অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছেন—তলিয়ে যাচ্ছেন নিজের মধ্যে। এক-একবার নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরছেন। বড় ছেলের জন্মের সময় স্বাধীনতার সৈনিক তার নাম দিয়েছিলেন স্বরাজপ্রসাদ। রাজনীতির বাড়ি। অল্প বয়স থেকে স্বরাজও রাজনীতি করতো। শিবপ্রসাদ বাধা দেননি। কেন দেবেন? কলেজে পড়বার সময় পুরোদস্তুর সে একজন ছাত্রনেতা—বামপন্থী চিন্তা তার, কংগ্রেস সোসালিজিমের নির্মম সমালোচক সে। অনেক উত্তপ্ত তর্ক চলেছে বাপের আর ছেলের মধ্যে, কেউ কাউকে বশীভূত করতে পারে নি।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি তখন সরকারী স্কুলের অ্যাসিস্টেণ্ট হেড মাস্টার। ছেলের বামপন্থী রাজনীতিতে যে তাঁর অবস্থা খুব স্বস্তিকর ছিল তা নয়। মাঝে মাঝেই নানা অপ্রীতিকর কথা তাঁকে বলতে হয়েছে। কখনও কখনও ভেবেছেন না হয়

দেবেনই চাকরি ছেড়ে। না হয় টিউসনি করেই সংসার চালাবেন। ছেলের সঙ্গে তাঁর মতেও মিল নেই—পথেও মিল নেই। কিন্তু চাকরির জন্যে তিনি ছেলের স্বাধীন মতামতে বাধা দিতে পারেন না। ইংরেজ সরকারী হুংকারকেই কখনও তিনি ভয় পেলেন না, মাথা নিচু করলেন না তো স্বদেশী সরকারের চোখরাঙানিকে তিনি ভয় করবেন!

আজ সেই ছেলে বলছে, চুলোয় যাক পলিটিকস্! শিবপ্রসাদের ভালো লাগে। যেন নিজেকেই পরাভূত মনে হয়েছে তাঁর। যে পথ ধরে এতদিন তিনি এগিয়ে গিয়েছেন আজ সেই পথে দাঁড়িয়ে তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছে, এই কি চেয়েছিলাম আমরা? এই কি বাংলা মা'র চেহারা—যাঁর দরজা সোনার মন্দিরে খোলা? স্টেশনে উদ্বাস্তুদের ভিড়—মাটি খুঁড়লেই মানুষের কংকাল। এখানে মাটিতে কেমন করে ফসল ফলবে যেখানে উত্তপ্ত মাটিতে এতো চোখের জল—এতো রুধিরে রাঙা!

'দাদু!' নীলু ডাকলো।

'এতো চুপ কইর‍্যা আছ কেন? আমার ভালো লাগে না।'

স্বপ্না বললে, 'তুই যা, খেলা কর গিয়া।'

'না পিসি, আমি দাদুর ধারে একটু বসি।' কি যেন বুঝেছে নীলু। কোথায় যেন খানিকটা অস্থিরতার তপ্ত বাতাস ঘরের স্বস্তিকে বিঘ্নিত করছে। কোথায় যেন খানিকটা অশান্তি ঘনীভূত ঝড়ের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে। ছোট হলেও নীলু যেন সেটা খুব ভালো করেই অনুভব করে অস্বস্তি পাচ্ছে।

ঘরে সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে আসছে। স্বপ্না ধীরে ধীরে শিবপ্রসাদের পাশ থেকে উঠে গেল। সুজাতা চলে যাওয়ার পর থেকে নীলুর দু চোখে কেমন ভয় আর অবিশ্বাস। যেন মনে করে, তাকে ফাঁকি দিয়ে সবাই পালিয়ে যাবে সুজাতার মত।

'দাদু, চল আমরা অংক কষি গিয়া।'

'তুই যা, আমি আসতে আছি।' শিবপ্রসাদ বললে।

সুজাতা স্বরাজের সঙ্গে ঝগড়া করতো যখন "অনেক সহ্য করেছি, তিন বছর ধরে কেঁদেছি। এ বাড়ির রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘুণ ধরে গেছে, এখান থেকে আমাকে বেরিয়ে পড়তে হবে। তোমার এ ডিফিটিজম আমার সহ্য হচ্ছে না। আমাকে মুক্তি পেতেই হবে"—নীলু বিবর্ণ মুখে দাদুর কাছে গিয়ে বসতো, তখন ঝড়ের ভেতর যেন সে একটু স্বস্তির নীড়ের সন্ধান করে ফিরত দাদু আর পিসির ভেতর।

'নীলু—' স্বরাজ ঘরে ঢুকলো। 'কাইল আমাকে চইলা যাইতে হইবো। তুমি আমার সঙ্গে যাবা। তোমার যা যা লইতে হয় গুছাইয়া লও।'

শিবপ্রসাদের মুখের পেশী যেন শক্ত হয়ে গেলো। গলা দিয়ে তাঁর কোন আওয়াজ বেরুল না।

'বড়দা—!' স্বপ্না চিৎকার করে উঠলো। 'তুমি বুচার, কাওয়ার্ড, স্বার্থপর! এ কথা তুমি কইতে পারলে বাবার মুখের সামনে?'

'না পারনেরও তো কিচ্ছু নাই। যা সত্য তারে নিঃশব্দে গ্রহণ করতে শেখাই প্রয়োজন। আমি ওরে কলকাতায় রাখুম না।'

'কোথায় যাবা বাবা?' নীলু বললো।

'আমি কানপুরে বদলি হইছি। তোরে ওখানকার বোর্ডিংএ রাইখ্যা পড়াবো। এখানে তোর কিছু হইবো না।'

'বাবা, দাদুর কী হইবো?' উজ্জ্বল কণ্ঠে নীলু জিজ্ঞাসা করলো।

'তার কথা তোর চিন্তা করতে হইবো না। তর পিসি তারে দেখবো।'

'আমি দাদুরে ছাইড়া যামু না বাবা। তুমি যাও—'

ঘরে যেন বাজ পড়লো।

স্বপ্নার মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে নীলুকে দুটি কম্পিত বাহু প্রসারিত করে শিবপ্রসাদ বুকে টেনে নিয়ে কেঁদে ফেললেন।

॥ ত্রিশ ॥

বস্তীটায় ঢোকবার পথটা কাঁচা। খোয়া আর কাঁকর ছড়ানো, তারই মধ্যে প্রায়ান্ধকার ঘরে একটা কালিপড়া লণ্ঠনের সামনে হাঁটুর মধ্যে মাথা রেখে বসে মানিক আর মেঝের ওপর চিৎ হয়ে হাতের ওপর মাথা রেখে ওর পাশে ফণে বসে।

'ব্যাটা কুত্তার বাচ্ছাকে মারতে খুব মিস হয়ে গেল মাইরী! শ্লা—নিজের জান বাঁচাতে গিয়ে তোকে ফাঁসিয়ে দিয়েছে. নইলে পুলিস মালের খোঁজ পায় কী করে? শালার লাশ সেইখানেই ফেলে দেতাম, মধ্যেখান থেকে—'

কার্তিক এক কোণায় চুপ করে বসেছিল এতক্ষণ; হঠাৎ বলে উঠলো, 'তাই বলে তুই—'

'মারবোই তো। এখন হারামি ভদ্রলোক হয়েছে। আমাদের সঙ্গে মেশে না। ভদ্রলোক হয়েছে—ছুটিয়ে দেব ভদ্রলোক হওয়া! সঙ্গে আবার জুটেছে এক ময়না। সে আবার খাসা বুলি ঝাড়ে—'

'চুপ শালা শুয়োরের বাচ্চা। যা বলবার থাকে বল ওই টুলেটাকে, ভদ্রলোকের মেয়েদের নামে যা-তা বলবি না বলে রাখলাম।' কার্তিক গর্জে উঠলো।

'কেন বলবো না শুনি? ওঃ, তোকে দাদা ডেকে বুঝি তোর মন ভুলিয়ে দিয়েছে!' মানিক বললে। 'ওরে ফণে, কার্তিককে বুঝি আর রাখা গেল না দলে। কিছুদিন হলো দেখছি ও যেন কেমন কেমন বুলি ছাড়ছে। কেমন অন্যমনস্ক ভাবে কথা কয়, হঠাৎ হঠাৎ রেগে ওঠে।'

ঘরের মধ্যে অন্ধকার জমে উঠছে। অসম পলতের একপাশ পুড়ে লণ্ঠনের ভেতর কালি জমছে। চিমনিটা কালো হয়ে গিয়ে ওপর দিয়ে ধোঁয়ো উঠছে। কেমন যেন তেলপোড়া কটু-কটু গন্ধ ছাড়ছে।

সত্যিই কার্তিকের ভালো লাগে না। এই বোমাবাজি, ওয়াগন ভাঙা আর ছোরা-ছুরি। কিন্তু উপায় কী? কি করবে সে? বাড়ির কোন আকর্ষণ নেই। ঘরে খাওয়া নেই। ভবিষ্যতের কোন নিশ্চয়তা নেই। তবে এ কাজ না করে সে কি করবে? অন্তত একটা থ্রিল তো আছে!

পুলিসে কুকুরের মত তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়, বস্তি ঘেরোয়া করে ঘরে ঘরে তল্লাসী চালায়। বাড়ির মেয়েদের অকথ্য গালাগালি দেয় আসামী না পেলে। বাড়ির জিনিসপত্র

তছনছ করে ভেঙেচুরে ফেলে। যদি একটা কাজকর্ম কিছু পেত, তাহলে এ পথ সে ছেড়ে দিত।

কিছুদিন আগে মানিকের কানে কি যেন মন্ত্র দিয়েছিল পলিটিক্সের দাদারা। কোথায় যেন কাদের হয়ে ধান কাটতে গিয়েছিল সে। তারা তাকে ভরসা দিয়েছে এসব কাজে নেমে পড়লে তার জীবনটাই অন্যরকম হয়ে যাবে। আর ওয়াগন ভাঙতে হবে না, খাওয়া-পরার কোন অসুবিধা থাকবে না। একেবারে মই বেয়ে সুখের স্বর্গে চড়ে বসবে সে। ফুঃ! মনে মনে ভাবলো কার্তিক ঃ হবে ঘোড়ার ডিম! পলিটিক্সের দাদারা তো লাল কাপড় উড়িয়ে দেশসুদ্ধ ষাঁড় খেপিয়ে বেশ মৌজের সঙ্গে হাততালি বাজাচ্ছে—আর মরতে মর ব্যাটা তুমি। ধুঃ! একবার তারা তাকেও ডেকেছিল কিন্তু ভাবগতিক বুঝে যায় নি সে।

'আমি ছেড়ে দেব এসব একটা চাকরি পেলে।' কার্তিক বললো।

'লে বাবা! ওই টুলু তোর কানে মন্ত্র দিয়েছে। তোর জন্যে চাকরি সাজিয়ে সবাই বসে আছে। মেলা ফালতু কথা বলিস নি।'

ছেঁড়া একটা প্যাণ্ট পরা ছেলে হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো ঃ 'প্রমোদদা বললে, রাতে পুলিস আসবে তোমাদের খোঁজে।' খবরটা দিয়েই ছেলেটি তীরবেগে যেদিক থেকে এসেছিল সেই দিকেই আবার চলে গেল।

এ বস্তীর পাঁচ থেকে পঁচিশ বছরের কি ছেলে কি মেয়ে সবাই এ ব্যাপারে পোক্ত। এরা পুলিসের গাড়ি চেনে। ইনফরমারদের নামগোত্র অন্ধিসন্ধির খবর রাখে। আপাতত অহিংস এই ছেলেগুলোই কিন্তু এদের প্রধান সহায়। এরাই আগামী দিনের ফণে, কার্তিক, মানিক, প্রমোদের শূন্যস্থান পূরণ করবে। এরা খেলা করে সেও সেই বোমা ছোঁড়াছুঁড়ি খেলা। পুলিস আসছে—পালাচ্ছে। কেউ কিছু করলে তাকে শাসাচ্ছে ঃ যেমন করে ফণেদা শিবুর বাবার পেট ফাঁসিয়ে দিয়েছে, ঠিক তেমনি করে পেট ফাঁসিয়ে দেব, যদি আর একটা কথা বলিস!

গলির মোড়ে রকে বসে খেলছিল একটা বাচ্চা ছেলে। দেওয়ালের গায়ে আলকাতরা দিয়ে লেখা—"বন্দুকের গুলীর ভেতর দিয়ে বিপ্লব বেরিয়ে আসে"। মাও-সে-তুং যুগ যুগ জিওতে হাত বোলাচ্ছিল। হঠাৎ তীরের মত ছুটে গিয়ে খবর দিল ঃ পুলিস!

দেখতে দেখতে একেবারে দৃশ্যপট বদলে গেল। কোমরে দড়িতে বাঁধা রিভলভার নিয়ে পুলিসের দল নামলো একটা পুলিস-ভ্যান থেকে। সঙ্গে ইনফরমারের দল পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো বস্তীর গলির ভেতর দিয়ে।

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড আওয়াজ উঠলো বোমার। ধোঁয়াতে সব কালো হয়ে গেল। ফণে বোমা ফাটিয়ে মানিককে নিয়ে পালিয়েছে, কিন্তু কার্তিক পালাতে পারে নি।

টুক করে সে একটা দরজার পাশে লুকিয়ে পড়লো। বোমাটায় কারুর কিছু হয় নি, সে পালাবার জন্যেই সেটা ফাটিয়েছিল। ফণে আর মানিক বহুদিনের ফেরার, পুলিস ওদের খুঁজে ফিরছিল। তারপর চললো পুলিসী তাণ্ডব। ঘর দরজা তছনছ করে জিনিসপত্র উল্টেপাল্টে ওরা আসামীকে খুঁজতে লাগলো। কিন্তু ওদের ধরা এতো সোজা নয়। অভ্যস্ত পায়ে আর স্বাভাবিক তৎপরতায় তারা প্রথমে ঘরের দরজার ওপর

পা দিয়ে হনুমানের মত ঝুলে উঠে পড়লো টালির ছাদে। সেখান থেকে পাশের খাটালে লাফিয়ে পড়ে বস্তীর ছাদে ছাদে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এযাত্রায় কার্তিকও ধরা পড়তো না, দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সে যেন অন্ধকারের সঙ্গে মিলিয়ে ছিল—হঠাৎ যাবার সময় গণেশ পুলিসের কানে একটা হাঁচির শব্দ যেতেই সে ফিরে দাঁড়ালো।

তারপর হঠাৎ একটা লাঠির আঘাত নেমে এলো তার মাথার ওপরে। মুহূর্তে পৃথিবীটা ঘুরে গেল তার চোখের সামনে। সব অন্ধকার হয়ে গেল। মনে হলো রাশি রাশি অন্ধকারের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে সে। মুখথুবড়ে পড়তে পড়তে কে যেন তাকে ধরে নিলো। তার হাত দুটো বড় নরম। বুকটা বড্ড ঠাণ্ডা। হয়তো বস্তীর সেই মেয়েটা শংকরী—যে তাদের পাশের ঘরে থাকে আর যে তাকে বহুবার পুলিসের হাত থেকে জান কবুল করে কত অপমান সহ্য করেও বাঁচিয়েছে। ওকে ঘিরেই ছোট্ট একটা বাসা বাঁধবার স্বপ্ন এক-একবার উঁকি দিত ওর মনে।

সামনের স্কুলটায় একটা লাল পতাকা উড়িয়ে কতকগুলো বোমা ফাটিয়ে কে বা কারা হল্লা করে গেছে। এখন শুধু ছেলেদের হৈচৈ চীৎকার আর ছুটোছুটি। একটা পুলিসের ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। কতকগুলো লোক জটলা করছে স্কুলের সামনে। কী দরকার ও পথ ধরে চলার—টুলু দূরের বাঁকা পথটাই ধরল। মনে পড়লো ওদের কথা।

মানিক ফণে কার্তিক।

হ্যাঁ, মানিক বলেছিল একদিন দুঃখ করে, 'ভোটের সময় ওদের হয়ে চিল্লিয়েছি, ভলেনটিয়ারী করেছি। দিনে চার টাকা আর মাংস পরোটা দিত। তারপর এবার দাদারা বললেন: "লেগে পড়, জান দিয়ে খাট্—যা পেয়েছিস ওর চেয়ে বেশীই দেব। গুণ্ডা-বাজী ছাড়। ইনক্লাবের জন্যে জান লড়িয়ে দাও। সবাইকে কাজ দেব। খাবার দেব। বাঁচবার পথ দেখিয়ে দেব।" প্রাণপণ খাটলাম, ওদের জিতিয়েও দিলাম। তারপর সব ভোঁ-ভোঁ। কোথায় চাকরি? সত্যি বলছি তোকে, একটা যদি কাজ পাই, ওই ওয়াগন ভাঙা ছেড়ে দেব। চোরে চোরে ভাগ-বাঁটোয়ারা আছে—কিন্তু কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। তারপর কোন্ দিন সি-আর-পি ব্যাটা দেবে রাইফেল চালিয়ে, খতম হয়ে যাব। একটা যদি বাঁধা রোজগার থাকতো, ঠিক বে-থা করে অন্যরকম হয়ে যেতাম।'

বৌ-ছেলে নিয়ে সংসার করবার স্বপ্ন আছে চোখে মানিকের। এখনও ওদের ফেরানো যায়। এ জীবন থেকে তাদের মুক্তি দেওয়া যায়। কিন্তু কে দেবে? পলিটিক্যাল পার্টিগুলো নিজেদের মধ্যে ভাঙাভাঙি শুরু করেছে। মানুষের মধ্যে এসেছে হতাশা—অনিশ্চিত অন্ধকারের যাত্রীকে কে আলোর পথ দেখাবে? মানিক, ফণে, কার্তিক আপাতত স্বপ্নই দেখতে থাকুক বস্তীর অন্ধকার ঘরের ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে আর পুলিসের তাড়ায় পালিয়ে পালিয়ে ফিরুক। আর তার কথা? আবার মনে পড়লো স্বপ্নাকে—

একবার রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। এবার চিন্তায় ছেদ পড়লো।

ও-বাড়ির মেয়ে হয়েও স্বপ্না ও-বাড়ির কেউ নয় যেন। কারু সঙ্গে কথা বলে না।

বাবা ভেতরে ভেতরে জ্বলছেন। বড়দা চব্বিশ ঘণ্টা ছটফট করে অস্বস্তিতে। কি যে তার অশান্তি, কি যে তার কষ্ট কিছু বোঝা যায় না। ভাঙা শরীর নিয়ে বৌদি ফেলে আসা মিছিলের দিনগুলোর কথা ভাবে। তাকে দেখলে মনে হয় আকাশ থেকে টেনে এনে খাঁচায় আটকে দিয়েছে কেউ। স্কুলে চাকরি করতে যায়, সেখানেও রাজনীতির তর্ক। বাসে করে ফেরে, সেই একই রাজনীতির কচকচি। ছোড়দা—বুকটার মধ্যে যেন কেমন জ্বালা করে ওঠে স্বপ্নার।

'টুলুদা ?' স্বপ্না ডাকলো।

এই সকালটা—বাইরের বাতাস লাগা কাঁপা-কাঁপা রাধাচূড়ার গাছটার ওপরে কিসের হাতছানি যেন রেখে যায়। সামনের লেকের জলে বাতাসে ছোট ছোট জলের লেখা পড়ছে আর মুছছে। টুলু চমকে তাকালো।

'স্বপ্না!'

'এই সকালেই হন হন করে চললে কোথায় ?'

'দাদা হাসপাতালে, তাকে দেখতে যাচ্ছি।' টুলুর গলা থরথর করে কাঁপতে লাগলো।

'ভুলুদা কেমন আছেন এখন ?' বিষণ্ণ ক্লান্ত গলায় জানতে চাইলো স্বপ্না। খবরটা আগেই পেয়েছিল। স্বল্পভাষী স্বপ্না এর বেশী কিছু আর জানতে চাইলো না।

'ভালো। খুব অল্পের জন্যে দাদার প্রাণ বেঁচে গেছে।'

স্বপ্না হাসলোঃ 'ভুলুদার কিছু হবে না—হতে পারে না। এ আমি নিশ্চিত ভাবে জানি।' দু' চোখ ভরা প্রত্যয় নিয়ে স্বপ্না বললো। তার স্বরে কী ছিল, টুলু যেন একবার শুকনো ঠোঁট ফাঁক করে কী যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল।

॥ একত্রিশ ॥

রাত বাড়ছে। ঘরের আলো নিভছে। পথের আলো আরো জোরালো হয়ে উঠলো। সারাদিনের ক্লান্তিতে আর অবসাদে মাথা ঘুরছে টুলুর।

সন্ধ্যার বিস্বাদ খবরটা যেন তার মনকে দুমড়ে মুচড়ে দু'টুকরো করে দিয়েছে। সংকট বাড়ছে। বক্তৃতা চলছে দ্বিগুণ উৎসাহে—প্রতি-বক্তৃতা আরো ক্ষুরধার। বিবৃতি—প্রতি-বিবৃতি। ফসলের মাঠে ভ্রাতৃঘাতী রক্তপাত—তার ওপর সর্বজনশ্রদ্ধেয় বর্ষীয়ান জননেতা হেমন্ত বসুর হত্যা।

"তোমরা আমাকে মারছো কেন ? আমি তো তোমাদের কিছু করি নি—" বুকের মধ্যে যেন মুচড়ে উঠলো টুলুর। এ কোন্ রাজনীতি ? কার জন্য এ নরহত্যা ? কোন্ কল্যাণের পথে এ রক্তস্রোত বইবে ? টুলু জানে না, জানতে চায় না। মানুষের জন্য রাজনীতি, না রাজনীতির জন্য মানুষ—এসব কুট প্রশ্নের উত্তর সে জানে না। জানতে চায়ও না। আপাতত তার কিছুই ভালো লাগছে না। কার্তিক ফণে মানকের দলের পরিণতি যা হবার তাই হয়েছে। এ ওদের অবশ্যম্ভাবী ছিল—কিন্তু—একটা মস্ত কিন্তু থেকে যায় সবকিছুর মধ্যে। সুস্থ জীবন—চাকরি—সামনে ভবিষ্যৎ।

তাহলেও কি ওরা এ পথে আসতো—কে জানে !

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে স্বপ্না চলে গেছে বাড়িতে। খবরটা তাকেও আহত করেছে। আবার স্বপ্নার কথা মনে পড়লো টুলুর, স্বপ্নার কথা মনে পড়লেই কেমন রক্তে নেশা ধরে তার। মেয়েটা তাকে ভালবেসে ফেলেছিল। সেই ছেলেবেলার ভালবাসার মানে আছে কোন ?

"ইস, তুমি কি ভালো অঙ্ক কষ টুলুদা ! কত তাড়াতাড়ি অঙ্ক কষতে পার !"

"অঙ্ক তো ভালো করেই শিখতে হবে। নিখুঁত চুলচেরা হিসেব চাই অঙ্কে। একটু ভুল করলেই অ্যাকসিডেন্ট !"

"কিসের অ্যাকসিডেন্ট ?"

"বা রে, আমি যে পাইলট হবো। জানিস্ স্বপ্না, দমদমে একটা এক্‌জিবিসন হয়েছিল একবার। আমি দেখতে গিয়েছিলাম। প্লেনের এক্‌জিবিসন। মানে ঠিক প্লেনের নয়—নানারকম প্লেনের ইঞ্জিন। তার যন্ত্রটন্ত্র সব দেখিয়েছিল। কত যে সব সূক্ষ্ম ব্যাপার, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। সেই দেখে আমার মনে হলো আমার পাইলট হতে হবে—"

"না টুলুদা, তোমার পাইলট হয়ে কাজ নেই—"

'কত নাম—কত সম্মান। আমি প্লেন চালিয়ে লণ্ডনে যাব।'

"না—না। যদি অ্যাকসিডেন্ট হয় ! তুমি ডাক্তার হও, ইঞ্জিনীয়ার হও।"

'টুলু, এখনও ঘুমোস নি ?' মা ঘরে এলেন।

এ বাড়িতে মা'র পজিসন একটু পিকিউলিয়ার। সমস্ত জীবন মা একটানা কষ্টই করে গেলেন। বাবা সেকালের গ্রাজুয়েট। সুতরাং তিনি যেমন ইংরিজি জানেন তেমন আর কেউ জানে না এবং তাঁর ধারণা মা সেকালের মহাকালী পাঠশালার ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়া—সুতরাং "তোমার মত গাধা নিয়ে সংসার করা—" এই সিদ্ধান্ত প্রায়ই শোনা যেত তাঁর মুখে !

মা একটা ইডিয়ট—মা'র মাথায় কোনো কিছু নেই, এই পরম আবিষ্কারটি সেকালের বি-এ পাস আর দারুণ ইন্টেলেকচুয়াল বাবা কখনো গোপন রাখতেন না। "শী ইজ এ ডোমেস্টিক অ্যানিম্যাল ! ডিলাইট ইন কুকারী !" এ তো তাঁর মুখে লেগেই থাকতো। ছেলেমেয়েদের সামনেই বলতেন, "আশ্চর্য আমার ট্র্যাজেডি ! সারাজীবন আমার ঘর করতে হলো এক বস্তা রাবিশের সঙ্গে।" দিদি এদিক থেকে ষোল আনা বাবার ধারা পেয়েছে। তার শাড়ি ইস্ত্রী থেকে সব পরিচর্যাই মাকে করতে হতো। তবু পান থেকে চুন খসলেই অকথ্য ভাষায় সে বকতো মাকে। কখনও কখনও বাবাকেও ছাড়িয়ে যেত কটুভাষণে। বোধ হয় এটা মেয়েদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। রূপ আর স্নো-পাউডারের পলেস্তারা করা মুখে যে এত বিষ থাকতে পারে, আগে তা ধারণাও করা যায় না ভাষাবিন্যাস না শুনলে।

মা আজ শোকে দুঃখে শীর্ণ সাদা হয়ে গেছেন। বাড়িতে তাঁর ধীর পদচারণ ছায়ার মতই নিঃশব্দ। তাই এতক্ষণ অন্যমনস্ক টুলু বুঝতে পারে নি।

মা আবার বললেন, 'ঘুমোস নি ? এতক্ষণ রাত জেগে জেগে কী করছিস ? যা ঘুমোগে।' মা টুলুর মাথায় হাত দিলেন। ফিরে তাকালো টুলু।

মা যেন কঙ্কালের মত হয়ে গেছেন।

'ভুলুকে কবে ছাড়বে রে?' মা'র ক্লান্ত স্বর শোনা গেল।

'দাদা ভালো আছে মা। তাড়াতাড়িই ওকে ছেড়ে দেবে।'

'উমার ওখানে একবার গিয়ে ওদের খবর নিলি না? অনেক দিন তো ওদের খবর পাই না?'

'কেন, পরশুই তো তোমাকে ওদের খবর এনে দিলাম।'

মা এগিয়ে এসে জানালার গরাদ ধরে দাঁড়ালেন।

'তুমি ঘুমোবে না মা? যাও ঘুমোওগে।'

'তুই?'

'হ্যাঁ, আমিও শোব এবার। মনটা ভাল লাগছে না, তাই—'

বাবা মারা যাবার পর মা যেন কেমন হয়ে গেছেন। কথায় কথায় কেঁদে ফেলেন। তাঁকে এখন আরো করুণ লাগে। তার ওপর টিনটিনের শোকটা তাঁর খুবই লেগেছে। লাগাই স্বাভাবিক।

মা টুলুর কাছে এগিয়ে এলেন। ধীরে ধীরে ওর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'স্বপ্নার সঙ্গে দেখা হলো?'

'হ্যাঁ।' সংক্ষেপে টুলু বললে।

'ওর বৌদি কি সত্যিই চলে গেছে বাড়ি ছেড়ে? আহা বড় লক্ষ্মী বৌ ছিল সুজাতা। কিন্তু কি যে হলো ওদের—'

মা'র সঙ্গে এসব কথা ইতিপূর্বে কখনও টুলুর হয় নি। সুতরাং টুলু বললে: 'ওসব অনেক জটিল ব্যাপার মা। তুমি ভালোমানুষ, এত সব বুঝবে না।'

'হয়তো বুঝবো না, ঠিক কথা—কিন্তু একটা কথা—'

মাকে যেন একটা শ্বেতপাথরের মূর্তির মতো লাগলো এই মুহূর্তে: 'সেও তো মা। স্বামীর ওপর তার রাগ হতে পারে। হতে পারে অনেক কারণেই। রাজনীতির মধ্যে দিয়ে ওদের জীবন শুরু হয়েছিল। সে আদর্শে ফাটল ধরলে ওদের জীবনেও চিড় লাগবে—এটা হওয়াও সম্ভব। কিন্তু মা হয়ে কি করে ছেলেকে ছেড়ে গেল? একবার ভাবলো না, সে মা—একটা ছেলের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তার ওপর। এই ছেলে যখন বড় হবে—লেখাপড়া শিখে মাথা তুলে দাঁড়াবে, সে কি কখনও তার মাকে ক্ষমা করতে পারবে?'

'মা—' অবাক বিস্ময়ে টুলু ডাকলো: 'তুমি এত কথাও বোঝ, আর এমন করে বোঝ?'

'তোর বাবা তো আমাকে ইডিয়ট ছাড়া কথা কইতেন না। আমার যে একটা প্রাণ আছে, বোধ আছে, ভালো-মন্দ বোঝবার অধিকার আছে—তা যেন আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। উমা তো আমাকে অপদার্থই বলে। কিন্তু আমরা যে অপদার্থ—তাই বরং ভালো আছি। এসব এত আধুনিকতা আমরা বুঝি না। আর উমা যদি একটু কম আধুনিক হতো তাহলে হয়তো খানিকটা প্রকৃতিস্থ হতো। আর তাকে এত বড় আঘাতটাও পেতে হতো না।'

টুলু কি স্বপ্ন দেখছে? মা'র আজ কী হলো! 'মা, তোমার আজ হলো কী মা?

অত কথা তুমি বলতে পার ?'

একটু হেসে মা বললেন, 'পারতাম না রে, কিছুই বলতে পারতাম না। নিজের সম্পর্কে কিছু ভাবতেও পারতাম না। শুধু "ইডিয়ট" ছাড়া আর "গাধা" ছাড়া আমি যে আর কিছুই নয়, একথা বার বার মনে হয়েছে। আর মনে হয়েছে তোর বাবার জীবনটা আমি সত্যিই নষ্ট করে দিলাম। উমার বিয়ে হলো—ভাবলাম ওরা দু'জনেই আধুনিক, হয়তো সুখী হবে। নতুন কালের নতুন মানুষ এরা—নতুন মা হবে। ছেলে-মেয়ে আদর্শ হবে। আমার মত করে ওরা ছেলেমেয়েকে নষ্ট করে দেবে না। কিন্তু—' মা থামলেন: 'যাই আমি। মনটা ভারি খারাপ ছিল আজ সারাদিন। পাগলের মত অনেক কথা বললাম। শো—শো তো! তোকে না শুইয়ে আমি যাব না।'

অগত্যা টুলুকে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়তে হলো। মা ছোট ছেলেটির মত ওর মশারি টাঙিয়ে, চারিদিকে সযত্নে মশারি গুঁজে দিয়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বাতি নিভিয়ে চলে গেলেন।

তখনও ঘুম আসে নি টুলুর।

শুয়ে শুয়ে ভাবছিল মা'র কথা, যে মা'র মুখ দিয়ে একটিও কথা ফুটতো না, সেই মা আজ কত কথা বললেন। বাবা মাকে যা ভাবতেন তিনি তো একেবারেই তা নন। যথেষ্ট বুদ্ধি রাখেন মা। সবই বোঝেন, কিন্তু কথা বলেন না সহজে আর অকারণে।

হঠাৎ আকাশ বিদীর্ণ করে কোথায় যেন বোমা পড়লো। একটা—দুটো—তিনটে। তারপর বন্দুকের শব্দ। যাদবপুরের দিক থেকেই মনে হলো। ওধারে নাকি দুটো দল আছে এপাড়া আর ওপাড়ায়। রাস্তা পার হয়ে এপার থেকে ওপারে গেলেই এই অনর্থ।

ঢনঢন করে ঘণ্টা বাজিয়ে একটা ফায়ার ব্রিগেড চলে গেল। কোথায় যেন আগুন লেগেছে।

টুলু কত কি ভাবছিল। ভাবতে ভাবতে কখন যে তার চোখে ঘুম এসে গেছে কে জানে!

॥ বত্রিশ ॥

আনন্দ চলে গেছে অনেক দূরে। আলোয় তার উদ্ভাসিত মুখটার কথা মনে পড়তেই স্বপ্নার বুকটা যেন ভরে উঠলো। পথ হাঁটতে হাঁটতে লেকের পাশে অন্ধকারে একবার থমকে দাঁড়ালো টুলু। ঘন অন্ধকারের ভেতরে চাদরে ঢাকা যে জিনিসটা এতক্ষণ তার বুকের ভেতরে লুকোনো ছিল সেটা ছুঁড়ে জলে ফেলে দিয়ে স্বপ্নার হাত ধরে টেনে দ্রুতপায়ে একটা ট্যাক্সিতে চড়ে বসলো: 'মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল!'

'বৌদি ?' স্বপ্না ডাকলো।

কিন্তু চোখ খুললো না সুজাতা। মিছিলে লাঠি খেয়েছে। রুগ্ন শরীর—এত ধকল তার সহ্য হয় নি। পালাতে হয়তো পারতো কিন্তু কেন পালায় নি কে জানে ? বেকায়দায় লাঠিটা তার মাথায় পড়েছে।

'নীলু—নীলুরে আইজ আর ইস্কুলে পাঠাইস না।' তার পরই কি যেন বিড়বিড় করতে লাগলো। শুধু বার বার ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারিত নীলু নামটা ছাড়া আর কিছুই বোঝা গেল না সুজাতার মুখ থেকে।

'বৌদি, বাবা এই যে নীলুরে আনছে!' কিন্তু সুজাতা তখন অনেকদূরের যাত্রী। বন্ধ চোখ যেন নিবিড় ঘুমে জড়িয়ে আসছে। স্বপ্নার জলভরা চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে পাথরের মূর্তির মত দাদুর হাত ধরে নীলু দাঁড়িয়ে ছিল। টুলু শুধু একবার তাকিয়ে ভাবলো: নীলুর নিঃশ্বাস পড়ছে তো? কিন্তু বরফের মত চারদিকের জমাট আবহাওয়ায় যেন জোরে নিঃশ্বাস ফেলতেও তার ভয় করছিল।

* * *

বাড়ি ফিরে টুলু শুনলো মা দিদির বাড়ি ছুটেছেন। জল-পুলিসের কাছ থেকে খবর এসেছে গতরাতে গঙ্গা থেকে একটি মেয়ের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। পাড়ে পড়ে থাকা ব্যাগের মধ্যে ঠিকানা পেয়ে মণীশদাকে তারা টেলিফোন করেছে মৃতদেহ সনাক্ত করতে।

দিদি আর মণীশ গাড়ি নিয়ে ছুটেছে। টুলু যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেল। এখন যে কী করা উচিত ভেবে সে কিছুই ঠিক করতে পারছে না। শুধু মনে হচ্ছে, এ সময়ে স্বপ্নাকে তার খুব দরকার। সে সঙ্গে থাকলে যেন ওর বুকে নতুন শক্তি আসে। মনে জোর আসে। আর তাকে জড়িয়ে স্বপ্ন দেখতে ভালো লাগে: "বা রে, আমি পাইলট হবো! জানিস স্বপ্না, দমদমে একটা একজিবিসন হয়েছিল একবার। আমি দেখতে গিয়েছিলাম। প্লেনের নয়—নানারকম প্লেনের ইঞ্জিনের। তার ভেতরের যন্ত্রপাতি কত যে সূক্ষ্ম! না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। সেই দেখেই আমার মনে হলো পাইলট হতে হবে।"

"না, টুলুদা—তুমি পাইলট হয়ো না" স্বপ্নার দু'চোখে ভয়।

"কত নাম! কত সম্মান! আমি প্লেন চালিয়ে লণ্ডনে যাব।"

"না—না। যদি অ্যাকসিডেণ্ট হয়! তুমি ডাক্তার হও। ইঞ্জিনিয়ার হও।" টুলুর মাথাটা যেন কেমন ঘুরতে লাগলো। চোখ দুটো কালো হয়ে এলো।

* * *

সাবিত্রীর ফ্ল্যাটেই হাসপাতাল থেকে এসে উঠেছে প্রবীর। সাবিত্রী তাকে জোর করেই এখানে নিয়ে এসেছে। আজ সে বাড়ি যাবে।

সাবিত্রী যেন একটু বিশেষভাবে সেজেছে। বাড়ির সামনে ট্যাক্সি এসে দাঁড়িয়েছে—তাকে সাবিত্রীই নিয়ে যাবে বাড়িতে। ঘরে তালা দিয়ে প্রবীরের সামনে একটা রুপোর সিঁদুরকৌটো খুলে ধরে সাবিত্রী বললে, 'পরিয়ে দাও সিঁথিতে—তুমি ভীরু, জোর করে কিছু নিতে জান না বলে আমাকেই কাজটা জোর করে করাতে হবে।'

বাড়িয়ে দেওয়া মাথাটার শুভ্র সিঁথিটির ওপর সিঁদুরের রেখা এঁকে দিতেই সাবিত্রী প্রণাম করলো।

'এটা কী হলো!' একমুখ দুষ্টুমিভরা প্রসন্ন হাসিতে অসুস্থ মুখখানা ভরে গেল প্রবীরের। কী যেন একটা করতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু সলজ্জ হাসিতে মুখ ভরিয়ে তাকে থামিয়ে দিয়ে দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল সাবিত্রী।

'চল চল, ট্যাক্সি চলে যাবে কিন্তু!'

বাইরে ট্যাক্সির ঘন ঘন হর্ন শোনা গেল।

আলেয়ার রাত

॥ এক ॥

টিক টিক করে আওয়াজ হল দরজায়।

বাইরে বৃষ্টি পড়ছিল, শব্দ উঠছিল টিনের চালে, বাড়ির সামনে দেবদারু গাছটায় হাওয়া সোঁ সোঁ করছিল। তবু এরই ভেতরে দরজার আওয়াজটা আমি ঠিক শুনতে পেলাম।

আমার ঘরটা বাইরের দিকে—সদরের পাশে। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেব এবার, সেইজন্যে যাতে নির্বিঘ্নে একমনে একধ্যানে পড়াশুনো করতে পারি—কয়েক মাস হল এই ঘরটা আমাকে বরাদ্দ করে দেওয়া হয়েছে। এখানে আমার ছোট্ট তক্তপোশ আছে, বইয়ের শেলফ আছে, টেবিল-চেয়ার-টেবিলল্যাম্প-টাইমপিস আছে আর দেওয়ালে সরস্বতীর ছবিওলা স্টুডেণ্ট্‌স্‌ বুক হাউসের ক্যালেণ্ডার আছে। আমি এইখানে বসে সারস্বত-সাধনা করি।

ইতিহাসের বই খুলে আমি তখন ওয়ারেন হেস্টিংসের কীর্তি আর অকীর্তিগুলো কণ্ঠস্থ করবার চেষ্টায় ছিলাম। এমন সময় রাস্তার দিকের বন্ধ দরজায় টিক টিক করে আওয়াজ হল।

চেয়ার থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে আমি বাড়ির ভেতরদিকে চেয়ে দেখলাম। উঠোনের উত্তর-পশ্চিম কোণে আমাদের রান্নাঘরটা এই দরজা দিয়ে সোজা চোখে পড়ে। আমি দেখলাম, মা উনুনের সামনে ঝুঁকে কী যেন রাঁধছেন. আগুনের আলোয় মা'র খুব ফর্সা মুখখানা গনগনে লাল, গলায় সোনার হারছড়া চিক-চিক করছে।

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে অন্দরের দরজাটা ভেজিয়ে দিলাম নিঃশব্দে। তারপর বাইরের দরজা খুলে ফেললাম।

যা ভেবেছিলাম তাই—হারাণ এসে ঢুকল।

ছাতাটা বন্ধ করে আমার টেবিলের পাশে রাখল। তারপর বসে পড়ল তক্তপোশের ওপর।

—যাচ্ছিস তো?

আমি একটু চুপ করে রইলাম। মনটা ঠিক করতে পারছিলাম না।

—সকালে তো দিব্যি রাজী হয়ে গেলি, এখন আবার ভাবছিস কী? অধৈর্য ফুটে উঠল হারাণের গলায়।

—বৃষ্টি নামল যে! সেইজন্যেই—

—আরে বৃষ্টিই তো সুবিধে। হারাণের চোখ চক্‌চক করে উঠল: কেউ টের পাবে না। আর এই বাদলাতেই তো গান জমে ভালো। জল পড়বে, মেঘ ডাকবে, ঝিকিমিকি করে বিদ্যুৎ চমকাবে—মল্লারের সুর উঠবে—হারাণ গুনগুন করে উঠল: ঝিমিকি ঝিমিকি বরিখন লাগে, আয়ে পরদেশিয়া—

—এই থাম্‌, থাম্‌! আমি তটস্থ হয়ে উঠলাম: বাবার কানে যাবে!

হারাণ বিমর্ষ হয়ে গেল: তোর বাবা যেন কিরকম রে! হেডমাস্টারি করে রস-কষ

বলে যদি কিছু থাকে ! কেবল গ্রামার ছাড়া আর কথাই নেই। পার্জিং কর, অ্যানালিসিস্ লেখ্—ভালোও লাগে !

বাবা খুব কড়া হেডমাস্টার একথা ঠিক। কিন্তু বাড়িতে যে সবসময় গ্রামার নিয়ে বসে থাকেন তা নয়। মুখে মুখে আমাকে আর আমার ছোট বোন দুটিকে বিদেশী সাহিত্যের গল্প শোনান—চমৎকার করে বলেন। কত ছুটির দিনে, এই রকম কত বর্ষার সন্ধ্যায় তাঁর কাছে বসে বসে আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনি আলেক্জান্দার দ্যুমা, স্কট, ভিক্টর হিউগোর উপন্যাসের গল্প। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ভালোবাসেন, ভরাট গম্ভীর গলায় আমাদের পড়ে পড়ে শোনান : 'সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলামের স্রোত-খানি বাঁকা—'

কিন্তু হারাণের কথায় আমি প্রতিবাদ করলাম না। স্কুলে বাবার চেহারা আমরা সবাই চিনি। মুখের হাসি বাড়িতে রেখে স্কুলের দিকে পা বাড়ান তিনি। তখন লোহা দিয়ে আঁটা চাপা ঠোঁট, কালো মোটা ফ্রেমের চশমার নিচে কড়া দৃষ্টি, গলার আওয়াজে মেঘ ডাকে। স্কুলের বারান্দায় তাঁর পায়ের আওয়াজ উঠলে ক্লাস ফাইভ থেকে ক্লাস টেন পর্যন্ত সব চুপ—একেবারে পিনড্রপ সাইলেন্স যাকে বলে।

হারাণের অবশ্য বাবার ওপর রাগ করবার কারণ আছে। ক্লাস এইটে পর পর তিনবার ফেল করবার পরে বাবা তাকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

'লেখাপড়া তোর জন্যে নয়। ট্রাই ইয়োর লাক এল্স্হোয়্যার।'

হারাণ বিরক্ত হয়ে উঠল : কিরে, কথা বলছিস না কেন ?

—ভাই, থাক আজকে।

—আজ থাকবে ? হারাণের লম্বা মুখখানা যেন আরো ঝুলে পড়ল নীচের দিকে : তোর জন্যে ওস্তাদ লাল খাঁ আর গহরা বাই আরো সাত দিন ধ্যাধ্যেড়ে গোবিন্দপুরে বসে থাকবে, না ? নাকি কাল সকালে তানপুরা কাঁধে করে তোদের বাড়িতে এসে বলবে—'বৃষ্টির জন্যে কাল আপনি আসরে যাননি, তাই যেচে আমরা আপনাকে গান শোনাতে এলাম—আপনি মেহেরবানি করে একটু শুনুন !'

আমি অস্বস্তি বোধ করে বললাম না—মানে সেকথা আমি বলছি না। তবে—

—তবেটা আবার কী ? হারাণ তক্তপোশের ওপর সরে সরে আরো খানিকটা কাছে এগিয়ে এল আমার : ওই 'তবে' কথাটা যদ্দিন ভুলতে না পারছিস তদ্দিন জীবনে কিছু করতে পারবি না। এই সোজা কথাটা মনে রাখিস।'

'তবে' শব্দটা ভুলে গিয়ে হারাণ জীবনে কী করতে পেরেছে এই কথাটা আমার জানতে ইচ্ছে করল। কিন্তু এখন ও এমনিতেই ক্ষেপে রয়েছে, ওকে আর চটিয়ে দিয়ে লাভ নেই। আমি চুপ করে চেয়ে রইলাম মেঝের দিকে। হারাণের ছাতা থেকে কালো সাপের মতো একটা জলের রেখা ধীরে ধীরে তক্তপোশের অন্ধকার তলাটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। সেইটেই আমি দেখতে লাগলাম।

হারাণ বললে, কত সাধ্যসাধনা করে, কত আগে থেকে বায়না দিয়ে ওদের আনতে হয় তা জানিস ? এক-একটা রাতে ওরা কত করে টাকা নেয়, ভাবতে পারিস তা ?

—না।

—তা হলে ? তাহলে এত নবাবী করছিস কেন ? এরকম চান্স মিস করলে

আর কোনোদিন পাবি না। আর—আর আমি তাহলে বুক ফেটে মরে যাব। গহুরা থাইয়ের গান অবিশ্যি আমি আগে কখনো শুনিনি, গলা নাকি একেবারে পঞ্চমে বাঁধা—কিন্তু লাল খাঁ—আঃ! এক-একটা তান যখন ছাড়ে, তখন হায় হায় করে ওঠে বুকের ভেতর। তায় আজকের বাদলার রাত। বুঁদ হয়ে যাবি বিমল—বুঁদ হয়ে যাবি।

বলতে বলতে যেন নিজেই মজে যাচ্ছিল হারাণ। চোখ দুটো জ্বল-জ্বল করে উঠল তার।

—আসছিস তা হলে? আমার ঘাড়ে হাত রাখল হারাণ।

—দেখি।

—দেখি আবার কিরে? এর আর দেখাদেখি নেই। আমি ঠিক রাত দশটা নাগাদ এসে দাঁড়িয়ে থাকব বারোয়ারীতলায়—বোধনের বেলগাছটার নীচে। চলে আসিস ভাই, ডোবাসনে আমাকে। হারাণ একটু হাসল: আর একটা রাত না পড়লে তোর স্কলারশিপ পাওয়াও আটকে থাকবে না।

—স্কলারশিপ আমি কোনোদিনই পাব না, তুই-ও তা বিলক্ষণ জানিস। ছাতা থেকে জলের রেখাটা হারাণের ভিজে স্যাণ্ডেলের চারদিকে গোল হয়ে ঘুরছিল, তাই দেখতে দেখতে আমি বললাম, একটা ফার্স্ট ডিভিশন আর দু-একটা লেটার হলেই যথেষ্ট। সেকথা থাক—একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, আচ্ছা আমি আসব।

—আর বৃষ্টিও হয়তো ধরে যাবে এর ভেতর, দু' ঘণ্টার ওপর তো সময় আছে এখনো। তোদের খাওয়া হয় কটার ভেতরে?

—নটা, স'নটা।

—কারেক্ট। কোনো অসুবিধেই নেই তাহলে। চলে আসিস ভাই—এ আসর ছাড়িস নি। এরকম এক-একটা জীবনের সব দুঃখ ভুলিয়ে দেয়—মনে হয় এর জন্যেই বেঁচে থাকা। হারাণের ভেতরটা উত্তেজনায় কাঁপছিল, আমি টের পাচ্ছিলাম আমার কাঁধের ওপর ওর নখগুলো যেন বসে যাচ্ছে।

—আচ্ছা।

—এই তো লক্ষ্মী ছেলে! হারাণ খুশি হয়ে উঠল: দেওয়ালে মা সরস্বতীর ছবি টাঙিয়ে রেখেছিস, দেখবি তোকে নির্ঘাত বর দেবেন। একটা বৃত্তিই পেয়ে যাবি তুই। আরে মা কি কেবল পড়ুয়া পণ্ডিতদের জন্যে? হাতের বইয়ের চাইতে বীণাটা কত বড়—তা দেখছিস না? বুঝলি, সব বিদ্যা সব শাস্ত্রের ওপরে হল গান। তুই তোর বাবার মতো কড়া হেডমাস্টার না হয়ে যদি বড় গাইয়ে হতে পারিস—অনেক শান্তি পাবি জীবনে। সুর যে কী জিনিস—যার বুকে একবার ঢেউ দিয়েছে সে-ই বোঝে। জানিস ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ—

আমি ওর উচ্ছ্বাসে বাধা দিলুম এবার।

—সে তো হল। কিন্তু রাত দশটায় বেরুলে দেরি হয়ে যাবে না?

—দেরি হবে কেন রে? আমি খবর নিয়েছি, গোড়ার দিকে গানটান গাইবে এদিককার কেউ কেউ—শ্যামলাল মুখুজ্জে, বৈকুণ্ঠ দাস—এরা। শ্যামলাল মুখুজ্জের গলা শুনলে তো মনে হয় হাঁড়িচাঁচা ডাকছে, আর বৈকুণ্ঠ দাসের কথা না বলাই ভালো—হরির লুটের কেত্তন ছাড়া আর কোথাও ওকে মানায় না। ওরা আসরে আসবে রাত

এগারোটা আন্দাজ। আমরা ঠিক পৌঁছে যাব তার ভেতরে।

—এক ঘণ্টায় যাওয়া যাবে ছ মাইল? কথাটা আমার খেয়াল হল এতক্ষণে।

—হবে, হবে, সব হবে। ফলো মী, মার্চ—ব্যাস! হারাণ উঠে পড়ল: সময়মতো নিয়ে যাওয়া, তোর বাবা জেগে ওঠবার আগেই পৌঁছে দেওয়া—এসব দায়িত্ব আমার। তুই আর ভেবে ভেবে মাথা খারাপ করিসনি, শুধু রেডি হয়ে চলে আসিস, তা হলেই যথেষ্ট।

হারাণ উঠে পড়ল। ছাতাটা তুলে নিয়ে নিঃশব্দে দরজাটা খুলে বেরিয়ে গেল বাইরে।

যে সময়টুকু সে দরজা খুলল আর বন্ধ করল, তার মধ্যেই বাইরের আকাশটাকে একেবারের জন্যে আমি দেখতে পেলাম। সে আকাশ রান্নাঘরের ঝুলের মতো নিবিড় কালো—তা থেকে টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল সমানে। আর আমার চোখের সামনে দেবদারু গাছের মাথাটা ঝাঁকড়াচুলো ডাকিনীর মতো দুলে উঠল একবার—কেমন ভয়ঙ্কর দেখালো।

বুকের ভেতরটা শিউরে উঠল একবার।

হারাণ আমার চাইতে প্রায় বছর ছয়েকের বড়। রোগা আর লম্বা বলে, মাথার চুলগুলো কেমন বুনো আর এলোমেলো বলে ওকে আরো অনেক বড় দেখায়। হারাণ এক সময়ে আমাদের স্কুলের ফুটবল-টীমে ব্যাকে খেলত। তাকে মাঠে দাঁড়াতে দেখলেই ছেলেরা চিৎকার করত: তালগাছ—তালগাছ!

খুব জবর তালগাছ। সকলের চাইতে লম্বা ঠ্যাং বাড়িয়ে সবার আগে সে বল কেড়ে নিত, তার মাথার ওপর দিয়ে কিছু বেরিয়ে যেতে পারত না, রোগা পায়ের হাড় ছিল ইস্পাতের মতো, তার সেই টিবিয়া বোনের সঙ্গে কারো সংঘর্ষ হলে নির্ঘাত অপঘাত ঘটে যেত। অন্য স্কুলের ছেলেরা বলত, 'ওদের ব্যাকে ব্রহ্মদৈত্য দাঁড়িয়েছে রে—রোজা এনে ওকে না তাড়ালে গোল দেওয়া যাবে না!'

কিন্তু ফুটবলের কথা বিশেষ দরকার নেই। মাত্র এইটুকু দরকার যে, ওই ফুটবল খেলতে গিয়েই প্রথম গানের নেশা ধরল তাকে।

ফুটবল থেকে গান—একটু নতুন রকমের বইকি, কিন্তু তাই ঘটল।

হারাণ অবশ্য আগে থেকেই এক-আধটু গুনগুন করত, গানের একটা ধারাও ছিল ওর রক্তের ভেতরে। ওর দাদু ছিলেন এ অঞ্চলের নামজাদা তবলিয়া, বড় বড় গাইয়ের সঙ্গে সঙ্গত করবার জন্যে নাকি নানা জায়গায় ডাক আসত তাঁর। সেইটেই বোধ হয় ফিরে এল হারাণের মধ্যে।

ঘটল এইভাবে। অন্ততঃ হারাণের মুখ থেকে এইরকম আমি শুনেছি।

খেলতে গিয়েছিল বাইরে—এক জমিদারদের টীম তাকে 'হায়ার' করে নিয়ে গিয়েছিল। সে আজ বছর চারেক আগেকার কথা। খেলায় তাদের দলটা জিতল, হারাণের জন্যেই জিতল। খুব খাওয়াদাওয়া হল জমিদারবাড়িতে, তারপর রাত্রে বসল

গানের আসর।

সেদিন সেখানে কোন্ এক জাঁদরেল গাইয়ে হাজির ছিলেন। গানপাগলা জমিদারের অতিথি তিনি। বিকেলে খেলে, কণ্ঠা পর্যন্ত মাংস-পোলাও খেয়ে হারাণের আর গান শোনবার মেজাজ ছিল না। তারপর ওস্তাদি গান—তার মানে ক্যাঁও-ক্যাঁও ম্যাও-ম্যাও! দূর, বয়ে গেছে ওসব শুনতে।

সঙ্গীদের অনেকে গান শুনতে গেল। গেল অনেকটা ভদ্রতার খাতিরেই। হারাণ বললে, 'মাপ করো ভাই, আমাকে একটু ভালো করে ঘুমুতে দাও।'

হারাণ শুয়ে পড়ল। ঘুম এল, কিন্তু ভালো করে এল না। একেই বেশি খাওয়ার জন্যে শরীরে একটা অস্বস্তি ছিল, তার ওপরে নতুন জায়গা—হারাণের চটকা ভেঙে যাচ্ছিল থেকে থেকে। এরই মধ্যে একসময় তার কানে এল গানের সুর।

প্রথমটা ভালো করে খেয়াল করেনি, তারপরেই ভালো করে কান পাতল হারাণ। সুরের নামটা তখনো সে জানত না, পরে শুনেছিল দরবারী কানাড়া। কেয়াফুলের গন্ধে যেমন করে কেউটে সাপের ঘুম ভাঙে, তেমনিভাবে চমকে উঠল তার বুকের মাঝখানে। তার শিরাগুলোর ভেতরে সাড়া দিতে লাগল তবলিয়া দাদামশাইয়ের রক্ত।

হারাণ বলেছিল, 'এমনিই হয় ভাই, হঠাৎ এক-এক সময় মানুষ এমনি করে নিজেকে চিনতে পারে। মনে হল আকাশটা যেন আলো হয়ে উঠছে, তারাগুলো কাঁপছে, বাইরের গাছপালাগুলো পর্যন্ত গানের তালে তালে মাথা নাড়ছে। সুরটা যেন আমার নাড়ী ধরে টান মারল। আর থাকতে পারলাম না—ছুটে বেরিয়ে এলাম।'

সেই শুরু। লেখাপড়ায় এমনিতেই হারাণের মন ছিল না—এবারে সে পাট একেবারে মিটল। সেই সঙ্গে গেল তার ফুটবল খেলাও। তারপর থেকে যেখানে গান, সেখানেই হারাণ ; যেখানে হারাণ—সেখানেই গান।

গান যে নিজে শিখতে পেরেছে তা নয়। কে ওস্তাদ আছে আমাদের এসব তল্লাটে যার কাছে সে নাড়া বাঁধতে পারে ? এদের গলা দিয়ে তো ভালো করে 'সারগম' পর্যন্ত বেরুতে চায় না। না, সে কালোয়াত হয়নি—সমঝদার হয়েছে।

আমার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হওয়ার কথা ছিল না। আমাদের জাত আলাদা। আমি মোটামুটি পড়ুয়া ভালো ছেলে, হারাণের সঙ্গে লেখাপড়ার সম্পর্ক ক্লাস এইটেই চুকে-বুকে গেছে। বাবা তো হারাণের নাম শুনলে পর্যন্ত ক্ষেপে ওঠেন। কিন্তু তবুও ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব জমে উঠেছিল।

কী করে উঠেছিল বলা কঠিন। অথবা হয়তো খুব কঠিন নয়। এক জায়গায় মিল ছিল আমাদের দুজনের ভেতর। ছেলেবেলা থেকেই আমার ছন্দের কান ছিল, কবিতা লেখবার পাগলামি ছিল। তাই ওর গান ভালো লাগার আবেগের সঙ্গে আমার কবিতা ভালো লাগাটা মিশে যেত। ও যখন বিভোর হয়ে মল্লার-ভৈরবী-ভঁয়রো-ইমন-বাগেশ্রী-কেদারা-মালকোশ-ভীম পলশ্রীর কথা বলত, তখন গান না বুঝেও আমার প্রাণের মধ্যে কেমন দোল খেয়ে উঠত—বর্ষার মেঘে, শীতের জ্যোৎস্নায়, বসন্তের কৃষ্ণচূড়ায় আমি রাগরাগিণীর মূর্তি দেখতে পেতাম।

আমার কল্পনাকে দুলিয়ে দেবার এই একটা উপকরণ ছিল হারাণের হাতে।

ওর দাদামশাই শুধু তবলচিই ছিলেন না—গান নিয়ে অনেক পড়াশোনাও করে-

ছিলেন তিনি। নানারকমের পুরোনো বই ছিল ওদের বাড়িতে—বাংলায়, সংস্কৃতে। সংস্কৃত বইগুলো আমাদের কাছে দুর্গম ছিল, কিন্তু বাংলা বইতে রাগ-রূপের বর্ণনা পড়তে গিয়ে আমার সমস্ত মন আকুল হয়ে উঠত। আমি দেখতাম, কোনো রাগ দাঁড়িয়ে আছেন মেঘান্ধকার এক গিরিচূড়ায়, তাঁর হাতে ঘুরছে উজ্জ্বল এক সুদীর্ঘ তলোয়ার, তার শাণিত ফলকে লহরে লহরে খেলে যাচ্ছে বিদ্যুৎ; দেখতাম কেউ চলেছেন এক বিশাল গজরাজে আরোহণ করে, তাঁর মাথায় চামর-ছত্র—সঙ্গে চলেছে উৎসবমত্ত সহচরীর দল; কখনো দেখতাম পুষ্পল সৌন্দর্যে আকুল হয়ে গেছে সমস্ত বনভূমি—তারই ভেতরে দোলনায় দুলছে রাগমূর্তি; কখনো দেখতে পেতাম কে এক নিঃশব্দ বেদনায় বিভোর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, চোখে তার টলটল করছে জল, তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বনের হরিণী—তারও দুটো কাজল চোখ সমবেদনায় ছলছলিয়ে উঠছে।

গানের চেতনা আমার ভেতরে ছিল না, কবিতার ছোঁয়া দিয়ে হারাণ আর এক ভাবে জাগিয়ে তুলল তাকে। আমি ওর সঙ্গে মধ্যে মধ্যে গান শুনতে যেতাম।

কোনো এককালে আমাদের এই অঞ্চলটাতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চর্চা ছিল মনে হয়। সে যুগটা বহুদিন আগেই পার হয়ে গেছে, কিন্তু তবু যেন এখনো সে সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়নি। আমাদের বাড়িতে মা'র সেই পুরোনো কালো ট্রাংকটার উপমা মনে আসে; একরাশ কাপড় কতকাল থেকে জমা হয়ে আছে তার ভেতর—সেগুলো এখন কেউ পরে না, কোনোদিন আর পরবেও না। তবু হঠাৎ যদি কখনো তার ডালা খোলা হয়, তা হলে চকিতের জন্য চোখে পড়ে নানারঙের ময়ূরকণ্ঠী ঝলক—আশ্চর্য একটা ক্ষীণ গন্ধের উচ্ছ্বাস আসে—সিল্ক, বেনারসী, জরির আর সেই সঙ্গে কোনো কোনো বিদেশী সুরভির মৃদু উচ্ছ্বাস—যা আজ আর কেউ ব্যবহার করে না।

সেই গন্ধ, সেই সুরভি এখন কোথাও নেই, তবু তা আছে। আমাদের গ্রামে, আশেপাশে এখনো কোথাও তানপুরার ঝংকার ওঠে—কোনো হারানো ঘরানার স্মৃতি-চর্চা চলে। হারাণ ঠাট্টা করে বলে, 'এইসব টুংটাং আর এক-আধখানা ছেঁড়া তান কি আর গান রে—ওর জন্যে সাধনা করতে হয়। সেকালে মুনিঋষিরা যেমন করে ভগবানকে পেতো—সুরকেও পেতে হয় তেমনি তপস্যার ভেতর দিয়ে। খানিকটা হা-হা-হা করলাম, একমুঠো পান মুখে পুরলাম, দুটো মিছরির কুচি চুষলাম—ব্যাস্, হয়ে গেল গান? তাহলে তো শ্যামলাল মুখুজ্জেকেও সাক্ষাৎ মিঞা তানসেন বলতে হয়!'

শ্যামলাল মুখুজ্জের গান আমি বুঝি না, তত্ত্বও বুঝি না, তবু আমাদের এই অঞ্চলে হারানো দিনগুলোর স্মৃতি এবং সৌরভ আমাকে আবিষ্ট করত। আমি হারাণের সঙ্গে গান শুনতে যেতাম। প্রথম প্রথম খুব কষ্ট হত, বিলম্বিত রাগের খেয়াল শুনতে শুনতে মাথা ঝিমঝিম করত, ভাবতাম এ আপদ কতক্ষণে থামবে। কিন্তু ঝর্ণার জল পড়তে পড়তে যেমন করে একটা প্রকাণ্ড পাথরও একদিন সরে যায়, তেমনি ভাবে আমারও অনভ্যাসের বাধাটা সরে যেতে লাগল, একটু একটু করে আমি সুরের ভেতরে প্রবেশের পথ পেলাম—হারাণ আমার নেশা ধরিয়ে দিলে।

হারাণের তো কোনো ভাবনাই ছিল না। মা-বাপ নেই, মামাদের সংসারে মানুষ। হারাণ যখন শেষ পর্যন্ত স্কুল ছাড়ল, তখন তাঁরাও হাল ছাড়লেন। 'ওটার কিচ্ছু হবে

না—এক নম্বরের গাধা' বলে তাঁরা তাঁদের ধানের আড়তে হিসেব করতে বসে গেলেন। মামীমারা হারাণকে ভালোবাসতেন, তাঁরা বললেন, 'আহা নিজেরা সব কী বিদ্যে-দিগ্‌গজ—কেউ তো একটা পাসও দিতে পারলেন না! দরকার নেই ওর লেখাপড়ায়, বাড়িটাড়ি দেখবার জন্যে একজন কাউকেও তো দরকার—তোমরা তো টাকা ছাড়া আর কিছুই চেনো না!'

অতএব হারাণ থাকে মামীমার আদরে, বাড়ির এটা-সেটা করে দেয়, আর গানের পেছনে ছোটে। আমার বরাত অবশ্য হারাণের মতো নয়—লেখাপড়া করতে হবে, পাস করতে হবে, দাঁড়াতে হবে নিজের পায়ে। তাই ওর সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সবসময় সম্ভব হয় না আমার পক্ষে, সুযোগ-সুবিধে পেলে ওর সঙ্গ নিই। একটু ভয়ও আছে—বাবার চোখ এড়িয়ে আমাকে মিশতে হয় ওর সঙ্গে, কারণ আমার যে দু-চারটি বন্ধু আছে তাদের ভেতর হারাণ হচ্ছে তাঁর দু-চক্ষের বিষ।

বাবা বলতেন, 'এতদিন মাস্টারি করে জানতুম, গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করা যায়। কিন্তু এখন দেখছি—এক-একটা এমন গাধা আছে যে তাদের ঠ্যাঙালে তারা ছাগল হতে শুরু করে। হারাণ হচ্ছে সেই দলের।'

আমি বলতুম, 'হারাণ ছাগল হবে না, দিকপাল গাইয়ে হবে—' কিন্তু সেটা বলতুম মনে মনে। বাবার সামনে মুখ ফুটে একটা শব্দও উচ্চারণ করব, এমন সাধ্য কি আমার!

সেই জমিদারবাড়ি—যেখানে ফুটবল ম্যাচ খেলতে গিয়ে হারাণ প্রথম গানের স্বাদ পেলো, সেইটিই ছিল তার প্রধান আড্ডা। জমিদার ভদ্রলোক নিজে গানের চর্চা করতেন, বড়-ছোট-মাঝারি গাইয়ের আমদানি করে প্রায়ই বসাতেন গানের জলসা। মুগ্ধ মৌমাছির মতো সেই মধুচক্রে মগ্ন হয়ে থাকত হারাণ। যাতায়াতে প্রায় বারো মাইল রাস্তা—ক্বচিৎ কখনো মামাদের একটা ঝরঝরে সাইকেল সে পেতো, নইলে পায়ে হেঁটেই আসা-যাওয়া করত।

আমি কয়েকবার তার সঙ্গে এসেছি গেছি, উঠে বসেছি তার সাইকেলের ক্যারিয়ারে। তাও ছুটিছাটা পুজোপার্বণের দিন—যে সময় একটু রাত হলেও কারো কাছে কৈফিয়তের দায় থাকে না। কিন্তু মাঝরাতে গান শোনা এবং বাড়ি থেকে পালিয়ে—এ অভিজ্ঞতার পাঠ জীবনে এই প্রথম। কিন্তু এখন জলসাও ওখানে প্রথম—একসঙ্গে লাল খাঁ আর গহরা বাই কোনোদিন ওখানে গানের আসরে হাজির হয়নি।

কিছুদিন থেকেই একটা ব্যাপারে আমার মন একটু খচখচ করছিল। আমি দেখছিলুম, হারাণ যেন দিন দিন একটু একটু করে জমিদার ভদ্রলোকের পারিষদ হয়ে উঠছে। লোকটি যতই সঙ্গীত-বিশারদ হোন, আমার তাঁকে ঠিক ভালো লাগত না।

ভালো লাগত না দুটো কারণে। এক নম্বর কারণ, তাঁর চেহারা। টকটকে ফর্সা রঙ, মস্ত একখানা গোল মুখ—সেই মুখে অনেকগুলো বসন্তের দাগ থাকবার জন্যে কোথায় যেন চিতাবাঘের সাদৃশ্য পাওয়া যেত; তা ছাড়া মুখের তুলনায় চোখ দুটো ছিল ছোট ছোট, কখনো তিনি সে দুটো সম্পূর্ণ করে খুলতেন না—পাকা করমচার মতো ঘন লালের আভাস পাওয়া যেত তার ভেতর থেকে। দু নম্বর কারণ, আমি জানতুম, ভদ্রলোক মদ খেতেন, বেশ বেশি মাত্রাতেই খেতেন।

হারাণ বলত : 'চেহারা দেখে ভুল বুঝিসনি ভাই, মানুষটা সত্যিকারের গুণী।'

'কিন্তু মদ খায় কেন ?'

'পয়সা আছে, তাই খায়। তা ছাড়া গাইয়ে-বাজিয়ে লোকেরা ওসব একটু খেয়েই থাকে, নইলে কী বলে—তাদের মেজাজই আসে না। ওসব ধরতে হয় না।'

'ধরতে হয় না ?' সেবারে আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম। মাতালকে রাক্ষসের চাইতেও ভীতিকর বলে জানা ছিল আমার।

'তুইও এসব খাবি নাকি হারাণ ?' তিন পা সরে গিয়ে সভয়ে বলেছিলুম, 'তুইও মাতাল হবি নাকি ?'

'পাগল নাকি রে!' হারাণ অভয় দিয়েছিল : 'ওসব ঘোড়ারোগ কি গরীবের পোষায় ?'

'কিন্তু তুই তো ওঁর ওখানে আসিস-যাস, যদি জোর করে খাইয়ে দেয় ?'

'দিলেই হল ? ইচ্ছে না থাকলে কেউ খাওয়াতে পারে কাউকে ?'

'তুই ওসব খাবি না তো কোনোদিন ?'

'না, কোনোদিন না।'

'তবে ছুঁয়ে বল্ আমাকে!'

'এই তো ছুঁয়ে বলছি।'

হারাণকে আমি বিশ্বাস করেছিলুম তবু মন সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। দুর্জন-সংসর্গে কী হতে পারে, 'হিতোপদেশে'র গল্প থেকে আমি তা পড়েছি। আমি হারাণকে বলেছিলুম, 'অত ঘন ঘন ওখানে যাসনে ভাই, ওসব লোককে বিশ্বাস করতে নেই।'

'বললুম তো, আমি ঠিক আছি। আমার জন্যে তোকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না।'

কিন্তু আজ এই রাত্রে—বাড়ি থেকে পালিয়ে এই গান শুনতে যাওয়ার অভিযানে আমার সারাটা মন অনেকগুলো আশংকায় ভরে উঠেছিল। হারাণ আসবার আগে পর্যন্ত কিছুতেই আমি নিশ্চিত হতে পারছিলুম না—ওয়ারেন হেস্টিংসের অতুলনীয় কীর্তিকলাপও আমার কাছে থেকে থেকে দুর্ভাবনায় বিস্বাদ হয়ে উঠছিল।

বিকেলে হারাণের সঙ্গে যখন দেখা হয়েছিল, তখন আকাশে জলভরা মেঘের আনাগোনা, পুবের হাওয়া দিয়েছিল গাছপালায়, হারাণের মুখের ওপর বার বার রুক্ষ চুল উড়ে পড়ছিল, তার চোখ দুটো ঝিকমিক করছিল উত্তেজনায়। কাছাকাছি কেউ ছিল না, তবু আমার কানে কানে হারাণ বলেছিল, 'এমন চান্স জীবনে দুবার আসবে না, বুঝেছিস তো ?'

'কিন্তু ভাই—বাবা যদি—'

'আরে টের পাবেন কী করে ? তিনি তো ভাববেন তাঁর মনোযোগী লক্ষ্মী ছেলেটি বাইরের ঘরে বসে পরীক্ষার পড়া তৈরী করছে। চট করে চলে যাব, সুট করে ফিরে আসব—বুঝলি না ? আমাকেও তো পালিয়ে আসতে হবে—সারারাত ওস্তাদি গান শুনতে যাচ্ছি, একথা শুনলে বড়মামাই কি আমায় বেরুতে দেবে নাকি ?'

'ধরা পড়লে তুই না হয় একটু বকুনির ওপর দিয়ে পার পেয়ে যাবি, কিন্তু বাবা আমাকে সোজা তাড়িয়ে দেবে বাড়ি থেকে!'

'ধ্যেত্তোর কাওয়ার্ড'! তুই পুরুষমানুষের নাম ডোবালি!'

আমি শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' পড়েছিলুম, আমি জানতুম, 'কাপুরুষ' শব্দটা কিভাবে ম্যাজিক ঘটাতে পারে, কিভাবে ইন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীকান্তকে ভাসিয়ে দিতে পারে মধ্য-রাতের ভরাগঙ্গায়। বুকের ভেতরটায় আমার নাড়া খেয়ে উঠল। একটা ঢোক গিলে আমি বললুম, 'আচ্ছা ঠিক আছে।'

'কী ঠিক আছে?'

'যাব।'

'গুড বয়!' খুশি হয়ে আমার একটা হাত ধরে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিলে হারাণ। বললে, 'দ্যাখ্ তোকে আমি জোর করতুম না—তোর অসুবিধে অনেক আছে সে জানি, আমি একাই চলে যেতুম। কিন্তু কেন টানাটানি করছি, তা জানিস? ভালো জিনিস একা ভোগ করে সুখ নেই—বন্ধুবান্ধবদেরও তার ভাগ দিতে হয়। তুইও গান ভালোবাসিস বলে তোকে আসরে নিয়ে যেতে চাইছি—সেইজন্যেই এত করে বলা।'

আমি চুপ করে রইলুম।

হারাণ বলে চলল, 'তা ছাড়া ভেবে দ্যাখ্, এ ছাড়া সুযোগই বা আমরা পাব কোথায়? আমরা তো কলকাতা-দিল্লী-লক্ষ্ণৌ যেতে পারব না—শুনতে পাব না বড় বড় ওস্তাদের গান! ছিটেফোঁটা যা পাই, এখান থেকেই তো কুড়িয়ে নিতে হবে।'

যুক্তিতে ফাঁক নেই। কিন্তু হারাণ চলে গেলে, বাড়ি ফিরে এসে সন্ধ্যার পর যখন আমি পড়তে বসলুম, আকাশের ছাড়া-ছাড়া মেঘ যখন ঘন হয়ে জমাট বাঁধল, পুবে হাওয়ায় এল ঝড়ের মাতলামি, ছিপছিপ ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়তে লাগল একটানা—তখন সব আমার কাছে অনেক কঠিন, অনেক দুঃসাধ্য হয়ে উঠল।

হারাণ এ পাগলামি না করলেও পারত।

(পাগলামি? আজ ত্রিশ বছরেরও অনেক পরে যখন এই কাহিনী লিখতে যাচ্ছি, তখন জানি, সুস্থ মানুষকে কিভাবে পাগল করে দেয়—কেমন করে তাকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায় আলো আর আলেয়ার পেছনে। আমি পড়েছি জাঁ ক্রিস্তফ, পড়েছি মানের ডক্টর ফস্টার্স, দেখেছি এই গানের জন্যে মানুষের যন্ত্রণা—দেখেছি সেই যন্ত্রণার মধ্য দিয়েও তার কী দুর্লভ অমৃত-মুক্তি!

এই সেদিনও তো চমকে উঠেছিলুম। মধ্য কলকাতার একটা সিনেমা হলে গানের জলসা। রাত আড়াইটে। এইমাত্র শেষ হল ওস্তাদ আমীর খানের আসর। আমি সিগারেট খাওয়ার জন্যে বেরিয়ে এসেছিলুম। হেমন্তের শেষরাতে অল্প অল্প কুয়াশা, আলোর সারি ঘোলাটে, টুপ টুপ করে দু'এক বিন্দু শিশির—তারই মধ্যে আমি দেখে-ছিলুম ফুটপাথে অনেক মানুষ বিনিদ্র, উৎকীর্ণ, গানের নেশায় তখনো মাতালের মতো দুলছে। তার মধ্যে দীর্ঘ শীর্ণ চেহারার কে ও একটা ল্যাম্পপোস্টে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে? হারাণ? বুকের ভেতরটা আমার চমকে উঠেছিল মুহূর্তের জন্যে। না হারাণ নয়, হারাণ হতেই পারে না।)

কিন্তু এখন বাইরে যতই চোখ পড়ছে, ততই একটা শীতল শিহরণ টের পাচ্ছি বুকের ভেতর। অন্ধকারে দেবদারু গাছটা যেন বৃষ্টির তালে তালে একটা রাক্ষুসে মাথা নাড়ছে—যেন অশরীরী সঙ্গীতের একটা আসর বসেছে কোথাও, যেন একটা নিঃশব্দ

মল্লারের প্রবল দুরন্ত উচ্ছ্বাস বয়ে যাচ্ছে চারদিকে। শুনেছি দীপকে দীপ্ত শিখার আগুন জ্বলে ওঠে, বসন্ত রাগে মঞ্জুরিত হয় অরণ্য ; আমার মনে হতে লাগল—এই রাত্রির মল্লার অন্ধকারের বুকভাঙা বিপুল জলধারার মতো নেমে আসবে আমাদের ওপর, আমরা ভেসে যাব হারিয়ে যাব, তারপর জলের ভেতরে একটা চিনির কণা যেমন করে মিশে যায়—তেমনি ভাবে মিশে যাব চিরকালের মতো।

(সেদিন কথাগুলোকে ঠিক এইভাবে ভেবেছিলুম কিনা জানি না, কিন্তু উপলব্ধিটা যে ঠিক এইরকম ছিল, এ আমি আজো মনে করতে পারি। একেই কি ইংরেজিতে বলে প্রিমোনিশন? কিন্তু আমি তো হারাণের মতো ভাগ্যবান ছিলুম না, তার মতো আমার প্রতিটি রক্তনাড়ী তারবাঁধা সেতারের মতো সুরের সাড়া পেলেই রিনরিন ঝিনঝিন করে উঠত না। তাই আমি জীবনের শুকনো ডাঙায় যেখানে দাঁড়িয়ে রইলুম, গান সেখান থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। আর হারাণ—)

আমার ভাবনা চমকে উঠল। মা ডাকছেন।

'বিমল, খাবি আয়।'

ঘরের মেঝেতে হারাণের ছাতা থেকে জলের রেখাটা তখনো সাপের মতো জ্বলজ্বল করছিল। টেবিলল্যাম্পটা কমিয়ে দিয়ে, পায়ে চটি গলিয়ে, সাবধানে জলের দাগটা ডিঙিয়ে আমি খেতে গেলুম।

॥ তিন ॥

আমি বাড়ি থেকে যখন বেরিয়ে পড়লুম, আমার টাইমপীসে তখন ঠিক ন'টা পঞ্চাশ।

রোজ খেয়ে এই ঘরে এসে আমি দরজায় খিল দিই, আজ একটু শব্দ করেই বন্ধ করলুম দোরটা। মা অভ্যাসমতো ডেকে বললেন, 'এই, মশারি না ফেলে ঘুমুসনি, মশায় ছিঁড়ে খাবে—' আমিও রোজকার মতোই জবাব দিলুম, 'না মা, মশারি না ফেলে আমি শোবো না।'

ব্যাস্, অন্দরমহলের সঙ্গে আর সম্পর্ক রইল না।

বাবার শুতে শুতে এগারোটা সাড়ে এগারোটা বাজে, বিকেলের ডাকে যে খবরের কাগজটা আসে, সেটা তিনি তন্ন তন্ন করে পড়বেন এখন। কিন্তু এ ঘরে কী ঘটছে, তা তিনি টেরও পাবেন না। উঠবেন ছটায়, তারও আধ ঘণ্টা আগে মা উঠে খুট খুট করে কী সব করে বেড়াবেন, ঝি এলে সদর দরজা খুলে দেবেন। আমার ঘর সাতটায় খুললেও ক্ষতি নেই—কারণ বাবা জানেন, মা জানেন, আমি রাত জেগে জেগে ম্যাট্রিকুলেশনের পড়া তৈরী করছি।

তবু ভয় করছিল, তবু পা সরছিল না।

কিন্তু মনে পড়ল—'ধুত্তোর কাওয়ার্ড', মনে পড়ল শ্রীকান্তকে। তা ছাড়া তখন আমার বয়েস সেই পনেরো বছর—যখন নিষেধ ভাঙবার পাগলামি থেকে থেকে রক্তের মধ্যে টলমল করে ওঠে, যখন অজানা ভয়টাই আরো বেশি করে বুকের মাঝখানে হাতছানি দিতে থাকে। গহরা বাইয়ের মল্লারের চাইতেও সেই নিষেধ ভাঙবার—সেই ভয়টার ভেতরে ঝাঁপিয়ে পড়বার খ্যাপামিটাই আরো বেশি করে টানতে লাগল আমাকে। যে

ছোট স্যুটকেসটায় আমার যৎসামান্য বিষয়-সম্পত্তি আছে, তাদের খুদে তালাটা আমি আগেই যোগাড় করে রেখেছিলুম। দরজার শেকলে সেটা টুক করে টিপে দিয়ে আমি পথে নেমে পড়লুম।

আমার ছাতা ছিল না, একটা বর্ষাতি ছিল গায়ে। এটি আমার খুব আদর আর খুব অহঙ্কারের জিনিস, আমাদের গ্রামে আমার বয়েসী কোনো ছেলের তখন বর্ষাতি ছিল না। ওটা এনে দিয়েছিলেন আমার সেই জ্যাঠামশাই—যিনি এলাহাবাদে থাকেন, গত বছর পুজোর সময় বেড়াতে এসেছিলেন আমাদের এখানে।

বর্ষাতি পেয়ে হাতে প্রায় স্বর্গলাভ করেছিলুম আমি। কিন্তু ব্যাপারটা বাবার একেবারে পছন্দ হয়নি।

'এসব ভালো নয়, রাঙাদা। এতে করে ছেলেপুলে ফপিশ হয়ে যায়।'

মস্ত একজোড়া গোঁফ আর একমুখ হাসি নিয়ে বাবাকে ধমক দিয়েছিলেন জ্যাঠামশাই।

'থাম্ রে বাপু, থাম্! এই বুড়োর ওপর তোর এখন মাস্টারি না করলেও চলবে।'

বর্ষাতিটা আমার এই ঘরে এনেই রাখি, মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখি ওর ফিকে নীল মসৃণতার দিকে, আমার চোখ যেন জুড়িয়ে যায় দেখে দেখে। ওটাকে বৃষ্টিতে ভেজাতে আমার ইচ্ছেই করে না।

আজ এই বর্ষাতিটার ভেতরে শরীরটাকে ভরে দিয়ে রবারের মৃদু গন্ধের আমেজ পেতে পেতে আমি বেরিয়ে এলুম। মাথার টুপিটা কেমন নতুন রকমের লাগছিল—আয়নায় একবার নিজের চেহারাটা দেখতে ইচ্ছে করছিল।

কিন্তু সে-সব পরে হবে। আপাততঃ হারাণ আমার জন্যে বোধনের বেলতলায় অপেক্ষা করছে।

বাইরের রাতটা ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে তখনও উতরোল হাওয়ায় মাতাল। শুধু দেবদারু গাছটাই নয়, চারিদিকের সমস্ত গাছের মাথাগুলোই যেন আকাশজোড়া কোন্ সুরের আসবে সমঝদারের মতো মাথা নাড়ছিল। ঘাসগুলো ছপছপ করছে জলে, পথের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ছলছলে জলের ধারা। সব কালো, সব অন্ধকার, সব নির্জন। জানলা-দরজা-বন্ধ বাড়িগুলোতে একবিন্দু আলোর চিহ্ন নেই কোথাও, একটি মানুষের সাড়া নেই, একটা কুকুরের ডাকও ভেসে আসছে না। এমন রাত্রে চোরেও চুরি করতে বেরোয় না।

আচ্ছা পাগলামি যা হোক হারাণের!

ফিরে যাব? না, সেও অসম্ভব। হারাণ আমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে বেলতলায়। তাকে বিট্রে করা অসম্ভব। বেরিয়ে যখন পড়েছি, তখন যেতে আমাকে হবেই।

অন্ধকারে খানিকদূর এগিয়ে যেতেই বোধনতলায় বার-দুই টর্চের আলো জ্বলে উঠল। হারাণের সংকেত।

আমাদের সেই ছেলেবেলায় চৌকো ফ্ল্যাশ লাইট বিক্রী হত, কী করে যেন তারই একটা কিনেছিল হারাণ। সেই আলোটার কথা আমি কখনো ভুলতে পারব না। তার মাথায় যে কাচ ছিল, সেটার ছিল তিনটে মাথা—একটা সাদা, একটা নীল, একটা লাল। বাল্বের সামনে সরিয়ে সরিয়ে তিন রকম আলো করা যেত তা থেকে। বৃষ্টির মধ্যে আমি দেখলুম, একটা নীল একটা লাল চোখ যেন কিসের একটা হিংস্র ইঙ্গিত করল আমাকে।

আমি জানি ওটা আর কিছু নয়, ওখানে হারাণ দাঁড়িয়ে। ওই লাল-নীল কাচ সম্পর্কে আমি বরাবর মুগ্ধ ছিলুম—ওই সম্পদটির জন্যে ঈর্ষাও করতুম হারাণকে। কিন্তু আজ এই রাতে এই বৃষ্টি আর অন্ধকারে আমার জিনিসটা অদ্ভুত রকমের খারাপ লাগল।

তারপরেই সাদা আলো জ্বলল—চকচক করে উঠল পথের জল। আমি দেখলুম হারাণ এগিয়ে আসছে।

'এলি ?'

'হুঁ, এসে গেছি।'

ফ্ল্যাশ লাইটের আলোয় কিছুক্ষণ মুগ্ধভাবে আমাকে পর্যবেক্ষণ করল হারাণ। আমাকে এবং আমার বর্ষাতিকে।

'গ্র্যাণ্ড দেখাচ্ছে তোকে !'

'যাঃ !'

'এই বর্ষাতি, টুপি—ঠিক যেন মিলিটারী ম্যান !'

আমি সুখী হলুম, লজ্জাও পেলুম একটু।

'থাম্, চালাকি করতে হবে না।'

'চালাকি নয়, সত্যিই তোকে ভাল দেখাচ্ছে ভীষণ। যেন চেনাই যায় না। সে যাক—চল্ এখন। আর সময় নষ্ট করবার জো নেই।'

এক মুহূর্তের জন্যে দ্বিধা করলুম আমি।

'একটা কথা বলব, ভাই ?'

'আবার কী হল রে ?'

অতখানি রাস্তা—তায় এই বৃষ্টি, যেতে আসতে অনেক দেরি হয়ে যাবে না ? মানে গান-টান শেষ হলে বাড়ি ফিরে আসতে—'

'হয়ে যাবে—হয়ে যাবে !'

'কী করে হবে ?'

'শর্টকাট করব, বুঝলি ? আলেয়ার মাঠ দিয়ে।'

'আলেয়ার মাঠ !'

মুহূর্তের জন্যে আমার বুকের ভেতরটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। এই মাঝরাতে এই বৃষ্টি আর অন্ধকারের ভেতরে পেরিয়ে যেতে হবে আলেয়ার মাঠ ? গ্রামের তিনজন বাঘা জোয়ানও একসঙ্গে সে সাহস করবে না !

আমি শীর্ণ গলায় বললুম, 'সত্যি বলছিস ?'

'মিথ্যে বলব কেন ? আসতে-যেতে আড়াই মাইল কম হবে রাস্তা।' হারাণ হাসল : 'মিছেমিছি কে বড় রাস্তা দিয়ে অতখানি ঘুরতে যাবে—তুই বল্ ?'

'ও মাঠে ভয় আছে, হারাণ !'

উদ্ধতভাবে হারাণ বললে, 'কিসের ভয় ?'

'মানে—লোকে—ইয়ে—'

হারাণ হা-হা করে হেসে উঠল।

'মানে ভূত ? ওসব গাঁজাখুরি তুই বিশ্বাস করিস নাকি ?'

বিশ্বাস আমি করি না—কিন্তু করি না যে সেকথাও কি জোর করে বলতে পারি ? হারাণের হাসিতে আমি লজ্জা পেলুম। বললুম, 'তা নয়, তবে অত বড় ফাঁকা মাঠ—'

'হ্যাঁ, সে কথা বলতে পারিস। একসময় যখন বড় রাস্তা হয়নি, সে তো সত্তর-আশি বছর আগে—তখন নাকি ঠ্যাঙাড়ের আস্তানা ছিল ওখানে। সে তো রামজন্মের কথা। সে আমলের ভূতেরাও এখন বুড়ো হয়ে মরে গেছে !' নিজের রসিকতায় খুশি হল হারাণ : 'আরে ওসব কিছু না। আসলে জংলা মাঠ, বুনো শুয়োর-টুয়োর দুটো-একটা ছিল, তাই—'

'ভাই, সে ভয়ও তো আছে !'

'তুই একটা রাবিশ। সে-সব শুয়োর কবে লোকে সাবাড় করে দিয়েছে। নে আর বকবক করিসনি। এখানে দাঁড়িয়েই যদি রাত কাবার করবি, তাহলে আর গান শুনতে হবে না। চল্—পা চালা শীগ্গির !'

হারাণ চলতে আরম্ভ করল। আমি একটা নিঃশ্বাস ফেলে সঙ্গ নিলুম। আজ রাত্রে যা হওয়ার হোক। এখন আর ফিরে যাওয়া চলে না।

বৃষ্টি-বাতাসে নিঃসাড় ঘুমন্ত গ্রাম। কখনো গেরস্তবাড়ির বন্ধ জানালা, কখনো বা মুদির দোকানের ঝাঁপ—তাদেরই ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসছে এক-আধটা আলোর রেখা। শুকনো নিরাপদ জায়গায় বসে মধ্যে মধ্যে হাঁকডাক করে কুকুরেরা কর্তব্য পালন করছে, বৃষ্টিভেজা বাতাসে ভারী ডানা টেনে টেনে উড়ে যাচ্ছে একটা দুটো বাদুড়।

পথ আর দুধারের ঘাসের জমি জলে একাকার। ব্যাঙ ডাকছে, ঝিঁঝির সাড়া উঠছে। হারাণের ফ্ল্যাশ লাইটের সাদা আলোটুকু ঝকঝক করে উঠছে সেই জলের ভেতরে। রবারের জুতো ছপছপিয়ে আমরা এগিয়ে চললুম।

আধ ঘণ্টা পরে গ্রাম ছাড়িয়ে আমরা মাঠের সামনে এসে দাঁড়ালুম।

বৃষ্টিটা প্রায় ধরে এসেছে তখন। পড়ছে কি পড়ছে না। রবারের আশ্চর্য গন্ধভরা বর্ষাতিটা ভিজে আর ভারী হয়ে উঠেছিল আমার গায়ে। ভাবলুম খুলে ফেলি—কিন্তু সাহস হল না। কেমন মনে হল ওই বর্ষাতিটা একটা আশ্রয়ের মতো—একটুখানি অভয়ের মতো আমাকে ঘিরে রেখেছে।

মাঠটার সামনে এসে বোধ হয় একবারের জন্যে হারাণের মনেও সংশয় জাগল। দিনের আলোয় এ মাঠ অনেকবার দেখেছি, দল বেঁধে এগিয়ে গেছি বৈঁচি খেতে—চলে গেছি জংলী নদীটার সেই মজা খাঁড়ি পর্যন্ত। দুটো-চারটে বট-অশথের গাছ, এলো-মেলো ঝোপজঙ্গল, কোথাও কোথাও সারবাঁধা ক'টা তালের গাছ—এছাড়া মাঠটার আর কোনো বিশেষত্ব চোখে পড়েনি—চলতি গালগল্প দুপুরের রোদে কোথায় মিলিয়ে গেছে আমরা টেরও পাইনি।

কিন্তু রাত্রে সে সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল। বৃষ্টি থেমে যাওয়া মেঘে ঢাকা আকাশের তলায় একটা অপরিচিত ভয়ংকর রূপ নিয়ে জমাট-বাঁধা অন্ধকারের মতো পড়েছিল মাঠটা। এখানে দাঁড়িয়ে যে দু-একটা গাছ—যে-সব ঝোপঝাড় আমরা দেখতে পাচ্ছিলুম, হাওয়ার দোলা লেগে যেসব শব্দ উঠছিল, ঝিঁঝির ডাকে যেভাবে ঝমঝম

করছিল চারদিক, তাতে আমার পা আর এক ইঞ্চিও এগোতে চাইল না। ঠ্যাঙাড়ে, বুনো শুয়োর—এই মাঠে কবে কে কী অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখেছিল তার গল্প, মনে হল এই মাঠে আজ রাত্রে তা সব সত্য হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ আমার কাঁধ ধরে কে ঝাঁকুনি দিলে, আমি দারুণভাবে চমকে উঠলুম।

'কি রে বিমল, ভাব লেগে গেল নাকি?'

'হারাণ!' আমি বলতে চাইলুম, 'আমাকে ছেড়ে দে ভাই, এ মাঠ আমি কিছুতেই পার হতে পারব না', কিন্তু কথাটা গলা পর্যন্ত এসেই থেমে দাঁড়িয়ে গেল।

হারাণ বললে, 'এই তো পায়ে-চলার ফালি রাস্তাটা। চল্ এগোনো যাক।'

আমরা চললুম। আমাদের সামনে হাত সাতেক পর্যন্ত অর্ধবৃত্তাকারে ফ্ল্যাশ লাইটের যে সাদা আলোটা পড়েছে তাতে জলভরা পথ, ভিজে ঘাস, কণ্টিকারী, আকন্দের ঝোপ আর বিছুটির জঙ্গল চিকচিক করে উঠছে। তার বাইরে সব কালো, সব অন্ধকার, সব অনিশ্চিত। সেই আলোটুকুর দিকে দৃষ্টি রেখে, হারাণের পাশে পাশে আমি চলতে লাগলুম। আলোর বৃত্তটার বাইরে অপরিচিত অন্ধকারের দিকে চোখ মেলে চাইবারও সাহস আমার ছিল না।

হারাণ কিন্তু ধাতস্থ হয়ে উঠল একটু পরেই। কী একটা সুর ভাঁজতে লাগল গুনগুন করে।

'এটা কী সুর, বল্ তো?'

বললুম, 'আমি জানি না।'

'এত সহজ সুর, তবু বুঝতে পারলি না? মিঞামল্লার।'

'তা হবে।'

আমার গলার স্বরে কী ছিল জানি না, আমার দিকে মাথা ফেরালো হারাণ।

'তুই ভয় পেয়েছিস, না?'

'না, পাইনি।' মিথ্যে কথাই বলতে হল আমাকে।

'তবে এত মিইয়ে গেলি কেন?'

'মিইয়ে যাইনি তো! কিন্তু এই জল বৃষ্টি আর বিশ্রী এই মাঠটার ভেতর দিয়ে এত রাতে যেতে গেলে—'

কথাটা কেড়ে নিয়ে হারাণ বললে, 'গানের জন্যে এর চেয়ে ঢের বেশি কষ্ট করতে হয় রে—এ তো আর কী বলে গাছের আম নয় যে পেড়ে নিয়ে খেলেই হল! একজন ওস্তাদের গল্প শুনবি?'

একটা গল্প-টল্প হলে আমি বেঁচেই যাই। বললুম, 'বলে যা।'

'ওস্তাদ গান গাইছেন—মানে ডুবে গেছেন তাঁর সাধনায়। এমন সময় বাড়িতে আগুন লাগল।'

'তারপর?'

'তারপর গান গাইছেন তো গাইছেনই। বন্ধ দরজায় বাড়ির লোকে ঘা দিচ্ছে প্রাণপণে—কে শুনবে? শেষে ওস্তাদের যখন খেয়াল হল তখন তাঁর চারদিকে আগুনের বেড়াজাল। বললেন, ঠিক আছে—বেরুতে যখন পারবই না, তখন শেষবারের মতো আগুনের গান গাওয়া যাক—"জগমগ জগমগ দীয়া জ্বালাও—"'

হারাণের গল্প শেষ হওয়ার আগেই আমার মুখ দিয়ে আর্তনাদ বেরুল। আমাদের ডানদিকে—খানিকদূরে অন্ধকারের ভেতর দপ করে আলো জ্বলে উঠেছে একটা।

'হারাণ!'

'কী হল রে?'

'ভাই, তোর ওস্তাদের আত্মা নিশ্চয়। আগুন জ্বলে উঠেছে ওখানে।'

'দূর বেকুব—ও তো আলেয়া!'

'আলেয়া?'

'কেন, আলেয়া দেখিসনি আগে? বর্ষাকালে মাঠে-জলায় কী সব গ্যাস-ট্যাস হয় না! তাই থেকেই তো ওগুলো জ্বলে ওঠে। তুই তো হেডমাস্টার মশায়ের ছেলে, ভালো ছেলে—তোরই তো এসব জানা উচিত।'

আমি জানি। কিন্তু হারাণের গল্পের সঙ্গে সঙ্গে ওটা এমন করে জ্বলে উঠল যে—

ডানদিকে, আরো দূরে দপ করে আর একটা আলেয়া ফুটে উঠল। মনে হল সেটা যেন দুলতে দুলতে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে।

'ঠিক মনে হচ্ছে ভাই—' আমি কাঁপা গলায় বললুম, 'কেউ যেন লণ্ঠন হাতে চলে আসছে এদিকে!'

'মনে হয় ওরকম।' হারাণ একটু হাসল: 'ওইতেই তো ভয় পায় আনাড়ী লোকে। তারপর বাড়ি ফিরে গিয়ে ভুতুড়ে গল্প ছড়ায়। এই মাঠে, বিশেষ করে বর্ষার সময় বিস্তর আলেয়া জ্বলে। ওইজন্যেই তো মাঠটার এই নাম।'

আলেয়া দুটো নিবে গিয়েছিল। হারাণ আবার সহজভাবে বললে, 'তোকে মল্লারের কথা বলছিলুম—ওর আবার কতগুলো ভ্যারাইটি আছে, জানিস তো? মিঞা-মল্লার, নটমল্লার, সুরটমল্লার, গৌড়—' বলতে বলতে হারাণ থেমে গেল হঠাৎ।

'এই, শুনছিস শব্দটা?'

আমার বুক ধুক করে উঠল।

'কিসের শব্দ রে!'

'ধ্যেৎ, তুই গাধার মতো ঘাবড়ে যাচ্ছিস কেবল। জলের আওয়াজ পাচ্ছিস না? খুব ঢল নেমেছে জংলা নদীতে।'—হারাণ কান পাতল: 'হুঁ, জোর জল এসেছে।'

এবার আমিও শুনতে পেলুম। তীব্র গোঙানির মতো একটানা চঞ্চল আওয়াজ। সোনা ব্যাঙের চিৎকার আর ঝিঁঝির ডাক ছাপিয়ে, মাঠের গাছপালায় বাতাসের শব্দকে ডুবিয়ে দিয়ে শব্দটা সমস্ত মাঠকে ছেয়ে ফেলছে।

হারাণ বললে, 'গত দু-তিন বছরে এত জল আসেনি। অন্ততঃ ডাক শুনে মনে হচ্ছে সেইরকম।'

জংলী নদী আমার অচেনা নয়। দিনের বেলা, শীতের দুপুরের হলুদরঙা রোদে আমরা দল বেঁধে বৈঁচি খেতে কতবার গেছি ওই নদীর ধারে। হাত তিরিশেক চওড়া একটা মজাখাঁড়ি, বালির ভেতর দিয়ে তিরতিরে একটু জলের রেখা—তাতে পায়ের পাতা পর্যন্ত ভালো করে ডোবে না। তবু সেই জলের ধারেই বসে থাকে দুটো একটা কানি বক—কী মাছ-টাছ পায় তারাই জানে। এদিকে-ওদিকে মধ্যে মধ্যে আটকে থাকা জলের টুকরো, কি একরকম পোকা ঝাঁক বেঁধে সাঁতার কাটে তাতে—মানুষ কাছে এলেই

পিড়-পিড় করে উড়তে থাকে।

এই নদীতে অমন জলের ডাক! আমার ভালো করে বিশ্বাস হতে চাইল না।

হারাণ বললে, 'ওইজন্যেই তো জংলী নাম ওর। হঠাৎ জলের তোড়—পাঁচ-ছ ঘণ্টা খুব স্রোত চলল, ব্যাস, তারপরে যে-কে সেই। একেবারে বুনো।'

'ফাঁকা মাঠের মধ্যে বয়ে যাচ্ছে—বুনো ছাড়া কী আর হবে!'

'যা বলেছিস!' হারাণ হাসল: 'কিন্তু জানিস, আগে বারো মাস জল থাকত। ঠ্যাঙাড়েরা মানুষ-খুন করে পুঁতে দিত ওর বালির তলায়।'

'ওসব বলিসনি ভাই, ভালো লাগে না।'

'ধ্যেৎ, তুই বিচ্ছিরি ভয়কাতুরে!' চলতে চলতে, নদীর ডাক শুনতে শুনতে হারাণ বললে, 'কিন্তু আমার কী মনে হয় জানিস? ওই নদীটা ঠিক কোনো পুরোনো বড় ওস্তাদের মতো ঝিম মেরে চুপচাপ বসে থাকে—বাহবা চায় না, আসরে যায় না—লোকে ভাবে মানুষটার মধ্যে কিচ্ছু নেই। কিন্তু তারপর হঠাৎ একদিন মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে বসে বুড়ো ওস্তাদ তানপুরা টেনে নেয়, ধীরে ধীরে গলা খোলে—তারপরেই বিদ্যুতের মতো খেলতে থাকে সারগমের ঝলক। পাহাড়ী ঢলের মতো সব ভাসিয়ে দিয়ে সুরের বান আসে—তখন কে দাঁড়ায় তার সামনে? এই জংলী নদীটাও ঠিক সেই ওস্তাদের মতো—আজ ওর গলায় আকাশভাঙা মিঞা কি মল্লারের সুর লেগেছে।'

ভয় আর ভাবনা ভুলে গিয়ে আমি মুগ্ধের মতো হারাণের কথা শুনতে লাগলুম। আমি তো মোটামুটি ভালো ছাত্র, বাংলায় একটা লেটার পাওয়ারও আশা রাখি, কিন্তু এমন চমৎকার করে এত সাজিয়ে একটা কথাও তো আমি লিখতে পারতুম না। লেখাপড়া হয়তো হারাণের হয়নি, কিন্তু সরস্বতী তাঁর গানের বীণাটি ছুঁইয়ে দিয়েছেন হারাণের কপালে—তাই এত সহজে সমস্ত জগৎটা গানে গানে উতরোল হয়ে উঠেছে হারাণের কাছে।

নদীর গর্জন তখন আরো গভীর, আরো জোরালো। এতক্ষণে আলেয়া-জ্বলা অন্ধকার মাঠের আর সব ধ্বনি, সব চেতনা ওই শব্দের মধ্যে ডুবে গিয়েছিল। সভয়ে আমার মনে হল, ওই নদীটা—

আমি বললুম, 'হারাণ!'

'কি রে?'

'নদীটা পেরিয়েই তো যেতে হবে আমাদের?'

'নিশ্চয়।'

'কেন, পুরোনো কাঠের সাঁকোটা আছে না?'

'সেটা কিরকম ভাঙা-ভাঙা আর নড়বড়ে—'

'সে তো হবেই।' হারাণ খুব সহজভাবে নিলে ব্যাপারটা: 'নতুন রাস্তা হওয়ার পরে তো লোকে আর এদিক দিয়ে বেশি চলে না। দু-চারজন গ্রামের মানুষ যা আসে যায়। তাছাড়া এরকম এক-আধটা বর্ষার দিন ছাড়া নদীতেই বা কোথায় জল থাকে, বল? হেঁটেই পেরিয়ে যায় সবাই। কার আর গরজ পড়েছে পুলটার জন্যে—কেই বা সারাচ্ছে!'

'ওই পুলটাই তো আমাদের পার হতে হবে?'

'তা ছাড়া কী করবি ? সাঁতরাবি নদী ?' হারাণ ঠাট্টা করে বললে, 'দ্যাখ্ না চেষ্টা করে। কুটোর মতো ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।'

ততক্ষণে আমরা নদীর ধারে এসে পে'ৗছে গিয়েছিলুম। জলের গর্জনে কান বন্ধ হয়ে আসে এমনি একটা অবস্থা। উ'চু পাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে হারাণ নীচের দিকে ফ্ল্যাশ লাইট ফেলল।

আলো বেশি দূরে পে'ৗছলো না—অর্ধবৃত্তের আকারে শূন্যতার অন্ধকারেই হারিয়ে গেল। তবু যা দেখবার আমরা দেখলুম। নদী ফুলে উঠেছে—ডুবিয়ে দিয়েছে দুধারের ছোট-বড় ঝোপগুলো, আর এক-একটা ফেনার স্তবক নিয়ে ঘন বাদামী রঙের জল ছুটে যাচ্ছে খড়্গের ধারায়। হাজার হাজার ক্ষ্যাপা মোষ নেমেছে তার জলে।

তখন আর চাপা গলায় কথা বলে লাভ নেই—সেই প্রচণ্ড শব্দের মধ্যে সে-চেষ্টাও আমি করলুম না। চিৎকার করে বললুম, 'ভাই, এর ভেতরে ভাঙা সাঁকো পেরিয়ে—'

'কোনো ভয় নেই।'

'যদি পড়ে-টড়ে—'

'পড়ে যাবি কেন ? খোকা নাকি ? আয় আয়—'

আমার শরীর শক্ত হয়ে গিয়েছিল। হারাণ টানতে টানতে নিয়ে চলল আমাকে।

টর্চের আলোয় কালো একটা জীর্ণ কঙ্কালের মতো দেখাচ্ছে পুরোনো কাঠের ব্রীজটা। আলকাতরার রঙ চটে গেছে অনেক দিন, ধরুনি খসে পড়ছে এখানে ওখানে—আমার আর পা উঠতে চাইল না।

'ধ্যুৎ, দাঁড়িয়ে আছে ক্যাবলার মতো!' হারাণের স্বর হঠাৎ অস্বাভাবিক হয়ে উঠল: 'শুনতে পাচ্ছিস না, নদীর জলে মল্লার চলছে দ্রুতলয়ে? আর সময় নষ্ট করা চলে? এখুনি—একটু পরেই গহরা বাইয়ের গান আরম্ভ হয়ে যাবে। চলে আয়—চলে আয়—'

'ভাই, পুলটা যেন দুলছে—কেমন যেন—'

'দুলছে—দুলুক। চিরকাল দোলে। আজ গানের সুরে মাতাল হয়ে দুলছে। কোনো ভাবনা নেই তোর, চলে আয় আমার সঙ্গে—'

কয়েক পা এগিয়ে গেলুম আমরা।

হঠাৎ আমি দেখতে পেলুম, ঠিক ব্রীজটার ওপারেই যেন দপ করে জ্বলে উঠেছে একটা আলেয়া। আমি চমকালুম, ব্রীজটা ঠিক আমাদের পায়ের তলায় মট্ মট্ করে উঠল, হারাণ চীৎকার করে আমাকে চেপে ধরল—আমরা দুজনে পাশের ধরুনির ওপরে কাত হয়ে পড়লুম।

তারপরেই পাঁজরে একটা অসহ্য যন্ত্রণা, হারাণের আর একটা চিৎকার—ফ্ল্যাশ লাইটটা কোথায় ছিটকে চলে গেল আর ধরুনি ভেঙে আমরা দুজনে সেই অন্ধকার দুরন্ত স্রোতের মধ্যে আছড়ে পড়লুম।

বুকে দারুণ একটা ধাক্কা লাগল, চোখে-মুখে ঠাণ্ডা জল ঝাপট মারল, পরক্ষণেই আমি যেন একেবারে অতলে তলিয়ে গেলুম।

॥ চার ॥

মিনিটখানেক কী হয়েছিল জানি না—সেই ঠাণ্ডা অন্ধকার স্রোতের ভেতরে কে যেন পাগলের মতো আমায় ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল দম ফেটে যাবে। তারপর সাঁতার জানার অভ্যাসে—বাঁচবার সেই চিরকালের আকুলতায় প্রাণপণে আমি জলের ওপর ঠেলে উঠলুম।

তখন আমি আর স্রোত—স্রোত আর আমি। আর অন্ধকারের ভেতরেও ছুটন্ত জলের পিঙ্গল রূপ। আর কোথাও কিছু নেই—কেউ না।

মুখ থেকে জল বের করে ফেলে ভাঙা গলায় আমি চেঁচিয়ে উঠলুম: 'হারাণ!'

কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। শুধু জলের ভয়ংকর শব্দে আমার দুটো কান যেন বধির হয়ে যেতে লাগল। আমার সাঁতার কাটবার কোনো দরকার হচ্ছিল না—মাত্র শরীরটাকে কোনোমতে ভাসিয়ে রেখে প্রখর স্রোতের মধ্যে কুটোর মতো ছুটে যাচ্ছিলুম আমি। তীরগতিতে আমার সঙ্গে বয়ে যাচ্ছিল লালচে ফেনার রাশ, শুকনো ডালপাতার মতো আরো কিসব কোন্ অকুলে আমায় টেনে নিয়ে চলেছিল—তা ভাববারও আমার সময় ছিল না।

'হারাণ—হারাণ—' ছুটে যেতে যেতে আবার আমি চিৎকার করলুম। কিন্তু এর মধ্যে অন্ধকার পিঙ্গল এই জলের ওপরে যতটুকু দেখতে পাচ্ছিলুম, তাতে হারাণের কোনো চিহ্নও কোথাও ছিল না। শুধু দুটো অস্পষ্ট তীর—তার ঝোপঝাড়, তার বেঁচির জঙ্গল, তার বুনো কুলের গাছ নিয়ে ছিটকে সরে যাচ্ছিল পেছনে—আর আমার চারদিকে একটানা জলের অট্টহাসি যেন আমাকে বলছিল: 'হারাণ নেই—হারাণ নেই —আর কোনোদিন তাকে তুমি খুঁজে পাবে না!'

আমার হৃৎপিণ্ড হিম হয়ে এল। আর এতক্ষণে আমি অনুভব করলুম কী শীতল—কী দুঃসহ শীতল এই জল! এর মধ্যে আর কিছুক্ষণ থাকলে আমার সারা শরীর জমাট বেঁধে যাবে।

এরপরে বড় হয়ে অনেক তুহিন-শীতল জলের ছোঁয়া আমি পেয়েছি—পেয়েছি হিমালয়ের কোলে তিস্তা-জলঢাকা-রংপো-রিলিতে, পেয়েছি হৃষীকেশের গঙ্গায়, অনামা পাহাড়ী ঝোরার বরফগলা স্রোতের ভেতর—কিন্তু আতংক আর আকস্মিকতার সঙ্গে মিশে আজোয়ার মাঠের সেই ঢল-নামা জংলী নদীতে যে শীতের স্পর্শ আমি অনুভব করেছিলুম, তার সঙ্গে বুঝি মাত্র একটা উপলব্ধিরই তুলনা করা চলে। শীতের মধ্য-রাতে যদি একা কোনো হাসপাতালের মর্গে পা দেওয়া যায়, যদি হিম, মৃত্যু আর অমানুষিক ভয়ে সমস্ত শিরা-স্নায়ু শিথিল হয়ে আসে—তা হলে একমাত্র সেইখানেই তার কিছুটা স্বাদ পাওয়া যেতে পারে।

সেই অদ্ভুত হিমাক্ত আতঙ্কের মধ্যে আমার মস্তিষ্ক যেন জমে যাচ্ছিল—আর একটু পরে হয়তো স্রোতের ওপর থেকে আমি তলায় নেমে যেতুম—নিঃশেষে হারিয়ে যেতুম মৃত্যুর অতলে। কিন্তু যে জীবন কোনোমতে হার মানতে চায় না, বলির পরে ছিন্নকণ্ঠ পশুর শারীরিক আক্ষেপের মধ্যে দিয়েও তার শেষ প্রতিবাদ জানিয়ে যায়,

আমার সেই পনেরো বছরের নতুন সতেজ জীবন আমাকে মনে করিয়ে দিলে—এভাবে হাত-পা ছেড়ে দিয়ে কোনোমতেই আমার ভেসে যাওয়া চলবে না—আমাকে যে করে হোক পাড়ে উঠতেই হবে।

সাঁতার আমি মন্দ জানি না—পূর্ব বাংলার জলের দেশে আমার বাড়ি—হাঁসের মতো সে সংস্কার আমার রক্তে রক্তে। ছুটিছাটায় দেশে গিয়ে বাড়ির পুকুর পাড়ি দিয়েছি কতবার, সাঁতার দিয়েছি খালের জলে, এমন কি কুমীরের ভয় ভুলে গিয়ে আড়িয়াল খাঁর গম্ভীর বিশাল বুকেও ঝাঁপাই ঝুরেছি। আত্মবিশ্বাসে আমি সজাগ হয়ে উঠলুম। বুঝতে পারলুম আমার আগেই হারাণ নিশ্চয় কোথাও ডাঙায় উঠে পড়েছে—আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে—ডেকে বেড়াচ্ছে হয়তো। এই স্রোত আমাকে বহুদূরে ঠেলে নিয়ে চলে যাওয়ার আগেই পাড়ে উঠে পড়তে হবে—আর দেরি করা চলে না।

কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে হল, কে যেন আমাকে ক্রমশ শক্ত করে জড়িয়ে ধরছে—ভারী হয়ে, নিষ্ঠুর হয়ে আমাকে টেনে নিতে চাইছে জলের তলায়। আমি আনন্দে আর আতঙ্কে ডেকে উঠলুম ঃ 'হারাণ!' তারপরেই মনে হল, ওটা আমার সেই ওয়াটার-প্রুফ—আর একটা মানুষের শরীরের মতো আমাকে আঁকড়ে ধরেছে, টেনে নামাতে চাইছে স্রোতের নীচে।

ওয়াটারপ্রুফটা আমার অনেক সাধের, অনেক অহঙ্কারের জিনিস। আজ রাতে বিশিষ্ট হওয়ার জন্যে ওইটেকে আমি গায়ে পরেছিলুম। হারাণ খুশি হয়ে বলেছিল, 'তোকে চমৎকার দেখাচ্ছে রে বিমল—ঠিক মিলিটারীর মতো মনে হচ্ছে যেন!' কিন্তু এখন আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলুম—মাত্র দুটো রাস্তা খোলা আছে আমার সামনে। মোটা রবারের ওয়াটারপ্রুফটা ক্রমশই যেভাবে আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জাপটে ধরছে—তাতে ওটাকে বাঁচাতে হলে ওর সঙ্গে আমাকেও তলিয়ে যেতে হবে ; আর যদি আমাকে বাঁচতে হয়—তাহলে ওটার মায়া এই মুহূর্তেই আমার ত্যাগ করা দরকার।

একবার দ্বিধা করলুম, কিন্তু মাত্র একবারের জন্যেই। মৃত্যুর আলিঙ্গনের মতো ওয়াটারপ্রুফটাকে প্রাণপণ চেষ্টায় গা থেকে ঝেড়ে ফেললুম আমি, সেই চেষ্টায় ডুবে গেলুম জলের ভেতরে, তারপর আবার যখন ভেসে উঠলুম তখন শরীর অনেকখানি হাল্কা হয়ে গেছে।

ওয়াটারপ্রুফটা গেল—যাক। তার জন্যে দুঃখ করবার সময় অনেক পাওয়া যাবে। কিন্তু আপাততঃ এই জলটাকে আর সহ্য করা যাচ্ছে না—শরীর কালিয়ে যাচ্ছে, হাত-পা অসাড় হয়ে আসছে। সবটুকু শক্তি জড়ো করে, দুরন্ত স্রোতের বাধা এড়িয়ে আমি ডানদিকের পাড়ের কাছে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলুম।

ডুবে-যাওয়া ঝোপের মাথাগুলো স্রোতের প্রচণ্ড টানে থরথর করে দুলছে। ধরবার জন্যে মুঠো করলুম, রাখতে পারলুম না—শুধু হাতের ভেতর কতগুলো পাতা ছিঁড়ে এল ; পায়ের নিচে মাটি পেতে চাইলুম—স্রোত আমাকে খানিকটা হাবুডুবু খাইয়ে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। আবার একটা ঝোপ আঁকড়ে ধরেই আর্তনাদ করে ছেড়ে দিলুম আমি—একরাশ বেতের কাঁটা হাতের তালুতে যেন ধারালো কতগুলো দাঁত বসিয়ে দিলে।

তবু শেষ পর্যন্ত ডাঙা মিলল। শক্তগোছের একটা ডাল হাতে ঠেকল—নুয়ে পড়া একটা বেঁটেগোছের গাছ, হয়তো হিজল, হয়তো আর কিছু হবে—আমার টানে ডালটা মটমট করতে লাগল, তবু ভাঙল না—তাই ধরে সেই ছুটন্ত স্রোতের ভয়ংকর নিষ্ঠুরতা থেকে আমি নিশ্চল, নিশ্চিত মাটিতে উঠে পড়তে পারলুম। পায়ের তলায় একরাশ ঝোপজঙ্গল ভেঙে শেষে আমি মাঠের মধ্যে এসে দাঁড়ালুম।

অনেক পরে আমার মনে পড়েছে, আমি যখন ঝোপ মাড়িয়ে, কাঁটার আঁচড় খেতে খেতে ওপরে উঠে আসছিলুম, তখন জলের সেই কান-ফাটানো শব্দটা ছাপিয়েও আশপাশে কোথাও তীব্র-তীক্ষ্ণ একটা আওয়াজ উঠছিল শিঁ-শিঁ করে, কেউ যেন শিস্ টানছিল। তখন যদি আমি লক্ষ্য করতুম, বুঝতে পারতুম—ও হল এ অঞ্চলের সেই মারাত্মক গোখরো সাপের শাসানি—পাকা গমের মতো যার গায়ের রঙ, আঙুল ছড়িয়ে দেওয়া হাতের মতো যার ফণার বিস্তার। কিন্তু লক্ষ্য করেই বা কী করতে পারতুম আমি? আমার সামনে মৃত্যু, পেছনে মৃত্যু—এবং পেছনের নিশ্চিত মৃত্যুর চেয়ে সামনের বিভীষিকা অনেক ভালো। সাপ অন্তত একটা প্রাণী, জংলী নদীর চলনামা দুরন্ত স্রোতের মতো একটা নিষ্ঠুর প্রাকৃতিক শক্তি নয়।

আর প্রাকৃতিক শক্তি নয় বলেই সাপটা আমাকে কামড়ায় নি। জৈব নিয়মেই বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল, আমি তাকে আঘাত করতে চাই না—আমি বাঁচতে চাই। কিন্তু এসব কোনো ভাবনাই তখন আমার ছিল না—ভাববার শক্তিই ছিল না। আমি টলতে টলতে বৃষ্টিভেজা মাঠের ভেতরে খানিকদূর এগিয়ে গিয়ে ধপ্ করে বসে পড়লুম।

কিছুক্ষণ ধরে আমি শুধু শুনতে লাগলুম নদীর ডাক—শিকার হারিয়ে যে হিংস্র পশুর মতো আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে তখনো। তারপরে টের পেলুম ঝড়ো হাওয়ার মতো নিঃশ্বাস পড়ছে আমার, শুনতে পেলুম আমার হৃৎপিণ্ড পাগলের মতো ধপ-ধপ করছে—যেন ফেটে বেরিয়ে যেতে চায়।

একটু একটু করে আত্মস্থ হতে লাগলুম আমি। বৃষ্টি থেমে গেছে এবারে—এতক্ষণ পরে। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের ফাঁক দিয়ে মাথার ওপর তারার উজ্জ্বলতা, সোনা ব্যাঙ ডাকছে, ঝিঁঝি ডাকছে, পোকামাপড় ডাকছে চারপাশে। পুবের হাওয়া বয়ে যাচ্ছে, শীতে আমার সারা শরীর ঠকঠক করে কাঁপছে।

কিন্তু এভাবে বসে থাকলে তো চলবে না। হারাণকে খোঁজা দরকার। সে নিশ্চয় অনেক আগে ডাঙায় উঠে পড়েছে। এপারে হোক ওপারে হোক, যেখানেই থাকুক তার একটা সাড়া পাওয়া দরকার।

আমি প্রাণপণে চেঁচিয়ে ডাকলুম, 'হারাণ—হারাণ—'

কোনো সাড়া এল না।

'হারাণ—হারাণ—'

মাঠের মধ্য দিয়ে আমার গলা হাওয়ায় ভেসে গেল, অন্ধকারে তলিয়ে গেল, গলে গেল নিশ্চিহ্ন হয়ে। শুধু নদীর হাসি শোনা যেতে লাগল পেছনে, শুধু ঝিঁঝি ব্যাঙ আর পোকামাকড় ডাকতে লাগল একটানা, হু-হু করে এক-একটা বাতাসের শব্দ উঠতে লাগল—হারাণের সাড়া এল না।

বুকের ভেতরে যেন বিদ্যুৎ বিঁধল একটা।

হারাণ কি ডুবে গেল নদীতে—মরে গেল সে ? ভাবতেই আমার সমস্ত শরীর চমকে। না, অসম্ভব, সে হতেই পারে না। আমার চাইতে সে বয়েসে অনেক বড়, প্রকাণ্ড লম্বা তার দেহ, নামকরা ফুটবল খেলোয়াড় সে। আমি যদি স্রোত ঠেলে উঠে আসতে পারি—সে পারবে না ? আমি অবশ্য তাকে কোনোদিন সাঁতার দিতে দেখিনি, কিন্তু সে সাঁতরাতে পারে না, এও কি সম্ভব ?

অথবা এমন হতে পারে—হতে পারে আমার অনেক আগেই সে সাঁতরে ওপারে চলে গেছে। আমাকে খুঁজেছে, পায়নি। তখন ভেবেছে, আর সময় নষ্ট করা যায় না, সামনে এখনো মাইল তিনেক পথ, আর দেরি হলে লাল খাঁ গহরা বাইয়ের গান আরম্ভ হয়ে যাবে। মিঞামল্লার, সুরটমল্লার, নটমল্লারে চলবে বিদ্যুতের ঝিকিমিকি, আসবে গভীর গম্ভীর দরবারী কানাড়া, বেহাগের সুর—কা'র বুকভরা অনেকখানি কান্নার মতো ছড়িয়ে পড়বে রাতের আকাশে। গানের পাগল হারাণ আর থাকতে পারেনি, সুরের টানে সে ছুটে চলে গেছে জমিদারবাড়ির দিকে।

কথাটা ভাবতে গিয়ে আমার কান্না পেলো। হতে পারে এমন—হারাণের পক্ষে কাজটা আদৌ অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু আমাকে সে এমনি করে ফেলে যাবে ? গান সে ভালোবাসে—তাই বলে এতখানি হৃদয়হীন হয়ে যাবে ? আমি তার চাইতে বয়েসে অনেক ছোট, জোর করে সে দুর্যোগের রাতে আমাকে ভয়ে-ভরা অচেনা মাঠের পথে নিয়ে এসেছে, পুলের কাঠ ভেঙে আমরা দুজনে নদীতে পড়েছি—এসব কোনো কথা সে একবারও ভাববে না ? তার তো মনে হওয়া উচিত—জংলী নদীর এই সাংঘাতিক দুরন্ত স্রোতে আমি ডুবে যেতে পারি, মরে যেতে পারি। আমাকে এইভাবে মরণের মুখে ছেড়ে দিয়ে সে গানের জলসায় ছুটে যাবে স্বার্থপরের মতো ?

কথাটা কিছুতেই বিশ্বাস করা গেল না। হারাণ আছে—নদীর এপারে ওপারে—যেখানে হোক। হয়তো সেও আমাকে ডাকছে। কিন্তু নদীর এই রাক্ষুসে গর্জনের জন্যে আমি তার ডাক শুনতে পাচ্ছি না, আমার ডাকও তার কানে গিয়ে পেঁছোচ্ছে না।

আমি উঠে দাঁড়ালুম।

'হারাণ—হারাণ—হারাণ—'

তৎক্ষণাৎ মনে হল, কে কথা কয়ে উঠল একটু দূরে।

'কেন, এই যে !'

'হারাণ—' বলে লাফিয়ে উঠেই আমি থেমে গেলুম। না, মনের ভুল, সম্পূর্ণ মনের ভুল—মাথার ওপর দিয়ে বাদুড় উড়ে যাচ্ছে একটা, সে-ই কিচ্‌মিচ্‌ করে ডেকে গেল ওভাবে।

'হারাণ—হারাণ—হারাণ—'

ঠাণ্ডায় আর শীতে স্বর বসে গিয়েছিল, ডাকতে ডাকতে গলা ভেঙে গেল। আমি নিরুপায় ভাবে চেয়ে রইলুম কিছুক্ষণ। এইবার আর একটা ভয় আস্তে আস্তে আমায় ঘিরে ধরতে লাগল। আমার আশেপাশে, ডাইনে বাঁয়ে যতদূর চোখ চলে—আলেয়ার মাঠ। যে মাঠ নিয়ে অস্বাভাবিক গালগল্পের শেষ নেই, যেখানে দিনের বেলা ছাড়া লোক চলে না, যেখানে খুনে ঠ্যাঙাড়ের রাজত্ব ছিল একদিন—

চেষ্টা করেও আমি ঠেকাতে পারলুম না—দাঁতে দাঁতে আমার ঠকঠক করে বেজে

উঠল।

আমি একা—এই মাঠের মধ্যে আমি একা। অন্ধকারে নানা আকারের গাছপালা আর ইতস্তত ঝোপঝাড় নিয়ে আলেয়ার মাঠ—যে মাঠে এই রাতে বাড়ির পথ খংজে পাওয়াও আমার পক্ষে অসম্ভব। কী করব আমি—কী করব!

ওই তো—কী দেখা যায় ওখানে?

একটা সবুজ আলো নয়? হারাণের সেই রঙিন ঢাকনা-দেওয়া ফ্ল্যাশ লাইটের আলো?

আমি খানিকটা ছুটে গিয়েই থমকে দাঁড়ালুম। সবুজ আলো একটা নয়—দুটো। ও দুটো চোখ—শেয়ালের চোখ। আমাকে দৌড়ে আসতে দেখেই শেয়ালটা ছুটে পালালো, চক্ষের পলকে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

তখন আমি দেখতে পেলুম, লণ্ঠন হাতে কে যেন আসছে এদিকে। বাতির শিখাটা হাওয়ায় কাঁপছে।

আশ্বাসে বুক ভরে উঠল। তাহলে মাঠটা যত নির্জন ভেবেছি তা নয়! এত রাতেও এর ভেতরে লোক চলে! আমি ভাঙা বিকৃত গলায় ডাক দিয়ে বললুম, 'কে যাও ওখানে? দাঁড়াও—একটু দাঁড়াও—'

দপ করে নিবে গেল আলোটা।

বাঁদিকে আর একটা লণ্ঠন আসছে। সেই লোকটাই? কিন্তু আলো নিবিয়ে ওখানে অত তাড়াতাড়ি চলে গেল কী করে? আমি আবার সেই অস্বাভাবিক স্বরে চিৎকার করলুম: 'কে যাও আলো নিয়ে? আমি বড় বিপদে পড়েছি, আমাকে—'

আলোটা নাচতে নাচতে খানিক শূন্যে উঠল, যেন কেউ দূর থেকে লণ্ঠন তুলে ধরে আমাকে দেখে নিতে চাইল—তারপরেই পরম কৌতুকে ফু দিয়ে সেটাকে নিবিয়ে দিলে।

আমি খানিকটা ছুটে গিয়েছিলুম সেদিকে—থমকে দাঁড়ালুম। তারপর আমাকে নিয়ে সেই মাঠের ভেতরে শুরু হল কাদের যেন মজার খেলা—কাদের এক অস্বাভাবিক কৌতুক। ডাইনে আলো, বাঁয়ে আলো, সামনে আলো, পেছনে আলো—অনেক দূরে সারি সারি আলো। জ্বালানো আর নেভানো—আমাকে নিয়ে মধ্যরাত্রির মাঠে কাদের যেন লুকোচুরি খেলা।

আমার মাথার ভেতরে সব এলোমেলো হয়ে গেল। আমি একবার ডাইনে—একবার বাঁয়ে ছুটতে লাগলুম। আমার গলা থেকে অস্পষ্ট গোঙানির মতো সেই বিকৃত স্বর বেরুতে লাগল: 'দাঁড়াও—দাঁড়াও—আমাকে নিয়ে যাও—'

কিন্তু আমাকে খংজতে তারা আসেনি। না—আমাকে নয়।

বড় হয়ে আমি ব্ল্যাকউডের গল্প পড়েছি। সেই কে একজন দিনান্তের মায়ায় আর একজন মানুষের ভবিতব্যের মধ্যে পা দিয়েছিল; সেই আর একজনের জীবনে যা ঘটতে যাচ্ছে, তার সব কিছুর স্বাদ পেয়েছিল সে—এমন কি সেই কঠিন অপমৃত্যু নোনা রক্তের স্বাদে তার মুখ ভরে দিয়েছিল। আমি পরে জেনেছিলুম—যে সুখ, যে গানের আলেয়ার পেছনে হারাণ পাগলের মতো ছুটেছে, তারাই সেই রাত্রে অমন করে ডাকতে এসেছিল তাকে। আমি ছুটে গিয়েছিলুম তাদের কাছে, কিন্তু কেউ নেই বলে—সুরের জগতে অনধিকারী বলে তারা আমাকে নিল না, আলো নিবিয়ে দিয়ে চলে গেল।

তখন বৃষ্টি-শেষের মল্লার থেমে আসছিল, তারায় তারায় কাঁপছিল দরবারী কানাড়া. বাতাসে মালকোষের বিস্তার শুরু হয়েছিল। কিন্তু আমি তা বুঝতে পারিনি।

এদিক-ওদিক ছুটতে ছুটতে হঠাৎ একসময় হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলুম আমি। ভিজে মাঠের ওপর মুখথুবড়ে লুটিয়ে চেতনার শেষ কেন্দ্রে পেঁছে আমি চকিতে একটি সত্যকে অনুভব করলুম।

ওরা আলো নয়—আলেয়া।

তারপর আর কিছুই নেই।

॥ পাঁচ ॥

কী আশ্চর্য, ওই তো একটা প্রকাণ্ড বাড়ি দেখা যাচ্ছে! আলোয় ঝলমল করছে সেটা! আমি কি গাধা নাকি? এতক্ষণ ওটাকে দেখতেই পাইনি?

কয়েক পা এগোতেই দু'তিনজন লোক ছুটে এল। মনে হল, তারা দারোয়ান গোছের কিছু হবে। মাথায় পাগড়ী, হাতে লাঠি। পোশাকে জরিটরি কি সব চিকচিক করছে।

আমাকে তারা সেলাম করল। আমি অবাক হয়ে গেলুম।

'কিছু তো বুঝতে পারছি না।'

'বোঝবার কী আছে? আপনার জন্যেই তো অপেক্ষা করছি আমরা?'

'আমার জন্যে?'

'জী হুজুর। আপনি আসেননি বলেই জলসা আরম্ভ হতে পারছে না। এত দেরি হল কেন হুজুর?'

আমার মনে হল, সত্যিই খুব দেরি হয়ে গেছে—এমন হওয়াটা কিছুতেই উচিত ছিল না। কিন্তু কেন হল? কিছুতেই সে-কথাটা আমার মনে পড়ল না।

'আর দাঁড়াবেন না—ভেতরে চলুন।'

একটা শ্বেতপাথরের সিঁড়ি বেয়ে আমি উঠে গেলুম।

সামনেই জলসার ঘর। এসব ঘরের বিবরণ যেন কার মুখে কোথায় শুনেছি, কিন্তু কোনোদিন চোখে দেখিনি। আজ দেখলুম। মস্তবড় ফরাসপাতা ঘর, তাতে ছোট বড় অসংখ্য তাকিয়া ছড়ানো। সেই সব তাকিয়ায় হেলান দিয়ে অনেক লোক বসে গেছেন। খুব জোরালো আলো ছিল ঘরে, গোটাচারেক ঝাড় জ্বলছিল মাথার ওপর, হাওয়া লেগে ঝাড় থেকে ঠুনঠুন করে আওয়াজ হচ্ছিল। অথচ এত আলোতেও আমি মানুষগুলোর মুখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলুম না—সব কেমন ঝাপসা, কেমন ধোঁয়া ধোঁয়া মনে হচ্ছিল। কী আশ্চর্য কারণে জানি না, ঘরের সমস্ত মানুষগুলোর মুখই যেন আলোর মধ্যে মিশে গিয়েছিল।

অথচ আমি তাদের পরিষ্কার দেখছি। দেখছি কারো কাঁধে সিল্কের চাদর, কারো গায়ে গরদের জামা। অনেকেরই আঙুলে মোটা মোটা আংটি, তার পাথর থেকে রঙ-বেরঙের আলো ঠিকরে পড়ছে—হীরে বলেই মনে হল। প্রত্যেকের গলাতেই এক-এক ছড়া করে জুঁইফুলের মালা—তার গন্ধে সারা ঘর ভরে গেছে।

একটু দাঁড়িয়ে আছি, কে যেন আমার সামনে এল। এর মুখখানা দেখতে পাচ্ছি—এ চেনা-চেনা। টকটকে ফর্সা, গোল, কয়েকটা বসন্তের দাগ, আধবোজা চোখ দুটো করমচার মত টকটকে লাল। আমার গলাতেও সে একছড়া মালা পরিয়ে দিলে, পাশ থেকে কে যেন গায়ে ছড়িয়ে দিলে খানিকটা সুগন্ধি আতর। তারপর সেই ফর্সা গোল মুখের মানুষটা আমাকে বললে, 'আসুন আসুন, আপনার জন্যেই আসর বসতে পারছে না।'

তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে বসা অন্য সবাইয়ের ভেতর দিয়ে সে আমাকে একেবারে সামনে নিয়ে গেল। দেখলুম একটা বেদীর মতো তৈরী করা আছে সেখানে—তার ওপরে নানারকম কারুকাজ করা ভেলভেটের গদীর মতো পাতা। তাতে তানপুরা রয়েছে, বাঁয়াতবলা রয়েছে, একটা ছোট হাতুড়ি আছে, একখানা বড় রুপোর থালায় মিছরির কুচি, ছাড়ানো বেদানার কোয়া—এই সব রয়েছে।

আমি বেদীটার মুখোমুখি বসতেই কে যেন বললে, 'এবার শুরু হোক।'

দেখলুম গায়ে মখমলের পাঞ্জাবি—তার গলার কাছে কী সব জরির কাজ করা, পাজামা পরা, সাদা দাড়িওলা, মাথায় কালো টুপি কে একজন এসে বাঁয়াতবলার পাশে এসে বসল। তার সঙ্গে সঙ্গে এল আর একজন—তারও গায়ে সাদা পাঞ্জাবি, পরনে সাদা ধুতি। এই-ই তা হলে ওস্তাদ!

আমি এর আগে এসব কখনো দেখিনি। গান শুনেছি—কিন্তু এমন সমারোহ, এত সাজানো, এত আলো, এত ফুল, এত গন্ধ—এর আগে কোথাও কোনোদিন ছিল বলে মনে পড়ছে না। অথচ আমার এতটুকুও বিস্ময় বোধ হল না। আমি দেখিনি, তবু যে কেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কথা বলেছিল আমাকে। বলেছিল এই সব ঝাড়-লণ্ঠনের কথা, আতরের কথা, ফুলের মালার কথা, এইরকম পোশাক পরা তবলচির কথা, এইরকম আসরের কথা। সব আমার জানা ছিল, সব আমার আগে থেকে চেনা হয়ে ছিল; কিন্তু কে বলেছিল—কত দিন আগে, কোথায় বলেছিল—সে-সমস্ত কিছুই আমি মনে করতে পারলুম না।

তানপুরায় আওয়াজ উঠছিল—টুং-টাং করে শব্দ বাজছিল; ঠুক ঠুক করে হাতুড়ির ঘা পড়ছিল তবলায়। এইবারে গান আরম্ভ হবে। আমি যেন কার কথা এতক্ষণ ধরে ভাবতে চাইছিলুম—এইবার জোর করে চোখটা ফিরিয়ে নিলুম আসরের দিকে।

ওস্তাদ তান ধরল। খুব চেনা আমার গলাটা—কিন্তু কার গলা? তবলচিকে দেখছি, বিলিতী গল্পের সান্টা ক্লজের মতো তার সাদা প্রকাণ্ড দাড়িটাও দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু ওস্তাদের মুখখানা অস্পষ্ট আবছা—একটা রেখা পর্যন্ত তার নেই। গলার পরে তার সমস্ত মাথাটাই হারিয়ে গেছে ঘরভরা সেই আলোর বন্যার ভেতরে।

ওস্তাদ গান গাইছে। কী একটা হিন্দি গানের কলি। মানে বুঝতে পারছি না—কিন্তু সুরটা আমি চিনি। হাঁ, চিনেছি—মিঞা কি মল্লার!

সঙ্গে সঙ্গে আমি চেঁচিয়ে উঠলুম: 'হারাণ!'

সেই বেসুরো বিকট চিৎকারে সঙ্গে সঙ্গে যেন বিপর্যয় ঘটে গেল একটা। থেমে গেল ওস্তাদ—তানপুরাটার বোধ হয় তার ছিঁড়ে গেল—ঘরসুদ্ধ লোক একসঙ্গে হা-হা-হা করে আর্তনাদ তুলল।

এতক্ষণে ওস্তাদকে আমি চিনতে পারলুম। আলোর আবরণটা যেন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। হারাণ! সেই রুক্ষ চুল, সেই শীর্ণ মুখের চেহারা—দু চোখে তার অদ্ভুত ভয়, অদ্ভুত আতঙ্ক!

পাগলের মতো আমি ডাকতে লাগলুম: 'হারাণ—হারাণ—'

আবার ঘরভরে হা-হা করে আর্তনাদ উঠল। দপ্ করে নিবে গেল আলো, ফুটে উঠল অথই অন্ধকার—বাড়িটা যেন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে আমাকে হঠাৎ কোন্ শূন্যের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। হা-হা-হা করে সেই আর্তনাদের আওয়াজটা জলের গর্জন হয়ে আমার দুই কান বধির করে তুলল, একটা অন্ধ হিংস্র শক্তি হিমাক্ত শীতল হাতে আমাকে জাপটে ধরে কোথায় টেনে নিয়ে চলল, আমি ডুবতে ডুবতে ডাকতে লাগলুম: 'হারাণ—হারাণ—'

তখন ঘরের সব মানুষগুলো—সব না-দেখা মুখগুলো এক-একটা আলো হয়ে আমার ডাইনে বাঁয়ে পুবে পশ্চিমে একবার জ্বলতে লাগল, একবার নিবতে লাগল। আমি হাত বাড়িয়ে তাদের ধরতে চাইলুম, তারা ধরা দিল না। শুধু আমার কানভরে বাজতে লাগল জলের অট্টহাসি, আলেয়ার ধাঁধায় চোখ দুটো যেন অন্ধ হয়ে গেল—আমি মৃত্যুর হিম-অন্ধকারে তলিয়ে যেতে লাগলুম।

মাঠ থেকে কারা আমাকে কুড়িয়ে এনেছিল জানি না। এক মাস পড়েছিলুম ব্রেন-ফিভারে। জল আর জলসা, আলো আর আলেয়ার দুঃস্বপ্ন ছিল আমার রোগশয্যার দুঃসহতম যন্ত্রণা।

একটু ভালো হয়ে সমস্ত অবস্থাটা বোঝবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম: 'হারাণ—হারাণ কোথায়?'

বিছানার পাশে মা ছিলেন, বাবা ছিলেন, আমার ছোট বোন ছিল। প্রথমে কোনো জবাব আসেনি কারো কাছ থেকে। তারপরে বাবা বলেছিলেন, 'হারাণ ঠিক আছে, সে পরে হবে।'

পরে আমি জেনেছিলুম, হারাণের মৃতদেহ জংলী নদীর স্রোত বেয়ে প্রায় ন' মাইল ভেসে আটকে গিয়েছিল একটা বটগাছের শিকড়ে। সে সাঁতার জানত কিনা সে প্রশ্নের দরকার ছিল না, পুল ভেঙে পড়বার সময় ভাঙা কাঠের খানিকটা ধারালো অংশ ছোরার মতো বিঁধে গিয়েছিল তার বাঁদিকের পাঁজরে।

ত্রিশ বছর পরে, মধ্য কলকাতার এক ওস্তাদি গানের জলসা থেকে মাঝরাতে বেরিয়ে এসে আমি দেখেছিলুম, ফুটপাথে আরো অনেকের সঙ্গে—একটা ল্যাম্পপোস্টের তলায় কে যেন বসে। লম্বা রোগা চেহারা, মাথায় রুক্ষ ঝাঁকড়া চুল—মুহূর্তের জন্যে থমকে গিয়ে আমি ভেবেছিলুম: হারাণ?

না, হারাণ নয়। তার আসর বসেছে অন্য জায়গায়। সেই রাত্রে—সেই আলেয়ার মাঠে, কোন্ এক জলসায় হাজিরা দেবার জন্যে যারা লণ্ঠন হাতে খুঁজতে বেরিয়েছিল, তারা বহুদিন হল পেয়ে গেছে হারাণকে। আমি সেখানে অনধিকার প্রবেশ করেছিলুম, তাই আমাকে তারা সঙ্গে নিল না।

হারাণকে তারা পেয়েছে—পেয়েছে ত্রিশ বৎসর আগে।

টুটুল

॥ এক ॥

টুটুল কে'দে ফেলল প্রথমে। বললে, আমি কী করে এখানে একা থাকব ?

জল মা'র চোখেও এসেছিল, মাথাটা ঘ্নুরিয়ে নিলেন তিনি।

ও কথা বলতে নেই খোকন। তুমি তো বড় হয়েছ এখন।

বাপী থাকবে না, তুমি থাকবে না—টুটুল হাতের মন্ঠোয় চোখ মন্ছতে লাগল ঃ আমি রাত্তিরে কার কাছে ঘন্মন্ব ?

ছি ছি, পন্রন্ষমান্ষকে বলতে হয় এসব ? মা আঙন্ল বাড়িয়ে দেখালেন লনের আর সব ছোট ছোট ছেলেদের দিকে। তারা হাসছিল, দৌড়ে বেড়াচ্ছিল। মা বলে চললেন, দ্যাখো তো ওদের। ওরাও তো মা-বাপী ভাই-বোনদের ফেলে এসেছে। কই, কেউ তো তোমার মতো কাঁদছে না। দন্'দিন পরে তুমিও ওদের সঙ্গে মিলে যাবে, খন্ব ভালো লাগবে তোমার।

আমায় কবে কলকাতায় নিয়ে যাবে ?

কেন ছন্টি হলেই। আমি আসব, বাপী আসবে তোমার—সঙ্গে করে নিয়ে যাব তোমাকে। এখন আর দন্ষ্টুমি করো না টুটুল, তোমায় এখন ভালো করে লেখাপড়া শিখতে হবে।

বা রে, আমি তো কলকাতার স্কুলেই পড়ছিলন্ম।

এ আরো ভালো স্কুল। দেখেছ তো, কত সন্দর জায়গা। দন্রে পাহাড়, গাছপালা, চারদিক ফাঁকা—কী চমৎকার! কলকাতায় তো খালি ধোঁয়া আর গণ্ডগোল—তার চেয়ে এ কত চমৎকার! চারদিকে গাছপালা কিংবা দন্রের পাহাড় কিংবা এত নির্জনতা শিক্ষিতা মায়ের মনে যতই কাব্য জানাক, খোকনের কিছন্ ভাল লাগছিল না। কান্না ফুলে ফুলে উঠছিল তার বন্কের ভেতরে।

মা তখন টুটুলকে কাছে টেনে নিলেন। অনেকক্ষণ হাত বন্লিয়ে দিলেন তার মাথায়। বললেন, ভাবনা কী, আমি তো তোমার মণি মাসিমার গ্রীনভিলায় আরো দিন পনেরো আছিই। মাঝে মাঝে এসে দেখে যাব। তুমি লক্ষ্মী হয়ে থেকো, দেখো—আমার ভালো ছেলে টুটুলের যেন কোন বদনাম না হয়।

হাসিমন্খে এগিয়ে এলেন সন্পারিনটেনডেণ্ট। মহিলাটি আইরীশ। মধ্যবয়স, স্নিগ্ধ নীলাভ চোখ, প্রসন্ন ভঙ্গি। টুটুলের হাত ধরে বললেন, এ ভেরি—ভেরি গন্ড্ বয়! নাউ কাম উইথ্ মী—লেট আস গো টন্ দ্য সন্ইং!

মা বললেন, যাও—দোলনায় দোলবার জন্যে ডাকছেন তোমায়।

আর দোলনা! সব প্রলোভনই এখন টুটুলের শন্ন্য মনে হচ্ছিল।

মহিলা বললেন, বী নাইস চাইল্ড—কাম উইথ্ মী!

কান্না ছাপিয়ে এবার দারন্ণ অভিমানে টুটুলের বন্ক ভরে উঠল। বাপী তাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন, মা তাকে এখানে রেখে যেতে চাইছেন। তাকে কেউ ভালোবাসে না—

তাকে কেউ চায় না। ঠিক আছে, সে চিরকাল এখানে থাকবে। চিরদিনই থাকবে, আর কখনো কলকাতায় যাবে না। না, মা-বাপী নিতে এলেও যাবে না।

টুটুল ছুটে চলে গেল সেখান থেকে।

মা'র চোখের জল এবার আর বাঁধন মানল না। টলটল করে দু'ফোঁটা গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে।

সুপারিনটেনডেণ্ট সহানুভূতির স্বরে বললেন, প্রথম প্রথম ওরকম হয়। কিছু ভেবো না—দু'দিন পরেই এদের সঙ্গে মিলে যাবে। তখন বাড়ি গিয়েও আর ওর ভাল লাগবে না।

রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে মা ইংরিজিতে জবাব দিলেন, জানি। সেই-জন্যেই তো তোমাদের এখানে রেখে যাচ্ছি।

মা বেরিয়ে এলেন স্কুল-কম্পাউণ্ড পেরিয়ে। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলেন একবার। টুটুলকে চোখে পড়ল না। অভিমানেই মুখ লুকিয়েছে কোথাও।

খুব নিষ্ঠুরের কাজ হল।

উপায় নেই—ছেলেকে মানুষ করতে গেলে এটুকু দুঃখ সইতেই হয়। কলকাতার পরিবেশটাই বিষাক্ত, সেখানে ছেলেটা ঠিক প্রপারলি ডেভেলপ করতে পারত না। কলকাতা থেকে দুশো মাইল দূরে—এই স্বাস্থ্যকর জায়গাটিতে—এই মিসনারি বোর্ডিং স্কুলটি এদিক থেকে আদর্শ। টুটুলের বাবার সঙ্গে অনেক পরামর্শ করেই শেষে ওকে এখানে ভর্তি করা হল।

ছেলেকে আগে গড়ে তোলা দরকার। সেণ্টিমেণ্টের খাতিরে তার ভবিষ্যৎ নষ্ট করা চলে না। মা রিকশা করে তাঁর বান্ধবী মণিকার গ্রীনভিলায় চলে গেলেন। কিন্তু সারাটা রাত তাঁর চোখের জলের আর বিরাম থাকল না।

॥ দুই ॥

চারদিন পর পর ঠিকই আসছিলেন। আর প্রথমটা খুব অসম্ভব বলে মনে হলেও তৃতীয় দিনে মা অনুভব করলেন—টুটুল যেন এর মধ্যেই মানিয়ে নিয়েছে একটু। তার নতুন বন্ধুদের কথা বলতে লাগল, প্রেয়ারের খবর দিলে, কালকে যে নতুন বরফের পুডিংটা খেতে দিয়েছিল, সে খবর জানাতেও ভুলল না।

চতুর্থ দিন গিয়ে যা দেখলেন, খোকা দারুণ উৎসাহে ফুটবল খেলছে। আজ আর দেখবামাত্র ছুটে এল না—দূর থেকে হাত তুলে বললে, একটু দাঁড়াও মা, আমি আসছি।

মা'র বুক থেকে একটা ভার নেবে গেল ; একটা নিঃশ্বাসও পড়ল সেই সঙ্গে। এই হয়। এমনি করেই ওরা কত সহজে মা-বাবাকে ভুলে যেতে পারে!

টুটুল এসে মাকে জড়িয়ে ধরে বললে, জানো মা, আজ আমি ক্লাসের বেস্ট বয় ছিলুম।

মা বললেন, এই তো চাই টুটুল, এইজন্যেই তোমাকে এখানে ভর্তি করে দিয়েছি। এবার বলো দেখি—এখানে তোমার ভালো লাগছে?

চারদিন আগেকার কান্না ভুলে গিয়ে অকৃতজ্ঞ টুটুল বললে, হাঁ মা, খুব ভাল লাগছে। যাওয়ার আগে মা আজ সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হলেন। কিন্তু দীর্ঘশ্বাস পড়ল তবুও একটা। কত সহজেই ওরা সব ভুলে যেতে পারে!

ভুলে টুটুল যেতে পারত। মা না থাকা, বাপীকে দেখতে না পাওয়া একটু একটু করে সব সয়ে যেত তার। তারপর এমন দিন আসত—সেদিন হয়তো একটিবারও তার মা বাবা কাউকে মনে পড়ত না; তারও পরে যেদিন স্কুল বন্ধ হত ভ্যাকেশনের জন্যে—মা কিংবা বাবা যে হোক কেউ তাকে নিতে আসতেন—সেদিন বাড়ি ফিরে যেতেই তার খারাপ লাগত, দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবত: এখন এক মাস সে একটা নিঃসঙ্গ নিরানন্দ জগতে ফিরে যাবে।

তবু একটু অন্যরকম হয়ে গেল ব্যাপারটা।

পঞ্চম দিনে মা এলেন না। তার পরের দিন না। তার পরের দিনও না।

সিস্টার, মাম্মী আসেনি আজকে?

না তো।

মাম্মী তো কালও আসেনি?

তাতে কী হয়েছে! তিনি তো তোমার ভার আমাদের ওপরেই দিয়েছেন।

সেদিন টুটুলের মনে হল, সব ভালো চলছে না। খেলায় আর উৎসাহ এল না—ছুটোছুটি করতে ইচ্ছে হল না। ওরা সব বল নিয়ে পেটাপেটি করতে লাগল, টুটুল শুধু চুপ করে বসে রইল একটা শিশুগাছের তলায়। সামনেই দুটো নারকেল গাছে কাঠবিড়ালেরা ওঠানামা করছিল, একবারের জন্যেও তাদের পেছনে তাড়া করলে না টুটুল। ঘাসের ভেতরে পা ছড়িয়ে বসে টুটুলের কান্না আসতে লাগল।

সে রাতটাও কাটল।

না, পরদিনও সকালে মা এল না।

দুপুরের খাবার টেবিলে, সেই যে নতুন ধরনের পুডিংটা টুটুলের ভাল লেগেছিল সেটাও ছিল; কিন্তু আজ আর তাতেও রুচি এল না। এখন টুটুলের ভয় করতে লাগল, এই কদিনের চেনা বন্ধুরা—এখানকার জীবনের এই যে নতুন স্বাদ—সব বিরস হয়ে গেল তার কাছে। হাত গুটিয়ে বসে বসে টুটুলের মনে হতে লাগল—এত বড় পৃথিবীটা তার ফাঁকা হয়ে গেছে, কেউ নেই, কোথাও নেই।

কাঁধে হাত পড়ল সিস্টারের।

খাচ্ছ না?

গলার স্বরে একরাশ স্নেহ। আরো বেশি করে মনে পড়িয়ে দিলে মাকে। টুপ করে একফোঁটা জল পড়ল টেবিলের ওপর।

অত ভাবছ কেন? সিস্টার বললেন, আমি তোমার মাম্মীকে বরং কাল খবর পাঠিয়ে দেব, তিনি এসে দেখে যাবেন তোমাকে। এখন লক্ষ্মী হয়ে খেয়ে নাও, আমি একটা খুব সুন্দর ছবির বই দেব তোমাকে।

কিন্তু ছবির বইতে কিছু হল না, ফাদার ক্রিসমাসের দাড়ি হাওয়ায় উড়ে যাওয়ার হাসির গল্পটায় টুটুলের হাসি পেল না, ব্যাম্বি হরিণ কি করে প্রথম চলতে শিখে বনের

প্রজাপতি আর পাখিদের সঙ্গে ভাব জমালো—সে গল্পেও খুশি হল না টুটুল—কোথাও সুখ নেই—কোথাও কিছু নেই। টুটুল বলল, কাল নয়, আজকেই যদি মার সঙ্গে তার দেখা না হয়, তা হলে সে ঘরে যাবে—ঠিক ঘরে যাবে।

তা ছাড়া গ্রীনভিলা সে তো চেনে। তার স্কুল থেকে বেরিয়ে—সামনের রাস্তাটা ধরে খানিক এগিয়ে কটা দোকান, তারপর মাঠের ভিতর দিয়ে আর একটা ছোট রাস্তা—সেই রাস্তার শেষেই তো গ্রীনভিলা। সেখানে মনি মাসিমা থাকেন, মেসোমশাই তাঁর লনে একটা বেতের চেয়ারে বসে চুরুট খান। ও'রা সেখানে দু'মাসের জন্য চেঞ্জে এসেছেন।

কাউকে চেনাতে হবে না। এক দৌড়ে টুটুল পৌঁছে যাবে গ্রীনভিলায়।

বিকেলের রোদ নামবার আগেই টুটুল চলে এল গেটের কাছে। তাকিয়ে দেখল এদিকে ওদিকে। কেউ নেই। দারোয়ান কোথাও সরে গেছে কোন কাজে।

ব্যাস দৌড়—সোজা দৌড় একেবারে।

॥ তিন ॥

এই তো গ্রীনভিলা।

লনের গাছের ছায়ায় আজ চেয়ারগুলো তো পাতা নেই। টুটুল জানে, এই সময় ও'রা বসে বসে চা খান এখানে। কই, কাউকেই দেখা যাচ্ছে না তো!

আর সব দরজা জানালা বন্ধই বা কেন?

দৌড়ে এসে হাঁফ ধরে গিয়েছিল টুটুলের। কিছুক্ষণ লনের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

মা কোথায়? সাত দিন নয়—মনে হচ্ছে আজ সাত মাস সে মাকে দেখেনি।

একটা গাছছাঁটা কাঁচি হাতে বুড়ো মালিটা আসছিল। টুটুলকে দেখে সে হাসল।

কী খোকাবাবু, ভালো লাগছে ইস্কুল?

টুটুল সে কথার জবাব দিল না।

মা কোথায়?

মালী হাসল, আভি তো কই নেহি আছে।

নেই? কোথায় গেছে?

মাইজী, নয়া মাইজী, বাবু—পরশু সব কোই তো চলে গেল পলাশদীঘা।

পলাশদীঘা! টুটুলের হৃৎপিণ্ডটা যেন আছাড় খেয়ে পড়ল: কবে আসবে?

তিন-চারদিন তো দেরি হোবে আরো। বেড়াইতে গেলো।

তিন-চারদিন দেরি হবে! তাকে ফেলে মা বেড়াতে চলে গেছে! টুটুলের মনে হল, সমস্ত পৃথিবীটাই বিশ্বাসঘাতক, কেউ নেই তার—কেউ তাকে ভালবাসে না। সে ফিরে যাবে তার স্কুলেই। আসুক না মা, সে তার সঙ্গে আর দেখা করবে না, কথাও বলবে না।

কিন্তু স্কুলে ফিরে যাবে?

অসম্ভব। বুকের ভেতরটা যেন ফুলে ফুলে উঠতে লাগল টুটুলের। রাগ

অভিমান কোথায় যে ভেসে গেল সে টেরও পেল না। তিন-চারদিন নয়, আজ—আজই তাকে দেখা করতে হবে মার সঙ্গে।

পলাশদীঘা—মালী, সে কত দূরে ?

সে তো হোবে গঙ্গানগরের কাছে।

মালী, কোন্ রাস্তা দিয়ে গঙ্গানগর যায় ?

মালী কাঁচি দিয়ে একটা গাছ ছাঁটতে আরম্ভ করেছিল। মুখ না ফিরিয়েই জবাব দিলে, বাজার পার হয়ে উধারসে যায়। তুমি ইস্কুলে চলে যাও খোকাবাবু। তিন চার রোজ বাদমে সব চলে আসবে।

টুটুল আর দাঁড়ালো না। না—তিন-চারদিন নয়। কতদিন সে মাকে দেখেনি, আজ—এখুনি সে চলে যাবে মার কাছে।

একটু এগিয়েই একজন ভুজাওলার দোকান। পাকাচুল বুড়ো মানুষটা কুঁজো হয়ে খোলার ভেতর বালি দিয়ে বড় মটর ভাজছে—দু'একটা দানা ফুটে উঠে ছটকে পড়ছে এদিকে ওদিকে। টুটুল দাঁড়িয়ে পড়ল।

ছেলেমানুষের ছায়া টের পেয়ে মাথা তুলল ভুজাওলা।

কী নিবে খোকাবাবু ? বাদাম ?

না। আমি বাজারের দিকে যাব। বাজারটা কোন্ দিকে ?

এই তো সিধা খোকাবাবু। এক্ হি তো রাস্তা।

ওইখান দিয়েই তো গঙ্গানগর যায় ?

ভুজাওলা এবার ভাল করে চেয়ে দেখল টুটুলের দিকে।

তুমি গঙ্গানগর যাবে খোকাবাবু ?

হুঁ।

তো সে তো রেলগাড়িতে যেতে হয়। তুমি টিশনে যাও।

সে কি অনেক দূর ভুজাওলা ?

নেহি—বহুৎ দূর নেহি আছে। দেশোয়ালী আদমি তো হেঁটেই আসে অনেক সময়। কিন্তু তুমি তো বাচ্চা আছো খোকাবাবু—তুমি যেতে পারবে না। ভুজাওলা আবার তার মটরভাজায় মন দিলে।

কিছুক্ষণ অনিশ্চিত ভাবে দাঁড়িয়ে রইল টুটুল। ট্রেনে যাবে ? কিন্তু তাহলে তো টিকিট লাগে—সঙ্গে তো তার পয়সা নেই। পয়সা আনবার জন্যে যদি সে ফিরে যায়, আর তাকে আসতে দেবে না। সে যে পালিয়ে এসেছে—এ খবর এতক্ষণ হয়তো পৌঁছে গেছে সিস্টারের কাছে !

টুটুল পা চালালো।

বাজার—লোকজন। কিন্তু এখানে এসে আর এক অস্বস্তি ধরল টুটুলের।

তিনটে রাস্তা তিনদিকে। কোন্ দিকে সে যায় ?

কাকে জিজ্ঞেস করবে ? তার স্কুল থেকে পালিয়ে আসবার কথা কি জেনে গেছে এরাও ? প্রত্যেকটা মানুষের চোখের দৃষ্টিই যেন তার ওপর। ওই যে ছাতা মাথায় ট্র্যাফিক পুলিসটা একটা পিপের ওপর দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে আছে—ও অমন করে তাকাচ্ছে কেন তার দিকে ? টুটুল সরে এল।

আরে রাম চলে দণ্ডকমে—পিছে লছমন ভাই—

একজন ঝাঁকামুটে। মস্ত একটা দোকানের সামনে ঝাঁকার ওপর বসে একমনে খৈনী টিপছে।

গঙ্গানগরের রাস্তা কোন্‌টা?

কেয়া?

ভয়ে গলা শুকিয়ে এল টুটুলের।

আমি বলছিলুম, গঙ্গানগরে যাব।

যাইয়ে না—রেলগাড়ি মে।

হেঁটে যাওয়ার রাস্তা কোন্ দিকে? মানে গাঁয়ের লোক আসে যায়?

কেয়া? হাতের খৈনী টেপা বন্ধ হয়ে গেল, বেরিয়ে এল ভাঙা বাংলা। তুমি উধার পাঁওদলমে যাবে খোকাবাবু?

না না, জীবনে বোধ হয় এই প্রথম মিথ্যে বেরিয়ে এল টুটুলের মুখ দিয়ে, আমি হেঁটে যাব কেন? একটু দরকার আছে, তাই জিজ্ঞেস করছিলুম।

এহি রাস্তা—সিধা রাস্তা।

আচ্ছা—

টুটুল আবার চারপাশে তাকাল। যে ট্র্যাফিক পুলিসটা ওখানে হাত তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার দৃষ্টিটা যেন তার দিকেই। খবর পেয়েছে নাকি? ওখানে ওই যে দুজন ফিসফিস করে কথা বলছে—চোখ তুলে এদিকে চেয়ে দেখছে মাঝে মাঝে, তারা কি তার কথাই বলছে?

না, আর এখানে দাঁড়ানো যায় না।

টুটুল পা চালাল। দেখতে দেখতে পার হয়ে গেল বাজার, দোকানপাট, কয়েকটা বড় বড় নতুন বাড়ি। ছোট শহরটার সীমানা ফুরিয়ে গেল একটু পরেই। পশ্চিমে নেমে আসা সূর্যের রঙ এতক্ষণে লাল হল একটুখানি।

॥ চার ॥

দু'পাশে মাঠ। দূধারে গ্রাম। দূরে পাহাড়। এক-একটা ঝিরঝিরে তিরতিরে নদী বালির ভেতরে।

বাতাসটা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। হাওয়া উঠেছে চারদিকে। চলতে চলতে এখন মন্দ লাগছে না টুটুলের। দু-একটা গরুর গাড়ি যাচ্ছে মাঝে মাঝে, তরি-তরকারি তাতে। ওদিকে রাখাল ছেলেরা মেষের পাল নিয়ে ফিরছে। দূর থেকে বাঁশির সুর উঠেছে। জলার ধারে বকেরা বসেছে মাছের আশায়। টুটুল চলতে লাগল।

রাস্তার ধারে বেলাশেষের আলোয় মাইল-পোস্ট চোখে পড়ে। সরাই বাজার—দুই কিলোমিটার। হিন্দী হরফ পড়তে জানে টুটুল। সে এগিয়ে চলল। সরাই বাজারে গিয়ে আবার গঙ্গানগরের খোঁজ পাওয়া যাবে।

ধীরে ধীরে দিন নিবে আসতে লাগল।

বড় বড় ছায়া পড়তে লাগল পথের গাছগুলোর নীচে। পাখীদের কিচির কিচির

উঠতে লাগল। চারদিক ভরে যেতে লাগল শুকনো হাওয়া আর ঘাসের গন্ধে। টুটুল এগোতে লাগল। চারদিক নির্জন—রাত আসছে, একটু ভয়ের শিরশিরানি ফুটে উঠল শরীরে।

একবারের জন্য দাঁড়াল টুটুল।

স্কুলে ফিরে যাব? না—তাও কি হয়? দশ বছর বয়েস হতে চলল তার। এখন সে বড় হয়েছে। আজ মা'র কাছে সে যাবেই, যখন হোক—যত রাতেই হোক।

মাঠের ওপারের আকাশটা খুব রাঙা হয়ে উঠল একবার। একঝাঁক পাখী সে রাঙা রঙ ডানায় মেখে ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল কোন্ দিকে। তারপর ঝুপ করে—ওধারের কতগুলো তালগাছের আড়াল দিয়ে কখন নীচেকার একটুখানি লাল সোনালি মেঘের ভেতরে টুপ করে ডুব দিলে সূর্যটা।

রাত হল তাহলে?

ছাইরঙের আকাশে এখন তারা ফুটছে একটা। সাঁঝের তারা।

ভয় জমে আসছিল, কেটে গেল। সামনেই কটা দোকান দেখা যায়—একটা গ্রাম রয়েছে পথের দুধারে। সরাই বাজার।

প্রথমেই চোখে পড়ল একটা মিষ্টির দোকান। একজন পাম্প করে করে একটা পেট্রোল্যাম্প জ্বালাচ্ছে সেখানে। ভাঙামতন একটা বেঞ্চিতে বসে দু'জন লোক কী যেন খাচ্ছে শালপাতায় করে—একটা কুকুর ল্যাজ নাড়ছে আশায় আশায়। মস্ত একটা কড়াইতে ঘুড়িভাজা লাল হয়ে উঠছে, একজন ঝাঁঝরি হাতায় তুলে তুলে নামিয়ে রাখছে।

ঘুড়িভাজার গন্ধে টুটুল টের পেলো তার খিদে পেয়েছে। স্কুল থেকে বেরুবার সময় সে টিফিন খেয়ে বেরোয়নি। তারপর এতখানি হেঁটে আসা। হাঁটু দুটো ব্যথাও করছিল একটু একটু। অভ্যাসে পকেটে হাত ঢোকাল টুটুল। ছোট্ট একটা সিকি ঠেকল হাতে।

দু'আনার ঘুড়িভাজা দাও।

বাড়িতে এগুলো খাওয়া বারণ। কলকাতার স্কুলে পড়বার সময় বন্ধুদের সঙ্গে রাস্তা থেকে কিনে খেয়েছিল একদিন। ঝাল, নোন্তা, মুড়মুড়ে—বেশ লেগেছিল খেতে। কিন্তু শুনে মা খুব বকুনি দিয়েছিলেন তাকে।

খবর্দার, কখনও কিনে খাবে না রাস্তায়—অসুখ করবে।

আজ বারণ করবার কেউ নেই। আর টুটুল ছোট হলেও বুঝতে পারছিল—পকেটের সব ক'টা পয়সা তার খরচ করা উচিত নয়, এখনো অনেক পথ সামনে। আর অল্প পয়সায় ঘুড়িভাজা ছাড়া আর কিছুই খাওয়া চলবে না।

দোকানে যারা খাচ্ছিল তাদের একজন টুটুলের দিকে আশ্চর্য হয়ে চাইল। মুখে তার মোটা গোঁফ, গায়ে কালো কোট একটা।

কোত্থেকে আসছ খোকা?

টুটুল চমকালো। লোকটা বাঙালী। সে স্কুল থেকে পালিয়েছে বুঝতে পেরেছে নাকি সেটা?

এই—এদিক থেকে।

এখানে কোথায় যাবে?

ওই ওদিকে।

টুটুল জোরে জোরে পা চালালো। ধুকধুক করছে বুকের মধ্যে। না, লোকটা তার পেছনে আসছে না। তাহলে বসা যাক এই অন্ধকার গাছটার তলায়।

সেখানে বসে একটু একটু করে ঝুড়িভাজা কটা খেল সে। কিন্তু বেশি দেরি করা চলবে না কোথাও। আজ রাত্রে যেমন করে হোক গঙ্গানগরে পেঁছুতেই হবে তাকে।

উঠে পড়তে হল। ঝুড়িভাজা খেয়ে শুকিয়ে গেছে গলাটা। একটু জল দরকার।

ঘটর ঘটর করে আওয়াজ পাওয়া গেল। ওপাশে একটা টিউবওয়েল। রাস্তার একটা বাড়ি থেকে তার ওপর একফালি আলো পড়েছে এসে। তারই বয়সী একটি ছেলে বালতিতে জল ভরছে।

একটু জল দেবে—খাব।

বালতি সরিয়ে ছেলেটা বললে, খাও।

আঁজলা আঁজলা করে জল খেলো টুটুল। শরীরটা একটু জুড়োল এতক্ষণে।

গঙ্গানগর কত দূরে জানো?

ঢের দূর।

কতক্ষণ লাগবে?

হাম নেহি জানতা।

আবার সে ঘটর ঘটর করে টিউবওয়েলের হাতলটা পাম্প করতে লাগল।

গঙ্গানগর তো এই রাস্তা!

হ্যাঁ, এহি তো।

টুটুল চলতে লাগল। দূর থেকে যেন একবার ভেসে এল: অকেলা মৎ যা-না—কিন্তু সে তা শুনতে পেলো না।

কতক্ষণ ধরে হাঁটছে? জানে না। কতখানি পথ পার হয়ে এল? তাও জানে না। সরাই বাজার শেষ হয়ে গেল। এখন আর পীচ নেই, পায়ের তলায় ধুলোভরা একটা লাল মাটির রাস্তা টের পাচ্ছিল টুটুল।

রাস্তায় দুটো-একটা গোরুরগাড়ি যাচ্ছিল, লোক চলছিল মাঝে মাঝে। ক্রমশ তা কমে আসতে লাগল। আকাশে ছেঁড়ামতন চাঁদের টুকরো উঠেছে একটা, মাঝে মাঝে পথ তার আলোয় বেশ দেখা যাচ্ছে, আবার কখনো অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে গাছের ছায়ায়। মাঠের এধারে ওধারে নিশ্চয় গ্রাম আছে, কিন্তু দুধারে জায়গায় জায়গায় জমাট রাত্রির মতো বন জঙ্গল ঝোপ ছাড়া আর দেখা যাচ্ছে না কিছু। এই রাত্রির পৃথিবীর পথ দিয়ে টুটুল যেন একা চলেছে।

ভয় করছে—আবার অদ্ভুত ভালো লাগছে তার। জীবনে সে কখনও এমন করে একলা পথ হাঁটেনি, কোনদিন এত রাত পর্যন্ত বাড়ির বাইরেও থাকেনি সে। এই চলার ভেতরে একটা সুখ আছে, অহঙ্কার আছে। টুটুল আর ছেলেমানুষ নেই, সে বড় হয়েছে, সে অন্ধকার পথ দিয়ে অনেক দূর—অনেক দূর পর্যন্ত এখন চলে যেতে পারে।

মা কী করবে তাকে দেখলে? খুশি হবে? রাগ করবে?

টুটুল ভাবতে চেষ্টা করল, কিন্তু কোন্ উত্তর পাওয়া গেল না।

চ্যাঁ-চ্যাঁ-চ্যাঁ—

একটা বীভৎস বিশ্রী চিৎকার মাথার ওপরে। আঁতকে উঠল টুটুল—ভয়ে ছুটে গেল খানিকটা। তারপরেই মনে হল : ধুৎ, প্যাঁচা! ও তো মামাবাড়িতেই আমি দেখেছি।

আবার একটা গ্রামের মতো দু' পাশে। কিন্তু কাউকে তো দেখা যায় না। আলো নেই, দরজা-টরজা সব বন্ধ। টুটুলকে দেখে গোটা দুই কুকুর ডেকে উঠল।

কিন্তু পা আর চলে না। একটু জিরিয়ে নিতে পারলে হত।

না, আলো একটা দেখা যাচ্ছে। ওই তো একজন বুড়ো। দাওয়ার নীচে খাটিয়া পেতে সুর করে কী পড়ছে যেন।

টুটুলের পায়ের শব্দে মুখ তুলে চাইল বুড়ো।

কোন্ হো তুম্? যা রহা কিধার?

গলার স্বরে সন্দেহ জড়ানো। কপালটা কুঁচকে উঠেছে।

এই ইধার সে—বলেই ছুটে পালালো টুটুল।

আবার পথ, আবার গাছপালা, আবার ধুলোর ওপরে চাঁদের রাঙা আলো, আবার গাছের ছায়ায় থমথমে অন্ধকার। তবু পথের ধারে এক জায়গায় বসে পড়ল টুটুল। হাঁপাতে লাগল কিছুক্ষণ ধরে।

ঝোপে ঝোপে ঝিলমিল করছে জোনাকি। ঘাসের ভেতর থেকে ঝাঁ ঝাঁ করে সমানে উঠছে ঝিঁঝির ডাক। গঙ্গানগর আর কত দূর? সেখান থেকে আবার পলাশদীঘা যেতে হবে—সেই বা কত দূরে কে জানে!

কাউকেই জিজ্ঞেস করতেও সাহস হয় না ভালো করে। যদি সন্দেহ করে? যদি ধরে নিয়ে যায় স্কুলে? তাহলে টুটুলের আর মায়ের সঙ্গে দেখাই হবে না!

আবার চলা—আবার চলতে থাকা। গাছের ছায়া থমথম করছে এখন—চাঁদটা যেন হাসছে টুটুলের মুখের দিকে তাকিয়ে। রাত কটা বাজল? অন্যদিন এ সময় তো তার ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে—আজ সে চলছে, একটা অচেনা অজানা রাস্তা ধরে একা চলেছে। মা'র কাছে যাচ্ছে টুটুল।

একবার দাঁড়িয়ে পড়ল। আবার খানিকটা অভিমান দুলে উঠছে বুকের মধ্যে। মা তাকে এমন করে রেখে মাসিমার সঙ্গে বেড়াতে চলে গেল? সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া দূরে থাক, বলে গেল না পর্যন্ত একটিবার! ঠিক আছে—কোথাও যাবে না টুটুল, কোথাও যেতে চায় না সে। এই রাত্রির পথ দিয়ে একা যেতে যেতে সে চিরদিনের মতো হারিয়ে যাবে, তখন মা আর কোথাও খুঁজে পাবে না তাকে।

চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। হাতের তেলোয় মুছে ফেলল সে।

সামনে একটা মিটমিটে আলো দেখা যায়। ছোটমতন চালাঘর একটা। খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে উঁকি মারল সে।

একটা ভাঙা পুরোনো টেবিলের মতো। তাকে ঘিরে জনচারেক লোক বসে। তাদের সামনে দু-তিনটে মাটির ভাঁড়। তা থেকে ছোট ছোট গেলাসে কি যেন ঢেলে খাচ্ছে তারা। দুটো লোক তার মধ্যে প্রকাণ্ড জোয়ান, একজনের ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, আর একজন দেখতে যেন একটা বাঘের মতো—মুখটায় ছিটে ছিটে বসন্তের দাগ, হলদে হলদে মস্ত মস্ত চোখ।

কি একটা দুর্গন্ধ উঠছে। লোকগুলোকে দেখে ভয় হল তার।

একজন তাকে উঁকি মারতে দেখল।

অ্যাই, ক্যা মাংতা তুম্ ?

ভয় পেয়ে দরজা থেকে পিছিয়ে দাঁড়ালো টুটুল।

আমি গঙ্গানগরে যাবো।

সেই বাঘের মতো চেহারার, সেই ভয়ংকর হলদে চোখওলা লোকটা কটমট করে চাইল তার দিকে : এত রাত্রে গঙ্গানগরে যাবে ? কাদের ছেলে হে তুমি ?

আমি—আমি—

রাতের বেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে শয়তানি করা হচ্ছে ? শীগ্গির বাড়ি চলে যা বদমাশ ছেলে !

টুটুল আরো তিন পা পিছিয়ে গেল।

যা—জলদি ভাগো হিঁয়াসে—লাল টকটকে চোখ তুলে জড়ানো জড়ানো গলায় বললে আর একজন : মারেগা দো থাবড়া !

দৌড়—দৌড়—আবার দৌড়।

ধড়ধড় করছে বুকের ভেতর। পা আর চলছে না, চোখ অন্ধকার হয়ে আসছে। প্রায় আধ মাইল ছুটে টুটুল চোখ বুজে বসে পড়ল একটা গাছের তলায়।

মা—মা—মাগো !

কতক্ষণ চোখ বুজে বসেছিল জানে না। তবু ঝিঁঝির আওয়াজ তার কানে আসছিল, আশপাশে ঘাসের মধ্যে তিরতির করে পোকা ডাকছিল, চারদিকে গাছপালার শব্দ উঠছিল। টুটুল শুনছিল—শুনছিল না।

একটা টর্চের আলো পড়ল চোখে। ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়ালো টুটুল। চাঁদের লালচে ফিকে আলোয় তার সামনে একজন পাহারাওলা দাঁড়িয়ে।

ধড়াস করে আছড়ে পড়ল হৃৎপিণ্ড।

সর্বনাশ—নিশ্চয় স্কুল থেকে ধরতে পাঠিয়েছে !

পাহারাওলা বললে, এত রাতে এখানে বসে যে খোকা ?

আমি—মানে আমি—খোকনের গলার স্বর আটকে এল।

কোথায় বাড়ি তোমার ?

ওই—ওই তো ওদিকে।

চৌধুরী বাবুদের বাড়ির ছেলে, না ? পাহারাওলা নিজেই আন্দাজ করল : কলকাতায় থাকো তো ?

বোকার মতো মাথা নেড়ে সায় দিলে টুটুল।

এত রাতে বেরিয়ে এসেছ কেন ? গ্রামের রাস্তায় রাতবিরেতে এভাবে ঘোরা ভালো নয়। এসো—

ভারী মুশকিলে পড়ল টুটুল। আবার কোন্ চৌধুরী বাবুদের বাড়িতে নিয়ে যাবে কে জানে ! আর সেখানে যে অবস্থাটা কি দাঁড়াবে, কে বলতে পারে !

কিন্তু যা হোক তা হোক, আর সে ভাবতে পারছে না।

পাহারাওলা বললে, বাড়ি থেকে এতদূরে চলে আসা তোমার উচিত হয়নি। তাছাড়া

রাস্তাটাও সুবিধের নয়। আমি তো জয়গড় থানা পর্যন্ত যাচ্ছি। সেখান থেকে তোমাদের বাড়ি তিন মিনিটের পথ। চলো আমার সঙ্গে।

আচ্ছা। স্বস্তির শ্বাস ফেলে টুটুল চলতে লাগল পাহারাওলার সঙ্গে।

কে জানে, কোথায় জয়গড় থানা! তবু মনে হতে লাগল, এও ভালো। অন্তত একজন পাহারাওলার সঙ্গে সে যাচ্ছে। অন্তত খানিকটা পথ তার নিশ্চিন্ত।

তুমি তো স্কুলে পড়ো, না?

হুঁ।

লক্ষ্মী ছেলে, লেখাপড়া শেখো, খুব বড় হও। জানো, আমারও তোমার বয়েসী একটি ছেলে আছে।

তাই বুঝি? টুটুলের কৌতূহল হল।

কিন্তু সে তোমাদের মতো লক্ষ্মী নয়, গরিবের ছেলে কিনা। পড়াশুনো করতে চায় না, কেবল তার খেলাধুলোয় মন। আমি তাকে বলি—সময় থাকতে লেখাপড়া শিখে নে, তবে তো একটা গতি হবে। আর নইলে আমার মতো পুলিস হয়েই সারাটা জন্ম কাটাতে হবে।

কেন, পুলিস হওয়া তো ভালো!

না খোকাবাবু, না। পাহারাওলা একটু বিষণ্ণ হাসি হাসল: মোটেই ভালো না। এ চাকরি কি কেউ করে? পেটের দায়েই আসতে হয় এর ভেতর।

কেন, ভালো লাগে না চোর ধরতে? এতক্ষণে টুটুল সহজ হয়ে উঠল।

এবারেও পাহারাওলা হাসল, উত্তর দিল না।

তারপর পাহারাওলা পকেট থেকে একটু খইনি বের করে হাতের তেলোয় তৈরী করতে করতে এগিয়ে চলল, টুটুল হাঁটতে লাগল তার পাশাপাশি। সময় চলল।

ওধারে আবার আলো। একটা লাল বাড়িকে ঘিরে ছোট ছোট আরো বাড়ি দু-তিনটে।

পাহারাওলা বললে, এই তো থানায় এসে গেছি। তুমি বাড়ি যাও এবার।

একটু দ্বিধা করল টুটুল।

এই রাস্তাটাই তো চলে গেছে গঙ্গানগরের ওদিকে, না?

হুঁ। আর ডাইনে তো তোমাদের বাড়ির রাস্তা।

টুটুল তাকিয়ে দেখল ডানদিকে। একটা সাদা মেটে পথ চলে গেছে গাছপালার ছায়ার ভেতরে। দূরে একটা দোতলায় কটা আলো, চৌধুরীদেরই বাড়ি খুব সম্ভব।

থানার দিকে যেতে যেতে পাহারাওলা আবার ডাক দিয়ে বললে, এত রাতে আর বাইরে বাইরে ঘুরো না খোকা, বাড়ি ফিরে যাও। ঘরে থাকবে?

থাকবো।

টুটুল জবাব দিয়ে এগিয়ে চলল।

পেছনে থানার পেটা-ঘড়িটা বাজতে লাগল ঠং—ঠং—ঠং। একটা একটা করে শুনল টুটুল। রাত দশটা।

দশটা! সেই কখন থেকে সে হাঁটছে। তাহলে কত দূরে গঙ্গানগর—কোথায় বা পলাশদীঘা? কখন কতক্ষণে সে পেঁছাবে?

আবার চলা—আবার চলা।

চাঁদটা পশ্চিমের দিকে হেলে যাচ্ছে, রাস্তা নির্জন, থমথম করছে চারদিক। শুধু ঝিঁঝির আওয়াজ—শুধু ঝোপে ঝোপে জোনাকি। টুটুলের ভয় করতে লাগল। বেড়ে ওঠা রাতের ভয় আস্তে আস্তে ছড়িয়ে যেতে লাগল বুকের ভেতর। আর পা ব্যথা করছে, কী ভীষণ ব্যথা করছে এখন!

দুৎ! গান গাই একটা। গান গাইলে ভয়টা কেটে যাবে নিশ্চয়।

কী গান গাইবে? রেডিওতে শোনা সেইটেই মনে আসতে লাগল।

'শুভ কর্মপথে ধরো নির্ভয় গান,
যত দুর্বল সংশয় হোক অবসান—'

সামনে দিয়ে দৌড়ে কী গেল? দুটো জ্বলজ্বলে চোখে একবার তাকিয়ে গেল তার দিকে। গান বন্ধ হল, ভয়ে শক্ত হল শরীর।

দূর, নিশ্চয় শেয়াল! সেবার ছুটিতে মা-বাবার সঙ্গে শিমুলতলায় থাকবার সময় অনেক শেয়াল দেখেছিল টুটুল। নালার মধ্য দিয়ে আসত বাগানের মধ্যে—যে ছোট ঘরটার ভেতরে মুরগীগুলো রাখা হত, ঘুরঘুর করত সেখানে। আর ওদের চাকর মুন্নালাল তাড়া করলেই দুড়দুড় করে ছুটে পালিয়ে যেত।

শেয়ালকে কিসের ভয়? ওরা তো হাঁস-মুরগী চুরি করে খায় কেবল। মানুষ দেখলেই পালায়।

'চির শক্তির নির্ঝর নিত্য ঝরে,
লও সেই অভিষেক ললাট-পরে—'

কিন্তু আর পারা যায় না। গলায় আর সুর ফুটছে না কিছুতে। পায়ের তলায় যেন অনেকগুলো ফোসকা পড়ে গেছে, হাঁটু দুটো ভেঙে আসছে, বুক শুকিয়ে গেছে। পেটে নিদারুণ খিদের যন্ত্রণা—সেই মুড়িভাজা কটা কোথায় মিলিয়ে গেছে এখন।

টুটুল একটু দাঁড়াল। একটু সরে এল রাস্তার ধারে। হেলে যাওয়া চাঁদের আলোয় একটুখানি লালচে ঘাসের জমি। জিরিয়ে নেবার জন্যে বসল সেখানে।

'চির শক্তির নির্ঝর নিত্য ঝরে,
লও সেই অভিষেক ললাট-পরে—'

জড়ানো গলায় টুটুল গাইতে লাগল: শুভ কর্মপথে—শুভ কর্মপথে—শুভ কর্ম—

॥ ছয় ॥

কখন ঘাসের ওপর ঘুমে আর ক্লান্তিতে টুটুল এলিয়ে পড়েছিল জানে না, হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসল সে।

প্রথমে মনে হল যেন ঝড় আসছে—যেন চারিদিক কাঁপিয়ে ছুটে আসছে হাজারে হাজারে দৈত্যদানব। আধো ঘুমচোখে টুটুল দেখল একটা প্রকাণ্ড চোখ জ্বলে কী আসছে—থরথর করে কাঁপছে চারদিক।

গুম গুম—ঝন—ঝনাৎ ঝনাৎ—

তারপর আলোর পরে আলো ঠিকরে দিয়ে—খানিক দূর দিয়ে আবার অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়ল দৈত্যটা। দূর থেকে আওয়াজ আসতে লাগল ঃ ঝট ঝট—ঝনাৎ ঝনাৎ—

ওদিক দিয়ে রেলের লাইন আছে তাহলে! একটা মধ্যরাতের ট্রেন বেরিয়ে গেল উল্কার মতো।

প্রথম ভয়ের চমকটা সামলে নিয়ে উঠে বসল টুটুল।

এ কি কাণ্ড! পথের ভেতরে ঘাসের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে? সে তো যাবে গঙ্গানগরে, সেখান থেকে তার মায়ের কাছে পলাশদীঘায়!

উঠে দাঁড়াতে চাইল, কিন্তু আর উঠতে চাইছে না শরীর। চোখ জড়িয়ে ঘুম আসছে—হাত পা কি অসম্ভব ভারী! কিন্তু ঘুমুলে চলবে না। তার পথ এখনো সামনে—এখনো তো গঙ্গানগরে এসে পৌঁছোয়নি।

চলো—আবার চলো।

মাঝরাতের হাওয়া। টুটুল জানে না, কটা বেজেছে এখন। কিন্তু এই বাতাসে এই নির্জনতায় সে টের পাচ্ছিল এ আর এক রাত—এ রাতে চারিদিকে কেবল ঘুমের নিঃশ্বাস। এখন ঘাসেরা ঘুমুচ্ছে, গাছের পাতারা ঘুমিয়ে পড়েছে, শেয়ালেরাও ঘুমিয়ে গেছে, এমন কি জোনাকিদের আলো পর্যন্ত ঘুমে কাঁপছে।

সবাই ঘুমুচ্ছে। শুধু একা জেগে আছে টুটুল। সব ঘুমের মধ্য দিয়ে একলাই এগিয়ে যাচ্ছে সে। ভয় আর নেই এখন। নেশার ঘোরে যেন চলছে সে, চোখ দুটো ভাল করে পথটাও আর দেখতে পাচ্ছে না। চাঁদ নেই, কিন্তু ঝকঝক করছে আকাশভরা তারা।

আধ-ঘুমন্ত চোখের দৃষ্টি তার চমকে দিয়ে একটা উল্কা ছুটে গেল। একবার চেয়ে দেখল টুটুল। হঠাৎ তার মনে হল, আকাশে কি রেললাইন আছে? সেখানেও কি ট্রেন ছোটে?

দূর, এ সব কী ভাবছে? সে এখনো কি ছেলেমানুষ আছে আর, যে এই সব বোকামি চিন্তা তার মনে আসছে? আকাশে কোথায় রেলের লাইন? সেখান দিয়ে এরোপ্লেন উড়ে যায়, রকেট ছোটে—স্পুটনিক—লুনিক চলে যায় চাঁদের দিকে।

ঝিমিয়ে পড়া শরীরটাকে চাঙ্গা করে নেবার জন্যে আবার গুন গুন করে গান ধরল টুটুল।

'শুভ কর্মপথে ধরো নির্ভয় গান
যত দুর্বল সংশয় হোক অবসান—'

খট-খট-খটা-খট—

চমকে গান বন্ধ করল টুটুল। পেছনে দুটো আলো আসছে দুলতে দুলতে। আর ছুটন্ত ঘোড়ার পায়ের শব্দ। একা আসছে একখানা।

পথের ধারে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। একাটা তাকে ছাড়িয়ে একটু এগিয়ে গিয়েই থেমে গেল হঠাৎ। আর কে যেন ডাকল ঃ খোকা—খোকা—ও খোকা—

তাকে ডাকছে? হ্যাঁ, তাকেই। ওই তো ঘাড় ঘুরিয়ে এক ভদ্রলোক হাতছানি দিচ্ছেন তার দিকে। তারার আলোতে বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে সেটা।

ও খোকা, এসো তো এদিকে—

এগোবে কি এগোবে না চিন্তা করল টুটুল। একবার পেছন ফিরে দৌড়ে পালাবার কথাও ভাবল। তারপর আস্তে আস্তে চলল একাটার দিকেই। ভদ্রলোকের গলার আওয়াজ চড়া নয়—বেশ ভালো মেজাজের বলেই মনে হল।

একার সঙ্গে আছেন আধবুড়ো এক ভদ্রলোক, মাথায় টুপি। পাশে ঘোমটা দেওয়া এক ভদ্রমহিলা। ওঁরই স্ত্রী নিশ্চয়। তারার আলোয় ভদ্রমহিলাকে অনেকটা পিসিমার মতো দেখালো।

খোকা এত রাত্রে এ পথে কোথায় যাচ্ছ?

ভদ্রলোক বাঙালী নন। কিন্তু একটু টান থাকলেও সুন্দর বাংলা বলেন।

আমি—আমি গঙ্গানগর যাব।

সে তো সামনে এখনো ছ মাইল রাস্তা। এত রাত্রে একা যাচ্ছ সেখানে? গলায় স্নেহ আর সন্দেহ একসঙ্গে মেশানো, টুটুলও তা বুঝতে পারল।

বাপী বলেছেন, কোনদিন মিথ্যে কথা বোল না। মা বলেছেন, যে মিথ্যে কথা বলে, জীবনে তার কষ্টের শেষ থাকে না। টুটুল কখনো মিথ্যে বলে না। এমন কি তার দোষে একদিন যখন টেবিল থেকে সুন্দর সেই ফুলদানিটা পড়ে ভেঙে গিয়েছিল, সেদিন অনায়াসেই বাড়ির পপি কুকুরের ওপরে দোষটা চাপিয়ে দেওয়া চলত—সেদিনও মিথ্যে কথা বলতে পারেনি টুটুল।

হঠাৎ বলে ফেলল, আমি জয়গড়ে থাকি, কাকার কাছে। গঙ্গানগরে মা থাকে। মা'র খুব অসুখ করেছে শুনে, আমি—

ঈস্—ঈস্! মমতাঝরা গলায় মহিলাটি বললেন, এতটুকু ছেলে একা যাচ্ছ হেঁটে হেঁটে? সঙ্গে কাউকে নিতে পারলে না?

মিথ্যের সঙ্গে মিথ্যের জবাব আপনি এসে গেল।

কাকা যে বাড়িতে নেই, কার সঙ্গে যাব?

বলতে বলতে গলা ধরে এল টুটুলের। মিথ্যের জন্যে নয়, এই স্নেহটুকুর ছোঁয়াতেই কান্না আসছিল এখন। চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা জল পড়ল টুপটুপ করে।

ভদ্রলোক বললেন, এসো এসো, উঠে এসো একায়। আমরা ওদিক দিয়েই তো যাচ্ছি। তোমাকে নামিয়ে দেব গঙ্গানগরে।

আনন্দে বুকটা ভরে গেল। অন্তত ছ মাইল পথ একা অন্ধকারে তাকে আর হাঁটতে হবে না। সে আর পারছিল না—মনে হচ্ছিল, চলতে চলতে কোথাও পড়ে যাবে। এখন এই একায় চড়ে সে আরামে চলে যেতে পারবে। আর পলাশদীঘা? সে আর কতদূরই বা হবে ওখান থেকে?

ওঠো খোকা, লজ্জা কিসের? তা ছাড়া একায় অনেক তাড়াতাড়ি পেঁছুতে পারবে।

ভদ্রলোকই হাত বাড়িয়ে তাকে তুলে নিলেন একায়, বসালেন নিজের পাশে। টক্-টক্-টক্ শব্দে চলতে লাগল একা।

ভদ্রলোক বললেন, কোথায় স্কুলে পড়? জয়গড়ে?

হুঁ।

মিথ্যেটা বেশিক্ষণ আঁকড়ে রাখা যাবে না। টুটুল আরো জড়োসড়ো হল।

কিন্তু কথাটাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন মহিলাটিই।

এতটুকু ছেলে, কী মুসিবৎ!

ভদ্রলোক বললেন, হাঁ।

খোকা, আর ভাই বহিন নেই তোমার?

সেই স্নেহ, সেই মায়ের মতো সলজ্জ স্বর। অভিমানে আবার বুক ফেটে কান্না আসতে লাগল টুটুলের। তাকে ফেলে মা কেমন বেড়াতে চলে গেল, একটিবারও ভাবল না তার কথা!

হাঁটুতে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে উঠল টুটুল।

ভদ্রলোক নিঃশ্বাস ফেললেন একটা। একখানা নরম হাত মাথায় বুলোতে বুলোতে মহিলা নরম গলায় বলতে লাগলেন: রোও মৎ বাচ্চা, রোও মৎ। তোমার মা'র বেমারী জল্‌দি ভালো হয়ে যাবে।

দুঃখে কষ্টে ক্লান্তিতে আবার শরীর ভেঙে আসতে লাগল টুটুলের। মা—মাগো!

ভদ্রলোক বললেন, গঙ্গানগরে তোমাদের কোন্ বাড়ি?

টুটুল চমকালো। তারপর সামলে নিয়ে বললে, রা-রাস্তার ধারে শেষ বাড়ি!

আবার চলতে লাগল একা। আর তার চলার তালে তালে—

কে যেন গায়ে হাত রাখল, আবার ধড়মড় করে জেগে উঠল টুটুল। প্রথমটা সব ধোঁয়া ধোঁয়া ঠেকল, তারপরেই ঘোর ভেঙে গেল তার। সব মনে পড়ল।

বেশ বড় একটা জায়গায় এসে পড়েছে গাড়িটা। দুধারে সারি সারি ঘুমন্ত বাড়ি। এত রাতে একা দেখে তিন-চারটে কুকুর ডেকে উঠল একসঙ্গে। এখানে ওখানে দুটো একটা আলো।

সেই ভদ্রমহিলা কোমল স্বরে বললেন, শো গেয়া বাচ্চা?

ভদ্রলোক বললেন, হয়রানি তো বহুৎ হুয়া।

চোখ কচলালো টুটুল।

কোথায় এলাম?

এই তো গঙ্গানগর পেরিয়ে যাচ্ছি। কোন্ বাড়িতে নামবে তুমি?

ওই—আঙুল বাড়িয়ে যে-কোন একটা অন্ধকার বাড়ি দেখিয়ে দিলে টুটুল: ওই—ওইটে।

এই যে, রোখো একা।

একা থামল। টুটুল নেমে পড়ল ধীরে ধীরে।

আপনারা কত দূরে যাবেন?

আমরা? আমরা পলাশদীঘা যাব।

পলাশদীঘা! ঠক্ করে উঠল টুটুলের হৃৎপিণ্ড। যদি মিথ্যে কথা না বলত, তা হলে তো এঁদের সঙ্গেই সে চলে যেতে পারত পলাশদীঘায়!

পলাশদীঘা কি এখান থেকে অনেক দূর?

না, বেশিদূর নয়। এই মাইল চারেক। ওই তো সামনে পলাশদীঘার রাস্তা ঘুরে গেছে বাঁদিকে। আচ্ছা আমরা চলি তবে, তুমি বাড়ি যাও এবার।

সেই ভদ্রমহিলার মমতাঝরা গলা শোনা গেল আবার : ডরো মৎ বাচ্চা—তোমার মা খুব তাড়াতাড়ি আরাম হয়ে যাবে।

একা আবার টক টক করে এগিয়ে গেল।

এবার ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করল টুটুলের। চেঁচিয়ে বলতে চাইল, আমিও পলাশদীঘাতে যাব—আপনাদের কাছে আমি মিথ্যে বলেছি, আমাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যান। কিন্তু আর বলা চলে না। এইজন্যেই মা আর বাপী তাকে মিথ্যে কথা বলতে এত নিষেধ করে দিয়েছিলেন। মিথ্যেবাদীকে এমনি করেই শাস্তি পেতে হয়।

আরো চার মাইল পলাশদীঘা—আরো চার মাইল!

একাটা এখনো দূরে ছায়া-ছায়া দেখা যায়—এখনো আলোর দুলুনি টের পাওয়া যায়. এখনো শোনা যায় অস্পষ্টভাবে একাওলার মুখের টক্-টক্ শব্দ, ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ। কিন্তু ধীরে ধীরে সব মিলিয়ে গেল। পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল টুটুল।

চার মাইল! আরো চার মাইল!

আকাশে তারাগুলো যেন একটু ঝাপসা। চারদিকে এখন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়ার ঢেউ দিয়েছে। আরো—আরো চার মাইল!

টুটুল পথের ওপর বসে পড়ল, তারপরেই উঠে পড়ল আবার। যেতে হবে—মা'র কাছে তাকে যেতেই হবে। সে বুঝতে পারছিল, এখানে বসে পড়লে আর সে উঠতে পারবে না—কোনোদিনই না।

আবার চলতে লাগল টুটুল। চলা নয়—যেন নিজেকে ঠেলে ঠেলে এগোতে লাগল সে।

চার মাইল? সে আর কত দূর?

পথে ঠাণ্ডা হাওয়ার স্রোত। কেউ না—কোথাও না।

টুটুল চলছিল না, কেউ তাকে যেন ঠেলে নিয়ে চলেছে। তার হাত নেই, পা নেই, শরীর নেই। শুধু একটা নিষ্ঠুর কঠিন যন্ত্রণা। সেই যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে ভেসে যাচ্ছে সে।

চোখ ধোঁয়া-ধোঁয়া। তারই মধ্যে দেখল, ক্যাঁচর-ক্যাঁচর করে গরুরগাড়ি যাচ্ছে একটা।

ও গাড়োয়ান, পলাশদীঘা আর কতদূরে?

গলার স্বর ফুটল না।

গাড়োয়ান, পলাশদীঘা আর কত দূরে বলতে পারো?

একটা বিকৃত অদ্ভুত আওয়াজ বেরুল কেবল।

ক্যাঁচর ক্যাঁচর করতে করতে এগিয়ে গেল গাড়িটা। কেউ সাড়া দিল না। রাত্রির চেনা রাস্তায় গাড়ি ছেড়ে দিয়ে নিজের ছোট্ট জায়গাটিতে গুটিসুটি মেরে ঘুমিয়ে পড়েছে গাড়োয়ান।

আবার যন্ত্রণায় ভাবতে ভাবতে চলল টুটুল। এ পথ তার ফুরোবে না। এ চার মাইল আর কোনোদিন পার হতে পারবে না সে—কোনোদিন আর মা'র কাছে গিয়ে সে পেঁছবে না।

মা মাগো—

মাথার ওপর ঝটপট করল বাদুড়। রাত শেষ ঘরে ফেরার পালা। আবার কোথাও প্যাঁচা ডাকল তীক্ষ্ণ বিশ্রী গলায়। কিন্তু এবার আর কিছুই শুনতে পেল না টুটুল, কিছুই না।

মা মাগো—

আজি শরৎ-তপনে প্রভাত-স্বপনে
কী জানি পরাণ কী যে চায়—

সব আচ্ছন্নতা—সব অচেতনার মধ্যে যেন স্বপ্নলোকের গান। মা—মা'র গলা!

ওই শেফালীর শাখে কী বলিয়া ডাকে
বিহগ-বিহগী কী যে গায়—

সামনে কী এ? একটা বাড়ি? তার বাগান? সেখানে ভোরের আলোয় কে গান গায়?

শরৎ-তপনে প্রভাত স্বপনে—

মা—মা'র গলা আসছে স্বপ্নের পার থেকে!

মা মাগো! একটা আর্ত চিৎকার করল টুটুল, তারপর লুটিয়ে পড়ল গেটটার সামনে।

ভোরের আলোয় বাগানে যিনি ঘুরছিলেন, সেই মহিলা ছুটে এলেন পাগলের মতো।

টুটুল—টুটুল—আমার খোকন—আমার সোনা—

দু হাত বাড়িয়ে ছেলের অচেতন শরীর মা জাপটে ধরলেন বুকের ভেতরে। আকুল হয়ে ডাকতে লাগলেন, টুটুল টুটুল—আমার সোনা—কী করে এলি এখানে—টুটুল কী হল তোর—খোকন—বাবা আমার—

স্বপ্নলোকের ডাক শুনতে শুনতে, মা'র বুকের নরম আশ্রয়ের ভেতর, আরো গভীর থেকে গভীরতর অচেতনার মধ্যে টুটুল ডুবে যেতে লাগল।

একটি বিদেশী গল্পের প্রেরণায়।

আসানসোলের লোকটা

এককালে একটা নাম নিশ্চয় ছিল। সেটা তার বাপ জানত, মা-ও জানত নিশ্চয়। কিন্তু বাপ খতম হয়ে গেল জি টি রোডে মাঝরাতে নেশার ঘোরে লরি চালাতে গিয়ে, মা যে কোথায় উধাও হলো কেউ জানে না।

তারপর এখানে ওখানে। এর দোরে, তার দোরে।

একটা চোখ কানা, একটা পা ছোট। সব দিক থেকে মার-খাওয়া। কী আর কাজ জুটবে? হোটেলে কয়লা ভাঙা, বর্তন-উর্তন সাফ করা, উনুন ধরানো, সবজী কাটা, ফাই-ফরমাস, চড়-লাথি।

'এ কানা—এ বদমাস!'

এক পা ছোট, এক চোখ কানা। বদমায়েসী করবার সুযোগ নেই কোনো। তবু 'এ কানা—এ বদমাস' এই নামই দাঁড়িয়ে গেল।

এখন চল্লিশ ধরো-ধরো। অনেক দেখেছে, অনেক ঘাটের জল খেয়েছে, ঘুরেছে নানা জায়গায়। কিন্তু হোটেলের কাজ ছাড়া আর কিছুই জুটল না কোথাও। আর কোনো কাজেরই যোগ্যতা নেই তার।

বিয়েও করেছিল বইকি—যদি তাকে বিয়ে বলা যায়। একটা ছোট ঘরভাড়া করে—সেই ধানবাদে থাকবার সময়—হাজারীবাগ জেলার কালোকোলো একটি মেয়েকে নিয়ে সংসারও পেতেছিল একবার। কিন্তু কালো হলে কী হবে, সুরৎ ছিল মেয়েটার—অন্তত লোকে তাই বলত। তার মন টেঁকে কানা-ল্যাংড়ার ঘরে? কার সঙ্গে একদিন কোথায় চলে গেল একেবারে!

মা অন্তত বাপটা মরা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল, কিন্তু ততটুকু দেরিও এর সইল না।

ঘেন্না ধরে গেছে তারপর থেকে। জাতটাই হারামী। নিজের মা-টাকেও তো দেখল।

এখন চল্লিশ ধরো-ধরো বয়েস। 'এ কানা—এ বদমাস' কেউ আর বলে না। এখন শুধুই 'কানা'। তা চাকরিতে উন্নতি হয়েছে বইকি। আর কয়লা ভাঙতে হয় না, বর্তন সাফা করতে হয় না, চড়-লাথিও খেতে হয় না তাকে। কানা এখন রান্না করে হোটেলে। সব পথ শেষ করে আসানসোলে এসেই থিতু হয়েছে এখন। হোটেলের মালিক বুড়ো কার্নাইল সিং ফৌজে ছিল একসময়। মস্ত দাড়ি, মস্ত শরীর—মনটাও নেহাৎ ছোট নয় তার। কার্নাইল সিং পছন্দ করে কানাকে।

কানা রাঁধে ভালো। তার হাতের তৈরি মাংস আর আলু-মটরের নাম আছে বাসওয়ালা আর কোলিয়ারি এলাকার সর্দারজীদের মহলে। হয়তো এইজন্যেই একটু খাতির আছে তার কার্নাইল সিংয়ের কাছে।

কিন্তু 'এ কানা'?—ওইটেই তার নাম।

'তুমি তো শিখ!' একজন জিজ্ঞেস করেছিল।

'নিশ্চয়।'

'তাহলে তো শুধু কানা হতে পারো না। সিং—কানা সিং।'

তাই সই। একটু জাতে ওঠা গেল তাহলে। কানা সিং।

বেলা উঠতে থাকে—আসানসোলের রাস্তায় গাড়ির ভিড় বাড়ে। জি টি রোড পার হয়ে, রেলের লাইন ছাড়িয়ে রেল কলোনীর লাল লাল জীর্ণ বাড়িগুলোর মাথার ওপর দিয়ে কানা আকাশটাকে দেখে। সাদা সাদা মেঘ ছিঁড়ে নীল দেখা দিয়েছে—লাল রোদ পড়েছে মেঘের গায়। ভোররাতের হাওয়ায় কালো ঠাণ্ডায় যেন আলগা ছোঁয়া লাগল একটু। কানা জানে, জানে আর ক-দিন বাদেই বাঙালীদের পুজো আসবে। আসানসোল শহর, তার বাজার—সব কেঁপে উঠতে থাকবে ঢাকের শব্দে, মাইকের গানে। আকাশের ঐ নীলে তার খবর।

জি টি রোডে প্রাইভেট গাড়ির ভিড় ক্রমেই বাড়তে থাকবে এখন। কলকাতা থেকে পয়সাওলা মাড়োয়ারী-পাঞ্জাবী-গুজরাটি-সিন্ধি-বাঙালী-সব মোটর নিয়ে চলল হাওয়া বদল করতে। চলল নিয়ামৎপুর থেকে ডাইনে ঘুরে চিত্তরঞ্জন হয়ে জামতাড়া-দেওঘর-জসিডির দিকে, চলল বরাকরের রাস্তা ধরে ধানবাদ-হাজারীবাগ হয়ে পাটনা গয়া কাশী দিল্লীর দিকবিদিকে। জি টি রোডে এখন ছুটির ডাক।

কানার আর কোথাও যাবার নেই, তার সব চলা শেষ। এখন কার্নাইল সিংয়ের হোটেল, আলুমটর, কড়াই ডাল, আলু-পালং, কুচোচিংড়ির তরকারী, মাংস, রুটি। ওই সব গাড়ি করে যারা যায় এ হোটেলে তারা থামে না, তাদের জন্যে একটু দূরে দোতলা হোটেল আছে, বিলাইতী দারুর ব্যবস্থা আছে। এখানকার খরিদ্দার আলাদা, তারা বাস-লরির ড্রাইভার কণ্ডাকটার ক্লীনার, তারা কোলিয়ারী এলাকার সর্দারজী।

কিন্তু দূরে ছুটে যাওয়া ওই হাওয়া-বদলের গাড়িগুলো কানাকে উদাস করে। হাতের ডাণ্ডাটা নিয়ে লম্বা পাত্রটার মধ্যে প্রাণপণে মাংস কষতে কষতে চোখ চলে যায় আকাশের নীলের দিকে। যে বউটা পালিয়ে গেল—অন্য সময় যাকে স্রেফ হারামী ছাড়া আর কিছু মনে হয় না তার, তারই জন্যে বুকের ভেতর কেমন একটা যন্ত্রণা হতে থাকে।

'ম্যায় প্যার করনে ওয়ালে'—কানার চমক ভাঙে, কার্নাইল সিং রেডিওটা খুলে দিয়েছে।

ওই স্বভাব কার্নাইল সিংয়ের। রেডিও খুলে দেয়; কিন্তু কখনো শোনে না, নিজের চৌকিতে বসে সামনের ছোট বাক্সটার ওপর একটা পাঞ্জাবী খবরের কাগজ বিছিয়ে এক মনে পড়ে। সকালের কাগজ রাতে-দিনেও পড়া শেষ হয় না কার্নাইল সিংয়ের। এখন হোটেলে খরিদ্দার নেই, কাজের চাপও নেই, হোটেলের বাচ্চা ছেলেটা গানটার সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে পা ঠোকে, গুনগুনিয়ে ধরতে চায় সুরটা।

বিরক্ত হয়ে তাকে ধমক লাগায় কানা।

'ভাগ বদমাস কাঁহাকা!'

হি-হি করে হেসে ওঠে ছেলেটা। বাইরে গিয়ে বিড়ি ধরায় একটা। যেন কানাকে শুনিয়ে শুনিয়েই বিশ্রী বেসুরো গলা চড়িয়ে দেয়।

'ম্যায় প্যার করনে ওয়ালে—'

'বদমাস কাঁহাকা !' কথাটা নিজের কানে লাগে। 'এ কানা—এ বদমাস !' ডাকটা সেও শুনত। সেও বোধ হয় এরই মতো বয়েসে—কিংবা আরো ছোট ছিল তখন—হোটেলে কয়লা ভাঙতে আর বর্তন-উর্তন সাফা করতে এসেছিল।

তার কেউ ছিল না, এই ছেলেটার মা-বাপ আছে। বাপ কুলি, মা 'গেঠা' বিক্রি করে। সে রাত কাটাত হোটেলের মেজেতে, শীতের রাতে ঘন হয়ে আসত উনুনটার পাশে। অনেক রাত পর্যন্ত গরম থাকত সেটা—তখন মায়ের বুকে ঘুমুবার কথা ভেবে তার কান্না আসত।

কিসের মা? হারামী!

সামনে দিয়ে একটা বড়ো সাদা গাড়ি বেরিয়ে যায়—বহুৎ ভারী আদমির গাড়ি। কোনো পাঞ্জাবী বড়োলোক। সোনার চশমাপরা একজন, একজনের মাথায় পাগড়ি। ফুটফুটে কয়েকটি মেয়ের মুখ। দু-তিনটে বাচ্চা। এখন চলল হাওয়া-বদলে—ক্যারিয়ার পুরো বন্ধ হয় নি। মালপত্রে বোঝাই।

কত দূরে চলল? হয়তো আগ্রা-দিল্লী ছাড়িয়ে একেবারে নিজের দেশে—পাঞ্জাবে। অত বড়ো গাড়ি রেলগাড়িকে টেক্কা দিয়ে কোথা থেকে কোথায় ছুটে যাবে।

রেল কলোনির পুরনো বাড়িগুলোর মাথার ওপর দিয়ে নীল ফুটেছে, মেঘের গায়ে রাঙা রোদ। তারও দেশ ছিল পাঞ্জাবে। কিন্তু কানা কখনো দেশ দেখে নি। দেখে নি লাহোর থেকে কোথায় বিশ মাইল দূরে ছিল তার গাঁ। দেখে নি জলন্ধর—যেখানে তার চাচা নাকি বড়ো ব্যবসাদার আর অনেক টাকার মালিক। দেখে নি অমৃৎসর—তার সোনে কা মন্দিল—রাণীগঞ্জ-আসানসোল-দুর্গাপুর-ধানবাদ-হাজারীবাগ-কলকাতা-—ব্যাস, ব্যাস।

ব্যাস। সব ফুরিয়ে গেছে, এক পা খোঁড়া, এক চোখ কানা। বয়েস চল্লিশ হতে চলল। বাকি জীবনটা কেটে যাবে এই কার্নাইল সিংয়ের হোটেলে। যদি বুড়ো কার্নাইল মরে যায় হঠাৎ, হোটেল উঠে যায় তার—এই আসানসোলেই অন্য হোটেলে কাজ জুটে যাবে। কানা সিংয়ের নাম আছে রান্নায়।

রেডিওতে আবার একটা ফিল্মি গান শোনা যায়। বাচ্চাটা বাইরে থেকে ফিরে এসে চেয়ার-টেবিলগুলোকে অকারণে নাড়াচাড়া করে—যেন কাজ করছে। কানার হাসি পায়। ওর আসল কান ওই গানের দিকে।

'অ্যাই—' বদমাস বলতে গিয়েও সামলে নেয় কানা: 'থোড়া আদরৎ লাও!'

আদার দরকার নেই, তবু হুকুম করতে ভালো লাগে। না, এই ছেলেটার উপর তার মায়া হয় না, কেউ তাকেও মায়া করেনি। এই ছেলেটা রাত্রে তার গেঠাওয়ালী মায়ের বুকের ভেতর আশ্রয় পায়। সে শুয়ে থাকত উনুনের ধারে। যখন উঠত, তখন সারা গা তার ছাইয়ে মাখামাখি।

'এ কানা—এ বদমাস!'

এই ছেলেটারও একটা চোখ কানা হতে পারত, একটা পা খোঁড়া হতে পারত—হয় নি। শয়তানিতে দুটো চোখই ওর বিল্লির মতো জ্বলে। কানা যদি কখনো চটেমটে এক-আধটা চড়চাপড় বসাতে যায়, একেবারে রামছাগলের বাচ্চার মতো তিড়িং করে ছুটে পালায়—খোঁড়া পা নিয়ে কানা ধরতে পারে না তাকে। প্রাণখুলে গালাগালি করে

কদর্য ভাষায়—দূরে দাঁড়িয়ে হি-হি করে হাসে ছেলেটা।

কার্নাইল সিং নজর দেয় না ওসবে। সকালের খবরের কাগজটা দিনমান ধরে পড়ে—কী পড়ে সে-ই জানে। পয়সাকড়ির হিসেব করে। আর তেমন তেমন খরিদ্দার এলে আদর-আপ্যায়নও করে একটু। কানের কাছে রেডিওতে গানা চলে, অথচ কখনো শোনেও না। মেজাজ খুশি থাকলে, অর্থাৎ পয়সাকড়ির আমদানি একটু বেশী হলে তাকে গুনগুন করতে শোনা যায়।

'ধন ধন পিতা দশমেশ গুরু, জিনহি চিড়িয়াসে বাজ তোড়ায়ে—'

দশমেশ গুরু—গুরু গোবিন্দ। তারপর আর গুরু নেই। সব 'বান্দা'।

এসব খবরও কি রাখত নাকি কানা? কার্নাইলই তাকে শুনিয়েছে।

গুরু গোবিন্দ। কি অসাধ্য ছিল তাঁর? ছোট পাখি দিয়ে বাজ শিকার করিয়েছেন, তিনিই তো শিখিয়েছিলেন শিখদের পাঁচ 'ক' ধারণ করতে হবে—কেশ, কাঁকই, কংগন, কৃপাণ—

বলতে বলতে হাসে কার্নাইল সিং।

'কানা, তুমিও শিখ।'

'জী।'

'কিন্তু তোমার চুল নেই, দাড়ি নেই, কৃপাণ নেই, কাঁকই নেই।'

থাকবার মধ্যে কেবল ডান হাতের কংগন—লোহার বালাটা।

'দেশে গেলে শিখেরা রাগ করবে তোমার ওপর। বঙ্গাল বলেই পার পেয়ে গেলে।'

দেশ। পাঞ্জাব। সে রাণীগঞ্জে জন্মেছে। কোনোদিন দেশে যায় নি, কখনো যাবে না। তার সামনে দিয়ে পাঞ্জাব যেন ছুটে যায়, ছুটে যায় কালকার গাড়ি। তার দেশের মানুষরা ছোটে ঘরমুখো। অমরুৎসর, জলন্ধর, আম্বালা, লালান, চণ্ডীগড়—কোথায়, কতদূরে। ভারী আদমিদের বড়ো বড়ো মোটরগাড়ি হাজারীবাগ-গয়া-বানারস পাড়ি জমায়, হয়তো অমরুৎসর-চণ্ডীগড়েও চলে যায় রেলগাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। কানা রেলের লাইন দেখে, জি টি রোড দেখে, আর এমনি কোনো সময় —যখন শেষরাতের হাওয়ায় গায়ে একটা শিরশিরানি জাগে হঠাৎ, তখন আকাশের নীল দেখে।

রেডিওতে হিন্দী গান বাজে। বাচ্চাটা আবার পা ঠোকে তালে তালে। কানা এক চোখে তা দেখেও দেখতে পায় না। পাঞ্জাব—তার দেশ। অথচ সে দেশ কখনো দেখে নি। কে যেন তাকে বলেছিল 'হীর-রনঝা'র গল্প—শুনিয়েছিল তার গান। রনঝাকে ভালোবেসে শেষে মহিষের রাখাল হতে হয়েছিল হীরকে—কী সে দুঃখ, কত কষ্ট!

হারামীর জাত। বেকোয়াশ মহব্বৎ—বেফায়দা। সে তো নিজেই দুটোকে দেখল।

মাংসটা আরো জোরে কষতে কষতে কানা দাঁত কষকষ করে। কষা মাংসের গন্ধে আকুল হয়ে একটা কুকুর এসে দাঁড়িয়েছিল সামনে, একটুকরো কয়লা ছুঁড়ে মারে তার দিকে।

'ভাগ্ হারামী কাঁহাকা!'

কিন্তু সামনের ওই নীলটা মন খারাপ করে। সেই কালোকোলো উচ্ছল-চোখ

মেয়েটার কথা ভেবে মোচড় দিতে থাকে বুকের ভেতরে। যে পাঞ্জাব সে কখনো দেখে নি, তার মেঘবরণ আকাশছোঁয়া গমের ক্ষেত ভেসে ওঠে সামনে—দেখতে পায় তাদের —কতকাল পরে আজও মহিষ চড়াতে চড়াতে যারা 'হীর-রনঝা'র গান গায়।

'এই বদমাস!'

গালাগালটা দেবে না ভেবেও সামলাতে পারে না, যেন মুখফসকে বেরিয়ে আসে। যে কাজটা নিজেই করা চলত, তার দায় চাপিয়ে দেয় বাচ্চাটার ওপর।

'ঢালো—পানি ঢালো ইসমে—'

ছেলেটা গরমজল ঢালতে থাকে মাংসের পাত্রে। কানা প্রতি মুহূর্তে আশা করে—খানিকটা গরমজল উছলে পড়বে ছেলেটার পায়ে, ফোসকা পড়ে যাবে, ষাঁড়ের মতো চ্যাঁচাতে থাকবে, যেমন তার হয়েছিল উনুনের পাশে শুতে গিয়ে একটুকরো গনগনে কয়লা পিঠের নিচে পড়বার পর—ছাই দিয়ে ঢাকা ছিল, বুঝতে পারে নি।

কিন্তু শেয়ালের মতো চালাক ছেলেটা। অসম্ভব হুঁশিয়ার, একফোঁটা জলও পড়ে না।

'শালা হারামীর বাচ্চা!'

হঠাৎ ফুঁসে ওঠে ছেলেটা।

'ঝুটমুট গাল দেতে কেঁও?'

'মারব এক থাপ্পর। ভাগ সামনে থেকে।'

কার্নাইল সিং কিছুই শোনে না। এক হাতের মুঠোয় সাদা দাড়িটা চেপে ধরে খবরের কাগজ পড়ে যায়।

বেলা বাড়ে। মাংস নামে। ছেলেটা বেলে দেয়, কানা রুটি করতে থাকে। খদ্দেরদের আসবার সময় হয়ে এল। শব্দ করে একটা জীপগাড়ি এসে থামে হোটেলের সামনে। টক টক করে লাফিয়ে পড়ে চারজন। ভারী জোয়ান চারজন শিখ। এক চোখে এক লহমা দেখেই কানা চিনতে পারে এদের। কোলিয়ারির লোক এরা—মালিকদের পোষা গুণ্ডা। মজদুরদের মধ্যে বেয়াড়াপনা দেখা দিলে এরাই দু'-চারজনকে নিকাশ করে চালান করতে পারে কোনো পোড়ো খাদের অতলে, খুন করতে পারে দিনদুপুরে। এ ছাড়া ডাকাতি এদের বাঁধা ব্যবসা—কখনো কখনো বীমা-কোম্পানিকে ফাঁকি দেবার জন্যে এদের দিয়েই মালিক নিজের টাকা লুট করায়।

পুলিসে ধরে কখনো কখনো, আবার মালিকদের হাতের গুণে দু'দিনে ছটকে বেরিয়ে আসে। দরকার হলে দু'চারটে পুলিসকেও শেষ করে দেয়। একজন ফতে সিং, একজন ঠাকুর সিং, আর একজনের নাম জানে না—চতুর্থজনও ঠিক তার মতো আসল নাম হারিয়ে 'ডালকুত্তা' বলে বিখ্যাত।

ডালকুত্তাই বটে।

প্রকাণ্ড মাথা—প্রকাণ্ড মুখ। সারা মুখে কপালে 'চেচক'-এর দাগ। অদ্ভুত চওড়া আর থ্যাবড়া নাক। জোড়া ভুরু দুটো এত মোটা যে প্রায় কপালের আধখানা জুড়ে গিয়েছে।

কথা কম বলে—কখনো হাসে না। আর আধবোজা মিটমিটে চোখে তাকায় ঠিক

সাপের মতো। সে চাউনিতে রক্ত হিম হয়ে যায়। এসব লোককে ভালো করে চিনিয়ে দিয়েছে কার্নাইল সিং নিজেই। নিজে ফৌজী হাবিলদার হয়েও সে ভয় পায় এদের। বলে, 'খুব হুঁশিয়ার, ডালকুত্তাকে কখনো ঘাঁটিয়ো না।'

কার দায়—কে ঘাঁটাতে যাচ্ছে? বাচ্চাটা তো ওদের দেখলে ভয়েই সিঁটিয়ে যায়। আর কানা রান্না করে, খাবার সাজিয়ে দেয়। কানার হাতের মাংস খেয়ে খুশি হয় ওরা। যাবার সময় এক-আধটা থাবড়া আদর করে বসিয়ে যায় পিঠে। রোগা হাড়গুলো কনকন করে ওঠে তাতে।

ওদের ঢুকতে দেখে তটস্থ হয়ে উঠে দাঁড়ায় কার্নাইল সিং—আপ্যায়ন করে একগাল হেসে। অন্যদিন লোকগুলো খুশি থাকে—কুশল জিজ্ঞেস করে কানারও।

আজ আর ভালো করে জবাবও দেয় না। মুখগুলো কালো।

'কেমন করে থাকব—' বিরস মুখে জবাব দেয় ঠাকুর সিং, 'খবর ভালো না। জমানা বদলে যাচ্ছে।'

কার জমানা, কেমন করে বদলাল—এসব নিয়ে কিছু ভাববার নেই কানার। তার জমানা তো এই কার্নাইল সিংয়ের হোটেলের চৌহদ্দিতেই ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু লোকগুলোর কথা শুনে কেমন ভয় পায় বুড়ো—চুপ করে ফিরে যায় নিজের জায়গায়।

এক কোণায় যেখানে একটা কালো পর্দা দিয়ে ঘেরার ব্যবস্থা আছে, সেখানে গিয়ে বসে চারজন। টেনে দেয় পর্দা। খাবারের হুকুম দেয় না। বাচ্চাটাকে বলে, 'দো সোডা মাঙ্গাও, আউর গিলাস।'

বাচ্চা সোডা আনতে ছোটে পাশের দোকানে। চাপা গলায় কী আলাপ করে ওরা, শোনা যায় না। রেডিওটার আওয়াজ কমিয়ে দিয়ে কার্নাইল সিং আবার ডুব দেয় খবরের কাগজে।

সোডা আসে, গেলাস যায়। বোতল খোলার শব্দ ওঠে।

হয়তো ডাকাতির মতলব ভাঁজছে, হয়তো খুনখারাপির। কিংবা পুলিসেই হুড়ো লাগিয়েছে হয়তো বা। রুটি সেঁকতে সেঁকতে আবার কানার চোখ চলে যায় আকাশের দিকে। বাচ্চাটা বাইরে বেঞ্চিতে বসে থাকে চুপ করে। জি টি রোড দিয়ে গাড়ি ছোটে—ওধারে রেল আসা-যাওয়া করে, সময় যায়।

আরো দুজন খদ্দের আসে। রুটি, আলুমটর, জল খেয়ে পয়সা দিয়ে চলে যায় তারা। বাচ্চা টেবিল সাফ করে। বাইরে কাকের ডাক ওঠে। বেলা বাড়ে। সময় যায়।

কালো পর্দার ওপার থেকে মোটা গলায় হাঁক আসে। ফতে সিং কিংবা ডালকুত্তা—আওয়াজে বোঝা যায় না।

'রুটি মাংস। চারজনের।'

কানা সাজিয়ে দেয়। পরিবেশন করতে যায় ছেলেটা। আর তখনই ব্যাপারটা ঘটে যায়।

কী একটা গেলাস-টেলাস উল্টে পড়ল মনে হয়। তারপরেই শোনা যায় জঘন্য একটা গালাগাল। বাচ্চাটা ছিটকে সরে আসে, কালো পর্দার ভেতর থেকে জুতো পরা প্রকাণ্ড একটা লোক বেরিয়ে নিদারুণ লাথি বসায় ছেলেটার পেটে। হুমড়ি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে সে—তার হাত থেকে একথালা রুটি-মাংস ছড়িয়ে যায় ঘরময়।

আতঙ্কে শক্ত হয়ে যায় কানা—হুড়মুড় করে লাফিয়ে ওঠে কার্নাইল সিং। গালাগালির ঢেউ উঠতে থাকে পর্দাটার ওপার থেকে।

টেবিলে থালা বসাতে গিয়ে একটা গেলাস উল্টে দিয়েছিল ছেলেটা। খানিক মদ টলে পড়েছে ডালকুত্তার গায়ে।

মাংসের ঝোলে মাখামাখি হয়ে উঠে বসে ছেলেটা—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। হাতজোড় করে কসুরের মাপ চায় কার্নাইল সিং—তটস্থ হয়ে ছোটে নিজের হাতে পরিবেশন করতে।

চোখের জল মুছতে মুছতে ছেলেটা মেজে সাফ করতে বসে যায়।

কানা দেখে। মনে মনে খুশি হওয়া উচিত ছিল তার, কিন্তু খুশি হতে পারে না। স্মৃতিতে তার যন্ত্রণা চমকায়। তাকেও যেন কে অমনি করে লাথি মেরেছিল একবার, খাবার দিতে দেরি হয়ে গিয়েছিল বলে। একটা চোখ মেলে বাচ্চাটার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে সে—যেন নিজের সেদিনকার মুখটার ছায়া দেখতে পায় সেখানে।

খাওয়া শেষ করে বেরিয়ে আসে লোকগুলো। পয়সা মিটিয়ে দেয় কার্নাইল সিংকে। কার্নাইল সিং হাসে। খাতির করে কিছু বলতে যায়, কিন্তু আলাপ জমে না। অন্ধকার চেহারা নিয়ে, শুকনো গলায় কী বলে তারা আবার বেরিয়ে যেতে থাকে রাস্তার দিকে।

বাচ্চাটা পথ ছেড়ে ভয়ে সরে দাঁড়ায়। হঠাৎ কী ভেবে দাঁড়িয়ে পড়ে ডালকুত্তা। বাচ্চাটাকে ডাকে, 'এই, শুনো—ইধার আও।'

বাচ্চাটা নড়ে না।

'ইধার আও—ডরো মৎ—' পকেট থেকে একটা আধুলি বের করে ডালকুত্তা: 'লো।'

ছেলেটা তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে।

'লো—লো—বকশিশ লো—'

একভাবে ছেলেটা ঘাড় গুঁজে থাকে—এক পাও নড়ে না।

আধবোজা চোখদুটো খানিক খুলে যায় ডালকুত্তার। সাপের মতো চাউনি লিকলিক করে ওঠে। 'চেচক'-এর চিহ্নে ভরা প্রকাণ্ড মুখটাকে ভয়ঙ্কর দেখায়।

'গোস্সা হো গয়া শালে কো!'—আধুলিটা ছেলেটার মুখের ওপর সজোরে ছুঁড়ে দেয় ডালকুত্তা। ছেলেটা যন্ত্রণায় ক'কিয়ে ওঠে। হা-হা করে হেসে চারজন লাফিয়ে বসে জীপে। স্টার্ট নেয় গাড়িটা, এগিয়ে যায় কলকাতার দিকে। একবার চেয়ে দেখেই আবার কাগজটা পড়তে থাকে কার্নাইল সিং।

ছেলেটা দেখে না, আর কেউ দেখে না—কানা দেখে। আধুলিটা গড়িয়ে গিয়ে পড়ে নর্দমার ভেতরে।

সময় যায়, বেলা বাড়ে, খরিদ্দার আসে। একটু আগেকার সব দুঃখ ভুলে গিয়ে ছেলেটা পরিবেশন করে। গরীবের ছেলের ওসব মনে রাখলে চলে না।

কানাকে যে লাথি মেরেছিল—সে বলেছিল, 'কাঁদছিস কেন শুয়োরের বাচ্চা? হাস—হাস বলছি, নেহি তো ফিন এক লাথসে তুমকো—'

হাসতে হয়েছিল কানাকে। আর মজা দেখে মুচকে মুচকে হাসছিল হোটেলের

মালিক। সেও চাবুক দিয়ে পিটতে ভালোবাসত কানাকে।

এক ফাঁকে—দোকানের চাপ একটু কমে গেলে ছেলেটা এসে দাঁড়ায় কানার পাশে। ফিস্‌ফিস করে বলে, 'চাচা!'

'কেয়া?'

'উ লোক খুন কিয়া।'

'কেয়া?'

'হাঁ, তাই। পর্দার বাইরে থেকে শুনেছে বাচ্চাটা। ওরা এবার পাঞ্জাবে পালিয়ে যাবে। জমানা খারাপ। মালিকের আর হাতযশ নেই আগেকার মতো।

কানার ঠোঁটের ওপর দাঁতের চাপ পড়ে। পাঞ্জাব! হঠাৎ কানার মনে পড়ে যায়, তার মা-ও যেন কার সঙ্গে পাঞ্জাব পালিয়ে গিয়েছিল।

তীব্র গলায় কানা বলে, 'যাক—মরুক গে! ডাকু সব!'

'চাচা!' বাচ্চাটা আবার ডাকে।

'কেয়া?'

'উ লোগ মুঝে এক আধুলি দিয়া থা—কিধার গিয়া, দেখা তুম?'

কানা দেখেছে। ওই নালার ভেতর—জানে হাত দিলেই পাওয়া যাবে ওখানটায়।

একটু চুপ করে থাকে, তারপর জবাব দেয়, 'না, দেখি নি। যেতে দে বদমায়েসের পয়সা, আমি তোকে আধুলি দেবো একটা।'

ছেলেটা বিশ্বাস করতে পারে না। চাচার এমন দয়া এর আগে সে আর কখনো দেখে নি।

'তুম?'

'হ্যাঁ, আমিই দেবো। বিশ্বাস করছিস না কেন?'

ছেলেটার চোখমুখ খুশিতে ভরে যায়। বাচ্চা রামছাগলের মতো লাফাতে লাফাতে চলে যায় বাইরে। একটা ঘুড়ি কেটে পড়েছে কাছাকাছি। ছোটে তারই দিকে। ওরা কত সহজে ভুলে যায়!

সামনে আকাশটা নীল। গাড়ি ছুটছে একটার পর একটা—সব হাওয়া-বদলে চলল। কিন্তু ওই নীলের দিকে তাকিয়ে আর মনখারাপ হয় না কানা সিংয়ের। 'হীর-রনঝা'র গান ভেসে ওঠে না কোথাও। কেন যেন খুশি লাগে তার, বাচ্চা ছেলেটাকে একটা আধুলি দেবার কথা ভাবতে ভালো লাগে। কোথায় যেন একটা হাওয়া-বদল হয়ে যাচ্ছে—টের পায় সে॥

কলধ্বনি

॥ এক ॥

স্টেশনটা দেখেই এণাক্ষীর চমক লাগল। রেল কোম্পানির রসিকতা এতখানি মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে সেটা আগে ভাবতেও পারা যায় নি।

অবশ্য রসিকতাটা শুরু হয়েছিল ফেরী পার হয়ে ছোট লাইনের গাড়ি ধরবার পর থেকেই। এক-একটা নগণ্য স্টেশনে গাড়ি এসে থামছিল এবং প্রত্যেকবার থামবার পরেই মনে হচ্ছিল আর চলবে না। একুনে জনপাঁচেক ওঠা-নামার যাত্রী; শুকনো পুরী, কালো তরকারী আর হলুদে রসগোল্লা নিয়ে একটি ভেণ্ডার; ঘুমুতে ঘুমুতে বেরিয়ে আসা একজন স্টেশন মাস্টার—তাড়াতাড়িতে যাঁর কোটের গোটা-দুই বোতাম উঁচু-নিচু করে লাগানো। দুটো-একটা শিরীষ জাতের গাছের পাতা. ঝিরঝির ছায়া আর হু-হু-করা হাওয়ার ভেতর ট্রেনটা অকারণে দাঁড়িয়ে থাকছিল। বোধ হয় ওটাও ঘুমিয়ে পড়ছিল।

সবসুদ্ধ মোটের ওপর গোটাদশেক স্টেশন। ফেরীঘাট ছেড়েছে বেলা আটটায় —এখানে এল দুটোর সময়। আন্দাজ মাইল চল্লিশ রাস্তা—আসতে ঘণ্টা ছয়েক লাগল। ভাগ্যিস স্টিমার থেকে কিছু সংগ্রহ করা হয়েছিল টিফিনক্যারিয়ারে, নইলে খিদেয় নাড়ী ছেড়ে যেত এতক্ষণে। এই পুরী তরকারী কিছুতেই গলা দিয়ে গলত না।

সৌরীন বলেছিল, এখন বিরক্তি লাগছে, কিন্তু আমাদের স্টেশনে পেঁছে তুমি সত্যিই খুশি হবে। বাঙলা দেশের এমন রূপ তুমি কখনোই দেখোনি।

সেই স্টেশনে এতক্ষণে নেমেছে এণাক্ষী। এই বেলা দুটোর সময়।

বাঙলা দেশ পরে হবে—রেল স্টেশনের এমন রূপই কি সে আর দেখেছে কোনোদিন? চাকাবিহীন একটি ছোট মালগাড়ী—বোধ হয় রোদের তাপ বাঁচাবার জন্যে তার ওপর একটা খড়ের চালা বসিয়ে দেওয়া হয়েছে—অপরূপ লাগছে দেখতে। সেই ঘরের মধ্যে এক এবং অদ্বিতীয় স্টেশন মাস্টার—একটা টেবিল, একরাশ খাতা. একটি টেলিফোন আর একখানা ক্যাম্পখাট নিয়ে সম্রাটের মহিমায় বিদ্যমান। পয়েণ্টস্‌ম্যানটা খামোখা ব্যতিব্যস্ত হয়ে একটা লাইন-ক্লিয়ার হাতে নিযে এঞ্জিনের দিকে ছুটতে লাগল—স্টেশন মাস্টার বেরিয়ে এলেন কী যেন চিবুতে চিবুতে। খুব সম্ভব মুড়ি খাচ্ছিলেন।

সেকেণ্ড ক্লাস থেকে এরা দুজন ছাড়া যাত্রী নামল আরো তিনজন। সাঁওতাল— দুটি পুরুষ, একটি মেয়ে। এণাক্ষী দেখছিল সাঁওতাল মেয়েটিকে। ছিপছিপে চেহারা —অথচ স্বাস্থ্যে ঝলমল। মাথার ওপর কাপড়ের একটা মোট চাপিয়েছে—সেটার ওজন প্রায় মণখানেক হবে। সেই অবস্থাতেই খিলখিল করে হেসে উঠে একজন সঙ্গী পুরুষের পিঠে ছোট্ট চিমটি কাটল।

বোধ হয় ওর স্বামী।

কিন্তু সৌরীনের সময় ছিল না। আশপাশের এইসব ছোটখাটো নাটক দেখবার চাইতেও অনেক জরুরী কাজ তার সামনে। সঙ্গে জিনিসপত্রের বোঝা নেহাৎ কম নয়— একটা ট্রাঙ্ক, দুটো সুটকেস, প্রকাণ্ড বিছানা, অতিকায় বেতের ঝুড়ি একটা। কলকাতা থেকে বেরুবার সময় ঝুড়িটা পিসিমা জোর করে গাড়িতে তুলে দিয়েছিলেন—

কী যে ওর মধ্যে আছে তিনিই জানেন—কিন্তু ওজনটা দশ সেরের কাছাকাছি। এণাক্ষী সাঁওতাল মেয়ে নয় যে গোটাকয়েক বোঝা ওর মাথায় তুলে দেওয়া যাবে। আর সদ্য টাইফয়েড্ থেকে ওঠা সৌরীনের এমন শক্তি নেই যে ভারী ভারী সুটকেসগুলো টেনে সে বেশিদূর নিয়ে যেতে পারে। ট্রাঙ্কটার প্রশ্ন তো ওঠেই না।

ব্যতিব্যস্ত হয়ে সৌরীন চ্যাঁচাতে লাগল, কুলি—কুলি—

এণাক্ষী হেসে উঠল : কুলি আনতে হলে তোমায় শেয়ালদা স্টেশনে যেতে হবে। এ গাড়ি যতই ঢিলেঢালা হোক—ততক্ষণ কিছুতেই দাঁড়াবে না। তার চেয়ে এসো, আমরাই হাত লাগাই।

হাত না লাগিয়ে উপায়ও ছিল না। অনেক পরিশ্রমের পর ট্রাঙ্কটা যখন প্ল্যাটফরমে নামল তখন এণাক্ষীর শাড়ী বেশ খানিকটা ছিঁড়ে গেছে পায়ের দিকে, বাঁ হাতের খানিকটা ছাল উঠে গিয়ে চিড়বিড় করে জ্বলতে শুরু হয়েছে। তখনো একটা সুটকেস, বিছানা আর ঝুড়িটা বাকী।

কুলী এল না—কিন্তু ছুটে এলেন স্টেশন মাস্টার।

—সরুন সরুন—আমি ধরছি—

—সে কি—আপনি!

শুকনো চোয়াল, জীর্ণ চেহারার অল্পবয়েসী স্টেশন মাস্টার আপ্যায়নের বিমর্ষ হাসি হাসলেন।

—তাতে আর কী হয়েছে! এটুকু সাহায্য নিশ্চয়ই আপনাদের করা উচিত। এ তো স্টেশন নয়—হল্ট, কুলি তো এখানে পাবেন না—

—থাক্ না, আমরাই যা হোক করে—

কিন্তু বিনয় করবার আর সুযোগ পেলো না সৌরীন। তার আগেই ঝুড়িটা টেনে বের করে এনে সৌরীনের হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন ভদ্রলোক। আর সেটা মাটিতে নামাতে-না-নামাতেই বিছানাটা হিড়হিড় করে টানতে টানতে কামরার দরজায় এনে ফেলেছেন।

সৌরীনের চোখ কপালে উঠল। ওটাকে ধরে নামানো! টাইফয়েডে দুর্বল হাত দিয়ে সে অসাধ্যসাধন কিছুতেই সম্ভব নয়। বিভ্রান্তভাবে একবার সৌরীন এণাক্ষীর দিকেই তাকালো—প্রায় কাপুরুষের মতোই। কিন্তু এণাক্ষী তখন নুনছাল-ওঠা হাতখানা ঘষছে শাড়ীর আঁচল দিয়ে।

দুঃসময়ে কখনো কখনো ভগবানে বিশ্বাস করতে হয়। বড়বাবুকে বিব্রত দেখে ছোটবাবুর টনক নড়ল—অর্থাৎ সেই পয়েন্টসম্যানটি উপস্থিত হল ঘটনাস্থলে।

—আপ্ হঠ যাইয়ে, হাম উতার দেতে হেঁ—

মাল নামল। সমস্যার সমাধান হল।

সৌরীন ধন্যবাদ দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু সময় পেল না। স্টেশন মাস্টার শশব্যস্ত হয়ে বললেন, দাঁড়ান, সবুজ ফ্ল্যাগটা দেখিয়ে আসি আগে—গাড়ি আটকে রয়েছে।

পয়েন্টসম্যান গেল আর একটু পরে—চার আনা পয়সা নিয়ে এবং লম্বা একটা সেলাম দিয়ে।

সৌরীন তখনো হাঁপাচ্ছিল। এণাক্ষী তাকিয়ে দেখছিল হাতটার দিকে—অনেকখানি ছাল ছেড়ে গেছে।

ভাঙা গলায় বাঁশি বাজিয়ে ট্রেনটা আস্তে আস্তে সরে গেল প্ল্যাটফর্ম থেকে। মস্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল সৌরীন—একটা চেপ্টে যাওয়া সিগারেট ছোঁয়াল ঠোঁটের কোণায়।

এণাক্ষী বললে, বাক্স-বিছানা তো নামল, এবার ?

—এবার কী ?

—যেতে হবে কোথায় ? এগুলো নেবেই বা কে ?

সৌরীন বললে, সেজন্যে ভাবনা নেই—আমি মাঝি ডেকে আনছি।

—মাঝি আবার কোথায় ?

—বেশি দূরে নয়, স্টেশনের নিচেই বিল—পাঁচ মিনিটের মধ্যেই নিয়ে আসছি আমি।

—আর এখানে আমি বসে থাকব ? করুণ গলায় এণাক্ষী বললে, একা ?

আবার সেই বিপদভঞ্জন স্টেশন মাস্টার।

—কোথায় যাবেন আপনারা ?

সৌরীন বললে, মালণ্ড।

—মালণ্ড ? রায়বাড়ি ?

সৌরীন আশ্চর্য হয়ে বললে, কী করে জানলেন ?

চোয়াল-ভাঙা মুখে আবার সেই বিমর্ষ হাসি হাসলেন স্টেশন মাস্টার : রায়বাড়ি ছাড়া মালণ্ডের এমন যাত্রী আর কে নামবে এই স্টেশনে ? আমি তো প্রায় দেড় বছর আছি এখানে—সবই জানি। তা মাঝির জন্য ভাববেন না, রামরতন ডেকে এনে দেবে।

রামরতন অর্থাৎ সেই পয়েণ্টসম্যান।

বলেই ভদ্রলোক গলা তুললেন—রামরতন—রামরতন—

স্টেশনের ঘর থেকে রামরতন বেরিয়ে এল।

—একটা মাঝি নিয়ে আয় নিচের ঘাট থেকে। বলবি, মালণ্ড যাবে।

রামরতন চলে গেল। সৌরীন কৃতজ্ঞ হয়ে বললে, আপনাকে যে কী বলে ধন্যবাদ জানাব—সত্যি এমন বিব্রত হয়ে পড়েছিলাম—

ভদ্রলোক লজ্জিত হলেন। বললেন, ধন্যবাদের আর কী আছে—এমন কিছু তো আর করিনি আপনাদের জন্যে। তারপর এণাক্ষীর দিকে একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিলেন : তা এখানে দাঁড়িয়ে কেন কষ্ট করবেন আর ? ও মাঝি ডেকে আনুক, ততক্ষণ ভেতরে গিয়ে বসবেন চলুন। ভয় নেই—জিনিসপত্র কিছু চুরি যাবে না এখান থেকে।

এণাক্ষী ততক্ষণে বসে পড়েছে ট্রাংকটার ওপর। স্টেশন মাস্টার যাকে 'ভেতর' বলছেন, সে মনোরম জায়গাটির জন্যে খুব লোভ হচ্ছিল না তার। ছোট্ট মালগাড়ির ঘরটা, ভেতরে টেবিলে কাগজপত্রের স্তূপ আর ক্যাম্পখাটটা দেখা যাচ্ছে এখান থেকেও। ব্যতিব্যস্ত হয়ে এণাক্ষী বললে, না-না, কিছু দরকার নেই—বেশ ছায়া রয়েছে এখানটায়, ভারী সুন্দর হাওয়াও দিচ্ছে—এখানেই বসি।

স্টেশন মাস্টার একটু চুপ করে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, তা বটে। ভেতরে আপনাদের বসতে বলাও শাস্তি দেওয়া। যেমন ছোট, তেমন গরম। তার

ওপর এক-একদিন রাতে যখন ঝড় ওঠে তখন আমারই ভয় করতে থাকে। ভাবি, কখন উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে নিচে বিলের মধ্যে ফেলে দেবে!

সৌরীন বললে, কোয়ার্টার দেবে না আপনাদের?

—সে তো শুনছি এক বছর থেকেই। স্টেশনের পাকা বাড়ি হবে, কোয়ার্টার হবে—মাপজোপও তো হয়ে গেল বারতিনেক। কিন্তু কোথায় কী? সব লাল ফিতের ব্যাপার মশাই—ফাঁস খুলতেই তিন বছর!

এণাক্ষী তাকিয়ে দেখছিল চারদিক। সত্যিই অদ্ভুত জায়গা। অর্ধচন্দ্রাকার একটা বাঁধের মতো রেললাইনটা দুদিকে বাঁক নিয়েছে। উঁচু টিলার মতো একটা জায়গায় এই স্টেশন। লাইনের ওপারে জঙ্গলের নীলরেখা—এপারে যতদূর চোখ যায় ঘোলা জল সমুদ্রের মতো ঢেউ খেলছে, সেই জলের ভেতর দু-এক জায়গায় ছোট ছোট কালো কালো ঝোপের মতো জেগে আছে—তা ছাড়া ঢেউ আর ঢেউ—অফুরন্ত ঢেউ। যেন শীতের দিনে পুরীর সমুদ্র—শুধু তফাতের মধ্যে জলের রঙটা ঘোলা।

হঠাৎ কী একটা ভয়াবহ সম্ভাবনা জেগে উঠল এণাক্ষীর মনে। শিউরে উঠল শরীর।

স্টেশন মাস্টার বলছিলেন, ওরা কি আর আমাদের মানুষ বলে গণ্য করে মশাই! দেবে যেখানে খুশি ঠেলে—বাঁচো আর মরো। এই তো বছর দুই আগে আমার এক বন্ধুকে ট্রান্সফার করেছিল লামডিং বদরপুর সেকশনে। ছ মাসের মধ্যেই বুনো হাতীর পাল্লায় তার প্রাণটা বেরিয়ে গেল।

সৌরীন বললে, কী সর্বনাশ!

নিজের ভাবনাটা ভুলে গিয়ে আতঙ্কে আর সমবেদনায় চকিত হয়ে উঠল এণাক্ষী।

—বলেন কি! হাতীতে মেরে ফেললে!

—কোনোদিন হয়তো আমাকেই বাঘে খাবে। স্টেশন মাস্টার করুণভাবে হাসলেন: শীতকালে ওদিকের জঙ্গলে বাঘ আসে। এই তো স্টেশন—সন্ধ্যে সাতটার পর আমি আর রামরতন ছাড়া দু মাইলের মধ্যে একটি প্রাণীও থাকে না—নৌকাগুলো পর্যন্ত নয়, তখন এসে মুখে করে নিয়ে গেলে আর ঠেকাচ্ছে কে! তা ছাড়া ডাকাত এসেও যদি কেটে রেখে যায়, তাহলেই বা কী উপায় আছে বলুন!

এণাক্ষী বললে, এমন চাকরি করেন কেন? ছেড়ে দিলেই পারেন!

বলেই লজ্জা পেল। কেন যে মানুষ এমনভাবে প্রাণ হাতে নিয়ে চাকরি করতে আসে, কেন এমন করে দিনের পর দিন বাইশ বছর বয়সেই তার চোয়াল ভাঙতে থাকে, মাছের চোখের মতো কেন এমনি করে তারও চোখ ঝাপসা আর ঘোলাটে হয়ে যায়—সেটা না বোঝবার মতো বয়স তার নয়। তার ছোট ভাই কমল আজও ড্যালহাউসি স্কোয়ারের আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ক্লার্কশিপের পরীক্ষা দিয়েছে দু-দুবার। সৌরীন অবশ্য একটু বেশি মাইনের চাকরি করে—তবু বিকেল সাড়ে পাঁচটায় তাকে অফিস থেকে ফিরতে দেখেছে এণাক্ষী—ক্লান্ত শিথিল শরীরটাকে টেনে টেনে আসছে সৌরীন—যেন হেঁটে আসছে না, পেছন থেকে কেউ ঠেলে ঠেলে দিচ্ছে ওকে।

উত্তরে স্টেশন মাস্টার আবার সেই ক্লান্ত শীর্ণ হাসি হাসলেন। তারপর প্রসঙ্গটা বদলে দিয়ে বললেন, চা খাবেন?

—চা ? চা এখানে কোথায় ? সৌরীন আশ্চর্য হল।

—আনছি, দেখুন না—পা পাড়ালেন তিনি।

—দাঁড়ান—দাঁড়ান। সৌরীন বললে, আপনি তৈরী করবেন নাকি ?

স্টেশন মাস্টার লজ্জিত মুখে বললেন, বিশেষ অসুবিধা হবে না—আমার স্টোভ আছে, পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই হয়ে যাবে।

এণাক্ষী বললে, না-না, আপনার আর কষ্ট করার দরকার নেই—আমরা পথে একটু আগেই চা খেয়ে এসেছি।

কথাটা মিথ্যে। এক পেয়ালা চা পেলে ভালোই হত এ সময়ে। কিন্তু ভদ্রলোকের ওপর অনেক উৎপাত করা হয়েছে এর মধ্যেই। ট্রাঙ্ক নামানো থেকে শুরু করে মাঝি আনবার ব্যবস্থা পর্যন্ত। আর চাপ দেওয়া উচিত নয়।

একটা প্রস্তাব করা যেত অবশ্য। এণাক্ষী বলতে পারত, সব দেখিয়ে দিন—আমি চা করে আনছি। কিন্তু সংকোচ বোধ হল, তা ছাড়া ট্রেনে এতখানি লম্বা পাড়ি দেওয়ার পর শরীরে মনে কোনো উদ্যমই আর অবশিষ্ট নেই এখন।

স্টেশন মাস্টার যেন একটু ক্ষুণ্ণই হলেন। বললেন, তাহলে আর কিছু খাবেন ? দুধ ?

সৌরীন অত্যন্ত স্থূলভাবে হেসে উঠল: দুধ খাব—বলেন কি! দুগ্ধপোষ্য পেলেন নাকি আমাদের ?

স্টেশন মাস্টার ভারী অপ্রতিভ হয়ে গেলেন—তাঁর মনে পড়ে গেল, মালঞ্চের রায়বাড়ির যারা যাত্রী তাদের অতিথেয়তা দেখাতে গিয়ে নিজের অধিকারের মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন তিনি।

থতমত খেয়ে বললেন, না, এমনি বলছিলাম। এদিকের দুধ খুব ভালো—মানে কলকাতায় এরকম দুধ পাওয়া যায় না কিনা তাই—

সৌরীন হেসে বললে, আমিও তো এদিকের লোক। এখানকার দুধের খবর আমারও জানা আছে—আপনি ব্যস্ত হবেন না।

সৌরীনের ওপর কেমন যেন রাগ হল এণাক্ষীর। প্রায় বলতে যাচ্ছিল, নিয়ে আসুন না আপনার দুধ—খেয়ে দেখি, কিন্তু ঠিক তক্ষুনি দু'জন লোককে সঙ্গে নিয়ে রামরতন ফিরে এল।

—হুজুর, মাঝিলোগকো লায়া—

সৌরীন বললে, আঃ বাবা, বাঁচালে। ওঠাও, ওঠাও—মাল ওঠাও।

শুধু মাঝি দু'জনই নয়, রামরতনও বাক্স তুলতে লেগে গেল।

স্টেশন মাস্টার একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলেন বলে মনে হল। বললেন, তাহলে চললেন ?

—হ্যাঁ—আসি আজ। সৌরীন বললে, অনেক উপকার করলেন। আপনি সাহায্য না করলে অর্ধেক জিনিস গাড়ি থেকে নামাতেই পারতাম না।

—কিছু না, কিছু না। স্টেশন মাস্টার মাথাটা ঘুরিয়ে নিলেন হঠাৎ।

একটা মৃদু করুণায় এণাক্ষীর মন ভরে গেল। এই ছোট্ট নগণ্য স্টেশন—সঙ্গীহীন একটানা দিনগুলো—আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে কত দূরে। কোনোদিন জ্বরে

পড়লে মাথায় হাত বুলিয়ে দেবার একটি মানুষ পর্যন্ত কাছে নেই। আতিথ্য করবার এই উচ্ছ্বাসটুকু ঠেলে উঠেছিল মনের সেই ফাঁকার ভেতর থেকেই। এণাক্ষীর মনে হল, ফেরার দিন যদি সময় পায় তাহলে একবেলা রান্না করে খাইয়ে যাবে ভদ্রলোককে।

মাঝিরা মাথায় বাক্স-বিছানা তুলে হাঁটতে শুরু করেছে। সৌরীন বললে, আসি তবে, নমস্কার।

এণাক্ষীও হাত তুলে কপালে ঠেকালো। স্টেশন মাস্টার নিঃশব্দে প্রতি-নমস্কার করলেন। একটু আগেই যেমন অপ্রত্যাশিত ভাবে মুখর হয়ে উঠেছিলেন—এখন তেমনি ভাবেই নীরব হয়ে গেছেন।

কোনোদিন বাঘে মুখে করে নিয়ে যেতে পারে—ডাকাত এসে খুন করতে পারে, কথা দুটো কান ভরে শুনতে শুনতে প্রায় ঢালু একটা ধার বেয়ে ওরা স্টেশনের পেছন দিকে নামতে লাগল। আর এণাক্ষী আরো স্পষ্ট করে দেখতে পেলো এবার।

জল—সামনে অফুরন্ত জল। যতদূর চোখে পড়ে, সে জল সমুদ্রের মতো ঢেউ ভাঙছে—ফেটে পড়ছে ফেনার ফুল। এখানে ওখানে দু'একটা ঝোপের মতো দ্বীপের বিন্দু—তা ছাড়া সে অনন্ত জলের কোনো কিনারা আছে বলে মনে হয় না। দূরে দূরে এক-আধখানা নৌকা চলছে—হাওয়ায় দুলে উঠেছে তাদের পাল।

এণাক্ষী সভয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

—এই জল পাড়ি দিয়ে যেতে হবে?

সৌরীন বললে, হুঁ।

—এ যে সমুদ্র বলে মনে হচ্ছে!

সৌরীন বললে, প্রায় তাই। বর্ষার বিল কিনা। মাঠঘাট নদীনালা যা ছিল সব তলিয়ে গেছে।

—দেখেই যে ভয় করছে গো! যদি ডুবে যায় নৌকো!

রামরতন পেছন ফিরে তাকালে। বাংলা করে বললে, ডুববে কেন মাইজী—ডুববে না। কেতো নৌকা যাচ্ছেন। তুফান-টুফান হলে দুসরা বাত—আজ তো পানি ঠাণ্ডা আছেন।

এই ঠাণ্ডা পানি! ততক্ষণে বিলের ঘাটের কাছে এসে নেমেছে ওরা। সাপের ছোবলের মতো ঘোলাজলের ঢেউ অসংখ্য খড়কুটো নিয়ে ঘাসের গায়ে এসে আছড়ে পড়ছে, বাঁধা নৌকাগুলোকে দুলিয়ে দিচ্ছে নাগরদোলায়। বিলের মাঝখানে এসে কী রূপ নেবে কে জানে!

সৌরীন বললে, কোনো ভয় নেই। পাল তুলে দিলে স্টিমারের মতো স্পীডে পাঁচ ছ' ঘণ্টায় মালঞ্চ পেঁছে যাব।

সামনেই মাঝারি আকারের ছইতোলা নৌকো একটা। মাঝিরা তার ওপর জিনিসপত্র তুলল। সৌরীন একটা টাকা তুলে দিলে রামরতনের হাতে—খুশি হয়ে দু-দুটো সেলাম ঠুকল রামরতন। সৌরীন বললে, এণা, ওঠো—

কিন্তু এণাক্ষীর তবু পা সরে না। সাপের ছোবলের মতো ঢেউ এসে পড়ছে ডাঙার ঘাসগুলোর মধ্যে। নৌকাগুলো দুলছে অনবরত। দূরে সমুদ্রের মতো ফেনা ফুটছে—ফেনা ফাটছে। মনে হচ্ছে, ও জলের কোনো পার নেই—কোনো শেষ

নেই ওর।

তবু গলুইয়ে পা দিয়ে, সৌরীনের হাত ধরে টলতে টলতে নৌকোয় উঠতে হল তাকে। আর তখুনি তার মনে হল—কেন কে জানে মনে হল—একটা শুকনো ডাঙা থেকে এমন একটা জীবনের মধ্যে সে পা দিয়েছে—যেখানে সমুদ্রের মতো ঢেউ কেবল দুলবে আর দুলেই চলবে—যার কূলকিনারা কোথায় কেউই জানে না।

সিনেমা ছাড়া সমুদ্র দেখেনি এণাক্ষী। পুরীতেও যায়নি কোনো দিন। ভয় আর বিস্ময়ে ভরা দুটি চোখ মেলে সে দেখতে লাগল এই নতুন পৃথিবীর রূপ। জল আর জল। এত জল কোথায় ছিল—এলোই বা কোথা থেকে? পাল তুলে নৌকো ছুটেছে মালঞ্চের দিকে। দু পাশ থেকে—সামনে থেকে ঢেউয়ের ছোবল পড়ছে—একটানা রুদ্ধ গর্জন উঠছে যেন। এণাক্ষী দেখতে লাগল, শুনতে লাগল।

কী অদ্ভুত রঙ জলের। কোথাও সাদা—কখনও নীলচে—কখনো মেঘের মতো কালো। কোথাও জলের ওপরে ঘাসের ডগা নড়ছে—কোথাও চাপ চাপ নোংরা সাদা ফেনা ভেসে বেড়াচ্ছে কবরখানার নরমুণ্ডের মতো। দূরে দূরে জলের ভেতরে কতগুলো কালো কালো ঝোপ—ঢেউয়ে ঢেউয়ে ক্রমাগত দুলছে তারা। মাঝিদের দাঁড় থেকে রেণু রেণু বৃষ্টির মতো জলের ছোঁয়াচ এসে মুখে লাগছে—একটা অদ্ভুত গন্ধ আসছে: সেটা নৌকোর না জলের এণাক্ষী বুঝতে পারল না। এণাক্ষী আর থাকতে পারল না—আচ্ছা, এটা কি সমুদ্র?

সৌরীন হেসে উঠল পরম কৌতুকে।

—বাংলা দেশের জিওগ্রাফিটাও কি ভুলে গেলে এণা? এখান থেকে স্ট্রেট লাইন টানলেও যে বে অব বেঙ্গল পৌনে তিনশো মাইলের কম নয়।

জবাব এণাক্ষীর ছিল। এণাক্ষীও বলতে পারত, তোমার দেশের ট্রেন যেভাবে অনন্ত যাত্রার পথে চলছিল, তাতে আমি ভেবেছিলাম বুঝি বে অব বেঙ্গলেই এসে পড়েছি। কিন্তু এই বিপুল জলের রাক্ষস রূপের দিকে তাকিয়ে সেটুকু রসিকতা করবারও উদ্যম ছিল না এণাক্ষীর।

হালের আধবুড়ো মাঝিটাও একটুখানি হাসল। হাসিটা সস্নেহ।

—মা ইটা প্রায় ঠিকই বুলছেন। তো ইটাকে সাগরই কহা যায়। ইহার নাম হৈল চাফাল।

—চাফাল! চাফাল মানে কী?

উত্তুরোল হাওয়ার ভেতরে গোটা আটেক কাঠি নষ্ট করে শেষ পর্যন্ত একটা সিগারেট ধরালো সৌরীন। তারপর ব্যাখ্যা করে দিলে: এগুলো সব ঢালু মাঠ। বর্ষার জলে এমনি করে ভরে উঠেছে।

—বর্ষার জল! এত জল এল কী করে?

—চারদিকের উঁচু জায়গা থেকে জল গড়িয়ে এসে জমা হয়েছে এইসব মাঠে। তার সঙ্গে মিলেছে নদীর বান। আষাঢ় থেকে ভাদ্র পর্যন্ত এই সমুদ্রের পরমায়ু। আপাতত

এর তলায় মাঠ আছে, বেনার বন আছে, হিজলগাছ আছে। গোরুরগাড়ী আর মানুষের পায়ে চলার রাস্তা আছে। আশ্বিন-কার্তিক মাসে নৌকোর রাস্তা দিয়ে গোরুরগাড়ী চলবে।

—আশ্চর্য! এণাক্ষী তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। এত জল—এমন অফুরন্ত জল! এই জল কোনোদিন নেমে যাবে, কোনোদিন শুকিয়ে যাবে—এ কিছুতেই বিশ্বাস হয় না! কেমন মনে হয়—যেন দিনের পর দিন এ বাড়তে থাকবে, বাড়তেই থাকবে, তারপর একসময় পৃথিবীর অবশিষ্ট শুকনো জমিটুকুও নিঃশেষে গ্রাস করে নেবে। এ যেন পৃথিবীর আগামী পরিণাম, বাইবেবেলের গল্পের মতো সেই শেষ পরিণতি।

সৌরীন অন্যমনস্ক ভাবে বলে যাচ্ছিল, বেশ লাগে দেখতে। একটু একটু করে জল নেমে যায়—রোজ খানিকটা করে মাটি জেগে ওঠে। আজকের সাগর ক্রমে ক্রমে কয়েকটা খাঁড়ি হয়ে যায়। তারপর সেই পুরোনো চেনা পৃথিবী। সাপ ফিরে আসে নিজের আস্তানায়, নতুন ঝোপে আবার পুরোনো খরগোশ এসে আশ্রয় নেয়, শেয়াল আসে তাদের সন্ধানে। অনেক দূরের থেকে ফিরে এসে পাখীরা আবার বাসা বাঁধে হিজল-বাবলার ডালে। একসময় মনে হয়, মাটি হারিয়ে গেছে, জীবন ফুরিয়ে গেছে—খালি সাগরের মতো জল—খালি ভয়—খালি অনিশ্চয়তা। কিন্তু মাটি হার মানে না। অপেক্ষা করে—ধৈর্য ধরে থাকে। শীতল কাদার তলায় প্রতীক্ষা করে ভাঁটফুল আর বুনো ভাঙের দল। মাটি জানে—অধিকারটা শেষ পর্যন্ত তারই—জলের নয়।

কথাগুলো কান পেতে শুনতে লাগল এণাক্ষী। সাজিয়ে-গুছিয়ে ভালো ভালো কথা বলবার আনন্দে বলছে সৌরীন। হয়তো খানিকটা—কিন্তু সবটা নয়। এই সাগরের মতো জল—যার কূল নেই কিনারা নেই ; মাথার ওপরে এই প্রকাণ্ড আকাশটা—যার খানিকটা ঘোলাটে মেঘ, খানিকটা কালচে মেঘ, খানিকটা উজ্জ্বল নীল—চাফালের জলের সঙ্গে যার মিল আছে ; এই হাওয়া—অফুরান হাওয়া—যার মধ্যে পাখীর মতো ডানা মেলে দিতে ইচ্ছা করে ঃ এখানে সাজিয়ে বানিয়ে কথা বলতে হয় না, আপনিই আসে। তাদের ডেকে আনে জল, আকাশ, হাওয়া—আর তাদের মধ্যে ছড়িয়ে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া মন।

বাতাস বাড়ছে—ঢেউ মাতলামি করছে অল্প অল্প। নৌকো দুলছে—একবার একটুখানি দুলুনিতে ছইয়ের গায়ে টলে পড়ল এণাক্ষী। সঙ্গে সঙ্গে একটা তীক্ষ্ণ ভয় শক্ত থাবার মতো আঁকড়ে ধরল তার হৃৎপিণ্ড। মাটির ফিরে আসতে এখনো দেরি আছে,—তার আগে পর্যন্ত এই দোলা—এই নিষ্ঠুর হিংস্র গর্জন।

এণাক্ষী বললে, কখনো নৌকো ডোবে না এর ভেতর ?

সৌরীন যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠল। কথাটা কানে গিয়ে বাজল বেসুরো ভাবে। ভুরু কুঁচকে একবার তাকালো এণাক্ষীর দিকে।

—ঝড় তুফান হৈলে তেবে ডুবিবে, ঝুটমুট কেনে ডুবিবে মা ? হাল থেকে বুড়ো মাঝি অভয় দিলে এণাক্ষীকে।

—মানুষ মরে যায় ?

—যায় দুই-চাইরটা। তেবে সব বচ্ছরে হয় না। তিন্ সাল আগে একটা নাও

ডুবিল—প"চিশটা মানুষ আছিল—সব মরি গেইল্।

—প"চিশ জন মানুষ ডুবে গেল! একজনও বাঁচল না! বিবর্ণ হয়ে গেল এণাক্ষী।

সৌরীন বললে, এর ভেতর ডুবলে আর কোন অ্যাপীল নেই এণা। নদী নয় যে স্রোতে গা এলিয়ে দেবে। ভারী জল ঠেলে দশ গজ এগিয়ে যেতে হাত ধরে আসবে। ওই যে ঘাসের ডগাগুলো দেখছ—ওরা উঠে আসছে পনেরো-বিশ ফুট জলের তলা থেকে—পড়বার সঙ্গে সঙ্গে নাগপাশের মতো জড়িয়ে ধরবে শরীরে। ওই যে ঝোপগুলো দেখছ—ওরা হিজল-বাবলার মাথা, ওদের যেটুকু জেগে রয়েছে, সেখানে বাস্তু বে"ধেছে দলে দলে গোখরো কেউটে। আশপাশে দু-চারটে কুমীরও ভাসছে—ঘড়িয়াল ছাড়া ম্যান্-ইটারও আছে তাদের মধ্যে। মুখের কাছে খাবার পেলে তারা খুব আপত্তি করবে না।

ভয়ে শি"টিয়ে গেল এণাক্ষী। শুধু জলই নয়—একরাশ তরল মৃত্যু। সহস্রমুখ রাক্ষস। কেন নিয়ে এল তাকে সৌরীন—কেন নিয়ে এল এখানে? বাংলা দেশে আর কি এমন কোনো জায়গা ছিল না যেখানে শক্ত মাটি আছে—জীবন যেখানে দাঁড়িয়ে আছে অভয় বাড়িয়ে?

বুড়ো মাঝি বললে, কিছু ভয় নাই মা—কুনো ভয় নাই। ঝড়-তুফানের দিন নহো এইটা। ত্যামন বুঝিলে হামরাই কি নাও লিয়ে বাহির হইতাম? হামাদেরও তো জানের ডর আছে মা!

ঠিক কথা। ভরসা এইটুকুই। বুড়ো মাঝির মাথার চুল অর্ধেক সাদা—সামনে দুটো দাঁত নেই, বয়েস নিশ্চয় ষাট্ পেরিয়ে গেছে। এর মধ্যে কত দিন—কত বার সে পাড়ি দিয়েছে এই বিল কত দিনে, কত রাত্রিতে। তবু এই জল তাকে গ্রাস করতে পারেনি। এইটুকুই আশা এণাক্ষীর—এইটুকুই তার বিশ্বাস।

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল এণাক্ষী, হঠাৎ চে"চিয়ে উঠল: সাপ—সাপ!

ভয়ানক ভাবে চমকে উঠল সৌরীন: সাপ? কোথায় সাপ?

—ওই যে। জলের ভেতর দিয়ে এগিয়ে আসছে এদিকটায়।

সত্যিই সাপের মতো কী একটা আসছিল নৌকোর দিকে। জলের ওপর একটা রেখা টানতে টানতে, ঢেউয়ে দুলতে দুলতে এগোচ্ছিল এইদিকেই।

বুড়ো মাঝি মৃদু হেসে বললে, সাপ নয় মা—পাখি।

পাখি! তাই তো বটে। একটা বুলবুলি। প্রাণপণে আসতে চেষ্টা করছে নৌকোর দিকেই।

মাঝি বললে, বেচারা! উঁড়িতে উঁড়িতে কুথাও বসিবার ডাঙা পাইলে না, ডানা ভাঙি আসিল্। পড়ি গেইল্ পানিতে। নাও দেখি জান বাঁচাবার জন্যে আইলে ইদিকে।

পাখিটা তখন প্রায় নৌকোর কাছে এসে পড়েছে। মানুষকে দেখলে যে উর্ধ্বশ্বাসে পালায়, আজ মানুষের কাছেই সে এসেছে আশ্রয় চাইতে। বুঝতে পেরেছে দারুণ প্রকৃতির কাছ থেকে কেউ যদি তাকে রক্ষা করতে পারে তা হলে সে তারই মতো প্রাণী: যে মাটিতে থাকে—যে জলের কেউ নয়।

মাঝি একটা দাঁড় এগিয়ে দিলে। ঝট্‌পট করে বিনা দ্বিধায় উঠে বসল তখনি।

তারপর একেবারে নৌকোর ওপর। চারদিকে একবার ভয়াতুর দৃষ্টিতে চেয়ে দেখল বুলবুলিটা—সরে এল এণাক্ষীর পাশেই। মানুষের মধ্যেও একটা আপন-পর চেনার শক্তি আছে তার।

থরথর করে কাঁপছিল পাখিটা। কিছুক্ষণ মাথা বাঁকিয়ে দেখল এণাক্ষীকে। সে দৃষ্টিতে আশংকা, ভয় আর প্রার্থনা। আশ্রিতের আত্মসমর্পণ।

সৌরীন বললে, শুধুই বুলবুলি? একটা ঘুঘু-টুঘু হলে মন্দ হত না। নৌকো থেকে সোজা গিয়ে ঢুকতো রান্নাঘরে।

এণাক্ষী বললে, ছিঃ ছিঃ! কী করে একথা বললে? একটু দয়া-মায়া নেই?

সৌরীন হেসে আর একটা সিগারেট ধরালো।

—ঘুঘুর মাংস খেতে খুব ভালো, এণা।

এণাক্ষী রাগ করে বললে, মানুষের মাংস আরো ভালো। তাই খেলেই পারো।

এণাক্ষীর গলার স্বরে পাখা ঝাপটে বুলবুলি আর একটু সরে বসল। কী একটা বুঝেছে যেন। তারপর আর একবার এদিকে ওদিকে তাকিয়ে নিয়ে বেশ নিশ্চিন্তভাবে ঘাড় ঘুরিয়ে পিঠের পালক খুঁটতে লাগল।

সৌরীন বললে, খেয়ে দেখতে আপত্তি ছিল না। আইনের একটু বাধা আছে কিনা।

এণাক্ষী বললে, আমাকে খেয়ো। আমি কাগজে লিখে রেখে যাব যে আমার ক্ষুধার্ত স্বামীর জন্যে স্বেচ্ছায় আমি রান্নাঘরের হাঁড়িতে ঢুকছি।

সৌরীন শব্দ করে হাসল: তাতে ছাড়বে বলে মনে হয় না। দিনকাল খারাপ।

আরো চটে গিয়ে খুব একটা কড়া কথা বলতে যাচ্ছিল এণাক্ষী, কিন্তু ঠিক সেই সময় বুড়ো মাঝি বললে, মালঞ্চের বোট্-নাও আইল্ছে একখান।

—মালঞ্চের বোট-নৌকো? কোথায়?

বলেই দেখতে পেলো সৌরীন। বাঁদিকে—অনেকখানি দূরে। চারদিকের এই সমুদ্র-তরঙ্গিত জলের মধ্যে একটুখানি উঁচু ডাঙা মাথা তুলে রয়েছে দ্বীপের মতো। সেই দ্বীপের ওপর একখানা চালা। আর তারই পাশে একখানা সাদা বোট দাঁড়িয়ে—একটা প্রকাণ্ড রাজহাঁস যেন। ডাঙায় গুটিতিনেক মানুষ রয়েছে। একজনের সাদা সাহেবী পোশাক—মাথায় একটা টুপিও।

সৌরীন আশ্চর্য হয়ে বললে, কারা ওরা?

—ছোট তরফের প্রভাসবাবু বুলে মনে হল্ছে।

—প্রভাস? এত বড় হয়েছে? সৌরীন বিস্মিত গলায় বললে, কয়েক বছর আগেও তো হাফ-প্যান্ট পরত বলে মনে পড়ছে। তা প্রভাস কী করছে ওখানে বোট নিয়ে?

—পাগলা লোক বাবু—ওর খেয়ালের কিছু ঠিকানা নাই।

সৌরীন তাকিয়ে ছিল সেদিকেই। বললে, মাঝি চলো তো ওদিকে। একবার বাড়ীর খবর নিয়ে যাই।

এণাক্ষীও দেখেছিল এতক্ষণে। জিজ্ঞাসা করলে, কে প্রভাসবাবু?

—আমাদের জ্ঞাতি—আর এক শরিক। সৌরীন বললে, ভালোই হয়েছে। পথে দেখা হল, খবরটা নিয়ে যাই একবার।

বাঁদিকে আধ মাইল এগিয়ে নৌকো যখন চালাঘরটার কাছাকাছি পৌঁছুল—তখন

দেখা গেল, মাঝির অনুমানই ঠিক। সাদা স্যুট পরা যে লোকটি কৌতূহলী চোখে এই নৌকাখানাকে দেখছে সে প্রভাসই হওয়া সম্ভব। অন্তত চেহারার আদলটা সেই রকম।

সৌরীন উঠে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু সে কিছু বলবার আগেই স্যুট পরা লোকটিই চেঁচিয়ে উঠল: আরে, সৌরীনদা নয়?

সৌরীন উৎসাহিত হয়ে সাড়া দিলে: তুই প্রভাস না?

—নিঃসন্দেহে। সেই আদি অকৃত্রিম প্রভাস—যার কান দুটোর ওপর বরাবরই তোমার একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল। বিশ-বাইশ বছরের সেই ফুটফুটে ছেলেটি হেসে উঠল: ঠিক চিনেছ। কিন্তু তোমার কী খবর সৌরীনদা? এই সাত বছর পরে বুঝি দেশের কথা মনে পড়ল?

—মনে পড়িয়েছে টাইফয়েড—সৌরীন হাসল: তিন মাসের ছুটি নিয়ে এসেছি। তারপর মালঞ্চের সব খবর কী? সবাই ভালো? কাকিমা কেমন আছেন? তুই কী করছিস এখানে?

প্রভাস বললে, দাঁড়াও দাঁড়াও। একগাদা প্রশ্ন করছ, যেতে যেতে কি সব কথার জবাব দেওয়া যায়? এখানে বরং দাঁড়িয়ে যাও দশ মিনিট। আমার চা আর ডিমসেদ্ধ রেডি—খেয়ে যাও, খবর-টবর সব নিয়ে যাও। সঙ্গে বৌদিকেও দেখছি—দুজনকেই নিমন্ত্রণ করলাম। নেমে এসো সৌরীনদা—

সৌরীন বললে, চা আর ডিমসেদ্ধ? প্রস্তাব মন্দ নয়। এণা?

এণাক্ষীর আপত্তি ছিল না। চায়ের তেষ্টাটা অনেকক্ষণের—স্টেশন মাস্টারের আহ্বানেও তখন তার যথেষ্ট উৎসাহই ছিল। এণাক্ষী বললে, বেশ তো!

মাঝিকে বলবার দরকার ছিল না—সে এর মধ্যেই নৌকো ভিড়িয়েছে বোটের পাশে। রোমাঞ্চিত হয়ে এণাক্ষী শুনল স্টোভের শাঁ শাঁ শব্দ উঠছে বোটের ভেতর থেকে।

প্রভাস এগিয়ে এল। সুদর্শন বলিষ্ঠ ছেলেটি—চমৎকার মানিয়েছে সাদা পোশাকে। ঝকঝকে দাঁতের একরাশ উজ্জ্বল হাসি ছড়িয়ে বললে, আসুন বৌদি—নেমে আসুন। আমার কাছে লজ্জা পাওয়ার মতো যে কিছু নেই, সেটা পরিচয় হলেই বুঝতে পারবেন।

নামবার জন্যে পা বাড়ালো এণাক্ষী। মাটি। পুরোনো, পরিচিত, জীবনের নির্ভর। শুধু একটা জিনিসই বুঝতে পারল না। সব মাটিকেই বিশ্বাস করা যায় না। কোনোটা পেছল, কোথাও চোরাবালি, কখনো সরীসৃপ।

আপাততঃ প্রভাস বললে, এইদিক দিয়ে নামুন বৌদি—পা রাখুন এখানে—

॥ তিন ॥

অথৈ সমুদ্রের মাঝখানে একটুকরো দ্বীপ। সমুদ্র ছাড়া কী আর। যতদূর দেখতে পাও ঘোলাটে নীল জলের কূল নেই—কিনারা নেই। জলদানবের মাথার মতো দূরে দূরে দু-একটা হিজল-বাবলার ঝোপ—বানভাসি কেউটের আশ্রয়। মলিন বিবর্ণ রাশি রাশি ফেনা নিয়ে জল এসে আছড়ে পড়ছে এই ছোট ডাঙাটুকুর চারপাশে।

প্রভাসের অনুষ্ঠানের ত্রুটি ছিল না। সতরঞ্চি বিছিয়ে বসবার আয়োজন করে রেখেছে। একটা সসপ্যানে প্রায় ডজনখানেক ডিমসেদ্ধ। স্টোভে চায়ের জল ফুটছে। কলা রয়েছে গোটাকতক। আর একদিকে পড়ে আছে একটা দো-নলা বন্দুক, টোটার মালা। সঙ্গে মাঝিরা ছাড়াও দুজন লোক—একটি চাকর, আর একজন কর্মচারী।

আরাম করে সতরঞ্চির ওপরে হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে সৌরীন বললে, ব্যাপার কিরে? এত সমারোহ করে চলেছিস কোথায়?

স্টোভে সশব্দে গোটাকয়েক পাম্প করে প্রভাস বললে, কুমীর শিকার করতে বেরিয়েছি সৌরীনদা।

এণাক্ষী বললে, কুমীর?

প্রভাস হাসল: অনেক আছে। যেখানে আমরা বসে আছি, একটু আগে এখানেই শুয়েছিল একটা।

—বলেন কি!

—আমার বোট দেখে পালালো। তবে কাছাকাছিই আছে।

এণাক্ষী আঁতকে খানিকটা সরে এল, বসল সৌরীনের গা ঘেঁষে।

—মানুষ খায়?

—কেউ কেউ খায় বইকি। তবে সবাই নয়। বেঁশেলই বেশি। তারা মাছ খায়।

—এখানে যেটা ছিল?

প্রভাস কৌতুকভরা চোখ এণাক্ষীর মুখের ওপর মেলে দিয়ে বললে, দূর থেকে ভালো দেখতে পাইনি। তবে ম্যান-ইটার হওয়া অসম্ভব নয়। আর তা যদি হয়, তাহলে কাছাকাছিই ঘুরছে।

সৌরীন বললে, ঠিক। এতগুলো মানুষের গন্ধ যখন পেয়েছে, তখন কি আর সহজে নড়বে?

এণাক্ষী একটা চাপা আর্তনাদ করল।

প্রভাস হেসে উঠল হা-হা করে।

—কেন মিথ্যে বৌদিকে ভয় দেখাচ্ছ, সৌরীনদা? তোমার কোনো ভাবনা নেই বৌদি। আমার এই দো-নলা বন্দুকটা দেখছ তো? টোটাও আছে গোটা পঞ্চাশেক। তাছাড়া সৌরীনদা জানে—আমার হাতের টিপ খুব খারাপ নয়। ছেলেবেলায় যতবার গুলতি ছুঁড়েছি—পণ্ডিত মশাইয়ের টাক থেকে গাছের বুলবুলি পর্যন্ত, তার একটাও কখনো ফসকায় নি।

এবার সৌরীনও হাসিতে যোগ দিলে। চাকরটা ডিম ছাড়াচ্ছিল—সে-ও মুখ ফিরিয়ে হাসল একটুখানি।

এণাক্ষী হাসতে পারল না। ভয়ে ভরা দু' চোখ মেলে দেখতে লাগল জলটাকে। ঘোলাটে নীল জল একটানা গর্জনে অবিশ্রাম ঢেউ ভাঙছিল।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেমন ঘোর লাগে—হঠাৎ মনে হয়: ওই অফুরন্ত দোলা লাগা জলের সঙ্গে সব দুলছে—আকাশ দুলছে—মেঘগুলো পর্যন্ত দুলে দুলে উঠছে ঢেউয়ে ঢেউয়ে। আর এই যে শক্ত মাটিটা—যার ওপরে ওরা আপাতত আশ্রয় নিয়েছে—একেও বিশ্বাস নেই বেশিক্ষণ। এ যেন সিন্দবাদের গল্পে শোনা একটা বিরাট তিমি

মাছ—নিথর হয়ে ঘুমিয়ে আছে কিছুক্ষণের জন্যে ; বলা যায় না—হঠাৎ কখন জেগে উঠবে ঘুম থেকে—তারপরই একটা বিরাট দোলা দিয়ে ডুব যাবে অথৈ জলের আড়ালে।

প্রসঙ্গটা বদলাতে পারলে ভালো হয়।

এণাক্ষী শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করলে, এ চালাটা কিসের ঠাকুরপো ?

—গোয়ালাদের বাথান ছিল মনে হয়। জল আসবার আগে সরে গেছে আর কোথাও।

এণাক্ষী বললে, এখানে কি মানুষের স্থায়ীভাবে থাকবারও জো নেই নাকি ?

সৌরীন সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললে, এ ভারী আশ্চর্য মাটি এণা। এখানে মানুষ আর প্রকৃতি পাঞ্জা লড়ছে সারা বছর। পুরো দখল কেউ পায় নি। প্রায় চার মাস চলবে জলের রাজত্ব। ভয় আর মৃত্যু, আতঙ্ক আর অনিশ্চয়। তারপরে জল নেমে যাবে—মাটি আবার মাথা তুলবে—এই জলের সাগর হয়ে যাবে ঘাসের সমুদ্র। সে ঘাস ঘন সবুজ—মানুষের মাথা ছাপিয়ে উঠবে। তার ভেতরে চরে বেড়াবে দলে দলে মোষ আর গরু। তাজা কচি ঘাস খেয়ে নধর নিটোল হয়ে উঠবে তাদের শরীর—ক্ষীরের মতো দুধে ভরে উঠবে পালান। বসতি বসবে এখানে-ওখানে, আগুন জ্বলবে, গান শোনা যাবে। আর যতদিন এই জলের পালা চলবে, ততদিন এখানে প্রাণ নেই—আলো নেই—জীবন নেই, কিছুই নেই। বানভাসি কেউটে আর কুমীর এড়িয়ে অন্ধকারে মানুষ দাঁড় টেনে চলবে। কখনো যদি একটুখানি জোরালো হাওয়া দেয়—ভয়ে ছমছম করে উঠবে মাঝির বুক।

মানুষ আর প্রকৃতি। অনিচ্ছাসত্ত্বেও এণাক্ষীর চোখ আবার ঘুরে গেল জলের দিকে। অনেককালের ইতিহাস—সেই আদিম কাহিনী। মানুষের জন্যে পৃথিবী কোথাও এতটুকু নির্বিঘ্ন আশ্রয়ের দরজা খুলে রাখেনি। পায়ে পায়ে মৃত্যুকে ছড়িয়ে রেখেছে—মাথার ওপর ভ্রূকুটি করেছে মহুম্ভয়-সমুদ্যত বজ্রবাহী আকাশ। প্রত্যেক ইঞ্চি জমি মানুষকে অধিকার করতে হয়েছে অনেক রক্ত আর অনেক শ্রমের বিনিময়ে। পৃথিবীর যাদুঘরে এই মাটিটুকু যেন সেই ইতিহাসেরই স্মৃতিচিহ্ন। আদিম রণভূমির একটুকরো সংরক্ষিত অঞ্চল।

প্রভাসের গলার স্বরে চমকে উঠল এণাক্ষী।

—চা নাও বৌদি।

একটা জিনিস এণাক্ষীর খেয়াল হল এতক্ষণে। এই দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যেই প্রভাস সম্পর্কটাকে 'আপনি' ছেড়ে 'তুমি'তে নামিয়েছে।

—ছিঃ ছিঃ. চা-টা কিন্তু আমারই করে দেওয়া উচিত ছিল। চায়ের পেয়ালা টেনে নিয়ে এণাক্ষী সসংকোচে বললে।

প্রভাস জবাব দিলে, সে সুযোগ তোমার পালাচ্ছে না বৌদি। মালঞ্চে ফিরে গিয়ে তোমাকে অনেক চা করে খাওয়াতে হবে। ভালো কথা সৌরীনদা—দেশে থাকছ তো কিছুদিন ?

—ইচ্ছে তো আছে। তিন মাসের ছুটি নিয়েছি।

—গুড্ গুড্! প্রভাস উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল : দেশের ছেলে দিনকয়েক দেশেই থাকো। কী যে পড়ে আছো কলকাতার টানে—আমি গিয়ে তো সাতদিনেই হাঁপিয়ে

উঠি। গোটাকয়েক নতুন ফিল্ম দেখা, দুদিন থিয়েটার দেখা—কিছু কেনাকাটা—ব্যাস্, ফুরিয়ে গেল কলকাতা। বাপরে—দম আটকে যায় যেন!

সৌরীন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল: কী আর করব? পেটের জন্যেই পড়ে থাকতে হয়!

—পেটটাকে কত বাড়াবে আর? দেশের জমি-জমা নিয়ে পড়ে থাকলে তোমার অন্ন জুটবে না—এই কথাটাই বলতে চাও?

সৌরীন জবাব দিল না। কী একটা মনে পড়ে গেল হঠাৎ। মুহূর্তের মধ্যে বিষণ্ণ হয়ে উঠল মুখ।

আর তৎক্ষণাৎ বোধ হয় সৌরীনের মনের কথাটা অনুমান করল প্রভাস। তরল গলায় বললে, বাই দি বাই সৌরীনদা—একটা ভালো খবর দিই তোমাকে। সেই মামলাটায় জিতেছ তোমরা। খবর পাওনি?

সৌরীন সন্দিগ্ধভাবে প্রভাসের মুখের দিকে তাকালো—যেন বুঝতে চেষ্টা করল ওকে। শুকনো গলায় বললে, ওসব জিনিস জানবার দায়িত্ব কাকার—তিনিই জানেন। আমার ওতে কৌতূহল নেই।

স্মিত হাসিতে প্রভাস বললে, যা বলেছ। আমিও তোমারই দলের। তোমাদের সঙ্গে মামলায় হেরে গিয়ে আমার বাবা—মানে সেই ওল্ড্ ম্যান খুব মুষড়ে পড়েছে। বাতের ব্যথাটা জোর বেড়েছে।

সৌরীন তবু স্বাভাবিক হতে পারল না। হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়ার একটা আকস্মিক উচ্ছ্বাসে, নিজের জল-মাটিকে আবার ফিরে পাওয়ার খানিকটা আবেগের মধ্যে একটা অত্যন্ত কুৎসিত সত্যকে সে ভুলে ছিল এতক্ষণ। আজ দশ বছর ধরে কতগুলো জমিজমা নিয়ে তাদের একটানা বিরোধ চলে আসছে প্রভাসের বাবা যদুপতি রায়ের সঙ্গে। শেষ এই বড় মামলাটা আর্থিক দিক দিয়ে যে খুব বড় ছিল তা নয়—এর সঙ্গে মান-সম্মানের প্রশ্নটাই বেশি করে জড়িয়ে ছিল। এমন কি যদুপতি বলেছিলেন, এ মামলায় জিততে না পারি—তাহলে প্রজাদের কাছে আর আমার মাথা তুলে দাঁড়াবার জো থাকবে না—বিষয়-সম্পত্তি সব বেচে দিয়ে আমাকে বৃন্দাবনে চলে যেতে হবে।

আর একবার জিজ্ঞাসু সন্দিগ্ধ দৃষ্টি প্রভাসের মুখের ওপর ফেলল সৌরীন। মৃদু গলায় বললে, ছি ছি, ভারী বিশ্রী হল ব্যাপারটা!

প্রভাস বললে, বিশ্রী আবার কী? আরে গাঁয়ের এসব ওল্ড্ ম্যানের মামলা-মোকর্দমা ছাড়া আর কী ডাইভারশান থাকতে পারে বলো! একটা কোনো উত্তেজনা তো এদের চাই-ই। আর হার-জিতের কথা বলছ? মামলায় এক পক্ষকে হারতেই হবে। জানো, আমি গিয়ে তোমার কাকাকে অভিনন্দন জানিয়ে এলাম। তিনি অবশ্য আমার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন। এমন বেরসিক যে আমাকে মিষ্টিমুখ করালেন না পর্যন্ত!

এণাক্ষী কিছুই বুঝল না, তবে এটুকু অনুমান করল, কোথাও একটা চাপা অস্বস্তির স্রোত বইছে সৌরীনের মনের ভেতর। আর প্রভাস সেটাকে যথাসাধ্য লঘু করবার চেষ্টা করছে। কিছু না বুঝেও এণাক্ষী প্রভাসের ওপর কৃতজ্ঞতা বোধ করল খানিকটা।

প্রভাস আবার বললে, সে ক্ষতিপূরণ করবে বৌদি—মালঞ্চে গিয়ে খুব ভালো করে রেঁধে খাওয়াবে। আর আশা আছে, কাকা সেদিন বড় পুকুরে জাল ফেলে আমার

অনারে একটা বিশ-সেরী রুইমাছ ধরাবেন।

সৌরীন জোর করে হাসতে লাগল: হ্যাঁ, তা ধরাবেন। তারপর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, আমাদের এবার নৌকায় ওঠা দরকার, প্রভাস। নইলে পেঁছুতে রাত হয়ে যাবে।

প্রভাস বললে, পালে হাওয়া দিচ্ছে দাদা—কোনো ভাবনা নেই। তিন ঘণ্টায় চলে যাবে।

—তা হোক। একটু তাড়াতাড়ি করাই ভালো।

প্রভাস এবার একটা কিছু বুঝল। সৌরীনের মনের সুর কেটে গেছে। জোর করে আরো খানিকটা ধরে রাখা যায় বটে, কিন্তু আলাপটা আর জমবে না।

প্রভাস চকিত হয়ে বললে, আরে এই যা! কথায় কথায় শুধু চা-ই খাওয়া হল, ডিম-কলাগুলো সব পড়ে রইল যে!

সৌরীন বললে, ও তোরাই খা। আমরা খেয়েই নেমেছি। খিদে নেই।

—ভুলে যাচ্ছ সৌরীনদা—সামনে এখনো আরো তিন ঘণ্টা রাস্তা। জলের হাওয়ায় দেখতে দেখতে পেট আর্তনাদ করে উঠবে। ছাড়ব না—খেতেই হবে। বৌদি—

—আমি ডিম খেতে পারিনে ভাই, আঁশটে গন্ধ লাগে।

—কলকাতার ফ্যাশান? উঃ! প্রভাস দীর্ঘশ্বাস ফেলল: খালি পুঁইডাঁটা, কুচো চিংড়ি আর পোনামাছ! তাহলে দুটো কলা—

নাছোড়বান্দা ছেলে, খেতেই হল সৌরীনকে। কোনোমতে একটা খেতে হল এণাক্ষীকেও। ছায়া নেমেছে মনের ওপর—আগেকার মতো আর স্বাভাবিক হওয়া যাচ্ছে না কিছুতেই।

—এণা, ওঠা যাক এবার—

শাড়ীটা আঁট হয়ে বসেছে কোমরে—একটু ঠিক করে নেবার দরকার ছিল—এণাক্ষী উঠল, আস্তে আস্তে এগিয়ে গেছ চালাঘরটার ভেতরে।

তিনদিকে খড়ের বেড়ার সামান্য আড়াল আছে—মাথার ওপরে চালাটাও ফাঁকা হয়ে এসেছে আট আনা। নিচে খানিকটা স্যাঁতসেঁতে কালো মাটি। এণাক্ষী ঘরটার এক কোণায় সরে এল।

আর তৎক্ষণাৎ কালো মাটির ভেতর থেকে আরো কালো কী একটা লাফিয়ে উঠলো স্প্রীঙের মতো। বাতাসে যেন শব্দ করে একটা চাবুক বসিয়ে দিলে কেউ।

এণাক্ষীর তীব্র তীক্ষ্ন চিৎকার বেরিয়ে এল গলা ফাটিয়ে।

সবচেয়ে আগে এল প্রভাসই। ততক্ষণে এণাক্ষীর পাথর হয়ে যাওয়া নিশ্চল পা দুটো থেকে মাত্র আড়াই হাত দূরে প্রকাণ্ড গোখরোটার ফণা অল্প অল্প দুলছে। সরতেও পারছে না—নড়তেও পারছে না এণাক্ষী, কেবল স্থির দৃষ্টিতে দুটো শীতল নিষ্ঠুর চোখের দিক তাকিয়ে আছে একভাবে।

দুম্ দুম্! একসঙ্গে দুটো ট্রিগারই টেনে দিয়েছে প্রভাস। প্রচণ্ড শব্দে থর্ থর্ করে কেঁপে উঠল এণাক্ষী, ধোঁয়ায় আর বারুদের গন্ধে ভরে গেল চালাটা—পেছনের পচা খড়গুলোকে আরো অনেকখানি উড়িয়ে দিয়ে বুলেট দুটো ছুটে গেল বাইরে। আর ছিন্নমুণ্ড সাপটা মোটা একটা গুলঞ্চের লতার মতো এণাক্ষীর পা ছুঁয়ে লুটিয়ে

পড়ল মাটিতে।

সৌরীন যেন তখনো নিঃশ্বাস ফেলতে পারছিল না।

স্তব্ধতা ভাঙলো প্রভাসের হাসির শব্দে।

—দেখলেন তো বৌদি হাতের টিপ? একটা কথাও বাড়িয়ে বলিনি!

॥ চার ॥

বিশাল সমুদ্রের মতো 'চাফালে'র বিচিত্রবর্ণ জল রঙ বদলালো কতবার। দুপুরে ক্ষুরের মতো রোদ পড়ন্ত বিকেলে ক্রমে সোনা হল, একরাশ রক্ত মাখল তারপর, তারপরে ধূপছায়া আঁচল দুলিয়ে দিলে, তারও পরে কালি-গোলা কালো হয়ে গেল। অদ্ভুত ভয়ঙ্কর অন্ধকারে জল আর ঘাসের গন্ধের ঘূর্ণির মধ্যে এণাক্ষী নিজের ভেতরে মন ডুবিয়ে বসে রইল। মাত্র আধ হাত দূরে বসে থাকা সৌরীন পর্যন্ত বহুদূরে হারিয়ে গেল যেন—যেন মিলিয়ে রইল এমনি নিথর কালো একটা সমুদ্রেরও ওপারে।

সেই গোখরো সাপটার কথা ভাবছিল এণাক্ষী। ছিন্ন গুল্মের লতার মতো পড়ে আছে পায়ের কাছে—কয়েকটা হিমশীতল রক্তের কণা এসে ছড়িয়ে পড়েছে তার পায়ের পাতার ওপর—কয়েক বিন্দু রক্তচন্দন যেন। এণাক্ষীর এখনো মনে হচ্ছে যেন সেই রক্তকণাগুলোতে জ্বালা করছে—সাপের রক্তেও কি বিষ থাকে?

এই জল একটা বিভীষিকা। কিন্তু মাটি? সব মাটিকেই কি বিশ্বাস করা যায়? কোথা থেকে একটা গোখরো এসে হিংস্র ফণা তুলে দাঁড়ায়—কালো শিখার মতো দুলতে থাকে আদিম হিংসায়। কিন্তু সব সময় কি প্রভাসকে পাওয়া যাবে কাছে? সব হিংসার কাছ থেকেই কি তাকে বাঁচাতে পারবে প্রভাস?

অনেকক্ষণ স্তব্ধতার জালটা কেটে দিলে সৌরীনের গলার স্বর। কেমন আকস্মিক মনে হল এণাক্ষীর। অপ্রত্যাশিত কোনো শারীরিক স্পর্শের মতো সৌরীনের কথাটা চমকে দিলে এণাক্ষীকে।

—খাল এল, না?

—জী হাঁ।

খাল? এণাক্ষী তাকিয়ে দেখল। তাই বটে। অন্ধকারেও বোঝা যাচ্ছে সীমানাহীন সমুদ্রের বিস্তার নেই আর। কয়েক হাত দূরেই একপাশে চলেছে খাড়া পাড়ি—তার ওপরে প্রহরীর মতো কালো কালো গাছের সার। আর একদিকে বেতবনের মতো কিসের ঝোপ। জল এখন আর হাত-ত্রিশেকের বেশি চওড়া নয়। কিন্তু এই ছোট খাঁড়ির মধ্যে দিয়ে সে জল তীরধারায় ছুটেছে—একটা উগ্র গর্জন উঠেছে তা থেকে।

—আর দেরি নেই এণা, এসে গেলাম।

আবার সৌরীনের গলার স্বর: এসে গেলাম! কেমন অদ্ভুত লাগল এণাক্ষীর। যে জলের কোনো শেষ নেই ভেবেছিল, হঠাৎ যেন ফুরিয়ে গেল সেটা। এর জন্যে মন তৈরি ছিল না।

ছপাৎ!

কী একটা জল থেকে লাফিয়ে নৌকোর গলুইয়ে পড়ল। আবার ছপাৎ! আরো একটা। এণাক্ষীর পায়ের পাশ দিয়ে টুপ করে নৌকার পাটাতনের নিচে খালের জলে পড়ে গেল।

আতঙ্কে শিঁটিয়ে গিয়ে এণাক্ষী আর্তনাদ করে উঠল: সাপ—সাপ!

—সাপ? কোথায় সাপ? সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে প্রতিধ্বনি করল সৌরীন। কিন্তু বুড়ো মাঝি এতক্ষণ পরে প্রাণখোলা গলায় হেসে উঠল হা-হা করে।

—সাপ নয় মা, মাছ!

—মাছ!

বুড়ো বললে, হ্যাঁ মা, মাছ। খালে খুব মাছ হলুছে এখন। যে জল দেখছেন—ই তো জল নয়, মাছের সোঁতা। জলে হাত ডুবাই দিলেও মাছ ঠেকিবে। সিগিলাই মধ্যে মাঝে লাফাই উঠিছে নৌকায়।

সৌরীন লজ্জিত হয়েছিল। বললে, তাই বটে। এসময় এদিকে খুব মাছ হয়, এণা। ট্যাংরা, ন্যাদস, বেলে, কালবোস। দু পয়সায় পাঁচ সের ছোট মাছ পাওয়া যাবে—তাও কিনে খাবে না লোকে। ফেলে দেবে।

ছপাৎ! আবার জল থেকে লাফ পড়ল নৌকায়। এবার সত্যিই এণাক্ষী দেখতে পেল, মাছই বটে। পাটাতনের ওপর রুপোর মতো চিকচিকে একটা আঙুল-চারেক মাছ লাফালাফি করছে।

—বাঃ, কী চমৎকার! থাবা দিয়ে এণাক্ষী মাছটাকে ধরতে গেল—কিন্তু ধরে রাখতে পারল না। হাত থেকে পিছলে সেটা টুপ করে খালের জলের মধ্যে পড়ে গেল।

বুড়ো মাঝি জানাল, মাছ কত খাবেন মা? কালকে একটা চাকরকে জাল নিয়ে খালে পাঠিয়ে দেবেন—আধ ঘণ্টায় এক মণ চুনোমাছ নিয়ে যাবে ধরে। আর ক'দিন পরে কষ্ট করে জাল দিয়ে ধরতেও হবে না। শুধু খাল দিয়ে নৌকো বেয়ে গেলেই চলবে—পাঁচ-সাত সের মাছ আপনি জমে যাবে নৌকোতে।

অপরিমিত খুশিতে সৌরীন বললে, এই মাছ খাওয়ার জন্যেই তো দেশে এলাম, এণা! এখানে দু'মাস থাকব—তারপরেই দেখবে শরীর একেবারে লাল হয়ে গেছে আমার। মাছ খেয়ে তুমিও মুটিয়ে যাবে। সাধে কি আর ডি. এল. রায় লিখেছেন: 'সকল দেশের সেরা সে যে আমার জন্মভূমি?'

এণাক্ষী বললে, আমি মাছ ধরা দেখব।

সৌরীন প্রসন্ন স্বরে বললে, নিশ্চয় নিশ্চয়। কালই আমরা নৌকো নিয়ে মাছ ধরতে আসব। আমরা জাল ফেলব, তুমি ইচ্ছে করলে হাত দিয়েই ধরতে পারবে।

—কী মজা! আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠতে ইচ্ছে করল এণাক্ষীর।

—বাবু, রায়বাড়ির ঘাট আইলুছে। বুড়ো মাঝি চকিতভাবে ঘোষণা করল।

এণাক্ষী চকিত হয়ে জল থেকে চোখ তুলল। নৌকো এসে বাঁধা ঘাটে ভিড়েছে একটা। কয়েকটা সিঁড়ি দুপাশের গাছের ছায়ার মধ্য দিয়ে উঠে গেছে ওপরে—আর তার ডানদিকে কালো একটা প্রকাণ্ড মন্দির ভুতুড়ে মূর্তি ধরে দাঁড়িয়ে। অনেক পেছনে বাগানের ভেতরে মিটমিট করছে আলো—রায়বাড়ি।

এণাক্ষী শঙ্কিত অনিশ্চিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। একটা অপরিচিত ভৌতিক জগতে এসে পড়েছে যেন। এই ঘাট, দু'ধারে অসাবৃত গাছের ছায়া, ভুতুড়ে চেহারার এই মন্দির, দূরে অচেনা বাড়ির অস্ফুট আলো—সব মিলিয়ে তার শরীর ছমছম করতে লাগল।

সৌরীন উচ্ছ্বসিত গলায় বললে, নামো এণা—নেমে পড়ো। নৌকোর ছইয়ের গায়ে কালিপড়া যে অপরিচ্ছন্ন লণ্ঠনটা জ্বলছিল, বুড়ো মাঝি সেটা খোলবার উপক্রম করতে সৌরীন বললে, থাক বাপু, তোমার লণ্ঠনে আর দরকার নেই। ওতে করে যতটা পথ দেখাবে, হোঁচট খাওয়াবে তার চাইতে আরো অনেক বেশি। আমার সঙ্গে টর্চ আছে।

হাতব্যাগ থেকে টর্চ বের করে সৌরীন ঘাটলার ওপরে তার আলো ফেলল।

শ্যাওলা ধরা পুরোনো ঘাট। অসংখ্য ফাটল তাতে।

সৌরীন বললে, নামো এণা।

—একটু দাঁড়ান বাবু।

বুড়ো মাঝি নামল আগে। ঘাটের পাশে কাদার মধ্যে লগি পুঁতে দিয়ে শক্ত করে কাছি বাঁধল তাতে। তার পরে বললে, মা, নামি আইসেন এবার।

সৌরীন নেমে পড়েছিল। হাত বাড়িয়ে এণাক্ষীকে টেনে নিলে ওপরে। বুড়োকে বললে, তোমরা জিনিসপত্রগুলো সব নিয়ে এসো—আমরা এগোচ্ছি।

ঘাট বেয়ে দু'জনে উঠে এল পথের ওপর। স্যাঁতসেঁতে ভিজে মাটির ওপরে সৌরীনের টর্চের আলোটা চকচক করে উঠল। তারপরে সৌরীন আলো ফেলল মন্দিরটার গায়ে।

শিবমন্দিরই বটে। তবে অনেককালের পুরোনো। রন্ধ্রে রন্ধ্রে তার চারাগাছ জন্মেছে। বহুদিন চুন-বালির ছোঁয়া পড়েনি—নোনাধরা ইঁটের রাশি নোংরা দাঁতের মতো হাসছে। ভেতরে মস্ত একটা শিবলিঙ্গ—মসৃণ কষ্টিপাথরে গড়া, তার ওপরে পেতলের চন্দ্রলেখা টর্চের আলোয় চন্দ্রচূড়ের তৃতীয় চোখের মতো ঝকঝক করে উঠল।

সৌরীন দাঁড়িয়ে পড়েছিল। বলল, এ মন্দির আমাদেরই, এণা। এর একটা ইতিহাস আছে।

—ইতিহাস ?

—হ্যাঁ। আমার প্রপিতামহী নাকি এখানে সতী হয়েছিলেন—সে সিপাহী বিদ্রোহের আমলে। সে এক আশ্চর্য থ্রিলিং গল্প! পরে বলবো তোমাকে।

টর্চের আলোয় নোনাধরা ইঁটগুলো আবার বীভৎস ভাবে হেসে উঠল, নিকষ-কালো শিবলিঙ্গের চন্দ্রলেখা আবার ঝকমক করে উঠল সুতীক্ষ্ণ দীপ্তিতে। এণাক্ষী রোমাঞ্চিত হল—বুকের ভেতরে একটা ভয়ের ধাক্কা লাগল এসে।

সৌরীন বললে, চলো যাই।

দু'পাশে আমের বন—মাঝখান দিয়ে ভিজে ভিজে মাটির পথ। একটু এগিয়েই রান্নাবাড়ি। সামনে উঠোনের মধ্যে বিরাট চণ্ডীমণ্ডপ—তার সামনে খুঁটির গায়ে একটা লণ্ঠন দুলছে। এই আলোটাই ওরা ঘাট থেকে দেখতে পেয়েছিল।

ওরা উঠোনের মধ্যে পা দিতেই তারস্বরে কুকুর ডেকে উঠল।

সৌরীন বললে, চুপ কর্—আমরা!

মুখে টর্চের আলো পড়ায় লালরঙের একটা বিশাল কুকুর দু'পা পিছিয়ে গেল, তারপরে আবার প্রাণপণে আর্তনাদ আরম্ভ করে দিলে।

আর তখন দোতলার জানলা থেকে একটা বজ্রগম্ভীর স্বর ভেসে এল: কে—কারা ওখানে?

চমকে সৌরীনের হাত চেপে ধরলে এণাক্ষী। সৌরীন সাড়া দিয়ে বললে, কাকা—আমি।

—ওঃ, সৌরীন! দোতলার জানলায় এবারে কালপুরুষের মতো এক বিশাল ছায়ামূর্তি দেখা গেল: সঙ্গে কে—বৌমা নাকি? কী আশ্চর্য, আয়—আয়—

চারদিক কাঁপিয়ে আবার সেই বজ্রগম্ভীর স্বর ফেটে পড়ল: দাশু কোথায়—মাধব কই? শিগগির আলো ধর সব—ছোটবাবু আর বৌমা এসেছে যে!

চণ্ডীমণ্ডপের পরেই প্রাচীর—তার গায়ে রায়বাড়ির সদর দরজা। সর্বাঙ্গে লোহা বসানো সেই বিরাট দরজা খুলে গেল—কব্জার একটা কর্কশ তীক্ষ্ন শব্দ ছড়িয়ে পড়ল অন্ধকারে।

রায়বাড়ি অভ্যর্থনা জানালো এণাক্ষীকে। আহ্বান জানালো তার অনিশ্চিত বিশাল গহ্বরে—যার ভেতরে ঢুকতে সহজে পা উঠতে চাইল না এণাক্ষীর।

॥ পাঁচ ॥

রাতের অন্ধকারে বাড়ীটাকে অমন বীভৎস ভয়ংকর লেগেছিল, যার বড় বড় ঘরগুলো ভুতুড়ে ছায়া নিয়ে জমাট বেঁধে ভয় দেখাচ্ছিল এণাক্ষীকে, লণ্ঠনের আলোয় যাদের দেওয়ালগুলো শেওলার রেখায় রেখায় ভ্রূকুটি করছিল—দিনের বেলা তাদের কিরকম দেখাবে, সারাটা রাত হয়তো ঘুমের ভেতরে সেই ভাবনাই চাপা অস্বস্তির মতো ঘুরপাক খেয়েছে তার মনে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে যেন শুনতে পেয়েছে জলের শব্দ—পূর্বে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে—রাশি রাশি জল তাকে ঘিরে ঘিরে কলধ্বনি তুলছে।

অতৃপ্ত ঘুমের অবসাদ নিয়ে এণাক্ষী চোখ মেলল। চোখের পাতা দুটো ভারী, গলাটা শুকিয়ে আছে, তেতো তেতো লাগছে মুখের ভেতরে। আর চোখ মেলতেই দেখল পাশের খোলা জানালা দিয়ে একরাশ আবীর এসে তার মশারিকে রাঙিয়ে দিয়েছে, রাঙিয়ে দিয়েছে সৌরীনের কোঁকড়া চুলগুলিকে, সৌরীনের গলার ওপরে রাখা তার একখানা হাতকে।

ভোরের এই নরম লাল আলো কলকাতার বাসায় কখনো দেখা দেয় না। সামনের চারতলা বাড়িটা তার পথ আটকায়। সেখানে রোদ আসে সৌরীনের চা খাওয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পর, অফিসের ভাত অর্ধেকটা ফুটে উঠলে, সেই তখন—তখন আর সূর্য ওঠার কোনো অর্থ থাকে না; কোনো আলাদা রূপ নয়, গন্ধ নয়, স্বাদ নয়, কিছুই নয়।

আর এখন এই যে হাওয়ায় কাঁপা মশারির গায়ে আবীরের রঙ ঢেউ তুলছে—এর

সঙ্গে মিলেছে বাইরের পাখির ডাক। একটা মৃদু মিষ্টি গন্ধ ভাসছে। তার কোনো নির্দিষ্ট নাম নেই, অথচ বেশ বোঝা যায় সেটা সকালের গন্ধ। সারাটা রাতের অস্বস্তি-ভরা ঘুমের কথা ভুলে গিয়ে এণাক্ষী নিজের হাত আর সৌরীনের চুলের ওপর লাল আলোর দোলাটা দেখতে লাগল কিছুক্ষণ। তারপর চেতনাটা সম্পূর্ণ স্বচ্ছ হয়ে গেলে মশারি তুলে নেমে এল বিছানা থেকে।

পাশেই মস্ত খোলা জানালা। এণাক্ষী এসে তার শিক ধরে দাঁড়ালো।

নিচে একটা ছোট বাগান। একসময়ে পরিপাটী ছিল, এখন আর বিশেষ কিছু শ্রী নেই তার। কয়েকটা গাছে অজস্র কলকে ফুল ফুটেছে, কিছু ঝুমকো আর পঞ্চমুখী জবা ফুটেছে এদিকে ওদিকে, একরাশ নয়নতারার ঝোপ হয়ে আছে, আর পেছনে উঁচু দেওয়ালটা বেয়ে বেয়ে উঠেছে লবঙ্গলতা আর অপরাজিতা। হলদে রঙের কলকে ফুলের ভেতর থেকে আরো হলদে একটা বউ কথা কও ল্যাজ দোলাচ্ছে। গোটাতিনেক টুনটুনি নাচছে দেওয়ালের ওপর—পঞ্চমুখী জবার ডালে একজোড়া বুলবুল অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে নিজেদের ভেতরে কী যেন আলোচনা করছে।

এণাক্ষী জানলায় এসে দাঁড়াতেই বউ কথা কও উড়ে পালালো—টুনটুনিরা নাচতে নাচতে চলে গেল দেওয়ালের একপাশে, কী খুঁটে খাওয়ার জন্যে বুলবুলিরা নিচে ঘাসের মধ্যে নেমে পড়ল। দু-চোখভরা প্রসন্ন পরিতৃপ্তি নিয়ে এণাক্ষী তাকিয়ে রইল।

বাগানের পরে প্রাচীর—তারপরে মাঠ। সেই মাঠের ওপারে সূর্য উঠছে। কিন্তু কোথায় উঠছে ?

এই দোতলার জানালা থেকে বহুদূর পর্যন্ত তার চোখে পড়ছিল। এতক্ষণে সে দেখতে পেলো তাদের মশারিতে যে লালের আভাটুকু পড়েছিল—মাঠের ওপারে কী অদ্ভুত রূপ হয়েছে তার! একটা রক্তের সমুদ্র দুলছে ওখানে আর তার ভেতর থেকে রক্তমাখা ছিন্নমুণ্ডের মতো সূর্য উঠে আসছে।

জল—কাল সারাদিন ধরে যে জল সে দেখেছিল, কালকে অস্বস্তিভরা ঘুমের মধ্যে যে জলতরঙ্গ সে শুনেছিল—সেই জল। এণাক্ষী বুঝতে পারল, মালঞ্চের রায়বাড়ির চারদিক ঘিরেই অন্তহীন জল জেগে আছে এখন। এই বিশাল জলের কোলের মধ্যে মালঞ্চও একটা দ্বীপ।

দ্বীপ—একটা দ্বীপ কালও সে দেখেছিল। তার সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ল খড়-ঝরে-যাওয়া চালাঘরটা। এণাক্ষীর সারাশরীর শিউরে উঠল। মোটা একটা গুলঞ্চের লতার মতো মুণ্ডহীন সাপটা মোচড় খাচ্ছে সামনে, কয়েক ফোঁটা ঠাণ্ডা রক্তচন্দনের ছিটের মতো এসে পড়েছে তার পায়ের ওপর সাপের রক্ত। যদি প্রভাস না থাকত—

এ-ও আর এক দ্বীপ। আরো বড়—আরো অচেনা। এণাক্ষী আবার চমকে উঠল ভয়ঙ্কর ভাবে। এখানেও কি ওইরকম সাপ আছে কোথাও? আকাশ-জোড়া একটা ফণা তুলে যদি সে সাপ তার সামনে এসে দাঁড়ায়—এখানে কে তাকে বাঁচাবে? সৌরীন ?

এণাক্ষী জোর করে হেসে উঠতে চেষ্টা করল। ছি ছি, এ কী হচ্ছে! একসময় সে কবিতা লিখত, সুযোগ বুঝে আজকে কি আবার তাকে কাব্যরোগে পেয়ে বসল নাকি?

—একা একা হাসছ যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে? ব্যাপার কী? সৌরীন কখন বিছানা

ছেড়েছে—এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে।

দূরের রক্ত-সমুদ্রে সোনার ঢেউ দুলছে এখন। ভয়ের লাল আবরণটা সরিয়ে সোনার পাতের মতো দেখা দিয়েছে সূর্য। তার পাশেই সৌরীন। না, ভাবনার কিছু নেই এণাক্ষীর। সৌরীনের একখানা হাত সে চেপে ধরল মুঠোর মধ্যে।

—কী হল? হাসছিলে কেন? ঘুমভাঙা জড়ানো গলায় জানতে চাইল সৌরীন।

—কিছু না—এমনিই।

—রাতে ভালো ঘুমিয়েছিলে কাল?

—এক রকম।

সৌরীন সস্নেহে এণাক্ষীর মুখের দিকে তাকালো: একটু ডিস্টার্বড্ ঘুম হয়েছে, না? নতুন জায়গা—সব অচেনা, প্রথম এক-আধদিন কিছু অসুবিধে হবেই। আমার পৈতৃক বাড়ি, নিজের শোওয়ার ঘর—তবু আমিই ভালো করে ঘুমুতে পারিনি।

—তাই নাকি? এণাক্ষী অল্প একটু হাসল: কিন্তু সেকথা তো আমার একবারও মনে হয়নি। সারারাত যে ভাবে তোমার নাক ডাকছিল, তাতে—

—নাক ডাকছিল? সৌরীন চিন্তিত হয়ে বলল, তা হতে পারে। মাঝে মাঝে আমারও সন্দেহ হচ্ছিল, ঘরের মধ্যে কি রকম যেন একটা আওয়াজ হচ্ছে—যেন ক'টা গোরুরগাড়ি যাচ্ছে বিছানার পাশ দিয়ে। তাহলে ওটা গোরুরগাড়ির শব্দ নয়—আমারই নাক ডাকছিল!

এণাক্ষী শব্দ করে হেসে উঠল। দূরে সোনার সমুদ্র দুলছে। সোনার গিল্টি লেগেছে অপরাজিতায়, লবঙ্গলতায়, ঝুমকো আর পঞ্চমুখী জবায়; ঘাসের ওপর বুলবুলি জোড়া সোনার ধারায় স্নান করছে। টুনটুনিরা উড়ে গেছে। ওর হাসির শব্দে বুলবুলিরা হঠাৎ চকিত হয়ে কলকে ফুলের ডালে এসে বসল।

ঠিক এমনি সময় বাইরে থেকে মেঘমন্দ্র গলা সোনা গেল: সৌরীন, উঠেছ?

কাকার গলা। কাল রাতের অন্ধকারে কয়েকবার যে দীর্ঘদেহ মানুষটিকে দেখেছিল এণাক্ষী—যার প্রকাণ্ড শরীরটাকে মনে হয়েছিল এ বাড়ীর পুঞ্জ পুঞ্জ ছায়া দিয়ে গড়া। এণাক্ষী কেমন সংকুচিত হয়ে গেল, নিজের হাসিটাকে তার যেন অন্যায় রকমের প্রগল্ভ বলে বোধ হল।

সৌরীন তটস্থ হয়ে সাড়া দিলে, উঠেছি কাকা।

—তোমরা মুখটুখ ধুয়ে নাও, চা হয়ে গেছে।

একজোড়া ভারী খড়মের শব্দ বারান্দা বয়ে এগিয়ে গেল।

চা ঘরেই এল। নিয়ে এল মাধব।

চুমুক দিয়েই বুঝতে পারল এণাক্ষী: কাকা চা খান না বুঝি?

সৌরীন বললে, না। শুধু চা কেন, পান তামাক কিছুই স্পর্শ করেন না। নিরিমিষ খান—তাও একবেলা।

—বরাবর?

—না, কাকিমা মারা যাবার পর থেকে। রি-অ্যাক্শন খুব সম্ভব।

—রি-অ্যাক্শান? কিসের রি-অ্যাক্শান?

দু গ্লাস জল নিয়ে মাধব ঘরে ঢুকছিল। তার দিকে তাকিয়ে যা বলতে যাচ্ছিল, সামলে নিলে সৌরীন। মাধব জল রেখে বেরিয়ে গেলে সে অন্যমনস্ক ভাবে চায়ে চুমুক দিলে।

—কী রি-অ্যাকশানের কথা বলছিলে ?

সৌরীন বললে, সে একটা অদ্ভুত ব্যাপার। একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, কিংবা এ বাড়ির অনেক কিছুই এত অদ্ভুত যে আমার সহজে দেশে আসতে ইচ্ছে করে না। ভয় হয়, এখানকার সেই অদৃশ্য জালটার মধ্যে আমিও জড়িয়ে যাব। যত চেষ্টাই করি, কিছুতেই তার হাত থেকে মুক্তি পাব না।

—কী বলছ এসব ?

আত্মগতের মতো সৌরীন বলল, আসলে কী জানো—কোথায় কী একটা গোলমাল আছে আমাদের ভেতরে, কিছু একটা লুকিয়ে রয়েছে এই পরিবারের রক্তে রক্তে। কাকিমা মারা যান—যখন তাঁর বয়স কুড়ি বছর। আর মারা যাওয়ার ছ'মাস আগে তিনি পাগল হয়ে গিয়েছিলেন।

—পাগল ? কেন ?

—সেইটেই তো গল্প। চায়ের পেয়ালা শেষ করে সৌরীন সিগারেট ধরালো ঃ লোকে বলে, তাতে কাকার হাত ছিল।

—কাকার হাত ! সে কি !

অন্যমনস্ক হয়ে সৌরীন বলে চলল, কালকে সন্ধ্যেবেলা খালের ঘাটে তোমায় শিবমন্দিরটা দেখিয়েছিলাম—আমাদের পরিবারে সতীর সেই স্মরণচিহ্ন ! সেই থেকে এ বাড়িতে সতীত্বের আদর্শটা খুব পাকা। সৌরীন একবার জানলা দিয়ে তাকালো ঃ সেই আদর্শে বিপর্যয় ঘটবার উপক্রম হল কাকিমাকে এ বাড়ীতে আনবার পর।

কেন, কাকিমা কি—জিজ্ঞাসাটা শেষ করতে পারল না এণাক্ষী, কুণ্ঠায় থমকে গেল।

সৌরীন বললে, না না, সেরকম অপবাদ পরম শত্রুতেও দিতে পারে নি। আসলে কাকিমার ছিল রূপ। বড় বেশি, বড় অসাধারণ রূপ। কদাকার কাকার সেইখানেই ছিল ভয়। তাঁর আশংকা—অমন সুন্দরী স্ত্রীকে তিনি নিজের কাছে ধরে রাখতে পারবেন না। নিজের মনের বিষের জ্বালায় কাকা গেলেন এক গুণিনের কাছে, তার কাছ থেকে বশীকরণের শিকড় এনে শরবতের সঙ্গে মিশিয়ে কাকিমাকে খাওয়ালেন। তারপর—

এণাক্ষী সভয়ে বললে, তারপর ?

—আমার লোকের মুখে শোনা। সিগারেটের অনেকখানি ধোঁয়া ছড়িয়ে দিয়ে সৌরীন বললে, ওই শিকড়ের মধ্যে নাকি বিষাক্ত কিছু ছিল—এসব জিনিসের মধ্যে সাধারণতঃ যা থাকে। কাকিমা পাগল হয়ে গেলেন। ছ'মাস অসহ্য যন্ত্রণা পেয়েছিলেন। কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল—সেখানেও কিছু করতে পারে নি। সেই থেকেই কাকাও কেমন হয়ে গেছেন। একবেলা নিরিমিষ খান, কারো সঙ্গে বিশেষ মেলামেশা করেন না। সারারাত কখনো কখনো একা বাড়ির চারপাশে ঘুরে বেড়ান। অনেক সময় পথচলতি লোক ও'কে ভুত ভেবে চিৎকার করে উঠেছে।

এণাক্ষী চুপ করে রইল। চা-টা যেন আটকে যেতে চাইছে গলায়। সকালের সোনালী প্রসন্নতার ওপর আবার রাত্রির সেই আতঙ্ক-গম্ভীর ছায়াটা ঘনিয়ে আসছে। মনে পড়ছে লণ্ঠনের আলোয় আবছাভাবে দেখা সেই দীর্ঘকায় মানুষটিকে। মাথায় ধূসর বর্ণের সাদা পাকা চুল, পাখির ঠোঁটের মতো মুখের ওপর ঝুলেপড়া বাঁকা নাক, চোখদুটোতে অন্ধকার মাখানো, গলার স্বরে মেঘের গর্জন।

এণাক্ষী বলে ফেললে : কী সাংঘাতিক!

সৌরীন প্রসঙ্গটাকে লঘু করবার চেষ্টা করলে। বললে, হয়তো গল্প গল্পই—ওর আর কোনো মাথামুণ্ডু নেই।

—কিন্তু গল্প কি একেবারে মিথ্যে হয়? কিছু সত্য তো থাকেই!

—থাকতে পারে। কিন্তু সে সত্যের চেহারাটা হয়তো এত ছোট যে মাইক্রোসকোপ দিয়েও তাকে দেখতে পাওয়া যায় না। তারপরে আসে লোকের কল্পনার পালা—রঙের ওপর রঙ চড়ানো। তাছাড়া চেহারায় আর চালচলনে কাকা এমনি বিচিত্র ধরনের মানুষ যে ওঁকে নিয়ে যে কোনো রকম রহস্যকাহিনীই তৈরী করা চলে। আসলে এমন একটা লোকের ব্যক্তিজীবন যে আর সকলের মতো সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, এই কথাটা ভাবতেই আমাদের ভালো লাগে না।

হয়তো ঠিক কথাই বলছে সৌরীন। কলকাতা হলে মেনে নিতে এণাক্ষীর আপত্তি উঠত না—বরং নিজেই হয়তো যুক্তিটা প্রমাণ করতে চাইত আরো বেশি জোর দিয়ে। কিন্তু এই বাড়ি, রাত্রির অন্ধকারে লোহার বড় বড় গজাল বসানো দরজাটার সেই বিকৃত আর্তনাদ তুলে খুলে যাওয়া—তারপরে কবরের মতো শীতল ছায়াচ্ছন্ন ঘরগুলো আর—

আর মালঞ্চের চারদিকে জল। সমুদ্রের বুকের মধ্যে দ্বীপের মতো জেগে আছে এই গ্রাম। কিন্তু দ্বীপগুলোকে কি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায়? কালই তো তার প্রমাণ পেয়েছে এণাক্ষী।

মাধব এসে দেখা দিলে। খাবারের থালা আর চায়ের পেয়ালা তুলে নিয়ে গেল। আর জলের গ্লাস দুটোও। গ্লাস দুটো ভরাই ছিল—কোনো কাজে লাগে নি।

সৌরীন বললে, কাকা কী করছেন রে?

—সেরেস্তায় বসেছেন।

—ঘাটে নৌকো আছে?

—আছে।

—তুই জাল নিয়ে আমাদের সঙ্গে বেরুতে পারবি?

মাধব হাসল : মাছ ধরতে যাবে? কিন্তু কী দরকার খোকাবাবু? ছোটবাবু আধমণ মাছ আনিয়েছেন তোমাদের জন্যে।

—তা হোক। আমরা আরো আধমণ ধরে আনব। লোককে বিলিয়ে দেব। তুই যেতে পারবি মাধব?

মাধব আবার হাসল : বেশ তো, চলো।

—কিন্তু তোদের বৌদি সঙ্গে যাবে।

—বৌদি! মাধব কপালে চোখ তুলল : বলো কি! বাড়ির বউমা—

সৌরীন বললে, একালের বউমা—ওতে কোনো ক্ষতি হবে না। তাছাড়া মালঞ্চের

রায়বাড়িরও তো আর সেদিন নেই, অনেক জল গড়িয়ে গেছে এর মধ্যে। তুই যা—তৈরি হয়ে নে।

মাধব চলে গেল। কিন্তু খুব খুশি হয়েছে বলে মনে হল না।

সৌরীন বললে, চলো এণা, মাছ ধরা দেখবে আমাদের দেশে। খুব একটা নতুন রকমের অভিজ্ঞতা আর অ্যাড্‌ভেঞ্চার হবে তোমার।

॥ ছয় ॥

পুরোনো শিবমন্দিরটা বেয়ে মোটা মোটা লতা উঠেছে—যেন সাপের বেণী জড়িয়েছে সর্বাঙ্গে। চূড়োর ওপরে কাৎ হয়ে যাওয়া ত্রিশূলটার সঙ্গে গোটাকয়েক ধুঁদুল দুলছে। মন্দিরের তিন দিক ঘিরে বিছুটির বিষাক্ত জঙ্গল উজ্জ্বল সবুজ হয়ে আছে। আবছা ছায়ার মধ্য দিয়ে ঝকমক করছে শিবলিঙ্গের চন্দ্রলেখা।

এইখানে সতীদাহ হয়েছিল। অনেককাল আগে। এ বাড়ির ওপর তার প্রভাব আজো কাটে নি। কাকার অন্ধকার মাখানো চেহারাটা মনে পড়ছে। কেমন দেখতে ছিলেন কাকিমা? কী সে ভয়ংকর রূপ—কাকা যাকে কোনোমতেই বিশ্বাস করতে পারলেন না!

ভাবতে ভাবতেই এণাক্ষীর চোখ পড়ল একধারে বিছুটিবনের ওপর আর একটা ছোট লতার দিকে। কিন্তু লতাটার রঙ যেন একটু বেশি ফিকে—চেহারাটা যেন একটু বেশি মসৃণ। তারপরেই দেখা গেল গিরগিটির মতো তার একটা মুখ আছে এবং সেটা এগিয়ে আসছে একটু একটু করে এণাক্ষীর দিকেই।

চাপা আর্তনাদ করে এণাক্ষী সৌরীনের হাত চেপে ধরল।

মাধব ডিঙির ওপরে একটা সতরঞ্চি বিছিয়ে দিচ্ছিল—সৌরীনের লক্ষ্য ছিল তার ওপরে। চমকে বললে, কী হল?

এণাক্ষী জবাব দিলে না, আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলে।

এণাক্ষীর চিৎকারে ভয় পেয়ে সেটা তখন বিছুটিবনের দিকে দ্রুত মুখ ঘুরিয়েছে। সৌরীন দেখল, মাধব ডিঙির ওপর দাঁড়িয়ে পড়েছিল—সে-ও দেখতে পেলো।

মাধব হেসে বললে, ও কিছু নয় বৌদি—লাউডগা সাপ। কামড়ায় না।

সাপটা আস্তে আস্তে বিছুটিবনের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

—কামড়ায় না?

—আজ্ঞে না। তবে যদি কখনো কামড়ায়, তাহলে সে একেবারে মোক্ষম। তখন আর শিবেরও সাধ্য নেই যে বিষ নামায়।

সৌরীনও এবার অল্প একটু হাসল: ওসব কিছু নয়। নন্‌পয়জনাস। যাক এসো, নৌকো তৈরি।

এণাক্ষী ডিঙির দিকে পা বাড়ালো। কালকের সেই ছিন্নমুণ্ড গোখরোটা। সারা শরীর সিরসিরিয়ে গেল একবার।

সাপ—মালঞ্চে আসার সঙ্গে সাপের কী একটা যোগাযোগ আছে কে জানে! কী একটা হিংস্র—একটা কুটিল ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে তার ভেতর। এণাক্ষীর ভালো

লাগল না।

ডিঙি খুলে দিয়ে মাধব লগির খোঁচা মারল।

বিলের উপচে-পড়া জল খরধারে বয়ে আসছে খালের ভেতর দিয়ে। উজানে লগি ঠেলে মাধব এগিয়ে চলল। একদিকে ছাড়া-ছাড়া মালও গ্রাম, ছোট বড় বাড়ি, বাঁধানো ঘাট—আর একদিকে শোলা আর বেতের বন, তার ভেতর দিয়ে গুচ্ছ গুচ্ছ আকাশী নীল ফুল উঁকি মারছে। নোনা আর জিকে গাছ দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি—পান্নাবরণ মাছরাঙা সন্ধানী চোখে তাকিয়ে রয়েছে জলের দিকে। শোলাবনের তলায় তলায় একঠেঙো কানি বকের নির্বিকল্প তপস্যা চলছে—চিল আর শংখচিল ঘুরে ঘুরে উড়ছে মাথার ওপর।

সকলের লক্ষ্য একদিকে—জলের দিকে।

জলের ভেতরে মাছের উল্লাস। লক্ষ কোটি মাছের সে এক বিশাল শোভাযাত্রা। সারা জলটা তাদের চলার আলোড়নে তিরতির করে কাঁপছে। কখনো কখনো তালগোল পাকিয়ে জলের ওপর 'উল্লাস' খাচ্ছে, কখনো ছিটকে পড়ছে কাদার ডাঙায়, আবার কখনো টুপ্ টুপ্ করে লাফিয়ে আসছে নৌকোর ওপরে। কেউ নিরাশ হচ্ছে না। মাছরাঙা নয়—চিল নয়—বকও নয়। বকের পেটের দিকে তাকালে মনে হয় ওর কণ্ঠা অবধি ঠাসা, কিন্তু লোভ কিছুতেই সামলাতে পারছে না—একটার পর একটা গিলেই চলেছে।

সাপের কথা ভুলে গেল এণাক্ষী—ভুলে গেল আর সমস্তই, তুড়ুক করে একটা মাছ এসে প্রায় কোলের কাছে লাফিয়ে পড়ল।

ছেলেমানুষের মতো কলরব তুলে এণাক্ষী সেটা থাবা দিয়ে ধরতে যাচ্ছিল, বাধা দিলে সৌরীন।

—হাত দিয়ো না—হাত দিয়ো না !

—কেন ?

—দেখছ না বানমাছ ?

বিঘৎখানেক লম্বা কালো মাছটা সাপের মতো এঁকেবেঁকে চলছিল ডিঙির কাঠের ওপর। মাছটার ওই চলা আর সৌরীনের সন্ত্রস্ত নিষেধ তাকে চমকে দিলে।

সৌরীন বললে, ওর পিঠভর্তি কাঁটা। হাতে লাগলে ভয়ংকর জ্বালা করবে।

কাঠের ফাঁক দিয়ে মাছটা খালের জলে পড়ে গেল।

এণাক্ষী বসে রইল চুপ করে। খুশি হতে যাচ্ছিল, কিন্তু কোথা থেকে একটা ছায়া পড়ল এসে। সাপ—মাছটাও ঠিক সাপের মতোই এঁকেবেঁকে চলেছে।

অথচ একান্তভাবে খুশি হওয়ার মতোই অপরূপ সকাল। নরম রোদ জলের ওপর দুলে বেড়াচ্ছে—মনে হচ্ছে আলো ছড়িয়ে ছড়িয়ে খেলা করছে কেউ। মাছরাঙার পান্নারঙের পাখায় রোদ ঝিলমিল করছে। তীক্ষ্ণদৃষ্টি চিলের ডাক আকাশকে ভরে দিয়েছে।

নৌকোয় টুপ টুপ করে মাছ পড়তে লাগল—দেখে চলল এণাক্ষী। কোনোটাই খুব বড় নয়। অধিকাংশই দু'ইঞি থেকে ছ'ইঞির মধ্যে। সাদা, কালো, লালচে, লম্বা, চ্যাপ্টা, গোলাটে। চাঁদা, কালবোস, ট্যাংরা, রুই-কাতলার পোনা, বান। কোথা

থেকে একটা ছোট কাঁকড়াও এসে জুটেছে—চোখদুটোকে দূরবীনের মতো উঁচু করে সন্দিগ্ধভাবে সে পাটাতনের এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগল।

সৌরীন বললে, আর এগিয়ে কী হবে? এখানেই তো জাল ফেললে হয়!

মাধব বললে, মাছ খাল ভরেই রয়েছে দাদাবাবু। যেখানেই ফেলবে—জাল ছিঁড়ে যেতে চাইবে। তবে এদিকে সব ছোট মাছ, আর একটু এগিয়ে গেলে আধসেরী একপো মাছ পাওয়া যাবে—ওদিকের ওই বাঁকটার মুখে, শিমুলতলায়।

সৌরীন বললে, তা হোক, এখান থেকেই শুরু করে দে।

মাধব ডিঙি ভেড়ালো। লগি পুঁতে নৌকো আটকে জাল তুলে নিলে। তারপর কনুইয়ের ওপর জাল সাজিয়ে শরীরের একটা নির্ভুল ভঙ্গি করে জাল ফেলল জলের মধ্যে। একটা পাপড়িখোলা ফুলের মতো জালটা চক্রাকারে জলের ভেতরে আদৃশ্য হল। সঙ্গে সঙ্গে একরাশ মাছ ছিটকে পড়ল চারধারে।

সৌরীন বললে, এনা, মজাটা দেখো এইবার!

দেখবার মতোই বটে। একটু পরে মাধব যখন জাল টেনে তুলল, তখন এণাক্ষী যে দৃশ্য দেখল তা জীবনে ভোলবার নয়। কালো জালটা যেন কার মন্ত্রবলে একেবারে রুপালী হয়ে গেছে। সূর্যের আলোয় জীবন্ত রুপোর টুকরোগুলো তীব্রভাবে ঝলমল করে উঠল। কয়েকটা মাছ ঝরেও পড়ল জলে, কিন্তু যা উঠে এল তাতেই নৌকোর তলা প্রায় বোঝাই হয়ে গেল।

এণাক্ষী শুধু বলতে পারল: এত—এত মাছ!

মাধব বললে, জলে আর একটু টান ধরুক না বৌদি, তখন আর জাল নিয়েও আসতে হবে না।

ডিঙির কাঠের ওপর খোলের মধ্যে তখন অসংখ্য মৃত্যুমুখী মাছের লাফালাফি—যেন ঝুমুর ঝুমুর করে নূপুর বাজতে আরম্ভ হয়েছে। মাধব আর একবার জাল ফেলতে যাচ্ছিল, কিন্তু একটা বিষণ্ণ করুণায় এণাক্ষীর মন ভরে গেল।

আরো একবার জাল ফেলল মাধব, আবার খালের জল থেকে হাজারখানেক রুপালি মাছের উজ্জ্বলতায় কালো জালটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। এবার নৌকোয় আর নূপুর নয়, ঝাঁঝর বাজতে শুরু করল যেন। নৌকোর পাশ দিয়ে কতকগুলো আবার টুপ টুপ করে লাফিয়ে পড়ল জলে, কিন্তু কেউ তাদের ধরে রাখবার চেষ্টা করল না।

—থাক, আর জাল ফেলে দরকার নেই।

সৌরীন বললে, সেই ভালো। ছোট মাছ ধরে আর কী হবে—শিমুলতলার বাঁকের দিকেই যাওয়া যাক।

জাল রেখে মাধব লগি তুলে নিলে। আবার উজান ঠেলে নৌকো এগিয়ে চলল।

তেমনি জলে লক্ষ কোটি প্রাণের অন্ধ উল্লাস, শোলা আর বেতের বন, চিল, মাছ-রাঙা, কানি বক। নোনাগাছে লাল টুকটুকে হয়ে পাকা নোনা দুলছে। একটা কাক ঠুকরে ঠুকরে নোনা খাচ্ছিল—মাছ খেয়ে খেয়ে ওর অরুচি ধরে গেছে খুব সম্ভব।

সৌরীন সিগারেট ধরালো। খানিকটা স্বগতোক্তির মতো একরাশ পরিতৃপ্তির উচ্ছ্বাস বেরিয়ে এল তারপরে।

—আঃ, দেশের জলমাটির গুণই আলাদা। পা দিলেই যেন শরীর অর্ধেক ভালো

হয়ে যায়।

এণাক্ষী বকের মাছ ধরা দেখছিল, জবাব দিল না। সৌরীন আবার বললে, কিন্তু এমন জড়িয়ে গেছি কলকাতায় যে কিছুতেই আর বেরুনো হয় না। বন্ধ ঘরের মধ্যে দম আটকে মরছি দিনরাত। অথচ—

সৌরীন দীর্ঘশ্বাস ফেলল। নাক দিয়ে নিঃশ্বাসের সঙ্গে ধোঁয়া বেরিয়ে এল একরাশ।

—তোমার কেমন লাগছে এনা?

—খুব ভালো।

মৃদু গলায় এণাক্ষী জবাব দিলে। কিন্তু সত্যিই খুব ভালো? অবিমিশ্র, পরিপূর্ণ? কোথাও এতটুকু ফাঁক কিংবা ফাঁকা নেই তার? বলেই ভুরু কোঁচকালো এণাক্ষী। কী একটা কুয়াশার মতো মনের ওপরে ভেসে বেড়াচ্ছে তার, নিজে যে তাকে খুব ভালো করে বুঝতে পারছে তা-ও নয়। কিন্তু ক্রমাগতই একটা অস্পষ্ট অস্বস্তির মতো মনে হচ্ছে: বিলের এই অফুরন্ত সাগরের মতো জল, এই বনজঙ্গল, মালঞ্চের রায়বাড়ি, চারদিকে সাপের আনাগোনা—এরা সবাই কুটিল একটা নিষ্ঠুর প্রাকৃতিক শক্তির ঐকতান বাজিয়ে চলেছে। এর মধ্যে মগ্ন হয়ে থাকা, মুগ্ধ হয়ে ডুবে যাওয়া—তার পক্ষে উচিতও নয়, স্বাভাবিকও নয়। যেন একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে এণাক্ষী টের পেয়েছে, এখন তার চোখকে সজাগ আর মনকে সতর্ক করে রাখা দরকার।

—কবে আইল্‌ছেন? আদাব—আদাব!

ডাঙা থেকে কে ডাক দিয়েছে। তিনজনেই একসঙ্গে তাকালো।

একজন চাষী মুসলমান। পরনে চেককাটা লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জি, হাতে বাঁকা একখানা ধারালো হাঁসুয়া, খালি পা, গলার ওপর কালো সুতোয় বাঁধা পিতলের একটা চৌকো মাদুলী দুলছে, মাথায় কাঁচাপাকা চুল, মুখে সাদা দাড়ি।

লোকটি আবার বললে, আদাবজী ছোটবাবু! কবে আইল্‌ছেন?

সৌরীন বললে, কাল।

—কাইল? তা ঢের দিন বাদে আইলেন! থাকিবেন তো দুই-চাইরটা মাস?

—দেখি। তুমি ভালো আফাজদ্দি?

—খোদা যেমন রাখিছেন। আফাজদ্দি একটা উদার ভঙ্গি করলে হাতের: চলি যাইলছেন একমতন। হামি এখন চইলনু তোমাদের ওইঠৈই। ছোটকর্তা হামাক্ বুলাল্‌ছে। আদাব—

আফাজদ্দি চলে গেল।

এণাক্ষী বললে, তোমাদের প্রজা বুঝি?

সৌরীন অল্প একটু হাসল: ও কারো প্রজা নয়—ফ্রী ল্যান্স্।

—ফ্রী ল্যান্স্? মানে?

—মানে বাদিয়া মুসলমান। জাতে পাঠান। যে ওকে পুষতে পারবে—তার জন্য ও হাসিমুখে একটার পর একটা খুন করতে পারে। জেলও খেটেছে বছর দশেক। তবে আজকাল—সৌরীন মাধবের দিকে তাকিয়ে বললে, কিরে, এখনো সেরকম আছে নাকি আফাজদ্দি? খুনখারাপি করে?

মাধবের মুখের ওপর মেঘ নেমেছিল। সংক্ষেপে বললে, আমি জানিনে।

সৌরীন সেটা লক্ষ্য করল। বললে, কী হল মাধব? ব্যাপার কী?

লগিতে প্রাণপণে একটা খোঁচা দিয়ে মাধব বলল, ব্যাপার অনেক কিছুই আছে দাদাবাবু, আস্তে আস্তে সবই জানতে পারবে। কিন্তু এই সকালেই যে আফাজদ্দি ছোটকর্তার ওখানে চলেছে, এ লক্ষণ ভালো নয়। নিজের মনেই যেন মাধব আস্তে আস্তে মাথা নাড়তে লাগল: না, একেবারেই ভালো নয়।

এণাক্ষী খালের জলের দিকে তাকালো। আশ্চর্য, জলটাকে ঠিক সাপের মত দেখাচ্ছে এখন!

॥ সাত ॥

একনৌকো মাছ নিয়ে ওরা যখন ফিরে এল, তখন বেলা বারোটার কাছাকাছি। জালের সঙ্গে মাছগুলোকে জড়িয়ে নিয়ে তার ভারে নুয়ে নুয়ে এগিয়ে চলতে লাগল মাধব, সৌরীন আর এণাক্ষী তার পেছনে হেঁটে চলল। জালের ফাঁস দিয়ে দুটো একটা ছোট মাছ টুপটাপ করে ঝরে পড়ছিল, অন্য সময় হলে লোভীর মতো সেগুলো কুড়িয়ে নিত এণাক্ষী কিন্তু এখন আর সে উৎসাহ তার ছিল না। বরং কেমন যেন ক্লেদাক্ত মনে হচ্ছিল নিজেকে। ভিজে হাওয়ায় শরীরটা যেন চটচট করছিল—শাড়ী থেকে, হাত থেকে একটা আঁশটে গন্ধ ঘুলিয়ে উঠছিল।

একবার ভালো করে স্নান করা দরকার সাবান দিয়ে। যাওয়ার পথে মন্দিরের গায়ে সেই ঝোপটার ওপর সতর্ক চোখ বুলিয়ে গেলে সে। ওরই ভেতর থেকে না তখন বেরিয়ে এসেছিল সবুজ লতার লাউডগা সাপটা?

সৌরীন বললে, খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছ, না?

ক্লান্তির সুরটা ঢাকবার চেষ্টা করে এণাক্ষী বললে, না, খুব এন্‌জয় করেছি।

—ভালো করে এক পেয়ালা চা এখন খাওয়া দরকার, কী বলো?

—সকালের সেই চা! এণাক্ষী হাসল।

—না, এবার তোমার হাতের। গিয়ে স্টোভটা বের করতে হবে।

এণাক্ষী কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই চোখে পড়ল কাকাকে। চণ্ডীমণ্ডপের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন সুদীর্ঘ মানুষটি—ওদেরই লক্ষ্য করছেন। চকিত হয়ে ঘোমটা নামিয়ে দিলে এণাক্ষী। অভ্যাস নেই, তবু মনে হল, মালঞ্চের রায়বাড়ির বৌয়ের ঘোমটা ছাড়া মানায় না।

কাকা দাঁড়িয়ে আছেন—এই বাড়ির কালপুরুষের মতো। রাত্রির অন্ধকারে যাকে ভয়ঙ্কর মনে হয়, এখন তাঁর দিকে তাকিয়ে কেমন যেন করুণা হল একটা। একবার চোখ তুলে দেখেই এণাক্ষী অনুভব করল, কালপুরুষের শরীরেও আজ কালের ছোঁয়া এসে লেগেছে। মাথার সাদা চুলে আর একটুখানি ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গির মধ্যে একটা ইতিহাসের শেষ অধ্যায় এসে পেঁছেছে।

কাকা অল্প একটু হাসলেন।

—শিকার হল?

মাধব ঝুপ করে জালটা মাটিতে আছড়ে ফেলল।

—করেছিস কিরে ? একেবারে দু' মণ মাছ এনে হাজির করলি ! কী হবে ?

মাধব গর্বিতভাবে বললে, শিমুলতলার আগে মোটে দু'বার জাল ফেলেছিলাম বাবু, তাতেই—

—খুব আপসোস হচ্ছে, না ? আরো মণ দু'তিন না আনতে পেরে মন বুঝি খারাপ হয়ে রয়েছে ? আজ সারাদিন বসে বসে এই মাছ তোকে কুটতে হবে—টের পাবি তখন। কাকা হঠাৎ এণাক্ষীর দিকে তাকালেন ঃ মাছ কুটতে জানো বৌমা ?

সৌরীন বললে, সে কি কথা কাকা ! বাঙালীর মেয়ে মাছ কুটতে জানে না ?

—কলকাতায় থাকে যে, তায় পাস করা—এসব কাজ কি আর ওদের জন্যে ? ঝি-চাকরেই তো করে।

—আমরাও করি। মৃদু গলায় এণাক্ষী জবাব দিল।

—তাই নাকি ? কাকা শব্দ করে হাসলেন ঃ তাহলে তুমিও নয় বসে যেও মাধবের সঙ্গে—দেখি কেমন কুটতে পারো ! আচ্ছা সে পরে হবে, এখন বেলা হয়েছে, তোমরা স্নান করে নাও।

কাকা সরে গেলেন। পা বাড়ালেন ওদিকের কাছারিবাড়ির রাস্তায়।

দোতলায় নিজের ঘরে ফিরে এসে এণাক্ষী বললে ঃ কলকাতার মেয়েদের সম্পর্কে ও'র ধারণা এখনো এক যুগ আগেকার !

সৌরীন আয়নার সামনে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে দাড়ি কামাতে বসেছিল। গালে সাবান ঘষতে ঘষতে বললে, খুব স্বাভাবিক। এক যুগ মানে তো বারো বছর ? উনি তার ঢের আগে কলকাতায় শেষবার ঘুরে এসেছেন। তাছাড়া কাকা আজ পর্যন্ত সিনেমা দেখেন নি। উপন্যাস যদি পড়ে থাকেন, তাহলে 'হরিদাসের গুপ্তকথা' আর রেনল্ডসের 'কোর্ট অব্ লণ্ডনে'র অনুবাদ—ও দুটো বই এ বাড়িতে ছিল বলে মনে পড়ছে !

—কী সর্বনাশ ! বেঁচে আছেন কী করে ?

—যেমন করে বনের পুরোনো বটগাছ বেঁচে থাকে। আকাশের বৃষ্টি আর রোদ হলেই তার চলে যায়।

—কিন্তু এ তো বন নয় !

—ট্র্যাজিডি সেখানেই। সৌরীন গালের ওপর বুরুশ বুলোতে লাগল ঃ একেবারে আদিম হতে পারার মস্ত একটা সুবিধে আছে। মনটা থাকে বটে, কিন্তু সেটা প্রয়োজনের সঙ্গে এমন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা যে দরকারের দাবি মিটলে সেও সঙ্গে সঙ্গে ভরপেট কুকুরের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু যেটা আদিমও নয়, আধুনিকও নয়, যেখানে মনের বারো আনা অতীতের ভেতর আর চার আনা একালের আলোয়—গোলমালটা সেখানেই বেশি।

—রূপকের মতো মনে হচ্ছে। সবটা বোঝা গেল না।

—ঠিক বোঝানো সম্ভব নয়, নিজেই টের পাবে দু-চারদিনের মধ্যে। আফাজদ্দিকে দেখলে না একটু আগে !

এণাক্ষী কাঁধে আঁচল তুলে দিতে যাচ্ছিল, হাতফসকে আঁচল মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। আফাজদ্দিকে মনে পড়েছে বইকি। একটু আগেই দেখা হয়েছিল তার সঙ্গে। বাদিয়া

মুসলমান—শরীরে জাতপাঠানের রক্ত। কাবুল-কান্দাহারের রুক্ষ পাহাড় থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে একটা বন্য হিংসা বয়ে এনেছে নিজের মধ্যে। কথায় কথায় মানুষ খুন করতে তার নাকি বাধে না।

এণাক্ষী চঞ্চল হয়ে বললে, ও লোকটা—

—সেই আদিম অন্ধকারের একটা দিক। ওই অন্ধকারে ডুবেই কাকিমা মারা গিয়েছিলেন। আর একটা রূপ হল কিছু বংশগত কালচার, খানিকটা বুনিয়াদী মেজাজ। একালের শিক্ষাদীক্ষাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারেন না, বেশ জানেন দিন বদলে যাচ্ছে। কিছুটা টেরও পেয়েছিলেন যখন এ অঞ্চলে তে-ভাগা আন্দোলনের ঢেউ এসেছিল কিছুদিন আগে। কিন্তু তাতে করে ওঁর দিক থেকে বিশেষ কোনো লাভ হয় নি, শুধু ওঁর পুরোনো হিংসাটাই আরো হিংস্র হয়ে উঠেছে।

এণাক্ষী চুপ করে রইল। দার্শনিকের ভাষায় বলে যাচ্ছে সৌরীন। কিন্তু সমস্ত তত্ত্বকে ছাপিয়েও এর ভিতরের একটা নিরলঙ্কার সত্য ধরা দিচ্ছে মনের সামনে। সেই সত্যের আভাস কাকার দিকে তাকালেই পাওয়া যায়—সৌরীনের এতখানি ব্যাখ্যা হয়তো না করলেও চলত।

—সৌরীনদা ?

বাইরে থেকে ডাক ভেসে এল। সৌরীন উৎকর্ণ হয়ে বলল, প্রভাস !

এণাক্ষী আঁচলটা ভালো করে জড়িয়ে নিলে। অকারণেই একটা ঢেউ দুলে গেল বুকের ভেতর। কালকের কথা মনে পড়ল। সেই জল—সেই সাদা বোট—ছাউনির ভেতর একটা সাপের ফণা—দুম্ করে বন্দুকের শব্দ। মাথাটা চরকির মতো ঘুরে গিয়েছিল পাক খেয়ে।

—আসতে পারি সৌরীনদা ?

সৌরীন গাল থেকে ক্ষুর নামিয়ে বলল, আয়।

প্রভাস ঘরে ঢুকল। ট্রাউজার নয়—শার্ট আর ধুতি। পায়ে কাবলী চটি। বাড়তির মধ্যে হাতে ছড়ি একখানা।

—নমস্কার বৌদি। কেমন লাগছে নতুন জায়গা ? বলে সোজাসুজি বিছানার ওপর বসে পড়ল ঃ বেশ ইন্টারেস্টিং, না ?

এণাক্ষী হাসল ঃ হাঁ, খুব ইন্টারেস্টিং। কিন্তু আপনার খবর কী ? কাল কটা কুমীর মারলেন ?

—পাইনি। প্রভাস রায়ের গলার আওয়াজ শুনেই সেই যে ডুব মারল, তারপরে আর পাত্তা নেই। শেষে আর কী করি—একজোড়া পানকৌড়ি নিয়েই ফিরে আসতে হল !

—পানকৌড়ি ? খান নাকি ?

—না, খাবারের এত দুর্ভিক্ষ হয়নি যে পানকৌড়ি খেতে হবে ! ওটা অভ্যেস রাখা—বুঝলে না ? হাতের টিপ ঝালিয়ে নিলাম।

সৌরীন বললে, হাতের টিপের কথা আর বলতে হবে না—সে কালই দেখেছি। উঃ, যেভাবে সাপটা মারলি—

—যেতে দাও, যেতে দাও। প্রভাস হাতের ছড়িটা মেজের ওপর ঠুকল ঃ ও আমার কম্প্লিমেণ্ট নয় সৌরীনদা। যদি সময় পাই তাহলে বুঝিয়ে দেব কতবড় মার্কস্‌ম্যান

আমি। সে যাক, আমি তোমাদের নেমন্তন্ন করতে এসেছি।

—নেমন্তন্ন! সৌরীনের হাতে ক্ষুরটা শক্ত হয়ে গেল।

—হাঁ, গরীবখানায়। আজকে সন্ধ্যাবেলায়।

—কী খাওয়াবেন? এণাক্ষী হাসল: সেই পানকৌড়ির মাংস নাকি?

প্রভাস উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে উঠল: তা খাওয়ালে মন্দ হয় না। জলের দেশে এসেছো, অথচ সাঁতার জানো না! একবার পড়লেই টুপ করে একটুকরো ইঁটের মতো ডুবে যাবে। পানকৌড়ির মাংস খাইয়ে দিই—বেশ ভালো সাঁতার শিখে ফেলবে।

সৌরীন হাসতে চেষ্টা করেও হাসতে পারল না।

—কাকাকে বলেছিস?

—আলবৎ। প্রভাস হাতের ছড়িটা মেঝেতে ঠুকে বললে, সিং-দরজা না পেরোলে কি আর অন্দরমহলে আসা চলে? তাঁর পারমিশন আছে।

সৌরীন আশ্চর্য হল।

—আর তোর বাবা?

—দ্যাট্ খেপচুরিয়াস ওল্‌ড্ ম্যান? প্রভাস দিলদরিয়া ভঙ্গিতে বললে, তার সাইকোলজি খুব ইন্‌টারেসটিং। বাবা বললে, জমিজমা নিয়ে কোর্টে যা হবার হোক—ঘরের বৌয়ের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক? তাছাড়া বৌমা প্রথম দেশে এসেছেন—আলাদা শরিক হলেও তিনিও তো বাড়িরই বৌ, তাঁকে আদর করে একবার ডেকে আনতে হবে না?

সৌরীন চুপ করে রইল। অদ্ভুত রকমের নাটকীয় ঠেকছে সবটা। গালে বুরুশ বুলোবার কথা ভুলে গিয়ে অনমনস্ক ভাবে ধুয়ে ফেলল সেটাকে।

প্রভাস বললে, তোমাদের চান-টান তো এখনো কিছু হয় নি! তাহলে আমি আর বসব না—উঠে পড়ি। কিন্তু তোমাদের আসছ তো সবাই সন্ধ্যেবেলায়?

—তোমার দাদা গেলেই যেতে পারি।

—এটা তোমার মুখে মানালো না বৌদি। আর একটুখানি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আশা করেছিলাম তোমার কাছ থেকে। প্রভাস দাঁড়িয়ে উঠল: কী সৌরীনদা, কথা রইল তো?

সৌরীন তখনো ভাবছিল। তার মনে পড়ে গিয়েছিল, কাকা আফাজদ্দিকে ডেকে পাঠিয়েছেন। একটা কিছু ঘটবে। হয়তো তার বেশি দেরিও নেই। তার আগে—

অস্বস্তিভরে সৌরীন বললে, কথা রইল।

প্রভাস বললে, ঠিক আছে, এমনি না যাও—আমি টেনে নিয়ে যাব! একবার যখন এসে পড়েছো এখানে, আমার হাত থেকে নিস্তার নেই।

প্রভাস বেরিয়ে যাচ্ছিল। আর তক্ষুনি দেওয়ালে একটা টিকটিকি ডাকল।

ওর কোনো মানে নেই—কোনো সংস্কারও নেই সৌরীনের, তবু একবার সৌরীনের বলতে ইচ্ছে করল, থাক প্রভাস, আমরা নাই গেলাম। কিন্তু সেকথা বলা গেল না, তার আগেই বেরিয়ে গেছে প্রভাস।

এণাক্ষী লক্ষ্য করছিল।

—কী ভাবছ?

সৌরীন বলল, কিছুই না।

সত্যিই তো—ও কিছুই না! তাছাড়া যা ভাবছে তা কি কখনো বলা যায় এণাক্ষীকে? আর খানিকটা খেয়ালের খ্যাপামি ছাড়া বাস্তবিকই কি সে ভাবনার কোন অর্থ আছে?

॥ আট ॥

প্রভাসের কাকা যদুপতি রায়ের বাড়িতে পা দেবার যে সংকোচ সারাটা বিকেল সৌরীনকে বিষণ্ণ করে রেখেছিল, সেটা কেটে যেতে মাত্র কয়েক মিনিট সময় লাগল।

সৌরীনের কাকা যদুপতি রায়ের সব চেয়ে বড় শত্রু। জ্ঞাতি বলে সে শত্রুতার বিষ আরো ভয়ংকর, রক্তের সম্পর্ক আছে বলে সেটা আরো কূটচারী। শেষের যে বড় মামলাটায় যদুপতি হেরে গেছেন তাতে তাঁর যে কেবল আর্থিক ক্ষতিই হয়েছে তাই নয়, সমস্ত গ্রামের সামনেই তিনি ছোট হয়ে গেছেন। এ মামলার ব্যাপারে সৌরীনের কোনো ভূমিকা নেই, সে প্রবাসী, তবু পরোক্ষভাবে এর সঙ্গে তার যে সম্বন্ধ জড়িয়ে আছে, সেইটের কথা ভেবেই সৌরীনের অস্বস্তির সীমা ছিল না।

কিন্তু যদুপতি তার আভাসমাত্র দিলেন না।

—এসো এসো সৌরীন। বৌমা, লজ্জা কিসের? এ তো তোমারই বাড়ি—নিজের ঘর।

সৌরীন তবু মুখ নীচু করেই রইল, কিন্তু এণাক্ষী তাকালো চোখ তুলে। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হল কাকার সঙ্গে যদুপতি রায়ের কোনো মিল নেই। টকটকে ফর্সা গায়ের রঙ, প্রভাসও তার বাপের তুলনায় কালো। মাথা জুড়ে টাক চকচক করছে—সামান্য কিছু পাকা চুল অবশিষ্ট আছে কানের দু পাশে। সোনার ফ্রেমের চশমার আড়ালে দুটি প্রসন্ন চোখ সজীব হয়ে আছে, দৃষ্টিতে কৌতুক আর কৌতূহল মেশানো। কাকার মুখের ওপর যেখানে একরাশ কালো মেঘ থমথম করছে, সেখানে যদুপতি মনের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে আছেন।

এঁর সঙ্গে বিরোধ কেন কাকার? কেন তিনি ডেকে পাঠান আফাজদ্দিকে? কে অন্ধকার ঘরের ভেতর থেকে কাকিমার গলা টিপে ধরেছিল? এও কি সেই অন্ধকারের আর একটা দিক? এণাক্ষী শিউরে উঠল।

কিন্তু এর মধ্যে জ্যাঠাইমা এসেছেন—এসেছে প্রভাসের ছোট বোন চিত্রা। জ্যাঠাইমা ছোটখাটো শ্যামবর্ণ চেহারার মানুষ—যদুপতির পাশে যেন তাঁকে মানায় না। চিত্রা বাপের রূপ নিয়েই জন্মেছে, পাড়াগাঁয়ের সহজ স্বাস্থ্য আর প্রভাসের মতো বুদ্ধির দীপ্তিতে আর কিশোর মুখ উজ্জ্বল।

কথা চলছিল যদুপতি রায়ের দোতলার একখানা ঘরে। এণাক্ষীর শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে এ বাড়ির পার্থক্য এই ঘরে ঢুকলেই স্পষ্ট হয়ে যায়। ওখানে সব জীর্ণ, ধূলি-ধূসর, অতীতগন্ধী—ও বাড়িতে পা দিয়েই মনে হয়েছিল, পঞ্চাশ বছর আগে পৃথিবীর মুখের সামনে যে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, তা আর খোলে নি, অন্তত কাকা যতদিন বেঁচে আছেন, ততদিন তা কিছুতেই খুলবে না। আর কলকাতা থেকে এতদূর

মালঞ্চের এই বাড়িতেও একেবারে আধুনিক মনের ছাপ ঝকমক করছে। পরিপাটি বসবার আসন, এক কোণে একটা রেডিয়ো, দেওয়ালে খানকয়েক সুনির্বাচিত ছবি, বুককেসে রবীন্দ্র রচনাবলীর বাঁধানো সেট, একটি অর্গ্যান। জানালার বাইরে যদি ঝিঁঝি-ডাকা অন্ধকার ঘন হয়ে না থাকত আর এই ঘরে যদি ইলেক্ট্রিকের আলো জ্বলত—তাহলে এই ঘরকে স্বচ্ছন্দে কলকাতার সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া চলত।

জ্যাঠাইমা এণাক্ষীর মুখখানা সস্নেহে তুলে ধরে বললেন, বাঃ, দিব্যি বউটি হয়েছে। ভারী খুশি হলাম সৌরীন।

—বৌদি কিন্তু গ্র্যাজুয়েট মা। প্রভাস গর্বে মনে করিয়ে দিলে।

জ্যাঠাইমা বললেন, জানি, শুনেছি সেকথা। তাই একটু ভয়ও ছিল। কলকাতার মেয়ে, লেখাপড়া জানে, কেমন চালচলন, কেমন কথাবার্তা—বুঝতে পারি নি। এ যে দেখছি লক্ষ্মীর প্রতিমা।

সৌরীন সহজ হতে চেষ্টা করছিল। হেসে বলল, শুধু চেহারা দেখেই রায় দিচ্ছেন জ্যাঠাইমা ?

জ্যাঠাইমা বললেন, চেহারা দেখেই মানুষ চেনা যায়। তুই বদনাম গাইলেও বিশ্বাস করব না।

যদুপতি বললেন, ঠিক, চেহারা দেখেই চেনা যায়। খাসা হয়েছে বৌটি। আচ্ছা তোমরা বোসো, আমি ঘুরে আসছি একটু।

জ্যাঠাইমা ভ্রূকুঞ্চিত করলেন, তুমি আবার চললে কোথায় ?

—বঙ্কিমের ওখানে যাব একবার।

চিত্রা কলকণ্ঠে বললে, তার মানে ? তুমি কি আজও ওখানে গিয়ে পাশার ছক নিয়ে বসবে নাকি বাবা ?

যদুপতি অপ্রতিভ হয়ে বললেন, না না, আজ আর পাশার ছক নয়। বঙ্কিমের জ্বর হয়েছে শুনলাম, কেমন আছে তাই একবার দেখে আসব।

—বেশি দেরি কোরো না কিন্তু।

—না না। যদুপতি একবার সৌরীন আর একবার এণাক্ষীর দিকে কুণ্ঠিতভাবে তাকালেন : তোমরা বোসো, আমি এই এলাম বলে। আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরব।

একগাছা মোটা বেতের লাঠি আর একটা টর্চ হাতে যদুপতি বেরিয়ে গেলেন।

চিত্রা বললে, দেখো মা, বাবার ফিরতে সেই রাত বারোটা।

প্রভাস বললে, কোনো ভাবনা নেই, দেরি হলে আমি গিয়ে ধরে আনব। মা, তোমার রান্নার কতদূর ?

—হয়ে এল। ওদের বেশি রাত করাব না—তাড়াতাড়িই ছেড়ে দেব। এণাক্ষীর মাথায় সস্নেহে একবার হাত বুলিয়ে বললেন, তোমরা বোসো বৌমা, আমি এবার রান্নাঘরটা একবার দেখে আসছি।

কী মনে করে এণাক্ষী উঠে দাঁড়ালো।

—আমিও যাব আপনার সঙ্গে।

—রান্নাঘরে যাবে ? জ্যাঠাইমা হাসলেন : আচ্ছা এসো তবে।

কিন্তু বাধা দিলে প্রভাস তারস্বরে প্রতিবাদ করে উঠল।

—তার মানে? তোমার মতলব কী মা? তুমি কি বৌদিকে হেঁসেলে নিয়ে গিয়ে বেগুন ভাজতে বসিয়ে দেবে নাকি?

মা বললেন, ক্ষতি কী! না হয় বি. এ. পাসই করেছে—তাই বলে রান্নাবান্না করবে না? ঘরের বৌ কেমন হয়েছে সবদিক থেকে একবার বাজিয়ে দেখে নিতে হবে না?

প্রভাস বললে, চালাকি রেখে দাও। নিজে উঠে যাচ্ছ, তাই বৌদিকেও সঙ্গে সঙ্গে ভাগিয়ে নিয়ে যেতে চাও। ওখানে গিয়ে দুজনে মিলে গল্প জমানোর মতলব—ও চলবে না।

জ্যাঠাইমা হেসে এণাক্ষীর দিকে তাকালেন।

প্রভাস বলে চলল, অনেক কষ্টে নেমন্তন্ন করে এনেছি—বেগুন ভাজানোর জন্যে নয়। তুমি নিজেই কাজে যাও, আমাদের এখন গানের জলসা বসবে।

—তাই ভালো—বলে জ্যাঠাইমা চলে গেলেন।

এণাক্ষী বললে, রান্নাঘরে তো যেতে দিলেন না, কিন্তু গান গাইবে কে—আপনি?

প্রভাস বললে, গাইবই তো। কিন্তু কেবল আমি নই—তোমরাও বাদ যাবে না।

সৌরীন আস্তে আস্তে বলল, আমিও?

এণাক্ষী সকৌতুকে বলল, তুমি! প্রভাস ঠাকুরপোর প্রচুর ধৈর্য আছে আশা করি, কিন্তু অতটা বোধ হয় সইবে না।

চিত্রা শব্দ করে হেসে উঠল।

প্রভাস বললে, এটা অবিচার হচ্ছে বৌদি। সৌরীনদা যে একেবারে খারাপ গান তা নয়। আমাদের ছেলেবেলায় গ্রামে একসময় প্রভাতফেরী বেরুত—সৌরীনদা সেই দলে গান গাইতেন: 'জাগো জাগো দেশবাসী, দুখনিশি হল ভোর।' আমার এখনো মনে আছে।

সিগারেট ধরাতে ধরাতে সৌরীন বললে, সেই সঙ্গে আর একটা কথা বুঝি দাদার ওপরে ভদ্রতা করে চেপে গেলি? সেই প্রভাতফেরীর দল থেকেও বেসুরো গাইবার জন্যে আমাকে যে মধ্যে মধ্যে বের করে দেওয়া হত, সেকথা বুঝি এখন আর মনে নেই?

সম্মিলিত হাসিতে সমস্ত ঘর ভেঙে পড়ল। সবচাইতে বেশি জোরে, সবচাইতে বেশি উচ্ছ্বসিত হয়ে হাসতে চেষ্টা করল সৌরীন। এই ঘরে—একমাত্র তারই মনের ওপর একটা পাথরের ভার চেপে বসে আছে, একমাত্র তারই মনের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে আফাজদ্দির ছায়ামূর্তি, একমাত্র সেই ভুলতে পারছে না কাকাকে—নিথর রাত্রে নিদ্রাহীন চোখে অর্থহীন অন্তর্জ্বালার দীপ্তি জাগিয়ে যিনি কালপুরুষের মতো অতীতের মধ্যে পরিক্রমা করেন। তাই এই হাসিটা দরকার ছিল সৌরীনের, দরকার ছিল নিজের মনটাকে একটা প্রচণ্ড নাড়া দিয়ে স্বাভাবিক করবার জন্যে।

হাসি থামলে প্রভাস বললে, সত্যি বৌদি, গান শোনাও।

—আমি ভালো গাইতে পারি না।

—আমরাও খুব খারাপ গাই। ভালো গাওয়াটা আমাদের এই আসরে ডিস্‌কোয়ালিফিকেশান।

সৌরীন সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললে, তাহলে তো আমার ক্লেম সকলের আগে !
প্রভাস বললে, বেশ, তুমিই উদ্বোধন সঙ্গীত শুরু করো।
—তাহলে কিন্তু আমি উঠে যাবো এ ঘর থেকে ! এণাক্ষীর প্রতিবাদ শোনা গেল।
আবার হাসির ঢেউ উঠল।
হাসি থামলে প্রভাস বললে, নাঃ, খালি সময় নষ্ট হচ্ছে। বৌদি—
—না, আমি আগে নই।
—তা হলে চিত্রা।
চিত্রার হাসি তখনো থামেনি। তার কিশোর মনে একবার ঢেউ উঠলে সহজে থামতে চায় না। এণাক্ষী অনেকক্ষণ ধরেই লক্ষ্য করছিল মেয়েটিকে, কথা বলার চাইতেও হাসে বেশি—যেন হাসি দিয়েই গড়া। যদুপতির মনের প্রসন্নতা বয়েই যেন সে পৃথিবীতে এসেছে। হাসি বন্ধ করে চিত্রা বললে, বা রে, শেষে আমি !
প্রভাস বললে, হ্যাঁ, তুই। যা—ওঠ্ ! গুরুজনের আদেশ লঙ্ঘন করতে নেই।
—কী গাইব ?
—রবীন্দ্রসঙ্গীত।
অর্গ্যানের ওপর থেকে 'স্বরবিতান' নামিয়ে নিলে চিত্রা। কয়েকটা পাতা উলটে গান বেছে নিলে, আরম্ভ করলে : 'বসন্তে বসন্তে তোমার কবিরে দাও ডাক।' গলাটি মিষ্টি, সুরেলা। তবু এখনো শিক্ষানবীশ, সেটা বোঝা যায়।
গান শেষ হলে এণাক্ষী আর সৌরীন একবাক্যে বললে, চমৎকার !
চিত্রা বললে, ছাই ! আমি তো সবে শিখছি। দাদা বেশ ভালো গাইতে পারে।
প্রভাস চোখ পাকিয়ে বললে, খবরদার, তোকে পাকামো করতে হবে না। এবার বৌদির পালা।
সৌরীন খুশি হয়ে নড়েচড়ে বললে, ওইটে—'আসিতে তোমার দ্বারে—মনে হল—'
দ্বিধাভরে এণাক্ষী উঠল। গান গাইতে খুব উৎসাহ ছিল না, তবু এই বাড়ির পরিবেশে এসে যেন কেমন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিল সে। এইখানেই যেটুকু মুক্তি—এখানেই যেটুকু সম্ভব নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ। বাড়িতে ঢুকলেই তো দম-চাপা অন্ধকার এসে হৃৎপিণ্ডকে আঁকড়ে ধরতে চাইবে।
'সজল মেঘের ছায়া ঘনাইছে বনে বনে, পথ হারানোর বাজিছে বেদনা সমীরণে—'
ঝড়ের অন্ধকারে উৎসুক পাখির চোখ এসে যাত্রা শেষ করল বাতায়নের শান্ত আশ্রয়ে। প্রভাস বললে, কী বিনয়ই করেছিলে বৌদি ! এই বুঝি তোমার খারাপ গানের নমুনা ? আর একটা হোক।
লজ্জিত এণাক্ষী কপালের ঘাম মুছে বললে, না, এবার তুমি।
—অর্থাৎ বীণার সুর থামল, ব্যাঙের ডাক শুরু হল ! তা হোক, এ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্সেও একটা রস আছে। প্রভাস হাসল : আমি ভয় পাই না—তোমরা তো কমলবনবিহারিণীর প্রতিষ্ঠা করলে, এবার আমি না হয় 'কাঁটাবনবিহারিণী সুর-কানা দেবী'কেই ডাক পাঠাব !
প্রভাস গিয়ে অর্গ্যানে বসল।
'যখন তুমি বাঁধছিলে তার সে যে বিষম ব্যথা—'

আশ্চর্য দরাজ গলা—নিপুণ নিখুঁত শিক্ষা, গভীর অনুভূতি! মুহূর্তে চকিত হয়ে উঠল এণাক্ষী। এই ঘরের রূপ বদলে গেল—বদলে গেল পরিচিত প্রতিবেশ। একটা বিশাল দিগ্‌বিস্তীর্ণ আকাশ এসে চার দেওয়ালের সীমাকে নিঃশেষে মুছে নিয়ে গেল, বিশ্বপ্রাণের কিরণপূর্ণ পদ্মাসনে যে গীতিসত্তা আসীন হয়ে আছে—অন্তহীন অগ্নিধারা দিয়ে সে তারায় তারায় সুর বাঁধতে লাগল, জ্যোতির কণায় কণায় নিঝরিত হয়ে চলল সৃষ্টির আদি সঙ্গীত। এণাক্ষী প্রভাসের মুখ থেকে আর চোখ সরাতে পারল না।

গান থামল। কিন্তু সুর থামল না—তার দোলা থামল না। নক্ষত্রকীর্ণ অনন্ত আকাশের জ্যোতির্ময় বিলুপ্তির ভেতর থেকে অনেক পরে এই ঘর, চারিদিকের মানুষগুলো আর চেনা জীবন ধীরে ধীরে রেখায়িত হয়ে উঠল।

ভালো-মন্দ কোন কথা বলতে পারল না এণাক্ষী। শুধু তেমনি তাকিয়ে রইল প্রভাসের দিকে। তার রক্ত ছলছল করতে লাগল।

সৌরীন বললে, বেশ গাইলি তো তুই!

কী কুৎসিত—কী বেসুরো কথাটা! এণাক্ষীর হঠাৎ ভারী খারাপ লাগল সৌরীনকে। সৌরীন সত্যিই গান বোঝে না। বোঝে না যে সংসারে এমন অনেক গান আছে—যা স্তবের মতো, যা ধ্যানের মতো, যা ভালো-মন্দের বাইরে, যা আকাশের তারায় তারায় সীমা ছাড়ায়—কূল হারায়।

প্রভাস বললে, আমার গানের কথা ছেড়ে দাও—বৌদিই আসর মাৎ করেছেন।

সৌরীন বললে, তুই মন্দ গাসনি।

আবার কুৎসিত লাগল কানে। কেন আজ এত স্থূল হয়ে যাচ্ছে সৌরীন? প্রভাসের এই গানের পরে তার গান? কোনো তুলনা চলে? প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে হল, কিন্তু এই মুহূর্তে কথা বাড়াবার কোনো প্রেরণা সে খুঁজে পেলো না।

প্রভাস বললে, আমার একটা আইডিয়া এসেছে বৌদি!

এণাক্ষী তাকিয়ে রইল।

—কাল আমরা বজরা নিয়ে বেরুব বিলে। বজরাতেই স্টোভ থাকবে, রান্না হবে—সারাদিন জলের ওপর আমরা ঘুরে বেড়াব। মোবাইল পিকনিক। আর গান চলবে সেই সঙ্গে। তুমি, সৌরীনদা, আমি আর চিত্রা। কেমন, রাজী?

চিত্রা খুশি হয়ে হাততালি দিল. বাঃ, চমৎকার হবে!

—সৌরীনদা, কী বলো?

—বেশ তো, খাসা আইডিয়া।

এণাক্ষীর কেমন ভয় করতে লাগল। একটু আগেই এই ঘরে একটা আকাশ এসেছিল, তার বুককে দুলিয়ে দিয়েছিল—হঠাৎ মনে হয়েছিল এইরকম গানের সুরে যে-কোন সময় একটা অঘটন ঘটে যেতে পারে। তার ওপর বিল। সেখানে শুধু গান নয়, প্রভাসের বন্দুকও আছে। একটা উজ্জ্বল পৌরুষ আর এই অদ্ভুত গান! এণাক্ষীর মন বললে, থাক—কালকে থাক।

কিন্তু মনের কথা বাইরে থেকে শোনা যায় না। প্রভাস উচ্ছ্বলিত হয়ে বললে, তা হলে কিন্তু কথা রইল বৌদি, কাল সকালের দিকেই বোট নিয়ে বেরুব আমরা।

ঠিক এই সময়ে যদুপতি রায় এসে ঘরে ঢুকলেন।

॥ নয় ॥

'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো,
একলা রাতের অন্ধকারে আমি চাই পথের আলো—'

গান জমে উঠেছিল কোরাসে। তিনজন গাইছিল।

প্রভাস, এণাক্ষী, চিত্রা। দাঁড়ি দুজন যেন নিজেদের অজ্ঞাতেই তালে তালে দাঁড় ফেলছিল গানের সঙ্গে, হালের মাঝির মাথা নড়ছিল অল্প অল্প। বেরসিক সৌরীন বেতালাভাবে কাঠের ওপর তবলা বাজিয়ে চলেছিল।

সকাল থেকে চমৎকার কাটছে দিনটা। এ মালঞ্চের রায়বাড়ি নয়—যেখানে ছায়াশীতল স্যাঁতসেঁতে ভিজেমাটির পথটা একটা সাপের খোলসের মতো পুরোনো শিবমন্দিরের পাশ দিয়ে বড় বড় গজাল-বসানো রায়বাড়ির বিরাট দরজাটায় গিয়ে শেষ হয়েছে। তার সঙ্গে এর মিল নেই। কালো কালো কড়ি-বরগাওলা গম্ভীর ঘরগুলো এখানে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে নিষেধের ভ্রূকুটি করছে না, চণ্ডীমণ্ডপে একটা বিরাট কেরোসিনের ডিবে থেকে যে লাল আলো ছড়িয়ে পড়ে, সেই আলোয় কাকার দীর্ঘ ভৌতিক ছায়াটার মতো কোনো ছায়া নেই এখানে। অনেকখানি আকাশের নিচে আরো অনেকখানি জল দুলছে এখন, ছোট ছোট ফেনার ফুল ফুটছে—রায়বাড়ির জেলখানা থেকে বেরিয়ে এসে এণাক্ষী যেন মুক্তির স্বাদ পেয়েছে এখানে।

আজকে আর এই জলকে ভয় নেই এণাক্ষীর। হয়তো দু তিনদিন ধরে এর সঙ্গে পরিচয় হওয়ার ফলে প্রথম দেখার আতঙ্ক খানিকটা সহজ হয়ে এসেছে—হয়তো পরিবেশের প্রভাব, হয়তো অবচেতন মনে এ অনুভূতিও রয়েছে যে সঙ্গে প্রভাস আছে—রক্ষা করবার জন্যে বীরের মতো দক্ষিণ হাতে যে অস্ত্র ধরতে পারে, যার অব্যর্থ লক্ষ্যে গোখরো সাপের ফণা তোলা মাথাটা তিন হাত দূরে ছিটকে পড়ে।

সুতরাং চমৎকার কাটছে দিনটা। এই জল সমুদ্রের মতো। এর ভেতরে ইতস্তত কুমীর ভেসে বেড়াচ্ছে জেনেও আজ আর এণাক্ষীর ভয় করছে না—আধডোবা গাছের মাথায় জড়িয়ে থাকা গোক্ষুর-কেউটেদের দেখে দেখে চোখ অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কোথাও ঘোলা, নীলিম—আবার কোথাও কালীদহের মতো কালো জলের রঙ দেখতে তার ভালোই লেগেছে। সৌরীনের নিষেধ না শুনেই হাত বাড়িয়ে ছিঁড়ে নিয়েছে দাম-ঘাসের শিষ।

—বেশ লাগছে সত্যি। খুব ভালো লাগছে।

—তবু তো কলকাতা ছেড়ে বেরুতেই চাও না বৌদি! প্রভাসের অনুযোগ।

—বা রে, সে তো তোমার দাদার জন্যেই। নিয়ে না এলে আসব কী করে?

প্রভাস হাসল : নিজের জোরে। তুমি তো কলেজে পড়েছো বৌদি!

উত্তরে এণাক্ষীও হাসল : কলেজে কমার্শিয়াল জিয়োগ্রাফী পড়েছিলাম। তাতে ভারতবর্ষের কোথায় কত কয়লা আর পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায় তার খবর ছিল। কিন্তু মালঞ্চের কোনো নাম ছিল না।

কথা হচ্ছিল বজরায় নয়—একটা উঁচু ডাঙার ওপর। চা খাওয়ার জন্যে সেখানে

বজরা বাঁধা হয়েছিল। সতরঞ্চির ওপর পা ছড়িয়ে বসে, চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে গল্প করছিল এণাক্ষী আর প্রভাস। সৌরীন আর চিত্রা সেখানে ছিল না। বোটের একজন দাঁড়ী এক জায়গায় গোটা চল্লিশেক কাছিমের ডিম আবিষ্কার করেছিল, চিত্রা সেগুলো দেখাবার জন্যে সৌরীনকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। প্রভাস বললে, কথাটার মানে এই দাঁড়ালো যে কমার্শিয়াল জিয়োগ্রাফীতে যে কটি জায়গার নাম পেয়েছ, তুমি নিজের জোরেই সে-সব জায়গা ঘুরে এসেছ! অর্থাৎ কোলারের সোনার খনি থেকে আসামের অয়েল ফিল্ড পর্যন্ত কিছু আর বাকী রাখো নি!

এণাক্ষী জবাব দিলে, ঠাট্টা করতে পারো, কিন্তু এদের সব জায়গাতেই আমি ঘুরে বেড়িয়েছি। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'মনে মনে ভ্রমিয়াছি দূর সিন্ধুপারে।' তুমি জানো না, আমাদের কলকাতার বাসায় অনেক দিনের পুরোনো একটা 'ব্রাড্‌শ' আছে। এক-একদিন দুপুরে তোমার দাদা অফিসে চলে যাওয়ার পরে যখন কিছুতেই আমার ঘুম আসে না, তখন আমি সেইটে খুলে বসি। ইচ্ছে হল অমনি সঙ্গে সঙ্গে নীলগিরি এক্সপ্রেসে চেপে আমি উট্‌কামণ্ডে চলে গেলাম। সেখানে ভালো লাগল না —সঙ্গে সঙ্গে ত্রিবান্দ্রম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমি পাঠানকোট থেকে বাসে চেপে কাশ্মীর রওনা হলাম। তারপরেই দেখি একটা বিড়াল এসে ঢুকেছে রান্নাঘরে। তৎক্ষণাৎ ফিরে এলাম কলকাতায়, লাঠি নিয়ে তাড়া করলাম বেড়ালকে।

শব্দ করে হেসে উঠল প্রভাস। হাসির ধাক্কায় খানিক চা ছল্‌কে পড়ল পেয়ালা থেকে।

—তোমার ভ্রমণকাহিনীর শেষটুকু চমৎকার বৌদি! একেবারে মাস্টার টাচ্! ইচ্ছে করলে তুমি গল্প লিখতে পারতে। এরকম দু'একটা ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখে কাগজে কাগজে পাঠিয়ে দাও।

—কেউ ছাপবে না ঠাকুরপো। সবাই ভাববে আমি ভ্রমণকাহিনীর লেখকদের ঠাট্টা করছি।

প্রভাস বললে, তা বটে। আরো বিশেষ করে এই ভ্রাম্যমানদের যুগে। যাই হোক, তুমি তো মনে মনে ঘুরেছ—আমি কিন্তু সত্যিসত্যিই ভারতবর্ষের অনেক জায়গা বেড়িয়ে এসেছি—তোমার উট্‌কামণ্ড, ত্রিবান্দ্রম, কাশ্মীর—সব। ভাবছি আসছে বছর আন্দামান যাব।

—আমাকে নিয়ে যাবে সঙ্গে? হঠাৎ বলে ফেলল এণাক্ষী।

—সে তো খুব ভালো কথা। কিন্তু সৌরীনদাকে টেনে বের করতে পারবে কলকাতা থেকে?

—নাই বা গেলেন উনি। আমরা দু-জনেই যাব।

—আমরা দুজনেই! প্রভাস কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালো এণাক্ষীর দিকে: কিন্তু সৌরীনদা রাজী হবেন?

প্রভাসের শেষ কথাটা শোনবার আগেই এণাক্ষী চমকে উঠল। প্রভাসের দৃষ্টিটা তাকে কী একটা কথা মনে পড়িয়ে দিলে। বড় একটা জলের ঢেউ একরাশ ফেনা নিয়ে পায়ের কাছে এসে আছড়ে পড়ল তখন।

আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দেবার জন্যে এণাক্ষী কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, সেই

সময়ে সৌরীন আর চিত্রা ফিরে এল। চিত্রার হাতে গোটাকয়েক সাদা গোল ডিম। চিত্রা বললে, আচ্ছা দাদা, এই ডিমগুলো বাড়ি নিয়ে গেলে এদের ভেতর থেকে কচ্ছপ বেরুবে?

প্রভাস হেসে বললে, তুই তা দিয়ে দেখতে পারিস!

চিত্রা রাগ করে বললে. আমি খামোখা তা দিতে যাব কেন? আমি কি কচ্ছপ?

—না হয় প্রক্সি দিবি!

হাসির ঢেউ উঠল। একটা কিছুর ছায়া ঘনিয়ে আসতে চাইছিল, সেটা হাওয়ায় উড়ে গেল।

তবু চমৎকার কাটছে দিনটা। চায়ের পরে চা—গানের পর গান—হুল্লোড় করে খিচুড়ি রান্না—আরো হুল্লোড় করে খাওয়া। এরই মধ্যে বজরা থেকে খানিক দূরে গিরগিটির মুখের মতো কুমীরের একটা মাথাও দেখা গিয়েছিল একবার। সকলে এক সঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠায় সেটা টুপ করে জলের মধ্যে ডুব মারল—প্রভাস তার বন্দুকটা নিয়ে আসবারও সময় পেলো না।

এখন প্রায় বিকেল হয়ে এসেছে। দশ-বারো মাইল এই বিলের ভেতরে ঘুরে বেড়াবার পর বজরা এখন ফেরার দিকে। আকাশে এখন শান্ত নীল, রোদে এখন পাকা আমের মতো সোনালি-লালচে রঙ। বজরার ছাতের ওপর কোরাস চলছিল:

"দুন্দুভিতে হল রে কার আঘাত শুরু—
বুকের মধ্যে উঠল বেজে গুরু গুরু গুরু গুরু—"

ঠিক সে সময়েই দুন্দুভিতে আঘাত পড়ল।

অনেক দূরের আকাশে কালো মেঘ ডানা মেলল।

গানের ঝোঁকে ওদের কারো খেয়াল হয় নি—কিন্তু মাঝির চোখ পড়েছিল। মাঝি চেঁচিয়ে বললে, টেনে যা—আরো তাড়াতাড়ি গাঁয়ের দিকে টেনে চল। এখনো দেড় ক্রোশ সামনে।

গান থামিয়ে প্রভাস চকিত হয়ে বললে, কী হয়েছে?

—মেঘটা ভালো নয় বাবু। আরো অসময়ের মেঘ।

সমস্ত খুশির কে যেন গলা টিপে ধরল। বেসুরো হয়ে গেল সব গান।

দেখতে দেখতে আরো বড়—আরো অতিকায় হয়ে উঠল মেঘখানা। আরব্য উপন্যাসের গল্পে যেমন দৈত্যটা একটু একটু করে কলসীর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, তেমনি ভাবে দু'তিন মিনিটের মধ্যে মেঘটা আধখানা আকাশকে ছেয়ে ফেলল। বিলের জল কালো হয়ে এল দূরে।

প্রভাস বললে, সৌরীনদা, বৌদি—তোমরা সবাই বজরার ভেতরে চলে এসো।

পাংশু হয়ে সৌরীন বললে, ঝড় উঠবে নাকি?

প্রভাস বললে, তাই তো মনে হচ্ছে।

—কী হবে তবে? এণাক্ষী শুকিয়ে উঠল।

—কোনো ভয় নেই। এত সহজেই ভারী বজরার কিছু হবে না। এসো—নেমে এসো নীচে—

কিন্তু প্রভাসের অভয় শেষ হওয়ার আগেই আকাশ ছেয়ে আসা দুন্দুভি গুরু গুরু

করে উঠল। আর সেই সঙ্গে এল সেই আচমকা হাওয়াটা।

এই হাওয়াকে এণাক্ষী কখনো চেনেনি—সৌরীন এর কথা ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু মাঝি একে চিনত—প্রভাস একে জানত। এ উত্তরবঙ্গের সেই ভুতুড়ে হাওয়া—যা হঠাৎ আকাশ থেকে আছড়ে পড়ে চক্ষের পলকে প্রকাণ্ড গাছকে উপড়ে দিয়ে যায়, উড়িয়ে নেয় ঘরের চাল, মাঠের গোরু-ছাগলকে বিশ-পঁচিশ হাত দূরে নিয়ে গিয়ে আছড়ে ফেলে দেয়। কালো মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের একটা কঠিন হাসি হেসে এই হাওয়াটা নিষ্ঠুর খেয়ালী হাতের মতো নেমে এল—সেই হাত, যা নির্বিচারে সব কিছুকে ভেঙেচুরে একাকার করে দিয়ে যায়।

অতবড় বজরাটা যেন জল ছেড়ে হাত-চারেক লাফিয়ে উঠল। মাঝি-দাঁড়ীরা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল: সামাল্—সামাল্—সামাল্—

আর সব কিছুকে ছাপিয়ে প্রভাসের গলা ফেটে পড়ল: চলো—চলো—ভেতরে নেমে চলো—

সমস্ত বিলের জল এখন কালকেউটের রঙের মতো কালো। আধ হাত ঢেউগুলো তিন হাত হয়ে উঠছে চক্ষের নিমেষে। জলতরঙ্গে এখন দুন্দুভির বোল শুরু হয়েছে। এক পলকে চারদিকের পৃথিবী ধরেছে মারণ-মূর্তি।

হুড়হুড় করে চারজনে নিচে নেমে চলছিল, ঠিক তক্ষুনি আবার সেই বিদ্যুৎ-রাঙানো খেয়ালী হাতখানা এসে পড়ল ওদের ওপর। তার আঙুলের ছোঁয়া লাগল এণাক্ষীর গায়ে। বজরা আবার লাফিয়ে উঠতে না উঠতেই এণাক্ষী একটা শুকনো পাতার মতো বিলের মধ্যে উড়ে পড়ল।

চিৎকার, আর্তনাদ, হাওয়ার শব্দ, জলের গর্জন। তার ভেতরে এণাক্ষীর বিহ্বল বিভ্রান্ত চেতনা বারকয়েক জলের ওপর ভেসে উঠতে চাইল, আর প্রত্যেকবারই নাকে-মুখে হিংস্র ঢেউয়ের নিষ্ঠুর ঘা তাকে অতলে তলিয়ে দিতে চেষ্টা করতে লাগল।

তারপর এণাক্ষী ডুবল। একরাশ দামঘাস সাপের মতো লিক লিক করে তাকে জড়িয়ে ধরতে এল জলের তলা থেকে। সহস্রবাহু অক্টোপাশের মতো ওরা যেন এতক্ষণ এরই জন্য অপেক্ষা করছিল।

বাঁচবার প্রাণপণ চেষ্টায় এণাক্ষী শেষবারের মতো ওপরে ভেসে উঠল। খুঁজতে চাইল সৌরীনের মুখ, তার বাহুর নিরাপদ নিশ্চিত আশ্রয়। কিন্তু কোথায় সৌরীন—কোথায় কে! সামনে পেছনে মাঝরাতের মতো কালো অন্ধকার—সে অন্ধকার রাক্ষসের মতো গর্জন করছে। আবার একরাশ ঢেউয়ের ক্ষমাহীন দয়াহীন আঘাত তার মুখের ওপর এসে পড়ল—খানিকটা বিস্বাদ জল গিলে এণাক্ষী আবার ডুবতে লাগল জলের তলায়—বিলের বিরাট মুখের ভেতরে—যেখানে সহস্রবাহু অক্টোপাশের মতো দামঘাস-গুলো ওরই জন্যে প্রতীক্ষা করে আছে। এণাক্ষী ডুবল।

অন্ধকারে একেবারে হারিয়ে যেতে যেতে—হৃৎপিণ্ডের ভেতরে তীব্র যন্ত্রণার সঙ্গে লড়াই করতে করতে এণাক্ষী টের পেল কী যেন ঝপাং ঝপাং করছে আশপাশে।

হয়তো সেই কুমীরটাই। শিকার খুঁজছে।

হৃৎপিণ্ডটা একেবারে ফেটে যাওয়ার আগেই এণাক্ষীর অনুভূতির শেষ বিন্দুটিও মুছে গেল।

॥ দশ ॥

মৃত্যুর পরে নতুন করে জেগে উঠল এণাক্ষী।

চারদিকে সমুদ্রের ধ্বনি। মাথার ওপর এক আকাশ তারা। এণাক্ষীর সমস্ত শরীরটা শূন্যে ভাসছে। মরবার পরে কি এমনিই হয়? মাটি নেই, পৃথিবী নেই—কোথাও কিছুই নেই। শুধু কালো সমুদ্র—ঢেউয়ের পরে ঢেউ, গর্জনের পর গর্জন—তার কিনারা নেই—তার তলা পাওয়া যায় না। আর আছে একটা আকাশ—যে তারায় তারায় ডাক পাঠায়, বলে, যেখানে খুশি চলো। যতদূরে খুশি চলো। তার শেষ নেই। মানুষের সমাপ্তি মাত্র একবারই আছে—সে তার মৃত্যুতে; সে সীমা তুমি যখনই পার হয়ে গেলে—তারপরেই তুমি অশেষের মধ্যে মুক্তি পেলে।

এণাক্ষীর কুয়াশাঘেরা চেতনার ওপর এমনি করেই কতগুলো অনুভূতির বুদ্বুদ ফুটে উঠেছিল। কালকের সেই গানটা কে যেন তার কানের কাছে গুঞ্জন করে ফিরছে। আর মাটিতে নয়—এবার আকাশে আকাশে, তারায় তারায়।

"বাঁধলে যে-সুর তারায় তারায়
অন্তবিহীন অগ্নিধারায়
সেই সুরে মোর বাজাও প্রাণে তোমার ব্যাকুলতা—"

—কেমন আছো এখন? কে ডাকছে? সৌরীন? কিন্তু সৌরীন এল কী করে? কেমন করে এল তার সঙ্গে? তা হলে—? চকিতে স্মৃতির বিদ্যুৎ উদ্ভাসিত হল। মনে পড়ে গেল বজরা—ঝোড়ো হাওয়া—তারপর ঃ

একটা চাপা চিৎকার করে উঠল এণাক্ষী। কেউ বেঁচে নেই—কেউ না। সবাই একসঙ্গে ওই অতলান্ত বিলের জলে ডুবে মরেছে তারা। সে, সৌরীন, চিত্রা, প্রভাস—

—ভয় নেই বৌদি, কোনো ভয় নেই। প্রভাসের গলা ঃ তাকাও আমার দিকে—

এণাক্ষী চোখের তারা ঘুরিয়ে দেখতে চেষ্টা করল। মস্তিষ্কের ভেতর তখনো কুয়াশা ঘুরছে, দৃষ্টির সামনে রাত্রির অন্ধকার। তবু সেই অন্ধকারে সে দেখতে পেলো তার পাশে প্রভাস বসে আছে।

—এ কোথায় এসেছি ঠাকুরপো? এণাক্ষী ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল। মৃত্যুর পরে—আবছায়া অন্ধকারের জগতে—আকাশভরা তারায় আর সমুদ্রের শব্দের ভেতরে তারা এ কোন্ জগতে এসে পৌঁছুল? সৌরীনই বা কোথায়? এণাক্ষীর স্বর তীব্র হয়ে উঠল ঃ তোমার দাদা কোথায়?

—নিরাপদেই আছেন খুব সম্ভব। বজরা ডোবেনি—ঝড়ের মধ্যে পাল তুলে ছুটে গেছে দক্ষিণের দিকে। আমরা দুজনে কোনোমতে এই ডাঙাটায় এসে উঠেছি।

তা হলে মৃত্যু নয়! সে জলে ডুবে গিয়েছিল, প্রভাস উদ্ধার করেছে তাকে! সঙ্গে সঙ্গে এণাক্ষী উঠে বসল। আবছা আবছা তারার আলোয় স্পষ্ট করে দেখতে পেলো সব।

নিচে একরাশ ভিজে ঘাস। পাশেই দুটো কালো কালো ডালসর্বস্ব বেঁটে গাছ ছায়ামূর্তির মতো দাঁড়িয়ে—খুব সম্ভব বাব্‌লা। একটু দূরেই অন্ধকার জলে লক্ষ লক্ষ সাপের ফণায় ফেণা ছুটছে। প্রভাস তার পাশে চুপ করে বসে আছে অপরাধীর

মতো। জামাকাপড় গায়ের সঙ্গে লেপ্‌টে আছে—মাথার চুলগুলো ছড়িয়ে পড়েছে গালে কপালে।

প্রভাসের বেশবাসের চেহারা দেখে নিজের কথা মনে পড়ল এণাক্ষীর। লজ্জায় কুঁকড়ে গেল শরীর। কিন্তু এখন আর কিছুই করবার নেই। তা ছাড়া রাত্রির এই আবছায়া অন্ধকারটুকু তার খানিক আবরণ—নিরুপায়ের আংশিক লজ্জাবাস।

তবু ওর মধ্যেই ত্রস্তভাবে সে গায়ের কাপড় যথাসাধ্য গুছিয়ে নিলে। প্রভাস মাথা নামিয়ে দু হাতে মুখ ঢাকল। শুধু সৌজন্য দেখানোই নয়—একটা ক্ষোভে, মনের ভেতরকার একরাশ তীব্র গ্লানিতে সেও যেন আর মাথা তুলে চাইতে পারছে না।

এণাক্ষী চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। দিগন্ত-বিস্তার জলের একটানা হু হু শ্বাসে তার শীত করছে এখন। দাঁতে দাঁতে কাঁপুনি বেজে উঠল। কিন্তু কিছুই করবার নেই। অন্তত গায়ের ভিজে জামাটা খুলে ফেলতে পারলেও হত। কিন্তু এই ছোট চরটুকুর ওপরে সেরকম একটু আড়ালও নেই কোথাও।

কাঁপা গলায় এণাক্ষী বললে, এখন কী হবে ঠাকুরপো ?

হাতের মধ্যে মাথা লুকিয়ে প্রভাস বললে, কিছু ভেবো না বৌদি। এতক্ষণে আমাদের খুঁজতে নৌকা বেরিয়ে পড়েছে চারদিকে।

—এই অন্ধকারে খুঁজে পাবে ?

—আশা তো করছি।

—যদি না পায় ?

প্রভাস আবার চুপ করে রইল, তারপর আস্তে আস্তে মাথা তুলল। কিন্তু এণাক্ষীর দিকে তাকালো না—সাপের ফণা তোলা অন্ধকার জলের দিকে ছড়িয়ে দিলে দৃষ্টিটা।

—তা হলে—তা হলে—

এণাক্ষী অধৈর্য হয়ে উঠল। কাঁপতে কাঁপতে তীক্ষ্ন স্বরে বললে, তা হলে কী ?

—বাকী রাত এখানে বসেই কাটাতে হবে। ভোরের আলো ফুটলে নৌকো আসবেই এদিকে।

—ভোরের আলো ! রাত এখন কটা হবে ঠাকুরপো ?

প্রভাস বাঁ হাতটা চোখের সামনে তুলে ধরল। ওয়াটারপ্রুফ-ঘড়িটা জলে নষ্ট হয় নি—তার রেডিয়াম ডায়ালে কয়েকটা উজ্জ্বল জ্যোতির্বিন্দু ঝিকমিক করছে। প্রভাস বললে, সাড়ে আটটা।

—মোটে সাড়ে আটটা ! ততক্ষণ এই চড়ার ওপরে—এই ভিজে কাপড়জামায়—

—কোনো উপায় যে নেই বৌদি।

—আমি পারব না ঠাকুরপো—এ আমি কিছুতেই পারব না।

ক্ষোভে আর বেদনায় প্রভাসের মাথা আবার নিচু হয়ে এল। আস্তে আস্তে বললে, যদি নদী হত বৌদি, আমি জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়তাম, সাঁতার কেটে কোথাও গিয়ে একখানা নৌকা যোগাড় করে আনতাম। কিন্তু এই বিলের যে কূলকিনারা পাওয়ার যো নেই ! এ জল ঠেলে আমি কোথায় যাব ?

ঠিক কথা। কিন্তু তবু এ কী করে সইবে এণাক্ষী ?

কেমন করে এই নির্জন চরের ওপর রাত কাটাবে সে আর প্রভাস ? তা ছাড়া

প্রভাসকে বিশ্বাস করবার মতো কতটুকু সে জানে? দুটো পরিবারের মধ্যে তিক্ত বিদ্বেষের যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এতদিন ধরে—তার কোনো ছায়াই কি প্রভাসের মনে পড়েনি? আজ এখানে যদি প্রভাস তার বীভৎস কোনো প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করে—

মুহূর্তে শরীরটা শক্ত হয়ে এল তার। এতক্ষণ হাত পা কুঁকড়ে যাচ্ছিল—এক ঝলক বিদ্যুৎ এখন বয়ে গেল রক্তের মধ্য দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল হাতের ভারী কঙ্কণজোড়ার কথা। আরো মনে পড়ল, সৌরীন এই কঙ্কণ কিনে দিয়ে তাকে বলেছিল, এণা, আজ এরা কেবল হাতের গয়না, কিন্তু একসময়ে ছিল অস্ত্র। এর ধারালো মুখগুলো ছিল মেয়েদের আত্মরক্ষার প্রধান উপায়। ভারী ধারালো কাঁকনের একটি ঘা শত্রুর মুখে বসিয়ে দিতে পারলে আর দেখতে হত না।

তার হাতেও কাঁকন আছে। অত ভারী নয়—অত ধারও নেই। তবু তা দিয়ে কি আত্মরক্ষা করতে পারবে না এণাক্ষী? কিন্তু তারপরেই সে লজ্জিত হল। কেন সে ভাবছে এ-সব কথা? কেন সে এমন করে অবিশ্বাস করছে প্রভাসকে? যদিও মুখ ফুটে প্রভাস এখনো কোনো কথা বলেনি, তবু এ সত্য তার বুঝতে বাকি নেই যে সে যখন বজরা থেকে জলে পড়ে গিয়েছিল, তখন সঙ্গে সঙ্গেই ঝাঁপ দিয়ে পড়ে তার প্রাণ বাঁচিয়েছে প্রভাস,—হয়তো নিজের প্রাণ বিপন্ন করেই তাকে বাঁচিয়েছে। এই কি তার কৃতজ্ঞতা? এই সন্দিগ্ধ ভাবনা—শত্রুর কাছ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে তৈরী হওয়া?

এণাক্ষী তাকিয়ে দেখল। অন্ধকার জলের দিকে দৃষ্টি ফেলে প্রভাস নিজের মধ্যে মগ্ন হয়ে আছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, সবই আমার জন্যে বৌদি। আমিই তো তোমাদের বিলে বেড়াবার জন্যে ডেকে এনেছিলাম।

ম্লান গলায় এণাক্ষী বললে, তোমার আর দোষ কী? দুর্ঘটনার ওপরে তো কারো কোন হাত নেই।

—তবু আমার সাবধান হওয়া উচিত ছিল।

—সাবধান হয়ে তুমি কী করতে? ঝড় ঠেকাতে পারতে?

প্রভাস আবার চুপ করে রইল। এণাক্ষীও আর কথাটার জের টানল না। সেই শীতটা সারা শরীরে যেন একরাশ সাপের শীতল আলিঙ্গনের মতো জড়িয়ে ধরেছে। মাথার ওপরে আকাশটাও যেন বরফ দিয়ে ঢাকা—প্রত্যেকটা তারা থেকেও যেন হিমের বিন্দু ঝরছে। আঃ, একটু আগুন যদি কোথাও পাওয়া যেত! থেকে থেকে হাওয়া আসছে—তীব্র শীতের অনুভূতিকে তীব্রতর করে তুলছে, এণাক্ষীর ঠোঁটে একটা চাপা গোঙানি এসে থমকে গেল।

যদি কোনো নৌকো না আসে? যদি সারারাত দুজনকে এভাবে এখানে বসে কাটাতে হয়?

কী ভাবে সইবে এণাক্ষী? কেমন করে কাটাবে এই দীর্ঘ সময়? সইবে এই মানসিক যন্ত্রণা? শীতে আর ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে—প্রভাসকে অবিশ্বাস করতে করতে?

প্রভাস আবার বললে, আমার সৌরীনদার কথা মনে হচ্ছে। কী যে ভাবছেন তিনি!

সৌরীন! আবার চমকে উঠল এণাক্ষী। কী ভাবছে সৌরীন? এণাক্ষী মরে গেছে? কাঁদছে তার জন্যে? অসহায় দুর্বল স্বামী—মাত্র সেদিন টাইফয়েড থেকে উঠেছে, এই আঘাতে কেমন হয়েছে তার অবস্থা? কিন্তু যদি সত্যিই মরে যেত এণাক্ষী, বিলের

এই রাক্ষুসে জল তাকে গ্রাস করত, তাহলে সে যন্ত্রণাও একদিন সয়ে যেত সৌরীনের—আজকের ক্ষত আর ক্ষতিকে একসময় সে ভুলে যেতেও পারত। কিন্তু—কিন্তু আর একটা কুটিল ভয়াবহ চিন্তায় মুহূর্তে তার স্নায়ুগুলো অবশ হয়ে গেল। কিন্তু সে বেঁচে আছে, আর নির্জন এই দ্বীপে রাত কাটিয়েছে প্রভাসের সঙ্গে—এই ক্ষতি, এই মানসিক ক্ষয়ের হাত থেকে কেমন করে রক্ষা পাবে সৌরীন? সে নিজে যত জ্বলবে, তার চাইতেও অনেক বেশি করে জ্বলবে এণাক্ষী—জীবনে দুজনে কখনো আর সহজ হতে পারবে না। সৌরীনের মনের ওপর একটা সূক্ষ্ম ঘৃণা আর অবিশ্বাসের আবরণ তাদের চিরদিন আড়াল করে রাখবে।

এণাক্ষী আবার চিৎকার করে উঠল—চিৎকার করে উঠল নিজেকে সামলাতে না পেরেই।

—আমি পারব না ঠাকুরপো, এভাবে কিছুতে থাকতে পারব না!

—কী করতে পারি বৌদি? কোন উপায় নেই যে। আর্ত অসহায় স্বরে প্রভাস জবাব দিলে।

—আমি এই জলের মধ্যেই ঝাঁপ দিয়ে পড়ব।

—কী বলছ তুমি?

—এভাবে এখানে থাকতে গেলে আমি মরে যাব।

তিলে তিলে মরে যাওয়ার চাইতে জলে ডুবে মরা ভালো। হঠাৎ একটা অসহ্য বিরক্তি প্রভাসের মনটাকে বিষাক্ত করে তুলল, কী অদ্ভুত স্বার্থপরতা—কী নীচ অবিশ্বাস! জলে ডুবে মরতে যাচ্ছিল, নিজের জীবন বিপন্ন করে প্রভাস তাকে বাঁচিয়েছে। কী দুঃখ আর কী প্রাণান্ত প্রয়াসে সে এণাক্ষীকে এখানে টেনে তুলতে পেরেছে একমাত্র সে-ই তা জানে। থেকে থেকে ঢেউয়ের ঝাপটায় তার নাক-মুখ জলে ভরে যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল যে কোনো সময় তার দম ফেটে যেতে পারে, তার মধ্যে থেকে থেকে এণাক্ষী এমন করে তাকে জাপটে ধরছিল যে শরীরে মনে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের শক্তি না থাকলে অনেক আগেই দুজনে অতলে তলিয়ে যেত। এত করেও শেষ পর্যন্ত এই তার পুরস্কার!

প্রভাস দাঁতে দাঁত চাপল। বলতে ইচ্ছে করল, তাই করো—ডুবেই মরো। তুমিও নিষ্কৃতি পাও, আমিও বাঁচি। হয়তো সেই কথাই বলতে যাচ্ছিল, কিংবা কোমল কোনো সান্ত্বনা বেরিয়ে আসতে চাইছিল মুখ দিয়ে। কিন্তু তখনই অন্ধকারের বুকের ভেতর একরাশ কর্কশ কান্না বিদীর্ণ হয়ে পড়ল। যেন রাত্রির আড়ালে মুখ গুঁজে বসে থাকা একটা ডাইনী হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠেছে।

—ও কি ঠাকুরপো, ও কি!

আবার সেই উতরোল উৎকট কান্না তরঙ্গিত হয়ে পড়ল চারদিকে। যেমন কর্কশ, তেমনি ভয়ংকর।

—ভয় নেই বৌদি—ভয় নেই। ওরা হচ্ছে—

কিন্তু প্রভাস শেষ করতে পারল না কথাটা। আবার জ্ঞান হারিয়ে এণাক্ষী ভিজে মাটির ওপরে এলিয়ে পড়ল। অশরীরী কান্নার শব্দটা থেকে থেকে জেগে উঠতে লাগল—তারপরে চলতে লাগল একটানা অবিচ্ছিন্ন ভাবে। আর সেই শব্দেই যেন ঘুম থেকে চমকে উঠে কয়েকটা গাংশালিক আর্তনাদ করে চলল: টিট্টি—টিট্টিহু—টিট্টিহু—

॥ এগারো ॥

কাঁদছিল বকের ছানা। ওরা অমনি করেই কাঁদে। নিথর রাতে নির্জন পথ দিয়ে যেতে অন্ধকার ভুতুড়ে গাছ থেকে ওই রকম আকস্মিক তীক্ষ্ণ কান্না শুনে অনভিজ্ঞেরা ভয় পেয়েছে অনেকবার। হঠাৎ মনে হয় একদল শিশু যেন মৃত্যুযন্ত্রণায় ড়ুকরে উঠছে। শব্দটা যেমন কুৎসিত—তেমনি আতঙ্ককর।

এণাক্ষীকে সেকথা বুঝিয়ে তাকে স্বাভাবিক করে তোলার চেষ্টা করতে গিয়েও থমকে গেল প্রভাস। এই দ্বীপের ওপর এখন রাত নামছে—চারদিকে অন্ধকার দুলছে জলের ওপর। এই রাত—এই অন্ধকার—এই কালো জল যেন প্রভাসের রক্তের মধ্যেও সঞ্চারিত হচ্ছে কণায় কণায়। হঠাৎ যেন তার গায়ের ওপর দিয়ে কিলবিল করে একটা ঠাণ্ডা সাপ চলে গেল। রাত আরো ঘন হোক—প্রহরের পর প্রহর আকাশের তারাগুলো ঢেউয়ের ফণার ওপর মণির মতো ঝলমল করুক—হাওয়াটা আরো শীতল, আরো দস্তুর হয়ে উঠুক—তবু এণাক্ষীর কোনো ভাবনা নেই। সামান্য একটা বকের কান্নাতেই সে নিজেকে তলিয়ে দিতে পারে নিশ্চেতনার গভীরে—সেখানে কোন ভয় নেই, কোনো দুশ্চিন্তা নেই, কোনো দুঃস্বপ্ন নেই।

কিন্তু প্রভাসের স্নায়ু তো অত সহজে হার মানবে না। নিজের কঠিন পৌরুষ নিয়ে সে জেগে থাকবে—এণাক্ষীকে পাহারা দিতে দিতে একটা দীর্ঘ প্রহর-স্পন্দিত রাত কাটাতে থাকবে কালপুরুষের মতো। তবু নিজেকে কি সে সম্পূর্ণ করে জানে? সে কি বলতে পারে এই রাত—এই আদিম জান্তব জলতরঙ্গ—এই জৈব প্রকৃতি তিলে তিলে তার রক্তে প্রবেশ করবে না—যেমন করে মৃদু বিষক্রিয়া ধীরে ধীরে মানুষের সত্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে?

মাটিতে হাত দিয়ে প্রভাস একমুঠো ঘাস আঁকড়ে ধরল। না, অন্ধকার নয়। এই জৈব-জান্তব রাত্রির আজো কোনো অর্থ আছে। সে অর্থ মণিজ্বলা ফণার মতো ওই ঢেউগুলোর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রভাস আকাশের দিকে চোখ তুলল। অসংখ্য উজ্জ্বল তারা। নিচের কালো জলটা উদগ্র চঞ্চলতায় দুলছে—হিংস্র নিঃশ্বাস ফেলছে ক্ষুধিত জন্তুর মতো—তার অন্ধকার পেটের মধ্যে কতকগুলো জীবন্ত নাড়ীর মতো দামঘাসগুলো কিলবিল করছে। একটু আগেই তো প্রভাস সেই বীভৎস জঠরটার সন্ধান পেয়েছিল—যার মধ্যে গিয়ে একবার পড়লে আর কখনো কোনোমতেই পরিত্রাণ নেই। সে ভয়ঙ্কর অনুভূতি তো ভোলবার নয়। আর মাথার ওপরে এই মুহূর্তের আকাশ—চন্দ্রহীন দিগ্‌দিগন্ত কোটি কোটি তারার আলোয় অপরূপ নীলোজ্জ্বল—আশ্চর্য স্থির, ধ্যানমৌনী। ওই আকাশ আপাতত তাকে অভয় দিতে পারে। ওই আকাশ থেকে নির্ঝরিত হতে পারে সেই গান: 'বাঁধলে যে সুর তারায় তারায়, অন্তবিহীন অগ্নিধারায়—'

এণাক্ষীর অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে প্রভাস ওই আকাশের কথা ভাবতে চেষ্টা করতে লাগল। ওই তারারা—ওই নীলোজ্জ্বল মহিমা কি তাকে বাঁচাতে পারে হিংস্র জলের মৃদু-সঞ্চারী বিষক্রিয়ার স্পর্শ থেকে? প্রভাস চোখ বুজল। দক্ষিণ ভারতের একটা বিশাল মন্দির। পেছনে পূর্বঘাট পাহাড়ের কালো রেখা—রাঙা গোধূলি মিলিয়ে গিয়ে বিবর্ণ

তামার মতো আলোর গায়ে গাছপালার নীল কলঙ্কচিহ্ন—তার ভেতরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে একটা প্রাচীন বিশাল মন্দির। কোথা থেকে ভেসে আসছে হাল্‌কা চন্দনধূপের গন্ধ, গম্ভীর গভীর বোল উঠছে মৃদঙ্গে আর মন্দিরের উঁচু চূড়োর ওপর একটি মাত্র তারা—সন্ধ্যাতারা—মুকুটের ওপরে হীরের মতো ঝলমল করছে।

'বাঁধলে যে সুর তারায় তারায়—'

ওয়াটারপ্রুফ রেডিয়াম ডায়াল ঘড়ির কাঁটায় রাত বাড়ছে। শীত—তীব্র শীত। এণাক্ষী মুখ গুঁজে পড়ে আছে মাটিতে। ঘুমিয়ে পড়েছে? তাই সম্ভব।

কিন্তু প্রভাস কতক্ষণ স্মৃতির ভেতরে ওই মন্দিরের ধূপের আর মৃদঙ্গের প্রভাবকে ধরে রাখতে পারবে? কতক্ষণ আকাশ তাকে আশ্রয় দিতে পারবে? জলটা সমানে গর্জন করছে পায়ের তলায়। কাছে—বড় বেশি কাছে। আর তখনই দেখা গেল অনেক দূরে একটা জোরালো আলো—পেট্রোমাক্সের আলো—বিলের কালো জলের ওপর যেন নিশিরাত্রেই সূর্য উঠছে।

চকিতে দাঁড়িয়ে উঠল প্রভাস, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বললে, এই যে—এই যে আমরা এখানে!

সেই চিৎকারে ধড়মড় করে উঠে বসল এণাক্ষী। বোবা ধরার মতো অদ্ভুত স্বরে বললে, কী—কী হয়েছে?

সেই ঘর—যেখানে চোখ খুললেই নীচু শ্যাওলাধরা ছাতটা মাথার ওপরে নেমে আসবে এমনি মনে হয়, কালো কালো কড়ি-বরগাগুলো কোনো অতিকায় খাঁচার মতো ভ্রূকুটি করে, কোণে কোণে জমে থাকা ছায়া সেদিনের স্মৃতিকে বহন করে, যেদিন কাকার কুটিল সন্দেহের বিষে কাকিমা জ্বলে মরেছিলেন এই বাড়িতে—হয়তো এই ঘরেই।

চোখ মেলে যন্ত্রণার অস্ফুট শব্দ করলে এণাক্ষী।

পাশ থেকে কে বললে, ভয় নেই—আর কোনো ভয় নেই। প্রভাস? অন্ধকার ছাওয়া সেই একফালি ডাঙা? এণাক্ষীর মাথার মধ্যে দিয়ে রাত্রির একটা স্রোত যেন বয়ে গেল। বিকৃত গলায় এণাক্ষী বললে, কে?

—আমি—আমি।

—কে?

—কী আশ্চর্য, চিনতে পারছ না আমাকে? আমি সৌরীন।

চোখের তারা ঘুরিয়ে এণাক্ষী ফিরে তাকালো। সত্যিই সৌরীন। উদ্বেগ-ব্যাকুল মুখে তার বিছানার পাশে বসে আছে। ভ্রূকুটি-করা ছাতটা নয়—কোণায় কোণায় জমে থাকা বিষণ্ন ছায়াও নয়, তার পাশেই খোলা জানলা—সেই জানলার কাচের শার্সীতে প্রথম শরতের সোনা রোদ ঝলমল করছে, কয়েকটা লবঙ্গলতিকা একগুচ্ছ ফুল নিয়ে বেয়ে উঠেছে সেখানে আর বাইরে থেকে বুলবুলির ডাক শোনা যাচ্ছে।

সৌরীনের একটা হাত মুঠো করে ধরে এণাক্ষী বললে, তুমি!

সৌরীন বললে, তোমাকে যে আর ফিরে পাব সে আশা ছিল না। তার চোখের কোণা চিকচিক করে উঠল: তুমি জলে পড়লে চিৎকার করে, তোমার পেছনে ঝাঁপ দিয়ে

পড়ল প্রভাস, তারপর কী যে হল বুঝতেই পারলাম না। পর পর কয়েকটা হাওয়ার ঝাপটা এল—চারদিক যেন অন্ধকার হয়ে গেল—ঘূরপাক খেতে খেতে কতদূর চলে গেল বজরাটা। আমিও মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলাম বজরার ওপর।

এণাক্ষী তাকিয়ে রইল। সৌরীনের মুখটা একটু একটু করে ঝাপসা হয়ে আসছে।

—খালি চিত্রা আশা ছাড়েনি। জলভরা মেঘের ডাকের মতো সৌরীনের গম্ভীর ক্লান্ত গলার আওয়াজ আসতে লাগলো : চিত্রা বলেছিল, দাদা যখন ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে, তখন টেনে তুলবেই বৌদিকে। দু'তিনটে ছোট ছোট ডাঙাও আছে কাছাকাছি। কিন্তু আমরা কেউই বিশ্বাস করতে পারিনি। তবু পেট্রোম্যাক্স আর লণ্ঠন নিয়ে পাঁচ-সাতখানা নৌকো বেরুল, যদি—

এণাক্ষীর হাতের ওপর টপ করে এক ফোঁটা গরম জল পড়ল। সৌরীনের চোখের জল। ইচ্ছে করল হাত বাড়িয়ে জলটা সে মুছিয়ে দেয়—পারল না। সমস্ত শরীরে তার অদ্ভুত যন্ত্রণা—যেন কেউ তাকে একটা ভারী রোলারের তলায় ফেলে পিষে দিয়েছে। মাথার মধ্যে একরাশ আগুনের চরকি ছুটে বেড়াচ্ছে ইতস্তত। সৌরীনের মুখখানা ঝাপসা হতে হতে একেবারে মিলিয়ে গেছে—শুধু তার অশরীরী কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে সে।

কিন্তু বন্ধ চোখ দুটো পরক্ষণেই খুলে ফেলতে হল এণাক্ষীকে। বাইরে খড়মের আওয়াজ পাওয়া গেল।

—সৌরীন!

—আসুন কাকা। তটস্থ হয়ে সৌরীন বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। ওরই মধ্যে মাথায় ঘোমটা টেনে যথাসাধ্য সংযত হয়ে উঠে বসতে চেষ্টা করল এণাক্ষী।

—থাক থাক, তোমায় আর উঠতে হবে না। কাকার ভারী গলা শোনা গেল। ঘরে এসে পা দিয়েছেন তিনি। শব্দ করে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে বললেন, তোমার শরীর ভালো নেই বৌমা—তুমি শুয়েই থাকো।

বলবার আগেই শুয়ে পড়েছিল এণাক্ষী। স্বেচ্ছায় নয়—পাথরের মতো গুরুভার মাথাটা তার ঘুরে গিয়েছিল, চোখে একরাশ অন্ধকার ঘনিয়ে সে লুটিয়ে পড়েছিল বালিশের ওপর। পায়ের কাছ থেকে একটা চাদর কুড়িয়ে নিয়ে সৌরীন এণাক্ষীর গলা পর্যন্ত ঢেকে দিলে।

—বৌমা কেমন আছেন? কাকা জানতে চাইলেন।

—জ্বর এসেছে সামান্য।

—সে তো হবেই। জলে ভেজা—তার ওপরে ভিজে জামাকাপড়ে অতক্ষণ ধরে ওই হাওয়ার মধ্যে বসে থাকা! কাকা একটু চুপ করে থেকে বললেন, তবে ভাবনা নেই, দু'একদিনেই ছেড়ে যাবে। আমি কবরেজকে খবর দিচ্ছি।

—কবরেজ কেন কাকা? চোখ বুজে সৌরীনের ভীরু গলা শুনতে পেল এণাক্ষী : ডাক্তার নেই?

—ওই ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ডাক্তার? চিকিৎসার ও কী জানে? আমাদের কবরেজ মশাইকে খবর দিয়েছি—বিচক্ষণ লোক, নাড়ী ধরলেই রোগ অর্ধেক সেরে যাবে।

সৌরীন চুপ করে রইল। এণাক্ষী বুঝতে পারল, কবিরাজের কথাটা তার পছন্দ হয় নি।

কিছুক্ষণ ঘরে কেউ কোনো কথা কইল না। এণাক্ষী চোখ বন্ধ করে নিজের নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে লাগল। সেই সঙ্গে আরো শুনতে লাগল—নিচের বাগানে কেবল বুলবুলিজোড়াই নয়, আরো অনেক পাখি প্রথম শরতের আলোয় খুশিতে কলধ্বনি করে উঠছে।

এণাক্ষীর শ্রান্ত, অসুস্থ মন প্রার্থনা করছিল যেন কেউ এই স্তব্ধতাটা না ভাঙে। যেন জ্বরের নেশায় আচ্ছন্ন চেতনা নিয়ে একটা নিমগ্ন শান্তিতে সেও পাখির ডাক শোনে—অল্প অল্প হাওয়ায় বুকের মধ্যে টেনে নেয় লবঙ্গলতিকা লতার আর ফুলের ঝলকে ঝলকে লঘু গন্ধ। শুধু শরীরেই নয়, তার মনের ওপরেও সুদীর্ঘ স্নায়বিক পীড়নের যে অবসাদ নেমে এসেছে, কেউ যেন তাকে আর পীড়ন না করে। একটু শান্তি, নিশ্চিন্ততা, জ্বরের নেশায় অবশ, শিথিল হয়ে এলিয়ে থাকা।

কেউ যেন কোনো কথা না বলে। সৌরীনও নয়।

কিন্তু কাকা কথা কইলেন।

—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব সৌরীন ?

—বলুন।

—ঠিক জানো, বৌমা নিজেই জলে পড়ে গিয়েছিলেন ? কেউ তাঁকে জলে ঠেলে ফেলে দেয়নি ?

এণাক্ষীর আচ্ছন্ন চেতনার ওপর কেউ যেন কাঁটাওলা চাবুকের ঘা মারল। সঙ্গে সঙ্গে উদ্‌ভ্রান্ত আরক্তিম চোখ মেলে সে সোজা কাকার দিকে তাকালো। কিন্তু কাকার মুখটা সে দেখতে পাচ্ছে না। একটা অন্ধকার বৃত্তের ভেতরে দুটো কী যেন কয়লার টুকরোর মতো ঝকমক করছে।

ভয়ংকরভাবে চমকে উঠে সৌরীন বললে, কী বলছেন আপনি ?

কাকা নিস্পৃহ শীতল গলায় বললেন, আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম, প্রভাস ইচ্ছে করেই—

কথাটা শেষ হওয়ার আগেই অব্যক্ত যন্ত্রণায়, অসীম ভয়ে এবং বীভৎস বিস্ময়ে গোঙিয়ে উঠল এণাক্ষী। সৌরীন প্রায় চেঁচিয়ে উঠল : ছি ছি, কী যে বলেন ! নিজের প্রাণ হাতে করে প্রভাস—

কাকা হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন।

—থাক থাক। সংসারের এখনো অনেক জিনিস আছে সৌরীন—যা কলকাতায় বসে জানা যায় না। সে যাক্। আমি এখন যাচ্ছি—কবরেজকে খবর পাঠিয়ে

খড়মের আওয়াজ তুলে কাকা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। এত বড় ফাঁকা বাড়িটার ছায়া-জমে-থাকা কোণায় কোণায় তার শব্দটা প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

॥ বারো ॥

ব্যাপারটার আসল চেহারা ধরা পড়ল আরো কিছুদিন পর।

এণাক্ষীর জ্বর ছাড়তে দেরি হল না। 'শক'টা কাটতে আরো দিনতিনেক লাগল। তারপরে সৌরীন বললে, চলো আজ একটু ছাতে গিয়ে বসা যাক।

শ্যাওলাধরা সিঁড়ি। কোণাগুলো ভেঙে গেছে এখানে ওখানে। বহুদিন এ সিঁড়ির ব্যবহার হয় নি। এ বাড়িতে কে আর ছাতে উঠবে? অবসর-বিলাসের সময় কার আছে এমন?

চাকরেরা দুটো চেয়ার তুলে দিয়েছিল ওপরে। দুজনে বসল মুখোমুখি।

পুরানো রেলিঙের ফাটলে বেশ বড় হয়ে শিউলি গাছ উঠেছে একটা—এখানে ওর বীজ কী করে যে এল কে জানে! কয়েক গুচ্ছ ঘাস দেখা দিয়েছে আর এক জায়গায়। কয়েকটা অশত্থের চারা উঁকি দিচ্ছে ইতস্তত। কিছুদিনের মধ্যেই বোধ হয় ছাতটা শূন্যোদ্যানের মহিমা পাবে। এক কোণে সাদা নীলচে কতগুলো পায়রার পালক, কোনো বনবেড়াল ওখানে তার ভোজনপর্ব সমাধা করে গেছে।

হাওয়ায় ওরই একটা উড়ে এল পায়ের কাছে। অন্যমনস্ক ভাবে সেটা কুড়িয়ে নিলো এণাক্ষী।

সৌরীন বললে, দ্যাখো, কী চমৎকার দেখা যাচ্ছে এখান থেকে!

বাঁ দিকে খানিক দূরেই সেই জলতরঙ্গ। মেঘলা আকাশের ছায়ার নিচে ইতিহাস-পূর্ব সমুদ্রের মতো সেই হিংস্র ভয়ংকর জল দূর-দূরান্তে ঢেউ ভাঙছে—এতদূর থেকেও তার হলদে ফেনার রাশি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ওই দিকে চোখ পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই এণাক্ষীর মনের ওপর সেই রাতটা কালো শকুনের মতো দুটো অন্ধকার ডানা ছড়িয়ে এসে উড়ে বসল। সারা শরীরে একটা বীভৎস অনুভূতির শিহরণ সামলে নিয়ে এণাক্ষী মুখ ঘোরাল।

সৌরীন বুঝতে পেরেছিল। সিগারেট ধরিয়ে বলল, একটা কথা বলব এনা?

এণাক্ষী চোখ তুলে তাকালো। কোনো প্রশ্ন করল না।

সৌরীন বললে, কলকাতায় ফিরে যাবে?

—কলকাতায়? নামটা যেন অপরিচিত ঠেকল কানে। হঠাৎ যেন এণাক্ষীর মনে হল, কলকাতা নামে যে একটা জগৎ আছে—তার সঙ্গে সব সম্পর্ক সে মিটিয়ে দিয়ে এসেছে। সে অনেক—অনেককাল আগে। কোনো ইংরেজী গল্পের মতো জাহাজডুবি হয়ে মহাসাগরীয় কোনো দ্বীপের ভেতরে সে নির্বাসিত হয়ে আছে যুগযুগান্ত; মুক্তির জন্যে সে অপেক্ষা করে আছে, অথচ এখানকার অভ্যাসের বাঁধন থেকে নিজেকে ছাড়াতে পারছে না। এণাক্ষী আবার বললে, কলকাতায়? কিন্তু শব্দটা এবার আর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল না—ঠোঁটের কোণায় কাঁপতে লাগল।

সৌরীন বড় একটা ক্লান্তির নিঃশ্বাস ফেলল। অকারণেই টোকা দিয়ে সিগারেটটা ঝেড়ে নিয়ে বললে, চলো ফিরেই যাই। যাত্রাটাই এবার হয়েছিল কুলগ্নে। আমার শরীর সারাতে এসে তোমাকে অসুস্থ করে ফেললাম। দেশ আমাদের সইল না—

কলকাতাই ভালো।

হাঁ, কলকাতাই ভালো। কথাটা আবার মনে মনে উচ্চারণ করল এণাক্ষী। সেখানে এত বড় আকাশ নেই, এমন ভয়ংকর সুন্দর জলের লীলা নেই, সেখানে কোনো নির্জন দ্বীপের ওপর কোনো দুঃস্বপ্নের রাত ঘনিয়ে আসে না। সেখানে সব সংকীর্ণ, সব সীমিত। সামান্য উপকরণ নিয়ে চারটে দেওয়ালের মধ্যেই মন সেখানে নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে বসতে পারে এমন বিশাল আকাশ, এত বিপুল পৃথিবীর ভেতরে তা নিজের আয়ত্তের বাইরে ছড়িয়ে যায় না। আনন্দ সেখানে এক মুঠো, ভয় সেখানে দিক-সীমান্তের পারে এমন করে দুটো কালো ডানা ছড়িয়ে দেয় না।

সৌরীন বললে, কাকাকে বলি তবে ?

—বলো। এণাক্ষী মৃদু গলায় জবাব দিলে। স্বরে উৎসাহ ফুটল না।

কিছুক্ষণ চুপ। বিলের জোলো হাওয়া আসছে ঝলকে ঝলকে। মেঘলা আকাশটা চাপা কান্না নিয়ে উবুড় হয়ে পড়ে আছে। চোখের জল ফেলতে পারছে না, কিন্তু তার আর্ত নিঃশ্বাস এসে গায়ে লাগছে। শিউলি গাছটার ঘন সবুজ কর্কশ পাতাগুলো হাওয়ায় দুলছে, পায়ের কাছে দুটো একটা পায়রার পালক উড়ে আসছে।

এই ছাত থেকে এণাক্ষী দেখছিল সামনের সেই বাঁধানো উঠোন, চণ্ডীমণ্ডপ, কাছারি। কাছারির সামনে দুটো ছাগল নিয়ে একটা লোক চুপ করে বসে আছে—মধুপুরে দেখা সাঁওতালদের মতো লোকটার চেহারা। ধারালো একটা কাটারি হাতে নিয়ে রঘু যেন কোন্‌দিকে চলে গেল।

এণাক্ষী দৃষ্টিটাকে আরো সামনে ছড়িয়ে দিলে। কাছারি পার হয়ে খালের দিকে যাওয়ার মেটে রাস্তাটা মিলিয়ে গেছে আমবাগানের ভেতরে। পূর্বপুরুষের কোন্‌ সতীদাহের স্মৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জীর্ণ শিবমন্দিরটা, তার ত্রিশূলের ওপর একটা কাক বসে রয়েছে ওয়েদার-ককের মতো। এণাক্ষী কাকটাকে দেখতে লাগল কিছুক্ষণ।

তারপর তার মনে পড়ল।

একটা দরকারী কথা। অনেকক্ষণ ধরে সেটা ঝাপসা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, এবার স্পষ্ট রূপ নিলে।

—এর মধ্যে প্রভাস ঠাকুরপো আসেনি আর ?

চকিতে মুখের রঙ বদলালো সৌরীনের। কিন্তু নিজের মধ্যেই মগ্ন হয়ে ছিল এণাক্ষী, লক্ষ্য করল না। হাতের সিগারেটে পর পর কয়েকটা দ্রুত টান দিয়ে সৌরীন সেটা বাইরের বাগানে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

—এসেছিল পরশু সকালে।

এণাক্ষী আশ্চর্য হল।

—কই, আমি তো দেখিনি ?

—তুমি তখনো ঘুমুচ্ছিলে। সতর্কভাবে সৌরীন জবাব দিলে।

—আমাকে ডেকে দিলে না কেন ? নিজের অজ্ঞাতেই এণাক্ষী উত্তেজিত হয়ে উঠল : বেচারা আমায় দেখতে এল, তোমরা আমাকে জাগালে না ? কী ভাবল কে জানে ?

আবার সৌরীনের মুখের রঙ বদলালো।

—তোমাকে বিরক্ত করা হয় নি। কাকার বারণ ছিল।

সৌরীনের গলায় এবার একটা কিছু ছিল। এণাক্ষী তাকালো তার দিকে।

—কাকার বোধ হয় এখনো ধারণা আছে যে প্রভাস ঠাকুরপো আমাকে ইচ্ছে করে জলে ফেলে দিয়েছিল?

নিজের অজ্ঞাতেই সৌরীনের ঠোঁটের রেখাগুলো শক্ত হয়ে উঠেছিল। জবাব দিল না।

একটা তীক্ষ্ণ দুর্বোধ্য সন্দেহ মৃদু বিষক্রিয়ার মতো এণাক্ষীকে স্পর্শ করতে লাগল। সৌরীনের ভাবান্তর এবার আর তার চোখ এড়িয়ে গেল না। মাথার ভেতরে খানিকটা উত্তেজিত রক্তস্পন্দন অনুভব করল এণাক্ষী।

—তুমিও কি তাই মনে করো নাকি? এণাক্ষীর চোখ জ্বলে উঠল, ধারালো হল গলার স্বর।

শান্ত গম্ভীর সুরে সৌরীন বললে, না, আমি পাগল হয়ে যাইনি।

এণাক্ষী তিক্তভাবে বললে, তোমাদের বাড়িকে বিশ্বাস নেই। এখানে কিছুই স্বাভাবিক নয়। এখানে বাতাসে বাতাসে বহুকাল ধরে যে বিষ জমে আছে, সে তোমার মধ্যেও নেই—একথা আমার মনে হয় না।

একটু বেশি তীব্র হয়েই আক্রমণটা আঘাত করল সৌরীনকে। দরকার ছিল না। এ নিয়ে এতখানি ক্ষিপ্ত না হলেও চলত এণাক্ষীর। সৌরীনের ঘরের এক কোণায় যে ছায়ার টুকরোটা জমে ছিল, হঠাৎ সেটা ঈশানী মেঘ হয়ে বিকীর্ণ হতে আরম্ভ করল।

তবু যথাসাধ্য সংযত হয়ে সৌরীন বললে, আমার ওপর মিথ্যে রাগ করছ। কাকাই বারণ করেছিলেন।

—তিনি তো পাগল। তোমার কোনো ব্যক্তিত্ব নেই? তুমি কি একেবারেই মেরুদণ্ডহীন?

সৌরীন ঠোঁটে ঠোঁট চাপল।

—কাকা পাগল কিনা জানি না, কিন্তু এ বাড়িতে যতক্ষণ আছি, তাঁর ইচ্ছেই মেনে চলতে হবে।

—আমরা শরিক নই? আলাদা কোনো অস্তিত্ব নেই আমাদের? এণাক্ষী প্রায় বন্য গলায় বললে, কোনো অধিকার নেই এই বাড়ির ওপরে?

সৌরীন বললে, তুমি উত্তেজিত হচ্ছো এণা। তোমার শরীর ভালো নেই।

এণাক্ষী চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। চঞ্চল পায়ে এগিয়ে গিয়ে রেলিঙের পাশে সেই অনধিকারী শিউলি গাছটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। একটা রুক্ষ কর্কশ পাতা ছিঁড়ে নিয়ে নির্দয়ভাবে সেটাকে ছিঁড়তে ছিঁড়তে বললে, কথা চাপা দেবার চেষ্টা করছ কেন? তুমি যে এত ভীরু তা আমি জানতাম না। ভালো কথা—তোমার যদি সাহস না থাকে, যা করবার আমিই করব।

এবার সৌরীনের চোখ জ্বলছিল।

—কী করতে চাও?

—কাল আমি নিজেই ওদের বাড়িতে যাব।

—কাকা অনুমতি দেবেন না।

এণাক্ষী ক্ষিপ্তভাবে কী বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সৌরীন বলতে দিল না। নিজে সংযত হওয়ার জন্যেই সংযত করতে চাইল এণাক্ষীকে।

—মিথ্যে এ নিয়ে গোলমাল কোরো না এণা। কাকার কথা তো তোমাকে সবই খুলে বলেছি। আমার মনে হয় আমাদের কলকাতায় ফিরে যাওয়াই ভালো।

—ফিরে আমিও যেতে চাই। তোমাদের এখানে আর কিছুদিন থাকলে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে।

এণাক্ষীর মনের মধ্যে যে ঘৃণাটা জ্বলে উঠেছিল, চোখের দৃষ্টিতে তারই খানিকটা সৌরীনের মুখের উপর ছড়িয়ে দিয়ে বললে, যাওয়ার আগে প্রভাস ঠাকুরপোর সঙ্গে একবার দেখা করে যাব। অন্তত তোমাদের সকলের পক্ষ থেকেও তার কাছে আমার ক্ষমা চাইবার আছে। সে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিল—একথা আমার মনে আছে।

সৌরীন বললে, সে থাক এণা। কলকাতায় গিয়ে চিঠিতেও তা হতে পারে। আর রাত্রে সেই চরের ব্যাপার নিয়ে গ্রামে যে কথা উঠেছে—

বলতে বলতেই জিভ কেটে থমকে গেল সৌরীন। ভেতরে ভেতরে মনের ধৈর্যটা টলে গিয়ে যে কথাটা সে কিছুতেই বলবে না ঠিক করেছিল, সেইটেই বলে ফেলল।

একটা ঢোক গিলে সৌরীন বললে, মানে জানোই তো, আমাদের যে পারিবারিক শত্রুতা—কিন্তু সামলাবার কোন উপায় ছিল না। ততক্ষণে এণাক্ষীর মুখ সাদা হয়ে গেছে।

—কী বললে? কী কথা উঠেছে?

সীমাহীন আতঙ্কে সৌরীন বললে, কিছু না এণা—কিছু না। ওটা হঠাৎ বলে ফেলেছি। এণাক্ষীর একখানা হাত মুঠো করে চেপে ধরে বললে, কালই আমরা কলকাতায়—

এণাক্ষীর চোখ দুটো বুজে এসেছিল। ধাক্কা দিয়ে সৌরীনের হাত সে সরিয়ে দিলে—মনে হল একটা সাপ তাকে স্পর্শ করেছে। তারপর ছাতের ওপর বসে পড়তে পড়তে বললে, তুমি চলে যাও এখান থেকে—তোমাদের কাউকে আমি সইতে পারছি না।

—এণা, কথা শোনো—আমাকে ভুল বুঝো না।

রেলিঙে পিঠ দিয়ে তেমনি চোখ বন্ধ করেই এণাক্ষী বললে, ভুল আমি কাউকেই বুঝিনি। দোহাই তোমার—একটু সরে যাও কাছ থেকে, আমার দম আটকে আসছে।

এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে সৌরীন ছাতের অন্য দিকে সরে যেতে লাগল। কিন্তু কয়েক পা যেতেই পায়ের তলায় একটা তীক্ষ্ন যন্ত্রণায় চকিত হয়ে উঠল সে। একটুকরো ছোট হাড় বিঁধেছে পায়ে—বনবেড়ালে খাওয়া পায়রাটার হাড়।

॥ তেরো ॥

প্রভাস বোট নিয়ে বিলে বেরিয়েছিল।

বাতাস আজও উদ্দাম। বোট ভেসে যাচ্ছে না—নাচের তালে তালে চলেছে। কখনো কখনো এক ঝলক জল আর এক মুঠো লালচে ফেনা এসে আছড়ে পড়ছে

ওপরে। তবে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। বসন্তের হাওয়া লাগা জ্যোৎস্না রাত্রে গাঁয়ের মেঠো পথের ওপর সাপের ছানারা যেমন ফণা তুলে খেলা করে—বিলের কাল-নাগিনীদের এ-ও তেমনি খেয়ালী খেলা ছাড়া আর কিছু নয়। কাউকে ভয় দেখাচ্ছে না—নিজেরাই খুশি হয়ে উঠেছে।

বোটের গায়ে হেলান দিয়ে প্রভাস দাঁড়িয়ে ছিল চুপ করে। সেই রাতটার কথা সে কিছুতেই ভাবতে চাইছিল না, অথচ বার বার সেকথাই তার মনে পড়ছিল। দূরে দূরে কালো কালো বিন্দুর মতো ডাঙা দেখা যাচ্ছে—সেরাতে ওদেরই কোনো একটাতে তারা দুজন আশ্রয় নিয়েছিল।

কী মনে হয়েছিল প্রভাসের? কী ভেবেছিল অচেতন এণাক্ষীর নিঃশ্বাসের অস্বাভাবিক শব্দ শুনতে শুনতে—বুকের সেই অদ্ভুত কান্নায় উচ্চকিত হয়ে আকাশের জ্বলন্ত নিষ্ঠুর তারাগুলির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে? এখন সেই ভাবনার কোনো স্পষ্ট রূপ নেই—কেবল কোথায় একটা মৃদু যন্ত্রণা স্থির হয়ে আছে। কোথায় একটা কী ঘটেছে প্রভাস বুঝতে পারছে না, কিন্তু একটুখানি দুর্বোধ্য অন্যায় যে কোনোখানে জমে আছে সেটা সে টের পাচ্ছিল।

চুলোয় যাক—এসব দুশ্চিন্তা প্রভাসের কেন?

পরশু গিয়েছিল খবর নিতে। এণাক্ষীর জ্বর শুনেই সে ফিরে এসেছে—একবার দেখে যাওয়ার কথাটাও বলতে পারেনি। নিজের অপরাধের লজ্জা তো ছিলই—সেই সঙ্গে আরো ছিল কাকাবাবুর চোখ। কুটিল, নির্মম, খানিকটা অস্বাভাবিক। লোকটা কোনোদিনই সুস্থ আর স্বাভাবিক নয়—প্রভাস জানে। তাঁর সম্পর্কে অনেক রোমাঞ্চকর গালগল্প সে শুনেছে। সেগুলো সে বিশ্বাস করেনি। এক-একদিন রাত্রে খাল দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ চমকে উঠেছে, পুরোনো মন্দিরটার একরাশ ছায়ার ভেতরে আরো কালো প্রেতের মতো একটা স্থির স্তব্ধ ছায়ামূর্তিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে সে, প্রায় আর্তনাদের মতো শব্দ তুলে মূর্তিটা জিজ্ঞেস করেছে: কে—কে যায় নৌকোয়?

ভয়ের চমক সামলে নিয়ে প্রভাস সাড়া দিয়েছে: আমি—আমি প্রভাস রায়।

—ওঃ, আচ্ছা যাও।

যেন রাত্রির কালপুরুষ প্রহরী সিংহদ্বারের পথ ছেড়ে দিলে।

তাদের সঙ্গে কাকার সদ্ভাব নেই। পর পর কয়েকটা মামলা হয়েছে—তারাই হেরেছে বেশি। বাবা রাগ করে বলেছেন, প্রায় সবই মিথ্যে মামলা, কিন্তু কাকার কুটিল বুদ্ধির কাছে পেরে ওঠেননি। অথচ বাবাকে সেজন্যে বেশি বিচলিত হতে দেখা যায় না। মনে হয় মামলায় জিতে কাকার আক্রোশ যেন বেড়েই চলেছে। আবার কী একটা নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা বাধিয়ে বসবেন, সেই চেষ্টাতেই তিনি আছেন। লোকটার এক ধরনের অহেতুকী হিংসা।

কিন্তু কেন এমন করে? নিজের বলতে কেউ নেই—স্ত্রী নয়, সন্তানও নয়, বিষয়-সম্পত্তি যা কিছু পাবে সৌরীনদা, সেও তো কলকাতায় পড়ে থাকে, কাকা মারা গেলে আর কখনো দেশে আসবে কিনা সন্দেহ। অন্তত সেদিনের সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার পর এণাক্ষী বৌদিই তাকে আসতে দেবে না। গ্রাম সম্বন্ধে মোহ বোধ হয় তার কেটে গেছে। প্রভাস জোর করে এণাক্ষীর ভাবনা থেকে মনটাকে সরিয়ে নিলে: আচ্ছা

তাই যদি, তাহলে আধহাত জমি, একটা মজা ডোবা কিংবা বুড়ো একটা আমগাছের জন্যে কাকা এমন করে কেন?

বাবাকে দোষ দেওয়া যায় না। খোঁচা খেয়ে খেয়ে বিরক্ত হয়ে গেছেন। প্রথম প্রথম অনেক ছেড়ে দিয়ে বুঝেছেন, একটুখানি ফুটো রেখে দেওয়ার অর্থই হল বানের মুখ খুলে দেওয়া। তাঁর নির্বিরোধ ভদ্রতাকে কাকা দুর্বলতা বলে মনে করেছেন—তাঁর অন্যায়ের পরিমাণ বেড়েই চলেছে দিনের পর দিন। এরপরে মাথা তুলে আর না দাঁড়ালে চলে না। প্রভাসও বুঝেছে, বাবাকে বাধা দিয়ে লাভ নেই—একতরফা শান্তি হয় না।

আচ্ছা সত্যিই লোকটা কেন এমন করে? সংসারে না হয় কেউ নেই, কিন্তু নিজে যদি বিলাসী হত—টাকা ওড়াতে জানত, তাহলে সব জিনিসের একটা অর্থ থাকত। কিন্তু নেশা-ভাঙ দূরের কথা, লোকটাকে সে একটা বিড়ি সিগারেট পর্যন্ত কখনো খেতে দেখেনি। তার চরিত্রদোষের অপবাদ শত্রুতেও দিতে পারবে না। মামলার দরকার ছাড়া সে শহরে যায় না—কখনো সিনেমা-থিয়েটারও দেখেছে কিনা সন্দেহ। কিংবা থিয়েটার-সিনেমাই বা কেন, এই গ্রামেই তো বিষহরির গান হয়—'আলকাপের' আসর বসেছে, কিন্তু সেখানেও তাঁকে কোনোদিন চোখে পড়েনি।

কী নিয়ে দিন কাটান লোকটা—কিসের জন্যে বাঁচেন?

যাই করুক, সেজন্যে প্রভাসের কোনো মাথাব্যথা নেই। কিন্তু সেই তার চোখ, সেই বীভৎস ক্রুর দৃষ্টি—কিছুতেই ভোলা যাচ্ছে না। কিছু একটা করতে চায়—কিন্তু কী করতে চায়?

বোটের গায়ে ঢেউ আছড়ে আছড়ে পড়ছে—হাওয়ায় এক-একটা জলোচ্ছ্বাস উছলে উঠছে পায়ের কাছে। ঝাঁক বেঁধে একদল পানকৌড়ি উড়ে যাচ্ছে আকাশ বেয়ে—তাদের কালো কালো পাখায় সোনার কুচির মতো রোদ কাঁপছে। একটা মাছরাঙা এসে বসেছে তার বোটের মাস্তুলে—নীল ফুলের মতো দেখাচ্ছে তাকে—বাতাসে পালকগুলো একরাশ নরম পাপড়ির মতো উড়ছে।

দূর দিয়ে একটা নৌকো পাড়ি জমাচ্ছে কোণাকুণি—বোধহয় আইহোর হাট আছে আজ, সেদিকেই চলেছে। দাঁড় টানতে টানতে মিঠে দরাজ গলায় কে যেন গান ধরেছে—'বিষহরি'র গান:

"সিন্দুর দিয়ো না শাশুড়ী মাগো,
সিন্দুর দেখিয়া ডর লাগে,
এক দাদায় খাইল মোর
সিন্দুরিয়া নাগে—"

সুরটা করুণ। বিয়ের পরে লখীন্দরকে বরণ করতে এসেছেন সনকা—কুলোয় তাঁর ধান-দূর্বা-সিঁদুর-সুপারি ইত্যাদি। কিন্তু বরণের প্রত্যেকটি উপকরণকে দেখে অজানা ভয়ে লখীন্দরের বুক কেঁপে উঠছে—তার মনে পড়ে যাচ্ছে কেমন করে তার ছয় ভাই মনসার কোপে একে একে মৃত্যুর মধ্যে লুটিয়ে পড়েছে:

"ধান্য দিয়ো না শাশুড়ী মাগো
ধান্য দেখিয়া ডর লাগে,

এক দাদায় খাইল মোর
ধান্যেশ্বরী নাগে—"

দীর্ঘায়িত কান্নার মতো একটানা সুর। প্রভাস নিজের অস্বস্তিভরা ভাবনাগুলোকে ভুলে গেল কিছুক্ষণের জন্যে। এই গান—এই কান্না—এ কেবল মনসার পালারই নয়—এর সঙ্গে সাধারণ মানুষের অনেক যন্ত্রণা, অনেক চোখের জলও মিশে আছে। সাপের দেশ তাদের এই জেলা। এখানে পুরোনো ভিটের ফাঁকে ফাঁকে গমের বরণ 'গহুমা' সাপের বাসা, ক্ষেতের আলে আলে আলু-গোখ্‌রো, বিলের জলে মেছো আলাদ ফণা তুলে সাঁতার কাটে, নালার ধারে বসে থাকে শামুকভাঙা, নয়নজুলীর কলমীলতার বনে আরো উজ্জ্বল আরো সুন্দর লতার মতো লুকিয়ে থাকে চন্দ্রবোড়া,—বড় বড় ঘাসের ভেতর গুপ্তঘাতকের মতো বিদ্যুৎগতিতে ছোবল দিয়ে পালায় চিতি। প্রত্যেকে সমান বিষাক্ত—সাক্ষাৎ মৃত্যু।

এ কান্না দেশের কান্না। কত প্রিয়জন ক্ষেতে লাঙ্গল দিতে গিয়ে আলের ওপর শুয়ে পড়েছে, কৌতূহলবশে ঘরের মেজের গর্তে আঙুল দিয়েই নীল হয়ে গেছে কত শিশু, শেষরাতে নালা থেকে 'চারো' ওঠাতে গিয়ে কতজনের সেখানেই হয়ে গেছে, সিঙ্গাড়া তুলতে কলমীবনে নেমে যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে উঠে এসেছে কতজন—দু-তিনদিন বিষে পচতে পচতে ফুরিয়ে গেছে, 'আমাকে কিসে কাটল' বলেই ঘাসবনের ওপর শুয়ে পড়ে কত মানুষ গ্যাঁজলা তুলেছে। তারপর হয়তো কলার ভেলায় শুইয়ে, মাথার কাছে কুলোয় ধান-দুর্বা সাজিয়ে প্রদীপ জেলে নিরাশ্বাসের আশায় নদীর জলে শব ভাসিয়েছে—বলা যায় না, হয়তো বিষনয়না দেবী একবার অমৃতনয়নে তার দিকে চাইবেন—মরা ছেলে মায়ের বুকে আবার ফিরে আসবে। কিংবা হয়তো কোনো ঘাটে নাইতে নেমেছে ধন্বন্তরী ওঝা, ওই ভেলা তার চোখে পড়বে, তার একটি মন্ত্রে হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে সাপের বিষ, ভাগ্যবতী সীমন্তিনীর কপালে সিঁদুর ঝলমল করে উঠবে।

"সুপারি দিয়ো না শাশুড়ী মাগো—
সুপারি দেখিয়া ডর লাগে।
এক দাদায় খাইল মোর—"

অনেক দূরে চলে গেছে নৌকো—বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে গানটা যেন অসহায় আর্তির মতো শোনাচ্ছে। ওর কাকে কোন্ সুপারিনী কিংবা দুর্বেশ্বরী নাগে কেড়ে নিয়েছে ও-ই জানে। সাপের দেশ এই জেলা। মা মনসার পদ্মাসন।

আর মনে পড়ল সেদিনের কথা—যেদিন প্রথম তার সৌরীন আর এণাক্ষী বৌদির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সেই পড়ো চালাঘরটার ভেতর—

আবার অস্বস্তিকর বিশ্রী চিন্তার দোলা—কাকার চোখ দুটো! তার সঙ্গে কিসের যে মিল আছে প্রভাস বুঝতে পারছিল না। এইবার মনে পড়ল। একটা অন্ধকার ফণা দুলছে এণাক্ষীর সামনে—দুটো চিকচিকে অগ্নিবিন্দু দুলছে তার ওপর। স্থির লক্ষ্যে প্রভাস ট্রিগার টেনেছিল। আর একটু দেরি হলেই—

প্রভাস জলের দিকে তাকিয়ে রইল। জল দেখা যাচ্ছে না—কুমীরও না। শুধু সামনে-পেছনে, দূর-দূরান্তরে যতদূর চোখ যায় সাপের ফণা দুলছে। লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি। ঢেউয়ের শব্দ—লক্ষ কোটি সাপের গর্জন।

অসহ্য কুশ্রী অপমানে সমানে জ্বলছিল এণাক্ষী। সৌরীনের মুখের দিকে পর্যন্ত তাকাতে তার ঘৃণা হচ্ছিল। এ কোন্ নরকে নেমে এসেছে—মানুষের কী বীভৎস হীনতার বিষ তার চারদিকে ফেনিয়ে উঠেছে! এক মুহূর্তে গ্রামের রূপ বদলে গেছে তার কাছে—মনে হয়েছে, কোনো সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ এখানে বাস করতে পারে না, এ সুন্দরবন ছাড়া আর কিছুই নয়।

সারাটা দিন একটা কথা সে বলল না সৌরীনকে। রাগে, দুঃখে, অপমানের যন্ত্রণায় বিছানার মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে রইল। খেলো না পর্যন্ত।

—আমার খিদে নেই। শরীর ভালো লাগছে না।

দু'একবার সৌরীন এসে মাথায় হাত রেখেছিল। ধাক্কা দিয়ে তার হাত সরিয়ে দিয়েছে এণাক্ষী।

—আমাকে বিরক্ত করো না। একটু চুপ করে থাকতে দাও।

সৌরীন মৃদু দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল।

—তাই হোক এণা। আমরা কাল চলেই যাই।

—তোমার খুশি।

সৌরীন আর কথা বলে নি। চুপচাপ বসে থেকে সিগারেট টেনেছে একটার পর একটা। অন্যদিন হলে এণাক্ষী বাধা দিত, হাত থেকে সিগারেটের প্যাকেট কেড়ে নিয়ে বলত, আর খেতে হবে না, থাক। বেশি সিগারেট খেলে ক্যানসার হয়। কিন্তু আজ একটা কথা বলতেও তার উৎসাহ হল না। যা খুশি করে করুক, যা হওয়ার হোক। সংসারের কারো জন্যে এণাক্ষীর কোনো মমতা নেই—সৌরীনের জন্যেও না।

নিজের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। চমকে যখন জেগে উঠল, তখন বোধ হয় মাঝরাত। বাইরে তীব্র ঝিঁঝির ঝঙ্কার, আমবাগানে প্যাঁচার কান্না, অনেক দূরের হাওয়ায় বিলের অস্পষ্ট প্রেতধ্বনি আর ঘরের কোণায় লণ্ঠনের শিখাটা লাল হয়ে এসেছে।

অপরিচিত একটা শব্দ উঠছে সৌরীনের গলা থেকে। যন্ত্রণা আর কান্না মেশানো অস্বাভাবিক আওয়াজ।

অসীম ভয়ে উঠে বসল এণাক্ষী। সারা শরীর শিউরে উঠল।

—কী হল? কী হয়েছে তোমার?

—পায়ে দারুণ যন্ত্রণা হচ্ছে এণা। ভারী কষ্ট হচ্ছে।

—দেখি দেখি—

লণ্ঠনটা তুলে, সেটা বাড়িয়ে দিয়ে এণাক্ষী কাছে নিয়ে এল। সৌরীনের ডান পায়ের তলাটা ফুলে বিশ্রী হয়ে গেছে—রঙটা টকটকে লাল।

—পায়ে একটা হাড় ফুটেছিল এণা। বোধ হয় সেই জন্যেই। উঃ, কী যে যন্ত্রণা হচ্ছে কী বলব!

সৌরীনের পায়ের দিকে তাকিয়ে এণাক্ষীর রক্ত হিম হয়ে গেল। তার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ল। সিঁড়িতে আছাড় খেয়ে পড়ে কপাল কেটে গিয়েছিল ঠাকুরমার—তারপরে ইরিসিপেলাস! সমস্ত মুখখানা ফুলে বেলুনের মতো হয়ে গিয়েছিল—নাক চোখ ডুবে গিয়েছিল সব, আর দেড়দিনের মধ্যেই—

লণ্ঠনটা মেজেয় নামিয়ে ঝড়ের গতিতে দরজা খুলে বেরুল এণাক্ষী। কাকার শোয়ার ঘরটা সে চেনে—যতই ভয় করুক না কেন, এখন কোনো ভয়কেই তার ভয় নেই।

॥ চৌদ্দ ॥

ঘর থেকে বেরিয়ে এণাক্ষী দেখল বারান্দাটা পাথুরে অন্ধকারে ঢাকা। প্রকাণ্ড রুইতনের মতো লালচে কাচের যে বড় বাতিটা লোহার শিকলের সঙ্গে ঝুলে বিশাল বারান্দায় আবছা বিচিত্র আলো ছড়ায়, সেটা কখন নিবে গেছে। দূর থেকে জলের গর্জন বয়ে এলোমেলো হাওয়া এসে তিমিরস্তব্ধ শূন্য বাড়িটায় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছে। নীচে প্রাচীর ঘেরা অতিকায় উঠোনটার এখানে ওখানে যেন কতগুলো ছায়ামূর্তি থাবা পেতে বসে আছে।

একবারের জন্যে এণাক্ষী থমকে দাঁড়ালো। একটা অদ্ভুত ভয় কার ঠাণ্ডা নিষ্ঠুর মুঠোর মতো তার হৃৎপিণ্ড আঁকড়ে ধরতে চাইল। মনে হল সে যেন একটা কবরখানায় এসে দাঁড়িয়েছে—যেখানে একটি জীবিত প্রাণীও যার কোথাও নেই।

কিন্তু মুহূর্তের জন্যে। তারপরেই ঘর থেকে শোনা গেল সৌরীনের গোঙানি। নিজের ঠাকুরমার মুখ। ইরিসিপেলাস। নাক-চোখ-মুখ বসে গিয়ে বেলুনের মতো দেখাচ্ছিল।

এণাক্ষী এগিয়ে চলল। কয়েক পা।

এগিয়েই আবার সে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। জমে যেতে চাইল বুকের রক্ত। একটা অস্ফুট চিৎকার গলার শিরা পর্যন্ত এসে থরথর করে কাঁপতে লাগল। দীর্ঘ বারান্দার শেষপ্রান্তে সাদা একটা মূর্তি যেন অন্ধকার থেকে ফুঁড়ে বেরিয়ে এল।

—কে? কে ওখানে?

গলার স্বরে ভয় ভাঙল এণাক্ষীর। রঘু।

—রঘু, আমি।

সাদা মূর্তিটা এগিয়ে এল সামনে। হাতে লম্বা একটা লাঠি।

—বৌদি? এত রাতে এদিকে এসেছেন কেন? কী দরকার?

রঘুই বটে। কাছে আসতে তাকে চেনা যাচ্ছে। আর এতক্ষণে অন্ধকারেও চোখের দৃষ্টি অনেকখানি অভ্যস্ত হয়ে এসেছে এণাক্ষীর।

—একবার কাকাবাবুকে ডেকে দাও রঘু। এক্ষুনি।

—কী হয়েছে বৌদি?

—তোমার দাদাবাবুর পায়ে আজ দুপুরে একটা হাড় ফুটেছিল। খুব যন্ত্রণা হচ্ছে এখন, পা-টা অনেকখানি ফুলে উঠেছে। গ্রামে নিশ্চয়ই ডাক্তার আছে—এক্ষুনি খবর দিতে হবে।

রঘু চুপ করে রইল।

ঘর থেকে সৌরীনের অস্ফুট কাতরোক্তি ভেসে আসছে। অধৈর্য হয়ে এণাক্ষী বললে, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

রঘু আস্তে আস্তে বললে, বাবু বাড়িতে নেই বৌদি।

—বাড়িতে নেই ? তবে কোথায় গেছেন ?

—তিন-চারজন বাদিয়া মুসলমান এসেছিল। তাদের নিয়ে—বলতে বলতে থেমে গেল রঘু : তাদের নিয়ে কোথায় যে বেরিয়ে গেলেন আমি বলতে পারব না।

বাবু কোথায় গেছেন রঘু জানে। বলবে না—বলবার হুকুম নেই। রঘুর গলার স্বরেই এণাক্ষী তা টের পেলো। কিন্তু তা নিয়ে এণাক্ষীর কোন কৌতূহল নেই।

ব্যাকুল হয়ে বললে, তাহলে কী হবে রঘু ?

—আমি স্টোভ এনে জল গরম করে পায়ে সেঁক দিয়ে দিচ্ছি বৌদি। ওতেই কমে যাবে।

এণাক্ষীর ধৈর্যচ্যুতি হল।

—তোমাকে ডাক্তারী করতে হবে না রঘু। তুমি বরং ডাক্তারকে খবর দাও।

রঘু নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তীক্ষ্ণ উগ্রস্বরে এণাক্ষী বললে, কী, দাঁড়িয়ে আছো যে ? যাও—খবর দাও ডাক্তারকে !

রঘু নড়ল না। মৃদু বিনীত স্বরে বললে, হুকুম নেই বৌদি।

—হুকুম নেই ? কিসের হুকুম নেই ?

—রাতে বাড়ি ছেড়ে যাবার। বাবু বারণ করে গেছেন।

ক্ষিপ্ত হয়ে এণাক্ষী বললে, তোমাদের কি মাথা খারাপ ? যন্ত্রণায় লোকটা ছটছট করছে, তুমি বলছ হুকুম নেই ? যাও—এখুনি যাও—

রঘু তবুও নড়ল না। তেমনি বিনীত শান্তস্বরে বললে, আমি গরম জল এনে দিচ্ছি।

এণাক্ষীর মাথার মধ্যে আগুন ধরে উঠল।

—বেশ, তবে আমিই যাচ্ছি।

রঘু নিরুপায়ভাবে বললে, আপনি পারবেন না বৌদি। জেলাবোর্ডের ডাক্তারখানায় ভালো ডাক্তার আছে। কিন্তু সে প্রায় মাইলটাক দূরে—নৌকো করে যেতে হয়।

—আমি সেখানেই যাব।

অসহ্য ক্রোধে জ্বলতে জ্বলতে ঘরে ফিরে এল এণাক্ষী।

একটা চাদরে মাথা পর্যন্ত মুড়ে সেখানে আর্তনাদ করে চলেছে সৌরীন। এণাক্ষী টেবিলের ওপর থেকে টর্চলাইটটা তুলে নিয়ে আবার বেরিয়ে এল বারান্দায়।

সামনেই রঘু দাঁড়িয়ে।

—আমি বলছিলুম বৌদি, আজ রাতে বরং গরম জলের সেঁক দিয়ে দিই। কাল সকালে—

এণাক্ষী এবারে চিৎকার করে উঠল।

—না, কাল সকালে নয়। আজ এখুনি—এখুনি ডাক্তার ডাকতে হবে।

ঘর থেকে সৌরীনের গোঙানি শোনা গেল।

—কী হয়েছে এণা—কী হল ?

—কিছু হয় নি। তুমি একটু চুপ করে শুয়ে থাকো—আমি আসছি।

এণাক্ষী সিঁড়ির ধাপে পা দিল। টর্চের আলোয় শ্যাওলা-পিছল সিঁড়িগুলো

সরীসৃপের মতো চকচক করে উঠল। সিঁড়ির পাশের দেওয়ালে গিরগিটির মতো একটা চ্যাপটা তক্ষক ডেকে উঠতে যাচ্ছিল, টর্চের আচমকা আলো পড়তে সে থেমে গেল—দুটো ছোট ছোট চোখ ঝিকঝিক করে উঠল তার।

—বৌদি—

এণাক্ষী দু-তিনটে ধাপ নামতে পিছন থেকে ডাক দিলে রঘু। কিন্তু অসহ্য ক্রোধে আর অসীম ঘৃণায় এণাক্ষী তার ডাকে সাড়া দিলে না।

—ডাক্তারখানায় যাওয়া দূরে থাক, আপনি বাড়ি থেকে বেরুতেই পারবেন না বৌদি।

সিঁড়ির রেলিং ধরে তৎক্ষণাৎ ফিরে দাঁড়াল এণাক্ষী। দু চোখে সমুদ্যত বজ্র। সিঁড়ির মাথায় রঘু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে, তার মুখে টর্চের ধারালো আলো ফেলে এণাক্ষী বললে, কে বাধা দেবে রঘু—তুমি ?

আলোর আঘাতে রঘুর চোখ বুজে এল পলকের জন্যে। কুণ্ঠিত হয়ে রঘু বললে, আমি বাধা দেব না। দরজা দেখলেই বুঝতে পারবেন।

দরজা দেখলেই ? টর্চের আলো এবার বারান্দা পার হয়ে সোজা দরজায় গিয়ে পড়ল। রঘু মিথ্যে বলেনি। মোটা মোটা লোহা বসানো যমপুরীর ফটকের মতো করালদর্শন দরজাটা নিঃশব্দ অট্টহাসির ভঙ্গীতে তাকিয়ে আছে এণাক্ষীর দিকে। আর তাদের বুকের ভেতরে প্রকাণ্ড একটা তালা একটি হিংস্র দাঁতের মতো ব্যঙ্গ করছে এণাক্ষীকে।

উপায় নেই—কিছুই করবার নেই। বুকের ভেতর থেকে কান্না ঠিকরে উঠতে চাইল এণাক্ষীর।

—ঘরে চলুন বৌদি। গরম জলের সেঁক পড়লেই ঠিক হয়ে যাবে। মিথ্যে ব্যস্ত হচ্ছেন—আমাদের অমন হয়।

ফিরেই যেতে হবে ? রঘুর গলায় নিয়তি যেন কথা কইছে। ওই তালার শাসন যেমন নিষ্ঠুর তেমনি নির্ভুল।

—আমি বলছি বৌদি—রঘু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ঠিক তৎক্ষণাৎ বিদ্যুৎ-চমকের মতো কথাটা মনে এল এণাক্ষীর। দীপ্ত চোখের দৃষ্টি রঘুর ওপর ফেলে তার কথায় বাধা দিয়ে এণাক্ষী বললে, দরজা খুলে দাও রঘু !

—চাবি বাবু নিয়ে গেছেন বৌদি।

তিক্ত গলায় এণাক্ষী বললে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে ভেতরের দরজায় কেউ তালা দিতে পারে না রঘু। দরজা খুলে দাও।

রঘু মাথা নীচু করল।

—খোলো দরজা।

প্রায় নিঃশব্দ আওয়াজ এল : হুকুম নেই।

—আমি তোমায় হুকুম করছি। হঠাৎ আকাশের বাজ ডেকে উঠল এণাক্ষীর গলায় : তুমি কি এ বাড়িতে কেবল কাকারই নিমক খাও ? আমার স্বামী এর অর্ধেক শরিক—তুমি আমারও চাকর। খুলে দাও দরজা—

রঘুর নির্বিকার মুখে এইবারে আতঙ্কের ছাপ পড়ল। এইবারে চমকে গেল রঘু।

এতদিন একজন ছাড়া এখানে কেউ তাকে হুকুম করেনি—মালঞ্চের রায়বাড়ির আর কোনো মালিক কোথাও আছে, সেকথা মনেও পড়েনি। কিন্তু মনে পড়ল এখন। এই মাঝ-রাতে এই ভাঙা শ্যাওলা ধরা সাপের পিঠের মতো সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে—এণাক্ষীর দুটো বজ্রজ্বালা চোখের দিকে তাকিয়ে রঘুর মনে পড়ল।

—খুলে দাও দরজা—

অস্বস্তিতে রঘু নড়ে উঠল।

—খোলো বলছি তালা। আমার হুকুম—খুলে দাও এক্ষুনি।

মাথা নিচু করে রঘু বললে, চলুন বৌদি। কিন্তু এত রাতে—

—সে ভাবনা আমার, তোমার নয়।

সিঁড়ি দিয়ে, উঠোন পেরিয়ে চাবুক খাওয়া কুকুরের মতো এণাক্ষীকে অনুসরণ করে এগোল রঘু। তা বটে, ভাবনা তার নয়। তবুও না ভেবে সে পারল না। কোমর থেকে চাবিটা নিয়ে তালা খুলতে খুলতে রঘু ভাবল, এইখানেই এর শেষ নয়। এই খোলা দরজা দিয়ে এইবারে বিলের জল ঢুকবে—এইবারে রায়বাড়িতে এমন কিছু ঘটবে যা অনেকদিন ঘটেনি, যা না ঘটলেই ভালো হত।

পেত্নীর কান্নার মতো তীব্র কর্কশ আওয়াজ তুলে খুলল দরজা। সামনে আমগাছ থেকে একটা বাদুড় সে-শব্দে ডানা মেলে অন্ধকার আকাশে আছড়ে পড়ল।

—একা এই রাতে কোথায় যাবেন বৌদি? আপনি তো কিছু জানেন না?

—আমাকে জেনে নিতে হবে।

—তাহলে আমিই যাই বৌদি। রঘু অপরাধীর মতো এগিয়ে এল।

—কাকার দু-দুটো হুকুম ভেঙো না রঘু—বিপদে পড়বে। জ্বালাধরা হাসি হেসে এণাক্ষী বললে, তুমি বরং তোমাদের দাদাবাবুকে দেখো, আমি আসছি।

একা গাছের ছায়া ঢাকা বীভৎস অন্ধকার পথ দিয়ে, টর্চের আলোয় রাত্রিকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে এণাক্ষী এগিয়ে চলল। পাশেই শিবমন্দিরটা—ঘন জঙ্গল আর সতীদাহের স্মৃতি নিয়ে কালভৈরবের মতো দাঁড়িয়ে। দিনের আলোতেও ওই মন্দিরের দিকে তাকালে তার গা ছমছম করে; কিন্তু আজ রাত্রে তার গায়ের রক্তে আগুন ধরে গিয়েছিল, মাথায় বিদ্যুৎ খেলছিল—রাত্রে যারা গোপন হিংসা নিয়ে শিকারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায় তাদের মতোই এণাক্ষীও যেন নিশাচর হয়ে উঠেছিল।

সে ভয় পেলো না।

ভয় পেলেন যদুপতি, ভয় পেলো প্রভাস, ভয় পেলো চিত্রা, ভয় পেলেন চিত্রা-প্রভাসের মা।

—কী হয়েছে বৌদি? এত রাত্রে? এইভাবে?

প্রভাসের চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে এণাক্ষী বললে, আমার বড় বিপদ ঠাকুরপো। তোমার দাদা অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এক্ষুনি আমার সঙ্গে তোমাকে ডাক্তারখানায় যেতে হবে।

। পনেরো ।

এণাক্ষী বললে, আমাকে ক্ষমা করবেন। অত্যন্ত বিপদে পড়েই এত রাত্রে আপনাদের বিরক্ত করছি।

এণাক্ষীর চোখের দিকে তাকিয়ে একটা কথাও কেউ জিজ্ঞাসা করতে সাহস পেল না। সমস্ত বাড়িটাই যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগল।

—ও'র পায়ে একটা হাড় ফুটে গিয়েছিল। ফুলে উঠেছে এখন, আর ভয়ানক যন্ত্রণা হচ্ছে। কাকাও বাড়িতে নেই। তাই আপনাদের কাছেই ছুটে এসেছি। আপনারা কেউ আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে চলুন।

যদুপতি একবার প্রভাসের দিকে চাইলেন। তারপর বিব্রতভাবে বললেন, তোমার যাওয়ার দরকার কি মা? ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ডাক্তারখানা প্রায় দেড় মাইল দূরে। সে-ও নৌকো করে যেতে হবে। আমি লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি—সে-ই গিয়ে ডাক্তার ডেকে আনুক।

—না জ্যাঠামশাই, আমাকেও যেতে হবে।

এতক্ষণ পরে কথা বললে প্রভাস।

—চলো বৌদি, আমি নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে।

কী যেন বলতে চাইলেন যদুপতি। বজরার সেই দুর্ঘটনাটা ঘটবার পরে অনেকগুলো কথাই হাওয়ার মতো তাঁর কানে এসেছে। জ্ঞাতিশত্রুতার বিষে কতগুলো কদর্য বুদ্বুদ ফুটতে শুরু হয়েছে। একটা আধপাগলা বিকৃতবুদ্ধি লোককে তিনি ভয় করেন না—কিন্তু এণাক্ষীর জন্যে তাঁর দুর্ভাবনা হল। ওই কুশ্রী কদর্য লোকটার সন্দেহের কোনো সীমা নেই—না করতে পারে এমন কাজ নেই।

তবু বাধা দিতে পারলেন না। এণাক্ষীর দৃষ্টি দেখে তাঁর মনে হল, বাধা দিয়ে কোনো লাভ হবে না।

দু মিনিটের মধ্যেই তৈরি হল প্রভাস।

—বৌদি, চলো।

বাড়ির বাঁধা ঘাটেই ডিঙ্গি তৈরি। প্রভাসের টর্চের আলো অনুসরণ করে এণাক্ষী এসে ডিঙ্গিতে উঠল। চাকর কানাই ডিঙ্গির দড়ি খুলে লগির খোঁচা মারল। একটা ঝাঁকুনি খেয়ে স্রোতে এগিয়ে চলল নৌকো।

কালো অজগরের মতো এঁকেবেঁকে চলেছে খালের জল। তারার আলো ইতস্তত ঝক্‌ঝক্‌ করছে ময়াল সাপের পিঠের চক্রাংকের মতো। রাত্রি-মাখানো ঝোপগুলো নিঃসাড় হয়ে জলের ওপরে ঝুঁকে আছে। জোনাকি জ্বলছে—যেন লক্ষ লক্ষ অশরীরীর চোখ।

অন্যদিন হলে এণাক্ষীর শরীর-মন ভয়ে থমথম করত। এই জল যে হিংস্র জান্তব সমুদ্র থেকে বেরিয়ে এসেছে, তার কথা মনে পড়ে থমকে যেতে চাইত হৃৎপিণ্ড। কিন্তু আজ যেন কী করে তার সমস্ত ভয়ের হাত থেকে মুক্তি ঘটে গেছে। যে-মুহূর্তেই রায়বাড়ির লোহার কপাট খুলে গেছে—সেই মুহূর্ত থেকেই পৃথিবীর কোনো কিছুকে

আর তার ভয় নেই।

লগির শব্দ—জলের শব্দ—ঝোপঝাড়ে হাওয়ার শব্দ। এণাক্ষী এক দৃষ্টিতে জলের দিকে তাকিয়ে রইল। প্রভাস সিগারেট ধরালো—দেশলাইয়ের কাঠির একঝলক আলো আকস্মিকভাবে জ্বলে উঠেই আবার ডুবে গেল অন্ধকারের মধ্যে। কিন্তু নিজেদের এই চুপ করে থাকাটা অস্বস্তিকর মনে হল প্রভাসের—কথা বলা দরকার।

—কাকা কোথায় গেছেন বৌদি ?

—জানি না।

—রঘুকে নিয়ে এলে না কেন ?

—তার বেরুবার নাকি হুকুম নেই। অন্ধকারে এণাক্ষী হাসল, তারার আলোয় অদ্ভুত তীক্ষ্নভাবে ঝকঝক করে উঠল তার দাঁত : আমাকেও জোর করেই বেরিয়ে আসতে হয়েছে।

কথার ভঙ্গিতে প্রভাসের শরীর সিরসির করে উঠল।

—সকালে যদি একটু ভালো থাকেন, তাহলে কালই আমি ওঁকে নিয়ে কলকাতায় চলে যাব ঠাকুরপো।

চমকে প্রভাস বললে, কালই ?

—হাঁ, কালই। ও বাড়িটা পাগলাগারদ ঠাকুরপো। ওখানে স্বাভাবিক মানুষ বাস করতে পারে না। ও বাড়িতে আর দুদিন থাকলে আমিও পাগল হয়ে যাব।

প্রভাস কথা খুঁজতে লাগল। কিন্তু কী বলা যায় ? এণাক্ষীর সঙ্গে সে-ও সম্পূর্ণ একমত।

কানাই লগি ঠেলে চলল। খাল অনেকখানি সরু হয়ে এসেছে এখানে। জলের ভেতর টুপটাপ করে বৃষ্টি পড়ার মতো আওয়াজ হচ্ছে। মাছের ঝাঁক। এখানে জাল ফেললে ছিঁড়ে যেতে চাইবে মাছের ভারে। তিড়িক তিড়িক করে গোটাকয়েক মাছ নৌকোর ওপর লাফিয়ে উঠল, একটা এসে পড়ল এণাক্ষীর কোলে। আজ আর আনন্দে বিস্ময়ে উচ্ছল হয়ে উঠল না এণাক্ষী, মাছের ঠাণ্ডা ছোঁয়াটা তার বিশ্রী লাগল—কাপড় ঝেড়ে মাছটাকে সে আবার জলে ফেরত পাঠিয়ে দিলে।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে এণাক্ষী বললে, জানো, রঘু সঙ্গে আসতে চাইলেও আমি তোমাকে ডেকে নিতুম।

—কেন ?

—জবাব দেব বলে। এণাক্ষীর স্বর ধারালো হয়ে উঠল : ওই নোংরা লোকটাকে একটা মুখের মতো জবাব দিতে চাই। ওকে জানিয়ে যাব—সব মেয়েই কালিমা নয়। ইচ্ছে করলেই থাবা বাড়িয়ে সকলের গলা টিপে ধরা যায় না।

—বৌদি !

প্রভাসের হাত থেকে সিগারেটটা জলের মধ্যে খসে পড়ল।

—যেসব কথা উনি রটিয়ে বেড়াচ্ছেন, সবই আমি শুনেছি ঠাকুরপো।

প্রভাসের গলা শুকিয়ে এল। অন্ধকারে জোনাকির ঝাঁক শয়তানের লক্ষ চোখের মতো জ্বলছে। যেন চারদিকে কাকা তার বিষাক্ত ক্রূর দৃষ্টি মেলে রেখেছেন।

—এ জানলে আমি তোমার সঙ্গে আসতাম না বৌদি।

আবার হাসল এণাক্ষী। তারার আলোয় তার উজ্জ্বল সাদা দাঁতগুলো আবার অদ্ভুত হিংস্র দেখাল।

—তোমার বুঝি ভয় করছে?

শান্তস্বরে প্রভাস বললে, ভয় আমার নেই। অন্তত নিজের জন্যে কোনোদিনই নেই। আমি তোমার কথাই ভাবছি।

—আমার ভাবনা আমিই ভাবব ঠাকুরপো। তুমি দুশ্চিন্তা কোরো না।—এণাক্ষীর গলা থেকে একরাশ তিক্ততা ঝরে পড়ল: তুমি ইচ্ছে করলে ফিরে যেতে পারো।

স্পষ্ট ঝগড়ার সুর। অপমান করবার চেষ্টা। প্রভাস আবার চুপ করে গেল। এই দু'তিন দিনের মধ্যে অদ্ভুত রকমের বদলে গেছে বৌদি। যেন এই জলতরঙ্গের আদিম বন্যতা নিজের অজ্ঞাতেই কখন তার রক্তের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে গেছে। এই ক'দিন তিলে তিলে এখানকার বিষ পান করে বিষকন্যা হয়ে উঠেছে সে।

—আমি জবাব দিয়ে যাব ঠাকুরপো—আমি এর জবাব দিয়ে যাব।

বদলে গেছে এণাক্ষী। ভুতুড়ে রায়বাড়ির অভিশপ্ত আত্মা আশ্রয় করেছে তাকে।

অস্বস্তি ভোলবার জন্যে আবার সিগারেট ধরালো প্রভাস। খানিকটা উগ্র ধোঁয়া যেন গলার মধ্যে গিয়ে ধাক্কা মারল—বিস্বাদ কটু লাগল মুখ। সবই বিস্বাদ লাগছে প্রভাসের। কিন্তু এমন হওয়ার কথা ছিল না। বজরা থেকে জলে পড়ে যাওয়ার পরে সেই নির্জন উঁচু ডাঙা। জ্ঞান হারিয়ে পড়ে আছে এণাক্ষী—বাবলা গাছ থেকে পেতনীর মতো কঁকিয়ে কঁকিয়ে কাঁদছে বকের ছানা। সেই আশ্চর্য অনিশ্চিত মুহূর্তগুলোকে এত খারাপ লাগেনি প্রভাসের। সেই অবস্থাতেও একটা অপূর্ব সুরের রেশ বাজছিল চারদিকে—'আর বিলম্ব কোরো না গো ওই যে নেভে বাতি।' কিন্তু আজ একেবারে অন্যরকম। এণাক্ষীর সাহচর্যকে সহ্য করা যাচ্ছে না। হঠাৎ প্রায় চিৎকার করে উঠল কানাই।

—দাদাবাবু, দেখুন দেখুন—

দুজনেই চমকে উঠল। কানাই কী দেখাতে চায় সেকথা জিজ্ঞেস করবারও দরকার হল না। ঝোপঝাড়ে গাছপালার মাথার ওপর পশ্চিম আকাশ লালে লাল হয়ে উঠেছে। হাতীর শুঁড়ের মতো এক-একটা আগুনের শিখা লাফিয়ে উঠছে থেকে থেকে—লালের ওপর কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে দিচ্ছে মুঠো মুঠো। দুম্ দুম্ করে বাঁশ ফাটবার আওয়াজ পাওয়া গেল গোটাকয়েক।

—খুব আগুন লেগেছে তো!

স্তম্ভিত দৃষ্টিতে এণাক্ষী চেয়ে রইল সেদিকে। এমনভাবে আগুন লাগা সে কখনো দেখেনি। কলকাতার পথ দিয়ে দ্রুত ঘণ্টা বাজিয়ে ফায়ার-বিগ্রেডকে ছুটতে সে দেখেছে, কিন্তু গ্রামে আগুন লাগার যে এমন একটা ভয়ঙ্কর আকাশজোড়া রূপ আছে সে তার কল্পনায়ও ছিল না। এ এক অবিশ্বাস্য দুঃস্বপ্ন।

শুকনো গলায় এণাক্ষী বললে, কোথায় আগুন লাগল?

কানাই বললে, মনে হচ্ছে জয়পুরহাটের দিকে।

—আমাদের জয়পুরহাটের কাছারীতে নয় তো ? নিজের অজ্ঞাতেই বলে ফেলল প্রভাস।

—কে জানে!

তিনজনই তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। রক্ত আলোর পৈশাচিক উল্লাস চলেছে আকাশে। মানুষের ক্ষীণ চিৎকার ভেসে আসছে হাওয়ায়। ঊর্ধ্বমুখী শিখাগুলো কালো ধোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিকণার ফুলঝুরি ছড়িয়ে দিচ্ছে। আগুন আরো বাড়ছে—প্রভাস বললে উদ্বিগ্ন গলায়। বাতাসে পোড়া গন্ধ। বাঁশ ফাটবার আওয়াজ। মানুষের ক্ষীণ চীৎকার। এণাক্ষী আর চাইতে পারল না, কালো জলের ওপর লাল আকাশের আভা পড়েছে—চোখ নামিয়ে নিলে সেদিকে। নিঃশব্দে এগিয়ে চলল নৌকো।

আচমকা ডাঙায় ধাক্কা লাগতে যেন ঘোর ভাঙল এণাক্ষীর।

কানাই বললে, এসে পড়েছি।

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ডাক্তার ব্রজেন সেন প্রৌঢ়, ভালো মানুষ। ডাক শুনেই উঠে এলেন ধড়মড় করে। তারপর সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাগ হাতে করে বেরিয়ে পড়লেন।

আকাশে তখনো আগুনের হোলিখেলা চলছে। ফেরার মুখে নৌকোয় কেমন নিস্তেজ হয়ে বসে রইল এণাক্ষী। পোড়া গন্ধে ভরা হাওয়াটা যেন তার মুখের ওপর কতগুলো কর্কশ আঙুলের মতো আঁচড় টেনে চলেছে। হঠাৎ এণাক্ষীর ভয় করতে লাগল। উত্তেজিত শিরাস্নায়ুগুলো শিথিল হয়ে এসেছে এতক্ষণে। খানিকটা তীব্র নেশা কেটে যাওয়ার অবসাদ যেন তাকে আচ্ছন্ন করছে এসে।

ব্রজেন সেন প্রভাসের সঙ্গে কথা বলে চলেছেন। টুকরো টুকরো কানে আসছে।

—আমার কাছে নতুন ফাইল এসেছে কাল—হ্যাঁ, পেনিসিলিনই হচ্ছে একমাত্র ট্রিটমেণ্ট—এই মালদতেই একটা কেস—চল্লিশ লাখ, না-না, ভাববেন না—

না, সৌরীনের জন্যে এখন তার ভাবনা নেই। সে ভাবনার ভার আরো অনেকে নিয়েছে। প্রভাস আছে, ডাক্তার আছেন, কাল জ্যাঠামশাই আসবেন, চিত্রাও আসবে হয়তো। এখন তার নিজের কথা ভাববার সময় এসেছে। এইবারে তারা দুজন মুখোমুখি। সে আর কাকা।

আসল বোঝাপড়া বাকী আছে।

বাড়ির ঘাটে নৌকো লাগল। সেই শিবমন্দিরটার পাশে। সঙ্গে সঙ্গেই ওদিক থেকে একটা টর্চের উজ্জ্বল আলো ছুটে এসে পড়ল ওদের ওপর।

কাকা এগিয়ে আসছেন। এগিয়ে আসছে কালপুরুষের মতো একটা দীর্ঘ প্রেত-ছায়া। এণাক্ষীর হৃৎপিণ্ড থমকে গেল—মাথার ভেতর আছড়ে পড়তে লাগল রক্তের ঢেউ।

কাকা সামনে এসে দাঁড়ালেন। এণাক্ষীকে যেন দেখতেও পেলেন না। তাঁর চোখ ডাক্তারের দিকে।

স্থির শান্তস্বরে কাকা বললেন, নমস্কার ডাক্তারবাবু, আসুন আসুন। এসো প্রভাস।

॥ ষোল ॥

কয়েকটা ইন্‌জেক্‌শনেই কাজ হল। সৌরীন যখন ঘুমিয়ে পড়ল, তখন বাগানের বুলবুলিদের ঘুম ভেঙেছে। শিশিরে ভেজা লবঙ্গলতার কুঁড়িগুলো পুবের দিকে চোখ তুলেছে, পশ্চিম আকাশের কপালে রঙের ছোঁয়া দিয়ে পুবের কালনাগিনী জলের ওপর সূর্যের প্রথম পা পড়েছে।

ডাক্তার বললেন, আর ভাবনা নেই। তবুও ডিস্‌পেন্‌সারির কাজ সেরে বেলা বারোটা নাগাদ এসে আমি আর একবার দেখে যাব।

ডাক্তার, এণাক্ষী, প্রভাস আর রঘু যখন ঘরের ভেতর সৌরীনকে নিয়ে বিব্রত, তখন বাইরের বারান্দায় একটানা পায়চারি করেছেন কাকা। তাঁর চটির শব্দ একটা অশুভ আবহ-সঙ্গীতের মতো কানে এসেছে এণাক্ষার, বার বার মনে হয়েছে, কেবল এই ঘরেই নয়, আরো বড় কী একটা অনিশ্চিত—কী একটা আতঙ্ক বাইরে অপেক্ষা করে আছে। মামার মুখে আসামের কোন্ এক ফরেস্ট্ বাংলোর গল্প সে শুনেছিল ছেলেবেলায়। সমস্ত রাত বাংলোর চারপাশে একটা দুরন্ত ম্যান্-ঈটার বাঘ ঘুরে বেড়িয়েছে, তীব্র দুর্গন্ধ ভেসে এসেছে বন্ধ দরজা-জানালার ভেতর দিয়ে, শুকনো পাতার ওপর শোনা গেছে তার পায়ের শব্দ—দরজা খুলে একটি অসতর্ক মানুষ বেরিয়ে এলেই সে সোজা তার ওপর লাফিয়ে পড়বে। ঘরের তিনটি প্রাণী বিহ্বল আতঙ্কে রাত জেগেছে, প্রত্যেকটি মুহূর্তকে প্রহর বলে মনে হয়েছে, তিনজনে একসঙ্গে ভেবেছে, ওই দুর্দান্ত নরখাদকের পক্ষে একটা জানালা ভেঙে ঘরে ঢুকে পড়তে কতক্ষণ? আত্মরক্ষার জন্যে একটি পেন্‌সিল কাটা ছুরি পর্যন্ত কারো সঙ্গে ছিল না!

বাইরে কাকার একটানা পায়ের আওয়াজ। ঘরের ভেতর সৌরীনের যন্ত্রণার গোঙানি, প্রভাসের হাতে পাখা, আলোয় উঁচু করে তুলে ইন্‌জেকশন সিরিঞ্জের পিস্টনটা ঠেলে পরীক্ষা করছেন ডাক্তার—তাঁর কপালে ঘামের বিন্দু, রঘু গরম জলের গামলা নিয়ে আসছে, অসহায় চোখে সৌরীনের বিকৃত মুখের দিকে তাকিয়ে আছে অসুস্থ বিবর্ণ এণাক্ষী—আর তার ভেতরে সমানে কাকার চটির শব্দ ভেসে আসছে। আসামের ফরেস্ট বাংলোর বাইরে ম্যান্-ঈটারটা অপেক্ষা করছে।

কিন্তু সকাল হল। সৌরীন ঘুমুল, পাখা ছেড়ে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল প্রভাস, ডাক্তার ব্যাগ বন্ধ করে রুমাল দিয়ে মুখ আর কপাল মুছে ফেললেন, বললেন, ভাবনা নেই।

বাইরে বুলবুলিরা শিস্ দিয়ে উঠল আর শিশিরে ভেজা লবঙ্গলতার গুচ্ছের ওপর একরাশ রাঙা আলো এসে পড়ল। তখন কাকা এসে ঘরে ঢুকলেন।

—আর ভয়ের কিছু নেই বলছেন ডাক্তারবাবু?

এণাক্ষী কাকার মুখের দিকে তাকাতে পারল না, কিন্তু প্রভাস চোখ তুলে চাইল। জানালার পাশে কাকা এসে দাঁড়িয়েছেন, হাত রেখেছেন টেবিলটার ওপর। পাশেই জ্বলন্ত লণ্ঠনটা—তখনো নেভানো হয় নি; সেই লণ্ঠনের সাদা আলোয় আর বাইরের রঙিন আভায় প্রভাস দেখল, কাকার বাঁ হাতের পিঠে পাকা বড় আঙুরের মতো দুটো

আগ্নে পোড়া ফোস্কা টলটল করছে।

মুহূর্তের মধ্যে কী একটা সম্ভাবনা প্রভাসের চিন্তায় ঝিলিক দিয়ে গেল। মনে পড়ল রাত্রির আকাশে রক্তের রঙ—কিলবিলে একদল সাপের মতো আগুনের লহর দুলছে। 'আমাদের কাছারিবাড়িটা তো ওদিকেই—!' অত রাতে কাকা কোথায় বেরিয়ে গিয়েছিলেন? বজরার সেই ঘটনাটা ঘটবার পর থেকে যে কতকগুলো অর্থহীন কুৎসিত কথা—

কাকা হয়তো প্রভাসের চোখ লক্ষ্য করে থাকবেন। প্রভাস ঠিক বুঝতে পারল না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর হাতটা সরে গেল টেবিলের ওপর থেকে।

ততক্ষণে ডাক্তার কথা কইতে শুরু করেছেন। তার শেষের অংশগুলো কেবল প্রভাসের কানে এল।

—দরকার হলে দুপুরে আবার লাখদশেক দিয়ে যাব। তবে মনে হচ্ছে এতেই কাজ হবে—কাল নাগাদ ইন্‌ফ্ল্যামেশন্‌টা একেবারেই থাকবে না। আচ্ছা রায়মশাই নমস্কার, আসি এখন।

—বৌদি, আমিও চলি, বিকেলে একবার আসব। প্রভাস এণাক্ষীর দিকে তাকালো।

এণাক্ষী কথা বললে না। কেবল গভীর কৃতজ্ঞতায় ভরা চোখ তুলে মাথা নাড়ল মাত্র।

প্রভাস বেরিয়ে এল।

বারান্দায় কাকা বলছিলেন, আপনার ভিজিটের টাকাটা!

—পরে দেবেন এখন, ব্যস্ত কেন? আচ্ছা নমস্কার—

—নমস্কার। ভারী উপকার করলেন—কাকা ভদ্রতা করবার চেষ্টা করছেন।

—না-না, উপকার কিসের, আমাদের কাজই তো এই, ডক্‌টরস্‌ ডিউটি—বলতে বলতে পা চালিয়ে সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি নামতে লাগলেন ডাক্তার। তাঁর নামার ভঙ্গি দেখে প্রভাসের মনে হচ্ছিল, এই লোকটির সামনে তাঁর আর বেশিক্ষণ দাঁড়াবার সাহস নেই—এই বাড়ি থেকে বেরুতে পারলেই তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন।

প্রভাস একবার কাকার দিকে তাকালো, কিন্তু কাকা সরে গেছেন। সৌরীনের ঘরে ঢুকছেন তিনি। ডান হাতের চেটোটা আবার মুহূর্তের জন্যে প্রভাসের চোখে পড়ল—আগুনে পোড়া ফোস্কা দুটো সম্পর্কে সন্দেহের কোনো কারণই আর নেই।

কিন্তু সে আর দাঁড়ালো না। বড় বড় পায়ে উঠোনে নেমে এসে ডাক্তারের সঙ্গ ধরল।

নিদ্রাহীন ক্লান্ত দৃষ্টি তুললেন ডাক্তার। শীর্ণ হেসে বললেন, ইরিসিপেলাসই বটে। আর এক ঘণ্টা দেরি হলেই মুশকিল বাধত—আমার বিদ্যেয় আর কুলোত না। বৌমা বুদ্ধি করে ঠিক সময়মতো ছুটে গিয়েছিলেন।

প্রভাস জবাব দিল না।

—আপনিও তো খুব কষ্ট করলেন প্রভাসবাবু!

এবার প্রভাস হাসতে চেষ্টা করল। কিন্তু একটা বিশ্রী সন্দেহে মন ভরে গেছে, অস্বস্তিতে বিস্বাদ হয়ে আছে সমস্ত। মাথার ভেতরে রাত্রির সেই কালো আকাশটা ফটোগ্রাফের মতো স্থির স্তব্ধ হয়ে আছে, আর একরাশ আগুনের শিখা খেলে খেলে

যাচ্ছে সেখানে। তবুও প্রভাস জোর করে হাসতে চাইল।

—ও'রা আমাদের আত্মীয়।

—তা বটে। ডাক্তার মাথা নাড়লেন। তারপর আরো কয়েক পা এগিয়ে যেন স্বগতোক্তির মতো উচ্চারণ করলেন : সে আত্মীয়তার কথাটা ও'রা কি মনে রাখেন মশাই ?

দু'জনে তখন আমবাগানের কালো মাটি পেরিয়ে জংলা শিবমন্দিরটার কাছে এসে পড়েছে। প্রভাস আস্তে আস্তে বললে, সোরীনদা আর বৌদি অন্তত মনে রাখেন। তা হলেই যথেষ্ট।

—কিন্তু ও'দের নিয়ে যে-সব কথা—

বলতে গিয়েই থমকে থামলেন ডাক্তার। যা মুখের ডগায় এসেছিল, তাকে যেন জোর করে টেনে নিলেন ভেতরে।

—কী কথা ? প্রভাসের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। শরীরের মধ্যে যে চাপা উত্তেজনা ঝিমঝিম করছে, খানিকটা গ্যাসের মতো তা জ্বলে উঠতে চাইল।

ডাক্তার বললেন, না, সে-সব কিছুই নয়—ও থাক।

শুধু ডাক্তারই নয়, রায়দের কয়েক শরিক আর সামান্য ক'ঘর প্রজার এই ছোট গ্রাম মালঞ্চের হাওয়ায় হাওয়ায় একটা বিষাক্ত কুৎসা ভেসে বেড়াচ্ছে—প্রভাসের কানেও তা এসেছে টুকরো টুকরো ভাবে। এইবার অসহ্য অন্তর্জ্বালায় তার মনে হল : ওই কুৎসিত লোকটার মুখটাকে বন্ধ করে দেওয়ার সময় হয়েছে। প্রভাসের মস্তিষ্কের মধ্যে রায়বাড়ির একঝলক রক্ত আছড়ে পড়ল।

সামনেই ঘাটের ওপর নৌকো। মাঝি অপেক্ষা করছিল।

প্রভাস আগের কথাটার কোনো জের টানল না। শুধু ডাক্তারকে বললে, আপনি নৌকায় উঠে পড়ুন—আমি এ পথটুকু হে'টেই চলে যাব।

সোরীন অঘোরে ঘুমুচ্ছে। কয়েক ঘণ্টা যন্ত্রণায় ছটফট করে গভীর শান্তির মধ্যে তলিয়ে গেছে এখন।

আড়ষ্ট অবসন্ন শরীরটাকে বিছানা থেকে টেনে তুলে এণাক্ষী এসে জানালাটার সামনে দাঁড়ালো। কাল সারারাত শরীর আর মনের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে। সোরীনের পাশে তারও শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছিল। জানালার গরাদ ধরে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

দূরে সাদা জলের ঢেউ উঠছে—সেই সমুদ্রটা দুলছে—একটা হিংস্র মৃত্যুর মতো তিনদিক ঘিরে আছে মালঞ্চকে। ওই সমুদ্র পার হয়ে অনেকখানি দুর্গম জলকে ছাড়িয়ে গিয়ে তবে সে ছোট্ট স্টেশনটি ; আর সেই সামান্য স্টেশনমাস্টার—নিঃসঙ্গ, নির্বান্ধব। প্রাণপণে আতিথেয়তা করতে চেয়েছিল।

চোখের সামনে স্টেশনটাকে দেখতে লাগল এণাক্ষী। প্রার্থনার মতো মনে হ'তে লাগল, এই মুহূর্তে সেখানে গিয়ে পে'ছুতে পারলে হিংস্র মানুষগুলোর দ্বীপান্তর থেকে বেরিয়ে গিয়ে সেখানে অন্তত সত্যিকারের মাটির ওপর দাঁড়াতে পারে সে—ফেলতে পারে স্বস্তির নিঃশ্বাস।

হঠাৎ চমকে সে পেছন ফিরে দাঁড়াল। অচেতন ভাবেই যেন বুঝতে পেরেছে, পেছন থেকে দুটো জ্বলন্ত চোখ তার পিঠের ওপরে স্থির হয়ে আছে অনেকক্ষণ থেকে।

তাই বটে—কাকা!

কাল সারারাত বারান্দায় পায়চারি করে বেড়িয়েছে বাঘটা। এইবার এসে পা দিয়েছে ঘরের ভেতর। কিন্তু লোকটার চোখের দিকে তাকিয়ে এণাক্ষীর রক্ত জমে যেতে চাইল। বাঘের দৃষ্টিতে সরল হিংসা আছে, কিন্তু এ দৃষ্টিতে আরো বেশি কিছু আছে—কল্পনাতীত ক্রূরতা, উৎকট ব্যঙ্গ, খুনে পাগলের উদ্‌ভ্রান্তি।

হিপনটাইজ্‌ডের মতো এণাক্ষী চেয়ে রইল, মাথার ঘোমটা টেনে দেওয়ার কথা তার মনে রইল না।

কাকার গলার স্বরে কিছু বোঝা গেল না। অদ্ভুত স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বললেন, সৌরীন এখন অনেকটা ভালো আছে, কী বলো?

এণাক্ষী কথা খুঁজে পেলো না। নিঃশব্দে মাথা নাড়ল।

—তাহলে বিকেলের দিকে হয়তো উঠে বসতে পারবে। ধরাধরি করে সন্ধ্যেনাগাদ নৌকোয় তুলে দেওয়া যায়।

—আপনি কী বলছেন? ইচ্ছার বিরুদ্ধেও কথাটা ঠেলে বেরিয়ে এল এণাক্ষীর গলা দিয়ে।

কাকা সোজাসুজি কোনো জবাব দিলেন না। বললেন, এখানে তোমাদের কারো শরীর ভালো থাকছে না। কলকাতায় ফিরে যাওয়াটাই উচিত—আজ রাত্রেই।

একটু আগে ঠিক এই কথাটাই ভাবছিল এণাক্ষী। এই দ্বীপান্তরের ওপারে কোনো শক্ত মাটি, কোনো স্বাভাবিক জীবনের মধ্যে ফিরে যাওয়ার জন্যে তার সমস্ত অন্তরাত্মা ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কাকার কথার ভঙ্গিতে তার গায়ের ভেতরে জ্বালা করে উঠল। এ উপদেশ নয়—হুকুম। ভদ্র ভাষায় তাড়িয়ে দেবার পদ্ধতি।

এণাক্ষী নিজের চোখ এবার সোজা কাকার দিকে তুলে ধরল।

—অনেকদিন পরে আমরা দেশে এসেছি কাকা। আরো কটা দিন থাকব। তা ছাড়া নিজেদের বিষয়-সম্পত্তি মধ্যে মধ্যে একটু দেখাশুনো করা দরকার বইকি।

নিজেদের বিষয়-সম্পত্তি? কথাটা কাকার কানে গিয়ে ঘা দিল, মুহূর্তের জন্যে তাঁর মুখে একটা ছায়া নেমে এল। এণাক্ষীর কাছ থেকে ঠিক এই রকম একটা জবাব তিনি খুব সম্ভব আশা করেন নি।

—তোমাদের অংশের কথা বলছ বৌমা? তবুও নিরীহ গলায় কাকা জানতে চাইলেন।

—হ্যাঁ কাকা, নিজেদের অংশের কথাই বলছি। আরো নিরীহ ভাবে এণাক্ষীর জবাব এল।

কাকা চুপ করে রইলেন কয়েক মিনিট। একটা নতুন ধরনের শক্তির সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। এমন প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে এর আগে তাঁর পরিচয় হয় নি।

তারপর বললেন, আচ্ছা আজকের দিনটা বরং সৌরীন বিশ্রাম করুক। কাল সন্ধ্যেবেলায় আমি নিজেই তোমাদের সঙ্গে করে স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসব।

—আমরা যাব না—

বলতে গিয়েও এণাক্ষী বলতে পারল না। কাকা তাঁর হুকুম জানিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেছেন। মালঞ্চের রায়বাড়িতে তিনি আর ওদের থাকতে দেবেন না—ওদের মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে।

কিছুতেই যাব না, কিছুতেই যাব না—অসীম আত্মপ্রত্যয় নিয়ে কথাগুলো এণাক্ষী উচ্চারণ করতে চেষ্টা করল, কিন্তু সম্পূর্ণ জোরটা এল না—কোথায় যেন হোঁচট খেতে লাগল।

ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরতে গিয়ে আবার যন্ত্রণায় একটা অস্পষ্ট শব্দ করল সৌরীন।

॥ সতেরো ॥

ট্রেনটা বেলা এগারোটায়। ধরতে হলে শেষরাতে রওনা হওয়া দরকার। এমনিতেই প্রায় ছ'ঘণ্টা সময় লাগে। তার ওপরে বিলের খামখেয়ালি আছে—আছে হাওয়ার মর্জি। একটু হাতে রেখেই বেরোনো উচিত।

শুধু হাতে রেখে কেন, এই বাড়িতে আর একটি মিনিটও থাকতে রাজী নয় এণাক্ষী। মালঞ্চের রায়েরা মরে গেছে অনেককাল আগে, তাদের কবরের উপর একটা পিশাচ পাহারা দিচ্ছে এখন। এখানে আর ক'দিন থাকলে সৌরীন বাঁচবে না—এণাক্ষীর পরিণাম ঘটবে কাকিমার মতো। তারপরে সাপের জঙ্গলে ঘেরা ওই ভাঙা শিবমন্দিরের পাশে আবার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটবে—জ্বলে উঠবে আর একটা সহমরণের চিতা।

বাইরে থমথম করছে রাত। ঝিঁঝির ডাক ছাপিয়ে দূর থেকে আসছে সেই জলতরঙ্গের বিষাক্ত গর্জন। তবু এই বাড়ির চাইতে ওই হিংস্র সমুদ্রই ভালো। তার মাথার ওপর আকাশ আছে—তাকে বেষ্টন করে আছে দিগ্‌দিগন্ত। মৃত্যুরও একটা মহিমা আছে সেখানে। কিন্তু এই কবরের মতো শীতল শূন্য বাড়িটার অন্ধকার কোণায় যেন ঘাতকের ছায়ামূর্তি লুকিয়ে—যে-কোনো মুহূর্তে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে এসে তার অসতর্ক শিকারের ওপর ঝাঁপ দিয়ে পড়তে পারে।

সৌরীন চুপ করে বসেছিল জানালার পাশে। রঘু বিছানা বাঁধছিল। এণাক্ষী দাঁড়িয়েছিল রঘুর পাশে—মাথার ভেতরে চিন্তার ঝড় বইছে তার।

সৌরীন কী ভাবছিল—কী দেখছিল অন্ধকারের মধ্যে তা সে-ই জানে। হঠাৎ রঘু এণাক্ষীর দিকে চোখ তুলল, প্রায় নিঃশব্দ গলায় বললে, বৌঠাকরুণ?

—কী বলছিলে?

—আজ রাতে নাই বা গেলেন আপনারা!

রঘুর গলার আওয়াজ প্রায় দীর্ঘনিঃশ্বাসের মতো। সৌরীন শুনতে পেলো না, কিন্তু মুহূর্তে পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিউরে উঠল এণাক্ষীর।

—কেন বলছ এ-কথা?

রঘু কী জবাব দিতে যাচ্ছিল, সঙ্গে সঙ্গে দরজার কাছে শোনা গেল খড়মের শব্দ। যেন এতক্ষণ কাকা অন্ধকারের মধ্যে অপেক্ষা করছিলেন—সময় বুঝেই আত্মপ্রকাশ করলেন। লণ্ঠনের আলোয় বিবর্ণ হয়ে গেল রঘুর মুখ।

কাকা বললেন, নৌকো ঘাটে এসে গেছে। রঘু, ওদের জিনিসগুলো তুলে দিয়ে

আয় ।

কথাটা অশরীরী আদেশের মতো শোনালো। অন্যমনস্কের মতো কেবল একবার ফিরে চাইল সৌরীন। শান্ত, মৃদু গলায় এণাক্ষী বললে, জানি।

কাকার চোখের দিকে একবার তাকালে অত সহজে কথাটা সে বলতে পারত না।

রঘুর আরো কিছু বলবার ছিল, কিন্তু বলতে পারল না। সতর্ক কালপুরুষের মতো কাকা সঙ্গে সঙ্গে রইলেন সারাক্ষণ। প্রণাম করে নৌকোয় ওঠবার সময় জড়ানো গলায় তিনি কী যেন আশীর্বাদও করলেন—ঠিক বোঝা গেল না।

রঘুর কাঁধে ভর দিয়ে নৌকোয় উঠে দুর্বল সৌরীন চুপচাপ শুয়ে পড়েছিল। মাঝিদের লগির খোঁচায় নৌকো রায়বাড়ির ঘাট ছাড়িয়ে খাল বেয়ে অগ্রসর হল। তীব্র স্রোতের টানে ছুটে চলল নৌকা। বাঁকের মুখ ঘোরবার আগে পর্যন্ত এণাক্ষী দেখতে লাগল, পুরোনো শিবমন্দিরের পাশে কাকার মূর্তিটা লণ্ঠন হাতে নিশ্চল হয়ে আছে —যেন পাথর দিয়ে তৈরী; তাঁর পেছনে রঘু ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে।

স্রোতে তেমনি মাছের উল্লাস। তেমনি দুটো একটা টুপটুপ করে নৌকোর ওপরে লাফিয়ে পড়ছে। আজ আর এণাক্ষীর কোনো রোমাঞ্চ, কোনো অনুভূতি জাগল না। এই কয়েকটা দিন দুঃস্বপ্নের মতো বয়ে গেছে। শুধু প্রথম দিনের সেই গোখরো সাপটা নয়—যেন সাপের অরণ্যের মধ্যে এসেই পা দিয়েছিল তারা।

প্রভাস! একটা কঠিন যন্ত্রণা বুকের মধ্যে জড়িয়ে জড়িয়ে উঠতে লাগল তার। কী অদ্ভুত ভাবে, কী অকারণে প্রভাস তাদের জীবনের মধ্যে এসে পড়েছিল। সেই প্রথম দিন, সেই ঝোড়ো হাওয়ায় বিলের মধ্যে ডুবে যাওয়ার ভয়ংকর রাত্রি—প্রভাসকে ডেকে নিয়ে সৌরীনের জন্যে ডাক্তার আনতে যাওয়া, আর—আর কুৎসার তরঙ্গ।

একবার প্রভাসের সঙ্গে দেখাও হল না আসবার সময়ে। জীবনে দেখা আর হবেও না কোনোদিন। কোথায় যেন সরু সুতোর মতো কী একটা ছিঁড়ে যাচ্ছে—বুকের সঙ্গে সংযোগ আছে তার। একটা চাপা যন্ত্রণাকে কোনোমতেই ভুলতে পারা যাচ্ছে না। এণাক্ষী দীর্ঘশ্বাস ফেলল। চাপা কাতরোক্তি শোনা গেল সৌরীনের।

স্বামীর মাথায় হাত রাখল এণাক্ষী।

—কষ্ট হচ্ছে তোমার?

—বিশেষ নয়।

—খুব চমৎকার জায়গাতে শরীর সারাতে নিয়ে এসেছিলাম তোমাকে। চেষ্টা করেও স্বরের তিক্ততাটা এণাক্ষী গোপন করতে পারল না।

—অদৃষ্ট, এণা।

—না, অদৃষ্ট বলে কিছু নেই। এণাক্ষী দাঁতে দাঁত চাপল: একটা বিকৃত মানুষ সব কিছুকে বীভৎস করে রেখেছে। তোমার শরীর ভালো থাকলে এত সহজে আমি মালঞ্চ ছেড়ে চলে আসতাম ভেবেছ? ও বাড়িতে আমাদেরও যে কিছু অধিকার আছে, সেই কথাটা প্রমাণ করে আসতাম।

সৌরীন জবাব দিল না। আর একটা মৃদু আর্তনাদ করে পাশ ফিরল।

—পায়ে কি ব্যথা আছে এখনো?

—ও কিছু না। একটু চুপ করে থেকে সৌরীন বললে, কষ্টটা হচ্ছে মনে। আগা-

গোড়া নির্বোধের মতো সব দেখে গেলাম—কিছুই করতে পারলাম না।

—কী করতে তুমি ?

সৌরীন আস্তে আস্তে বললে, প্রভাসের সঙ্গে বোঝাপড়া।

—প্রভাসের সঙ্গে !—সৌরীনের কপালের ওপর এণাক্ষীর হাত শক্ত হয়ে গেল, এই মুহূর্তে তার ঘৃণা করতে ইচ্ছে হল স্বামীকে।

সৌরীন বললে, ওর কাছ থেকে সব যাচাই করে নেওয়া চলত।

—কী যাচাই করে নিতে তুমি ?—বমির মতো কী একটা ঠেলে আসতে চাইল এণাক্ষীর গলায় : কাকা যে-সব কুৎসা ছড়িয়ে দিয়েছেন চারদিকে—সেইগুলো ?

সৌরীন চুপ করে রইল।

হাতের কাঁকন দিয়ে সৌরীনকে নয়—নিজের কপালেই একটা ঘা মারতে ইচ্ছে হল এণাক্ষীর। ধরা গলায় জিজ্ঞাসা করলে, তুমিও কি বলতে চাও সেই নৌকোডুবির রাতে—

ক্লান্তস্বরে সৌরীন বললে—আমায় কিছু জিজ্ঞাসা কোর না এণা। এখানকার সমস্ত কিছু আমাকেও বোধ হয় বিকৃত আর অস্বাভাবিক করে তুলেছে। এখন আমি যা বলব, আগামী কালের কথার সঙ্গে তার হয়তো মিল থাকবে না। আমি তোমার সব কথার জবাব দেব কলকাতায় ফিরে—এখানে নয়।

ঠিক কথা। সব বিকৃত—সব অন্যরকম হয়ে গেছে। এণাক্ষী নিজেও কি স্বাভাবিক আছে সম্পূর্ণ ? এখনো ওদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে মালঞ্চের প্রেতচ্ছায়া—এখনো ওদের স্নায়ুর ওপরে চেপে আছে তার প্রভাব। এই জলতরঙ্গ পার হয়ে শক্ত কঠিন মাটিতে পা না দেওয়া পর্যন্ত, মানুষের সুস্থ সবল জীবনের মধ্যে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত কোনো সত্য-মিথ্যা, কোনো বিশ্বাস-অবিশ্বাসের যাচাই হতে পারে না।

সৌরীন একটা সিগারেট ধরালো। আস্তে আস্তে নিঃশেষ করলে সেটাকে, তারপর খালের খরস্রোতের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। এণাক্ষী বসে রইল অভিভূতের মতো। খাল ক্রমশঃ সেই বিশাল-বিচিত্র সমুদ্রের দিকে এগিয়ে আসছে—কলোল্লাস শোনা যাচ্ছে জলতরঙ্গের। এণাক্ষীর আজ ভয় হল না—ভাবনাও না। তার মনে পড়তে লাগল সেই নৌকোডুবির রাত্রিটাকে। না, সেই দুর্ঘটনার দুঃস্মৃতি নয়। তার চোখ থেমে রইল আকাশের দিকে। নিতল কালোর ওপর ঝলমল করছে অসংখ্য তারা, আর একটা গানের সুরে সুরে যেন প্রতিটি তারা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে :

"বাঁধলে যে সুর তারায় তারায় অন্তবিহীন অগ্নিধারায়—
আজকে আমার তারে তারে শোনাও সে বারতা—"

কে গাইছিল ? সে ? প্রভাস ? চিত্রা ? ঠিক মনে পড়ছে না।

অনেক গ্লানি, অনেক তিক্ততার ভেতরে ওই গানটাই আশ্চর্য সুন্দর আর পবিত্র হয়ে আছে। ওই গানের মধ্যে কী অপরূপ মুক্তি—কী শুচিতা ! 'যখন তুমি বাঁধছিলে তার—সে যে বিষম ব্যথা—'

সেই গভীর, বিপুল বেদনায় এই তুচ্ছ ব্যথাকে ভুলিয়ে দাও। সেই অসীম জ্যোতির্ময় যন্ত্রণার মধ্যে এই যন্ত্রণার নিবৃত্তি হোক।

'বাজাও বীণা—ভোলাও ভোলাও—'

সময় বয়ে চলেছে নিঃশব্দে। তারাগুলো ঝোঁক নিয়েছে পশ্চিমে। রাত আড়াইটের কাছাকাছি। মাঝিরা দাঁড় ধরেছে লগি ছেড়ে। নৌকোর নিচে ঢেউয়ের দোলা শুরু হয়েছে—হাওয়া দিচ্ছে জোরালো। দু'দিকে আর কূল নেই—একটা ঝাঁকড়া ঝোপের মাথাও আর দেখা যাচ্ছে না। নৌকো বিলে পড়েছে।

তবু নিজের মধ্যে মগ্ন হয়ে রইল এণাক্ষী। একটা বিচিত্র শান্তি। ওই গানটা রক্তের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে। এতক্ষণে একটা গভীর ক্লান্তিতে প্রণামের মতো এলিয়ে পড়তে চাইছে তার শরীর।

হঠাৎ হালের মাঝি চিৎকার করে উঠল বিকট গলায়।

—কে? কার নৌকো আসে পেছনে?

সৌরীন সোজা উঠে বসল—মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ বয়ে গেল এণাক্ষীর।

হালের মাঝি আবার বললে, কে? তফাৎ যাও—

সৌরীন বিহ্বল গলায় বললে, ডাকাত না তো?

টর্চের একরাশ খরধার আলো এসে মাঝির গায়ে পড়ল। পেছনের নৌকো এসে পড়েছে।

মাঝি আবার কী বলতে যাচ্ছিল, হয়তো চিৎকার করেই উঠত এণাক্ষী। তার আগেই শোনা গেল: এন্তাজ আলী, আমি প্রভাস রায়। আমার সঙ্গে ভরা রাইফেল আছে।

এণাক্ষীর হৃৎপিণ্ড থমকে গেল। ভয়ে না বিস্ময়ে বোঝা গেল না, সৌরীন প্রায় পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠল: প্রভাস—তুই? ডাকাতি করতে এসেছিস নাকি?

অন্ধকারে প্রভাসের মুখ দেখা গেল না, কিন্তু হাসির আওয়াজ ভেসে এল।

—না দাদা, ডাকাতি করতে না—ডাকাতের হাত থেকে বাঁচাতে। তোমাদের নৌকোর দু'জন মাঝিই পাকা খুনী—পাটাতনের তলায় দা-বল্লম নিয়েই ওরা এসেছে। ওদের দু'জনের হাতে এত রাতে তোমাদের পাঠিয়ে দেবার অর্থ বুঝতে পারছ না দাদা? দুটো বস্তা আর খানকয়েক ইট হলেই এই অথই জলের মধ্যে—

এণাক্ষীর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। চিনেছে—হালের মাঝিকে এইবার সে চিনেছে। এইজন্যেই অনেকক্ষণ ধরে তার চেনা-চেনা ঠেকছিল মুখখানা। এ সেই কাকার অনুগত বাদিয়া মুসলমানটি—পৃথিবীতে যার অসাধ্য কোনো কাজ নেই!

প্রভাস আবার বললে, কাকা অতবড় অপমান সহজে ভুলবেন, একথা কী করে বিশ্বাস করলে সৌরীনদা? তাই আমি সতর্ক হয়েই ছিলাম। আর আমার রাইফেলকে এন্তাজ চেনে। যতক্ষণ আমি সঙ্গে আছি—

টর্চের আলো আবার এন্তাজের মুখে পড়ল। বিকৃত, ভয়ঙ্কর মুখ। ফাঁদে আটক-পড়া বাঘের মতো নিরুপায় ক্রোধে চোখদুটো নীলাভ জ্বালায় ঝক্‌ঝক করছে।

দু হাতে মুখ ঢেকে এণাক্ষী নৌকোর পাটাতনে এলিয়ে পড়ল। আর সে শুনতে চায় না—আর তার শোনবার শক্তি নেই।

অন্ধকারে দিকে দিকে সমুদ্র দুলছে। বিষধর সাপ-জড়ানো বাবলাগাছের মাথাগুলো ওৎ পেতে আছে দূরে দূরে। জলের গর্জন আর ফেনার ফুল—পচা ঘাস-পাতার গন্ধ। উঁচু ডাঙার ওপর ঘুমন্ত কুমীর। তারাগুলো নেমে পড়েছে পশ্চিমে—ম্লান হয়ে আসছে সপ্তর্ষি।

নিরুপায় বন্দী বাঘকে পাহারা দিয়ে এগিয়ে চলল টোটাভরা সতর্ক রাইফেল। বহুদূরে কোথায় কতগুলো বকের ছানা ককিয়ে উঠল সমস্বরে। সেই ডাঙাটার ওপরেই কিনা কে বলতে পারে!

বেলা ন'টার আগেই স্টেশনের ঘাটে এসে নৌকো ভিড়ল। এণাক্ষী তখনো মুখ গুঁজে পড়ে ছিল পাটাতনের ওপর। সৌরীন আলুগা ভাবে স্পর্শ করল তাকে।

—ওঠো এণা, আমরা এসে গেছি।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল এণাক্ষী। সমস্ত জিনিসটা এখনো যেন স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে তার। ডাঙায় দাঁড়িয়ে আছে প্রভাস। নৌকো থেকে মাল নামাচ্ছে এন্তাজ আর তার সঙ্গীটি।

প্রভাস হাসছিল। বললে, এন্তাজ মিঞা খুব কাজের লোক। তবে মাঝরাতে বিলের ভেতর সোয়ারী পেলে সব সময় ওর মাথা ঠিক থাকে না।

এন্তাজ জবাব দিল না। নিঃশব্দে বাক্স-বিছানা নিয়ে এগোল স্টেশনের দিকে।

—নামো বৌদি। প্রভাস ডাকল।

এণাক্ষী নামল। তার কাঁধে ভর দিয়ে নামল সৌরীন। এখনো ভালো করে হাঁটতে পারে না।

স্টেশনের দিকে এগোতে এগোতে গভীর গলায় সৌরীন বললে, সত্যি প্রভাস, তুই সঙ্গে না থাকলে—

—আমাকে যে থাকতেই হত, দাদা। আমি খবর পেয়েছিলাম এন্তাজ তোমাদের নৌকো নিয়ে যাচ্ছে।

এণাক্ষী একটা কথাও বলল না। প্রভাসের দিকে চোখ তুলে সে চাইতে পারছিল না।

এই স্টেশনে কোথায় আর ওয়েটিং রুম? নতুন পাতায় ছাওয়া কাঠমল্লিকা গাছের ছায়ায় বেঞ্চির সামনে বাক্স-বিছানা নামিয়ে দিয়েছে এন্তাজ।

সৌরীন পকেট থেকে দুটো টাকা বের করে দিতে যাচ্ছিল, এন্তাজ সেলাম করল।

—মাফ করবেন জী।

প্রভাস সশব্দে হেসে উঠল: একটা চক্ষুলজ্জাও তো আছে, কী বলো এন্তাজ?

এন্তাজ জবাব দিল না। চলে গেল নিঃশব্দে।

প্রভাস বললে, এই বেঞ্চিতেই তোমরা বোসো দাদা। ট্রেনের অনেক দেরি। তবু মালঞ্চের রায়বাড়ির চাইতে এখানে অনেক বেশি ভালো লাগবে। আমি এবার যাই—

—এখনি চলে যাবে ঠাকুরপো? এতক্ষণ পরে বিষন্ন শ্রান্ত চোখ তুলে কথা বললে এণাক্ষী।

একটু চুপ করে রইল প্রভাস। তারপর বললে, আমার সময় নেই বৌদি। অনেক কাজ। নইলে তোমাদের ট্রেনে তুলে দিয়েই আমি যেতাম।

—চিঠি লিখবে না আমাদের?

প্রভাস বিচিত্র অন্যমনস্ক হাসি হাসল। বলল, জানি না বৌদি, ঠিক সুযোগ পাব কিনা। কাকার শিকার কেড়ে নিয়েছি—তিনি সেকথা ভুলবেন না। এত সহজে অপমান হজম করার মানুষ এন্তাজ নয়। তাছাড়া আমাদের কাছারী আর খামার-

বাড়িতে কে আগুন দিয়েছিল তা-ও আমি জানি। তারও একটা হিসেবনিকেশ বাকী আছে।

—ঠাকুরপো!

—তোমরা চলেই যাও বৌদি। মালঞ্চ তোমাদের জন্য নয়। এখানকার দিনগুলোকে পারো তো চিরদিনের মতো ভুলে যেয়ো।

নীচু হয়ে সৌরীন আর এণাক্ষীর পায়ের ধুলো নিলে প্রভাস, তারপর নেমে গেল দ্রুত, আর ফিরেও তাকালো না।

সৌরীন আর এণাক্ষী দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। কাঠমল্লিকার তরুণ শ্যামল পাতায় বিলের থেকে উঠে আসা বাতাস যেন গানের সুর তুলছে। শক্ত মাটির ওপর চকচক করছে রেললাইন—নির্ভয়, সহজ জীবনের প্রতীক। লাইনের এপারে একটা হিংস্র কুটিল সমুদ্র গর্জন করছে—ওপারে আম-কাঁঠাল-কলা গাছে ঘেরা গ্রাম—লালমাটির পথে ধুলো উড়িয়ে চলেছে গোরুর গাড়ি। দুদিকে দুটো পৃথিবী। এক পারে জীবন, অন্য পারে মৃত্যু।

সৌরীন আস্তে আস্তে বললে, আমরা কি স্বপ্ন দেখছিলাম এণা?

এণাক্ষী তার হাত চেপে ধরল। চুপি চুপি বললে, খুব সম্ভব।

কোথা থেকে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ছুটে আসছেন কালো কোট পরা একটি ভদ্রলোক।—সেই স্টেশন মাস্টার।

—এই যে, নমস্কার।

হেসে সৌরীন বললে, নমস্কার।

—এত তাড়াতাড়ি ফিরছেন?

—কলকাতায় দরকারী কাজ পড়েছে একটু।

স্টেশন মাস্টার ইতস্তত করলেন একটু। এণাক্ষীর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে কুণ্ঠিত গলায় বললেন, ট্রেনের তো অনেক দেরি আছে এখনো—প্রায় দু' ঘণ্টা। দয়া করে যদি আমার ওখানে একটু চা—

এণাক্ষী বললে, চা কেন? যদি অনুমতি করেন, এ বেলা আপনাকে আমি রান্না করে খাওয়াব। তাছাড়া আমাদেরও তো স্বার্থ আছে, কী বলেন? চাল-ডাল আছে বাড়িতে?

—চাল-ডাল কী বলছেন? এখুনি মাছ তরকারী—স্টেশন মাস্টার অভিভূত হয়ে গেলেন: এ যে আমার কী সৌভাগ্য, আমি তা ভাবতেও পারি না! কতদিন মা-বোনের রান্না খাইনি।

স্টেশন মাস্টারের পুলকিত কৃতজ্ঞ চোখ, মাথার ওপরের নীল নির্মল আকাশ—লাইনের ওপারে গ্রাম, গাছের ছায়া, রাঙা মাটির পথ। জীবন। পূর্ণতা। প্রীতি। বিশ্বাস।

এপারে বিলের জল নিরুপায় হিংসায় মাথা খুঁড়ে মরছে। জীবন মৃত্যুঞ্জয়।

স্টেশন মাস্টার হাত বাড়িয়ে বললেন, আসুন আসুন।

সাহিত্যে ছোট গল্প

দ্বিতীয় খণ্ড (রূপতত্ত্ব)

সাত

ছোট গল্পের সংজ্ঞা

"Peculiar product of nineteenth century" হল ছোট গল্প। কিন্তু কেন "Peculiar ?" উনিশ শতকেই বা বিশেষভাবে এর জন্ম অথবা শ্রীবৃদ্ধি হল কেন ?

প্রথম জিজ্ঞাসার জবাব সহজেই দেওয়া চলে। এ উনিশ শতকের এক সম্পূর্ণ নিজস্ব সামগ্রী—যা ইতঃপূর্বে—অন্তত এই রূপে—বিদ্যমান ছিল না। এ নভেলও নয়, রোমান্সও নয়। এ কবিতার মতো ঐকভাবাশ্রয়ী—অথচ কল্পনামুখ্য নয়, জীবন-নির্ভর। আবার সেই জীবনের সামগ্রিকতার প্রতিচ্ছবিও এতে নেই—এতে খণ্ডতার ব্যবহার। সুতরাং এ বস্তু স্পষ্টই 'অভিনব'—এ হল একটি peculiar product।

উনিশ শতকই ছোট গল্পের জন্মলগ্ন কেন—এ প্রশ্নের উত্তর এত সরল নয়। কিন্তু একটা জিনিস সুস্পষ্ট অনুভব করা যাচ্ছে। দান্তের তিমিরাভিসার আর পেত্রার্কের বিদগ্ধ রোমান্টিকতার যুগে নির্মোহ জীবনসন্ধানী জনসাধারণের শিল্পী বোক্কাচ্চো চার্চের দিকে—সামাজিক গ্লানির দিকে তাঁর জিজ্ঞাসা উদ্যত করে তুলে ধরেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দী, বিশেষ করে তার মধ্য ও শেষ ভাগ (ছোট গল্পের পূর্ণ আবির্ভাব যুগ) পৃথিবীর ইতিহাসে বুদ্ধিজীবীর যন্ত্রণাকে দুঃসহ করে তুলেছে। ফ্রান্সে এবং রুশিয়ায় এই যন্ত্রণা সবচেয়ে ভয়াবহ। ফ্লোব্যার-মেরিমে-স্তাঁদাল প্রমুখ লেখকেরা রিয়্যালিজমের পথে সমাজ-সমালোচনায় যতখানিই অগ্রসর হোন—নেপোলেঁয় বংশের প্রতি তাঁদের অন্তরের মমতা ছিল, তাঁরা তখনো বিশ্বাস করতেন ফ্রান্সই ইয়োরোপের মুক্তিদাতা। প্রিন্সেস মাতিল্দ ফরাসী বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁর ভোজের আসর ফ্লোব্যার-গঁকুর-গোতিয়েরের রমণীয় ছিল। সিডানের রণক্ষেত্রে বিসমার্কের জয়ে মেরিমের মৃত্যু ঘটল—'সালাবোঁর' পরে ফ্লোব্যার আর এগোতে পারলেন না, সাহিত্য হিসেবেও 'সালাবোঁ' ফ্লোব্যারকে বিশেষ উজ্জ্বল করেনি। মোপাসাঁ দুরন্ত যৌবনের বিদ্রোহ নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু তিনি ক্রমশঃ গ্লানি আর মনোব্যাধির শিকারে পরিণত হলেন।

আধুনিক ছোট গল্প হল যন্ত্রণার ফসল। মহৎ বিশ্বাস থেকে—অন্তত মোটামুটি একটা নিশ্চিত ভিত্তি থেকে (যা ফ্লোব্যারও রাজতন্ত্রের মধ্যে পেয়েছিলেন) উপন্যাস সৃষ্টি হয়। কিন্তু শূন্যতার আঘাতে তার উপকরণগুলো টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে—আদর্শ আর বিশ্বাসের উজ্জ্বল-কোণিক ধারালো খণ্ডগুলিকে লেখক জিজ্ঞাসার মাধ্যমে নগ্ন তীক্ষ্ণতার সঙ্গে ছুঁড়ে দিতে থাকেন। গী-দ্য মোপাসাঁও তাই দিয়েছেন। এমিল জোলা গণজীবনের বলিষ্ঠতায় বিশ্বাস করে উপন্যাসের পথে অবশ্য কিছু এগোতে চেয়েছিলেন—কিন্তু তিনিও ন্যাচারালিজমের পঙ্কে অনেকখানি তলিয়ে গেছেন।

মহান শিল্পী তুর্গেনেভ উদার এবং বিশাল, তাঁর আত্মতৃপ্ত ব্যক্তিত্ব অনেকখানি স্থিতধী, ফ্লোব্যারের সহমর্মী হয়েও তাই 'ফাদার্স অ্যাণ্ড সনস' কিংবা 'ভার্জিন সয়েলে'র মতো ভালো উপন্যাস লিখেছেন। তলস্তয়ের গভীর ক্রীশ্চান মনন, তাঁর

আশাবাদ—নব অভ্যুত্থানের প্রত্যয় তাঁকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস লেখবার সৌভাগ্য দিয়েছে। চেকভও আশাবাদী—কিন্তু সে আশা যে কী যন্ত্রণাগর্ভ—তার 'ছয় নম্বর ওয়ার্ডে'ই সে পরিচয় আছে। তাই জিজ্ঞাসা-চিহ্নিত ছোট গল্পই চেকভের প্রধান অবলম্বন।

আমেরিকায় ছোট গল্পও এমনি যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে। সেখানে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক কোনো বিপুল সংঘাত নেই বটে, কিন্তু আছে লেখকের ব্যক্তিক বেদনা ও ব্যর্থতার ট্র্যাজিডী। নিঃসঙ্গ উপেক্ষিত ন্যাথানিয়েল হথর্ন সেই বেদনাতেই আলো-ছায়ার মধ্যে 'পিউরিটার উর্ধ্বচারণা'কে ভাসিয়ে দিয়েছেন—ক্ষতবিক্ষত এডগার অ্যালান পো দেখেছেন তাঁর জানালার পাশে দাঁড়কাকের জ্বলন্ত দৃষ্টি করাল-নিয়তির মতো জেগে আছে। হয় সামাজিক সংকট—নয় ব্যক্তিক সংকট—উনিশ শতকের ছোট গল্পে এই দ্বিবিধ যন্ত্রণা বিদ্যমান। ছোট গল্প যন্ত্রণার ফসল রূপেই এই সময় প্রথম অঙ্কুরিত হয়েছে।

উনিশ শতকের শেষভাগ—যা বিশেষ করে ছোট গল্পের কাল, তা প্রধানত রিয়্যালিজম্ এবং ন্যাচারালিজ্‌মের উত্তাল তরঙ্গে কলমন্দ্রিত। ইংল্যাণ্ডের বার্ণার্ড শ' আর জার্মানীর হাউপ্‌টম্যানের নাটকে, ফ্রান্সের এমিল জোলার উপন্যাসে আর শার্ল বোদ্‌ল্যারের কবিতায় দুঃখ-বেদনার নিগূঢ় বাস্তবতা ও অতি-বাস্তবতার উদ্বেলতা। এড্‌গার অ্যালান পোর বৈজ্ঞানিক সাহিত্য-দৃষ্টি ফরাসী লেখকদের বিশ্লেষণমুখী করে তুলেছে, গঁকুর ভ্রাতাদের 'নির্দয় বস্তুদৃষ্টি' এবং 'নির্মম অভিপ্রকাশ' যে অভিনব যুগমানস প্রস্তুত করে তুলেছিল, জীবন-জিজ্ঞাসু, সত্যসন্ধী এবং নিষ্ঠুর ছোট গল্পকে তাই একালে এত বেশি অনুপ্রেরণা দিতে পেরেছে।

জীবনের পুরোনো মূল্যবোধগুলিকে যখন অর্থহীন মনে হতে থাকে, ব্যক্তি-চেতনার সঙ্গে, সমাজ চেতনার সঙ্গে কোনোমতেই যখন সামঞ্জস্য ঘটতে চায় না—যখন প্রতি মুহূর্তে চতুর্দিকের সঙ্গে শিল্পীর সংঘাত, তখন রোমাণ্টিক কবি নাইটিঙ্গেলের পাখা আশ্রয় করে 'Strange and beautiful'-এর অভিসারে নভোযাত্রিক হতে পারেন, বুদ্ধির চোরাগলি থেকে বেরিয়ে আশ্রয় নিতে পারেন হৃদয়ারণ্যের ছায়ায়, কিন্তু গীতিকবির সগোত্র গল্পলেখক যেন তীরবিদ্ধ পাখি। সে-পাখি আহত বক্ষে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে—রক্ত-কর্দমের মধ্যে তাকে ছটফট করতে হয়। কখনো তার নির্বাপিত চোখে স্বপ্নময় আকাশের ছায়া ঘনায়, আবার কখনো বা মৃত্যুকালীন "হংস-গীতিতে" সে সমাজ এবং জীবনের ব্যাধকে অভিসম্পাত জানিয়ে যায়। তাই ছোট গল্পের ভিতর আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন-কল্পনার কথা থাকলেও উনিশ শতকে তা মূলত দুঃখবাদী।[১] চেকভের মতো জীবনরসিক লেখকের গল্পে দীর্ঘশ্বসিত বেদনাই তার পরিচয়। তার মধ্যে একটা কঠিন জিজ্ঞাসা—চারদিকের ব্যর্থতার প্রতি তার আর্ত অঙ্গুলি-নির্দেশ। অবশ্য দুঃখবাদ হয়েও তা সর্বত্র পরাজয়বাদ নয়। দুঃখের মধ্যেও কারো চোখে আশার

১। মাত্র ছোট গল্প কেন ? উনিশ শতকের শেষপাদে বাস্তবতার ও বেদনার মিশ্রণে শপ্যাঁর মেলোডি, সোপেনহাওয়েরের দর্শন, হাউপ্‌টম্যানের ট্র্যাজিডী এবং হার্ডির উপন্যাস ভারাক্রান্ত হয়ে আছে।

আলো—তিনি চেকভ ; কারো বিশ্বাস প্রকৃতির অম্লান সৌন্দর্যে 'এখনো অনেক রয়েছে বাকী'—তিনি আল্‌ফঁস্‌ দোদে ; কেউ বা মানুষের চিন্তা-চেষ্টা-স্বপ্নকে এক অদৃশ্য শক্তির কঠোর ব্যঙ্গে তাড়িত হতে দেখেন—তিনি ন্যাথানিয়েল হথর্ন ; কারো চোখে অনরুণ নিশান্ধকার—তিনি মোপাসাঁ।

জিজ্ঞাসা-চিহ্ন হয়েই ছোট গল্পের আবির্ভাব। তারপর তা অবশ্য বিশিষ্ট একটি শিল্পবস্তুতে পরিণত হল। তখন তার মধ্যে সবই এল। প্রেম এল, স্বপ্ন এল, আনন্দ এল, কান্না এল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর আকাশে ছোট গল্প লেখকেরা যেন সপ্তর্ষির মতো জিজ্ঞাসা রচনা করে অন্তর্জ্বালায় জ্বলেছেন—ধ্রুবতারাটি যে কোন্‌ দিকে—তার সন্ধান তাঁরা তখনো পাচ্ছেন না।

তবে এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে কলারীতির দাবিও গল্প-লেখকের অবশ্য মান্য। ছোট গল্প বিদ্রোহ আর প্রতিবাদকে একেবারে যে অতি-প্রত্যক্ষ ভাবেই উপস্থিত করবে—শিল্পীর জিজ্ঞাসাকে যে অত্যন্ত স্থূলভাবেই অভিব্যক্ত করবে—এমন কোনো শর্তও নেই। একটি বিশেষ প্রতীতির প্রতিক্রিয়া নানাভাবে আমাদের শিল্পের মধ্যে দেখা দিতে পারে—কখনও তা অতিব্যক্তরূপে আসবে, কখনও দেখা দেবে বক্র-কুটিল পরোক্ষতার মাধ্যমে, কখনো বা নিজেকে একেবারেই প্রচ্ছন্ন করে রাখবে। ছোট গল্পের মধ্যে যুগমননের সন্ধান করতে হলে তাই অতি-স্পষ্টতার উপর নির্ভর করলে চলবে না। মনঃসমীক্ষণের কাজে যেমন অবাধ ভাবানুষঙ্গের ভিত্তিতে চিন্তার অসংলগ্ন সূত্রগুলিকে একত্র করে একটি অখণ্ডতার সন্ধান করতে হয়, তেমনি যুগচেতনাকেও সেইভাবে নানা বৈচিত্র্যের এবং বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে সন্ধান করে নেওয়া দরকার। মোপাসাঁর দেশাত্মবোধক গল্পে শ্লেষ, ব্যঙ্গ ও লালসার কাহিনীতে এবং কৃষক-জীবনের চিত্রণে তাঁর সমগ্র ব্যক্তিত্ব খণ্ড খণ্ড ভাবে বিকীর্ণ হয়ে আছে, তাঁকে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে গেলে এদের মধ্যগত ঐক্যসূত্রটি আবিষ্কার করা আবশ্যক।

যে-কোনো যুগসন্ধির প্রতিক্রিয়া ঘটে দু'দিকে। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির এবং ব্যক্তির সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কের ভিতর। তাই সংশয় ও বেদনার যুগের ফসল ছোট গল্প একাধারে ব্যক্তিমূলক ও সমাজমূলক। এই ব্যক্তিমূলক গল্পগুলির মর্মোদ্ধারই সব চাইতে কঠিন কাজ। এইসব গল্পের মধ্যে কখনো আত্মতান্ত্রিক বিষণ্ণতা, কখনো অবচেতনার ছায়া-সঞ্চরণ। পাঠককে অনেকখানি গভীরে প্রবেশ করেই ব্যক্তি-প্রধান গল্পের গুহানিহিত তাৎপর্য এবং সামাজিক অবস্থার সঙ্গে স্পষ্ট সংযোগটিকে নির্ণয় করতে হবে। চেকভের 'ডার্লিংঙে'র সঙ্গে 'ছয় নম্বর ওয়ার্ডে'র মর্মসম্বন্ধ এইভাবেই অনুসন্ধান করা দরকার। তাই উনিশ শতকের ছোট গল্পের ক্ষুব্ধ জিজ্ঞাসামূলকতার ধর্মটিকে বহুমুখী আঙ্গিক এবং বিষয়বস্তুর ভিতর দিয়ে ত্রিবিধপদ্ধতিতে বুঝতে চেষ্টা করতে হবে ঃ অভিধায়, লক্ষণায় এবং ব্যঞ্জনায়—বুঝতে হবে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কে, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্কে।

আরো লক্ষণীয়, ছোট গল্পের যখন ব্যাপক আবির্ভাব—উপন্যাস তখন সংকুচিত। 'মহৎ অস্তি—মহৎ নাস্তি' অথবা 'যেমন আছি তা-ও ভালো' এদের যে কোনোটি না থাকলেই যেন উপন্যাসের সংকট। মোপাসাঁ-পূর্ব ফ্লোব্যার কুণ্ঠিত, মোপাসাঁ-পরবর্তী জোলা সমকালে অদ্বিতীয় খ্যাতিকীর্তির অধিকারী হয়েও উত্তরকালের বিচারে প্রায়

অসার্থক। তাই ভক্ত খ্রীষ্টান তলস্তয়েরও ধৈর্যচ্যুতি—'ক্রুট্জার সোনাটা'র আবির্ভাব। তাই পঞ্চাশ বছর বয়েস পেরিয়ে—একটা দার্শনিক নির্বেদে পৌঁছে, তবেই 'দি স্কারলেট্ লেটার' লিখতে পারলেন হথর্ন্?

এ গেল আত্মিক কারণ। অন্য কারণও ছোট গল্পের পথ খুলে দিয়েছিল।

আমেরিকার গল্প-সাহিত্য আলোচনায় আমরা দেখেছি সেখানে সংবাদপত্র ছোট গল্পকে আনুকূল্য করেছে। সাংবাদিকতার প্রয়োজনেই স্কেচ্ধর্মী রম্যতার আবির্ভাব হয়েছিল ইংল্যাণ্ডের ট্যাট্লার-স্পেক্টেটর-র্যামব্লারে। হথর্ন্, পো এবং হেন্রি জেমস্ বিখ্যাত ম্যাগাজিনিস্ট্, ফ্লোব্যার-ব্যালজাকের মুখ্য আশ্রয় পত্রিকা, মোপাসাঁ তাঁর তিনশোর উপর গল্প পত্রিকার প্রয়োজনেই প্রধানত লিখেছেন; চেকভকে ডাক্তারী পড়বার খরচ চালাতে হাসির নক্সা দিয়ে পত্রিকার পাতায় হাত মক্সো করতে হয়েছে—তারপর লিখতে হয়েছে গল্প। সংক্ষিপ্ত পরিসর—একটি মাত্র ভাব—একটি সংকটের সৃষ্টি করে পাঠককে নগদ বিদায় করা—এই স্থূল ব্যবসায়িক প্রয়োজনও ঊনবিংশ শতাব্দীর ছোট গল্প সৃষ্টির অন্যতম মুখ্য কারণ। প্রসঙ্গত বাংলা সাহিত্যে আধুনিক গল্পের প্রবর্তক রবীন্দ্রনাথকেও মনে পড়তে পারে, তিনিও ছোট গল্প লিখতে শুরু করেছিলেন 'সাপ্তাহিক হিতবাদী'র তাগিদেই। ঊনবিংশ শতকের সাংবাদিকতার সঙ্গে সাহিত্যের কিছু রোচক পরিবেষণের চেষ্টা আধুনিক ছোট গল্পের দ্বিতীয় জন্মহেতু। পত্রিকার সম্পাদকেরা যুগে যুগে অনেক অঘটন ঘটিয়েছেন; সন্দেহ হয়—তাঁদের ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির তাড়া না থাকলে এবং সেই সঙ্গে স্থান-সংকুলানের প্রশ্ন এসে লেখকদের নিয়ন্ত্রণ না করলে ছোট গল্প আদৌ বর্তমান কালের রূপ গ্রহণ করত কিনা। সংক্ষেপে বলা যায়, উনিশ শতকের যুগমানস ছোট গল্পের ভাবসত্যকে জন্ম দিল এবং সংবাদপত্র তার কায়ারূপ নির্মাণ করল।

তাই অন্তরের তাগিদে এবং বাইরের প্রয়োজনে এই বিশেষ কালের ছোট গল্প নামীয় "Peculiar Product"টির আবির্ভাব।

এইবার ছোট গল্পের সংজ্ঞা নির্ধারণের জন্যে কিছু কিছু মহাজনবাক্য উদ্ধৃত করা যাক।

(ক) গল্পসাহিত্যের প্রথম দার্শনিক ব্র্যাণ্ডের মাথুজ (Brander Matthews)-এর মতে—"The short story by its effect, a certain unity of impression which set it apart from other kinds of fiction'.'

(খ) ওয়েবস্টার ডিক্শনারী ও এন্সাইক্লোপিডিয়ায় পাই: "A short story usually presenting the crisis of a single problem."

(গ) আপ্হ্যাম (Upham) বলেন: "Out of rapidly moving currents of life's experiences the author's imagination seizes upon an impassive situation or a striking contrast, that effects him keenly." (The Typical Forms of English Literature)

(ঘ) হাডসন (Hudson) ম্যাথুজের সংজ্ঞাকেই একটু বিস্তৃত করে নিয়ে বলেছেন: "A short story must contain one and only one informing idea, and that this idea must be worked out to its logical conclusion

with absolute singleness of method." (An Introduction to the Study of Literature)

(ঙ) অধ্যাপক ফ্রেড্ লিউয়িস প্যাটির বক্তব্য আগের অধ্যায়ে আমরা উদ্ধৃত করেছি : "Impressionistic Prose tale···short, effective, a single blow, a moment of atmosphere, a glimpse of a climatic incident—"

(চ) বিখ্যাত আইরিশ গল্পলেখক সিয়ান ও'ফাওলেন (Sean O'Faolain) বলেছেন : "In other words the short story is an emphatically personal exposition. What one searches for and what one enjoys in a story is a special distillation, a unique sensibility which has recognised and selected at once a subject that, above all other subject, is of value to the writer's temperament and to his alone—his counterpart his perfect opportunity to project himself." (The Short Story)

(ছ) জনৈকা গল্পলেখিকা জোয়ান ভ্যাট্সেক (Joan Vatsek) বলছেন : "Stories can grow slowly in the imagination, almost by themselves, from some strong impression."

এ ছাড়া হেন্রি জেম্স্, এড্গার অ্যালান পো এবং এইচ্ জি ওয়েল্সের বক্তব্য পূর্বেই নানাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আশা করি এসবের থেকে ছোট গল্পের একটা বাংলা সংজ্ঞা আমরা এইবার নির্ধারণ করে নিতে পারব।

সংজ্ঞাটি এইভাবে গঠন করা যেতে পারে :

ছোট গল্প হচ্ছে প্রতীতি (Impression)-জাত একটি সংক্ষিপ্ত গদ্য-কাহিনী যার একতম বক্তব্য কোনো ঘটনা বা কোনো পরিবেশ বা কোনো মানসিকতাকে অবলম্বন করে ঐক-সংকটের মধ্য দিয়ে সমগ্রতা লাভ করে।

এই সংজ্ঞায়ই বর্তমানে আমাদের কাজ চলে যাবে। বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে, "প্রতীতির সমগ্রতা"—Unity of Impression—লেখকের প্রধান পালনীয় শর্ত। যাই হোক, আপাতত ছোট গল্পের মর্ম ও রূপ সম্বন্ধে একটা সুশৃংখল সংকেত পাওয়া গেল। বর্তমানে কিছু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

প্রথম কথা হল, ছোট গল্পে ঘটনাগত, মনস্তত্ত্বগত বা চরিত্রগত—একটিমাত্র সমস্যারই সংকটরূপ দেখানো হবে।

দ্বিতীয়ত, বহমান জীবনের মধ্য থেকে লেখকের অনুভূতি একটি বিশিষ্ট প্রতীতিকে আহরণ করে নেবে—সেটা তার নিজস্ব দর্শন বা আদর্শের অনুকূল হতে পারে, প্রতিকূলও হতে পারে, হয় তার মধ্যে লেখক একটি কাঙ্ক্ষিত সত্যকে আবিষ্কার করবেন অথবা তার অন্তর্নিহিত একটি মিথ্যাকে নির্দেশ করে দেবেন।

তৃতীয়ত, ছোট গল্প পড়তে গিয়ে আমরা লেখকের ব্যক্তিত্বেরই একটা পরিস্রুত রূপ দেখতে পাব, লাভ করব লেখকের চরিত্র ও মানসিকতার অনুযায়ী এক অপূর্ব সংবেদনা—সেটি লেখকের সত্তারই প্রতীক, গল্পের স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে নিজেকে অভিব্যক্ত—সম্প্রসারিত করবেন—"Project himself."

তাহলে ছোট গল্প হল একমুখী—তার একটিমাত্র সামগ্রিক বক্তব্য।

এই বক্তব্য সে আহরণ করবে চারদিকের জীবন থেকে, গতিশীল প্রাণপ্রবাহের ভিতর থেকে একটি সত্য বিদ্যুদ্বিকাশের মতো আবির্ভূত হবে তার কাছে—লেখকের দর্শন সেই চকিত উপলব্ধির মধ্যে নিজের সমর্থন পেতে পারে, বিরোধিতাও পেতে পারে।

আর ছোট গল্প হল লেখকের ব্যক্তিত্বেরই এক-একটি অভিব্যক্তি। নিজের সমাজ-পরিবেশ, শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং চারিত্রিক গঠন অনুযায়ী ছোট গল্পের লেখক যে প্রতীতি জীবন থেকে গ্রহণ করবেন, তারাই তাঁর রচনায় ধরা দেবে। ছোট গল্প লেখকের ব্যক্তিত্বেরই বিচিত্র-রঞ্জিত বিকাশ।

একে একে আলোচনা করা যাক।

কিপ্‌লিঙ পুরোনো স্কটল্যাণ্ড্‌ ইয়ার্ডের পুলিশের "Bull's eye Lantern"-এর সঙ্গে ছোট গল্পের বিখ্যাত উপমাটি দিয়েছেন। এর আলোক-রশ্মি যেমন বিশেষ একটি লক্ষ্যবস্তুর উপরে গিয়ে সেটিকে উদ্ভাসিত করে তোলে, অথচ তার চারপাশে থাকে অন্ধকার এক লক্ষ্য—ছোট গল্পের কৌশলটিও ঠিক তাই।

অর্থাৎ ছোট গল্প নিজের একান্ত বক্তব্যটি ছাড়া আর কিছুই বলবে না। অনাবশ্যক ব্যাপ্তির সুযোগ তার নেই, অহেতুক চরিত্রের ভিড়ে তাকে ভারাক্রান্ত করা চলবে না, অপ্রয়োজনীয় বর্ণনা-বিলাসের কোনো ভূমিকাই সেখানে নেই। তার প্রতিটি সংলাপ হবে ধারালো ভাবগর্ভ—তার প্রতিটি বাক্যে থাকবে ইঙ্গিতময়ী উদ্ধৃতিযোগ্যতা। তার মধ্যে বরং স্বল্পভাষিতা থাকতে পারে, কিন্তু বহুভাষিতা—gift of the gab তার ক্ষেত্রে অচল।

আর সবচাইতে বড় কথা, গল্পের যেখানে সমাপ্তি, সেইখান থেকেই তার আস্বাদনের আরম্ভ। তার বক্তব্য শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু ভাবের অনুসরণটি চলতে থাকবে পাঠকের মনে। এমনভাবে বক্তব্যটি উপস্থিত করা হবে—যাতে যেটি শেষ হয়েও শেষ হতে চাইবে না; মানস-যন্ত্রের নায়কী তারটিতে একটিমাত্র ঝঙ্কার দেবে ছোট গল্প—তারপর অনেকক্ষণ ধরে সঞ্চারিণীগুলিতে তার মূর্ছনা বাজতে থাকবে।

রবীন্দ্রনাথের "সোনার তরী" কাব্যের 'বর্ষাযাপন' কবিতাটিতে ছোট গল্পের চরিত্রটি খুব সুন্দরভাবে বলে দেওয়া হয়েছে:

"ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা ছোটো ছোটো দুঃখকথা
নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতিরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু-চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘন ঘটা
নাহি তত্ত্ব, নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে, সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।
জগতের শত শত অসমাপ্ত কথা যত
অকালের বিচ্ছিন্ন মুকুল;
অজ্ঞাত জীবনগুলা অখ্যাত কীর্তির ধুলা,—
কত ভাব, কত ভয়-ভুল—"

খাঁটি ছোট গল্পের এই হল সহজসুন্দর কাব্যিক ব্যাখ্যা। 'ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা'ই তার উপজীব্য—কিন্তু গোষ্পদে যেমন আকাশের ছায়া পড়ে, তেমনি একটুখানি ক্ষুদ্র চিত্রপটের মধ্যেই বিশালব্যাপ্ত মহাজীবনের ছায়া পড়বে। তত্ত্ব থাকবে, কিন্তু তাত্ত্বিকতা বড় হয়ে উঠবে না—ফুলের গায়ে গন্ধের মতোই তা অবিচ্ছিন্ন হয়ে বিরাজ করবে; কাহিনীর ধূপ নিবে যাবে, কিন্তু তার ভাবের সৌরভটি মোহ বিস্তার করতে থাকবে ধীরে ধীরে। অতএব লেখকের কলম যেখানে থেমে দাঁড়াবে, সেইখান থেকেই পাঠকের মনে গল্পটি সঞ্চারিত হয়ে চলবে।

ভাবের এই একমুখিতা—এই 'One climax'-এর জন্যই ছোট গল্পকে সনেটের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ছোট গল্পও সনেটের মতো মিতভাষিতায় বিশিষ্ট, ভাবের দিক থেকে দৃঢ়-সন্নদ্ধ—শেষের অংশে পেঁছে তার নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রিত পরিণতি। আর সেই পরিণতিটি ব্যঞ্জনাধর্মী। এবং এই কারণেই দার্শনিক ক্রোচে মোপাসাঁর গল্পের মধ্যে গীতিকবিতার সৌন্দর্য আস্বাদন করতে পেরেছেন। তিনি দেখেছেন, 'The lyric is really intrinsic to the form of the narrative, and shapes each part of it, without mixture and without having any residue."[১]

গাথাকাব্য কিংবা মহাকাব্যের সঙ্গে সনেট্-লিরিকের যে মৌল-পার্থক্য, উপন্যাসের সঙ্গে ছোট গল্পের পার্থক্যও তদনুরূপ। উপন্যাসের বক্তব্য আদ্যন্ত।[২] কোনো ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ বা কোনো একটি বিশিষ্ট জীবন-সিদ্ধান্তকে সে একেবারে প্রথম থেকেই আরম্ভ করবে; সেটি ধীরে ধীরে বিকশিত হবে—আসবে পরস্পর-সাপেক্ষ চরিত্র ও অনুক্রমিক ঘটনাসমূহ, বাহ্যিক এবং আন্তরিক ঘাত-সংঘাতে বিলম্বিত লয়ে উপন্যাস শেষ পর্যন্ত তার কাহিনীবৃত্ত অথবা ভাববৃত্তটিকে সম্পূর্ণ করে দেবে। আধুনিক উপন্যাসে অবশ্য কাহিনীবৃত্তের চাইতে ভাববৃত্তটিকে পূর্ণ করবার দিকেই প্রবণতা বেশি।

জন কুরনস্ (Cournos) ছোট গল্পের সঙ্গে উপন্যাসের যে তুলনামূলক পার্থক্য দেখিয়েছেন, সেটি এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে: "Brevity and natural limitions give the short story a precison as an art, beside which the art of the novel seem rambling and formless. Standing as a single crystalline episode or experience, the short story bears, perhaps, the same relation to the novel as a single parable to the whole gospel." কিন্তু ছোট গল্প আংশিক হয়েও স্বয়ংসম্পূর্ণ, যথা: "The parable is indeed a fragment, but is a complete fragment, and if it is cumulation of truth, it is still better the essence of all truth and it is not less than the whole of which it is a fragment."

১। Croche—Poetry and Non-Poetry.

২। "A novel is a totality, made up of all the words in it, and must be judged as a totality"—Walter Allen, The English Novel, Penguin, Intr.

কিন্তু কাহিনীগত সমাপ্তিই হোক আর দর্শনগত সমাপ্তিই হোক—বিকাশ, বিস্তার, পল্লবিত সমীক্ষা, চিন্তা-প্রতিচিন্তা, ঘাত-প্রতিঘাত—সব কিছু নিয়েই উপন্যাসকে পূর্ণতায় পৌঁছুতে হবে। আর ছোট গল্প জীবনের এই বিস্তৃত বিশালতা থেকে একটি মাত্র ঘটনা বা একটি মাত্র মানসিকতাকেই নির্বাচন করে নেবে। তার আরম্ভও নেই—তার শেষও নেই। মুহূর্তজীবী বিদ্যুদ্বিকাশেই তার ক্ষণ-বক্তব্য শেষ, অথচ ওই চকিত বিদ্যুদালোকেই আমাদের দৃষ্টির সামনে দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

মোপাসাঁকে নিন্দাচ্ছলে বলা হয়েছে—"cutter of life"; হয়তো জীবনকে তিনি খণ্ডিত দৃষ্টিতে দেখেছিলেন বলেই এই অপবাদ তাঁকে বরণ করতে হয়েছে। কিন্তু আদর্শ ছোট গল্প যে সত্যিই "cut-piece" তাতে সন্দেহমাত্র নেই; সে হল বিরাটের খণ্ডাংশ।

অতএব ছোট গল্পকে ধরতে হবে মাঝখান থেকে—শেষও করতে হবে মাঝখানে। প্রথম পংক্তির রচনার সঙ্গে সঙ্গে সে সুরেবাঁধা হয়ে যাবে। এড্‌গার অ্যালান পো বলেছেন: "If his (গল্প-লেখকের) very initial sentence tends not to the out-bringing of this effect, then he has failed in his first step. In the whole composition there should be no word written of which the tendency, direct or indirect, is not to the preestablished design."

তাহলে প্রথম বাক্য থেকেই সুনিশ্চিত লক্ষ্যের দিকে ছোট গল্পের যাত্রা, প্রতিটি অক্ষর সেই লক্ষ্য ভেদ করবার প্রয়োজনে সুমিত। উপন্যাসের মন্থর অলস গতি তার জন্য নয়—তার বিরামের কোনো অবকাশ নেই।

আমাদের বাংলা সাহিত্য থেকেই উপন্যাস ও ছোট গল্পের প্রথম পদক্ষেপ যথেচ্ছভাবে উদাহৃত করা যাক:

(১) "মা-ভাগীরথীর কূলে কূলে চরভূমিতে ঝাউবন আর ঘাসবন—তারই মধ্যে বড় বড় দেবদারু গাছ। উলুঘাস কাশশর আর সিন্ধি গাছে গাছে চাপ বেঁধে আছে। মানুষের মাথার চেয়েও উঁচু। এরই মধ্যে গঙ্গার স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হিজলবিল এঁকেবেঁকে নানা ধরনের আকার নিয়ে চলে গেছে। ক্রোশের পর ক্রোশ হিজলবিল—"

এই ক্রোশের পর ক্রোশ ব্যাপ্তি—চরভূমিতে ঝাউ-দেবদারু আর ঘাসবনের বিপুলতা—পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের চোখের সামনে এক দূর-বিস্তীর্ণ সম্ভাবনাকে ঘনিয়ে আনল। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস "নাগিনীকন্যার কাহিনী" এইভাবেই আরম্ভ হয়েছে।

আবার:

(২) "ঘরের দরজায় ধাক্কার সঙ্গে বাড়িউলীর কর্কশ গলা শোনা গেল, 'ভরসন্ধ্যেয় দরজা বন্ধ কেন লা বেগুন? খোল্ না, কতক্ষণ দাঁড়াব?'

প্রদীপের অস্পষ্ট আলোকে একটি বিগত-যৌবনা রোগা লম্বা স্ত্রীলোক সিল্কের একটা শাড়ি সেলাই করছিল—"

এই সূচনাটিই বলে দিচ্ছে এটি একটি ছোট গল্প। গল্পটির নাম 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে'—লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র।

প্রথম উদ্ধৃতিটি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়—লেখক বেশ সহজ অনাড়ম্বর ভঙ্গিতে কাহিনীটি আরম্ভ করছেন ; আগে পটভূমিকাটি রচনা করে নিচ্ছেন, তারপর তার উপর ফুটবে চরিত্র, পল্লবিত হয়ে উঠবে ঘটনা। যেন এক বিরাট ঐকতানের সূচনায় যন্ত্রগুলিকে একসঙ্গে সুর মিলিয়ে বেঁধে নেওয়া হচ্ছে—সেই প্রস্তুতিপর্ব শেষ হলে আসবে তার সম্মিলিত সঙ্গীতোৎসবের পালা। আপাতত তার বাঁধবার সময় মূল রাগিণীর বিশেষ কোনো আভাস পাওয়া যাবে না।

আর দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটি—(এড্‌গার অ্যালান পো-র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী) "In the very initial sentence" বক্তব্যে প্রবেশ করেছে। যেন বাঁশি প্রস্তুতই ছিল, ফুঁ দিতেই সুর বেজে উঠল। 'ঘরের দরজায় ধাক্কা'—একটা তীব্র অসহিষ্ণুতা, 'কর্কশ গলা'য় বাড়িউলির চরিত্রের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি, এবং কোনো 'সন্ধ্যাবেলায় দরজা বন্ধ' থাকার মধ্যে সূচনাতেই কেমন একটা অসামঞ্জস্য পাওয়া যাচ্ছে—কোথায় যেন কী বেঠিক হয়ে গেছে। তারপরেই যখন রোগা লম্বা একটি বিগত-যৌবনা স্ত্রীলোককে অস্পষ্ট প্রদীপের আলোয় ছেঁড়া সিল্কের শাড়ী সেলাই করতে দেখা যায়, তখন গল্পের অন্তর্নিহিত একটি বেদনা পাঠকের সম্মুখে প্রায় উপস্থিত হয়ে পড়েছে। কত অল্প (minimum materials-এ) কত বেশি প্রতিক্রিয়া (maximum effect) সৃষ্টি করা যেতে পারে—এই দুটি বাক্যই তার প্রমাণ।

'বেগুন' নাম, বাড়িউলীর কর্কশ সম্ভাষণ আর 'ভরসন্ধ্যেবেলায় দরজা বন্ধ কেন' —পড়লেই বোঝা যাবে এটি গণিকাদের কাহিনী। দ্বিতীয় বাক্যটিকে কয়েকটি খণ্ডে ভাগ করে লেখকের সাফল্যের পরিমাপ করা যাক :

(ক) স্ত্রীলোকটি রোগা ও লম্বা : এ থেকে মেয়েটির শারীরিক কুশ্রীতা সংকেতিত হচ্ছে ; তার দৈর্ঘ্য দৈহিক ক্ষীণতার জন্য আরো কদাকার হয়েছে।

(খ বিগত-যৌবনা : তার উপর বয়স গেছে। বারবধূর একমাত্র পাথেয়ই হল যৌবন—সেইটি না থাকার ফলে বলা যেতে পারে 'সর্বং শূন্যং দরিদ্রস্য'।

(গ) প্রদীপের অস্পষ্ট আলো : কুশ্রী গতযৌবনা দুর্ভাগিনীর ঘরে জোরালো প্রদীপ জ্বালবার মতো যথেষ্ট তেলও জোটে না—এ থেকে তার দৈন্যের সুস্পষ্ট ব্যঞ্জনা পাওয়া যাচ্ছে। তার চাইতেও আরো বড় কথা আছে, তার আশা-ভরসা অন্ন-বস্ত্রের শিখাটিও অমনি করেই ম্লান হয়ে আসছে, এর পরেই নেমে আসবে চরম দুঃসময়ের অন্ধকার।

ঘ) সিল্কের শাড়ী সেলাই করছিল : কুশ্রীতা ও দৈন্যের পটভূমিতে রূপজীবার সমগ্র কারুণ্য এসে যেন এর মধ্যে ধরা দিয়েছে। রূপ নেই, যৌবন নেই, ব্যাধিগ্রস্ত শীর্ণ দেহ—তবুও একমুঠো উদরান্নের জন্য এখনও তাকে কায়িক পশরা সাজিয়ে দোরগোড়ায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে—সাজসজ্জা দিয়ে প্রেতিনীর মায়ায় শিথিলচিত্ত পথচারীকে প্রলুব্ধ করতে হবে। তার একমাত্র শোভনবাস বহু-জীর্ণ এই সিল্কের শাড়ীটি —নিরুপায় হয়ে এটিকে সে সেলাই করছে। আরো একটু ইঙ্গিত আছে এর মধ্যে। যৌবনকালে এই হতভাগিনীর সুদিন ছিল, সে সিল্কের শাড়ী কিনতে এবং পরতে পারত। স্মৃতিসম্বল এই সিল্কের ছিন্ন শাড়ী তার অপগত যৌবনের সমস্ত বেদনাকে আমাদের সামনে মেলে ধরেছে।

বোঝবার প্রয়োজনে আমরা বাক্যটির একটু বিস্তৃত বিশ্লেষণ করেছি। আর এ থেকে যা পাওয়া গেল তা হচ্ছে এই ঃ ছোট গল্প শুরুর সঙ্গে সঙ্গে জ্যা-মুক্ত তীরের গতিতে তার লক্ষ্যের দিকে ছুটে চলবে ; আরম্ভ করেই পাঠক দেখতে পাবেন—তাঁকে একেবারে বিনা ভূমিকাতেই স্রোতের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে—তাঁর দাঁড়াবার এক পলও সময় নেই। একটি-দুটি বাক্যে, দুটি-চারটি আভাস-ইঙ্গিতের মধ্যে দিয়ে 'one climax'-এর আয়োজন প্রায় করে ফেলা হয়েছে, তারপর পরিণামের জন্য অপেক্ষা মাত্র।

আবার উপন্যাস ও ছোট গল্পের সমাপ্তিতেও এমনি সুস্পষ্ট পার্থক্য। উপন্যাস কাহিনীমূলক ভাবে শেষ হোক আর ভাবমূলকরূপেই শেষ হোক—তাতে একটা পরিপূর্ণতার যতি-পতন থাকবেই। ওই "নাগিনীকন্যার কাহিনী"র সমাপ্তিটিই ধরা যাক ঃ

"ভাদু নাটনেরা সাঁওতালী ছেড়ে চলে গিয়েছে। মনসার বারি নাই, আর কি ক'রে সাঁওতালীতে থাকবে? গভীর অরণ্যে গিয়ে তারা বাস করবে।

এদের নিয়ে শবলা বেরিয়েছে রাঢ়ের পথে।

আর সাঁওতালী নয়,—অন্যত্র এদের নিয়ে বসতি স্থাপন করবে। মানুষের বসতির কাছে—গ্রামে তারা স্থান খুঁজছে।

নাগিনীকন্যা আর আসবে না, মুক্তি পেয়েছে, আর তো সাঁওতালীতে থাকবার অধিকার নেই।"

বলে দিতে হয় না—কাহিনী সমাপ্ত হয়েছে। মাঝখানে অনেক ঝড়—অনেক দুর্বিপাক বয়ে গেছে, অনেক ব্যথা-বেদনার পালা সাঙ্গ হয়েছে। এমন একটা ম্লান বিষাদের ছায়ায়—বিশ্রান্ত বিকেলের আলোর ভিতরে একটি শান্ত করুণ পরিণাম নেমে এসেছে। উপন্যাসের সমাপ্তি হয়েছে।

আবার প্রেমেন্দ্র মিত্রের উক্ত গল্পটির উপসংহার এই রকম ঃ

"দাঁতে দাঁত চেপে অসীম হতাশায় কপর্দকহীন সেই মূর্তিমান দুঃস্বপ্নের হাত ধরেই বেগুন বললে, 'চলো—'

এবার তাদের পথে কেউ বাধা দিলে না।"

গল্পের শুরুতেই যে কুশ্রীতা, দারিদ্র্য আর কারুণ্য দিয়ে আমাদের সচকিত করে তোলা হয়েছিল—এখানে সেটি চূড়ান্ত রূপ নিয়ে ভেঙে পড়েছে। কোনো শান্ত বিস্তৃতি এখানে নেই—কোনো ম্লান গোধূলির করুণ বিশ্রামও নেই কোথাও। এর আরম্ভে যন্ত্রণার সংকেত—সমাপ্তিতে 'অসীম হতাশা' আর 'কপর্দকহীন মূর্তিমান দুঃস্বপ্ন।' সমাজ ও জীবন-জিজ্ঞাসু ছোট গল্পের প্রশ্ন-চিহ্নটি যেন আগুনের বর্ণে এখানে জ্বলজ্বলে করে উঠেছে। যতিপাত নেই—এই যন্ত্রণা-কুটিল নরকের সীমারেখা নেই কোথাও।

একটি উপন্যাসের সমাপ্তি এই রকম ঃ

"দিন রাত্রি পার হয়ে, জন্ম মরণ পার হয়ে, মাস, বর্ষ, মন্বন্তর, মহাযুগ পার হয়ে চ'লে যায়…তোমাদের মর্মর জীবন-স্বপ্ন শেওলা ছাতার দলে ভ'রে আসে, পথ আমার তখনও ফুরোয় না…চলে…চলে…চলে…এগিয়ে চলে…

অনির্বাণ তার বীণা শোনে শুধু অনন্ত কাল আর অনন্ত আকাশ…

সে পথের বিচিত্র আনন্দ-যাত্রার অদৃশ্য তিলক তোমার ললাটে পরিয়েই তো তোমায়

ঘর ছাড়া করে এনেছি···চল এগিয়ে যাই।"

বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' এইভাবে শেষ হয়েছে। এর প্রসার ঘটেছে অনন্ত কাল আর অনন্ত আকাশের মধ্যে—আর এই অনন্ত শরণি বেয়ে যে পথিক এগিয়ে চলেছে, তার ললাটে আনন্দ-যাত্রার অদৃশ্য তিলক। যদিও 'অনির্বাণ বাণী' আলংকারিক দোষে দুষ্ট, তবু এর অনাহত ঝংকার সমগ্র সমাপ্তিটির উপর একটি সমুদ্র-বিশালতা এনে দিয়েছে।

আবার রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'দান প্রতিদান' গল্পটির এইভাবে মুখবন্ধ করেছেন :

"বড়ো গিন্নি যে কথাগুলা বলিয়া গেলেন তাহার ধার যেমন বিষও তেমনি। যে হতভাগিনীর উপর প্রয়োগ করিয়া গেলেন, তাহার চিত্তপুত্তলি একেবারে জ্বলিয়া জ্বলিয়া লুটিতে লাগিল।

বিশেষত, কথাগুলা তাহার স্বামীর উপর লক্ষ্য করিয়া বলা—"

সূত্রপাত করবার সঙ্গে সঙ্গে কাহিনী আরম্ভ হয়ে গেল। পাঠকের বুঝতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব ঘটল না যে, পারিবারিক একটি তীব্র অশান্তির আগুন জ্বলে উঠেছে এবং এ আগুন সহজেই নিভবে না—শোচনীয় কোনো পরিণতি একটি ঘটবেই, কারণ অপমানিতা মেয়েটির স্বামীর উদ্দেশে কটূক্তি তার একেবারে মর্মস্থানে গিয়ে আঘাত করেছে।

ওয়ারেন বেক (Warren Beck) তাঁর বিখ্যাত গল্প 'Between Two Worlds' এইভাবে শেষ করেছেন :

"Suddenly the long-forbidden tears brimmed in her eyes : and she was happy, knowing them to be a bond with Andrew's. They walked on steadily, arm in arm, silent, looking ahead up the vacant street, where in the almost noontime light the shadows paused shrunken before the slow beginning of their augmentation with the day's decline."

'Suddenly' চোখের জলের বন্ধন এবং বৈকালী পথের নির্জনতায় সংকীর্ণ হয়ে যাওয়া ছায়ার সমাবেশ—সমস্ত গল্পটিতে একটি প্রতীকী পূর্ণতা এনে দিল। কোনো নিশ্চিত সমাপ্তির দরকার হল না—এই সাংকেতিকতার আশ্রয়েই গল্পের গভীর বক্তব্য আভাসিত হয়ে উঠল।

এই সব দৃষ্টান্ত থেকে, উপন্যাসের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে দেখা গেল, দ্রুত সূচনা, সংক্ষিপ্ত কয়েকটি মাত্র কথার মাধ্যমে মূল বক্তব্যের অবতারণা এবং যেমন মিতবাক্ তেমনি পরিপূর্ণ ইঙ্গিতের দ্বারা সমাপ্তি—এই হল আধুনিক ছোট গল্প লেখকের প্রাথমিক দায়িত্ব —তাঁর বিশিষ্ট কলাকৃতি।

আর এই হেতু, অনিবার্য ভাবেই ছোট গল্পের সমস্ত ভঙ্গিটাই হবে ইঙ্গিতমূলক, বিবৃতিমুখ্য নয়। অবশ্য যে-কোনো শিল্প-নির্মিতিতেই ইঙ্গিতধর্মিতা তার সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে দেয় ; তা হলেও একটি দীর্ঘবিলসিত উপন্যাস যদি প্রথম থেকেই তির্যগ্ ভাষণের বঙ্কিম পন্থা অবলম্বন করে, তাহলে পাঠকের পক্ষে তাকে বেশিক্ষণ সহ্য করা সম্ভব নয়। ক্রমশই তা পীড়িত করে তুলতে থাকবে—স্নায়বিক বিপর্যয় ঘটিয়ে দেবে। তাই ঔপন্যাসিক গোড়াতে মোটের উপর সরল বিবৃতিকে আশ্রয় করবেন—যাতে তাঁর

সামগ্রিক বক্তব্যটি নানা দিক থেকে ধীরে ধীরে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়—পাঠকের মনে ঘটনা, বিশ্লেষণ ও চরিত্রগুলি নির্ভরযোগ্য ভাবে ক্রমে ক্রমে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে।

কিন্তু ছোট গল্পের সময় নেই। আলাপ-বিস্তার-তান-কর্তবের অবকাশ নেই, শুরুতেই সুর বাজিয়ে তুলতে হবে। যতটা সম্ভব স্বল্প-প্রসারের মধ্য দিয়ে তাকে নিজের বক্তব্য পেঁছে দিতে হবে পাঠকের কাছে ; অর্জুনের নিশ্চিত লক্ষ্যভেদী বাণের মতো তা চোখের ভিতর দিয়ে সোজা মরমে প্রবেশ করবে। সূচনার মুহূর্তেই উচ্চকিত করে দিতে হবে অসতর্ক মনকে, বলে দিতে হবে : 'একটি শব্দও যদি হারাও, তা হলে গল্পেরও অনেকখানি তুমি হারালে।' অতএব পাঠকচিত্তকে সচেতন ও সাগ্রহ রাখবার জন্য গাল্পিকের প্রয়োজন সুতীক্ষ্ণ ভঙ্গি—ইঙ্গিতগর্ভ ভাষা।

O' Faolain বলেছেন :

"A story can be subtle in proportion as it manages to convey a greater and greater amount of information by means of these suggestions, and if a reader fails to catch the suggestions that is his loss."১

এই suggestion—এই ইঙ্গিতময়তা কি রকম ?

উল্লিখিত সমালোচক চেকভের একখানা চিঠি থেকে একটি অপূর্ব উদাহরণ তুলে দিয়েছেন। চেকভ তাঁর কোনো বন্ধুর রচিত একটি গল্প পড়ছিলেন। কাহিনীর মধ্যে একটি জ্যোৎস্নারাত্রির বর্ণনা ছিল এবং গল্পকার চলিত-সংস্কার (Convention) অনুযায়ী তাতে প্রচুর পরিমাণে কবিত্বের বৃষ্টি করেছিলেন। পড়তে পড়তে চেকভ চেঁচিয়ে উঠলেন : 'উঁহু, এ নয়—এতে হবে না। যদি সত্যিই তুমি চাঁদের আলো বর্ণনা করতে চাও, তাহলে কেবল দেখিয়ে দাও—কারখানার পাশের জলাটার ধারে একটা পুরোনো ভাঙা বোতলের গায়ে জ্যোৎস্না কি ভাবে ঝিকমিক করে জ্বলছে।'

ছোট গল্পের ইঙ্গিতময়তার একটি সুন্দর উদাহরণ হিসেবে এটিকে গ্রহণ করা যেতে পারে। জীবন সম্পর্কে যে তীক্ষ্ণ প্রশ্নমূলকতা সমাজ-সচেতন ছোট গল্পের প্রধানতম প্রেরণা, এর মধ্যে সেইটিই যেন অভিব্যক্ত হয়েছে। ওই কারখানাটি যান্ত্রিক শোষণবাদের প্রতীক, আর এর পাশের জলাটি—যাতে কারখানার অব্যবহার্য ভাঙাচুরো জিনিসগুলো নিক্ষেপ করা হয়—সেখানে পড়ে থাকা ওই পুরোনো ভাঙা বোতলটি শ্রমিকের রিক্ত জীবনের মতোই ঝিকিয়ে উঠছে। চাঁদের আলোয় রোম্যাণ্টিক্ স্বপ্নের উপর বাস্তব জীবনের নিষ্ঠুর আঘাত ওই একটি কথাতেই সুস্পষ্ট হয়ে যায়—আধুনিক তরুণ বাঙালী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের সেই বিখ্যাত ইঙ্গিতগর্ভ পংক্তিটি মনে পড়ে : 'পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।'

অতি-সাম্প্রতিক একটি মার্কিন ছোট গল্প থেকে এই ইঙ্গিতধর্মী পরোক্ষতার (Suggestive Indirectness-এর) আর একটি উদাহরণকে পরীক্ষা করা যাক। গল্পের নাম 'নিশীথ-তরু' (A Tree of Night)—লেখক হচ্ছেন ট্রুম্যান ক্যাপোট (Truman

১। The Short Story, Sean O' Faolain, p. 140

Capote)। গল্পটির বিষয়বস্তু অতিশয় অস্বস্তিকর। মধ্যরাত্রির ট্রেনে জনৈকা তরুণীর উপর কৌশলে সম্মোহন-বিদ্যা প্রয়োগ করে একটি ভবঘুরে দম্পতি কেমন করে তার সর্বস্ব প্রায় রাহাজানি করে নিল—সেইটিই গল্পে প্রদর্শিতব্য। গল্পটি পড়তে পড়তে সর্বাঙ্গে একটা শীতল সরীসৃপের ভয়ংকর-কদর্য আলিঙ্গন যেন অনুভব করা যায়। শীতজর্জর রাত্রিতে জনহীন একটি রেলস্টেশনে প্রতীক্ষারতা একটি মেয়ের এই রকম বর্ণনা দিয়ে গল্পটির আরম্ভ :

"It was winter. A string of naked light bulbs, from which it seemed all warmth had been drained, illuminated the little depot's cold, windy platform. Earlier in the evening it had rained, and now icicles hung along the station house caves like some crystal monster's vicious teeth. Except for a girl, young and rather tall, the platform was rather deserted—."

যে অর্ধ-বাস্তব হিংস্র একটি কাহিনী এই গল্পে বলা হয়েছে, ঝোড়ো রাত্রির ট্রেনের কামরায় দুটি কুৎসিত নরনারী একটি অসহায় নিঃসঙ্গ মেয়ের উপর যে সম্মোহন জাল বিস্তার করেছে, সূচনাতেই আমরা যেন সেই আগামী নাটকের 'Ominous Orchestra' শুনতে পাই। উত্তাপহীন একরাশ ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌বের আলো, ঝোড়ো হাওয়ায় ভরা নির্জন ছোট প্ল্যাটফর্ম—স্টেশনের গায়ে কোনো স্ফটিক-দানবের ভয়াল দাঁতের মতো ঝুলন্ত তুষারের ঝালর, আর প্ল্যাটফর্মে একটি নিঃসঙ্গ তরুণী। সঙ্গে সঙ্গেই একটা সম্ভাব্য আতংকে আমরা উচ্চকিত হয়ে উঠি—ওই তুষারের দাঁত আর ঝোড়ো রাতের শূন্য প্ল্যাটফর্ম আমাদের বুকেও একটা শীত-শিহরণ বইয়ে দেয়। কী ধরণের গল্প লিখতে যাচ্ছেন, সূচনার মধ্য দিয়েই লেখক তার সংকেত দিয়ে রেখেছেন।

অথবা এডগার অ্যালান পোর সেই ভয়ংকর 'কালো বেড়াল'র সূচনাটি স্মরণ করা যাক :

"For the most wild yet most homely narrative which I am about to pen, I neither expect nor solicit belief. Mad indeed would I be to expect it, in a case where my very senses reject their own evidence. Yet, mad am I not—and very surely do I not dream. But tomorrow I die, and today I unburden my soul—"

সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা গেল, একটি অবিশ্বাস্য কাহিনী আবির্ভূত—যা স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, মতিভ্রমও নয়। 'Tomorrow I die'—এই ইঙ্গিতে গল্পের কৌতূহল বাড়ল এবং ভয়াল পরিণাম আগে থেকেই সংকেতিত হয়ে গেল।

ছোট গল্পের সূচনা এবং তার ইঙ্গিতময় চরিত্রের এইগুলিই সার্থক উদাহরণ।

এইভাবে রচনার রূপটি তৈরি হয়ে গেল। কিন্তু যার উপর এই রূপারোপ—সে বস্তুটি কী? এই যার কায়া—তার আত্মাটির স্বরূপটি কী? লেখক জেনেছেন কেমন করে লিখবেন, কিন্তু কী নিয়ে লিখবেন?

সেটি হল প্রবহমাণ জীবন থেকে গৃহীত একটি 'Impression'—মোটামুটি ভাবে যার বাংলা পরিভাষা করা যেতে পারে 'প্রতীতি'। এই পরিভাষা খুব সন্তোষজনক হল এ দাবি করব না—আশা করি, বিকল্প হিসেবে গ্রহণীয়।

স্নায়ুচক্রের সাহায্যে বহির্জগতের কোনো একটি বস্তুকে ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী আমরা আহরণ করি এবং সঞ্চয় করি। এরই নাম প্রতীতি বা 'ইম্প্রেশ্যন'। আমাদের অনুভূতি ও জীবনবোধের দ্বারা একটি বিশেষ রূপ দিয়ে আমরা তাকে নতুনভাবে প্রকাশ করি। কখনো বা উক্ত প্রতীতিটি অবচেতনার মধ্যে আশ্রয় নেয়—তখন তার অভিব্যক্তি ঘটে পরোক্ষে।

ছোট গল্পে (অথবা যে-কোনো শিল্পেই) স্রষ্টার বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী 'প্রতীতি' গৃহীত হয়, অনুভূতির রঞ্জন লাভ করে—বিভিন্ন বিভিন্ন তাৎপর্যে শিল্পিত হয়ে ওঠে। কবি কীট্‌স্‌ ওক গাছ দেখলেই বর্বর ইংল্যাণ্ডের পুরোহিত 'দ্রুয়িদ্‌'-দের প্রত্যক্ষ করতেন ; আবার কোনো কাঠের ব্যবসায়ী সঙ্গে সঙ্গেই কল্পনা করতে চাইবেন : এই গাছটি কেটে বিক্রী করলে তাঁর কত লাভ হতে পারে ? একই বস্তু বা ঘটনাকে বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব কত দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ ও আত্মস্থ করে নিচ্ছেন। পথ দিয়ে হরি-সংকীর্তন তুলে মড়া চলেছে একটি—তাই দেখে কেউ ভাবছেন—'জীবন অতি নশ্বর বস্তু' ; কোনো সংসারপীড়িত দুর্ভাগা ভাবছেন—'আমিও এমনি করে মরতে পারলে বেঁচে যেতাম' ; কবির মনে হচ্ছে : 'ডান হাত হতে বাম হাতে লও—বাম হাত হতে ডানে।' গল্প-লেখকের কল্পনা জাগছে—'এই বৃদ্ধের ঘরে হয়তো তৃতীয় পক্ষের একটি তরুণী বধূ আছে, কী তার ভবিষ্যৎ, কী তার পরিণাম ? হয়তো তার দেবরেরা তাকে পথে নামিয়ে দেবে, হয়তো তার মা-বাপ কেউ নেই—' ইত্যাদি। বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব এই ভাবে প্রতীতি নিচ্ছে জীবন থেকে—নিজের দর্শন ও অনুভূতি অনুযায়ী তাকে তাৎপর্যে মণ্ডিত করে তুলছে।

চেকভ একজন ভগ্ন-মেরুদণ্ড কেরানীকে দেখলেন, লিখলেন 'শ্রীপোকার কাহিনী' (Death of a Clerk)। আবার মোপাসাঁও 'একটি কেরানীর গল্প' (The Story of a Clerk) লিখেছেন। চেকভের গল্পটি আমরা পূর্বেই উদ্ধৃত করেছি। মোপাসাঁর গল্পে আছে—জনৈক দরিদ্র কেরানী আশা করে রয়েছে তার ধনবতী বৃদ্ধা শাশুড়ীর মৃত্যু হলে সে তার সম্পত্তির অধিকারী হবে। একদিন আশা পূর্ণ হল—সকালে দেখা গেল বৃদ্ধা মৃতা। কেরানী, তার স্ত্রী, শ্যালিকা প্রভৃতি মিলে যখন সব ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিয়েছে, তখন সুস্থ-স্বাভাবিক বুড়ী বিছানায় উঠে বসল। মরেনি—কোনো কারণে মৃতের মতো অচেতন হয়ে পড়ে ছিল মাত্র।

ভীরু, দুর্বল, ব্যক্তিত্বহীন কেরানী দুইয়েরই 'প্রতীতি' রূপে গৃহীত হয়েছে। একজন ব্যঙ্গের ভঙ্গিতে একটা সুগভীর ট্র্যাজিডির সৃষ্টি করেছেন, অপরজন নিষ্ঠুর পরিহাসের মধ্যে নির্বোধের ভূমিকায় কেরানীকে নামিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু প্রতীতিটি যেমনিই হোক, লেখক যখন তাকে প্রকাশ করেন তখন তা স্থান-কাল-পরিবেশের সংকীর্ণ সীমা থেকে বেরিয়ে এসে লেখকের জীবন-দর্শন অনুযায়ী বৃহত্তর সার্থকতার ভিতর মুক্তিলাভ করে ; তখন প্রতীতির ওই খণ্ডতাটুকুর মধ্যে এক সুবিশাল সত্য আভাসিত হয়ে যায়। একমুঠো উত্তপ্ত বালু যেমন সাহারার বার্তা বহন করে, তেমনি নব-তাৎপর্যমণ্ডিত একটি সাধারণ প্রতীতি গল্প-লেখকের কলমে কোনো সমগ্র সমাজ, কোনো জাতি, কোনো দেশ বা কোনো জীবন-সত্যকে বিপুলভাবে ব্যক্ত করে দেয়। তাই রবীন্দ্রনাথের কৈশোর-স্মৃতিতে বিধৃত সবরমতী নদীতীরের একটি পুরোনো

রাজপ্রাসাদ 'ক্ষুধিত পাষাণে'র অংকুর রচনা করে—ইতিহাস-স্বাক্ষরিত প্রাচীন প্রাসাদটি অপ্রাপণীয় সৌন্দর্যের প্রতি মানুষের তীব্রতম রোম্যাণ্টিক আকাঙ্ক্ষার প্রতীকী হয়ে ওঠে। মাঠে দড়ি বাঁধা একটি অনাদৃত বুড়ো ঘোড়াকে দেখে মোপাসাঁ জীবনের কী গভীর বেদনারই সন্ধান পান।

মার্কিনী ধনতান্ত্রিক সভ্যতা হচ্ছে নিছক একটি স্বর্ণ-মারীচ, তার আকর্ষণে জীবনারণ্যে যে হতভাগা ধাবমান হবে, তার অদৃষ্টে নির্ঘাত শোচনীয় অপমৃত্যু—লব্ধকীর্তি আধুনিক ঔপন্যাসিক জেম্স্ টি ফ্যারেল এই সিদ্ধান্তে পে'ছিোলেন। কল্পনা করা যাক, আমেরিকার একটি গ্রীক পত্রিকায় (ওখানে ও ধরণের বিভিন্ন জাতির পত্র-পত্রিকা আছে) ফ্যারেল একটি ছোট্ট সংবাদ পড়লেন। সে খবরে আছে, কোনো গ্রীক তরুণ ঐশ্বর্য লাভের আশায় আমেরিকায় এসেছিল। অমানুষিক পরিশ্রম করে কিছু অর্থও সে সংগ্রহ করেছিল, কিন্তু দেশে ফিরে গিয়ে সে মারা গেছে। ডাক্তারেরা বলেছেন, অতিরিক্ত শারীরিক শ্রমই তার অকাল-মৃত্যুর কারণ।

মাত্র এই খবরটুকু থেকে হয়তো একটি প্রতীতি এল ফ্যারেলের মনে। তার 'মার্কিনী জীবনের সুযোগ-সুবিধা' (The Benifits of American Life) হয়তো এই উপকরণ থেকেই জাত।

গল্পটি সংক্ষেপে এই :

"গ্রীস থেকে টাকিস্ নামে একটি কিশোর একদা চলে এল আমেরিকায়। স্কাই-স্ক্রেপারের দেশে যে আসে সে-ই কোটিপতি হয়—এ খবর তার জানা। তার দেশের অনেকেই এসে আমেরিকায় স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছে—সে শুনেছিল তাদের কেউ রকফেলারের কাছাকাছি এসেছে, কেউবা হেন্রি ফোর্ডের।

প্রথম ধাক্কাটা লাগল পা দিতে না দিতেই। তার দেশী মানুষেরা কেউই তো কোটিপতি হয়নি! অধিকাংশেরই হোটেলের ওয়েটারগিরি কিংবা বাবুর্চির চাকরি পর্যন্তই দৌড়। বড়ো জোর কারো একটা সামান্য ব্যবসা আছে—কেউবা একটা ছোট্ট গ্রীক পত্রিকা চালায়। ব্যাস্, ঐ পর্যন্তই।

টাকিস্ও অনেক ঘোরাঘুরির পরে এসে চাকরি পেলো একটা হোটেলে। বিরাট হোটেল—অতি আধুনিক আরাম-বিরামের সব ব্যবস্থাই আছে সেখানে। কিন্তু রান্নাঘরের প্লেট্ ধোয়াই যার চাকরি—তার জন্যে কী আর বিশেষ বন্দোবস্ত হবে? টাকিস্কে খেতে হয় সামান্য ঠাণ্ডা খাবার, শুতে হয় নিচুতলায় কন্কনে ন্যাড়া মেজের উপর। মাইনে যা পায় তাতে প্রাণধারণ করাই শক্ত।

কিন্তু ঐশ্বর্যের স্বপ্ন তার চোখ থেকে মুছে যায়নি। প্রত্যেক দিন মন্ত্রের মতো টাকিস্ জপ করে : বড়োলোক তাকে হতেই হবে।

নিজেকে বঞ্চনা করে—সব শারীরিক নিগ্রহ সয়ে সে সঞ্চয় আরম্ভ করে। অথচ ক'টাই বা টাকা? বছরের শেষে হয়তো পঞ্চাশটা ডলারও দাঁড়ায় না। এভাবে চলতে থাকলে সারাজীবন ভরে স্কাই-স্ক্রেপার কেন, একটা গ্যারাজও বোধ হয় সে তৈরি করতে পারবে না।

টাকিস্ ভেবে দেখল, উন্নতি করতে গেলে বিবিধ গুণাবলী চাই। এমনিতেই তো রকফেলার হওয়া যায় না। ঠিক করল সে নাচ শিখবে। আমেরিকা সমঝদারের দেশ,

গ্ণীর কদর আছে এখানে।

নাচ তো শিখবে—কিন্তু 'কালো' গ্রীককে কে পাত্তা দেয়? (জিউস-আফ্রোদিতের দেশের মানুষও 'কালো'? মার্কিনী বর্ণ-গরিমার মহিমা আছে!) টাকিস্ কোথাও ঢুকতেই পারল না। যেখানে তার মতো হরিজনদের জন্যে সুযোগ আছে, সেখানেও এত বেশি খরচ যে সে তার হাতের বাইরে—'উদ্বাহুরিব বামনঃ'।

শেষ পর্যন্ত একটা নাচের স্কুলে সুযোগ পেলো অল্প খরচে। অর্থ-সামর্থ্য অনুযায়ী নৃত্যসঙ্গিনী জুটল একটি তৃতীয় শ্রেণীর কদাকার মেয়ে। তা হোক, তবু তো নাচ শেখা হচ্ছে।

নাচ একরকম শেখাও হল। অথচ এদিকে জমানো টাকা সব খরচ হয়ে গেছে। এখন রোজগার করা দরকার। কিন্তু কী ভাবে? সমস্যায় যখন টাকিস্ জর্জরিত, তখন পথে আসতে আসতে তার চোখে পড়ল—এক জায়গায় লেখা রয়েছে—'ম্যারাথন ড্যান্স'।

গ্রীক নাম—গ্রীক নাচ। টাকিসের মন দুলে উঠল। পড়ে দেখল, একটি প্রতিযোগিতার বিজ্ঞপ্তি। জোড়া বেঁধে নাচতে হবে অবিশ্রাম। যে-জোড়া একবারও না থেমে সবচাইতে বেশিক্ষণ নাচতে পারবে, তারা পাবে হাজার ডলার, যারা দ্বিতীয় হবে, তারা পাবে পাঁচশো।

টাকিস্ সুযোগ ছাড়ল না। সেই কুরূপা সঙ্গিনীটিকে নিয়েই নাচতে নামল।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবিরাম নাচ চলে। কেউবা অজ্ঞান হয়ে পড়ে—অবিচ্ছিন্ন শরীর-সান্নিধ্যে কখনো জেগে ওঠে বাসনাবিকার, কারো কারো মধ্যে উন্মত্ততার লক্ষণও প্রকাশ পায়। শেষ পর্যন্ত টিঁকে রইল দু'জোড়া—তাদের একজোড়া টাকিস্ এবং তার সঙ্গিনী। অবশেষে মেয়েটি ক্লান্ত হয়ে পড়ে যাওয়ায় টাকিসেরা পেলো দ্বিতীয় পুরস্কার।

পাঁচশো ডলার! তাই বা মন্দ কি? টাকিসের মাথায় আগুন জ্বলল। রাতদিন শুধু সে খুঁজে বেড়াতে লাগল, কোথায় কোথায় ম্যারাথন নাচের প্রতিযোগিতা হচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত এইবারে সত্যিই বড়লোক হওয়ার উপায় পাওয়া গেছে মনে হচ্ছে। টাকিস্ আর সঙ্গিনী দরিদ্রা মেয়েটি জুড়ি বেঁধে একটার পর একটা ম্যারাথন নাচে সমানে যোগ দিয়ে যায়। প্রায়ই প্রথম হয় তারা—হাজার হাজার ডলার আসতে থাকে হাতে।

জমল—প্রায় বিশ হাজার ডলার জমল। রকফেলারের কাছাকাছি—সন্দেহ কী! নিজের ঐশ্বর্যের গর্বে পুলকিত চিত্তে টাকিস্ তখন দেশে বেড়াতে গেল। সবাইকে দেখাবে, আমেরিকা থেকে সত্যিই সে বড়লোক হয়ে এসেছে।

কিন্তু—"

এই 'কিন্তু'র পরে মাত্র একটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদে দীর্ঘ গল্পটি শেষ করেছেন ফ্যারেল।

"দেশে ফিরে গিয়ে তার যক্ষ্মা হল। দিনের পর দিন আধপেটা খাওয়া, ঠাণ্ডা মেজেতে ঘুমোনো, অবিচ্ছিন্ন নেচে বেড়ানোর অস্বাভাবিক শ্রম—এগুলোর অনিবার্য প্রতিক্রিয়া ঘটল তার উপরে। চিকিৎসা আরম্ভ হল এবং কিছুদিনের মধ্যেই বিশ

হাজার ডলার নিঃশেষিত হল। টাকিস্‌ যখন মারা গেল, তখন সে কপর্দকহীন—নিজের 'কফিনে'র সংস্থানও তার ছিল না।"

একটি সংক্ষিপ্ত সংবাদ বা অনুরূপ একটি সামান্য প্রতীতি অবলম্বন করে ফ্যারেল যে গল্পটি লিখলেন—তার প্রতীকের কৌশলে বিন্দুতে আমরা সিন্ধুর তরঙ্গধ্বনি শুনতে পেলাম। মার্কিন ডলারের আলেয়ার পিছনে ছুটলে কী নিদারুণ ট্র্যাজিডি যে ঘটতে পারে এটি তারই কাহিনী। এ কাহিনী ব্যক্তিমুখ্যও নয়; এ যেন সাম্প্রতিক যুগের স্বর্ণ-শিকারী মানুষের শোচনীয় পরিণতিরই ভয়ংকর ইঙ্গিত—সমকালীন ইতিহাস। পৃথিবীর নারী-পুরুষেরা জোড়া বেঁধে অর্থলোভে এই মরণ-নৃত্যে যোগ দিয়েছে; এ ম্যারাথন নাচ নয়—'ট্যারান্টুলা ড্যান্স্‌', আর এই নাচের তালে তালে সর্প-বিজড়িত বাঁশিটি বাজিয়ে চলেছে অজপাদ শয়তান স্বয়ং—'ম্যামন' যার নামান্তর। একটি দুরাকাঙ্ক্ষী গ্রীক তরুণের পরিণামের মধ্যে দিয়ে মাত্র আমেরিকাতেই নয়—দেশে দেশে ধনতান্ত্রিক সভ্যতার পিশাচ মূর্তিটি দেখা দিয়েছে।

আগাগোড়া গল্পটিতে বিন্যাসে, বাচনে, ইঙ্গিতে, সমাপ্তিতে 'প্রতীতির সমগ্রতা' (Unity of Impression) সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হয়েছে। আর এ থেকে লেখকের ব্যক্তিত্বের স্বরূপটিও আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হচ্ছে।

প্রতীতির গ্রহণে এবং শিল্পরূপে তার পরিবেষণে ব্যক্তিত্বের কথা আমরা কিছু বলেছি। তবু আরো একটু স্পষ্টভাবে বোঝা যাক। ছোট গল্পের উদ্ধৃত সংজ্ঞাগুলিতে এক জায়গায় আমরা দেখেছি যে এর মধ্যে লেখক তাঁর ব্যক্তিত্বকে সম্প্রসারিত ও প্রতি-ফলিত করবার সুযোগ নেন। ছোট গল্প হচ্ছে গল্পকারের "Perfect opportunity to project himself"। কথাটির ব্যাপক দার্শনিক অর্থ আছে।

আসলে প্রত্যেকটি গল্পের নায়ক-নায়িকা বা পার্শ্বচরিত্র—লেখকেরই বহুরূপী অভিব্যক্তি ছাড়া কিছু নয়। আমরা প্রত্যেকেই নিজেদের মধ্যে সংখ্যাতীত সত্তাকে পরিবহন করে চলেছি। আমাদেরই রোম্যান্টিকতার তাড়নায় আমরা কোনো সুমধুর প্রেমকাহিনীর নায়ক হয়ে উঠি, আমাদের ভিতরে যে আদিম জিঘাংসা অবদমনের গুহায় নিহিত—সে-ই ঘাতক নায়ক হয়ে জন্ম নেয়, আমাদের দোলাচল-চিত্ততা থেকেই বেরিয়ে আসে বিমূঢ় দার্শনিক প্রিন্স্‌ হ্যামলেট: 'To be or not to be that's the question!' আর এই প্রতিটি চরিত্রের সঙ্গে যদি আমরা অভিন্নচেত না হতে পারি, তা হলে কিছুতেই তাদের মধ্যে প্রাণসঞ্চার ঘটবে না। রচনার বহিরঙ্গে শান্ত নৈর্ব্যক্তিকতা, অথচ অন্তরঙ্গে ব্যক্তিত্বের চরম প্রক্ষেপ, কথাসাহিত্যের আসল কৌতুকটি এখানেই।

প্রত্যেক লেখক (প্রত্যেক মানুষও) নিজের মধ্যে অগণিত সত্তা (Multi-perso-nality)-কে বহন করেন। তাই বলে যে-কোনো লেখকই যে-কোনো রকমের গল্প লিখতে পারেন না। তাঁর মূল ব্যক্তিত্ব কঠিন হাতে সহস্র অশ্বের মতো সহস্র সত্তার বল্গা ধারণ করে রেখেছে, একটা নির্দিষ্ট সীমার বাইরে তাদের ছুটে যাওয়ার উপায় নেই। রোম্যান্টিক গল্প গী দ্য মোপাসাঁ লিখেছেন, আল্‌ফঁস্‌ দোদেও লিখেছেন—কিন্তু অন্তর-বাইরের যন্ত্রণায় জর্জরিত প্যারিসিয়ান মোপাসাঁ কিছুতেই প্রকৃতির সৌন্দর্য-মুগ্ধ দোদে হতে পারবেন না। কৃষকের জীবনকে আশ্রয় করে একই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে লিখেছেন লিও তলস্তয় এবং মাক্‌সিম্‌ গোর্কী। কিন্তু ভক্ত তলস্তয় আর 'তিক্ত'

গোর্কীর মানসগত পার্থক্য মুহূর্তেই দৃষ্টিগোচর হবে।

সুতরাং একজন লেখক যত চরিত্র এবং যা-কিছু ঘটনারই আবিষ্কার করুন না— তার প্রতিটি চরিত্র তাঁরই নিজস্ব বর্ণে রঞ্জিত হয়ে থাকবে, তাঁর প্রতিটি ঘটনাকেই দেখা হবে একান্ত তাঁরই দৃষ্টিকোণ, perspective থেকে। উপমা দিয়ে বলা যায়, একজন অভিনেতা রঙ্গমঞ্চে সামাজিক, ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক নাটকে বিভিন্ন রূপসজ্জায় অভিনয় করতে পারেন, কিন্তু তাঁর মৌল ব্যক্তিত্বটি অব্যাহতই থেকে যাবে, তা ধরা পড়বে তাঁর চরিত্রের অর্থ-নিরূপণে (Interpretation-এ), বাচনভঙ্গিতে এবং নিজস্ব কতকগুলি শিল্পকৌশলে। 'লন চ্যানী' নামে বিখ্যাত অভিনেতাকে "Thousand-faced" বলা হত—কিন্তু তাঁর সহস্রমুখের মধ্যেও একটি মুখ অবিকৃত থাকত—সেটি হল ব্যক্তি লন চ্যানীর।

অনুরূপভাবে শিল্পী-সাহিত্যিকেরও যাবতীয় বিভিন্নমুখী সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে বস্তু-নির্বাচনে এবং পরিবেষণের পদ্ধতিতে তাঁর এই মৌল ব্যক্তিত্বটিই নিয়ন্তা শক্তিরূপে দাঁড়িয়ে থাকবে ; এই সহস্র বল্গাধারী বিচিত্র রথ ব্যক্তিত্বকে জানলেই আমরা বুঝতে পারব, কোন্ লেখকের কলমে প্রেমের গল্প কিভাবে রূপায়িত হবে, কোনো রাষ্ট্রিক আন্দোলন তাঁর কাছে কী অর্থ বহন করবে—কোনো মৃত্যু তাঁর জীবন-দর্শনে কিভাবে অনুরঞ্জিত হবে। কাহিনীর নায়ক, সেই নায়কের পরিক্রমাক্ষেত্র এবং তার পরিণাম—সবই শেষ পর্যন্ত নির্ধারণ করবে সেই রশ্মিগ্রাহী অধিনায়কটি। আমাদের আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দিকেই দৃষ্টিপাত করা যাক। দক্ষিণ কলকাতা-চিত্ত অভিজাতমনন বুদ্ধদেব বসু তাঁর প্রেমের গল্পে একটি বিদগ্ধ আবেশ সঞ্চার করবেন—তাঁর নায়িকার হাসি 'মোনা লিসা'র সঙ্গে একাকার হয়ে যাবে ; আবার মনোজ বসুর প্রেমের গল্প স্ফূর্তি পাবে 'রাত্রির রোমান্সে'—পল্লী-বাংলার কৌতুকোচ্ছ্বসিত একটি স্নিগ্ধ দাম্পত্য-জীবনের যূথিকা-গন্ধ এক ঝলক সিক্ত বাতাসে আমাদের সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়বে।

মূল ব্যক্তিত্ব থেকে নির্বাচন এবং বিন্যাস কিভাবে ঘটে, প্রতীতি-প্রসঙ্গে চেকভ আর মোপাসাঁর দৃষ্টান্তে আমরা তার আভাস দিয়েছি। বাংলা সাহিত্য থেকে দুটি স্মরণীয় গল্প অবলম্বন করে আর একটু বোঝবার চেষ্টা করা যাক।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় দু'জনেই সমসাময়িক শিল্পী। গৃহপালিত প্রাণীকে নিয়ে এঁরা দুজনেই দুটি বিখ্যাত গল্প লিখেছেন। একটি 'মহেশ', অপরটি 'আদরিণী'।

শরৎচন্দ্র স্পষ্টতই একটি সংকল্প, একটি সবিশেষ বক্তব্য নিয়ে আসরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আমাদের প্রায়-মধ্যযুগীয় উচ্চবর্ণ-শাসিত পল্লীসমাজ, তার জীর্ণ ক্রমক্ষয়ী রূপ, তার কুসংস্কার-তমসাচ্ছন্ন নির্মমতা, তার চিত্তদৈন্যজাত সংকীর্ণতা এবং সর্বাঙ্গীণ বিমূঢ়তাকে নগ্নভাবে প্রকাশ করা তাঁর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ইংরেজি সমালোচনার পরিভাষায় তাঁর অধিকাংশ রচনাই ছিল 'unmasking theme'-এর, অনাবৃতিমূলকতার।

অন্যদিকে প্রভাতকুমার মুখ্যত জীবনের লঘু অংশের শিল্পী। তাঁর প্রধানাংশ রচনাই রঙ্গমূলক ; মানুষের ভুলভ্রান্তি, নির্বুদ্ধিতা আর অহমিকাকে অসঙ্গত পরিবেশের মধ্যে ফেলে উচ্চ হাসি সৃষ্টি করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তাই দু-একটি ব্যতিক্রমকে

বাদ দিলে তাঁর গল্প সাধারণভাবে জনরঞ্জক ও বহির্মুখ। তাঁর চরিত্রগুলিও স্বয়ং-সম্পূর্ণ—তাদের মধ্যে প্রতীকী-সত্যের বিশেষ কোনো সামগ্রিক উন্মীলন পাওয়া যায় না।

সমাজ-সচেতন কথাকার শরৎচন্দ্র 'মহেশ' গল্পে যে বেদনার রূপটি ফুটিয়েছেন, তা মাত্র গফুর জোলার একটি নিদারুণ কাহিনীই নয়, গফুর এবং মহেশ যৌথভাবে বাংলা দেশের দরিদ্র ক্ষেত-মজুর সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ প্রতিনিধি। সমাজের উচ্চমঞ্চে অধিষ্ঠিত মানুষগুলি কেমন করে এই নিরুপায় সম্প্রদায়টিকে বীভৎসভাবে পীড়িত ও নির্যাতিত করে—তার একটি সমগ্র বর্ণনা এই গল্পে পাওয়া যায়। বর্ণগর্বিত সমাজ-পতিরা যখন নির্দয়তা, লোভ আর হিংস্রতার এক-একটি বর্বর উদাহরণ, তখন পালিত বৃদ্ধ বলদ 'মহেশে'র প্রতি গফুরের অপত্যস্নেহ, তার দয়া, তার চরিত্রমাধুর্য বাংলা দেশের এই দরিদ্র জনগণের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ করে তোলে—সেই সঙ্গে উচ্চ সম্প্রদায়ের প্রতি ক্ষোভে আর ঘৃণায় মন পূর্ণ হয়ে ওঠে।

'আদরিণী' গল্পে জয়রাম মুখুজ্জের হাতী কেনা, শেষে অভাবে পড়ে তাকে বিক্রীর চেষ্টা এবং আদরিণী ও জয়রামের পরিণাম একটি অশ্রুপূর্ণ বিষাদ পাঠকের মনে সঞ্চার করে। কিন্তু সূচনাতেই যখন দেখা যায় হাতী কেনার অন্তরালে জয়রামের প্রবল একটি অহংবোধ বিদ্যমান, গল্পের আবেদনটি তখনই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে—এর ব্যথা-বেদনা সমস্তই ব্যক্তিগত হয়ে দাঁড়ায়। বলদ 'মহেশে'র চাইতে হস্তিনী 'আদরিণী' আয়তনে অনেক বিশাল হলেও শরৎচন্দ্রের গল্পের ট্র্যাজিক বিশালতা তার মধ্যে পাওয়া যায় না। 'আদরিণী'র ক্ষেত্রটি ছোট—তার বেদনাও সংকীর্ণ।

'মহেশ' আর 'আদরিণী'র আসল পার্থক্য রয়েছে লেখকদ্বয়ের ব্যক্তিত্বের মধ্যে। শরৎচন্দ্র সমাজ-জীবনের শিল্পী, প্রভাতকুমার পারিবারিক জীবনের; শরৎচন্দ্র "unmasking"-এর জন্য তৎপর—প্রভাতকুমার আত্মতৃপ্ত, নির্বিরোধ। সুতরাং শরৎচন্দ্র তাঁর গল্পে এনেছেন দেশের লাঞ্ছিত জনসাধারণের জ্বলন্ত অভিসম্পাত এবং প্রভাতকুমার এনে দিয়েছেন একটি পরিবারের অশ্রুবিন্দু। এই স্বতন্ত্রতা তাহলে গড়ে উঠেছে লেখকের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য অনুসারে: "In special distillation of the personality", "his counterpart" এবং "opportunity to project himself"।

কিংবা আর একটি তুলনা গ্রহণ করা যাক। রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' কিংবা মোপাসাঁর 'One Phase of love'—ভাবের দিক থেকে অভিন্ন। রবীন্দ্রনাথের গল্পটি নির্জন বিলাস-প্রাসাদ, শুস্তার নীলজল, পাহাড় থেকে মৌরির ঘনগন্ধবাহী বাতাস—সব কিছু নিয়ে অতীত-প্রেমিক মানুষটির সামনে অপূর্ব স্বপ্ন-কল্পনা আর অশরীরী সঙ্গীতের ইন্দ্রজাল রচনা করে দিয়েছে; আর মোপাসাঁর গল্পটিতে ভিনিশীয় কিউরিয়ো থেকে পাওয়া একগুচ্ছ সোনালি চুলকে নিয়ে অসহ দুর্বাসনায় দগ্ধ হতে হতে নায়ক পরিশেষে উন্মাদাগারে আশ্রয় নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গল্পে মেহের আলীর 'সব ঝুট্ হ্যায়' এই সত্যটিই প্রকাশ করে—রোম্যান্টিকতার স্বপ্নযুগ আর ফিরে আসবে না। অথচ মোপাসাঁর গল্পের ফলশ্রুতি হচ্ছে: 'মানুষের চরিত্র কী বিচিত্র!' গল্পের শেষে ডাক্তার বলেছেন, "The mind of man is capable of anything!"

দূরাভিসারী বাংলা দেশের কবি আর প্যারিসিয়ান গল্প-লেখকের মধ্যে পার্থক্য

আপনা থেকেই ধরা দিয়েছে।

গল্পে 'প্রতীতির সমগ্রতা' রক্ষার প্রধান দায়িত্ব হল স্টাইলের ; ভালো স্টাইল না হলে ভালো গল্প লেখা হতেই পারে না।

এই 'স্টাইল' বা রচনা-শৈলী বলতে ঠিক কী বস্তুটি বোঝায় ? রবীন্দ্রনাথ 'অনুকৃত ফ্যাশান' আর 'মৌলিক স্টাইলে'র পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন : প্রথমটি হল মুখোশ—বেমানান প্রসাধন, অপরটি মুখশ্রী—সহজাত লাবণ্য।

মানুষের শরীরে লাবণ্য কোথায় আছে ? কোনো বিশেষ অঙ্গের উপরে তা অবস্থান করছে না। সমগ্র শারীর-সংস্থান মিলিয়ে, তার ওপর চরিত্রের দীপ্তিটি প্রতিফলিত হয়ে —যে একটি সুষমা, একটি ছন্দ বিকশিত হয়ে উঠেছে—তাকেই বলা হচ্ছে লাবণ্য। ভালো স্টাইলের রীতিও এই। তা ভাষার কারুত্বে নেই, বর্ণনার বৈচিত্র্যে নেই, শব্দের অভিনবত্বে নেই, প্লটের চাতুর্যেও নেই—আছে তার সমগ্রতার মধ্যে।

ফরাসী মতে, স্টাইল হল এক কথায় "Good writing" ; কিন্তু "ভালো লেখা" আমরা কাকে বলি ? ভাষাজ্ঞানহীন বা সাহিত্য-স্বাদবর্জিত রচনার প্রসঙ্গ তুলব না, কারণ সেক্ষেত্রে লেখক তাঁর প্রাথমিক পরীক্ষাতেই অনুত্তীর্ণ। "ভালো লেখা" হল সামগ্রিক লাবণ্যময়তা, সৌষম্যে উজ্জ্বল, সুছন্দে সুমিত।

এই লাবণ্য কার ? ব্যক্তিত্বের। তা অন্যে সঞ্চার করা যায় না। তা বিশিষ্ট— তা ঐকব্যক্তিক। লুকাস্ (F. L. Lucas) বলেছেন, এ হল "Personality clothed in words".

রচনার মধ্যে একটি সাহিত্যিক সাফল্য স্বাভাবিক ভাবেই থাকবে—তা একেবারে প্রথম কথা। অতঃপর দ্রষ্টব্য—সমগ্র সৃষ্টিটির সুসামঞ্জস্যের মধ্যে স্রষ্টার নিজত্বের বিশিষ্ট সুষমাটি বিকশিত হয়ে উঠেছে কিনা। সেইজন্য দৈহিক শ্রীর মতো প্রতিটি স্রষ্টার স্টাইলই তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব—তাকে অন্যের মধ্যে আরোপ করা যায় না। হালের জনৈক মার্কিন সমালোচক দুঃখ করেছেন, হেমিংওয়ের অনুসরণে অসংখ্য গল্প লেখা হচ্ছে, কিন্তু দ্বিতীয় হেমিংওয়ে আর তৈরী হচ্ছে না :

"The imitators then, are adapting the devices that Hamingway has found effective for what he has to say and superimposing those devices upon what they have to say (frequently very little) ; and the interest of such technical finagling is primarily statistical : How many Hemingway Stories were written last year by writers other than Hemingway ?" [১]

অনুকরণের পরিণামই এই। তা মূলের মতো হতে পারে না—হওয়া সম্ভবই নয়। হেমিংওয়ের চাইতে খারাপ লেখা হবে, হেমিংওয়ের চেয়ে নিশ্চয় ভালো লেখাও হবে, কিন্তু হেমিংওয়ের মতো লেখা আর হবে না। কারণ হেমিংওয়ের স্টাইল ভাষায় নেই, বক্তব্যে নেই—যেমন হেন্‌রি জেম্‌সের আলোচনায় দেখেছি, তা আছে ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের ভিতর ; আর সে বস্তু অননুকরণীয়। লেখকের জীবন-সম্পর্কিত বোধি,

১। Contemporary Short Stories, Intr. P—VIII, Maurice Baudin

তাঁর প্রতীতি-আহরণ, প্রকাশ-উপকরণ (Expressive Symbols), তাঁর সিদ্ধান্ত—এরা সব মিলেই স্টাইলের পূর্ণতা। হার্বার্ট রীডের মতে স্টাইলের শেষ কথা : Unity—সামগ্রিক ঐক্য।

উদাহরণ দিলে স্পষ্ট হবে। বাংলা সাহিত্যেই তারাশঙ্করের "ইমারত' গল্পটি স্মরণ করুন। রাজমিস্ত্রী জনাব শেখের কাহিনী এটি। গল্পটিকে লেখক প্রথম থেকেই এমনভাবে বেঁধে নিয়েছেন যে একজন রাজমিস্ত্রীর চোখ দিয়েই জীবন-জগৎ পাপ-পুণ্য সব কিছু নির্ধারিত হচ্ছে। এমন কি জনাবের শারীরিক বর্ণনা পর্যন্ত রাজমিস্ত্রীর পরিভাষায় :

"মাঝখানে চেরা সিঁথিটি তার ওলংয়ের সুতোয় পাকানো সরু দড়িটির মতো সাদা এবং সোজা, বাবরী-কাটা সাদা চুলগুলি পরিপাটি করে আঁচড়ানো, কর্নিক দিয়ে মাজা পংখের পলেস্তারার মতো চকমক করছে। ঘাড়ের চুলগুলির প্রান্তভাগ সযত্নে কেটে নিচে থেকে ঘাড়টা কামিয়ে ফেলেছে, গোল থামের মাথায় বেড় দেওয়া কার্নিসের বিটের মতো—সবচেয়ে পাতলা কর্নিক দিয়ে দড়ি ধরে কাটা হয়েছে যেন।"

এই রূপ বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে গল্পের নায়কের চরিত্রটি বাঁধা পড়ে গেছে—তার যা কিছু শুভাশুভবোধ, যে কোনো অনুভূতি ওই বিশিষ্ট জীবন-বৃত্তের দ্বারাই বেষ্টিত হয়েছে। একখানা অযত্নের গড়া একতলা দালানকে দেখে তার মনে হচ্ছে : "আরে আসলে মানুষের গাঁথনি তো হাড়ের, গাছের ভিতরটা তো কাঠ, হাড়ের কাঠামোর উপর মাংস লাগিয়ে পংখের কাজের পলেস্তারার মতো চামড়া দিলে তবে না সে মানুষ, গাছের গায়ে বাকল না হলে সে কি গাছ ?"

আর গল্পের শেষ পরিণতিতে একটি বর্ষার দিনে জনাবের কৃত-অকৃত আনন্দ-বাসনার রূপটি এই :

"ঝপঝপ করে বৃষ্টি নেমে আসছে।

আসুক।

জনাব তাকালে মাথার উপরে—বুড়া বটগাছের পাতায় পাতায় ঢাকা গোল গম্বুজের মতো মাথার দিকে। খোদাতালার নিজের হাতে গড়া ইমারত।

সব ঝাপসা হয়ে গিয়েছে—এটুকু ছাড়া।"

একটু বিস্তৃত ভাবেই উদ্ধৃতিটি দিলাম। কিন্তু এ থেকে তারাশঙ্করের "শব্দমূর্তি ব্যক্তিত্ব"টি আমাদের সামনে উপস্থিত হল। তিনি আমাদের অপরিচিত অতি-সাধারণ প্রতিবেশীদের অন্তরঙ্গভাবে জানেন, তাদের চিত্রণে তিনি নিখুঁত রূপকার ; এই মানুষ-গুলির সঙ্গে যেমন তাঁর আত্মিক সহযোগ, তেমনি নিবিড় মমতার সম্বন্ধ। তার ফলে অনুভূতির সত্যতায় ও কলারীতির বাস্তবতায় গল্পটি যেন ছন্দে বাঁধা পড়েছে। উত্তর-কালে তারাশংকরের জীবনবোধ শান্তি ও ভক্তির মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে—জনাবের পরিণামে লেখকের সেই ব্যক্তি-সত্তাটিও অভিব্যক্ত।

আমরা বলব, গল্পটি সার্থক। কারণ এর স্টাইলটি নিখুঁত। এই স্টাইলগত পরিপূর্ণতা এসেছে বস্তু-নির্বাচনে, বিন্যাসে, ভাষা-কৌশলে, সিদ্ধান্তে এবং সর্বাত্মক সামঞ্জস্যে।

ছোট গল্পে 'প্রতীতির সমগ্রতা' এই স্টাইলের বন্ধনেই নিবন্ধ। ভাষার সঙ্গে যেখানে

কাহিনী মিলছে না, বক্তব্যের সঙ্গে যেখানে বিন্যাসের পার্থক্য ঘটছে, সেইখানেই দুর্বলতা—গল্পের দীনতা।

হেমিংওয়েকে যাঁরা নকল করেন, তাঁরা পরের লাবণ্য চুরি করে রূপবান হতে চান, এবং সে অসম্ভব সম্ভব হয় না। হয় ভাষা কৃত্রিম, নয় অনুভূতি কৃত্রিম, নইলে প্রতীকটিকে জোর করে টেনে আনা। লেখকের নিজত্বকে তাঁর গল্পের মধ্য দিয়ে উজ্জ্বল ভাবে উদ্ভাসিত করে তুলতে পারলে তবেই সাফল্যের দাবি।

এ যুগের গল্পে অনেক সময় ভাষার কারুকৃতিকেই স্টাইল নামে চিহ্নিত করা হয়—বাচনের চমৎকারিত্বে কখনো কখনো তা বাহবাও পায়। কিন্তু গল্পের বিচারে বহিরাঙ্গিক আপাতত-চাতুর্যকেই যাতে আমরা স্টাইল বলে ভ্রম না করি, সেই কারণেই এই কয়েকটি কথা স্মরণ করতে হল। অনেক মুখশ্রীহীন গল্পই একালে মুখোশ এঁটে আসরে নেমেছে—যে-কোনো মাসিক পত্রের পাতা খুললেই তা চোখে পড়বে।

ছোট গল্পের আত্মা ও রূপ বিচারের প্রধান সূত্রগুলিকে আমরা আবার স্মরণ করছি :

(১) ছোট গল্পে 'প্রতীতির সমগ্রতা' (Unity of Impression) অবশ্য রক্ষণীয়।

(২) ছোট গল্পে একটিমাত্র বস্তুকেই একমুখী ভাবে পাওয়া যাবে, পার্শ্ব উপকরণগুলি সে একমুখিতার আনুকূল্য করবে—অন্তরায় ঘটাবে না।

(৩) একটিমাত্র 'মহা মুহূর্ত' বা 'চরম ক্ষণ' (climax) থাকবে—গল্পের সমগ্র উৎকণ্ঠা (suspense) তার উপরেই নিবন্ধ হবে।

(৪) জীবনের চলস্রোত থেকে গল্পকার যে সমস্ত খণ্ড খণ্ড 'প্রতীতি' আহরণ করবেন—তারাই হবে ছোট গল্পের প্রাণবীজ।

(৫) এই প্রাণবীজটি গল্পরূপে পল্লবিত হবে ব্যক্তিত্বের মৃত্তিকায়। প্রত্যেকটি ছোট গল্পেই লেখকের ব্যক্তিসত্তা নিজেকে সম্প্রসারিত করবে—তাঁর দেশ, কাল, চরিত্র ও মানসিকতা অনুযায়ী তিনি 'প্রতীতি'র উপযোগী প্রতীক (Expressive symbol) এবং তার রসভাষ্য রচনা করবেন। তাঁর নিজস্ব স্টাইলটিও সেই ব্যক্তিত্বেরই রূপ।

(৬) স্বল্পতম ব্যাপ্তির মধ্যে ছোট গল্প বৃহত্তম সত্যকে প্রতিফলিত করবে।

আধুনিক ছোট গল্পের রূপ-নির্মিতি প্রসঙ্গে আর একটি কথা না বললে আলোচনা সম্পূর্ণ হবে না। সে হল তার সমাপ্তি।

পাঠকের মনে বাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়াটি সৃষ্টি করবার জন্য গল্প-লেখকেরা সাধারণতঃ দুটি উপায়ে পূর্ণচ্ছেদ টানেন। গল্পের শেষে একটা অপ্রত্যাশিত চমক দিয়ে পাঠককে স্তম্ভিত করে দেওয়া একটি প্রিয় ও প্রাচীন পদ্ধতি। চলতি পরিভাষায় এর নাম "Whipcrack ending"—'চাবুক-হাঁকড়ানো' সমাপ্তি। 'ম্যাগাজিনিস্ট' লেখকেরা কেউ কেউ এই উপায়েই পত্রিকার পাতায় পাঠকচিত্ত জয় করতে চেয়েছিলেন। পো, মোপাসাঁ এবং ও. হেনরি এই জাতীয় সমাপ্তির পক্ষপাতী। বিশেষ করে ও. হেনরি এ ব্যাপারে সম্রাট—তাঁর গল্পে শুধু 'whipcrack'ই নেই—আছে 'kick' এবং সেই জন্যেই সমালোচকেরা রাগ করে বলেছেন—"তিনি যেন মদের আসরে হঠাৎ উঠে এসে গায়ে একটা প্রচণ্ড চাপড় বসিয়ে অট্টহাসি শুরু করে দেন।" অতখানি বাড়াবাড়ি না করলেও মোপাসাঁর গল্পে এ-রকম চমক প্রায়শঃ লভ্য। তাঁর 'La Parure' গল্পে একটি

মুক্তোর মালা হারানোর জন্য কী নিষ্ঠুর মূল্যই দিতে হল দরিদ্র পরিবারটিকে! অথচ গল্পের শেষে যখন জানা গেল, হারানো মালাটি আসলে ঝুটো মুক্তোর ছিল, তখন তার চমক আমাদের বিমূঢ় করে দেয়। এইসব গল্পের উদ্দেশ্য হল, সর্বশেষে একটা আকস্মিক আঘাত দিয়ে পাঠকের মনে ক্ষতচিহ্নের মতো কোনো স্থায়ী প্রভাব অঙ্কিত করা।

আর একদল আছেন, যাঁরা এই চমককে পছন্দ করেন না। এঁদের মধ্যে আছেন চেকভ, আছেন হেন্‌রি জেম্‌স। দিনের শেষে যেমন ধীরে ধীরে বিকেলের ছায়া বিকীর্ণ হয়ে পড়ে, এঁরা গল্পের ভিতর সেই ধীর স্বাভাবিক পরিণামকেই আনবার পক্ষপাতী। চমক লাগানো গল্প-সমাপ্তিকে এঁরা উঁচুদরের শিল্প-কৌশল বলে স্বীকৃতি দিতে রাজী নন। চেকভের একটি রোম্যান্টিক্ গল্পকে অবলম্বন করে এঁদের রীতিটিকে বোঝা যেতে পারে।

গল্পটির নাম 'চুম্বন' (The Kiss)। চেকভের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি এটি। সারাংশ বলে নিলে এর আসল সৌন্দর্যটি অনুভব করা যাবে :

"জেনারেল ফন রাবেকের বাড়ীতে সান্ধ্য-ভোজে একদল সামরিক অফিসার নিমন্ত্রিত হন। এই দলের অন্যতম রিয়াবোভিচ ছিল কুদর্শন ও অসামাজিক। নিজের ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন রিয়াবোভিচ ভোজনের আসরে নিজেকে ঠিক মেলাতে পারছিল না—না আলাপে, না নাচে, না বিলিয়ার্ড রুমে। শেষে একা ঘুরতে ঘুরতে সে ভ্রমক্রমে একটি অন্ধকার ঘরে ঢুকে পড়ে—তৎক্ষণাৎ কে ছুটে আসে তার কাছে—'At last' বলে তাকে চুম্বন করে, পরক্ষণেই নিজের ভ্রান্তি বুঝতে পেরে পালিয়ে যায়। সেই অস্পষ্ট ছায়া-মূর্তি, সেই অদেখা মেয়েটির ক্ষণস্পর্শ রিয়াবোভিচের মনে এক অপূর্ব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কে এই রহস্যময়ী, আবার কবে তার সঙ্গে দেখা হবে—এই ভাবনা এবং অসম্ভব একটি দুরাশা তাকে পেয়ে বসে। দীর্ঘদিনের এই মোহাচ্ছন্নতা এবং বাসনা-বিলাসের অবসান ঘটে, যখন সে একদিন রাত্রে রাবেকের বাড়ীর পাশের অন্ধকার নদীটির ধারে গিয়ে দাঁড়ায় :

"The water flew past him, whiter and why no one knew. It had flown past in May. From a little stream it had poured into a great river, then into the sea; from the sea it had risen in mist, then came down in rain, and now perhaps the water flowing past him was the very same he had seen in May. Why?

And the whole world and life seemed to Riabovitch to be one great, incomprehensible, senseless jest. He raised his eyes from the water and looked up in at the sky: once more how fate, in the form of an unknown woman, has unexpectedly caressed him: he recalled his dreams and images of the summer, and his life appeared to him so poor, wretched and colourless."

কী গভীর—কী বিপুল বিষণ্ণ ঔদাসীন্যে কাহিনীটি শেষ হয়েছে। অচেনা-অদেখা মেয়েটির ক্ষণস্পর্শের সেই মুহূর্তটি অবলম্বন করে অপরূপ করুণ সমাপ্তি রচিত হল।

যেন গল্পের পাঁপড়িগুলি আস্তে আস্তে দল মেলে দিলে। অনুভূতির অরুণালোকে নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত জীবন-সত্যের পদ্মটি একটির পর একটি পর্ণ প্রসারিত করে বিকশিত হয়ে উঠল ; কিন্তু এই উন্মীলনটি এত সুন্দর, এমন স্বাভাবিক যে আমাদের বিন্দুমাত্র চমক দিল না। অথচ চাবুকমারা সমাপ্তির চাইতে পাঠকের মনে এর প্রতিক্রিয়াটি যে লঘু হল, তাও নয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পোস্টমাস্টার' শেষ করে আনছেন এই ভাবে :

"যখন নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল, বর্ষাবিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মতো চারিদিকে ছলছল করিতে লাগিল, তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটি বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন—একটি সামান্য গ্রাম্যবালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল। একবার নেহাত ইচ্ছা হইল, 'ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড়বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি—' কিন্তু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে, বর্ষার স্রোত খরতর বেগে বহিতেছে, গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীকূলের শ্মশান দেখা দিয়াছে এবং নদীপ্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল, জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী ! পৃথিবীতে কে কাহার !"

এ গল্পে পূর্বাবধিই কোনো বিস্ময়ের অবকাশ নেই, পোস্টমাস্টার ছুটি পেলেই কলকাতায় ফিরে যাবেন—রতন তাঁর কেউ নয়, এ সবই আমরা জানি। কিন্তু সেই বিদায়ের মুহূর্তটিতে এই করুণ জীবন-সত্যের গোধূলি-বিস্তার, একটি ক্ষণ-নাট্যের অনিবার্য যবনিকাকে ধীরে ধীরে গল্পটির উপর নামিয়ে আনল।

আধুনিক গল্প-লেখকদের প্রধান আনুগত্য এখন চেকভের প্রতি। তাই বলে সকলেই চেকভপন্থা মেনে নেন নি। ইংল্যাণ্ডের সবচেয়ে জনপ্রিয় গল্পকার—মোপাসাঁর মন্ত্রশিষ্য সমারসেট মম এ সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি বলেন, There is nothing to be condemned in a suprise ending if it is the natural end of a short story, on the contrary it is an excellence." ১

অতএব সাম্প্রতিক গল্প-লেখকেরা সকলেই চেকভশিষ্য নন—তাঁদের কেউ কেউ গল্পের শেষে একটি স্বাভাবিক অথচ চমকপ্রদ নাটকীয়তা সৃষ্টি করতেও ভালোবাসেন। খ্যাতিমান ইভলিন ওয়া (Evelyn Waugh)-র একটি এই জাতীয় গল্পকে গ্রহণ করা যাক— "বেলা ফ্লিসের পার্টি" (Bella Fleace gave a Party)।

বেলা ফ্লিস্ তাঁর দীর্ঘ জীবনের শেষ পর্যায়ে একটিমাত্র পার্টির ব্যবস্থা করেছিলেন। অঞ্চলের সমস্ত বিশিষ্ট লোককেই তিনি নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছিলেন এই উপলক্ষে। সুপ্রচুর সুখাদ্যের আয়োজন করে, মহাসমারোহে টেবিল সাজিয়ে বৃদ্ধা অভ্যাগতদের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

আশ্চর্য, একটি অতিথি এল না—একজনও না ! সময় বয়ে চলল। নির্দিষ্ট সময়ের এক ঘণ্টা পার হল, দু' ঘণ্টা চলে গেল, তবু একজনও অতিথির পদধ্বনি বেজে উঠল না সিঁড়িতে।

১। 'Creatures of Circumstance', The Author Excuses himself, P. 3

ক্ষুধার্ত হয়ে শেষে বৃদ্ধা একাই আহার শেষ করলেন। খাওয়া শেষ করে উপরে উঠে যাচ্ছেন, এমন সময় দ্বার প্রান্তে দেখা দিল একটি দম্পতি। বেলা ফ্লিস্ সবিস্ময়ে দেখলেন, এদের তিনি নিমন্ত্রণ করেননি—এরা তাঁর অনাহূত অতিথি! হঠাৎ মাথা ঘুরে তিনি একটা চেয়ারের উপরে বসে পড়লেন।

"He and two of the hired footmen carried the old lady to sofa. She spoke only once more. Her mind was still on the same subject. 'They came uninvited, these two......and nobody else.'

A day later she died."

সমস্ত ব্যাপারটির আসল রহস্য উন্মোচিত হল বৃদ্ধার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী এসে পেঁৗছোনোর পর। লোকটির নাম মিস্টার ব্যাংকস্। "Mr. Banks arrived for the funeral and spent a week sorting out her effects. Among them he found in her escritoire, stamped but unposted, the invitations to the ball."

বেলা ফ্লিস সবই করেছিলেন; চিঠি লিখেছিলেন, খামে পুরে ঠিকানা লিখেছিলেন, প্রয়োজনীয় ডাকটিকিটও লাগানো ছিল, কেবল ডাকে ফেলবার কথাটিই তাঁর মনে ছিল না। তার ফলেই এই ট্র্যাজিডিটি সংঘটিত হল। যে দম্পতিটি এসেছিলেন, তাঁরা আকস্মিক আগন্তুক মাত্র।

ছোট গল্পের এই দ্বিবিধ সমাপ্তির মধ্যে কোন্‌টি ভালো কোন্‌টি মন্দ, কোন্‌টি শিল্প হিসেবে উত্তম কোনটিই বা অধম—এ সম্পর্কে মতামত না দেওয়াই সমীচীন। এই ভালোমন্দ প্রধানত নির্ভর করে পাঠক ও লেখকের প্রবণতার উপরে। অনেকেই দু'ভাবে লিখেছেন এবং সাফল্যলাভও করেছেন। তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। 'দুরাশা'র সমাপ্তি কেশরলালে, পরিণতির চমক মোপাসাঁর রীতিতে, 'ক্ষুধিত পাষাণে' রবীন্দ্রনাথ ব্যঞ্জনার বিস্তারে চেকভ-পথযাত্রী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই সর্বপ্রধান দুটি গল্পের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ কোন্‌টিই বা নিকৃষ্ট—কোনো সমালোচকই কি জোর করে সে সম্বন্ধে রায় দিতে পারেন?

অতএব ছোট গল্পের কোন্ সমাপ্তি বাঞ্ছনীয়, সেটি নির্ধারণ করবার ভার পাঠকের রুচির উপরেই ছেড়ে দেওয়া যাক। আর ছোট গল্প সম্পর্কে এক কথায় একটি ছোট সংজ্ঞা সবশেষে মনে রাখা যাক: সে একাঘ্নী বাণ। স্থির লক্ষ্যে, বিদ্যুৎগতিতে, একটি ভাব-পরিণামকে মর্মঘাতীরূপে বিদ্ধ করতে পারলেই তার কর্তব্য শেষ—তার গঠনের ইতর-বিশেষে খুব বেশি কিছু আসে যায় না।

॥ আট ॥

[উপাখ্যান : বৃত্তান্ত : ছোট গল্প]

আধুনিক ছোট গল্পের আত্মা ও রূপ সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা আমরা করতে পেরেছি। প্রথমে একটি প্রতীতি আহরণ, তারপর নিজস্ব মনন ও দর্শন অনুযায়ী তাতে একটি তাৎপর্য আরোপ; সেই তাৎপর্যমণ্ডিত প্রতীতিকে কোনো উপযুক্ত প্রতীক

(Expressive symbol) আশ্রয়ে একটি গদ্য-কাহিনীতে শিল্পায়ন—লেখকের ব্যক্তিত্ব দ্বারা সেটি নিয়ন্ত্রিত ; খণ্ডিত হয়েও তা এক অখণ্ড সত্যের সংকেতবাহী ; রচনাভঙ্গিতে তা উজ্জ্বল এবং তীক্ষ্ণ বর্ণনাধর্মী নয়—ইঙ্গিতধর্মী।

ছোট গল্প এবং উপন্যাসের পার্থক্যের কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। এক গীতি-কাব্য, অপর মহাকাব্য ; একটি 'মেলোডি', অপরটি 'হার্মনি' ; একটি বাঁশির সুর, অন্যটি ঐকতান।

তা সত্ত্বেও বড় গল্প এবং ছোট উপন্যাস আমাদের মনে সংশয়ের সৃষ্টি করতে পারে। দৈর্ঘ্যের বিচারেই আমরা এদের স্বতন্ত্রতা সর্বদা নির্ধারণ করতে পারব না। কিন্তু একটিমাত্র ভাবের একমুখী গতি, বিবৃতিমূলকতার পরিবর্তে ইঙ্গিতমূলকতা এবং একমাত্র 'মহামুহূর্ত' বা climax-এর উপস্থিতি থেকে ছোট গল্পকে আমরা চিনে নিতে পারব। চরিত্রধর্মে একান্ত ছোট গল্প হয়েও আয়তনের জন্য অনেক সময় তাকে উপন্যাস বলে মনে হতে পারে—যেমন বিখ্যাত ফরাসী কথাশিল্পী কামুর 'L'etranger'—'আগন্তুক' ; আবার আকারে সংক্ষিপ্ত হয়েও অনুরূপ ভাবে উপন্যাস ছোট গল্পের ছদ্মবেশ ধরতে পারে, যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের 'যুগলাঙ্গুরীয়'।

সুতরাং একালের ছোট গল্পকে স্পষ্ট-চিহ্নিত রাখতে হলে গল্পপ্রতিম দুটি বস্তু সম্বন্ধে আমাদের সজাগ থাকা দরকার। তাদের একটি হচ্ছে 'আখ্যায়িকা' (Tale), অপরটি হচ্ছে 'বৃত্তান্ত' (Anecdote)। তৃতীয় আর একটি আছে 'কথা' (Fable)—কিন্তু সম্প্রতি তা লুপ্ত। বিষ্ণুশর্মা বা ঈশপের মতো প্রাণী-আশ্রয়ী বা মানব-আশ্রয়ী নীতিমূলক ছোট ছোট রচনার রেওয়াজ আর নেই, ইভান ক্রাইলভের সঙ্গেই তা বোধ হয় শেষ হয়ে গেছে। এখন শ্চেদ্রিন-এর মতো কথাধর্মী গল্প ব্যঙ্গ রচনার প্রয়োজনই সিদ্ধ করে মাত্র। কিন্তু 'আখ্যায়িকা' এবং 'বৃত্তান্ত' ছোট গল্পের ছদ্মবেশে এখনো বিদ্যমান বলে তাদের সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণার প্রয়োজন।

আখ্যায়িকা পর্যায়ের রচনার সঙ্গে আমরা দীর্ঘকাল ধরে পরিচিত আছি। 'পঞ্চ-তন্ত্রে'র পঞ্চাধ্যায়ে কথাপুষ্পের স্রগ্ধারিণী হয়ে এরা দেখা দিয়েছে। কথাসরিৎ-সাগর, দশকুমার-চরিত, আরব্য উপন্যাস, দেকামেরন, গেস্তা রোমানোরাম, ক্যান্টারবেরি টেলস্, গায়গাঁতুয়া আর পাঁতাগ্রুয়েলের কাহিনী এই আখ্যায়িকার মহামহোৎসব। এরা গল্পরসে রসায়িত, বৈচিত্র্যে সমুজ্জ্বল, বাস্তব জীবনের সুস্পষ্ট ছবিও ফুটেছে অনেক জায়গায়। কোথাও কোথাও আধুনিক ছোট গল্পের সম্ভাবনাও পাওয়া যায়—কিন্তু ইঙ্গিতমর্মিতা বা ব্যঞ্জনার সূক্ষ্মতা এদের মধ্যে অনুপস্থিত ; খণ্ডতার মধ্যে অখণ্ডের কোনো সন্ধান এরা রাখে না, এদের জন্ম কোনো প্রতীতি রূপ থেকে নয়, গল্প বলার স্বভাবিক প্রেরণা থেকে এদের উৎসার। এরা 'Novella'—যখন সমাজ-আশ্রয়ী ; এরাই রোমান্স —যখন কল্প-জগতে সঞ্চরমাণ।

আধুনিক কালেও গল্পের মুখোশ পরা আখ্যায়িকাগুলিকে (Tales) প্রকাশ করে ধরলে রোম্যান্স এবং উপন্যাস বেরিয়ে আসবে। এই 'টেল'জাতীয় ছোট গল্পের একটি সুন্দর নিদর্শন রবীন্দ্রনাথের 'দালিয়া'। হতভাগ্য শা-সুজার অন্যতমা নন্দিনীর সঙ্গে বন্যবেশী আরাকানরাজ দালিয়ার প্রেম, সংকট ও মিলনের যে কাহিনী এতে বর্ণিত হয়েছে—তার উপযুক্ত বিস্তার ঘটালেই তা পূর্ণ রোম্যান্সের

মর্যাদা পেতো। বঙ্কিমচন্দ্রের 'যুগলাঙ্গুরীয়ের' উল্লেখ আমরা করেছি, দস্যু বা স্কটের হাতে পড়লে এই গল্পই পাঁচ-সাতশো পাতায় এগিয়ে যেত—লেখকেরা কিছু যুদ্ধ-বিগ্রহ-চক্রান্ত এর মধ্যে জুড়ে দিয়ে আরো রোমাঞ্চঘন করে তুলতেন। শরৎচন্দ্রের 'ছবি'র 'দত্তা' হতে বাধা ছিল না—দুটির কল্পনার সাদৃশ্য লক্ষণীয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাধারাণী' আয়তনে সংক্ষিপ্ত হলেও তাকে উপন্যাসের খসড়া বলেই মনে হয়। বাংলা সাহিত্যে তারাশঙ্করের অনেক গল্পই টেল-পর্যায়ী। বালজাকের বিখ্যাত গল্পগুলির অধিকাংশই 'টেল'—তাঁর 'এল্ ভ্যাদুগো' (El Verdugo), 'ফাসিনো কান' (Facino Cane) ইত্যাদি ঔপন্যাসিক কাহিনী। ফরাসী কবি ও নাট্যকার মুসেও এই ধরণের বেশ কিছু গল্প লিখে গেছেন।

এইখানে একটি বৈচিত্র্য বিশেষভাবে উল্লেখ্য। কখনো কখনো বিস্তৃত আখ্যায়িকা-মূলক গল্পও লেখকের কৃতিতে পরিশেষে ব্যঞ্জনাশ্রয়ী হয়ে—গোত্রান্তর ঘটিয়ে, ছোট গল্পে রূপান্তরিত হতে পারে। তখন তাতে আর কাহিনী-পরিণতি প্রধান থাকে না—তা হয় ইঙ্গিতমুখ্য—তাতে অকস্মাৎ একটি "Pointing finger"-এর আবির্ভাব হয়। আখ্যায়িকাধর্মী বিবৃতি তার ফলে তির্যক ইঙ্গিতমূলকতায় বিলসিত হয়ে যায়।

যেমন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক'।

গল্পটিতে খুনী ডাকাত ভিখুর পলাতক জীবনের নানা পর্যায় ঔপন্যাসিক স্তর-পরম্পরায় সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার অরণ্যবাস, প্রহ্লাদের বাড়ীতে আশ্রয় নেওয়া ও সেখানকার নানা ঘটনা, ভিক্ষাবৃত্তি ও শেষ পর্যন্ত বসিরকে হত্যা করে পাঁচীকে নিয়ে তার তিমির-যাত্রা—আখ্যানমূলক সমাপ্তিকে প্রায় এনে ফেলেছিল। কিন্তু লেখক তার পাশ কাটিয়ে ছোট গল্পের এক অনন্য ব্যঞ্জনা বিস্তার করলেন—বিকৃত বীভৎস মনুষ্যত্বের এক অন্ধকার আর অন্তঃশীলা প্রবাহের দিকে এইভাবে বাড়িয়ে দিলেন তাঁর "Pointing finger" :

"ভিখুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া পাঁচী তাহার পিঠের উপর ঝুলিয়া রহিল। তাহার দেহের ভারে সামনে ঝুঁকিয়া ভিখু জোরে জোরে পথ হাঁটিতে লাগিল। পথের দু'ধারে ধানের ক্ষেত আবছা আলোয় নিঃসাড়ে পড়িয়া আছে। দূরে গ্রামের গাছপালার পিছন হইতে নবমীর চাঁদ আকাশে উঠিয়া আসিয়াছে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্ত স্তব্ধতা।

হয়ত ওই চাঁদ আর এই পৃথিবীর ইতিহাস আছে। কিন্তু যে ধারাবাহিক অন্ধকার মাতৃগর্ভ হইতে সংগ্রহ করিয়া দেহের অভ্যন্তরে লুকাইয়া ভিখু ও পাঁচী পৃথিবীতে আসিয়াছিল এবং যে অন্ধকার তাহারা সন্তানের মাংসল আবেষ্টনীর মধ্যে গোপন রাখিয়া যাইবে তাহা প্রাগৈতিহাসিক। পৃথিবীর আলো আজ পর্যন্ত তাহার নাগাল পায় নাই —পাইবেও না।"

কোথা থেকে কোথায় চলে গেল গল্পটি ! সৃষ্টির আদিতে—যখন মানুষের ইতিহাস আরম্ভ হয় নি তখনকার ভয়াল রাত্রির অন্ধকারে, ডাইনোসর-ব্রণ্টোসরের যুগে ফার্ণের অরণ্যে কেবল একটি সত্যই বিদ্যমান ছিল : হত্যা করো, আত্মরক্ষা করো, বংশধারাকে অবিচ্ছেদ করো। সেদিনের আদিম জিঘাংসা এবং নীতি-ধর্ম-সমাজ-বিবর্জিত পাশব কামনা আজও মানুষের অন্তরতম লোকে নিহিত আছে। সেই প্রাগৈতিহাসিক জান্তব-

লীলার দিকটিই প্রতীকিত হয়েছে ভিখ্‌ু এবং পাঁচীর গল্পটিতে। জ্ঞানের প্রভাত এসেছে, বিজ্ঞানে সূর্য-প্রদীপ জ্বলেছে সভ্যতার আকাশে, কিন্তু অন্তরতলচারী সেই আদিম বৃত্তির অন্ধ গহ্বরে তার আলো কখনো পড়েনি, কোনোদিনই পড়বে না ; ভূমিগর্ভ-সঞ্চারী লাভাস্রোতের মতো ভিখুজাতীয় কোনো 'ক্রেটারের' মুক্তিমুখ খুঁজে পেলেই আদি বাসনার অগ্নিধারা উদ্‌গীরিত হয়ে আসবে।

শেষের মাত্র দুটি অনুচ্ছেদে একটি নিশ্চিত আখ্যায়িকা এই বিশাল ব্যঞ্জনায় মুক্তি পেলো ; ভিখুর প্রতিটি পদক্ষেপে এবং শেষ পরিণতি একটি প্রতীতির সমগ্রতা লাভ করল ; ভিখুর হাতে বসিরের দানবিক হত্যাকাণ্ড জৈব-কামনার একতম 'মহা-মুহূর্তে' রূপায়িত হল এবং বৈজ্ঞানিক জীবন-সমালোচক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিত্বটি সম্পূর্ণভাবে এতে ধরা দিল।

কিংবা গোর্কীর 'মাল্‌ভা' (Malva) গল্পটিকে মনে করা যাক।

সমুদ্র, জেলেদের উপনিবেশ, মাল্‌ভা নাম্নী একটি রহস্যময়ী লাস্যচঞ্চলা তরুণী আর তাকে কেন্দ্র করে পিতা ভাসিলি আর পুত্র ইয়াকোভের মধ্যে প্রাগৈতিহাসিক দ্বন্দ্ব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যৌবনের শক্তির কাছে হার মানতে হল ভাসিলিকে, পরাজয় স্বীকার করে সে দেশে ফিরে গেল, মাল্‌ভাকে অধিকার করল ইয়াকোভ।

উপাখ্যান এইখানেই শেষ হতে পারত ; কিন্তু সামাজিক নীতির বহির্ভাগে, আদিম-প্রায় জীবনে—যেখানে নারী মাত্র শক্তিশুল্কা, সেখানে গল্পটি এত সহজেই সমাপ্তি পেলো না। গোর্কী আরো একটু এগিয়ে গেলেন—রঙ্গমঞ্চে দেখা দিল সেরিওঝ্‌কা। সে ইয়াকোভের চাইতেও শক্তিমান—সমুদ্রের হিংস্রতারই প্রতীক। তাই শেষের পরেও শেষ টানলেন গোর্কী, সেরিওঝ্‌কা আয়ত্ত করল মাল্‌ভাকে। এই অংশটির ইংরেজি অনুবাদ তুলে দিচ্ছি :

"Yakov glanced at Malva. Her green eyes were laughing in his face, an offensive, humiliating mocking laugh, and she pressed against Seriozhka's side so lovingly that the sweat broke out all over Yakov's body."

মাটিতে পা পুঁতে ইয়াকোভ দাঁড়িয়ে রইল মূর্তির মতো। মাল্‌ভা আর সেরিওঝ্‌কা দু'জনে এগিয়ে চলে যাচ্ছে, দূর থেকে ওদের উচ্চ হাসি ব্যঙ্গের মতো তার কানে এসে আঘাত করতে লাগল। একটা বন্দী জন্তুর মতো ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল নিরুপায় বিধ্বস্ত ইয়াকোভ। আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল বহু দূরে চলে যাচ্ছে ভাসিলি—পরাজিত পিতার দূরাপসৃত মূর্তিটিকে মনে হচ্ছে একটি কালো ক্ষুদ্র পুতুলের মতো : "In the distance, over the yellow, deserted, undulating sand, a small dark human figure", আর তার দক্ষিণে আনন্দিত বিশাল সমুদ্র—"merry mighty sea glistened in the sun." এক দৃষ্টিতে বাপের দিকে চেয়ে আছে ইয়াকোভ, এমন সময় দূর থেকে :

"Yakov heard Malva shouting in a resonant throaty voice :

'Who took my knife ?"

The waves were splashing noisily, the sun was shining, the sea

was laughing……"

মাল্‌ভা তার ছুরি খুঁজছে। এ ছুরি তারই মতো একটি নারীর চরিত্রের প্রতীক, যা দিয়ে সে ভাসিলিকে হত্যা করেছে, হত্যা করেছে ইয়াকোভকে—যে ছুরি শাণিত হচ্ছে সেরিওঝ্‌কার জন্যও। এ গল্প আমাদের মোপাসাঁর 'মারোক্কা'কে স্মরণ করিয়ে দেয়।

আর সেই সঙ্গে উজ্জ্বল সমুদ্রের হাসির দীপ্তি—যেন চিরকালের নাটক-দ্রষ্টার নিরাসক্ত ব্যঙ্গের অভিব্যক্তি। এই সমুদ্রের তীরে—এই ফিশারিতে—মাল্‌ভা সেই চিরন্তন ছুরিকার প্রতীক হয়ে উঠেছে—যা একটির পর একটি হত্যার মাধ্যমে পুরুষ থেকে পুরুষান্তরে হাতবদল হয়, রক্তের একটি চিহ্নও ছুরির ফলায় লেগে থাকে না।

বিস্তৃত কাহিনীটি এখানেও প্রতীকে পরিণত হল এবং আদ্যন্ত বিন্যাসটি একটি সমগ্রতায় রূপ লাভ করে ব্যঞ্জনার মধ্যে মুক্তি পেলো। মহা-মুহূর্ত তৈরি হল সেখান-টিতে—যেখানে মাল্‌ভার দুটো সবুজ বাঘিনী-চক্ষু ইয়াকোভের দিকে তাকিয়ে অবমাননাভরা পরিহাসের হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

তাহলে যে-কোনো সুদীর্ঘ কাহিনীই আখ্যায়িকা নয়। সমগ্র আয়োজনে সনেটের মতো গাঢ়বন্ধতা, একক ভাবের প্রাধান্য এবং একমাত্র পরম-ক্ষণ তার সুস্পষ্ট গোত্রলক্ষণ। প্রচুর বিস্তৃতি এবং জটিল বিন্যাস থাকলেও এই গোত্রধর্মের ফলশ্রুতিতে তা ছোট গল্প হতে পারে। কামুর 'L'etranger' 'আগন্তুক' নামক বইটির আমরা উল্লেখ করেছি। মেরসাল (Meursalt) এক অদ্ভুত নিরাসক্তির জগতে বাস করছে—সমাজের সকলের মাঝখানে থেকেও সে বাইরের লোক। কোনো কিছুর প্রতিই তার কোনো গভীর সংসক্তি নেই—যা কিছু ঘটছে সবই তার কাছে "Nothing serious"! মৃত্যু, প্রেম, সমুদ্রে সাঁতার দেওয়া কিংবা সিনেমা দেখা—সবই তার কাছে সমার্থক। কেবল একটি চরম ক্ষণ এসেছে নির্জন সমুদ্রের তীরে, অসহ্য উত্তাপে এবং বন্ধুর পূর্বতন আততায়ী একজন আরবকে সেই তপ্ত নির্জনতার মধ্যে দেখার একটা সাময়িক উত্তেজনার ভিতরে। রিভলভারের গুলিতে আরবটিকে হত্যা করেছে সে। তারপর তার বিচার, তার প্রাণদণ্ডের আদেশ—সবই সেই "Nothing serious"! শুধু একবার স্টিমারের বাঁশির শব্দে আর বাইরের প্রাণস্রোতের কল্লোলে তার মনে হয়েছে, জীবনের অতি সহজ আনন্দ ও রূপকে সে ভালোবেসেছিল।

এর দার্শনিক তাৎপর্য আমাদের বিচার্য নয়—কিন্তু এই উপন্যাস নামিক রচনাটিকে বস্তুত দীর্ঘ ছোট গল্প ছাড়া কিছুই বলা যায় না। এটি বিবৃতিমূলক নয়—ইঙ্গিত-মূলক; একমুখী এর গতি—প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটি ভাব এতে অনাহত কবিতার সুরের মতো বিন্যস্ত; এর প্রতিটি সুনির্বাচিত বাক্যে, প্রতিটি পরিমিত বর্ণনায় ঐক্যভাবাত্মক সঙ্গতি। সর্বশেষে একটি জিজ্ঞাসা—এই জীবনে সত্যিই কি কোনো কিছুর গুরুত্ব নেই? প্রত্যেকটি মানুষই কি এখানে বহিরাগত—যা কিছু চারপাশে ঘটে চলেছে তারা তাকে স্পর্শও করে না? এমন কি মৃত্যু যখন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, তখনও সে নির্বিকার? দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর জীবন-বিমুখতায় এই রচনাটি ছোট গল্পসুলভ জিজ্ঞাসাকে মর্মমূলে বহন করছে।

কিংবা হেমিংওয়ের "বৃদ্ধ ধীবর এবং সমুদ্র" (The Old Man and The Sea)।

এটিও বেশ বিস্তৃত উপাখ্যানধর্মী রচনা। বৃদ্ধ ধীবরের বর্ণহীন জীবন, ছেলেটির সাহচর্য, নিঃসঙ্গ হয়ে মাছ ধরতে যাওয়া, অপ্রত্যাশিত ভাবে বিরাট মার্লেন মাছ শিকার, লোলুপ হাঙ্গরের ঝাঁকের দ্বারা তার সাধের শিকারটির সকরুণ পরিণতি। এর মধ্যে বৃদ্ধের নানা অনুভূতি, আশা-আনন্দ-ভয়, হাঙ্গরের সঙ্গে তার নিরুপায় ক্ষিপ্ত সংগ্রাম, সমুদ্রের অপরূপ বর্ণনা—এরা গল্পের অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে বটে, কিন্তু এর বক্তব্য একলক্ষ্য, এর ক্লাইম্যাক্স্ একতম, এর গতি একমুখী—সমস্তটি পরিমিতিবোধ এবং প্রতীতিগত ঐক্যে দৃঢ়সংবদ্ধ। যে মহা-মুহূর্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এনে দিয়েছেন ভিখু কর্তৃক বসিরের হত্যায়; মাল্ভার হরিৎবর্ণ চোখের ব্যঙ্গের হাসিতে যা রচনা করেছেন গোর্কী, বৃদ্ধের সঙ্গে মৎস্যলোভী হাঙ্গরদের সকরুণ সংগ্রামে সেই চরম ক্ষণটিকে আমরা দেখতে পাই। এই অসাধারণ গল্পটির শেষে লেখক বলছেন ঃ

"Up the road, in his shack, the old man was sleeping again He was still sleeping on his face and the boy was sitting by him watching him. The old man was dreaming about the lions."

অসামান্য এই সমাপ্তি। আদর্শ চেকভীয় পরিণতি বলা যায় একে। চেকভের 'ডার্লিং'-এ ওলেংকা যেমন শাশার মধ্যে নতুন করে তার ভালোবাসাকে পায় বাৎসল্যের কারুণ্যে, এ গল্পটিও তাই। জরার পরাভবের কথা আছে, তবু তা পরাজয় নয়—পাশে বসে থাকা ছেলেটির মধ্যে আশায় উদ্ভাসিত হয়েছে ভবিষ্যতের প্রাণশক্তি। আর বৃদ্ধ যখন সিংহের স্বপ্ন দেখছে, তখন তা যেন সেই আগামী আশাবাদকেই ব্যঞ্জিত করে তুলছে। এর মধ্যে নিহিত রয়েছে চেকভের সেই "Living man" আর তার "untrammelled spirit"!

আবার অন্যদিকে সংক্ষিপ্ত হয়েও 'দালিয়া' রোম্যান্স্, 'ছবি' উপন্যাসের খসড়া। আয়তনে ছোট গল্প, অথচ বস্তুত আখ্যায়িকা—এমনি একটি নিদর্শন হিসাবে রবীন্দ্রনাথের 'দিদি' গল্পটিকে বিন্যাস করে দেওয়া যেতে পারে ঃ

(ক) প্রথমে পতিপরায়ণা শশিকলার সুন্দর দাম্পত্যজীবন। সে তার স্বামী জয়গোপালকে হিন্দুনারীর আদর্শে ভালোবাসে, "স্বামী সর্বস্ব, স্বামী প্রিয়তম, স্বামী দেবতা"। তার স্বামী জয়গোপালও পত্নীগতপ্রাণ এবং তার অন্যতম কারণ, অপুত্রক শ্বশুর কালীপ্রসন্নের বিস্তর বিষয়-সম্পত্তি আছে।

(খ) তারপর জটিলতার সূচনা। বৃদ্ধ বয়সে কালীপ্রসন্নের পুত্রলাভ। আশাহত জয়গোপালের সরোষে আসাম যাত্রা। শশীর মনে তার অবাঞ্ছিত অনুজের জন্য স্বাভাবিক ক্রোধ। কিন্তু ঘটনাচক্রে ছোটভাইটি মাতাপিতৃহীন হয়ে শশীর কাছেই এসে পৌঁছুল। ফলে দিদির মনের পরিবর্তন—জননী-স্নেহের অভ্যুদয়—ছোট ভাইটিকে সযত্নে লালনপালন।

(গ) দু'বছর পরে জয়গোপালের প্রত্যাবর্তন। কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে তার সম্পর্ক আর আগের মতো সহজ নয়। শশী তার ছোটভাই নীলমণিকে বড় বেশি ভালোবাসে —জয়গোপালের তা অসহ্য; আর ওই নীলমণিই তো তার পথের কাঁটা—সে এসেছে বলেই তো শ্বশুরের সম্পত্তির বারো আনা থেকে বঞ্চিত হয়েছে জয়গোপাল। স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদের সূচনা হল এইখানে।

(ঘ) জয়গোপালের নানাভাবে নীলমণিকে বঞ্চনার চক্রান্ত, শেষে বিনা চিকিৎসায় মেরে ফেলার সংকল্প। শশীর কাছে স্বামীর স্বরূপ প্রকাশ। স্বামীর সঙ্গে বিরোধ এবং নীলমণিকে নিয়ে শশীর অন্যত্র চলে যাওয়ার চেষ্টা। একজন ডেপুটি বাবুর প্রভাবে সাময়িক মীমাংসা।

(ঙ) শেষে শশী কর্তৃক ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে নীলমণিকে সমর্পণ এবং স্বামীর হাত থেকে ভাইটিকে বাঁচানোর মিনতি। ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে জয়গোপালের অপমান। ম্যাজিস্ট্রেটের নীলমণির ভারগ্রহণ। গল্পের শেষে ক্রুদ্ধ ক্ষিপ্ত জয়গোপাল শশীকে খুন করে ফেলল তারই ইঙ্গিত।

গল্পটি সুন্দর। স্বামীপ্রেম এবং মাতৃস্নেহের দ্বন্দ্বে শশিকলার মাতৃত্বের জয়—অন্যদিকে ধীরে ধীরে অর্থলোলুপ জয়গোপালের মধ্যে পিশাচের আবির্ভাব—অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে স্তর-পরম্পরায় তা দেখানো হয়েছে। কিন্তু আমাদের বক্তব্য হচ্ছে—এটি আখ্যায়িকা বা 'টেল্', ছোট গল্প নয়। একাধিক ক্লাইম্যাক্স, ঘটনার বিস্তার, অধ্যায়ের পর অধ্যায়—সব মিলে 'দিদি' একটি সুবৃহৎ উপন্যাসের পর্যায়ে গিয়ে পেঁছেছে। গল্পটি শরৎচন্দ্রের হাতে পড়লে তিনি এর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতেন।

অনুরূপভাবে মোপাসাঁর সুপরিচিত 'মাদ্‌মোয়াজ্যাল্ ফিফি' (Madmoiselle Fifi) গল্পটিকে পরীক্ষা করা যাক।

'মাদ্‌মোয়াজেল্ ফিফি' নামে পরিচিত জার্মান সেনাপতি প্রমোদের উদ্দেশ্যে নিম্নশ্রেণীর কয়েকটি ফরাসী নারীকে সংগ্রহ করেছিল। মদের ঝোঁকে ফরাসী জাতির প্রতি কটূক্তি করায় রাশেল্ বলে একটি ইহুদী মেয়ে ফিফিকে হত্যা করে পালিয়ে গেল। গল্পটি এইখানেই শেষ। কিন্তু মোপাসাঁ শেষের পরেও শেষ টানলেন। যেমনঃ রাশেল্ গিয়ে লুকিয়ে রইল স্থানীয় গীর্জার ঘন্টাঘরে, পুরোহিতেরা তাকে রক্ষা করতে লাগলেন এবং পরে জার্মান সৈন্য স্থানত্যাগ করলে, 'A short time afterward, a patriot who had no prejudices, who liked her because of her bold deed, and who afterward loved her for herself married her and made a lady of her."

একটি মাত্র বাক্য, এতে একটির পর একটি 'যে' আর 'এবং' জুড়ে দিয়ে মোপাসাঁ যেন কোনো উপন্যাসের সারাংশ বর্ণনা করে গিয়েছেন। গল্পের মূল অংশটি বাদ দিয়েও মাত্র শেষটুকু আশ্রয় করেই স্বচ্ছন্দে কয়েকশো পাতা এগিয়ে যাওয়া যেত। যেমনঃ

ক) গীর্জার ঘন্টাঘরে রাশেল্ যখন লুকিয়ে রয়েছে, তখন তার ধরা পড়বার আশঙ্কাঃ নাটকীয় উৎকণ্ঠা; জার্মান সৈন্যেরা উন্মাদের মতো তাকে খুঁজছে, গ্রাম তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে—তার বিস্তৃত বিবরণ।

(খ) পরে একজন ফরাসী দেশপ্রেমিকের সঙ্গে রাশেলের পরিচয়। রাশেলের বীরত্বে দেশপ্রেমিকটির শ্রদ্ধার উদ্রেক, অথচ গণিকা (এবং ইহুদী) বলে একটা সংকোচ; অনেকখানি জায়গা জুড়ে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব—প্রেম ও সংস্কারের টানাপোড়েন।

(গ) ক্রমে সংকোচ এবং সংস্কারকে ছাপিয়ে প্রেমের জয়—নানা মানসিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধক পার হয়ে পরিণয়।

(ঘ) এই অসামাজিক মেয়েটিকে বার্ণার্ড শ-র পিগম্যালিয়নের মতো আস্তে আস্তে সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠাদান : "To make a lady of her."

দেখা যাচ্ছে, ছোট গল্পের সম্ভাবনাটি দীর্ঘচ্ছন্দ উপন্যাসের মধ্যে প্রসারিত হয়ে গেল। ইঙ্গিতধর্মী একমুখিতা বা একতম মহা-মুহূর্ত এতে পাওয়া গেল না—ঘটনা-বিচিত্র কোনো পৃথুল উপন্যাসের একটি সৌরভই আমরা এর মধ্যে লাভ করলাম।

অতএব আখ্যায়িকা বা 'টেল্'-কে আমরা ছোট গল্প বলতে পারি না। তারা উপন্যাসেরই সংক্ষিপ্ত রূপ মাত্র। জাপানী ঝাউগাছ গৃহস্থবাড়ীর টবের মধ্যে লালিত হলেও সে যেমন পার্বত্য মহাদ্রুমের সগোত্র—তেমনি ছোট গল্পের আধারে রক্ষিত হয়েও আখ্যায়িকা বস্তুত 'বোনসাই'-এর মতো উপন্যাসেরই ক্ষুদ্র সংস্করণ ; যেমন বায়োলজি-ক্যাল্ ল্যাবরেটরিতে ফার্ম্যালিনমগ্ন ছয় ইঞ্চি অক্টোপাস বংশ সম্বন্ধে সমুদ্র-দানবেরই স্থানচ্যুত অনুজ।

এইবারে আসে 'Anecdote' বা আমাদের পরিভাষায় 'বৃত্তান্তের' কথা। 'বৃত্তান্তে'র চলিত অর্থ, আশা করি, এ ক্ষেত্রে কেউই গ্রহণ করবেন না।

যাকে আমরা 'বৃত্তান্ত' বলছি তা জন্মগত ভাবে ছোট গল্পেরই সহোদর। এই উপমাকে বিস্তৃত করে বলা যায়, এই ভ্রাতৃদ্বয়ের একজন কবি ও দার্শনিক, অপরজন নিছক ব্যবসায়িক ও বস্তুতান্ত্রিক। 'বৃত্তান্ত'কে চিনবার নিরিখ্ হল, তার শেষে একটা স্পষ্ট পূর্ণ যতি। তা পড়বার পরেই একান্তভাবে শেষ হয়ে যায়—পাঠকের মনে নতুন করে কোনো সৃষ্টি-প্রক্রিয়া আরম্ভ হয় না। "শেষ হয়ে হইল না শেষ"—একথা বলা যাবে না তার সম্বন্ধে। কারণ "Anecdote is already finished and complete."

আসল কথা, বৃত্তান্ত হলেই ছোট গল্প হয় না। তার একটা চমকপ্রদ কৌতূহলজনক আরম্ভ থাকতে পারে, তার সমাপ্তিতেও লেখকের মুন্সিয়ানা থাকতে পারে, কিন্তু যতক্ষণ তাতে ব্যঞ্জনা না আসছে, তার মধ্যে "subtle comments on human nature"—মানব-চরিত্র বা জীবন-তত্ত্বের উপর কোনো বিচিত্র আলোকপাত না ঘটছে—ততক্ষণ তাকে আমরা আদর্শ ছোট গল্প বলতে পারি না। সাধারণত শক্তিহীন বা স্বল্প-শক্তিমান লেখকেরাই বৃত্তান্ত নিয়ে কারবার করেন। রবীন্দ্রনাথের গল্পের সঙ্গে এক-কালের জনপ্রিয় বাঙালী গল্প-লেখক সরোজনাথ ঘোষের (যাঁর 'শত গল্প' বসুমতী থেকে প্রকাশিত হয়েছিল রচনার পার্থক্য এইখানেই।

কিন্তু মহৎ গল্পকারও মধ্যে মধ্যে বৃত্তান্ত লিখে ফেলেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই তার প্রমাণ। পাঠ-সংকলনের কল্যাণে বালকপাঠ্য 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পটিই স্মরণ করুন। গল্পটির আগাগোড়াই এমন একটি কণ্টকল্পিত প্যাটার্ণ পাওয়া যায় যে রাইচরণের মনস্তত্ত্ব নিয়ে যখন একটি সুন্দর ছোট গল্প হয়ে উঠবার সম্ভাবনা ছিল, তখন ঘটনার টানাপোড়েনে, 'খোকাবাবুকে' ফিরিয়ে দেওয়ার একটি বিস্তৃত গাল্পিক-কল্পনায় তা 'Anecdote'-এর সীমা অতিক্রম করতে পারল না।

গল্পটিতে কত রকমের আয়োজন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। খোকাবাবু পদ্মায় ডুবে গেল, হতভাগ্য রাইচরণ ফিরে এল নিজের দেশে। আর যে রাইচরণের এতদিন কোনো ছেলেপুলে হয়নি, প্রায় প্রৌঢ় বয়সে, তার একটি পুত্রসন্তান জন্ম নিল। আর কী

আশ্চর্য, কাকতালীয়ের মতো সে ছেলেটির চেহারাও হল প্রায় খোকাবাবুর মতো। খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তনের পথ নিষ্কণ্টক করবার জন্য ইচ্ছাময় বিধাতার খেয়ালে রবীন্দ্রনাথ রাইচরণের পত্নীবিয়োগ ঘটালেন। তারপর অশিক্ষিত মূর্খ রাইচরণ পুত্র ফেল্‌নাকে 'আনুকোলব' (রবীন্দ্রনাথের ভাষায়) করে তোলবার জন্য যে সাধনা আরম্ভ করল, তাকে প্রায় 'কুমার-সম্ভবে'র উমার তপস্যার সঙ্গে তুলনা করা চলে। পাঠকের মনে এইখান থেকে যে সংশয়ের সৃষ্টি হয়, সে সংশয় অবিশ্বাসে পরিণতি লাভ করে—যখন দেখা যায়, সুদীর্ঘকালের পরেও অনুকূল-দম্পতির আর কোনো পুত্রসন্তানের জন্ম হয়নি (তাঁরা রাইচরণের জন্ম প্রতীক্ষা করছিলেন ?) এবং ফেল্‌নাকে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা পত্রপাঠ তাকে 'খোকাবাবু' বলে গ্রহণ করলেন।

শেষের দিকে রাইচরণের জন্য পাঠকের মনে খানিক সমবেদনার আবির্ভাব ঘটা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তা ঘটতে পায়নি। বৃত্তান্তের প্যাটার্ণ-পরিকল্পনা আর অধিকন্তু সমস্ত জিনিসটার সুস্পষ্ট অবাস্তবতা এটিকে সার্থক ছোট গল্পের উদার মহিমায় উত্তীর্ণ হতে দেয়নি।

অন্যভাবে ধরা যাক মোপাসাঁর 'সেমিয়াঁৎ' (Semillante)-কে। সেই ভয়ঙ্কর কুকুরটির গল্প।

বিধবা সাভরিনির একমাত্র ছেলে আঁতোয়ানকে সরাইখানার এক কলহে হত্যা করে কাপুরুষ নিকোলাস রাভোলাতি সেই রাতেই পালিয়ে গেল সার্দিনিয়ায়।

সাভরিনি কিন্তু ছেলের জন্য বেশিক্ষণ চোখের জল ফেলল না। শুধু প্রতিজ্ঞা করল, এই হত্যার সে দানবীয় প্রতিশোধ নেবে। তার পোষা কুকুরী সেমিয়াঁৎ হল এই প্রতিশোধের উপকরণ।

তারপর দিনের পর দিন সে কেমন করে সেমিয়াঁৎকে প্রস্তুত করে তুলল, তার সুকৌশল বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন, লেখক। যখন সেমিয়াঁৎ সাভরিনির সম্পূর্ণ মনের মতো হয়ে উঠল, যখন যে বুঝল এইবার তার উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূল অবকাশ হয়েছে, তার কুকুরীটিকে সঙ্গে নিয়ে সে সার্দিনিয়ায় নিকোলাসের গৃহে গিয়ে পৌঁছুল। তারপর :

"The old woman opened the door and called : 'Hey, Nicholas !'

"He turned around ; then losing the dog, she cried out : 'Go, go, devour him ! Devour him !'

The animal, excited, threw herself upon him and seized him by the throat, The man extended his arms, clinched her and rolled upon the floor. For some minutes he twisted himself, beating the soil with his feet ; then he remained motionless, while Semillante dug at his neck until it was in shreds !"

নিষ্ঠুর, ভয়ঙ্কর প্রতিশোধই বটে ! এর চাইতে বীভৎসতম হত্যা কল্পনাও করা যায় না। আর এই প্রতিহিংসাটির জন্য দীর্ঘদিন ধরে মোপাসাঁ প্রস্তুতি রচনা করেছেন। কিন্তু যে মুহূর্তেই সেমিয়াঁৎ নিকোলাসের গলা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ফেলল, সেই মুহূর্তেই লেখকের বক্তব্যও শেষ হয়ে গেল। পাঠকের মনে গল্প ছাড়িয়ে গল্পতর কোনো ঝঙ্কার বাজল না—একেবারে পূর্ণ যতিপাত ঘটল। মধ্যযুগীয় "Horror story"-র অতিরিক্ত

কিছুই একে বলা যায় না। ঘটনাটি অত্যন্ত রোমাঞ্চকর, কল্পনায় অভিনবত্ব আছে তা-ও স্বীকার্য, তবু এটি বৃত্তান্তের সীমা ছাড়িয়ে ছোট গল্পের পরিণতি লাভ করতে পারল না।

আধুনিক সমালোচনার মানদণ্ডে বৃত্তান্ত-প্রাণ গল্প 'Bad story'; তা শক্তিহীন লেখকের প্যাটার্ণ রচনা মাত্র।

তাই বলে ছোট গল্পে কি 'ঘটনা' (Incident) থাকবে না? নিশ্চয়ই থাকতে পারে। কিন্তু ঘটনার ভার, তার প্ল্যান-প্যাটার্ণ যাতে ছোট গল্পের ইঙ্গিতমূলকতা নষ্ট না করে, যাতে তার মধ্যে বৃহত্তর ব্যঞ্জনাধর্মিতার সৌন্দর্য আহত না হয়—তা যাতে কাহিনীগত পরাকাষ্ঠাই না পায়, সেই দিকেই লেখককে সর্বদা সচেতন থাকতে হবে। আর মনে রাখতে হবে ছোট গল্পে ঘটনা থাকবে, কিন্তু সে ঘটনা নিছক বৃত্তান্তসিদ্ধ হলে তাকে আর ছোট গল্প বলা চলবে না।

বরং আধুনিক ছোট গল্পে ঘটনা থাকতেই হবে—এমন কোনো প্রতিশ্রুতিই নেই। একটি মুহূর্ত-বিলাস, একটি মনন, একটুখানি দেখা, একটি মেজাজ, খানিক 'জাগর-স্বপ্ন' (Surrealism)—এরা সবাই-ই একালের ছোট গল্পের বিষয়বস্তু হতে পারে। ঘটনা (Incident) ক্রমশ বিন্দুবৎ হয়ে যাচ্ছে এখন। আমার তো মনে হচ্ছে বৃত্তান্তের ভার বর্জন করতে করতে ভবিষ্যতের ছোট গল্প এমন একটা অবস্থায় পৌঁছুবে—যখন কবিতার সঙ্গে একমাত্র আঙ্গিকে ছাড়া আর কোনো পার্থক্যই তার থাকবে না। আর আঙ্গিকের কথাই কি জোর করে বলা যায়? আজকাল তো বিশুদ্ধ গদ্যের মতোই কাব্যকলা ফ্রান্স থেকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। নিছক খবরের কাগজের রিপোর্টের মতো বিবৃতিকেও গল্প বলে চালিয়েছেন হালের বিশিষ্ট মার্কিন গল্প-লেখক জন ও-হারা।

একালের ছোট গল্প কবিতার কতখানি কাছাকাছি এসেছে, নোবেল্ পুরস্কারখ্যাত পার্ লাগের্কভিস্ট্ (Lagerkvist)-এর একটি গল্প থেকে তার নিদর্শন নেওয়া যাক। গল্পটি খুব ছোট—নাম "প্রেম ও মৃত্যু" (Love and Death)। সম্পূর্ণভাবেই অনুবাদ করে দিচ্ছি:

"একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমি পথে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম আমার প্রিয়ার সঙ্গে। একটা অন্ধকার বিষণ্ন বাড়ীর পাশ দিয়ে যখন আমরা চলেছি, তখন হঠাৎ তার দ্বার মুক্ত হয়ে গেল আর তমসার ভিতর থেকে জনৈক কন্দর্প (Cupid) একখানি পা বাইরে বাড়িয়ে দিলে। সাধারণ শিশু কন্দর্প সে নয়, একটি বিরাট পেশল পূর্ণবয়স্ক মানুষ —সর্বাঙ্গ তার রোমশ। তাকে দেখতে কোনো অসভ্য তীরন্দাজের মতো। একটা কদাকার ধনুকে তীর যোজনা করে আমার বুকের দিকে লক্ষ্য করল সে। তীর ছুঁড়ল —সেটা এসে আমার বুকে বিদ্ধ হল; তারপরই সে পা-খানা সরিয়ে নিলে আর অন্ধকার দুর্গের মতো সেই বাড়ীটার দরজা বন্ধ করে দিলে। আমি লুটিয়ে পড়লাম, আমার প্রিয়া এগিয়ে চলল। মনে হল, প্রিয়া আমার পড়ে-যাওয়াটা দেখতে পায়নি। যদি দেখত তাহলে নিশ্চয় থেমে দাঁড়াত, আমার জন্য কিছু করতেও পারত হয়তো। প্রিয়া এগিয়ে চলে গেল—খুব সম্ভব ব্যাপারটা সে জানতেই পারল না। আমার রক্ত একটা নর্দমার পথ বেয়ে অনেকখানি পর্যন্ত তাকে অনুসরণ করল—তারপর যখন পথে কেউ রইল না, তখন রক্তের ধারাটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।"

এই হল গল্পটি। আমি একে অক্ষরে অক্ষরে অনুবাদ করে দিয়েছি। কিন্তু

এইটি পড়ে পাঠক মাত্রেরই মনে একটি জিজ্ঞাসাই জাগবে : আধুনিক এবং ভবিষ্যৎ ছোট গল্পের গতি তা হলে কোন্ দিকে ? 'টেল' নয়, 'অ্যানেকডোট্' নয়—এখানে 'ইন্সিডেণ্ট্'-ও সাংকেতিকতায় পর্যবসিত হয়ে গেছে। এ একেবারে গীতি-কবিতার জগতে গিয়ে পেঁছেছে—অথবা বিশুদ্ধ দার্শনিকতার মধ্যে পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে। আঁদ্রে জিদের মতে ল্যাগেকভিস্ট্ কালসন্ধির শিল্পী, পাপ-পুণ্য ধর্মাধর্ম ভালো-মন্দের মাঝখান দিয়ে তিনি "Rope trick" দেখিয়ে চলেছেন ; কিন্তু গল্প এবং কবিতার মধ্যে 'রোপ্‌ট্রিক' দেখানোর অধিকার তাঁর আছে কিনা এ সম্পর্কে সঙ্গতভাবেই জিজ্ঞাসা জাগতে পারে।

ছোট গল্পের এই প্রবণতা দেখে কারো কারো মনে এ সংশয় ইতোমধ্যেই জেগেওছে। তাঁদেরই একজন হচ্ছেন সমারসেট মম। মম ঘটনাহীন বর্ণহীন আধুনিক গল্পের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন :

"Nor is a story any the worse for being neatly built with a beginning, a middle and an end. All good story-writers have done their best to achieve this. It is the fashion of today for writers, under the influence of an inadequate acquaintance with Chekov, to begin anywhere and end inconclusively. They think it enough if they have described a mood, or given an impression, or drawn a character. This is all very well, but it is not a story, and I do not think it satisfies the reader.....There is also today a fear of incident. The result is a spat of drab stories in which nothing happens. I think Chekov is perhaps responsible for this too—"[১]

আধুনিক গল্পের এই রকম পরিণতির জন্য চেকভের দায়িত্ব কতখানি, সে সম্পর্কে মম বলেছেন, চেকভ একবার বৃত্তান্ত ও বৈচিত্র্য-সন্ধানী-গাল্পিকদের কটাক্ষ করে একখানি চিঠিতে লিখেছিলেন, "People do not go to the North Pole and fall of icebergs ; they go to office, quarrel with their wives and eat cabbage soup." অর্থাৎ চেকভ একেবারে পরিচিত জীবন থেকে, চেনা মানুষের দৈনন্দিনতা এবং অতি তুচ্ছতা থেকে ছোট গল্প আহরণ করতে বলেছেন। তার উত্তরে মম বলেছেন —কোনো কোনো লোক তো উত্তর মেরুতেও যায় এবং তাদের সবাই-ই হয়তো আইস্-বার্গ থেকে পড়ে না, কিন্তু নানা রকমের বিপদ-আপদও তাদের ঘটে থাকে। তাদের নিয়েই বা ভালো গল্প লিখতে বাধা কোথায় ? আর যারা অফিসে যায়—তাদের কেউ কেউ অফিসের ক্যাশও ভাঙে, স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করতে করতে স্ত্রীকে কেউ খুনও করে। বাঁধাকপির ঝোল খাওয়ার মধ্যেও পারিবারিক জীবনের তৃপ্তি বা অশান্তি সংকেতিত হতে পারে—তার মধ্যেও আইস্‌বার্গ থেকে পতিত হওয়ার মতো কোনো বিপর্যয় নিহিত থাকতে পারে। এক কথায় সাধারণ দিনযাত্রার মধ্যে যে-কোনো সময় অসাধারণ কিছু

১। 'Creatures of Circumstance', The Author Excuses Himself. P—৪.

ঘটে বসতে পারে, তাদের গল্পের বিষয় করলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়না ; দৈনন্দিনতার প্রতিটি অন্নকণা থেকেই মাত্র গল্পের মণিমুক্তা আহরণ করতে হবে—এই গোঁড়ামির অর্থ কী ?

কাজেই গল্পে ঘটনা নিন্দনীয় নয়—বরং তা গল্পের মেরুদণ্ড ; জীবনে যখন বৈচিত্র্য অগণিত, দেশে-দেশান্তরে মানুষ যখন অজ্ঞাতপূর্ব বস্তুর সন্ধান লাভ করে এবং অভিনব অভিজ্ঞতা অর্জন করে—তখন তাদের নিয়েই বা গল্প হবে না কেন ? মানুষের মানসিক জটিলতা নিয়ে উচ্চাঙ্গের গল্প হবে, আর আফ্রিকার দুর্গম অরণ্যের রোমাঞ্চকর ঘটনাগুলি হবে গল্প হিসেবে অধম শিল্প ? বাস্তবে সত্যিই যদি কোনো অদ্ভুত ঘটনা ঘটে—কোনো বিচিত্র যোগাযোগ সম্ভাবিত হয়—সাহিত্যে তারা কি অপাংক্তেয় বলেই গণ্য হবে ? আধিপত্য করবে "Drab Stories" ?

মমের অভিযোগ সবটা উড়িয়ে দেওয়ার মতো কিনা আজ তা ভাববার কথা। লাগের্কভিস্টের উদ্ধৃত নমুনাটিকে যদি ভবিষ্যৎ গল্পের পদধ্বনি বলে ধরে নেওয়া যায়, তাহলে এ কথা বলতেই হবে যে আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই ছোট গল্প নামীয় চলতি বস্তুটি চিরতরে লুপ্ত হবে। সাধারণ পাঠক হিসেবে আমরা মনে করি, ছোট গল্পে বিস্তৃত বা সংক্ষিপ্ত কোনো ঘটনা যদি থাকে—আমরা খুশিই হবো, কিন্তু নিছক বৃত্তান্তধর্মী হলে তাকে আমরা সহ্য করব না। আবার ঘটনা পরিহার করেও যদি একটি বিশেষ ভাব বা 'mood'-এর মধ্যেই একটি মহা-মুহূর্ত কেউ এনে দিতে পারেন এবং মানব-চরিত্র বা জীবন-রহস্যের কোনো বিশালতার দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করতে পারেন, তাহলে তাঁকেও আমরা পরম সমাদরেই গ্রহণ করব।

ঘটনা-বর্জিত হয়েও কী অপরূপ ছোট গল্প যে গড়ে উঠতে পারে তার উদাহরণ দিচ্ছি আধুনিক মার্কিন গল্প-লেখক জেরোম ওয়াইড্‌ম্যান থেকে। ওয়াইড্‌ম্যান আমেরিকার নতুন গল্প-লেখকদের মধ্যে সবচাইতে দীপ্তিমান, কারো কারো মতে তিনি আর্নেস্ট হেমিংওয়ের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী।

ওয়াইড্‌ম্যানের একটি গল্পের নাম : "বাবা অন্ধকারে বসে থাকেন" (My Father sits in the Dark)।[১]

উত্তম পুরুষে এটি বিবৃত হয়েছে। অসামান্য সহজ ভঙ্গিতে আশ্চর্য ব্যঞ্জনাময় গল্পটি। বিষয়বস্তু আর কিছুই নয়, উত্তম পুরুষের পিতা একা অন্ধকারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকেন :

"আমার বাবার একটা অদ্ভুত অভ্যাস আছে। একা অন্ধকারে বসে থাকতে তিনি ভালোবাসেন। কখনো আমি অনেক রাতে বাড়ীতে ফিরি। তখন সারা বাড়ী অন্ধকার…আমি রান্নাঘরে একবার জল খেতে যাই। আমার খালি পায়ে কোনো শব্দ হয় না। আমি ঘরে পা দিয়ে প্রায় বাবার উপরেই গিয়ে পড়ি। রান্নাঘরের একটা

১। 'সাহিত্যে ছোট গল্প' প্রকাশিত হওয়ার প্রায় দু'বছর পরে ওয়াইড্‌ম্যানের যে শ্রেষ্ঠ গল্প-সংকলনটি মুদ্রিত হয়েছে, তার নামকরণ করেছেন লেখক : 'My Father sits in the Dark'। বর্তমান সমালোচকের তৃপ্তি এইখানেই যে আলোচনাপ্রসঙ্গে সে লেখকের প্রতিনিধিস্থানীয় গল্পটিকেই নির্বাচন করতে পেরেছিল।

চেয়ারে পাজামা পরে বাবা বসে আছেন, পাইপ খাচ্ছেন তিনি।

'Hello Pop'—I say.

'Hello Son.'

'Why don't you go to bed, pa.'

'I will'—he says.

কিন্তু বাবা ওঠেন না। অনেক পরে যখন আমি ঘুমিয়ে পড়তে যাচ্ছি, তখনও টের পাই—বাবা নিশ্চিন্ত ভাবে বসে আছেন ওইখানেই—পাইপ খাচ্ছেন। এ প্রায় প্রাত্যহিক নিয়ম। একদিন জল খেতে গিয়ে ছেলে হঠাৎ রান্নাঘরের আলোটি জেবলে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গেই বাপ চমকে উঠল : 'নিভিয়ে দাও—আলো নিভিয়ে দাও। আলো জবালা থাকলে আমি ভাবতে পারি না!'

আলো নিভিয়ে অন্ধকারে বসে বাপের এ কিসের ভাবনা? ছেলের মন তার উত্তর খোঁজে।

"I begin to think I understand. I remember the stories of his boyhood in Austria."

সেখানে ঠাকুর্দার একটি ছোট মদের দোকান। রাত গভীর হয়েছে—খরিদ্দারেরা চলে গেছে, ঠাকুর্দার চোখেও ঝিমুনি নেমে এসেছে, গজমান আগুনের শেষ ক্রোধ ঝকঝক করছে একরাশ জবলন্ত কয়লায়। ঘরটা ক্রমেই অন্ধকার থেকে গভীরতর অন্ধকারের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। আর "I see a small boy, crouched on a pile of twigs at one side of the huge fireplace, his starry gaze fixed on the dull remains of the dead flames. The boy is my father."

কর্মজীবন থেকে ছুটি পাওয়া একটি মানুষ—বহু দূর নিউইয়র্কের অন্ধকার রান্নাঘরে, আধনেভা উনুনের দিকে তাকিয়ে, মাতৃভূমি অস্ট্রিয়ায় তার শৈশবের মধ্যে ফিরে যায়। কত বছর আর কত মাইলের ওপারে।

"Then I remember. I turn back. 'What you think about, Pop?' I ask. His voice seems to come from far away. It is quiet and even again, 'Nothing,' he says softly, 'Nothing special'."

"Nothing special"—কথাটি শুধু অন্ধকারে বসে থাকা মানুষটিরই নয়—যেন সমস্ত গল্পটিরই মর্মধ্বনি। বিশেষ কিছুই নয়, কোনো বড় ঘটনা নেই, কোনো উপাখ্যান বা বৃত্তান্ত নেই—কোনো তীক্ষ্ণ মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণও নেই। মহা-মুহূর্ত যদি থাকে, তবে তা ওই হঠাৎ আলোটি জবালানোর ভিতরে। সমারসেট মম কী বলবেন জানি না—কিন্তু কী আশ্চর্য সুন্দর গল্পটি! এর মধ্যে যদি কোনো রূপক থাকে তাহলে সে হয়তো দিনের ঊর্ধ্বশ্বাস কর্মসংগ্রামের পর শ্রান্ত রাত্রির অন্ধকারে নিউইয়র্কে বসে নির্বাসিত ইয়োরোপের কোমল বেদনায় স্মৃতিমন্থন : বহু দূরে ফেলে আসা দানিয়ুব-রাইনের একটি স্বপ্নছবি।

ভবিষ্যৎ ছোট গল্পের তা হলে এই-ই কি রূপ? আখ্যায়িকা নয়, বৃত্তান্ত নয়, প্রতীতিজাত একমুখী ইঙ্গিতধর্মী কাহিনীও নয়? তার উপকরণ-আয়োজন এমনি সহজ, এমনি গভীর, আর বাইরে থেকে মনে হবে : "Nothing—nothing special?"

॥ নয় ॥

গল্প ঃ রূপে রূপে

কী নিয়ে ছোট গল্প হতে পারে ?

জবাব বোধ হয় আন্তন চেকভই দিয়েছেন ঃ 'কী নিয়েই বা ছোট গল্প হতে পারে না ?' ওয়াল্‌ট্‌ হুইটম্যান বলেছিলেন, 'Reject nothing'—অবশ্য কবিতায় ; এবং তা নিয়ে ডি এইচ্‌ লরেন্স তাঁকে ঠাট্টা করেছেন। কিন্তু ছোট গল্পের ক্ষেত্রে ওই ঠাট্টাটি একালে অচল। বাঁধাকপির ঝোলও যে গল্পের কাজে লাগতে পারে—চেকভ তা বলেছেন।

গল্পের উপাদান যেমন আজকাল জীবনের যে-কোনো জায়গা থেকে আহরণ করা যায়, তেমনি একালের 'প্রকাশ-প্রতীক' (Expressive symbol)-টিও হবে সহজ, নিকট। শিলার এবং শেক্‌সপীয়ার দু'জনেই নাট্যকার—দু'জনেই একটা ভয়ংকর বিপর্যয়ের রূপ ফোটাবার জন্য প্রতীক খুঁজেছেন। কোনো সমালোচক সকৌতুকে বলেছেন ঃ 'এ কাজ করবার জন্য শিলার একখানা গ্রাম পোড়াবেন আর শেক্‌সপীয়ার একখানি রুমাল ফেলে দেবেন মাত্র।' আধুনিকেরা আরো সহজের সন্ধানী।

এযুগের শিল্পীমাত্রেই সরল পরিচিত প্রতীকের আশ্রয় নিতে চান। তাকে করতে চান নিরাভরণ, ব্যঞ্জনাময় এবং 'Nothing special' ঃ অণোরণীয়ানের মধ্যেই তাঁরা মহতোমহীয়ানকে রূপায়িত করবার অভিলাষী। রবীন্দ্রনাথ এবং জীবনানন্দ দাশ দুজনেই রোম্যাণ্টিক কবি। স্থূল, সংঘাতময় ও সৌন্দর্যহীন বর্তমান থেকে তাঁরা দুজনেই অতীতের মায়ালোকে যাত্রা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন 'স্বপ্ন'—'দূরে বহুদূরে, স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে' তাঁকে অনেকখানি সময় নিয়ে পরিক্রমা করতে হয়েছে, আর জীবনানন্দ তাঁর 'বনলতা সেন'-এ অনেক সংক্ষেপে অভীষ্ট অর্জন করেছেন ঃ

"চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা
চোখে তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য—"

রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দের তুলনামূলক সমালোচনা এ অবশ্যই নয়, আশা করি কেউ সেভাবে একে গ্রহণও করবেন না। রবীন্দ্রনাথ থেকে জীবনানন্দ পর্যন্ত প্রতীক ও প্রকাশ কত নিকট ও সহজ হয়ে এসেছে, মাত্র সেটুকুই লক্ষণীয়।

লেখকের ব্যক্তিত্ব, তাঁর সমাজ-পরিবেশ এবং সর্বোপরি তাঁর শিল্পবোধ—এদের প্রভাবেই তাঁর প্রকাশ-প্রতীক গড়ে ওঠে। একটা ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে সমারসেট মম উত্তর মেরুতে যাত্রা করবেন—আবার আন্তন চেকভ হয়তো মস্কোর একটি দীন-দরিদ্র কেরানীর জীবনেই তা খুঁজে পাবেন। প্রেমের আদিম রূপ দেখাবার জন্যে মোপাসাঁ লিখেছেন 'মারোক্কা', আর বাল্‌জাক লিখেছেন 'ইউন পাশিঅঁ দাঁ লা দেজ্যার্‌'—অর্থাৎ 'মরু-বাসনা'। একজনের প্রতীক হল নারী আর একজনের প্রতীক বাঘিনী। আবার তারাশঙ্কর অনুরূপ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছেন আরো সহজ পরিচিত প্রতীকের আশ্রয়ে—'নারী ও নাগিনী'তে একটি সাপিনীকে অবলম্বন করে।

তাহলে গল্প-লেখক তাঁর অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নিজের প্রতীক নির্বাচন করে নেবেন। শিল্প-রচনায় সরলতা ও ব্যঞ্জনামুখ্যতার এই যুগে পূর্বসংস্কারাশ্রয়ী (conventional) বা কষ্টকল্পিত কোনো প্রতীক আর প্রশংসার্হ নয়। এযুগে স্বল্পশক্তিমান লেখকই বিশেষ ধরণের চমকপ্রদ ও পরম্পরাগত প্রতীককে গ্রহণ করে, তারাই প্রেমের গল্প লিখতে গিয়ে চাঁদের আলো, পাখির গান, টিউলিপ-কার্নেশান ফুলের পরিবেশ আর অপূর্ব রূপবতী নায়িকা ছাড়া ভাবতে পারে না ; বীরত্বের কাহিনী বলতে হলে তারাই 'সিংহ-হৃদয় রিচার্ডের' মতো অলৌকিক শক্তিমানকে কল্পনা করে ; তুলির একটিমাত্র টানেই রেখাকে ছন্দিত করতে পারে না বলেই রঙের পর রঙ বুলিয়ে যায়।

অথচ গুণীর হাতে ভাঙা টালীতেও 'জলতরঙ্গে'র ঝঙ্কার বাজে ; কারাগারের দেওয়ালে পোড়া কাঠকয়লা দিয়েই মাস্টারপিস্ ছবির জন্ম হয় ; গ্রাম পোড়াবার দরকার হয় না—একটি রুমাল ফেলে দিয়েই শিল্পী তাঁর কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করেন। সিদ্ধ রূপকারের ছোঁয়ায় যে-কোনো বিষয়বস্তুই ভাবে আর ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত হয়ে ওঠে।

চেকভ যে কোরোলেঙ্কোকে বলেছিলেন, একটি অ্যাশ্-ট্রেকে অবলম্বন করেই তিনি গল্প লিখতে পারেন, সে দাবী তাঁর অত্যুক্তি নয়। অ্যাশ-ট্রে হোক, মাঠে দড়ি-বাঁধা সেই অসহায় বুড়ো ঘোড়াটি হোক, জনহীন গলিপথে একটি ম্লান গ্যাসের আলো হোক, কিংবা কারখানার পাশে জলার মধ্যে পড়ে থাকা জ্যোৎস্নাঝকিত পুরোনো ভাঙা বোতলটিই হোক —যার আশ্রয়ে : 'Stubtle comment on human nature, on the permanent relationships between people, their variety, their expectedness and their unexpectedness" পাওয়া যাবে—তাই আধার হয়ে উঠবে।

ধরা যাক—একটি বিশাল বাড়ীর শূন্য জনহীনতা ফোটাতে হবে ; লেখক অখণ্ড নিস্তব্ধতার মধ্যে একটি কুকুরের কান্না দিয়েই সেটিকে রূপায়িত করতে পারেন। যেদিন দাড়ি কামানো হয়নি—সেদিন বিকেলেই বাঞ্ছিতা মেয়েটির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল—এর মধ্যে দিয়ে নায়কের মনে সুগভীর হীনম্মন্যতার সৃষ্টি হতে পারে। শিশু-চিত্তের গভীরতম বেদনার প্রকাশ এবং জীবনের নির্মমতার স্বরূপ ফোটাতে কুকুরটা বেড়ালের বাচ্চাগুলোকে খেয়ে ফেলল (চেকভের 'An Incident')—এইটুকুই যথেষ্ট মনে হতে পারে। অলৌকিক আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য পো "আশার বংশের পতনকাহিনী" লিখেছেন, অন্যত্র মোপাসাঁর নিতান্ত সহজ উপকরণে রচিত একটি গল্পে জলের তলায় অজ্ঞাত কারণে নোঙর আটকে যাওয়ার পর নিঃসঙ্গ মাঝি সারারাত যে রহস্যময় আতঙ্কে পীড়িত হয়েছিল, তার রসাবেদন পো-র চাইতে ন্যূন বলে পাঠকের মনে হবে না। আবার অতি আধুনিক লেখক সামনের বাড়ির কাচের জানালায় মাত্র কয়েকটি কালো ছায়ার সঞ্চারেই হয়তো তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবেন।

তাই সমারসেট মমের কিঞ্চিৎ আপত্তি সত্ত্বেও একালীন গল্পকে যে-কোনো প্রতীক অবলম্বন করলেই চলে। মহৎ, বিশাল ভাবকে ফোটাতে আর মহান্ বিরাট আয়োজন করতে হয় না। ছোট গল্পের আন্তর-সত্যকে প্রকাশের প্রয়োজনে এযুগে :

"The death of a cat will suffice ; a child's tears ; a friendship

ruined ; an unkind teacher ; a sad day ; a holiday in the country ; "barbell's touch"....(O' Faolain)

বহুমুখী প্রতীককে আশ্রয় করে মানুষের আত্ম ও বিশ্ব-জিজ্ঞাসা অসংখ্য স্রোতে ছোট গল্পের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছে। এদের শ্রেণীনির্ণয় স্বভাবতই দুরূহ কাজ। বর্তমান কালের অজস্র জটিলতার মতোই ছোট গল্পও অজস্রভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। তা-সত্ত্বেও বোঝবার সুবিধের জন্য তাদের সাধারণ কয়েকটি ভাগে সাজিয়ে দেওয়া দরকার। সংক্ষেপে ছোট গল্পের ত্রিবিধ প্রবণতা দেখা যায় : ঘটনামুখ্যতা, চরিত্রমুখ্যতা, ও ভাবমুখ্যতা। প্রথম পর্যায়ের গল্প ঘটনার বৈচিত্র্যের উপরেই নির্ভর করে এবং 'বৃত্তান্তের' দিকে ঝুঁকে পড়বার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা তার মধ্যে থাকে। দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্প একটি বিশেষ ব্যক্তি-চরিত্রকে অথবা মানবচরিত্রের কোনো একটি অপূর্বতাকেই পরিস্ফুট করবার চেষ্টা করে। তৃতীয় পর্যায়ের গল্প কোনো অনুভূতি, উপলব্ধি বা আবেগকে প্রকাশ করে—এই জাতীয় রচনাতেই দার্শনিকতা ও কাব্যধর্মিতার অঙ্কুর নিহিত থাকে। এই তিনটি মূল ভাগকে আবার নানা উপভাগে বিভক্ত করা যায়। বলা বাহুল্য, এ-রকম শ্রেণীবিভাগ কখনোই সম্পূর্ণ হতে পারে না, এতে অবশ্যই পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের অবকাশ থাকে। তবু আলোচনার প্রয়োজনে এখানে চলনসই রকমের একটি বিন্যাস করে দেওয়া গেল :

(১) দার্শনিক
(২) সমাজ সমস্যামূলক
(৩) নারী-পুরুষের মধ্যগত সম্পর্ক ও প্রশ্নাত্মক
(৪) মনস্তাত্ত্বিক
(৫) রোম্যাণ্টিক
৬) চরিত্রাত্মক
(৭) রূপক
(৮) ব্যঙ্গমূলক
(৯) কাব্যধর্মী
(১০) আদর্শাত্মক, রাজনৈতিক
(১১) অতিলৌকিক
(১২) বিচিত্র

এই বিভাগের অসম্পূর্ণতা মার্জনীয়।

আর একটি কথা বলা দরকার। এদের আলাদা আলাদা ভাবে ভাগ করা হয়েছে বটে, কিন্তু মিশ্রভাবেও এরা অবস্থান করতে পরে। কাব্যধর্মী গল্প রোম্যাণ্টিক হতে পারে, সমাজজিজ্ঞাসামুখ্য গল্পের চরিত্রাত্মক হতে বাধা নেই, আবার আদর্শাত্মক গল্প দার্শনিক হয়ে উঠতে পারে, রূপক গল্প স্বচ্ছন্দেই ব্যঙ্গের পসরা বয়ে আনতে পারে। গল্প মিশ্র হলেও যে ধর্মটি প্রাধান্য পেয়েছে সেই অনুযায়ীই আমরা তাকে চিহ্নিত করব।

দার্শনিক পর্যায়ের গল্পগুলি সাধারণ সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিষয়বস্তুর পর্যায়ে পড়ে না। এরা এক গভীর ও রহস্যময় উপলব্ধির স্তরে গিয়ে পৌঁছোয়, সেইজন্য

কখনো কখনো এদের মধ্যে অস্পষ্টতার আবির্ভাবও ঘটতে পারে। আমার মনে হয়, ন্যাথানিয়াল হথর্নের হাতেই এই পর্যায়ের গল্পের প্রথম সূচনা হয়েছিল—তাঁর 'David Swan' প্রভৃতিই এর সর্বাদি অঙ্কুর। তারপর অনেকেই এসেছেন। ডি এইচ লরেন্স্ এবং আধুনিক উইলিয়াম সারোয়ানের গল্পগুলিতে প্রচুর দার্শনিকতার সন্ধান মেলে। এই কপার্ডের এ ধরনের অসাধারণ সব গল্প রয়েছে—ফ্রাসোয়া মরিয়াকের কয়েকটি লেখার কথাও মনে আসছে। লাগের্কভিস্টের "The Lift that went down to Hell" বোধ হয় আধুনিক যুগে এই পদ্ধতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প। নমুনা হিসাবে তাঁর 'পিতা ও আমি' (Father and I) গল্পটির সংক্ষিপ্ত রূপ উদ্ধৃত করা যাক :

"বাবা রেলে কাজ করেন। আমার দশ বছর বয়সের সময় একদিন তিনি আমাকে সঙ্গে করে রেললাইন ধরে জঙ্গলের দিকে বেড়াতে নিয়ে গেলেন।

যেতে আমার খুব ভালো লাগছিল। সুন্দর দিনটি। টেলিগ্রাফের তার, সবুজ গাছপালা—ফল, গৃহস্থের আতিথ্য, নদী—তার পুল। সব বাবার চেনা। সবই তিনি জানেন। একটা ট্রেন যাচ্ছিল, তার ড্রাইভার হেসে তাঁকে সম্ভাষণ করে গেল। বাবার সবই চেনা—আমারও কোনো ভাবনা নেই।

চমৎকার একটা বিকেল কাটল। আমরা যখন ফিরে আসছি, তখন নামল অন্ধকার। আশ্চর্য, দিনের আলোয় যারা এত সুন্দর রাত্রে তাদের এত খারাপ দেখায় কেন? গাছ-পালাগুলো যেন কেমন হয়ে যায়—টেলিগ্রাফের তারগুলোকে ভূতের মতো লাগে দেখতে।

'বাবা, অন্ধকার হলে সব এত ভয়ঙ্কর লাগে কেন?'—ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

'ভয়ের কিছু নেই খোকা'—বাবার জবাব এল : 'যতক্ষণ ভগবান আছেন, ততক্ষণ কোনো ভয় নেই।' কিন্তু আমার কেমন খারাপ লাগছিল। ভারী নিঃসঙ্গ—একান্ত পরিত্যক্ত মনে হচ্ছিল নিজেকে। তারপর আমরা যখন বাঁক ঘুরছিলাম, তখন লাইনের উপর দিয়ে ঝম্‌ঝম্‌ করে একটা ট্রেন এল।

বাবা আর আমি থেমে দাঁড়ালাম। কিন্তু এ কেমন ট্রেন? একটা আলো নেই—কিছুই নেই! এখন তো কোনো ট্রেনের সময়ও নয়। কী অসম্ভব বেগেই গাড়িটা ছুটছে! ঝড় বয়ে যাচ্ছে ফুলকির। আর বয়লারের কয়লার আগুনে রক্তিম-পাণ্ডুর মুখ একজন ড্রাইভার পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে। বাবা তাকে চেনেন না।

আমি আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। বাবা নিজের মনেই বললেন, 'আশ্চর্য, এটা কোন্ গাড়ি? ড্রাইভারকেও তো চিনতে পারলাম না!'

তবে এ কিসের ট্রেন? এ হচ্ছে লেখকের ভাগ্যরথ—ভবিষ্যতে যখন বাবা আর পথ দেখতে পারবেন না, যখন অনির্দেশের অন্ধকারে উন্মাদের মতো ছুটে যেতে হবে—এই ট্রেন সেই আগামীর বার্তাবাহী : "It was for me, for my sake. I sensed what it meant ; it was the anguish that was to come, the unknown, all that father knew nothing about, that he wouldn't be able to protect me against"—আর জীবনের প্রতীক এই গাড়িটি তাই : "Hurtled, blazing into the darkness that had no end !"

আর্নেস্ট্ হেমিংওয়ের শ্রেষ্ঠ গল্প 'The Snows of Kilimanjaro'—এই

দার্শনিকতার জগতেই এসে মুক্তিলাভ করেছে। মৃত্যুর পরে গল্পের নায়ক হ্যারী যে রহস্যময় বিমানে কিলিমঞ্জোরোর তুষার-শিখরের দিকে উড়ে চলেছে—সে যেন মানুষের উদ্দাম জীবন-চর্চার পর এক চিরবিশ্রামের অনন্ত শান্তিতীর্থ :

"Then they began to climb and they were going to the East it seemed, and then it darkened and they were in a storm, the rain so thick that it seemed like flying through a waterfall, and then they were out and Compie turned his head and grinned and pointed and there, ahead, all he could see, as wide as all the world, great, high and unbelievably white in the sun, was the square top of Kilimanjaro. And then he knew where was he going."

সমাজ-সমস্যামূলক গল্পগুলির পরিচয় বিস্তৃতভাবে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। পৃথিবীর ছোট গল্প-সাহিত্যে এইখানেই সবচেয়ে বড় 'pointing finger'—সবচেয়ে জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা-চিহ্ন। উনিশ শতকের ক্ষুব্ধ বিপর্যস্ত মানসিকতা থেকে এদের যন্ত্রণাতিক্ত উদ্ভব। এরা আজ বিশ্বব্যাপী।

নারী-পুরুষের সমস্যা ও সম্পর্ক-সন্ধানী বিষয় ছোট গল্পের দ্বিতীয় প্রধান শাখা। এর আরম্ভ মানব-ইতিহাসের প্রথম দিন থেকে, এর শেষ হবে মানুষের ইতিবৃত্ত শেষ হলে। 'পঞ্চ-তন্ত্র' যদি এর সূচনা হয়ে থাকে—তাহলে এখন এ কোটি-তন্ত্রে বিসর্পিত হয়েছে। বক্তব্য হিসেবে এর সন্ধান মিলবে বারো আনা নাটক-উপন্যাসে, আট আনা ছোট গল্পে। প্রেম, ঘৃণা, মিলন, বিরহ, হিংসা, কূট-কামনা, অন্তর্দ্বন্দ্ব, সমাজে নারীর মূল্য সবই এর মধ্যে আশ্রিত। এর সঙ্গে সমাজ-সমস্যা মিলে থাকে, মনস্তত্ত্ব প্রায়ই একে পরিবহন করে, রোম্যান্স্ এবং কাব্যসৌন্দর্য একে ঘিরে থাকে জ্যোতির্মণ্ডলের মতো। এ হল মানুষের সর্বাগ্র গল্প, সর্বশেষ গল্প, সবচেয়ে প্রিয় গল্প—এর মধ্যেই 'বিষামৃতে একত্র মিলন'।

মনস্তাত্ত্বিক শাখাটিও ছোট গল্পের অন্যতম মুখ্য সমৃদ্ধি। এর বিকাশকে সবচাইতে আনুকূল্য করেছেন মনোবিজ্ঞানী সিগমুণ্ড্ ফ্রয়েড। গল্প-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিতে ফ্রয়েডবাদের বিশেষ একটি ভূমিকা রয়েছে। এযুগে এই পর্যায়ী গল্পেই লেখকের শক্তির পরিমাপ করা হয়ে থাকে। এর প্রয়োগ সম্পর্কে সর্বপ্রথম সর্বাধিক সচেতন হয়েছিলেন হেন্‌রি জেম্‌স্। জেম্‌স্ জয়েস্ ('ডাবলিনারে'র গল্পগুলি), গ্র্যাহাম গ্রীন, কারেল চাপেক, ফ্রান্‌ৎস কাফ্‌কা বা এইচ ই বেট্‌সের খ্যাতিও এই মননমূলক গল্পগুলির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। বাঙালী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনস্তাত্ত্বিক গল্প আন্তর্জাতিক মানদণ্ডেও রসোত্তীর্ণ।

কিন্তু আধুনিক গল্পের যদি মৃত্যুকেন্দ্র কোথাও থাকে—তাহলে তা-ও এই ধরনের গল্পেই। অন্তরলোকের গহনে গোপনে সন্ধান করতে করতে লেখক এমন একটি ভয়ঙ্কর জায়গায় পেঁছুতে পারেন—যেখানে আদি-প্রবৃত্তির সরীসৃপেরা কিলবিল করছে। আর সেইটেই যদি লেখকের কাছে মানুষের মূল পরিচয় বলে মনে হয়, তাহলে তাঁর জীবনভাষ্য ভয়াবহ রূপ নিতে পারে। তখন তিক্ত পরাভবে এবং রিক্ত মানসিকতায় এক শোচনীয় পঙ্ক-মন্থনই লেখকের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়—সে যেন জেম্‌স্ টমসনের

'প্রেতপুরী'তে অভিশপ্ত জীবন্মৃত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। এ আমরা বাঙালী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও দেখেছি। আরো একটি কথা আছে। ছোট গল্পে বা কাব্যে এ যুগে যে 'অবাচকতা' বা 'অস্পষ্ট বাচকতা'র দোষ দেখা দিয়েছে—আত্যন্তিক মর্ম-মুখিতাই তার কারণ। অস্বচ্ছ অনুভূতি এবং অসংলগ্ন কতগুলো কল্পবিলাস (Fancy) এখন ছোট গল্পের বুদ্বুদ হয়ে ফেটে পড়ছে।

মনস্তাত্ত্বিক গল্প কি ভাবে বিকৃতির বাঁক নিতে পারে, "The Moon is Down" (অস্তমুখী চাঁদ)-খ্যাত জন স্টেইনবেকের লেখা থেকে তার একটি নমুনা সংগ্রহ করা যাক। স্টেইনবেকের "The Long Valley" বইতে গল্পটি আছে। গল্পের নাম "নিজস্ব সর্প" (Snake of One's Own):

"তরুণবয়স্ক ডক্টর ফিলিপ জীব-বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করে। তার ল্যাবরেটরিতে বেড়াল, ইঁদুর, র‍্যাট্‌ল সাপ সবই আছে।

একদিন যখন সে ল্যাবরেটরিতে তারা মাছ নিয়ে পরীক্ষা করছিল সেই সময় সেখানে এসে উপস্থিত হল একটি শীর্ণাঙ্গী তরুণী। তার একটি অভিনব প্রস্তাব আছে। ডাক্তার ফিলিপের কাছ থেকে একটি বিষাক্ত পুরুষ র‍্যাট্‌ল সাপ কিনতে চায় সে।

কিনে নিয়ে সে চলে যাবে? না। সাপটি ডাক্তারের কাছেই থাকবে। সে মধ্যে মধ্যে এসে তার নিজের সাপটিকে খাইয়ে যাবে। আর আপাতত সাপটির খাওয়ার ব্যাপার নিজের চোখেই একবার দেখতে চায় সে।"

এরপর র‍্যাট্‌ল সাপটির গিনিপিগ-ভক্ষণের একটি অদ্ভুত বর্ণনা দিয়েছেন স্টেইন্‌বেক। তার চাইতেও অদ্ভুত হল মেয়েটির বর্ণনা—তার প্রতিক্রিয়া। ইঁদুরকে আক্রমণ করবার আগে সাপের সতর্ক প্রস্তুতি, তার ফণার আন্দোলন, তার হিংস্র ছোবল, তারপর শিকারকে গ্রাস করা—এদের প্রত্যেকটিই মেয়েটির মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে। যেমন ছোবল দেবার আগে সাপটির মাথা:

"Weaved slowly back and forth aiming, getting distance, aiming"—আর সঙ্গে সঙ্গে "She was weaving too, not much, just a suggestion—"

স্পষ্টতই অসুস্থ চিত্ত-বিকৃতির গল্প। ফ্রয়েডীয় মতে এর যে ব্যাখ্যা করা যায়—সেটির উপস্থাপনা অনাবশ্যক। কিন্তু বেশ বোঝা যায়, মনস্তত্ত্বজিজ্ঞাসু গল্প অত্যন্ত পিচ্ছিল একটি জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে।

এবং সেই পিচ্ছিলতায় যদি একবার পদস্খলন ঘটে, তাহলে কী দুর্ঘটনা যে ঘটতে পারে তার নিদর্শন দেখিয়েছেন টেনেসি উইলিয়ামস্‌। ইনি এ যুগের 'অভিজাত' লেখকদের অন্যতম, এঁর অধিকাংশ বইয়ের মূল্য সাধারণ পাঠকের ক্রয়-ক্ষমতার বাইরে থাকে। দারুণ শক্তিধর লেখক, 'A Street Car Named Desire' প্রমুখ কয়েকটি চাঞ্চল্যকর নাটকের ইনি প্রখ্যাত রচয়িতা। বিকৃত মনস্তত্ত্বের দু'একটি উৎকট গল্প জাঁ পল্‌ সার্ত্রও লিখেছেন—তাঁর "Intimacy" নামীয় বহুল প্রচারিত সংগ্রহটিতে তা প্রাপ্তব্য। কিন্তু অবক্ষয়ী মানস-বিকৃতির দিক থেকে টেনেসি উইলিয়াম্‌সের কাছেও বোধ হয় সার্ত্র পৌঁছুতে পারবেন না। উইলিয়ামসের 'কামনা এবং কৃষ্ণ সংবাহক' ("Desire and the Black Masseur"—"One Arm" নামে গল্পের বইটি দ্রষ্টব্য)

সম্ভবত আধুনিক পৃথিবীর ভয়ালতম গল্প। অন্তত আমি যতগুলি গল্প পড়েছি—তাদের মধ্যে কোথাও এর দ্বিতীয় সমতুল পাই নি। বিশ্ববিখ্যাত (বিখ্যাত বলা যায় কি ?) এই গল্পে একজন যৌনবিকারগ্রস্ত শ্বেতাঙ্গ অ্যাণ্টনি বার্ণস্ ও দৈত্যাকার একজন নিগ্রো সংবাহকের এক অবিশ্বাস্য কুটিল কাহিনী বিবৃত করা হয়েছে। দু'জনের মধ্যগত জঘন্য সম্পর্কের অবসান ঘটল নিগ্রোর হাতে বার্ণসের হত্যায়—কিন্তু সেইখানেই তা শেষ নয়। প্রেতলোকের বিভীষিকার মতো সেই নিগ্রো দৈত্যটা চব্বিশ ঘণ্টা ধরে বার্ণসের মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেলো—শুধু হাড়ের স্তূপ ছাড়া কিছুই আর অবশিষ্ট রইল না! তারপর সেই নিগ্রো :

"Moved to another city, obtained employment once more as an expert masseur. And there in a white-curtained place, serenly conscious of fate bring toward him another, to suffer atonement as it had been suffered by Burns, he stood impassively waiting inside a milky white door for the next to arrive—"

সাদার পটভূমিতে কালোর এই রাক্ষসমূর্তি—এ কী প্রতীক ? এই কালো কি আপাতশুভ্র সভ্যতার বিকৃত বাসনার রঙ ? এবং এই বীভৎস বিকারের শিকার কি সমগ্র সভ্যতা ?

মনস্তত্ত্বের বিন্দুতে সিন্ধু এনেছেন উইলিয়ামস্—গল্পের শেষে শোনা যাচ্ছে তাঁর তত্ত্ব : "meantime, slowly with barely a thought of so doing the earth's whole population"—রাত্রির কালো আঙুলের এবং দিনের শ্বেত আঙুলের স্পর্শে এই পরিণামের পথে এগোতে এগোতে প্রমাণ করছে : "perfection was slowly evolved through torture."

গভীর কোনো দার্শনিক বক্তব্য গল্পটিতে আছে মনে হয়—যদিও সেটি সুস্পষ্ট নয়। কোন্ যন্ত্রণাময় পূর্ণতার কথা উইলিয়াম্স্ বলেছেন তিনিই জানেন, কিন্তু মনস্তত্ত্ব বা প্রতীকিতার নামে এমন ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের জন্ম যেন পৃথিবীর সাহিত্যে বেশি না হয়—সুস্থ স্বাভাবিক পাঠক মাত্রেই এই কামনা করবেন।

চরিত্রাত্মক গল্পগুলি ব্যাপক অর্থে মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক ও নরনারী সমস্যার মধ্যে এসে পড়ে, তবু এদের নিজস্বতা আছে। একটি বিশেষ চরিত্রের চিত্ত-স্বাতন্ত্র্য, তার একটি ক্রমাভিব্যক্তি এবং সর্বশেষে একটি অপরিজ্ঞাত অপূর্বতার উপরে আলোকপাত এই ধরণের গল্পে থাকে। এই চরিত্র-রচনার জন্যই চেকভ "The Master" খ্যাতি অর্জন করেছেন। এ ছাড়া মোপাসাঁ, গোর্কী ও মম প্রভৃতি চরিত্রমূলক ভালো গল্প লিখেছেন। মোপাসাঁর 'মারোক্কা', গোর্কীর 'চেলকাশ্', মমের 'শ্রীযুক্ত সবজান্তা' (Mr. Know All) এই ধরনের সেরা গল্পের নিদর্শন। ফক্নারের 'এমিলির জন্য একটি গোলাপ' (A Rose for Emily) একটি ভয়াল চরিত্রাত্মক গল্প—বার্ধক্যের পদধ্বনি-ভীতা এমিলি তার প্রণয়ীকে চিরন্তন করে রাখবার জন্যে পর্ফিরিয়ার প্রেমিকের মতো আর্সেনিক প্রয়োগে হত্যা করেছিল।

রোম্যান্টিক গল্প পাঠকের কাছে চিরদিনই পরম আদরের সামগ্রী। সমাজ ও জীবন সমস্যার নানা জ্বালা-যন্ত্রণার দহনের মধ্যখানে তারা যেন পান্থপাদপ। রোম্যান্টিক

মননের আলোয় প্রকৃতি এক অপ্রাকৃত সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়—কামনা প্রেমের জ্যোতির্ময় মুক্তি লাভ করে, দেহ পায় দেহাতীতের বর্ণালী, জীবনের মুহূর্তগুলি সুরভিতে মন্থর হয়ে ওঠে। চিত্তের স্বাভাবিক প্রবণতায় এ ধরণের গল্প দুটি-চারটি সবাই-ই লিখতে চেয়েছেন; চেকভ লিখেছেন, দোদের অনেক ক'টি লেখাই অপরূপ হয়ে আছে, এমন কি মোপাসাঁও চেষ্টা করে দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথের হাতে রোম্যান্টিক গল্প কী রসব্যঞ্জনা লাভ করেছে, পরবর্তী অধ্যায়ে অন্য প্রসঙ্গে তার নিদর্শন আমরা দেব। অকাল-মৃতা ক্যাথারিন ম্যানস্‌ফিল্‌ডের ছোট গল্পগুলি যাঁরা পড়েছেন তাঁরা সেগুলিকে ভুলতে পারবেন না।

আধুনিক রোম্যান্টিক গল্পের মনোরম নিদর্শন হিসেবে রবার্ট হোয়াইটহেডের একটি কাহিনীকে সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাক :

"তারা দু'জনে পরস্পরকে গভীরভাবে ভালোবাসে। ভালোবাসে প্রথম যৌবনের সমস্ত স্বপ্ন, মাধুর্য আর পবিত্রতা দিয়ে।

কিন্তু সময় এল যখন ছেলেটিকে কিছুকালের জন্য দূর বিদেশে চলে যেতে হবে।

বিচ্ছেদের আগে তারা একসঙ্গে বেড়াতে বেরুল, পৌঁছুল সেখানে, যেখানে শুধু নির্জন নদীর তীর আর আকাশ-গলা চাঁদের আলো।

আমরা দু'জনে আলাদা হয়ে যাব। কতদিনের জন্য। কিন্তু আজকের এই ভালোবাসাকে কি এই বিচ্ছেদের মধ্য দিয়েও আমরা সম্মান করতে পারব—রাখতে পারব প্রেমের এই বিশ্বাসকে?

'এসো, আমরা শপথ করি'—মেয়েটি বললে।

কী সেই শপথ?

'এসো—এই চাঁদের আলোয়, এই আকাশের নীচে আমরা দু'জনে ক্ষণকালের মতো অনাবৃত হয়ে দাঁড়াই, তাকিয়ে দেখি দু'জনের দিকে। পৃথিবীতে দেহের চাইতে সুন্দর এবং স্বর্গীয় আর কিছুই নেই। এই দেহই হোক আমাদের প্রতিজ্ঞাপত্র'

সেই চন্দনবর্ণ চাঁদের আলোয়—সেই নির্জন নদীর ধারে দু'জনে মুখোমুখি দাঁড়ালো। দু'টি নির্মল নিরাবরণ দেহ—নবজাতকের মতো পবিত্র, প্রথম ফোটা পদ্মের মতো সুন্দর—চাঁদের আলোয় যেন গ্রীক ভাস্করের হাতে গড়া দুটি মর্মর মূর্তি। হুইট্‌ম্যানের সর্বোত্তম স্বপ্নে রচিত মানুষের শরীর।

এটির রোম্যান্টিক্‌ সৌন্দর্য আশা করি ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। আর এ থেকে বোঝা যায় এই রকম গল্পগুলি কত সহজে কাব্যধর্মিতার মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যেতে পারে। চেকভের 'চুম্বন' তো শেষে কবিতার মধ্যেই হারিয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' আগাগোড়াই কবিতা—এমন কি ভাষা পর্যন্ত ছন্দে ছন্দে নেচে উঠেছে। তুর্গেনেভ আর অস্‌কার ওয়াইল্‌ড্‌ প্রায় চিহ্নিত করে দিয়েই "Poems in Prose" লিখেছেন।

রূপক গল্প নামেই পরিচয় বহন করে। বাচ্যার্থের সঙ্গে এদের দ্বিতীয় অর্থ চলে সমান্তরাল রেখায়। একদিক থেকে অবশ্য শিল্পকৃতি মাত্রেই রূপক, কিন্তু আমরা সে ব্যাপক অর্থের কথা বলছি না; রবীন্দ্রনাথের 'একটি আষাঢ়ে গল্প' এর উদাহরণ, মোপাসাঁর ঘোড়ার কাহিনী 'Coco'র উল্লেখ তো আগেই করা হয়েছে। এইচ জি

ওয়েল্‌সের 'শেষ বিচারের দিন' (The Last Day of Judgement') থেকে রূপক গল্পের ভালো নমুনা পাওয়া যাবে :

"পৃথিবীর সব মানুষ মরে গেছে। কেউই বাকী নেই আর। এবার ঈশ্বরের দরবারে শেষ বিচারের দিন।

দেবদূতদের শিঙা বজ্ররবে ধ্বনিত হল। ডাক পড়ল সম্রাট থেকে ভিখারি অবধি সকলেরই। কবর থেকে একে একে উঠে এল সবাই : কেন্‌, অ্যাবেল, সেণ্ট্‌ পল থেকে শুরু করে পৃথিবীর শেষ মানুষটি পর্যন্ত।

ঈশ্বর বসে আছেন বিচারকের আসনে। মহাকাশ পরিব্যাপ্ত করে তাঁর মহিমময় বিশাল রূপ—নক্ষত্র-মালিকা চরণ প্রদক্ষিণ করে আবর্তিত হচ্ছে। পৃথিবীর সব মানুষ যখন তাঁর সম্মুখে এসে সমবেত হল, তখন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন তিনি। মাত্র এই ক'জন! মাত্র এই ক'টি পৃথিবীর জনসংখ্যা!

পাশ থেকে দেবদূত মাইকেলের নিবেদন শোনা গেল : 'গ্রহটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র ছিল, প্রভু!'

দরবারে ডাক পড়তে লাগল।

প্রথমেই এল আদিপাতকী কেন্‌। সহোদর অ্যাবেল্‌কে হত্যা করেছিল—মহাপাপী সে। নিজের অপরাধের কথা নিবেদন করল অনুতপ্ত চিত্তে। ঈশ্বর মৃদু হাসলেন, তাকে তুলে নিয়ে রাখলেন নিজের জামার আস্তিনে।

তারপর অ্যাবেল্‌। সে জানালো তার সারল্যের কথা, বিনা দোষে অপমৃত্যুর কথা। এলেন সেণ্ট্‌ পল, বললেন ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করবার জন্য কত কৃচ্ছ্রসাধন করেছেন তিনি। একের পর এক এসে সকলে স্বীকারোক্তি করে যেতে লাগল। কেউ পাপী, কেউ পুণ্যবান ; কেউ সাধু, কেউ দস্যু ; কেউ হত—কেউ বা ঘাতক।

ঈশ্বর কোনো কথা বললেন না। নির্বিকারভাবে প্রত্যেককেই তুলে তুলে জামার আস্তিনে রাখতে লাগলেন।

কতটুকু গ্রহ—ক'জনই বা মানুষ! বিচার শেষ হতে বেশি সময় লাগল না। তারপর ঈশ্বর হাসলেন—কোটি সূর্যদীপিত সে হাসি। বললেন, 'বিপুল অনন্ত আকাশের মহারাজ্যে তোমরা তুচ্ছতম বিন্দুমাত্র। পাপ-পুণ্যের তোমরা কী জানো—কী-ই বা বোঝো! তোমাদের ভক্তির মূল্য কী—তোমাদের নাস্তিকতাতেই বা কা'র কী এসে যায়! ও-সব নিয়ে মিথ্যে দুশ্চিন্তা কোরো না. আমার জন্যও তোমাদের মাথা ঘামাতে হবে না।'

পায়ের নিচে মানবধাত্রী বসুন্ধরাকে দেখা যাচ্ছে—উজ্জ্বল-সুন্দর-বর্ণময় একটি ছোট্ট গোলক। যেমন করে পিঁপড়ে ঝেড়ে ফেলা হয় তেম্‌নিভাবেই ঈশ্বর তাঁর আস্তিনটিকে ঝেড়ে দিলেন পৃথিবীর উপর—পড়ন্ত জীববিন্দুগুলিকে ডাক দিয়ে বললেন, "যাও, নতুন করে দেখো জীবনকে।"

তথাকথিত নীতি, ধর্ম বা পাপ-পুণ্য সম্পর্কে ফেবিয়ান সোশ্যালিস্ট্‌ ওয়েল্‌সের বক্র মনোভঙ্গিটি রূপকের আশ্রয়ে এই গল্পের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠাবান ইংরেজ লেখক জন কোলিয়ার (Collier) নিয়মিত রূপক গল্প লিখছেন। অস্‌কার ওয়াইল্‌ডের সর্বজনপরিচিত 'গোলাপ ও নাইটিঙ্গেল', 'কুৎসিত বামন' (The Ugly Dwarf)

রোম্যাণ্টিক রূপকের নমুনা। ই এম ফরস্টার (Forster) কয়েকটি উচ্চশ্রেণীর রূপক গল্প লিখেছেন—তাঁর 'স্বর্গীয় অমনিবাস' (The Celestial Omnibus) আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অসাধারণ সৃষ্টি। সাহিত্য-শিল্প-সঙ্গীতের স্বর্গে প্রবেশের কে অধিকারী, কল্পনাময় শিশুমন না বুদ্ধিবাদী অবিশ্বাসী পাণ্ডিত্য—তার একটা চমৎকার উত্তর আছে এই গল্পে। ফরস্টারের 'বেড়ার ওধার' (The Other Side of Hedge) গল্পটি আরো অপূর্ব। এযুগে রূপকধর্মী গল্প রচনার একটা প্রবণতাই গড়ে উঠেছে বলে মনে হয়। গল্পকে ব্যঞ্জনাধর্মিতার দিকে নিয়ে গিয়ে ক্রমশ তার প্রকাশ প্রতীকটিকে একটু সুদূর করে তোলবার ঝোঁক এসেছে বোধ হয় স্বাভাবিক কারণেই ; এবং কবিতার সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করতে গিয়ে লাগের্কভিস্টের 'Love and Death' (যার বঙ্গানুবাদ আমরা করে দিয়েছি) জাতীয় গল্প সম্ভাবিত হচ্ছে। টেনেসি উইলিয়ামসের গল্প স্পষ্টই রূপকের ধার ঘেঁষে চলেছে, গ্রাহাম গ্রীনের ক্ষেত্রেও তাই—এইচ্ ই বেট্সের কোনো কোনো গল্প, যেমন "The Elephant's Nest on the Rhubarb Tree" স্পষ্টই দ্বিতীয়ার্থে বিন্যস্ত। জটিল মনস্তত্ত্বের সঙ্গে এই রূপক প্রতীকী প্রবণতাই ভবিষ্যৎ ছোট গল্পের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ করবে বলে অনুমান করা যায়।

ব্যঙ্গাত্মক গল্প প্রধানত সামাজিক, রাজনীতিক ও যৌন-সমস্যাকে আশ্রয় করে ক্ষুরধার বক্র হাসিতে আত্মপ্রকাশ করে। ভল্ত্যারের 'কাঁদিদ' (Candide) এই পর্যায়ে পৃথিবীর সর্বকালীন শ্রেষ্ঠ গল্পের অন্যতম। মার্ক টোয়াইনেরও অনেকগুলি ভালো গল্প রয়েছে ; চেকভের 'বহুরূপী' (Chamelon) গল্পে জেনারেলের ভাইয়ের কুকুরকে নিয়ে পুলিশের কর্তব্যবোধের উপর তীব্র চাবুক চালানো হয়েছে—পূর্বেই তা আমরা দেখেছি। ও. হেনরিও এই প্রসঙ্গে স্মতর্ব্য, তাঁর 'পুলিশ এবং ধর্মগীতি' (The Cop and the Anthem) অথবা 'অদৃষ্টের পথ' (Roads of Destiny) ব্যঙ্গ গল্পের ভালো নিদর্শন। প্রথম গল্পটির নায়ক দাগী চোর 'সোপি' চেষ্টা করেও কিছুতেই জেলে যেতে পারছে না ; অথচ জেলে আশ্রয় পাওয়াটা তার নিতান্তই দরকার, নইলে থাকা-খাওয়ার কোনো উপায়ই হচ্ছে না। কিন্তু বিবিধ চেষ্টাতেও কিছুতেই যখন জেলে যাওয়ার উদ্দেশ্য সফল হল না, তখন অন্যরকম প্রতিক্রিয়া ঘটল সোপির মনে। সব দেখেশুনে ভাবল, এইবার সে ভালো হবে, সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মতো জীবনযাপন করবে ; একজন তাকে ট্রাক-ড্রাইভারের চাকরি দিতে চেয়েছিল সেটা সে সংগ্রহ করে নেবে। এইভাবে যখন দাগী চোরের চিত্তে পরিবর্তনের ঢেউ এসেছে, তখন ঃ

"Soapy felt a hand laid on his arm. He looked quickly around into the broad face of a policeman."

'—কী করছ এখানে ?'—পুলিশের জিজ্ঞাসা।

'কিছুই না—' সোপির জবাব।

'চলে এসো তা হলে'—শান্তি-রক্ষকের আদেশ।

পরের দিন পুলিশ কোর্টে ম্যাজিস্ট্রেট্ বললেন, 'তিন মাসের জেল (in the Island) !'

একালে ইতালীর পিরান্দেল্লো এবং আলবের্তো মোরাভিয়াও ব্যঙ্গাত্মক গল্পে

স্মরণীয়।

আদর্শাত্মক ও রাজনৈতিক গল্পও পৃথিবীর সমস্ত প্রধান লেখকেরই আছে। কৃষক ও গণজীবন নিয়ে তলস্তয় যেসব গল্প লিখেছেন, সেগুলিতে তাঁর উজ্জ্বল আদর্শবাদ ও মানবত্বের মহিমা ঘোষিত হয়েছে। এই গল্পগুলি কেবল আদর্শপ্রধান নয়—শিল্প হিসেবেও সাদরে গ্রহণীয়। আর যে-কোনো সমাজ-সচেতন শিল্পীই সমকালীন রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন এবং দেশ ও জনসাধারণ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও বক্তব্য গল্পসাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। রাজনৈতিক গল্পের নিদর্শন হিসেবে আমরা উল্লেখ করতে পারি আঁদ্রেভের 'যে সাতজনের ফাঁসি হয়েছিল' (The Seven that were Hanged' কিংবা গোর্কীর '৯ই জুলাই' ('The Ninth of July')-এর। আদর্শাত্মক গল্পের বলিষ্ঠতম আধুনিক নমুনা হেমিংওয়ের 'The Old Man and the Sea'। গোর্কীর শ্রেষ্ঠ গল্প 'মানুষের জন্ম' (The Birth of a Man) অবিনশ্বর রচনা ; 'মানুষের জন্ম' কেবল সমুদ্রতীরে একটি কৃষক শিশুরই আবির্ভাব নয়—এর তাৎপর্য :

"The new inhabitant of the land of Russia, the man of unknown destiny, was lying in my arms, snoring heavily. The sea, all covered with white lace trimming, slashed and surged on the shore. The bushes whispered to each other. The sun shone as it passed the meridian—"

নবজাত শিশুর জন্মকে সারা পৃথিবী যেন অভিনন্দন জানাচ্ছে,—তার বন্দনে মন্দ্রিত হচ্ছে সাগর, পত্রমর্মর আশীর্বাদ করছে, মধ্যাহ্ন-সূর্য তার ললাটে বর্ষণ করছে অভিষেকের কিরণধারা। ওয়াল্ট্ হুইটম্যান এই গল্প পড়লে নিশ্চয় এর উপরে কবিতা লিখতেন।

সাহিত্য-পাঠকের কাছে ভৌতিক গল্পেরও একটা বিশিষ্ট মূল্য আছে। এরা শুধু অতিলৌকিকতার জগৎ সৃষ্টি ক'রে—অবিশ্বাস্যতা ও রোমাঞ্চের যৌথ চাতুর্যে পাঠকের মনকে অভিভূত ক'রে একটা সুলভ আনন্দই পরিবেষণ করে না। অলৌকিক গল্পের আসল সৌন্দর্য রোমাঞ্চে নয়—আরো গভীরচারী রোম্যান্সের গহনে। জীবনের সীমান্ত পার হয়ে গেলে কী আছে সেখানে ? কোন্ অপরূপ অজ্ঞাত বিস্ময় সেখানে মানুষের জন্য অপেক্ষা করছে ? প্রকৃতির অন্তরালে আরো কোনো গোপন শক্তি নিহিত আছে কি ? সে কি ক্রূর ভয়ংকর, অথবা মানুষের পক্ষে কল্যাণময় ?

উত্তর কেউ জানে না। তাই অতি-প্রাকৃতের কল্পনায় রোম্যান্টিক চেতনা বার বার আন্দোলিত, শিহরিত হয়েছে। কোল্রিজ, টেনিসন এই জগতে কল্পনাকে ভাসিয়ে দিয়েছেন, কীট্সের উৎসুক মনে এরই চাঞ্চল্য ফুটে উঠেছে। প্রাচীন প্রাসাদ, ঐতিহাসিক দুর্গ, পরিত্যক্ত ধ্বংসস্তূপ—কোন্ সুদূরের লুপ্ত স্মৃতিকে সুতীব্র অনুভূতি-সজাগ মনের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে ঝংকারে ঝংকারে জাগিয়ে দিয়েছে। প্রাচীন গীর্জার প্রাচীনতম সমাধিগুলি কত অব্যক্ত সংগুপ্ত জীবনদ্বন্দ্বকে বহন করছে তার ইতিহাসের নেপথ্যে।

শুধু তাই নয়। ইয়োরোপে ডাকিনী-তন্ত্রের লীলাভূমিই হল জার্মানির ব্রোকেন-

হার্জ পর্বতমালা, যেখানে আজও হয়তো 'Wal-purgis Night'-এ শয়তানের সঙ্গে মিলনের জন্যে ডাকিনীরা সমবেত হয়। গোয়্টের ফাউস্টে এই উদ্দাম রাত্রির বিবরণ মেলে। এই দেশেই ইয়োরোপের প্রাচীনতম অলৌকিক কাহিনী 'ফাউস্টে'র আবির্ভাব, ম্যুসে (Musset), মার্লো এবং গোয়্টে সে কাহিনীকে অমররূপে শিল্পিত করেছেন। এর মধ্যে মানুষের চিরন্তন আত্মদ্বন্দ্বের কাহিনী—শয়তানের সঙ্গে দেবত্বের সংগ্রাম, পুণ্যের সঙ্গে পাপের ঘাত-প্রতিঘাত।

মানুষের ভূমিকা কী ? সে যেন এক অসহায় ক্রীড়নক। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই অন্ধকার শক্তির পাশ তার কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে—সে মার্লোর ভাষায় আর্তনাদ করে ওঠে : 'Mountains and hills, come, come, and fall on me and hide me from the eyes of heaven !' এই নেপথ্য তামস-শক্তি—ঈশ্বর ছাড়া যার হাত থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না, তারই আধুনিক রূপায়ণ 'The House of Dracula'।

মৃত্যুর রহস্য, অলক্ষ্য ভয়াল শক্তির আতঙ্ক, রোম্যান্সের অতৃপ্তি, ডাকিনী-বিদ্যায় ও মন্ত্রতন্ত্রের শক্তির উপর বিশ্বাস—এইগুলিই নানা জাতের অলৌকিক গল্পের জন্ম দিয়েছে। মোপাসাঁর বিখ্যাত 'La Horla', পো-র 'The Black Cat', স্টিভেন্সনের কিছু কিছু গল্প সেই অন্ধকার শক্তিরই বীভৎস প্রকাশ। হফ্মানের 'The Lost Reflection'-এর উৎসও এইখানে। অদৃশ্য নিয়তিরূপী কতগুলো দুর্জ্ঞেয় আর দুজ্ঞের্য় প্রভাবকে এই পর্যায়ের গল্পে অনুভব করেছেন হথর্ন। আবার রোম্যান্সের করুণ বেদনায় ও. হেন্রির 'The Furnished Room' রোমাঞ্চিত। ওয়াল্টার ডি লা মেয়ারের কয়েকটি গল্পে রোম্যান্সের অনুরণন।

মন্ত্রতন্ত্র, ডাকিনী-বিদ্যা, প্রাচীন গীর্জার রহস্যঘন স্তব্ধতা—এইগুলির ভিত্তিতে যিনি অসাধারণ সব গল্প লিখে এ যুগের বিশিষ্ট ভৌতিক কাহিনীকার হয়েছেন, তিনি স্বনামধন্য প্রত্নতত্ত্ববিদ মণ্টেগু আর জেম্স। জেম্সের 'Casting the Runes', 'Lost Hearts', 'Number 13', 'The Ash Tree'—অথবা 'Oh, whistle and I 'll come to you, My Lad—' এই মন্ত্রবিশ্বাসমূলক গল্পের নিদারুণ উদাহরণ। এইগুলি ছাড়াও আরো কিছু শ্বাসরোধী ভৌতিক গল্প লিখে মণ্টেগু আর জেম্স বহু পাঠকের জন্য দুঃস্বপ্নের রাত্রি সৃষ্টি করেছেন। ডাবলু ডাবলু জেকব্সের 'The Monkey's Paw'—যা স্পষ্টতই বালজাকের 'মারাত্মক চামড়া' থেকে অনুপ্রাণিত—তাও একালের একটি শ্রেষ্ঠ ভয়াবহ কাহিনী।

তবুও জেম্সের গল্পে পাঠক যতটা অলৌকিক শিহরণ পান, ঠিক সেই পরিমাণে সাহিত্যের স্বাদ পান না। ওয়াটার ডি লা মেয়ার এদিক থেকে আমাদের কিছু তৃপ্তি দেন, ও হেন্রির 'সাজানো কক্ষ'ও অপরূপ—তাতে রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণে'র স্পর্শ আছে। কিন্তু ভৌতিক গল্পকে যিনি উঁচুদরের সাহিত্যে রূপান্তরিত করেছেন, তিনি নিঃসন্দেহে খ্যাতনামা ইংরেজ লেখক অ্যালজারনন ব্ল্যাকউড (Algernon Blackwood)।

ব্ল্যাকউড নিছক ভৌতিক গল্পের রচয়িতাই নন, অলৌকিকতার সব ক'টি দিক নিয়েই তিনি নানা পরীক্ষা করেছেন। মনস্তত্ত্ব, দার্শনিক দৃষ্টি এবং কবি-কল্পনার সঙ্গে প্রথম

শ্রেণীর সাহিত্যপ্রতিভা মিশে গিয়ে ব্ল্যাকউডের গল্পগুলোকে শিল্প হিসেবেই স্মরণীয় করেছে। অর্থাৎ এরা মাত্র অতি-প্রাকৃতের বৈশিষ্ট্যেই স্বতন্ত্র নয়—উঁচুদরের ছোট গল্প রূপেই আমাদের পুলকিত করে।

ব্ল্যাকউডের "The Doll" যেমন প্রেততন্ত্রের অতি ভয়ংকর গল্প, তেমনি "Running-Wolt"-এ রেড্ ইণ্ডিয়ানদের বিশ্বাস-সংস্কারের এক অপূর্ব কাহিনী মেডিসিন লেকের মনোরম পরিবেশে আত্মিকরূপী একটি নেকড়ের মাধ্যমে পরিবেষিত হয়েছে। "The Valley of the Beasts" পশু-দেবতার নিজ সাম্রাজ্যের অদ্ভুত কাহিনী। "The Decoy" দাম্পত্য-বিশ্বাসঘাতকতা, স্বামীর অন্তর্যন্ত্রণা এবং অভিশপ্ত ভৌতিক বাড়ীর শ্বাসরোধী আতঙ্কে নিদারুণ হয়ে উঠেছে। "The South Wind" যেন প্রকৃতির ওপর রচিত একটি কবিতা, "The Touch of Pan" লিখবার জন্য পৃথিবীর যে-কোনো প্রথম শ্রেণীর গল্প-লেখক গর্বিত হতে পারেন। "The Man whom the Trees Loved" অথবা "The Lost Valley" তো আন্তর্জাতিক মহিমান্বিত।

ব্ল্যাকউডের সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে গেলে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখতে হয়—এখানে তার অবকাশ নেই। কিন্তু অতিলৌকিক উপকরণ যে কত বিচিত্ররূপী হতে পারে, রোম্যাণ্টিক্ এবং দার্শনিক চেতনার স্পর্শে স্থূল ভৌতিকতা অথবা রক্ত-জমানো আতঙ্ক সৃষ্টির কত উর্ধ্বে উঠে যেতে পারে ব্ল্যাকউডের গল্প তারই প্রমাণ। কোনো কোনো সমালোচকের এ উক্তি নিঃসন্দেহে সত্য যে এড্গার অ্যালান পো-র পরে এই পথের সর্বোজ্জল প্রতিভাই হলেন অ্যালজারনন ব্ল্যাকউড।

হাসির গল্পে বিশ্বসাহিত্যে কয়েকজনই দিক্পাল এসেছেন—তাদের মধ্যে মার্ক টোয়াইন, 'সাকি' ছদ্মনামী মুনরো, জেরোম কে জেরোম, স্টিফেন লিকক এবং এরিক্ নাইট্ আছেন—পি জি উড্হাউসকেও একেবারে অপাংক্তেয় করলে অপরাধ হবে। টোয়াইনের 'The Man that Corrupted Hadleyburg' 'Cannibalism in the Cars', 'The £1,000, 000 Banknote' এবং 'Celebrated Jumping Frog' অসাধারণ বস্তু। মুনরোর ক্লভিসের (Clovis) গল্প, নাইটের 'Sammy Small' (The Flying Yorkshireman) এবং উডহাউসের জীভ্স (Jeeves), উক্রিজ্ (Ukridge) এবং শ্রীযুক্ত মুলিনার (Mr. Mulliner) অতুলনীয়।

গোয়েন্দা-কাহিনীর সূত্রপাত করেছিলেন এডগার অ্যালান পো—সে আমরা আগেই দেখেছি। মাত্র অপরাধমূলক বিষয়বস্তু নিয়ে রোমাঞ্চ সৃষ্টিই ভালো গোয়েন্দা-গল্পের উদ্দেশ্য নয়; বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি, যুক্তির তীক্ষ্নতা, পর্যবেক্ষণ শক্তি (Power of Observation) এবং সিদ্ধান্তে পেঁছুবার নৈপুণ্যে ভালো গোয়েন্দা-গল্পের লেখক উঁচুদরের মনীষী, অবশ্যই 'থ্রিলার' ব্যবসায়ীরা এ পর্যায়ে পড়েন না। অ্যালান পোর পরে নানাভাবে এর শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছেন এড্গার ওয়ালেস, ই ফিলিপস্ ওপেনহাইম প্রভৃতি। সাম্প্রতিক আমেরিকান লেখক ড্যানিয়েল হ্যামেটের নামও উল্লেখযোগ্য। স্বনামধন্যা আগাথা ক্রিস্টি এবং ডরোথি এল সেয়াস্র্ চমৎকার সব গোয়েন্দা গল্প লিখেছেন। অপেক্ষাকৃত অপরিচিত হ্যারী ওয়েড্ (Harry Wade) গোয়েন্দা-গল্পে উল্লেখযোগ্য শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। বিচিত্রকর্মা জি কে চেস্টারটন ফাদার ব্রাউনকে নিয়ে অপরূপ কতকগুলি গল্প লিখেছেন, তাঁর মনীষা এবং রসিকতার দীপ্তিতে সেগুলি

সমুজ্জ্বল। আর আছেন মহামহিম স্যার আর্থার কোনান ডয়েল—যাঁর খরবুদ্ধি রহস্যভেদী ব্যক্তিটি বিশ্বসাহিত্যে অমর, জীবন্তবৎ প্রত্যক্ষ এবং যাঁর গৌরবে শার্লক হোমস্ প্রদর্শনী পর্যন্ত হয়ে থাকে। পো এবং কোনান ডয়েলের বহু গল্প অনুরূপ অপরাধমূলকতার ক্ষেত্রে পরবর্তী গোয়েন্দাদের যথার্থ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে এ কথা বিস্ময়কর হলেও সত্য।

এ ছাড়া বৈজ্ঞানিক কল্পনা ও অনুমানভিত্তিক এক ধরণের গল্প—যাকে "Science Fiction" বলা হয়, তা-ও আজকাল গোয়েন্দা-গল্পের মতো জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এইচ জি ওয়েলস্ এর প্রথম প্রেরণা। সম্প্রতি—'Space"-এর যুগে এই জাতীয় গল্প ক্রমেই সমৃদ্ধি লাভ করছে।

আপাতত এইভাবে ছোট গল্পের একটি শ্রেণীবিভাগ করা গেল। কিন্তু রসিক পাঠক মাত্রেই বুঝবেন—এ বিভাগ নিতান্তই কৃত্রিম এবং নিছক বহিরঙ্গমূলক। কোন্ গল্প কতটা মনস্তাত্ত্বিক এবং মনস্তত্ত্বের একটি অংশ সমাজ-সমস্যার মধ্যে প্রতিফলিত হতে পারে কিনা? কোন্ গল্পের কতখানি রোম্যান্টিক স্পন্দন, কতটাই বা দর্শন? (এ. ই কপার্ডের গল্প পড়তে গিয়ে এ প্রশ্ন জাগে) রূপক এবং দার্শনিক গল্প এক হয়ে যেতে পারে কিনা? কাব্যধর্মী ও রোমান্টিক গল্পের সীমারেখা কোথায় টানব?

এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া দুঃসাধ্য। ব্যক্তিগত উপলব্ধি বা রসবোধের পার্থক্য থাকবে, মত ও মনের ঐক্যও খুঁজে পাওয়া কঠিন। তাছাড়া মানুষের চিত্তগত জটিলতা, তার অগণ্য জিজ্ঞাসা, বহু বিচিত্র উপলব্ধি, তার আরক্তিম কামনার স্পন্দন, তার দূরযানী স্বপ্ন, অদ্ভুত যোগাযোগ এবং অবিশ্বাস্য ঘটনারা এমন শত-সহস্র মুখেই ছোট গল্পের উপকরণ বয়ে আনে যে এ ধরণের শ্রেণীবিভাগ কখনোই সম্পূর্ণ হতে পারে না। আবার বিভাগের ব্যাপারেও—যে কথা বলছিলাম—সীমারেখার (যেমন আমি যেটিকে আলাদা-ভাবে রূপক বলব, আর একজন হয়তো সেটিকে দার্শনিক বলে চিহ্নিত করবেন) এবং রুচির প্রশ্ন আসে। তবু সমালোচনার প্রয়োজনে বৈজ্ঞানিক একটি বিন্যাস করতে গেলে কয়েকটা সূত্র ঠিক করে না নিয়ে আমাদের উপায় নেই। তাই বিতর্ক-উদ্দীপক হলেও এই প্রয়াসটুকুর দায়িত্ব নিতেই হয়েছে।

তবু ছোটগল্প যে জাতেরই হোক, রাজনীতি, মনস্তত্ত্ব, দর্শন, অপরাধ, বৈজ্ঞানিক কল্পনা—যাই তার অবলম্বন হোক—মূলে গল্প তাকে হতেই হবে। তার রূপ-রীতির স্বাতন্ত্র্যে, নিজের মহিমায় সে বিশিষ্ট হয়ে থাকবে—উপন্যাসের অনুচর হয়ে থাকবে না, অথবা গদ্যকবিতার পরম রমণীয় আকর্ষণে ঝাঁপিয়ে পড়বে না—লাগেরকভিস্টের প্রলোভন সত্ত্বেও, আশা করি, সে সম্পর্কে আমরা সচেতন থাকব।

॥ দশ ॥

একটি ছোট গল্প : বিশ্লেষণ

আধুনিক ছোট গল্পের সংজ্ঞা, রূপ এবং শ্রেণী নিয়ে নানাভাবে আমরা আলোচনা করেছি। এখন এগুলির প্রয়োগে আমরা যে-কোনো একটি গল্পকে বিচার করে দেখতে পারি। বিচারের কাজে আমরা এইভাবে অগ্রসর হবো :

(ক) প্রথমেই গল্পটির শ্রেণী নির্ণয়।

(খ) দ্বিতীয় বিচার্য, গল্পটির মধ্যে একটিমাত্র 'মহা-মুহূর্ত' বা 'চরম ক্ষণ' (Climax) সৃষ্টি করা হয়েছে কিনা ; গল্পটি ঘটনাশ্রয়ী হোক, কোনো বিশেষ ভাবের পরিবাহক হোক বা কোনো চরিত্রের প্রকাশমূলকই হোক—সেটি উপযুক্ত তীব্রতা বা গভীরতা লাভ করেছে কিনা।

(গ) তৃতীয় বিচার্য, ভাবের একমুখিতা রক্ষা করা হয়েছে কিনা এবং অনাবশ্যক অতি-বিস্তার আছে কিনা ; আখ্যায়িকার বা বৃত্তান্তের প্রবণতা লেখাটির সার্থক ছোট গল্প হওয়ায় পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে কিনা।

(ঘ) চতুর্থ দ্রষ্টব্য, প্রকাশভঙ্গির মধ্যে বিবৃতিমূলকতার চাইতে পরোক্ষ ইঙ্গিত-ধর্মিতা (Indirect suggestiveness)-ই প্রাধান্য লাভ করেছে কিনা ; বিষয়বস্তু অনুযায়ী লেখকের ভাষার উপযোগ্যতাও পরীক্ষণীয়।

ঙ) পঞ্চম বিচার্য, দেশ, কাল ও জীবন-দর্শনের দ্বারা গঠিত লেখকের ব্যক্তিত্ব এর মধ্যে কতখানি প্রতিফলিত।

(চ) সর্বশেষে, নামকরণের যৌক্তিকতা বিচার।

এই আলোচনার প্রয়োজনে একটি সর্বজনপরিচিত গল্পকেই বেছে নিতে পারি ঃ রবীন্দ্রনাথের 'এক রাত্রি'।

আলোচনার সুবিধের জন্য এই গল্পটির একটুখানি সংক্ষিপ্ত রূপ প্রথমে বর্ণনা করা যাক।

গল্পটি পরিবেষিত হয়েছে এর নায়ক উত্তম পুরুষের জবানবন্দিতে। এই উত্তম পুরুষটির নাম গল্পের কোথাও উল্লেখ করা হয়নি, তাই আমরা তাঁকে নায়ক নামেই চিহ্নিত করে নিলাম ঃ

নায়ক আর সুরবালা আশৈশব প্রতিবেশী। একসঙ্গে একই পাঠশালায় পড়া এবং বউ-বউ খেলা। অভিভাবকেরা বলতেন, এদের দুটিতে বেশ মানায়। তাই সুরবালার প্রতি নায়কের প্রথমাবধিই একটা অনুকম্পা এবং সহজ প্রভুত্বের মনোভাব ছিল।

গ্রামের একটি লোকের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে নায়ক ভাবল, জীবনের সবচাইতে বড় সার্থকতাই হল কলকাতায় গিয়ে লেখাপড়া শিখে আদালতের নাজির বা হেড্‌ক্লার্ক হওয়া। সুতরাং সেও একদিন বাড়ী থেকে পালিয়ে কলকাতার এসে পৌঁছুল।

কিন্তু কলকাতায় এসে তার জীবনের ধারা বদলে গেল। দেশে তখন রাজনীতির প্রবল ঢেউ উঠেছে। নাজির বা পেশ্‌কার হওয়ার চাইতে 'গ্যারিবল্‌ডি' কিংবা 'ম্যাটসিনি' হওয়াটাকেই সে বৃহত্তর লক্ষ্য বলে মনে করল। মফঃস্বলের ছেলে—সরলচিত্তে একেবারে সম্পূর্ণভাবেই দেশের কাজে নামল।

এই সময় সুরবালার বাপ এবং নায়কের বাপ তাদের দুজনের মধ্যে বিয়ের ব্যবস্থা পাকাপাকি করে ফেলেছেন। যথাকালে বিবাহের আসনে বসবার জন্য পাত্রের ডাক পড়ল। কিন্তু দেশের কাজে সমর্পিতপ্রাণ তরুণটির বিয়ে করবার সময় ছিল না—প্রবৃত্তিও না। তার অনিচ্ছা সে পত্রপাট জানিয়ে দিলে। অতএব কিছুদিন পরে উকিল রামলোচন রায়ের সঙ্গে সুরবালার বিয়ে হয়ে গেল। বৃহৎ দেশের কাজে ব্যস্ত, আদর্শের স্বপ্নে বিভোর এবং নাগরিক জীবনে কর্মচঞ্চল মানুষটি এই তুচ্ছ সংবাদে

সেদিন ভ্রূক্ষেপও করল না।

এনট্রান্স্ এবং এফ-এ পাস করবার পর অকস্মাৎ তাকে আবিষ্কার করতে হল যে দেশোদ্ধারের চাইতেও আরো বড় সমস্যা জীবনে আছে। বাপ মারা গেছেন, মা এবং দুটি ভগ্নীর দায়িত্ব এসে পড়েছে তার কাঁধের উপর। অগত্যা দেশজননীকে ছেড়ে নিজের জননীর দিকেই দৃষ্টি দিতে হল—জুটিয়ে নিতে হল নওয়াখালি অঞ্চলের একটি স্কুলের সেকেণ্ড্ মাস্টারি। ছাত্রদের মনে দেশপ্রেম সঞ্চার করার সাধু ইচ্ছাটি তখনো ছিল, কিন্তু হেড্ মাস্টারের একটি ভ্রূকুটিতে সেটি সূচনাতেই সমূলে উৎপাটিত হল।

নিঃসঙ্গ শূন্যমন মানুষটির একা দিন কাটে স্কুলেরই একটা খোড়ো-ঘরের আস্তানায়। ঘটনাচক্রে এই স্কুলের কাছেই আবার সরকারী উকিল রামলোচন রায়ের বাসা। নায়কের জানা ছিল, এই রামলোচনের গৃহিণীই হচ্ছে সুরবালা, কিন্তু সেকেণ্ড মাস্টারের কাছে ব্যাপারটায় তখনও কিছুমাত্র গুরুত্ব ছিল না।

কিন্তু একদিন রামলোচনের বাসায় গিয়ে গল্প করতে করতে তার কানে এল, পাশের ঘরে অত্যন্ত মৃদু একটি চুড়ির টুংটাং, কাপড়ের একটুখানি খস্খস্, পায়ের একটু শব্দ এবং জানালার ফাঁকে দুটি চোখের কৌতূহলভরা দৃষ্টির অনুভূতি।

"তৎক্ষণাৎ দুইখানি চোখ আমার মনে পড়িয়া গেল—বিশ্বাস, সরলতা এবং শৈশব-প্রীতিতে ঢলঢল দুখানি বড়ো বড়ো চোখ, কালো কালো চোখের তারা, ঘনকৃষ্ণ পল্লব, স্থির স্নিগ্ধ দৃষ্টি। সহসা হৃৎপিণ্ডকে কে যেন একটা কঠিন মুষ্টির দ্বারা চাপিয়া ধরিল এবং বেদনায় ভিতরটা টন্টন্ করিয়া উঠিল—"

সেই হল যন্ত্রণার আরম্ভ। স্কুলের সেই চালাঘরে, দুপুরের ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্রে 'ঈষৎ উত্তপ্ত বাতাসে নিমগাছের পুষ্পমঞ্জরির সুগন্ধে', অথবা সন্ধ্যায় 'পুষ্করিণীর ধারে সুপারি নারিকেলের অর্থহীন মর্মরধ্বনি' শুনতে শুনতে মনে হত, সুরবালাকে আজ চোখের দেখাও পাপ, সে আজ তার কেউ নয়—অথচ সামান্য ইচ্ছা করলেই সুরবালা তার 'কী না হইতে পারিত!'

তারপর এল সেই 'এক রাত্রি'। রামলোচন রায় সেদিন মোকর্দমা নিয়ে কোথাও বাইরে গেছেন। চালা ঘরে স্কুলমাস্টার একা—রামলোচনের বাড়ীতেও সুরবালা একা। সকাল থেকেই সেদিন দুর্যোগ চলছিল, সন্ধ্যার মুখে তা প্রচণ্ড সাইক্লোন হয়ে ভেঙে পড়ল। তারপর মাঝরাতে সমুদ্রের দিক থেকে ছুটে এল নদী-ছাপানো প্রলয়ংকর জলোচ্ছ্বাস।

প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টায় মাটির ঘর ছেড়ে মাস্টার গিয়ে আশ্রয় নিল পুকুরের দশ-বারো হাত উঁচু পাড়ির উপর, আর সেই সময়েই বিপরীত দিক থেকে আর একটি মানুষও আশ্রয়ের জন্য উঠে এল ঠিক সেইখানটিতেই। সে আর কেউ নয়—স্বয়ং সুরবালা। চারদিকে ঘন অন্ধকার—সমস্ত জলমগ্ন, কেবল পাঁচ-ছয় হাত দ্বীপের উপর দুটি প্রাণী। দুজনে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল—কেউ কাউকে একটা কথা বললে না, একটা কুশল প্রশ্ন পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করল না।

"কেবল দুজনে অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিলাম। পদতলে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ উন্মত্ত মৃত্যুস্রোত গর্জন করিয়া ছুটিয়া চলিল।" আর ঃ

"আজ আমি ছাড়া সুরবালার আর কেহ নাই। কবেকার সেই শৈশবে সুরবালা, কোন এক জন্মান্তর, কোন এক পুরাতন রহস্যান্ধকার হইতে ভাসিয়া, এই সূর্য-চন্দ্রালোকিত লোকপরিপূর্ণ পৃথিবীর উপরে আমারই পার্শ্বে আসিয়া সংলগ্ন হইয়াছিল; আর আজ কতদিন পরে সেই আলোকময় লোকালয় পৃথিবী ছাড়িয়া এই ভয়ংকর জনশূন্য প্রলয়ান্ধকারের মধ্যে সুরবালা একাকিনী আমারই পার্শ্বে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। ·· এখন কেবল আর-একটা ঢেউ আসিলেই পৃথিবীর এই প্রান্তটুকু হইতে, বিচ্ছেদের এই বৃন্ত হইতে, খসিয়া আমরা এক হইয়া যাই।"

কিন্তু সেই ঢেউ যেন না আসে। মাস্টারের মনে নিঃশব্দ প্রার্থনার মতো উচ্চারিত হল: স্বামীসংসার নিয়ে সুরবালা সুখে থাকুক। প্রলয়ের দুর্লগ্ন পার হয়ে গেল—বানের জল নামল, সুরবালা ঘরে গেল, নায়ক ফিরে এল আবার সেই নিঃসঙ্গ চালাঘরে। কিন্তু আর তার যন্ত্রণা নেই—সেই শূন্যতার অনুভূতিও নেই। একটি পরম প্রাপ্তির তৃপ্তিতে তার মন আচ্ছন্ন:

"আমার সমস্ত ইহজীবনে কেবল ক্ষণকালের জন্য একটি অনন্ত রাত্রির উদয় হইয়াছিল—আমার পরমায়ুর সমস্ত দিনরাত্রির মধ্যে সেই একটিমাত্র রাত্রিই আমার তুচ্ছ জীবনের একমাত্র সার্থকতা।"

গল্পটি এই।

'এক রাত্রি'র শ্রেণী নির্ধারণ করতে গেলে প্রথমেই এর ভাব-নিষ্পত্তি লক্ষ্য করতে হবে। এর বক্তব্য কোথায় গিয়ে পেঁছেছে? কোনো সাংসারিক বা সামাজিক সত্যে কি? না। কোনো তত্ত্ব? তা-ও নেই। এটি কি চরিত্রমূলক—যাতে 'incidents should be invented solely to liven personality?' না—চরিত্রায়ণ এ গল্পে একেবারেই গৌণ। রূপকার্থ? না—ফরস্টার, কোলিয়ার কিংবা লাগের্কভিস্টের সঙ্গেও এ গল্পের কোনো মিল নেই।

এর শেষ কথা, সমস্ত লৌকিক ও ব্যবহারিক অর্থ তাৎপর্যকে ছাড়িয়ে এমন একটি বিস্তৃতি লাভ করেছে—অনুভূতি এমন সৌন্দর্যলোকে এর ফলশ্রুতিকে পেঁছে দিয়েছে যে ব্রাউনিঙের 'শেষ অশ্বারোহণের' বিখ্যাত পংক্তিগুলি আমাদের মনে পড়ে যায়:

> "I and my mistress, side by side
> Shall be together, breathe, and ride,
> So one day more I am deified,
> Who knows but the world may end tonight!"

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ব্রাউনিঙের পুরুষ-কঠিন দাবিটি কোথাও নেই—এর মধ্যে শোনা যায় না: "Escape me? Never!" একটি শান্ত ত্যাগে, জীবনের 'পরম-লগন'কে লাভ করবার রোম্যান্টিক তৃপ্তিতে সুগভীর সুর-ঝংকার এতে বেজে উঠেছে। লৌকিক প্রয়োজনের কোনো চরিতার্থতা এতে নেই—এর মধ্যে বাঁশির সুরের আনন্দময় মুক্তি।

সুতরাং আমরা বলতে পারি—গল্পটি কাব্যধর্মী।

গল্পের প্রয়োজনে এতে কিছু কিছু ঘটনার বিন্যাস আছে বটে—কিন্তু এর পরিণাম ঘটনাগত নয় ; অতএব ভাবাশ্রয়ী। কিন্তু ছোট গল্প যে-কোনো পর্যায়েরই হোক এবং তাতে বহিরঙ্গগত যত আয়োজনই থাক—একটি পরম মুহূর্তই তার আসল রসকেন্দ্র। আমরা গল্পের সেই বিশেষ মুহূর্তটিকে অপূর্বভাবে পাই কালরাত্রির সেই ভয়াল জল-গর্জনের মধ্যে : যখন মাত্র পাঁচ-ছয় হাত দ্বীপের উপর কেবল দুটি প্রাণী, যে-কোনো মুহূর্তেই একটি প্রকাণ্ড ঢেউ এসে তাদের ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আর সেই পটভূমিতে—সেই লগ্নে দুজন প্রাণীর নিঃশব্দ প্রতীক্ষা—যারা আজ কেউ কারো নয়, অথচ পরস্পরের 'কী না হইতে পারিত'!

গল্পটির এ ছাড়া আর কোনো মহা-মুহূর্ত নেই, সুতরাং এদিক থেকে রচনাটি সিদ্ধ। যে গভীরতা ও তীব্রতা এই পরম ক্ষণটি সৃষ্টির অনুকূল—উপযুক্ত সংকট ও স্থান-পরিবেশ নির্মিতি দ্বারা তা সার্থকভাবে সঞ্চার করে দেওয়া হয়েছে।

ঘটনা এতে আছে, কিন্তু ঘটনার বৃত্তেই এর সমাপ্তি নয় বলে এ বৃত্তান্ত পরিণতি লাভ করেনি। একেবারে বাল্যকাল থেকে কাহিনীটি আরম্ভ করায় আখ্যায়িকার দিকে গল্প পদক্ষেপ করেছিল, কিন্তু ভাবাত্মক একমুখিতার দিকে লক্ষ্য ছিল বলে লেখক সেটিকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত এবং ইঙ্গিতগর্ভ করেছেন। আদর্শবাদের পরশপাথর খুঁজে খুঁজে ক্ষ্যাপার দিন কাটে, কিন্তু একদিন সে অনুভব করে : একটুখানি প্রেম, জীবনের একটি স্নিগ্ধ নীড়ের দাক্ষিণ্যই তাকে দিতে পারত পরমতম ঐশ্বর্য ; কিন্তু নিজের এই ক্ষতিটিকে যখন সে বুঝতে পারে তখন তার আর সময় নেই। সুরবালাকে সহজেই পাওয়ার অধিকারবোধ থেকে একটা উপেক্ষা, তারপর কর্মক্ষেত্রগত উন্নতির স্বপ্ন এবং পরে দেশোদ্ধারের মরীচিকা—এরা সকলেই পরিণামে তার শোচনীয় বঞ্চনার উপলব্ধিটিকে সম্পূর্ণতা এনে দিয়েছে। তাই ভাবের ঐকলক্ষ্যগতি এতে নিঃসন্দিগ্ধ-ভাবে উপস্থিত হয়েছে। গোড়ার দিকে অতি-বিস্তারের আশঙ্কা ছিল, কিন্তু সচেতন লেখক সতর্কভাবে তাকে একাগ্রতার খাতে নিয়ন্ত্রিত করেছেন। তাই 'এক রাত্রি'তে ছোট গল্পের ধর্মটি সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হয়েছে—তাতে উপন্যাসধর্মী আখ্যায়িকার বিস্তার ঘটেনি বা বৃত্তান্ত তাতে পূর্ণ যতি টেনে দেয়নি।

গল্পের আরম্ভেই এর তির্যক বিন্যাস মূল লক্ষ্যের সূচনা করে দিয়েছে। বিনা বাহুল্যে, বিনা ভূমিকাতে কাহিনী শুরু করে দেওয়া হয়েছে : "একত্রে পাঠশালায় গিয়াছি এবং বউ বউ খেলিয়াছি।" "আমি কেবল জানিতাম সুরবালা আমারই প্রভুত্ব স্বীকার করিবার জন্য পিতৃগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এইজন্য সে আমার বিশেষরূপ অবহেলার পাত্র।" তারপর কাছে-পাওয়া এই সহজ ঐশ্বর্যটিকে তুচ্ছ করে জীবনের নানা আলেয়ার অনুসরণের অংশটুকুকে ব্যঙ্গের ধরণে বিবৃত করায় এদের মধ্যগত মিথ্যার স্বরূপটি সংকেতিত হয়েছে। রামলোচনের ঘরে সুরবালাকে দেখবার পর নায়কের অন্তর্দ্বন্দ্ব, নিম-মঞ্জরির সুগন্ধ আর নারিকেল-সুপারির মর্মরের মধ্য দিয়ে স্বল্প অথচ সুন্দর ইঙ্গিতের সাহায্যে ব্যক্ত করা হয়েছে। সর্বশেষে 'কৃষ্ণবর্ণ উন্মত্ত মৃত্যুস্রোতের গর্জনের' ভিতর দাঁড়িয়ে সেই উপলব্ধিটি ব্যঞ্জনাধর্মিতার মীড়-মূর্ছনায় সুনিবিড় হয়ে উঠেছে। অতএব প্রকাশভঙ্গিতেও বিবৃতিমূলকতার চাইতে ইঙ্গিতধর্মিতাই মুখ্য।

মনে হয় "রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল" থেকে শেষাংটুকু পর্যন্ত না লিখলেও ক্ষতি

ছিল না। "আস্বাদ পাইয়াছি"-এর পরেই গল্পের পূর্ণ রসাস্বাদ আমরা লাভ করি। তবু এই অংশটুকু সংক্ষিপ্ত বলে কাহিনীর ইঙ্গিতময়তা ক্ষুণ্ণ হয়নি।

ভাষায় বিষয়ের পূর্ণ সহযোগিতা রয়েছে। রচনার গতি সম্পূর্ণ অনায়াস, বলবার ভঙ্গীটি আরো অন্তরঙ্গ হয়েছে মৃদু কৌতুকের স্পর্শে। যথা: "দেখিলাম, ভাবী ভারতবর্ষ অপেক্ষা আসন্ন এক্‌জামিনের তাড়া বেশি। ছাত্রদিগকে গ্রামার অ্যাল্‌জেব্রার বহির্ভূত কোনো কথা বলিলে হেড্‌মাস্টার রাগ করে।" কিংবা "রামলোচন রায় উকিল, তাহার বিশেষ করিয়া সুরবালারই স্বামী হইবার কোনো জরুরী আবশ্যক ছিল না। বিবাহের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাহার পক্ষে সুরবালাও যেমন ভবশংকরীও তেমনি।" গল্পের শেষ অংশে কালো মৃত্যুস্রোতের গর্জন ভাবের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় গভীর গম্ভীর ভাষায় মহিমামণ্ডিত হয়ে উঠেছে। প্রথমাংশের মৃদু কৌতুকের কালোচ্ছলতা নদীর প্রবাহের মতো এগিয়ে গিয়ে পরিণতির মৃদঙ্গ-মন্দ্র সমুদ্র-ধ্বনিতে পরিসমাপ্তি লাভ করেছে।

লেখকের ব্যক্তিত্ব (personality)-ও এই গল্পে লক্ষণীয়ভাবে উপস্থিত। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-জীবনে এই সময় "মানসী সোনার তরী"র যুগ চলছে। "মানসী" রবীন্দ্রনাথের দেহগত প্রেমের ব্যর্থতায় কাতর, মনোবাসিনীকে কায়িকারূপে লাভ করে তাঁর সকরুণ আর্তি: 'বৃথা এ অনলভরা দুরন্ত বাসনা।' এর চাইতে 'মেঘদূতে'র সেই অপ্রাপ্তির রূপাভিসারই তাঁর কাম্যতর:

"লভিয়াছি বিরহের স্বর্গলোক, যেথা
চিরনিশি যাপিতেছে বিরহিণী প্রিয়া
অনন্ত সৌন্দর্যমাঝে একাকী জাগিয়া—"

এই 'বিরহের স্বলোক' 'অনন্ত সৌন্দর্যে'র' মধ্যে প্রিয়ার সঙ্গে যে ভাবসম্মিলন, 'এক রাত্রি'র বক্তব্য গল্পের বাস্তব আলম্বন-উদ্দীপনকে আশ্রয় করে ঠিক সেইখানে গিয়েই উত্তীর্ণ হয়েছে। "সোনার তরী"র 'মানসসুন্দরী'তেও প্রিয়ার সঙ্গে এই ভাব-সমাগম:

"আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছ প্রিয়ে,
তোমারে দেখিতে পাই সর্বত্র চাহিয়ে।
ধূপ দগ্ধ হয়ে গেছে, গন্ধবাষ্প তার
পূর্ণ করি ফেলিয়াছে আজি চারিধার—"

তবে এখানে 'পরশবন্ধনে' পাবার আকাঙ্ক্ষাটি আর উপস্থিত নয়; এ প্রেম 'রবিকিরণ হেন'—যা বল্লভাকে 'জ্যোতির্ময় মূর্তি' দান করে। আর শুধু 'মানসী সোনার তরী'ই বা কেন—রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনব্যাপী প্রেম-সাধনা রূপ-শৃঙ্গারেই কৃতকৃতার্থ। দেহপ্রেমের খণ্ড-ক্ষুদ্রতাকে তিনি চিরকালই 'অন্তর্ধান পটে'র উপর ধ্যানের 'চিরন্তনতা'-তে বিন্যস্ত করতে চেয়েছেন—এ-ই তাঁর 'শেষের কবিতা'। তাই 'এক রাত্রি'র নায়ক যখন বলে, 'এই ক্ষণটুকু হোক সেই চিরকাল'—তখন লেখকের প্রেম-সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সে তার সর্বোত্তম প্রাপ্তিকেই পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের রোম্যান্টিক্ যুগের তুঙ্গশিখরে এই গল্পের অবস্থান: তাই অ-ধরা নায়িকা শাশ্বতীর স্বপ্নকমলে অধিষ্ঠিতা, তাই বাসনা-বিহীন ক্ষণ-মিলন চির-মিলনের মহিমায় ভাস্বর। লেখকের বিশেষ-ব্যক্তিত্বটি এই গল্পে অতি স্পষ্টভাবে উপস্থিত, সেইজন্য আমরা নিঃসন্দেহেই বলতে পারি: "It is a

special distillation of personality।" এই ব্যক্তিত্ব স্টাইলের পূর্ণ সুষমায় উদ্ভাসিত হয়েছে।

সমস্ত গল্পটি সনেটের মতো দৃঢ়নিবদ্ধ—প্রতীতির সমগ্রতা নিপুণভাবে রক্ষিত। আর নাম? 'এক রাত্রি' ছাড়া এ গল্পের নামান্তর কল্পনাই করা চলে না—"Only one night—but the eternal night"

॥ এগারো ॥

শেষ কথা

ইতিহাসের পথ বেয়ে ছোট গল্পের সূচনা এবং উনিশ শতকে তার পূর্ণ বিকাশ পর্যন্ত আমরা অগ্রসর হয়েছি। তারপর আধুনিক ছোট গল্পের সংজ্ঞা রূপ, উপাদান ও শ্রেণী ইত্যাদির আলোচনা করেছি। আশা করি, এ থেকে সাহিত্যের এই কনিষ্ঠতম অবদান সম্পর্কে একটি ধারণা এখন গড়ে নেওয়া সম্ভব হবে।

কিন্তু কোনো সংজ্ঞার সাহায্যেই কি কোনো জীবিত, গতিদৃপ্ত শিল্পকে বেঁধে দেওয়া যায়? প্রতিদিন তার নব নব অভিব্যক্তি, নতুন নতুন পরীক্ষা। কালের সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্য ভাবেই সে রূপান্তরিত হতে বাধ্য। তা ছাড়া প্রত্যেকটি মৌলিক স্রষ্টা সচেতনভাবেই পূর্বগামিদের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে চান—পরম্পরাশ্রয়ী অনুবৃত্তির বাইরে বেরিয়ে আসতে চান তিনি। সুতরাং যুগের প্রয়োজনে ভাবের বিবর্তন ঘটে, শিল্পীর সজ্ঞান প্রয়াসে রূপের পরিবর্তন ঘটে যায়; তাই আজকের সংজ্ঞা কাল অচল, আজকের আইনকানুন আগামী কাল সব্যঙ্গে পরিত্যাজ্য।

এতদিন আমরা জানতাম কবিতা পাঠের উদ্দেশ্য হল আনন্দলাভ। কিন্তু একালের সমালোচক সুস্পষ্ট ভাবেই বলেছেন, "Nowadays, reading of poetry is not for pleasure, but for understanding"; এখন কবিতা আর হৃদয়ে বসতি করে না, সে স্থান নিয়েছে মস্তিষ্কে। একদা ছন্দ অলংকার ছিল কবিতার অন্যতম প্রধান গৌরব, এখন তারা যথাসম্ভব বর্জনীয় হয়ে উঠেছে। মিল্টনের কবিতায় যিনি একমাত্র কাব্যত্ব পান, তাঁর কাছে টি এস এলিয়ট্ প্রলাপের মতো বলে মনে হবে; কিন্তু মিল্টন যেমন মহৎ কবিতা লিখেছেন—তেমনি এলিয়ট্ও মহান কবি। যুগ বদলেছে, কবিতার সংজ্ঞারও বদল হয়েছে।

তাই ফেবল—রোম্যান্স্—নভেলা থেকে আধুনিক ছোট গল্পের যে বর্তমান রূপটি গড়ে উঠেছে তা-ও চিরস্থায়ী নয়। গল্প মনস্তত্ত্বমূলক হোক আর কাব্যমূলকই হোক—একটি ছোট কাহিনীকে অন্তত তার মধ্যে থাকতেই হবে—এতদিন পর্যন্ত এই নিয়মটিই চলে আসছিল। কিন্তু স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, ঘটনার প্রতি আধুনিক লেখকের মনে বিরূপতা সৃষ্টি হয়েছে, মম জানিয়েছেন, "Fear of incident"। একালের লেখক বলেছেন, 'কী হবে একটি অহেতুক গল্পের দীর্ঘায়ত বিন্যাসে? কোনো একটি ক্ষণ-মুহূর্তে কোনো একটি চকিত ঘটনার উদ্ভাসনই তো যথেষ্ট—তাতেই তো একটি জীবনগত বা চরিত্রগত সত্য বিদ্যুতের মতো দীপিত হয়ে থাকে।' এই যদি আগামী গল্পের দর্শন হয়—তা হলে কিছুকালের মধ্যেই গল্প-সাহিত্যের সংজ্ঞা থেকে অন্যতম

আবশ্যিক শর্ত—"কাহিনী" কথাটিকে বর্জন করতে হবে। 'গল্পত্ব' না থাকাই ভালো। গল্পের পরিমাপক হবে তখন।

কালের দ্রুততার সঙ্গে ভাষাও দ্রুতগামী। রকেটের গতিতে তাল রেখে জীবনও যখন অগ্রসর, তখন শিথিল-বিন্যস্ত বাণী-বিলাসের অবসর কোথায়? এখন ছোট ছোট প্রতীকী শব্দ প্রয়োগের দিকেই লক্ষ্য। ক্রিয়াপদের ব্যবহার অনেক কমে এসেছে। সেদিন একটি গল্পের সূচনা দেখলাম: "স্নানের ঘরে কলের জলের শব্দ। বেড়ালটা হাই তুলছে। দেওয়াল-ঘড়ির কাচে ধুলো। বিকেল। বেড়ালটা হাই তুলছে। জলের শব্দ নেই। রেডিয়োতে ওয়েস্টার্নার। বিকেল। ক্লান্ত। ধুলোর গন্ধ। ক্লান্ত বিকেল।"

লাইনগুলিকে উপর-নীচ করে সাজিয়ে দিলেই এলিয়টের কবিতা হয়ে উঠবে। এই ভাষার পাশে পাশে আবার প্রবাহিত হয়ে আসছে জেমস্ জয়েসের চৈতন্য-প্রবাহ-সম্ভব 'Interior monologue'—অন্তর্মুখী আত্মোক্তি। চেতন-অবচেতনের মিলনে যে জটিল ভাষা উইলিয়াম ফক্নার চর্চা করেছেন, অতি বড় সাহিত্যরসিক পাঠকেরও সে ভাষা পড়তে পড়তে মধ্যে মধ্যে মাথা ধরে যাবে। আধুনিক ছবি ও কবিতার মতো আধুনিক গল্পও যেন একান্ত ব্যক্তিমূলক হয়ে উঠেছে। মমের মতো দু-চারটি ক্লান্ত কণ্ঠস্বর এই প্রবণতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তুলেছেন; কিন্তু কালের গতিরোধ করা কি কারো পক্ষেই সম্ভব?

আজ যাকে আমরা গল্প বলছি, তা ভবিষ্যতে থাকবে না, কিন্তু সেদিনও নতুন সংজ্ঞা নিয়ে অভিনবতর ছোট গল্পের জন্ম হবে। আজকে ডিলান টমাসের কাব্যপাঠক যে মন নিয়ে শেলীর কবিতা পড়েন, জাক প্রেভেরের পাঠক যে ঐতিহাসিক কৌতূহল নিয়ে ভিয়ঁ (Villon)-রচিত কবিতার আস্বাদন করেন—ভবিষ্যতের গল্প-পাঠকও অনুরূপ মন এবং চেতনা নিয়ে সমারসেট মমের ছোট গল্প পড়বেন।

সমস্ত শিল্প-সাহিত্য আজ যে-পথে অগ্রসর হয়েছে—তা একান্ত ভাবেই ব্যক্তি-স্বতন্ত্রতার পথ। শিল্পে সমাজ-চেতনাকে ব্যক্ত করবার চেষ্টা দেখা যাচ্ছে সোভিয়েত ও মহাচীন প্রমুখ কয়েকটি সাম্যবাদী দেশে—এবং তার বিশিষ্ট আদর্শগত কারণও আছে। কিন্তু সাহিত্যশিল্পে যাঁরা "great things"-এর সন্ধান করেন, তাঁদের অনেকেই সাম্যবাদের বান্ধব হয়েও সোভিয়েত প্রভৃতি দেশের শিল্প-সাহিত্যের নামে নাসাকুঞ্চন করে থাকেন। কারণ ও নাকি বড় স্থূল, বড় বেশি লোকায়তিক।

মহৎ আর্টের আবেদন সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য—সেকথা মানি। পৃথিবীতে সব মানুষের সব ইন্দ্রিয়ই সমান তীক্ষ্ন হতে পারে না। এ-কথাও স্বীকার্য যে সর্বজন-রঞ্জনের বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভের জন্য ঐকান্তিক সাধনা করতে হয় খবরের কাগজের রিপোর্টার এবং কমার্শিয়াল্ আর্টিস্টেরই। কিন্তু তাই বলে নিছক আত্মকেন্দ্রিকতাকেই কি আর্টের পরাগতি বলে স্বীকার করব? আগামী দিনের গল্পের আসরে শ্রোতাদের অর্ধচন্দ্রযোগে বিদায় করে লেখক কি নিজের কাছেই নিজের গল্প বলতে বসবেন?

সে সম্ভাবনাকে আমার শুভ বলে মনে হয় না।

বর্তমানের শিল্প-সাহিত্যের প্রসঙ্গে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভূমিকাটিও স্মর্তব্য।

প্রত্যেকটি যুদ্ধই রক্ত-সমুদ্র বিমন্থন করে একসঙ্গে বিষ এবং অমৃতের পাত্রকে তুলে

ধরে। অমৃতের স্পর্শে বস্তু-বিজ্ঞানের অবিশ্বাস্য অগ্রগতি ঘটে—যুদ্ধের সর্বাত্মক প্রেরণায় মানুষের কর্মপ্রয়াস এক এক বছরে এক এক যুগ অগ্রচারণা করে। আর বিষক্রিয়াটি শুরু হয় বুদ্ধিজীবীর মনে ; যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে যে আদিমতার বীভৎস-হিংস্র প্রবাহ উদ্বেলিত হয়—তাতে মানুষের সভ্যতা, কল্যাণ-বুদ্ধি ও সৌন্দর্য-চেতনা সম্বন্ধে সমস্ত বিশ্বাস টলে যেতে চায়। বোমা-বিধ্বস্ত শহরের রূপ, পশু-লাঞ্ছিতা জায়া-কন্যার অপমান—বিজিতের শিশু-সন্তানকে নিয়ে বিজয়ী সৈন্যের সঙ্গিনের মুখে লোফা-লুফি খেলা—এতদিনের যা কিছু মূল্যবোধকে জলবিন্দুর মতো মুছে দেয়। গোয়টে-শিলার-হাইনে-রিলকে-কান্ট-হেগেল-ভাগনারের উত্তরাধিকারী জার্মান সৈন্য যখন বন্দীশিবিরে ইহুদীদের হত্যা করে তাদের গায়ের চর্বিতে সাবান বানিয়ে তাই দিয়ে পরমোল্লাসে স্নানলীলা করে—তখন কোনো সভ্য মানুষই ভাবতে পারে না : পৃথিবীর কোনো ভবিষ্যৎ আছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরেই আমরা দেখেছিলাম, একদল বুদ্ধিজীবী জীবন এবং পৃথিবী সম্বন্ধে কি ভাবে বীতশ্রদ্ধ হয়ে আত্মকেন্দ্রিকতার বিবরে নিহিত হয়েছেন, অথবা ধর্মের ছায়ায় আশ্রয় খুঁজতে আরম্ভ করেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং আণবিক মারণ-যজ্ঞ আরো ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। সোভিয়েতের নিজস্ব চারিত্র-শক্তি এবং আদর্শ-প্রাণনা তাকে এ সংকট থেকে রক্ষা করেছে—যুদ্ধোত্তরকালে যেসব দেশ গণ-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে—তারাও নতুন উদ্দীপনার পথে চলেছে। কিন্তু ইয়োরোপের অধিকাংশ দেশই একটা অসুস্থ মনোবিকারে আজও আচ্ছন্ন ; যুদ্ধে জিতেও আমেরিকার মনে শান্তি নেই—কমিউনিজমের প্রেতচ্ছায়ার দুঃস্বপ্ন দেখতে দেখতে সে 'ওয়ার সাইকোসিস্'-এ ভুগছে।

এর দাম দিচ্ছে শিল্প ও সাহিত্য। জীবন-জগৎ সম্পর্কে বীতস্পৃহ শিল্পী ও লেখক তাই নিজেকে নিয়েই মগ্ন থাকতে চাইছেন। কামুর মোরসালের মতোই তিনি যেন পৃথিবীতে 'বহিরাগত'। এর ফলেই সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো গল্পও এখন আত্মমুখ ; রূপক ও প্রতীকের দিকে তার প্রবণতা বেশি ; তার সমগ্র বক্তব্যে হয় দুঃখবাদ —নইলে নির্লিপ্তবাদ। আর ঐহিক জগৎটা যখন দুঃসহ নরক—তখন ধর্মের বোধি-দ্রুমছায়াও কারো কারো আশ্রয়স্থল।

যুদ্ধোত্তর যুগের প্রতীক হিসাবে আমরা টেনেসি উইলিয়ামসের একটি গল্পের নমুনা দিয়েছিলাম। জাঁ পল সার্ত্র—যিনি 'অস্তিত্ববাদী দর্শনের' প্রবক্তা এবং সম্ভবত এ যুগের সবচাইতে শক্তিশালী ঔপন্যাসিক, তাঁর একটি পরিচিত গল্পকে পুনরায় স্মরণ করলে আধুনিক মননের দুর্গতির রূপটি আরো স্পষ্ট হয়ে দেখা দেবে :

গল্পটির নাম 'এরোস্ত্রাত্যুস' (Erostratus) এবং নায়কের নাম পোল হিলব্যার। অদ্ভুত মানসিক বিকৃতির ফলে সে ঠিক করেছে ছ'টি নরহত্যা করবে। মাত্র ছ'টিই করবে, কারণ তার রিভলভারে ওর চাইতে বেশি আর চেম্বার নেই। তার এই সাধু-সংকল্পের কথা ফ্রান্সের ১০২ জন লেখককে সে ১০২ খানা চিঠি লিখে জানিয়েও দিয়েছে। এই হত্যার উদ্দেশ্য? মানুষকে সে ভালোবাসে না, অতিশয় ঘৃণা করে।

উদ্দেশ্যে সিদ্ধির জন্য সে পথে নেমে এসেছে। পুরুষ, নারী, শিশু, বৃদ্ধ—দলে

দলে চলেছে সামনে দিয়ে—তার শিকার। পকেটে তার গুলিভরা রিভলভার, ট্রিগারে আঙুল, অথচ কিছুতেই সে যেন মনঃস্থির করতে পারছে না, শুধু অনুভব করছে—এরা সকলেই মৃত—এদের নতুনভাবে হত্যা করে কী হবে ?

যান্ত্রিকভাবে চলন্ত মানুষগুলিকে সে অনুসরণ করে চলেছিল। এরই মধ্যে একজনকে তার নজরে পড়েছে। দীর্ঘশরীর একটি লোক—মাথার ডার্বি হ্যাট আর ওভারকোটের উঁচু কলারের ভিতর তার লাল রঙের ঘাড়টা দেখা যাচ্ছে ; সেই ঘাড়ের ভঙ্গি যেন হিল্‌ব্যারের দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গের হাসি হাসছে।

বিরক্ত নিরাশ হিল্‌ব্যার ভাবছে, রিভলভারটাকে সে আবর্জনার স্তূপের মধ্যেই ছুঁড়ে ফেলে দেবে কিনা। এমন সময় সেই দীর্ঘাঙ্গ লোকটা হঠাৎ ফিরে দাঁড়াল। জানতে চাইল একটা পথের ঠিকানা : "How to get to the Rue de la Gaite ?"

আর তৎক্ষণাৎ—

বীভৎস গালাগাল দিয়ে তার পেটে তিনবার গুলি করল হিল্‌ব্যার।

গল্পের বাকী অংশটুকু অনাবশ্যক। এর মধ্যে সার্ত্রের 'অস্তিত্ববাদী দর্শনে'র কী প্রভাব আছে জানি না—সার্ত্র যে পরাজয়বাদী তাও-ও নয়, কিন্তু এ-কথা বলতেই হবে এ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দান। এ-ই হল একালীন ইয়োরোপীয় বুদ্ধিজীবীর স্নায়ুর চিত্র। বিকৃতির কুটিল রন্ধ্রপথে মানুষের ভাবনাকে চালিত করেছে জর্মান কন্‌সেন্‌ট্রেশন ক্যাম্পের দুঃস্বপ্ন—জীবন্ত অবস্থায় রুশ-শিশুর গায়ের চামড়া খুলে নিয়ে নাৎসী সৈন্যের 'হোলি বাইবেল' বাঁধানোর ধর্মীয় পুলক !

এর পাশাপাশি আরও একটি গল্প স্মরণ করুন। লিখেছেন রুশ কবি ও গল্পকার নিকোলাই তিখোনভ্‌।

ঘটনাস্থল লেলিনগ্রাদ—কাল নাৎসী অবরোধ। প্রচণ্ড শীত—অথচ আগুন জ্বালবার উপায় নেই ; সমস্ত শহর ক্ষুধায় জর্জরিত—অথচ খাদ্য আসবার পথ বন্ধ। লাদোগা হ্রদের পথে আসা সামান্য কয়েক টুকরো রুটি যা নাগরিকদের জোটে, তাতে এক দশমাংশেরও উদরপূর্তি হয় না ; কেনোমতে শিশুর ক্ষুন্নিবৃত্তি করে উপবাসী মা হিমে আর ক্ষুধায় তিলে তিলে মরে যায়।

এরই ভিতর অবিশ্রান্ত কামানোর গোলা আর এয়াররেড্‌।

এমনি একটি বিমান আক্রমণের সময় জনৈক লেখক আশ্রয় নিয়েছেন একটি আণ্ডার-গ্রাউণ্ড শেল্‌টারে। উপরে নাৎসী বিমান অবিশ্রাম মৃত্যুবর্ষণ করছে। লেখক ভাবছেন —নাঃ, সত্যিই আর লেলিনগ্রাদে থাকা যায় না। এই মৃত্যু এই ক্ষুধা, এই বিভীষিকার ভার আর তিনি সইতে পারছেন না ; এবার তিনি লেলিনগ্রাদ ছেড়ে চলে যাবেন—সরে যাবেন পূর্ব দিকের কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে। তাঁর স্নায়ু একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে গেছে।

অল্‌-ক্লিয়ারের সাইরেন বাজল। জার্মান বোমারু কিছুক্ষণের জন্য ফিরে গেছে।

লেখক বেরিয়ে এলেন। আবার এসে দাঁড়ালেন আকাশের তলায়। চারদিক সাদা করে দিয়ে তুষার ঝরে পড়ছে। মাথার উপর অম্লান জ্যোৎস্নার রজত-নির্ঝর।

সেই শুভ্র তুষার আর রুপালি জ্যোৎস্নায় একটি অপরূপ দৃশ্য তাঁর চোখে পড়ল। সামনেই ছিল একটি উঁচু প্রাচীর। বোমার ঘায়ে সেটা ভেঙে পড়েছে। আর দেখা

যাচ্ছে শ্বেত-পাথরের একটি সিংহের মূর্তি—এতদিন ওটা প্রাচীরের আড়ালে লুকিয়ে ছিল।

তুষার আর জ্যোৎস্নার এই প্রেক্ষাপটে কী অপূর্ব দেখাচ্ছে ওই সিংহটিকে—কী মহিমান্বিত—কী আশ্চর্য সুন্দর! ও যেন লেলিনগ্রাদের প্রাণশক্তির প্রতীক—তার অপরাজেয় আত্মার সৌন্দর্যদীপ্ত অভিব্যক্তি। আর—আর তৎক্ষণাৎ লেখকের মনে হল: না, লেলিনগ্রাদ ছেড়ে তিনি কোথাও যাবেন না!

দুটি গল্পই সংক্ষেপে উদ্ধৃত করলাম। কোন্‌টি ভালো কোন্‌টি মন্দ সে বিচার করব না। ইতিহাসই নির্ধারণ করুক—ভবিষ্যতের ছোট গল্প কোন্ লক্ষ্যকে বেছে নেবে। মনের জগৎকে সে তন্ন তন্ন করেই সন্ধান করুক—কিন্তু সামাজিক দায়িত্বও কি তার থাকবে না? আর সে দায়িত্ব পালন করলে তাকে কি মহৎ আর্ট বলে গণ্য করা চলবে না?

নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করবার সময় উইলিয়ম ফক্‌নার আবেগ-স্পন্দিত ছোট একটি ভাষণ দিয়েছিলেন। এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ও ছোট গল্প লেখকের জীবন-বাণী, তা থেকে উদ্ধৃত করা যাক:

"Our tragedy to-day is a general and universal physical fear so long sustained by now that we can ever bear it. There are no longer problems of the spirits. There is only the question: When will I be blown up?......

......He must learn them again. He must teach himself that the basest of all things is to be afraid; and, teaching himself that forget it for ever, leaving no room in his workshop for anything but the old varieties and truths of the heart, the old universal truths lacking which any story is ephemeral and doomed—love and honour and pity and compassion, and sacrifice. Until he does so, he labours under a curse......

......I believe that man will not merely endure: he will prevail. He is immortal, not because he alone among creatures has an inexhaustible voice, but because he has a spirit capable of compassion and sacrifice and endurance. The poet's, the writer's duty is to write about these things—."

সমস্ত ভাষণটিই এখানে তুলে দেওয়ার প্রলোভন সংবরণ করতে হল। কিন্তু এযুগের অন্যতম প্রধান কথাসাহিত্য-নায়কের এই উদ্‌ঘোষণ আমাদের আশ্বস্ত করে, অপরাজেয় মানুষের একটি অভ্রংলিহ সিংহমূর্তি যেন চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়। ভবিষ্যতের ছোট গল্প অন্যান্য শিল্প-সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের মহিমাকেই স্বীকার করে নেবে—সঙ্গতভাবেই এ প্রত্যাশা আমরা করতে পারি; এবং যদিও ফক্‌নার আর বেঁচে নেই, আমরা এ আশা রাখতে পারি যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পী-সাহিত্যিকেরা মানুষকে সেই মহাজীবনের পথই দেখাবেন।

পৃথিবীর দিকে দিকে দেশে দেশে আজ শত-সহস্র ছোট গল্প রচিত হচ্ছে। কিন্তু তাদের মধ্যে মাত্র কয়েকটিই আমাদের সংজ্ঞা ও সূত্র অনুযায়ী প্রথম শ্রেণীর শিল্প হিসেবে কৃতিত্ব দাবি করতে পারে। তার জন্য অবশ্যই ক্ষুণ্ণ হওয়ার কোনো কারণ নেই। একজন সমালোচক বলেছিলেন, "It is an accidental year when a great short story is produced"। যে কোনো মহান্ সৃষ্টিই 'কোটিকে গুটিক'—তারা সাধারণ ধর্মের ব্যতিক্রম। সেইজন্য আমরা 'সু-গল্প' পেলেই খুশি হবো—'মন্দ নয় গল্পে'ও আপত্তি করব না।

আর এক দিক থেকে জ্যামিতির সরল-রেখাকে ভাবতে পারা যায়। আদর্শ জ্যামিতিক রেখা যেমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পেন্সিল দিয়েও আঁকা যায় না, তেমনি আদর্শ ছোট গল্পও কোনোদিনই লেখা হতে পারে না। কৃতিত্বের 'তর-তম' নির্ভর করে আদর্শের কাছাকাছি কে কতখানি পৌঁছতে পেরেছে তারই উপর। সে-ই তার মাপকাঠি।

এই 'তর-তম'র বিচারেই আমাদের বাংলা ছোট গল্পের কথাও সগৌরবে স্মরণ করি। ঐতিহাসিক ভাবে না হোক, সাহিত্যিক ভাবে বাংলা দেশে আধুনিক ছোট গল্পের প্রবর্তক রবীন্দ্রনাথ। তাঁর অনেক ক'টি গল্পই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কথা-সম্ভারের সঙ্গে সমমর্যাদা দাবি করতে পারে। আধুনিক বাংলা উপন্যাসের যত দৈন্যই থাকুক, তার ছোট গল্পের ফসল কোনমতেই উপেক্ষার বস্তু নয়। রবীন্দ্রনাথের পুঞ্জ পুঞ্জ সোনার ধান তো আছেই—একালীন লেখকদের সামগ্রিক কর্ষণার ক্ষেত্রভূমি থেকেও দু'মুঠো শস্য আমরা পৃথিবীর সামনে সানন্দেই তুলে ধরতে পারি।